শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

উত্তরাংশ

তৃতীয় ভাগ
চতুর্থ ভাগ

কথা
কলকাতা ৪৮

SREEHATTER ITIBRITTA-UTTARRANGSHO

[A History of Sylhet]

By Achyutcharan Choudhury, First Edition-1917

Revised Edition 2006

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০০

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৭ খ্রি.

বইওয়ালার পক্ষে রানা মৈত্র কর্তৃক ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রীট, শ্রীভূমি কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং বাসন্তী প্রেস, ১৯এ, ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত

ভূমিকা

ইতিহাসের সত্যানুসন্ধান একটি কঠিন কাজ এবং দুরূহ দায়িত্ব। সাধারণ লেখকের পক্ষে এ ধরনের ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু প্রায় একশত বৎসর পূর্বে শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সিলেটের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসের তথ্যগুলোকে একজন গবেষকের শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে চয়ন করেছেন। সিলেটের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তার নিজস্ব সত্য ও তথ্যের আলোকে আলোকিত করেছেন। একজন লেখক ও গবেষক হিসেবে তিনি যে পরিশ্রম ও প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন আজীবন তা প্রশংসার দাবিদার।

সিলেট একটি প্রাচীন জনপদের নাম। সিলেট অঞ্চলের লোকজন প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এম এ জি ওসমানী রণক্ষেত্রে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। সিলেটে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৪০ সালে ভ্রমণ করে— এই অঞ্চলকে শ্রীক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব সিলেট ভ্রমণকালে এই অঞ্চলকে শ্রীভূমি আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া অঞ্চলটির শ্রী এখনও অন্তর্হিত হয়নি। বরং আরও শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে সিলেটের মানুষ বাংলার গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থাপত্য, পুরাকীর্তি, শ্রুতি, স্মৃতি, দলিল, দস্তাবেজ, প্রাচীন শিলালিপি, ভাস্কর্য ও লিপিবদ্ধ বিবরণ সিলেটের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে থাকা প্রাচীন সভ্যতাকে শ্রী অচ্যুত চরণ চৌধুরী আমাদের জনসম্মুখে হাজির করেছেন। শুধুমাত্র এই একটি কারণে তিনি আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন। এখানে তার গ্রন্থের সার্থকতা।

আমি দুই যুগ ধরে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত। আমার লিখিত রাজনগরের ইতিবৃত্ত, মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। অচিরেই উভয় বাংলা ইতিহাস নিয়ে লিখিত বাংলার ইতিবৃত্ত গ্রন্থ প্রকাশের পথে। ইদানীং অনেক লেখক ও প্রকাশক ইতিহাস গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। তা বাঙালিদের জন্য আনন্দের কথা। কারণ বাঙালিরা নিজের ইতিহাস সাধারণত না পড়ে পাশ্চাত্য ইতিহাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এদিক দিয়ে এটা গর্বের কথা। বিশেষ করে সিলেটের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত শ্রী অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত তিন খণ্ডে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশনার দায়িত্ব জনাব সিকদার আবুল বাশার সাহেব গ্রহণ করে যে ঐতিহাসিক কার্য সম্পাদন করতে যাচ্ছেন তার জন্য যে কোনো ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রেমিক লোক হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন জানানো উচিত। জনাব সিকদার সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের জন্য ইতিহাসবিদদের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থটি বাংলার ইতিহাস সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধানী বাঙালি মাত্রেই গ্রন্থটি সংগ্রহে রাখা উচিত। নতুন সংস্করণের বহুল প্রচার কামনা করছি।

ভূমিকার পেছনের কথা

শ্রীহট্টের ইতিহাস রচিত হয় প্রায় একানব্বই বৎসর পূর্বে। শতাব্দী প্রাচীন সেই গ্রন্থ তিনটি আলোর মুখ দেখে এক অভাবনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে বসে। কারণ গ্রন্থকার সেই গ্রন্থ রচনাকালে সাধারণত ঐতিহাসিকগণ যে রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেন তিনি তার ধারেকাছেও যাননি। লেখক স্বর্গীয় অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কতটুকু মমত্ববোধে পুস্তক তিনটি রচনা করেছিলেন তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। শুধুমাত্র একজন লেখকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়— সম্ভব তাঁর পক্ষে যাঁর হৃদয়ে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, স্বজাতির ও দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং জন্মভূমিকে যিনি মাতৃ সমতুল্য বোধ করেন। এক্ষেত্রে শ্রী চৌধুরী প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিশ্বাস করার কারণ আছে।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় নিজের দেশকে তার পরিবার, সন্তান, ভাই এমনকি প্রাণাধিক স্ত্রীর ভালোবাসার উপরে স্থান দান করেছিলেন। লেখার কাজে মনোনিবেশকালে তিনি স্ত্রী, শিশুকন্যা, এক ভাই ও পুত্রকে হারান ; তারা বিভিন্ন কারণে রোগ-ভোগে ঐ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কার্যকালে একেকটি আঘাত আসতে থাকে। তাঁর লিখিত ভূমিকায় পাঠক ঘটনাগুলো দেখতে পাবেন— তাতে অশ্রু রোধ করা পাঠকের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন আঘাতও শ্রী চৌধুরীকে কাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা বিবেচনা করলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা থাকে না। এ কাজ সম্ভব কেন হয়েছিল আজ একশত বৎসর পরে যদি প্রশ্ন তোলা যায় তার জবাব হবে শ্রী চৌধুরী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন

প্রকৃতির ভাণ্ডারেতে শ্রীহট্টের মাঝে—
কতো শোভা মনোলোভা— সৰ্ব্বত্র বিরাজে।
বিদেশের বর্ণনায় মুগ্ধ তনুমন—
মোহবশে দেশপানে চাইনে কখন।

তিনি বলেছেন 'তখন সংকল্প করলাম শ্রীহট্টের অতীতকথা কিছু কিছু সংগ্রহ করিব।' সেই 'কিছু কিছু' সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তাও এক বিস্ময়ের বিষয়। বিভিন্ন এলাকার প্রধান- অপ্রধান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে তথ্যের জন্য তিনি প্রথমত প্রচারপত্র বিলি করেন। উচ্চ-নিম্ন-মধ্য বংশীয় পরিবার প্রধানদের কাছে তাদের বংশের গৌরব কীর্তিগাথা সুকর্ম-দুষ্কর্ম সকল বিষয় জানতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর সচেতনতা বজায় ছিল যেন কেউ নিজের বংশের নাম কামানোর জন্য অতিরঞ্জিত ভুল তথ্য দিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত না করেন। এক্ষেত্রে তিনি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্যকে তিনি 'ক্রস্ চেক' করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ভুল করতে পারেন এ বিষয়ে তাঁর সতত সতর্কতা ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর বিনম্র স্বীকারোক্তি তাঁকে মহাপুরুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। পরিতাপের বিষয়, আজ এমন মানুষের কীর্তির কথা, তাঁর নাম আমাদের

শিক্ষিতদের অধিকাংশই জানেন না। গুণের আদর ও মর্যাদা যেখানে নেই সেখানে গুণী জন্মে না, কথাটি কী সর্বাংশে সত্য?

বাংলাদেশের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, সারাদেশটি যদি একটি দেহ হয় শ্রীহট্ট বা আজকের সিলেট তার মস্তক স্বরূপ বলতে হবে। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সিলেট (শ্রীহট্ট) গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শাহজালাল (রঃ) কাল থেকেই এদেশের গণমানুষের পুণ্যভূমি। কারা বাস করতেন সেখানে, কেমন ছিলেন তারা? তাদের জীবনযাত্রাসহ এলাকায় প্রচলিত সর্বপ্রকার কিংবদন্তি এই বইয়ে অতি যত্নের সাথে পরিবেশিত হয়েছে। শ্রী চৌধুরীর বিজ্ঞানমনস্কতার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিংবদন্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে। মোট কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পড়তে শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠক স্বস্তি পাবেন বলে বোধহয় না।

অন্যদিকে পুস্তক প্রকাশের ব্যয় আজকালকার বাজার মূল্য হিসেবে কম হলেও সেকালে একেবারে কম ছিল না। প্রথমত ৯০০ কপি প্রায় ২৫০০ টাকা, সেই ব্যয়ভার বহন করাও তত্ত্বনিধির পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে একজন মহানুভব ব্যক্তি কোনো প্রকার আর্থিক লাভালাভ ছাড়াই সেই টাকাটা যোগান দিয়েছিলেন এটাও ইতিহাস বটে। আজকের দিনে বর্তমান সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত কয়টির দেখা মেলে? আরও একটি দৃষ্টান্তমূলক বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন— তত্ত্বনিধি ব্যক্তি হিসেবে দেশ-জনগণ ও জাতির প্রতি কেমন দায়বোধ করতেন সেই ঘটনা তার প্রমাণ। তার জন্ম গ্রামের ডাকঘর মৈনা-ডাকঘরটি পাথারকান্দি অফিসের অধীনস্থ একটি শাখা অফিস হিসেবে চালু ছিল। পরিচালনার ঝামেলার জন্য কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হন। তখন তত্ত্বনিধি নিজেই এগিয়ে এসে তার পরিচালনার ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। কানাই বাজারের ঐ অফিসে গ্রামের পথের পাশে— জমিদারির কাছারি বাড়িতে এক কোণে বসে আম, জাম, কাঁঠাল আর বাঁশবনের ছায়ায় ঘরের কোণে লাল রঙের টিনের চিঠির বাক্স ঝুলছে; হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পোস্ট মাস্টার 'খালি গা, পরনের ধুতি হাঁটুর ওপর তোলা' চোখে গোল ফ্রেমের চশমা এঁটে ডাকঘরের পরিত্যক্ত কাগজে ইতিহাস রচনা করছেন— কল্পনা করা যায়? কাজের প্রতি, দেশের প্রতি কতটুকু মমত্ববোধ থাকলে এমন কাজ করা যায় আজ তাও বিবেচনার দাবি রাখে।

পুস্তক প্রকাশের পর সমগ্র ভারতবর্ষে তা কেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাও ভেবে দেখবার মতো। সেকালের বিখ্যাত সব দৈনিক সাপ্তাহিক পত্র- পত্রিকা এর গুণকীর্তন করেছিল। ইংরেজি দৈনিক এমপায়ার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। গুণকীর্তন করে 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য সংবাদ', 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার', 'ঢাকা রিভিউ', 'সম্মিলন' এরাও।

গ্রন্থ রচনায় তত্ত্বনিধি মহাশয় একাদিক্রমে পনেরো বছর ব্যয় করেন। তার বক্তব্যের কিয়দংশ উপস্থাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করি : তিনি লিখেছেন "দীর্ঘকালের চেষ্টা ও প্রায় পঞ্চদশ বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে অবশ্যই আনন্দিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা মনে হইয়া আজ সে সুখ পূর্ণাঙ্গ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। ইতিবৃত্তের কপি লইয়া যখন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় যাইতে হয় সেই সময় মদীয় সহধর্মিণী পীড়িতা হইয়া পড়েন; আমার আগমনাপেক্ষায় তাহার সুচিকিৎসার

বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে নাই। সেই রোগেই আট মাসের একটি শিশুপুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। 'কুসুমাঙ্গ' সেই শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইলাম। কিছুদিনের জন্য ইতিবৃত্ত মুদ্রণের তত্ত্বাবধান স্থগিত রহিল। শিশু লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইল। সেই সময় কনিষ্ঠ সহোদর অনিরুদ্ধ চরণ চৌধুরী (যিনি ইতিবৃত্তের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন) কলিকাতায় যাওয়ার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। ... কলিকাতায় চলিলাম। কিন্তু হায়... জানিলাম না যে ইহার তাহার সহিত শেষ দেখা। বিদ্যুৎবার্তায় ব্যাধি সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম। কিন্তু অনিরুদ্ধকে পাইলাম না। সে তখন দুঃখময় সংসারের বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মাত্র পাঁচটি মাসের মধ্যে এই দুইটি শোক ঐ কুসুমাঙ্গের ফুল্ল মুখ চাহিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিলাম। যখন তাহার বয়স এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে তখন সে অমৃতভাষে পিতাকেই 'মা' বলিয়া ডাকে। ... ইতিবৃত্তের মুদ্রণ শেষ করিতে কলিকাতায় যাইতে হইবে— কর্তব্য আর স্নেহ উভয়ের মহাযুদ্ধে শেষোক্তই পরাজিত হইল। কলিকাতায় চলিলাম। যাত্রাকালের সেই চিত্র এখনও মন হইতে মুছে নাই। বাটীর সম্মুখে অন্যের কোলে থাকিয়া ফুল্ল কুসুমের ন্যায় সে আমার পানে চাহিয়া রহিল। অল্পদিন যে 'বাবা' বলিতে শিখিয়াছে, কিছুদূরে গিয়া শুনিতে পাইলাম যে সে ডাকিতেছে বাবা আইও।' সাতদিন যাইতে না যাইতে তাহার জ্বর হইল আর সেই ডাক শুনিয়াই সেই ডাক বাবা আইও (এস) থামিল না, কেহই থামাইতে পারিল না। ... কাজ একরূপ শেষ করিয়া বাড়ি আসিলাম। কিন্তু তাহার পীড়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ) রূপ-মানসপুত্র পাইলাম, কিন্তু আমার সোনার কুসুমাঙ্গকে চিরতরে হারাইলাম।'

আমরা মনে করি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের রচনা কাহিনী নিয়েই একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব। সে যাই হোক, এই গ্রন্থ বাঙালি জাতির গৌরব; এর অবদান কোনোকালে নিঃশেষ হবে না। গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত। আশা করি অনিসন্ধিৎসু দেশপ্রেমিক পাঠকগণ এ গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে পরান্মুখ হবে না। তাহলে আমরা নিজেদের শ্রম সার্থক মনে করব।

সিকদার আবুল বাশার

মুখবন্ধ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দুই অংশে বিভক্ত–
পূর্ব্বাংশ ও উত্তরাংশ।

পূর্ব্বাংশে– ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। উত্তরাংশে– বংশবৃত্তান্ত ও জীবনবৃত্তান্ত। পূর্ব্বাংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এইবার উত্তরাংশ হইল। বহুদিনে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিসমাপ্ত হইল।

যশের আশায় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই নাই– এ গুরুভার বহনের যোগ্য নহি বলিয়াই ধারণা। লভ্যের লালসায়ও এ কার্য্যে বৃত হই নাই,– ইহাতে যে লভ্য হইবে না, অনুমানে পূর্ব্বেই তাহা কতকটা বুঝিয়াছিলাম। তবে সাধ করিয়া এ ভার মাথায় কেন লইলাম?

বাল্যকালে যখন শ্রীহট্টে নয়াশড়কের বাসায় পড়িতাম, শ্রীহট্ট-প্রকাশ সম্পাদক স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাসের সহিত আলাপ সম্ভাষণের জন্য শহরের যে সকল গণ্যমান্য লোক আসিতেন, অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের কথা কখন কখন শুনিতে পাইতাম; ইহাতে আমোদ ও শিক্ষা উভয়ই হইত।

একদিন শ্রীহট্টের স্কুল সমূহের তদানীন্তন প্রখ্যাত–নামা ডিপুটী ইনিসপেক্টর স্বর্গীয় রায় সাহেব নবকিশোর সেন মহাশয়ের সহিত শ্রীহট্টের গৌরব কাহিনী লইয়া তাঁহার আলাপ হয়; উভয়েই বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও দেশ-বৎসল; উভয়ের শ্রীহট্টের পূর্ব্বগৌরব-স্মরণে বিমুগ্ধ ও তন্ময়চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্যারীবাবু শ্রীহট্টের ঐতিহাসিক ঘটনা নিচয়ের একটা নোট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কথাও উঠিয়াছিল; এবং স্থিরীকৃত হইয়াছিল প্রাগুক্ত ডিপুটী ইনিস্পেক্টর বাবু, সম্পাদক মহাশয়কে যথোচিত সহায়তা করিবেন এবং সেই ক্ষুদ্র নোটটি বিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশের চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু কার্য্য বোধ হয় সেই পর্যন্ত্যই স্থগিত থাকে। গৃহদাহে সেই নোটটিও ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

উভয় বন্ধুই অতঃপর এতদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের সেদিনকার উৎসাহ, সেদিনকার তন্ময়ভাবে, মনে যে ভাবোন্মেষ হইয়াছিল, মন যেরূপ উন্মাদিত হইয়াছিল, স্মৃতি হইতে তাহা মুছিয়া যায় নাই। মনে হইত, আমাদের শ্রীহট্ট কম কিসে? শ্রীমহাপ্রভুর যাহা পিতৃভূমি– যাহা দর্শন করিতে তিনি নবদ্বীপ হইতে আসিতে পারেন, সে দেশের মাহাত্ম্য আছে। তখন আর তত জানিতাম না, কিন্তু কবির কথা মনে জাগিত, ভাবিতাম–

"সতত শ্রীহট্ট শ্রীর অচল আবাস।
প্রকৃতির প্রীতি নেত্রে তাহাই প্রকাশ"॥

কবি স্বর্গীয় প্যারীচরণের পদ্য পুস্তক।

একাকী নির্জ্জনে ইদ্‌গার মাঠে চলিয়া যাইতাম, প্রকৃতির মধুর চিত্র জীবন্ত হইয়া হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিত, আবার কবির কথা মনে পড়িতঃ-

"কি ছার নন্দনবন কল্পনা কল্পিল
হয় কি প্রকৃত তাহে প্রসূন কলিত?
মিছে শুনে কবি তথা অলির গুঞ্জন,
কবির কল্পনা মাত্র মন্দারের বন।
প্রকৃতির ভাণ্ডারেতে শ্রীহট্টের মাঝে
কতোশোভা মনোলোভা সর্ব্বত্র বিরাজে॥"

(পদ্য পুস্তক)

মনে হইত–

"বিদেশের বর্ণনায় মুগ্ধ তনু মন,
মোহবশে দেশপানে চাইনে কখন॥"

(পদ্য পুস্তক)

ইহার পরে গ্রন্থাদি আলোচনায়, যখন জানিলাম– এই শ্রীহট্টে কেবল শ্রীচৈতন্যেব পিতৃভূমি নহে, ইহা শ্রীঅদ্বৈতাদিরও জন্মস্থান: এখানে বহু পার্ষদ, বহু পদকর্ত্তা, ও বহু গ্রন্থকার জাত হইয়াছেন; যখন জানিলাম, এই শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে কত পূণ্যভূমি পড়িয়া রহিয়াছে, কত মহাপুরুষের কত পূণ্যকথা তাহাতে জড়িত: যখন জানিলাম, কেবল স্বভাব-সম্পদে ও প্রাচীনত্বে নহে,– ধর্ম্মে ও জ্ঞানানুশীলনে, বিদ্যাবৈভবে ও রাজকীয় পদগৌরবে, শিল্পে ও ব্যবসায়ে, সাহস বা শৌর্য্যবীর্য্যে সর্ব্বদিকেই শ্রীহট্টের প্রতিভা সমুজ্জল রেখা পাত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন দেশের গৌরবে হৃদয় ভরিয়া গেল। কিন্তু কবির কথা মনোমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল ঃ-

"বিদেশের বর্ণনায় মুগ্ধ তনু মন,
মোহবশে দেশপানে চাইনে কখন।"

তখন সঙ্কল্প করিলাম– শ্রীহট্টের অতীত কথা কিছু কিছু সংগ্রহ করিব।

ইহার পরে যখন উকীল শ্রীযুক্ত চৈতন্য চরণ দাস মহাশয়ের অনুষ্ঠিত "শ্রীহট্ট দর্পণ' নামক মাসিক পত্রিকা আমাদিগকে সম্পাদিত করিতে হয়, সেই উপলক্ষে সংগ্রহ কার্য্যটাও কতকটা অগ্রসর হয়। যাহা অত্যল্প সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা "শ্রীহট্ট দীপিকা" নামা গ্রন্থে প্রকাশিত করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলাম কিন্তু হইয়া উঠে নাই। আশা পাইয়া স্বর্গীয় খাঁ বাহাদুর মজিদ বখত মজুমদার সাহেবের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু "Mazumder Family" প্রকাশিত করায় তিনি আর ইহা ছাপাইতে অগ্রসর হন নাই। লংলার জমিদার স্বর্গীয় মৌলবী আলী আমজদ খাঁর আশ্বাসে বাক্যে উৎফুল্ল হইয়া দীপিকার একটা প্রতিলিপি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম, কিন্তু তাহা আর ফেরতই পাইলাম না! অতঃপর পৃথিমপাশা হইতে "শ্রীহট্টের ইতিহাস" নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইল, ব্যাপারদৃষ্টে দীপিকার পরিণাম ভাবিয়া নিরাশ হইলাম; কিন্তু সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল না, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া–

ব্যয় বহন করিতে সমর্থ হইব কি না, না ভাবিয়াই উহা প্রেসে পাঠাইয়া দিলাম।

সেই সময় শ্রীহট্টের স্কুল সমূহের ডিপুটী ইনিসপেক্টর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ মহাশয়ের একখানা মুদ্রিত চিঠিতে জানিলাম যে তিনি শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রকাশ কল্পে মাল মসলা সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাকে দীপিকার কথা জানাইলাম এবং তিনি তৎক্ষণাৎ স্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে এ অযোগ্যকে ব্রতী করিলেন। দীপিকা আর মুদ্রিত হইল না,- সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষের স্থলে "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" রূপ মহামহীরুহের উৎপত্তি হইল। তখন ততটা ভাবি নাই, এখন দেখিতেছি, এ গুরুতর ভারটা গ্রহণ না করাই ছিল সঙ্গত, তরুটি তাহা হইলে নিশ্চিত সুপুষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

কিসে কি হইয়া গেল; নিজের শক্তির প্রতি লক্ষ্য নাই- এ কার্য্যে সাধ্যায়ত্ত কি না বিচার নাই, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আহ্বানের উন্মাদিনী শক্তির সম্মোহন গুণে বিমুগ্ধচিত্তে অপরিজ্ঞাত ও অনভ্যস্ত পথে পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে প্রভাবিত হইল- শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত বিরচিত হইতে আরম্ভ হইল; দেশের বহুকথা বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, যাহা অল্প কিছু এখনও শুনা যায় তাহাও বিস্মৃতির অন্ধকূপে চিরাবৃত না হউক, ইহাই এ কার্য্যের প্রবর্ত্তনা। সামান্যই হউক, ইতিহাস নামের অযোগ্যই হউক এবং অজ্ঞতা-জনিত ভুলভ্রান্তি বহুলই হউক, একটা হইয়া গেলে, পরে যোগ্যতর হস্তে সে পথের আবর্জ্জনা দূর হইতে পারিবে, ইহাই দুর্ব্বল চিত্তের সান্ত্বনা।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বার্দ্ধ (ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত) রচিত হইল,- মুদ্রণ ব্যয় বহন করিবে কে? তখন সেই মহাত্মা- যদিও তিনি ধনবান নহেন, কোন জমিদার সন্তান নহেন, কিন্তু সহৃদয়তা ও স্বদেশানুরাগ যাঁহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিল না- তিনিই নিজের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ এই কার্যে ব্যয় দিতে প্রস্তুত হইলেন। যখন তিনি নিজে গ্রন্থ প্রণয়নে বৃত না হইয়া আপনার সংগৃহীত বিবরণাবলী লেখকের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখনই শ্রীমহাপ্রভু ও নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথের গ্রন্থপ্রণয়ন প্রসঙ্গ মনে জাগিয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভুর ন্যায়শাস্ত্রের টীকা, রঘুনাথের দাধিতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইত, কিন্তু তিনি কবি-যশঃ প্রার্থী ছিলেন না-

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মানি জগন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"॥

ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য; তাই তিনি নিজ সঙ্কল্প বিসর্জ্জন দিয়া রঘুনাথের নাম পুরাইয়াছিলেন। অধিকন্তু পদ্মনাথ বাবু গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় বহনেও প্রস্তুত হইলেন। পবিত্র জাহ্নবী প্রবাহের মত তদীয় উদার হৃদয়ের বিমল ভাব লহরীর অনাবিলতা ও গভীরতা অনুভব করিয়া মোহিত হইলাম। পূর্ব্বার্দ্ধ প্রেসে গেল, কলিকাতায় কয়েকবার যাতায়াত ও অবস্থানাদির ব্যয় সহ কিঞ্চিদূন ২৫০০৲ টাকা ব্যয়ে বৎসরাধিক কাল পরে প্রেসের লৌহ নিগড় হইতে গ্রন্থ বাহির হইল। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লাভের আশায় ইহার ব্যয় বহন করিয়াছিলেন মনে করিলে, ইহা নিতান্ত ভ্রম ও দুঃখের বিষয় হইবে; কারণ গ্রন্থ বিক্রয়ে যদি লাভ হইত, তাহা তিনি পাইতেন না, শুদ্ধ প্রদত্ত ব্যয়টা তিনি পাইবেন, ইহাই কথা ছিল। কিন্তু ব্যয়টাও তো আর তিনি এযাবৎ প্রাপ্ত হন নাই। এবং পাইবার আশাও আর নাই। ৯৮০ খণ্ড গ্রন্থের মধ্যে অনেক কপি পত্রিকা সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দিতে হইয়াছে; মোটে

বড় জোর ৫০০ পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু মূল্য আদায় অর্দ্ধেকও হইয়াছে কি না সন্দেহ!– লজ্জার বিষয় যে এই অনাদায় শ্রীহট্ট জেলার মধ্যেই প্রায় সমস্ত! অত্রত্য কেহ কেহ পুস্তকের মূল্য অধিক হইয়াছে বলিয়াও রব তুলিয়াছিলেন। যেরূপ ব্যাপার, সহৃদয় ব্যক্তির নিকটে এই পুস্তকের মূল্য কম বলিয়াই বোধ হইবে। "বঙ্গবাসী" পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়তো স্পষ্টতঃ ইহাই বলিয়াছেন।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে পুস্তকের লিখিত বিষয়ের জন্যও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কোনও প্রকারে দায়ী। ইহা তাঁহাদের নিতান্ত ভুল। অনেক বিষয়ে লেখকের সহিত তাঁহার মতের প্রভূত পার্থক্য– কাছাড়ের ইতিহাস অংশ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশের উপসংহারে যেরূপ, তৎকৃত হেড়ম্বের দণ্ডবিধির ভূমিকায় তাহার অনেক বিপরীত কথা আছে। সেদিনও ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে কামরূপের সঙ্গে শ্রীহট্টের যে সম্পর্ক বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখাইয়াছেন (বিজয়া ১৩২০-আষাঢ় সংখ্যা), তাহা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের প্রকটিত মতের সঙ্গে অনেক স্বতন্ত্র। ফলকথা, তিনি পাণ্ডুলিপির অনেকটা দেখিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু লেখকের মতামতের উপর কদাপি হস্তক্ষেপ করেন নাই।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের আকার বড় হইয়া গিয়াছে বলিয়াও আপত্তি শুনা গিয়াছে, কিন্তু শ্রীহট্টের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ ঘটনাবলী পূর্ণাঙ্গে সংগৃহীত হইতে পারিলে যে ইহার আকার কত বৃহৎ হইত, তাহার তুলনায়, কলেবর ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন সামান্য স্থানের ইতিহাসের তুলনায়ও এতাদৃশ একটা সুবৃহৎ জেলার এই ইতিবৃত্ত নিশ্চয়ই বড় হয় নাই।

প্রথমার্দ্ধ ইতিবৃত্ত নানা প্রেসে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ছাপা হওয়াতে ইহাতে ভুল ভ্রান্তি বহু রহিয়া গিয়াছে– শুদ্ধিপত্রে অতি অল্পই সংশোধিত হইয়াছে। এও অতি সামান্য কথা। বিষয়গত ভুল ভ্রান্তিও বহুতর আছে, হয়তো এজন্য আমাদের উপরে অনেকে অসন্তুষ্টও হইয়াছেন। যাহা হউক তাঁহাদের প্রীত্যর্থে বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে যদি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে ঐ সকল ক্রটি সংশোধিত হইবে। তবে এই সকল ভুল ভ্রান্তির স্থলগুলি পাঠকগণ আমাকে বিজ্ঞাপিত করিলেই বাধিত হইব।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উত্তরাংশ– বংশবৃত্তান্ত ও জীবন বৃত্তান্ত– ভগবদিচ্ছায় এক্ষণে প্রকাশিত হইল। এই দ্বিতীয়ার্দ্ধ দেখিয়াও সেই মূল্যের ও আকৃতির কথা মনে পড়িতেছে। কাগজ ও অন্যান্য সরঞ্জামের এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বর্দ্ধিতায়ন উত্তরাংশের মূল্য পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা অল্প অধিক করিতে হইল। আমরা গ্রন্থাবয়বের সংঙ্কোচ করিতে পারিতাম, কিন্তু যেমন কেহ কেহ আকার বৃহৎ ও মূল্য বেশী বলিয়া বিতুষ্ট, তেমনই অনেকেই আবার "হউক মূল্য বেশী,– তথাপি যতদূর পারা যায় বিস্তারিতভাবে প্রখ্যাত বংশকথা সন্নিবিষ্ট করাই উচিত" বলিয়াও মত খ্যাপন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের সমস্ত বিশিষ্ট বংশের ও বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনী যত পারি প্রচারিত করিব এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া– কোন কোন স্থলে একাধিকবারে চিঠি লিখিয়া ও মৌখিক অনুরোধ করিয়াও তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। দেশের গৌরবকীর্ত্তির উদ্ধার হইবে ইহা কার না সাধ্য? এজন্যই তো এত পরিশ্রম ও

অর্থব্যয়। কিন্তু চেষ্টা সর্ব্বত্র ফলবতী হয় নাই, দুর্ভাগ্যই বটে। যে যে মহাত্মা নিজ নিজ বংশকথা পাঠাইয়াছেন, যাঁহারা অন্যের বংশ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র; বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাঁহাদের নামাবলী প্রকাশ করিতে অসমর্থ, গ্রন্থের গর্ভে স্থল বিশেষে বিষয় প্রদাতার নাম উল্লেখিত হইয়াছে এবং 'শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণয়ন কল্পে সংগৃহীত বিবরণাবলীর "সূচীপত্র" নামক যে পুস্তিকা ১৩১৪ বাংলায় প্রকাশিত হয়, তাহাতেও তাঁহাদের অনেকের নাম আছে।

শ্রীশ্রী স্বর্গীয় মহালক্ষ্মীর শ্রীচরণাঙ্কিত শ্রীহট্ট ভূমি কত মহাবংশ ও কত মহাপুরুষকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। সে সকলের কথা এই উত্তরাংশে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রচারিত না হইলে আকাঙ্খা সফল হয় কই? কিন্তু কোন কোন ব্যাপার স্মরণে চিত্র কখন কখন নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, কল্পনায় ভয় উদ্দীপ্ত ও উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

আমরা যে সকল বংশকথা প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎ সমস্ত যে সর্ব্বতোভাবে ঠিক কোন অংশে কোনটি যে অযথাবাদ-দৃষ্ট হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা বিবরণ দিয়াছেন তাঁহাদের কেহ যে স্থল বিশেষে অতিবাদ অথবা অযথা উক্তি প্রভৃতির সমাবেশ করেন নাই, তাহা বলা যায় না। প্রমাণ পাইয়াছি, কেহ কেহ(স্ববংশের কথা যেমন পল্লবিত করিয়া বলিয়াছেন, তদ্রূপ) অন্য বংশের উপর (হয়তো অনিচ্ছাঃ) মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়া ফেলিয়াছেন আমরা অতি সতর্কতার সহিত ঐ সকল অংশ পরিবর্জ্জন করিয়াছি। তবে সর্ব্বত্রই এতাদৃশ ভ্রান্তি পরিশোধনে যে কার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এইজন্য এই উত্তরাংশ প্রকাশে সময় সময় মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে, এবং এখনও উহা পাঠকের হাতে দিতে কুণ্ঠানুভব করিতেছি। যেরূপ অবস্থায় ইহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এতদপেক্ষা সতর্ক হওয়ার উপায় ছিল না; যদি কোন বংশ বা জাতির উপর কোনরূপ অন্যায্য উক্তি প্রযোজিত হইয়া থাকে, তাহা সেই বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ হইবে। এতদবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য বিবেচনায় মহানুভববর্গ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাহা জ্ঞাপিত করিলে কৃতার্থ হইব। এবং যদি শুভাদৃষ্টিবশতঃ গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণ হয় তবে যাহাতে প্রকৃত তথ্য প্রকটিত হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তদর্থে চেষ্টা করিব। যাঁহারা স্বয়ং নিজ বংশকথা পাঠাইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যেও এমনও হইয়াছে যে প্রথমবারে ভুল থাকায়, কেহ কেহ দুই তিন বারেও শোধন করিয়া দিয়াছেন, তদবস্থায় অপরে অপর বংশের সম্বন্ধে যাহা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ত্রুটি প্রমাদ থাকাই সম্ভব। অবস্থা বিবেচনায় বর্ত্তমান অর্দ্ধে যে ভুলভ্রান্তি থাকিবে না, এটা অপ্রত্যাশিতই বলিতে হইবে।

বংশ কাহিনী আমরা প্রায়শঃ তদ্বংশীয় ব্যক্তি বিশেষ হইতেই পাইয়াছি। কোন বংশের কথা তদ্বংশীয়েরই সম্যক জানা সম্ভব– তবে এস্থলে স্ববংশের গৌরব খ্যাপনে কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা থাকাও সম্ভাব্য বটে।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, একই বংশ বা স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ হইতে বিবরণ পাইব; এবং তাহাতে নিজেই সত্য নিষ্কর্ষ করিতে সমর্থ হইব। দুঃখের বিষয় দু-এক স্থল ব্যতীত এই সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই; অতএব যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সত্যতার জন্য সাধারণ্যে বিবরণ প্রদাতাই যে দায়ী, তাহা বলা বাহুল্য।

বংশ বৃত্তান্তে দেশের প্রখ্যাত বংশকাহিনী সন্নিবেশিত হইবারই কথা। কিন্তু এমনও ঘটিয়াছে যে, কোন স্থানের বিখ্যাত বংশাখ্যান ছাড় পড়িয়াছে, এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ বংশকথা স্থান পাইয়াছে। এরূপ স্থলে আমরা ঈপ্সিত বিবরণী প্রাপ্ত হই নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এবং ভবিষ্যতে ভগবাদিচ্ছায় ইহার ২য় সংস্করণ হইলে প্রত্যেক স্থানের প্রখ্যাত প্রাচীন বংশকথা প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করিতেছি।

জীবনচরিত খণ্ডে জীবিত ব্যক্তিগণের কথা উল্লেখ করি নাই। এমনকি "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"–নামক পুস্তকে উল্লেখিত "তিব্বতী বাবা" (প্রকৃত নাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যিনি প্রায় পৌণে দুই শত বৎসর হইল শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন) এখনও সশরীরে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া তাঁহার কথাও বলা হয় নাই। দুই এক খানি জেলার ইতিহাসে জীবিত বড় লোকদের কথা দেওয়া হইলেও আমরা পূর্ব্ব হইতেই একল্পনা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের শ্রীহট্ট জননীর জীবিত সুসন্তানগণ দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিতে থাকুন। শ্রীহট্টের ভবিষ্যত ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের কীর্ত্তি কাহিনী প্রচারিত করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

জীবনচরিত সঙ্কলনেও আমরা বংশ কাহিনীর রীতি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা ইচ্ছা করিয়া কাহারও কোন পীড়াজনক কথা ছাপাইব এটা যেন কেহ মনে না করেন। শ্রীহট্টের ও শ্রীহট্টবাসীর গৌরবকীর্ত্তি প্রখ্যাপনই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে মানুষ ভুল ভ্রান্তির স্বভাবতঃই অধীন। যাহা হউক, এই সকল কথা মনে করিয়া– আশা করি– সহৃদয়তা গুণে আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আবার প্রেস হইতে দূরে থাকিয়া প্রুফ দেখায় মুদ্রাঙ্কণেও বহু ভুল হইয়াছে– সমস্ত শোধনের চেষ্টা অসাধ্য। যদি দেশবাসীর উৎসাহে ইহার ২য় সংস্করণ কখন হয় তবে পুনঃ সংস্করণ না হওয়া পর্যন্ত সকলেই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এবং ইহাতে সংযোজনীয় প্রখ্যাত বংশের ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনীও কিছু পাইলে তাহা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশ প্রকাশে অনুষ্ঠাতার আর্থিক ক্ষতির কথা বলিয়াছি; তাদৃশ ক্ষতি দেখিয়াও অম্লান বদনে যিনি এই দ্বিতীয়ার্দ্ধেও ব্যয় বহনে বদ্ধপরিকর হইতে পারেন– ইউরোপীয় মহাসমরের জন্য কাগজের মূল্য দ্বিগুণ হইতেও অধিক হইয়া পড়িলেও যিনি ব্যয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই– তাঁহাকে একটা ধন্যবাদ কেহ ইচ্ছা করিলে দিতেও পারেন, কিন্তু আমরা জানি, তিনি ধন্যবাদের আকাঙ্খায় এই কার্য্যে উৎসাহী হন নাই। শ্রীভগবান তাঁহার সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় অব্যাহত রাখুন, এইমাত্র আমাদের কামনা।

রত্নাগর্ভা এই শ্রীহট্টে অতীত যুগে কত অসংখ্য মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা না থাকায় আমরা আজ শত চেষ্টাও তাঁহাদের বিষয় জানিতে পারিতেছি না; কাজেই এই সংগ্রহে ত্রুটি থাকিবারই কথা। বংশ ও জীবন বৃত্তান্তে যে সকল কথা দেওয়া হইয়াছে, সে সকল নিতান্ত আধুনিক কালের --প্রায়শঃ উনবিংশ শতাব্দীর বড় জোর দুই চারিটা অষ্টাদশ শতাব্দীর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়কার ২/৪ জন বৈষ্ণবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাও পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর। সৌভাগ্য বশতঃ পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠাতা মহোদয় এই সকল কীর্ত্তিকথা সংরক্ষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাই আধুনিক হইলেও অন্ততঃ কতক লোকের পরিচয়-বাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিতে পারা গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলের সাহায্যে "ইতিবৃত্ত" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ করিতে আমাদের একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, আশা সম্পূর্ণ হয় নাই। অত্রাবস্থায়ও সামান্য যাহা করা হইয়াছে তজ্জন্য আমরা পত্রিকা-সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি সূচক প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতই উৎসাহিত হইয়াছি; এবং এমনও অবগত হইয়াছি, যে ইতিমধ্যেই শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের অনুকরণে আরও দুএক জেলার ইতিহাস রচিত হইয়াছে। "এমপায়ার" নামক সুবিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় সমালোচনা স্থলে স্পষ্টতঃই শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের বিশিষ্টতা খ্যাপন করিয়াছেন। "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক পত্রিকায়ও এইরূপই লিখিত হইয়াছে। এতদ্বতীত "প্রবাসী" "সাহিত্য-সংবাদ", "অমৃত বাজার পত্রিকা" "আনন্দ বাজার পত্রিকা" "বঙ্গবাসী" "বসুমতী" "হিতবাদী" "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" "পল্লীবাসী" "শান্তিকণা" "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" প্রভৃতি বহুতর পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ আপনাদের সহৃদয়তা সূচক সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের পরিদর্শকও এতনিমিত্তে ধন্যবাদের পাত্র। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি পত্রদ্বারা আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন; গ্রন্থশেষে ঐ সকল সমালোচনা অংশতঃ উদ্ধৃত করা হইল।

দীর্ঘকালের চেষ্টা ও প্রায় পঞ্চদশ বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল; ইহাতে অবশ্যই আনন্দিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা মনে হইয়া আজ সে সুখ পূর্ণাঙ্গে উপভোগ করিতে পারিতেছি না। ইতিবৃত্তের কপি লইয়া যখন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় যাইতে হয়, সেই সময় মদীয় সহধর্ম্মিণী পীড়িতা হইয়া পড়েন; আমার আগমনাপেক্ষায় তাঁহার সুচিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে নাই; সেই রোগেই আটমাসের একটি শিশুপুত্র রাখিয়া তিনি পরলোকগামিনী হন। "কুসুমাঙ্গ"– সেই মাতৃহীন শিশুটিকে তখন বুকে তুলিয়া লইলাম। কিছুদিনের জন্য ইতিবৃত্ত মুদ্রণের তত্ত্বাবধান স্থগিত রহিল– শিশু লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইল। সেই সময় কনিষ্ঠ সহোদর অনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী–ইতিবৃত্তের জন্য যে সর্ব্বপ্রথম উপকরণ (লাখাইর ভবাণী দত্তের লিপি) সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল, কলিকাতায় যাওয়ার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল, স্বদেশের কীর্ত্তি প্রচার বিষয়ে তাহার অত্যাগ্রহ দর্শনে সুখী হইয়া কলিকাতায় চলিলাম; কিন্তু হায়, জানিলাম না যে ইহার তাহার সহিত শেষ দেখা! বিদ্যুৎবার্ত্তায় ব্যাধি সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম, কিন্তু অনিরুদ্ধকে পাইলাম না, সে তখন দুঃখময় সংসারের বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে!

মাত্র পাঁচটি মাসের মধ্যে এই দুইটি দারুণ শোক কেবল ঐ কুসুমাঙ্গের ফুল্ল মুখ চাহিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিলাম। মায়ার দাস আমরা, মায়াতীত যিনি, তাঁহার চরণানুসন্ধান না করিয়া আরো মায়ামোহিত হইতেই চাহি। ফলে কুসুমাঙ্গের মাতৃস্থলবর্ত্তী হইয়া পড়িলাম। যখন তাহার বয়স এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখনও সে অমৃতভাষে পিতাকেই "মা" বলিয়া ডাকে– এক‌তিলও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না। এ দিকে কঠোর কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে, ইতিবৃত্তের মুদ্রণ শেষ করিতে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কর্ত্তব্য আর স্নেহ, উভয়েই মহাযুদ্ধে শেষোক্তই পরাজিত হইল– কলিকাতায় চলিলাম। যাত্রা কালের সেই চিত্রটি এখনও মন হইতে মুছে নাই, বাটীর সম্মুখে অন্যের কোলে থাকিয়া ফুল্ল কুসুমের ন্যায় সে আমার পানে চাহিয়া রহিল। তখন অল্পদিন সে "বাবা" বলিতে শিখিয়াছে। কিছুদূরে

গেলে শুনিতে পাইলাম যে সে ডাকিতেছে– তাহার অমৃত-মধুর আধ স্বরে বলিতেছে– "বাবা আইও"।

সাতদিন যাইতে না যাইতে তাহার জ্বর হইল, আর সেই ডাক– শুনিয়াছি সেই ডাক–"বাবা আইও" (এস) থামিল না; কেহই থামাইতে পারিল না। সে বুঝি মনে করিত যে তাহার সুধা-স্রাবি মধুর আহ্বান তদীয় পিতাকে আকর্ষণ করিয়া আনিবে! যাহা হউক কিছুদিন পরেই ছেলের অসুখ হইয়াছে বলিয়া চিঠি পাইলাম। বিচলিত হইলাম কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখে তখনও স্নেহ দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। কি করিব– কালী ঘাটে গিয়া জগন্মাতার শ্রীচরণে মাতৃহীন রোগক্লিষ্ট শিশুকে সমর্পণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে লাগিলাম, কাজ একরূপ শেষ করিয়া বাড়ী আসিলাম, কিন্তু তখন তাহার পীড়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ) রূপ মানস-পুত্র পাইলাম, কিন্তু আমার সোনার কুসুমাঙ্গকে চিরতরে হারাইলাম।

আর এই উত্তরাংশের সহিত হারাইয়াছি– আমার হৃদয়পটের নির্ম্মল আলেখ্য নীলিমাকে! ভ্রান্ত মানব আমরা; তাই জগৎপিতার অজস্র স্নেহ তৈল ধারার ন্যায় সর্ব্বত্রই যে বহিতেছে, অনেক সময় তাহা অনুভব করিতে অক্ষম হই; বুঝিতে পারি না– বিয়োগের প্রতপ্ত শ্বাসে অসময়ে সুখের উৎস শুখাইয়া যায় কেন? সুখে শোক-স্মৃতি মিশ্রিত হয় কেন? ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ প্রকাশের পূর্ব্বে পুত্রকে হারায়াছি, আর উত্তরাংশ প্রচারের প্রাক্কালে প্রাণের দুহিতাকে খোয়াইয়াছি, কন্যার বিয়োগ পুত্রের শোক নতুন করিয়া তুলিয়াছে!!

নিয়তি এড়াইবে সাধ্য কার? কিন্তু কার্য্য কারণ বিচারেই আমরা সাংসারিক লাভালাভ ও সুখ দুঃখ সংঘটনের সুত্রানুসন্ধান করিয়া থাকি, এবং সে জন্যই আজি এ আনন্দ সম্যক সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না। হায় মায়া মোহ!

জীবন জলবিম্বের প্রায়, অথচ কাজ সুদীর্ঘ ও বৃহৎ; এজন্য মনে হইত যে অন্ততঃ যদি ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ কপিটা লিখিয়া যাইতে পারি, তবুও ধন্য হইব। ভগবদিচ্ছায় তাহা সফল হইয়াছে– সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে সভক্তি প্রণত হইতেছি। ইতি–

"মৈনা" শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী

৩০শে চৈত্র ১৩২৩ বাংলা।

সূচিপত্র

তৃতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড : উত্তর শ্রীহট্ট

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড : দক্ষিণ শ্রীহট্ট

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ খণ্ড : হবিগঞ্জ

সপ্তম অধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড : সুনামগঞ্জ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পরিশিষ্ট

তৃতীয় ভাগ

উ প ক্র ম ণি কা

চাতুর্ব্বর্ণ্য

আর্য্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষে কোন স্থানবিশেষের বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে তত্রত্য জাতিতত্ত্ব আলোচ্য হইয়া পড়ে। আর্য্য শব্দটাই যেন জাতি গন্ধী,—"মহাকুলকুলীনার্য্য" ইত্যমরঃ। কার্য্যতঃ যে কোন স্থানের কথা বলিতে গেলেই আগে চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা বলিতে হয়। নবামতে চারিবর্ণ পূর্ব্বে ছিল না, পরে ক্রমে চারিবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়, যথাঃ "ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুইবাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।" ঋগ্বেদসংহিতা ১০/৯০/১২ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ। ঐ মতে এ সূক্তটি পরবর্ত্তীকালের রচিত ও ঋদ্বেদে সংযোজিত।

ঋগ্বেদের ব্যবহৃত ভাষা এবং কোন শব্দে কি রূপ অর্থ বোধ হয়, আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান নাই, সুতরাং এই বিষয়ে আলোচনাপূর্ব্বক তথ্যনির্দ্ধারণেরও সামর্থ্য নাই। আমরা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় কৃত অনুবাদপাঠে স্থূলতঃ বুঝিতে পারি যে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল (— যে মন্ডলে পুরুষসূক্ত ভুক্ত আছে,) ছাড়া অন্যান্য মণ্ডলেও বিভিন্ন জাতির উল্লেখ আছে, তাহাতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বিশ বা বৈশ্য এবং সুতার কামার ইত্যাদি শূদ্র কর্ম্মা জাতির নাম আছে। যথা ঃ ক. (১) "হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে। অর্চ্চকেরা অর্চ্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করে, নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, "ব্রাহ্মণেরা" তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে।" ১/১০/১ ঐ। মূলে "ব্রাহ্মণ" শব্দ আছে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাতা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝিয়াছেন। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় স্বীয় অনুবাদে "স্তুতিকার" প্রতিশব্দ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত এই খণ্ডে গায়ক ও নর্ত্তকাদিরও উল্লেখ আছে।

(২) "বাক্ চারিপ্রকার। মেধাবী 'ব্রাহ্মণেরা' তাহা জানেন।" ১/১৬৪/৪৫-ঐ। এস্থলে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় মূলের "ব্রাহ্মণেরা" অনুবাদে "ঋত্বিকেরা" প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

খ. (১) "তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়"। ৭/৬৪/২-ঐ।

(২) "হে সুক্ষত্র দয়াকর দয়াকর।" ৭/৮৯/১১-ঐ। এস্থলে মূলের "ক্ষত্রিয়" ও "সুক্ষত্র" শব্দে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় টীকাস্থলে "বলবান" ও "অতিশয় বলবান" অর্থ হওয়া সঙ্গত বলিয়াছেন।

গ. "যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা গমন জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে" ইত্যাদি। ৪/৫৫/৬-ঐ। ইহারা বাণিজ্যজীবী বৈশ্য নহে কি?

ঘ. (১) "শিল্পিগণ যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে ইত্যাদি।" ৪/২/১৪-ঐ।

২. "কর্ম্মকার যেরূপ (ভস্ত্রাদি দ্বারা) অগ্নিকে যেরূপ সংবর্দ্ধিত করে" ইত্যাদি। ৫/৯/৫-ঐ।

৩. "স্বর্ণকার যেরূপ (ধাতু) দ্রবীভূত করে" ইত্যাদি। ৬/৩/৪-ঐ

এতদ্বারা ছুতার, কামার সোণার ইত্যাদি শূদ্রকর্ম্মার নাম পাওয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তী ঋকে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। যথাঃ "সকল ব্যক্তির কার্য্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; আমাদিগেরও কার্য্য নানাবিধ। দেখ তক্ষ (ছুঁতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের

প্রার্থনা করে, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ কর্ত্তা ব্যক্তিকে চাহে।" ৯/১১২/২,- ঐ। ইহাতে কি বুঝা যায় না যে তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল? যদি তাহা হয়, তবে ইহা জাতি বিভাগানুরূপ কার্য্য বিভাগ নহে কি?

যাঁহাদের মতে চারিজাতির উৎপত্তি ক্রমান্বয়ে পরে পরে হইয়াছে, তাঁহারা বলেন যে কর্ম্মানুক্রমেই জাতি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই প্রকৃত ও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় বটে; কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় বোধ হয় অন্যরূপ; গীতা-শাস্ত্রে লিখিত আছে, যথা— "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"। শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃবর্গের অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করা সমীচীন বোধ হয় না। আধ্যাত্মিক ভাব এবং শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহাদের যে অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা "সৃষ্টং" শব্দে কি বুঝিয়াছেন? 'সৃষ্টং' শব্দ থাকাতে বুঝিতে আপত্তি কি যে, সৃষ্টির সময় হইতেই গুণ ও কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি?— সত্ত্ব-রজাদি গুণতারতম্যে যে চারি জাতির সৃষ্টি হয় নাই, চারি জাতি স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা কে বলিবে? বিশেষতঃ মনুষ্যের জন্মের পর অভিপ্রায়ানুরূপ বৃত্তি গ্রহণে জাতি নিরূপিত হইয়াছে বলিলে, বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তিতায় সেই বিভিন্ন জাতির কথাই আসিয়া পড়ে। কারণ কেহ গ্রহণ না করিলে তাহা বৃত্তি বলিয়া গণ্য হয় না। তাহা হইলে "সৃষ্টং" শব্দও ব্যবহৃত হইত না এবং বিশ্বামিত্রাদির ব্রাহ্মণত্বলাভের বিশেষত্ব থাকিত না।[১] ফলতঃ ক্ষত্রিয়াদির এতদ্রূপ ব্রাহ্মণত্ব লাভের উদাহরণের বিশেষত্ব হইতেই অনুভূত হয় যে, বর্ণভেদ সাধারণ গুণকর্ম্মাশ্রিত নহে,— ইহা বিশিষ্ট গুণকর্ম্মসম্ভূত।[২] সাধারণ কর্ম্মবিভাগ হইতে বর্ণভেদ হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে আগে যজ্ঞাদি কর্ম্ম না আগে ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ ব্যতীত যজ্ঞাদির প্রতিষ্ঠা অসম্ভাবনীয় নহে কি? যাহা হউক, পণ্ডিতদের বিচার্য্য এ সকল বড় বিষয়ের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। ফলতঃ বৈদিক সময় হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা শাস্ত্র গ্রন্থে আছে তাহার পূর্ব্বে কি ছিল, ইহার যখন শাস্ত্র নাই, তখন অনুমানের উপর তাহার আলোচনার আবশ্যকও আমাদের নাই।

বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

এই চাতুব্বর্ণ্যের পার্থক্য ও বিশুদ্ধি সংরক্ষার সহিত এদেশের হিতাহিত গ্রথিত হইয়াছিল। শ্রৌত্ব-ধর্ম্ম-গৃহাদি, সূত্রগ্রন্থ ও স্মৃতি শাস্ত্রাদির মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই। এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম— তাহার আচার ব্যবহার সমস্তই শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদের বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, তাবৎ শাস্ত্রেই তাহা ঘোষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পুরাণে লিখিত আছে, — "ব্রাহ্মণ কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণ, কুল জাত হইয়া স্বধর্ম্ম ও সদাচারে ব্রহ্মচিন্তা করেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত।" শিবপুরাণে লিখিত আছে— "ধর্ম্মাদি চতুব্বর্গ ব্রাহ্মণগণেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞ, হোম এবং হবিঃ; দেবগণ ইহাতেই পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণবর্গের মঙ্গলেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের জন্মই ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার কারণ; সংস্কার অর্থাৎ উপনয়নে তাঁহাদের দ্বিজ সংজ্ঞার উৎপত্তি এবং বিদ্যাই তাঁহাদের বিপ্র নামের হেতু। তপস্যা, যোগ, শৌচ, সত্য ও জ্ঞানচর্চ্চাই ব্রাহ্মণের কার্য্য। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেন না, ব্রাহ্মণ প্রাণিহত্যাদি পাপ বিবর্জ্জিত।" ফলতঃ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণেই প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্রাহ্মণ ভূদেব।

---

১. সত্ত্বাংশোহি ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিঃ।

২. "বশিষ্ঠো বেশ্যায়াং বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়াগস্ত্যঃ কলসাজ্জাত ইতি শ্রূয়তে" শাঙ্করভাষ্যে এইরূপে ইহাদের জন্মের হীনত্ব প্রকীর্ত্তিত করিয়া বিশিষ্ট গুণ জন্য ব্রাহ্মণত্ব স্বীকৃত হওয়াতে সাধারণ কর্ম্মবিভাগ হইতে জাতির উৎপত্তি বলা সঙ্গত হয় কি? পৃথিবীর ইতিহাসে এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গোত্রাদি

হিন্দুর সামাজিকতার প্রধান লক্ষ্য, তাহাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত পবিত্রতা রক্ষা। ইহা হইতেই কালক্রমে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সংঘটিত হয়। এই পার্থক্যের বিভিন্নতায় এক এক জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাব এবং তাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গোত্রাদির উৎপত্তি এইরূপ কোন কারণসম্ভূত কি না কে বলিবে?

"গোত্রং চাভিজনঃ কুল্‌মিত্যমরঃ।"

"গোত্রং বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধমাদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপম্।"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

দেখাও যায় যে, বিশ্বামিত্র জমদগ্নি প্রভৃতি কুলপ্রবর্ত্তক ঋণিগণ হইতেই গোত্রোৎপত্তি। কথিত আছে যে, গোত্র-যাগ সম্পাদনকারী ঋষিগণের নামেই গোত্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং এরূপযজ্ঞে যাঁহারা ঋত্বিক থাকিতেন, তাহাদের নামে প্রবরের উৎপত্তি হইয়াছে। গোত্রের সংখ্যা অনেক; প্রত্যেকগোত্রে একাধিক প্রবর আছে।

ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি, তাঁহাদের পুরোহিতের গোত্রের নামে পরিচয় প্রদান করেন। এবং শূদ্রেরও গোত্রপ্রাপ্তি তদ্রুপেই হইয়াছে।[৩]

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণই আদি বলিয়া অনুমিত। ইঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ শুনকাদি আটটি গোত্র প্রচলিত। ইহার পরেই আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের প্রভাব। তাঁহাদের আগমনকাল নির্ণয়ে বহু ভিন্ন মত আছে: বারেন্দ্রকুলপঞ্জী মতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের আগমন ঘটে। তাঁহাদের নামঃ-

১। শাণ্ডিল্য গোত্রীয়   ভট্টনারায়ণ
২। কাশ্যপ   "   দক্ষ
৩। বাৎস্য   "   ছান্দড়
৪। ভরদ্বাজ   "   শ্রীহর্ষ
৫। সাবর্ণ   "   বেদগর্ভ

এই পঞ্চ বিপ্র পূর্ব্বোক্ত সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করিয়া এদেশে বাস করেন।

কালক্রমে তাঁহাদের ৫৬টি পুত্র জাত হয়, এই ৫৬ জনের বাসের জন্য যে ৫৬টি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাতে "গ্রামীণ" শব্দ হইতে, পরিচয় জ্ঞাপক এক এক "গাঞি" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৪]

এই সকল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা রাঢ়দেশে বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ী এবং যাঁহারা বরেন্দ্র-ভূমে বাস করেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিতি হন। আদিশুরের আনীত এই বিপ্রবর্গ 'পঞ্চগোত্রীয় বলিয়া প্রখ্যাত। তারপর ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপ শ্যামলবর্ম্মা আরও পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎপর যাঁহাদের আগমন ঘটে, তাঁহারা ষষ্ঠ গোত্রীয় বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। ইহার পর দাক্ষিণাত্য, শাকদ্বীপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটে।[৫] এ সকল হইতেই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের বিস্তৃতি।

---

৩. "ক্ষত্রিয়বৈশ্যায়ারুপাদিষ্টগোত্রং শুদ্রস্যাতিদিষ্ট গোত্রং।" ইতি উদ্বাহতত্ত্বম্।

৪. ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্রের উপাধি অনুসারে শাণ্ডিল্যগোত্রে ১৬ গাঞি; এইরূপ কাশ্যপগোত্রে ১৪ গাঞি; বাৎস্যেব গাঞি সংখ্যা ১১; ভরদ্বাজের ১৪, এবং স্বাবর্ণের ১১; মোট ৫৬টি। আবার কোন কোন কুলাচার্য্যের মতে গাঞি সংখ্যা ৫৯টি।

শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজ

আমাদের শ্রীহট্টে এই সকল শ্রেণী বিভাগ নাই। তাহার কারণ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজ ইহাদের বংশসম্ভূত নহে। কথিত আছে যে অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ আদি ধর্ম্মাপার এক যজ্ঞ হয়।[৬] সেই যজ্ঞের কথা কিছুমাত্র সত্য হইলে, সেই যজ্ঞে যে ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন, শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহাদের দ্বারাই গঠিত বলিয়া কথিত। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তৎপূর্ব্বে তবে কি শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল না?— ছিল। আদিশূরের পূর্ব্বে কি বঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল না?— ছিল। সপ্তশতী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও আদিশূরকে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে হয়, শ্রীহট্টেও ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও তদ্রুপ আদি ধর্ম্মপাকে ব্রাহ্মণ— আনিতে হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য যে, শ্রীহট্টের আদি, ব্রাহ্মণ সপ্তশতী হইতে ভিন্ন।

সাম্প্রদায়িক পশ্চাদগত ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত শ্রীহট্টের উক্ত ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ, অতি প্রাচীন। সম্ভ্রম অথবা বংশগৌরবে, সদাচার অথবা বিদ্যাবৈভবে, কোন অংশেই তাঁহারা কিছুমাত্র হীন নহেন। তৎপর, বল্লাল-পীড়িত বহুতর ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক এদেশে আগমন করেন, এই সকলের সংখ্যাও সামান্য নহে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় কার্য্যতৎপরতায় সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ বা কেহ প্রাচীন ব্রাহ্মণবর্গের সমাজে মিশ্রিত হইয়াছেন এবং কাহার কাহারও বা পূর্ব্ব পরিচয় এযাবৎ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। এরূপ কোন কোন বংশের 'পশ্চিমা' খ্যাতি থাকায় তাঁহারা অনতিপূর্ব্বে যে পশ্চিমদেশ হইতে আগমন করেন, তাহা বুঝা যায়। উদাহরণ স্থলে শ্রীহট্ট-লামাবাজারের পশ্চিমা ব্রাহ্মণ বংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা তথা হইতে কালারায়ের চক, ছাতক, লাউড় প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রসঙ্গতঃ "গড়ের গোবিন্দি" নামক যে ব্রাহ্মণগণের কথা বলা হইয়াছিল,[৭] ইহারাও ভিন্ন স্থানাগত, সম্ভবতঃ কোনরূপ উৎপীড়িত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়; রাজা গৌড়গোবিন্দের সময় এদেশে আসিয়া গৌড়গোবিন্দেরই নামে আখ্যাত হইয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত বর্ণব্রাহ্মণ সংখ্যাও শ্রীহট্টে অল্প নহে, ইঁহাদের অনেকেই অর্থলোভে বা কারণাধীনে স্বসমাজচ্যুত হইয়া হীণবর্ণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বিপ্রের বাসস্থানাদি

সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গ মধ্যে সাধারণতঃ দশটি গোত্র প্রচলিত, যথাঃ—

বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গুলা, স্বর্ণকৌশিক এবং গৌতম। এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণবর্গ বারটি পরগণায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বাসস্থান ও খ্যাতি সাধারণতঃ এইরূপ ঃ

৫. ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের উল্লেখ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের টীকা প্রসঙ্গে শেষ টিপপনীতে লিখিত হইয়াছে।

৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় এবং ঐ অধ্যায়ের টীকাধ্যায় দেখ।

৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায়ে ৫ম টীকা দ্রষ্টব্য।

গোত্র	বাসস্থান	খ্যাতি
বৎস	ঢাকাদক্ষিণ, বুরুঙ্গা রেঙ্গা।	ভট্টাচার্য্য, রায়, চৌধুরী পুরকায়স্থ ইত্যাদি,
বাৎস্য	ইটা, ছয়চিরি বরমাচাল, তরফ।	শিকদার, রায় চৌধুরী ভট্টাচার্য্য।
ভরদ্বাজ	পঞ্চখণ্ড, লংলা সতরশতী, বালিশিরা তরফ।	ভট্টাচার্য, শিকদার।
কৃষ্ণাত্রেয়	ঢাকাদক্ষিণ, চুড়খাই, পঞ্চখণ্ড, ইটা, লংলা, তরফ।	ভট্টাচার্য্য।
পরাশর	পঞ্চখণ্ড, ইটা।	পণ্ডিত, চক্রবর্ত্তী।
কাত্যায়ন	পঞ্চখণ্ড, ইটা।	ভট্টাচার্য্য।
কাশ্যপ	ইটা।	ঐ।
মৌদ্‌গুল্য	ঢাকাদক্ষিণ।	ঐ।
স্বর্ণকৌশিক	পঞ্চখণ্ড, তরফ।	ঐ।
গৌতম	ইটা।	চক্রবর্ত্তী।

এই সাম্প্রদায়িকগণ ব্যতীত বহুস্থানেই উচ্চকুলজাত সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশীয়ের বাস আছে। উপরোক্তরূপ তত্ত্বাবৎ প্রদর্শন করিতে গেলে একটা সুদীর্ঘ তালিকার প্রয়োজন হইবে। এ স্থলে দুলালীর শাণ্ডিল্য এবং কৃষ্ণাত্রেয় বংশীয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক না হইলেও বেজোড়া, বামৈ দুলালী, আতুয়াজান, বোয়ালজোর, ইটা, চৌয়ালিশ, বনভাগ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণবংশীয়গণ প্রাচীনত্বে ও মর্য্যাদায় সুমহৎ। মাসকান্দি, ইসাকপুর, লক্ষ্মীপুর, কাশীপুর, প্রভৃতির ভট্টাচার্য্যগণ এবং পঞ্চখণ্ডের শাণ্ডিল্য ও মৌদগুল্য, ইন্দেশ্বরের ভরদ্বাজ, বালিশিরায় আত্রেয়, সাতগাঁও বাৎস্য ও কাশ্যপ, ইটার বশিষ্ট প্রভৃতি বহুস্থানের বহু গোত্রীয়গণই সম্ভ্রান্ত ও সমাজমান্য। বাণিয়াচঙ্গের গৌতম, কাত্যায়ন, ভরদ্বাজ, জাতূকর্ণ প্রভৃতি গৌত্রীয়গণও প্রাচীন ও অতি সম্ভ্রান্ত। সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ হইতেও কোন কোন অংশে কোন কোন স্থানে এই সকল ব্রাহ্মণ গৌরবিত। ফলতঃ সাম্প্রদায়িক ও এসব গুরুসম্প্রদায়ের সম্মান শ্রীহট্টে অতি প্রবল।

রাঢ়ী বারেন্দ্রাদি পশ্চাদগত মধ্যে ষাটিয়াজুরীর শণ্ডল্য, আগনার চৌধুরী, দিনারপুরের বাগচি, স্বর্ণরেখার মৈত্র প্রভৃতি বংশীয়ের নাম উদাহরণ স্থলে বলা যাইতে পারে। শ্রীহট্ট বৈদিক প্রধান বলিয়া পাশ্চাত্য বৈদিকেরই এ দেশে বিশেষ মান্য এবং মৈথিল স্মার্ত্তগণের বিধি ব্যবস্থাই প্রচলিত। বিষ্ণুপুরবাসী শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "শ্রীহট্টের বৈদিকগণ যে পাশ্চাত্য তাহার একটা অখণ্ডনীয় প্রমাণ এই যে সমস্ত বঙ্গদেশ স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দের ব্যবস্থানুগামী হইয়াছেন কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতেই শ্রীহট্টে মৈথিলাচার ব্যবহার ও ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মিথিলাবাসী মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি, স্মার্ত্ত-চূড়ামণি বাচস্পতি মিশ্রকৃত স্মৃতি গ্রন্থাবলিই এখানকার চতুষ্পাঠী সমূহে পঠিত হয় এবং এই সকল গ্রন্থোক্ত ব্যবস্থানুসারেই এখানকার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

শ্রীহট্টীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে সাম্প্রদায়িক, গুরু সম্প্রদায় ও সাধারণ শ্রেণী, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণগণকে গুরুসম্প্রদায়ী বলিতে পারা যায়। উপজীবিকানুসারে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণসমাজ স্থূলতঃ নিম্নোক্তরূপ বিভক্তঃ

গুরুতা— প্রধানতঃ ভট্টাচার্য্যে, গোস্বামী ও অল্পমাত্রায় চক্রবর্ত্তী।
যাজকতা-- প্রধানতঃ চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য, দেশমুখ্য, মিশ্র বাগ্‌চি, প্রভৃতিও অল্পমাত্রায় ভট্টাচার্য্য।
মিরাশদারী--- প্রধানতঃ চৌধুরী রায়, শিকদার ও রায় চৌধুরী।
সাধারণ বিষয়কর্ম্ম-- পুরকায়স্থ, পাটওয়ারি, বিশ্বাস প্রভৃতি

এতদ্ব্যতীত পূজক শ্রেণী এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণগণ সচরাচর "ঠাকুর" আখ্যায় অভিহিত হন। গ্রহবিপ্র— গণকগণ "আচার্য্য" আখ্যা ধারণ করেন।

উপাধি ধারণের অধিকার

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ চৌধুরী প্রভৃতি উপাধি ধারণের অধিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিলে অন্যায় হইবে না। চৌধুরী, পুরকায়স্থ, কানুনগো, শিকদার প্রভৃতি উপাধি কুলক্রমানুযায়ী হইলেও, ইহা রাজ দত্ত উপাধি। ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মৈত্র প্রভৃতি উপাধিগুলো সামাজিক এবং তাহা কেবল ব্রাহ্মণই ধারণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা রাজ পণ্ডিতি সনন্দ পাইতেন, সমাজে তাঁহারা বিশেষ সম্মানিত হইতেন। দেশের রাজকল্প জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই রাজপণ্ডিত নিযুক্ত করিতেন। রাজপণ্ডিত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মণেতর ভূস্বামীরও থাকিত। রাজপণ্ডিতেরা স্বীয় অধিকৃত পরগণা প্রভৃতির অধিবাসী জনগণের ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবস্থা দান করিতেন ও বিশিষ্ট বিদায় পাইতেন।

এক বংশেই নানা উপাধি

আবার "চৌধুরী" "পুরকায়স্থ" প্রভৃতি রাজকীয় এবং ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধি, এক বংশের ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ব্যক্তির ধারণের উদাহরণও শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণসমাজে অল্প নহে, (যথা— বুরুঙ্গাস্থিত এক মধুকর মিশ্র বংশেই পুরকায়স্থ চৌধুরী, এবং ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাধির সমাবেশ দৃষ্ট হয়।) জিলার সর্ব্বত্রই এইরূপ উপাধি ব্যত্যয়ে ভুরি উদাহরণ রহিয়াছে। এমনকি পিতাপুত্রেও এই উপাধি বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। নবাবি সনন্দেই আমরা দেখিতে পাই যে, পিতা ভট্টাচার্য্য, পুত্র চক্রবর্ত্তী কি শর্ম্মা।

উদাহরণ যেমনঃ—

সনন্দদাতা	সনন্দপ্রাপক	তছরূপকারী
(১) নবাব হরকিষুণ দাস। মনসুর উলমুলুক বাহাদুর।	রামরাম ভট্টাচার্য্য। সাং লংলা।	তৎপুত্র জীবন রাম চক্রবর্তী
(২) নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর	রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য সাং কৌড়িয়া	" রঘুনাথ শর্ম্মা।
(৩) নবাব হরকিষুণ দাস। মনসুর উলমুলক বাহাদুর।	রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী। সাং লংলা	" ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য।
(৪) ঐ	ভবানী চান্দ চক্রবর্ত্তী	" আনন্দরাম শর্ম্মা ইত্যাদি।

যখন সরকারী কাগজ পত্রেই এইরূপ, তখন সাধারণ ব্যবহারে যে কিদৃশ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তী আখ্যাতি

ব্রাহ্মণগণের ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, প্রাচীন কালে যাঁহারা কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যের মতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারাই ভট্টাচার্য্য (ভট্ট+ আচার্য্য) উপাধি পাইতেন। এবং সমাজ-চক্র যাঁহাদের দ্বারা ব্যবস্থিত হইত, তাঁহারা চক্রবর্ত্তী খ্যাতি ধারণ করিতেন; যাহাহউক, এ অঞ্চলে কোন কালেই উপাধি ধারণের কোন শৃঙ্খলা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বরং তৎতুলনায় "চৌধুরী" "পুরকায়স্থ" প্রভৃতি পদবি ধারণের কিঞ্চিৎ শৃঙ্খলা ছিল। তথাপি এদেশে যাঁহারা চৌধুরী; ব্রাহ্মণ হইলে স্বয়ং তাঁহারা "শর্ম্মা (এবং কায়স্থাদি হইলে "দেব" "দাস" ইত্যাদি) লিখিতেন। অন্যে তাঁহাদিগকে কথাবার্ত্তায় "রায়" লেখায় "চৌধুরী" ব্যবহার করিত। এতদনুসারে পুত্র টাকা ধার লইতে স্বয়ং শ্রীঅমুক শর্ম্মা, (কি দেব কি দাস) লিখিয়া, পিতার নাম স্থলে "পিং অমুক চৌধুরী বা রায়চৌধুরী" লিখিতেন। স্বনামে উপাধির অনুল্লেখ শিষ্টতা বা দৈন্যজ্ঞাপক রীতি। এ রীতির এক্ষণে অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন হেতু কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইলেও এই পরিবর্ত্তনের পরিনাম মন্দ নহে। ডাকে এক, লেখায় আর এবং স্বাক্ষরে অন্যতর, একই ব্যক্তির এই ত্রিবিধ উপাধি না হইয়া সর্ব্বাবস্থায় এক উপাধি থাকিলে অনেকটা শৃঙ্খলা থাকে।

কায়স্থ জাতি

ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্য কায়স্থের উল্লেখ আবশ্যক। চাতুর্ব্বর্ণ্যের দ্বিতীয় বা ক্ষত্রিয় জাতিই কায়স্থ।[৮] কায়স্থ নামেই তাঁহাদের ক্ষত্রিয় মূলত্ব প্রকটিত করে; ব্রহ্ম-কায়া সমুদ্ভূত বলিয়াই ইহাঁরা কায়স্থনামে কথিত।[৯] ব্রহ্মা হইতে চিত্রগুপ্ত, তাহা হইতে চৈত্ররথ প্রভৃতির উৎপত্তি। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও, নামান্তর গ্রহণ জন্য যুদ্ধের পরিবর্ত্তে লেখ্য বিদ্যাই ইঁহাদের উপজীবিকা নিরুপিত হয়।[১০]

ইঁহাদের এই বৃত্তি গ্রহণ ও নাম ধারণ সম্বন্ধে স্কন্ধপুরাণে লিখিত আছে।

"ক্ষত্র-কুল-নাশন পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করতঃ নিশিত শরসন্ধান পুরঃসর ধাবিত হইতেছেন দেখিয়া রাজণ্যগণ এবং ক্ষত্রিয়রাজ চন্দ্রসেনের সগর্ভা ভার্য্যা পলায়ণপূর্ব্বক মহর্ষি দাল্‌ভ্যের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পরেই রাম দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমপদে উপনীত হইয়া ঋষি কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইলেন। তিনি ভোজনকালে স্বীয় মনোরথ জ্ঞাপন করিলে দাল্‌ভ্য তাঁহার অভীষ্ট প্রদানে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তিনিও তৎসকাশে একটি বর প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর উভয়ে আহার সমাপন করিলেন। আহারান্তে দালভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! আপনি ইতিপূর্ব্বে যাহা কামনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রকাশ করুন।" রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মহাভাগ! ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনের সগর্ভা স্ত্রী আপনার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে; তাহাকেই আমি চাহি।" ঋষি "তথাস্তু" বলিয়া ভয়কম্পিতা চঞ্চলনেত্রা চন্দ্রসেনপত্নীকে আনিয়া পরশুরামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভার্গব ইহাতে অতিশয় তুষ্ট হইয়া দাল্‌ভ্যকে জিজ্ঞাসা

---

৮. বাহ্বেশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।" আপস্তম্ব।

৯. "ব্রহ্মকারাৎ সমুদ্ভুতঃ কায়স্থো বর্ম্মনসংজ্ঞকঃ। ব্যোম সংহিতা।

১০. ক. "কায়স্থো রাজসাক্ষী স্যাৎ গণকো লেখকস্ততা।"
বিষ্ণুসংহিতা।
খ. "লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যবৃত্ত হিতৈষিণঃ।"
বৃহৎপরাশর।

করিলেন, ঋষিবর, এক্ষণে আপনার প্রার্থীতব্য কি আছে, প্রকাশ করুন।" দালভ্য বলিলেন— "হে জগদ্‌গুরো, এই চন্দ্রসেন— পত্নী-গর্ভস্থ বালিকাটিই আমার প্রার্থনীয়।" ভার্গব (অগ্রেই বরদানে স্বীকৃত ছিলেন, কাজেই) বলিলেন "আমি ক্ষত্রিয়হন্তা, এই বালকের জন্যই এস্থানে আসিয়াছি, আপনে ইহাকেই প্রার্থনা করিলেন!! আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইল, কিন্তু এই বালক যেন ক্ষত্রিয় শব্দে সংজ্ঞিত না হয়। (ব্রহ্ম-কায়া সমুদ্ভূত) ক্ষত্রিয় এই বালকের ভবিষ্যতে কায়স্থ নাম হইবে। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া বালক যদি ক্ষত্রধর্ম্মী হয়, তবে তাঁহাকে বারণ করিবেন।" এইরূপ বলিয়া দলভ্যাশ্রম ত্যাগ করতঃ কল্পান্তাগ্নিসমপ্রভ ভার্গব ক্ষত্রিয় বিনাশ করিতে অন্যত্র ধাবিত হইলেন। এইরূপে ক্ষত্রিয় তনয়ের কায়স্থ নাম প্রাপ্তি ঘটিল এবং এই হইতেই তাঁহারা ক্ষত্রধর্ম্ম বর্জ্জিত হইলেন।[১১] এইরূপে ক্ষত্রধর্ম্ম বর্জ্জিত ও কায়স্থ নামে খ্যাতি হইয়া তাঁহারা চিত্রগুপ্তের অবলম্বন লেখ্যবৃত্তি গ্রহণ করেন।[১২]

কায়স্থের পদ্ধতি

আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত বংশীয় পাঁচ জন কায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে ইঁহারাই কুলীন কায়স্থ। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ এই স্থান চতুষ্টয়ে বাসভেদে ইঁহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ হইয়াছে। ধ্রুবানন্দের কারিকা হইতে বঙ্গীয় কায়স্থগণের কুল পরিচয় নিম্নে লিখিত হইলঃ—

(১) গুহ, ঘোষ, বসু, মিত্র। এই চারি ঘর দক্ষিণ রাঢ়ীয় আদি কুলীন।

(২) [ঘোষ], দশ, সিংহ। এই তিন ঘর উত্তর রাঢ়ীয়।

(৩) চাকি, নন্দী, নাগ। এই ঘর বারেন্দ্র।

(৪) ওম্ দত্ত, দাস, পাল, পালিত, [সিংহ] সেন। সাতঘরে ইহারা মৌলিক।

(৫) অঙ্কুর, আঢ্য, কর, কুণ্ড, ধর, নন্দন, বর্দ্ধন, বিষ্ণু, ভঙ্গ, লাহা, [ওম্, ঘোষ,] চন্দ, [দত্ত দাস, নন্দী, পালিত, সিংহ, সেন।] এই উনবিংশতি জন "বঙ্গজের মহাপাত্র হন।"

(৬) অর্ণব, আইচ, আদিত্য, আস, ইন্দ্র, উপমান, এন্দ, কীর্ত্তি, ক্ষাম, ক্ষেম, ক্ষোম, খিল, গণ, গণ্ডা, গুই, গুটা, গুণ, গুপ্ত, ঘর, চন্দ্র, তেজঃ, দাম, দাহা, দানা, দেত্য, দেব, ধনু, ধরণী, নাথা, পিল, ভঞ্জ, ভুই, ভূত, মান, যশ, রক্ষিত, রঙ্গ, রাজা, রাণা, রাহা, রাউৎ, রুদ্র, লোধ, বন্দুর, বল, বর্ম্মা, ব্রহ্ম, বিদ্, বিন্দ, বৈতস, শক্তি, শাল, শালা, শীল, শূর, শ্বর, সাম, সোম, সোর্ম্মা, হড়, হুই, হেম, হেস, [অঙ্কুর, কুণ্ড, ধর, নন্দী, নাগ, পাল বর্দ্ধন, বিষ্ণু, ভদ্র।] এই ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক।[১৩]

শ্রীহট্টে (এবং ত্রিপুরা, ময়মনসিংহেও) বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই ঘোষ, বসু প্রমুখ কৌলিন্য নাই। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গে পঞ্চকায়স্থাগমন ঘটে। শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে তাহাদের প্রভাব ও বংশবিস্তৃতি ঘটে নাই। এ স্থলে তাঁহাদের আখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত খ্যাতি সম্পন্ন বহুতর কায়স্থ পরবর্ত্তীকালে রাঢ় প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আগমন করেন; খ্যাতি দৃষ্টে তৎপরিচয় পাওয়া যাইবে।

---

১১. "কায়স্থ এষ উৎপন্নো ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ ততঃ।
রামাজ্ঞয়া সদালভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মদ্বহিষ্কৃত॥"— স্কন্দপুরাণ ৪৭ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক।

১২. পুরাণান্তরে অন্যরূপ আখ্যানও লিখিত আছে।

১৩. এই শ্রেণী বিভাগে বহুমতান্তর লক্ষিত হয়, বিভিন্নমতে মৌলিকাদি শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন ঘর গণিত হইয়া থাকে। শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে ইহার অনেকটিই লক্ষিত হয় না।

শ্রীহট্টীয় কায়স্থ সমাজ

ইহাদের আগমনে প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্টে কায়স্থসমাজ সুচারুরূপে গঠিত হয়। এতৎপূর্ব্বে শ্রীহট্টে যে বৈদ্য ও কায়স্থ ছিল না, এমন নহে; ভাটেরার তাম্রশাসনে কায়স্থ ও বৈদ্যাদির উল্লেখ আছে।[১৪] তৎকালে দত্তোপাধি শ্রীহট্টীয় কায়স্থ যুদ্ধ-ধর্ম্মা ছিলেন, তাহাও ইহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীহট্টীয় কায়স্থ সমাজ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা— উত্তম, মধ্যম ও পঞ্চসমারি। এই তিন শ্রেণীতে, নিম্নলিখিত ঘর আছে; যথা—

প্রথমতঃ-	"দেব, দত্ত, দাস, নন্দী।	
	চারি ঘরে কুল বন্দী"॥	
দ্বিতীয়তঃ-	কর, ধর, চন্দ, পাল।	
	নাগ, পালিত মাঝাচাল॥	
তৃতীয়তঃ-	"ক্ষেম, কীর্ত্তি, হাতি, দাম।	সতি, ভূতি, চ্ছতি, সাম॥
	লোধ, বোধ, গণ, পত্য।	পাণি, ধানি, হড়, নাথ॥
	সুই, শূর, বমি রায়া।	সিংহ, সুচি, বিধি, বায়া॥
	রাউৎ, কেউৎ, সাধ্য, এস।	আদিত্য, অর্জ্জুন, অতি, কেশ॥
	গণ্ড, কুণ্ড, ভূমি, হোম।	পূর্ব্ব, ভদ্র, রক্ষিত, সোম॥
	তরণ, তারণ, তেজৎ, তড়াৎ।	বক্ষ, লাঙ্গল, বর্দ্ধণ, ঘড়াৎ॥
	গোহ, গোত্র, রাধ, রোল।	লোর লহ, এন্দ, বোল॥
	গুণ, আউদা, চইর, জাইট।	পঞ্চসমারি ঘর ষাইট॥"[১৫]

পঞ্চসমারি এই ষষ্টিসংখ্যক ঘরের অধিকাংশই এক্ষণে পাওয়া যায় না। অর্জ্জুন, আদিত্য, এন্দ, এস, গুণ, তড়াৎ, তারণ, দাস, পৈত্য, বর্দ্ধন, ভদ্র, রক্ষিত, রাউৎ, সাম, সিংহ, সোম, হোম প্রভৃতি কয়েকটি ঘরের অবস্থিতিই শ্রীহট্টের নানা স্থানে লক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত দেবদত্তাদি, এবং তৎপরে উল্লেখিত কর, ধরাদিও ভুরিশঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ক্ষেমকীর্ত্তাদি খ্যাতি বড় একটা দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম বঙ্গীয় খ্যাতি বিশিষ্ট ২/৪ বংশও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথা ভাড়াউড়ার ওম্ প্রভৃতি, বিভিন্ন স্থানের ঘোষ প্রভৃতি। তদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পন্ন ২/৪ ঘরও দেখা যায়; যথা— লাতুর স্বামী বংশ প্রভৃতি।

উপরোক্ত তিন শ্রেণী মূলে থাকিলেও, স্থান ও অবস্থার তারতম্যে সামাজিক এই শ্রেণীভেদ কার্য্যকর হয় নাই। ফলতঃ শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে "অবস্থা পূজ্যতে" ইতি কথারই উদাহরণ সর্ব্বত্র; সুতরাং কে বড় কে মধ্যম বা কে তদপেক্ষা ছোট্ট, পদ্ধতির হিসাবে তন্নিরুপণ নিশ্চিত ও নিরাপদ হইবে না।

বৈদ্য জাতি

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই আদি জাতি চতুষ্টয়ের অন্যতম না হইলেও বৈদ্য জাতির উল্লেখ এস্থলেই করিব। বৈদ্য জাতি অম্বষ্ঠ নামে কীর্ত্তিত। "অম্বা ক্রোড়জাত" ইতি অর্থে অর্থাৎ

১৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগঃ ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায় দেখ।

১৫. শম্ভুদাস পাল কৃত "ইতিহাস পুণ্য কথা" নামক লিপিতে (১১৯৯ সাল) "ষাইট" স্থলে "চৌরাশি জাইত" লিভিক আছে : বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

মাতৃক্রোড় জাত বলিয়া ইহাদের এই নাম। ইহাদের ঈদৃশ নাম ও উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণীয় মত এইঃ-

তপোবলসম্পন্ন গালব ঋষি তীর্থভ্রমণ কালে একদা তৃষ্ণা-কাতর হইয়া দর্শন করিলেন যে, এক অসামান্য রূপবতী নারী বারিপূরিত কুম্ভ কক্ষে মরালগমনে যাইতেছে। মহর্ষি সে সুধাংশুবদনা সদনে বারি প্রার্থনা করিলেন ও তদ্দত্ত সলিলপানে পিপাসা-শান্তিতে সন্তোষ সহকারে বর দিলেন "পুত্রবতী হও"। সে রমণীর নাম বীরভদ্রা। তিনি তৎ শ্রবণে মধুর-বাক্যে উত্তর করিলেন,– "আপনার অব্যর্থ বাক্য বিবাহিতা নারীর চিত্তহারী হইলেও কুমারীর পক্ষে লজ্জাকর, আমি অবিবাহিতা কুমারী"।

গালব ঋষি তখন বীরভদ্রার, পিতৃসকাশে এই বিবরণ বর্ণন করিলে, তিনি তাঁহাকেই কন্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু বীরভদ্রা তাঁহাকে জলদানে প্রাণরক্ষা করিয়াছে, এই কারণে প্রাণদাত্রীকে তিনি পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অন্যান্য ঋষি গালবের এই ধর্ম্ম সঙ্গত ব্যবহারে তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা বীরভদ্রার ও ঋষিবাক্য রক্ষার এক উপায় করিলেন। বীরভদ্রা হইতে ত্রিলোকের হিতার্থে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির উদ্ভব হইবে, তপঃপ্রভাবে ঋষিগণ পূর্ব্বেই বীরভদ্রার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। মাতৃক্রোড় স্পর্শমাত্র বেদ-মন্ত্র-প্রভাবে সে কুশ-কুমার জীবন প্রাপ্ত হইয়া মানবাকার ধারণ করিল। তখন হৃষ্টচিত্তে সেই সম্মিলিত ঋষিবর্গ উক্ত শিশুর ধন্বন্তরি এই নাম রাখিয়া তপোবনে গমন করিলেন। এই ধন্বন্তরি হইতে বৈদ্যগণের উৎপত্তি।[১৬]

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাতপুত্রই অম্বষ্ঠ।[১৭] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের জন্মখণ্ডে সমুদ্র মন্থনে ধন্বন্তরির উদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পুরাণেরাই ব্রহ্মখণ্ডে পুনঃ ব্রাহ্মণের বিবাহিত বৈশ্য স্ত্রীতে জাত পুত্রই অম্বষ্ঠ নামে কথিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর্গ কল্পান্তর কল্পনায় এই সকল বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধান করেন।

বৈদ্যের শ্রেণী ও পদ্ধতি

বঙ্গীয় বৈদ্য জাতি(১) রাঢ়ী, (২) পঞ্চকোটী, (৩) বঙ্গজ, এই তিন সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত। কৌলিন্য অনুসারে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট এই তিন শ্রেণী ইহাদের মধ্যে আছে। সদবৈদ্যকুল পঞ্জিকায় বৈদ্যগণের ত্রয়োদশ পদ্ধতি ও আদি বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে, যথাঃ-

"সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করোধরঃ।
রাজসোমশ্চ নন্দী কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রচ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ॥"

মর্য্যাদানুসারে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ। যথাঃ–

(১) "উত্তমৌ সেন দাসোচ গুপ্তদত্তৌ তথৈবচ।
(২) দেবঃ করশ্চ মধ্যৌশ্চ।
(৩) রাজসোম কুলাধমৌ॥
নন্দী প্রভৃতয়ো নিন্দ্যা লুপ্তপদ্ধতয়োপিচ।
কেচিজ্জাতাঃ পরিখ্যাতা স্তথা বৃত্তানুসারতঃ॥"

বৈদ্যগণের অষ্টকুলীন বংশে, যথাঃ-

১৬. অন্যতর পুরাণের আখ্যায়িকা উল্লেখে প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক।

শ্রীহট্টের বৈদ্য ও বৈদ্য কায়স্থ

শ্রীহট্ট দেশে, বলাবাহুল্য এ সকল শ্রেণী বিভাগ ও সিদ্ধ সাধ্যাদি ভেদ লক্ষিত হয় না। দক্ষিণ শ্রীহট্টের আলওয়া প্রভৃতি স্থানের বৈদ্য হইতে তাঁহারা বিশেষ ভিন্ন নহেন। জনৈক সমাজ তত্ত্বজ্ঞ কায়স্থ সন্তান আমাদিগকে লিখিয়াছেনঃ- "শ্রীহট্ট জেলায় অধুনা বৈদ্য কায়স্থে মিশামিশি হইয়া গিয়াছে, কেবল গোত্র ও পদ্ধতিতে বৈদ্য ও কায়স্থ বনিয়াদ চিনা যায়; তাহা ছাড়া আর বিশেষত্ব নাই। শ্রীহট্টের বৈদ্যদের অধিকতর কৌলিণ্য বাস্তবতঃ না থাকিলেও নামে একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। লোকে কথায় বলে যে, ইটা, চৌয়ালিশ, দুলালী, তরফ ভদ্রলোকের স্থান।" ইত্যাদি।

"জীবন বৃত্তান্ত" নামক পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও লিখিয়াছেন "শ্রীহট্টে বৈদ্য কায়স্থ বলিয়া কোন পার্থক্য নাই; পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত আছে। বঙ্গের অন্যান্য স্থানে কায়স্থ বৈদ্যে যেরূপ বিরোধ বিষম্বাদ, বিবাহ দূরে থাকুক, এক শ্রেণীর সহিত অন্যে পংক্তি ভোজন পর্যন্ত করেন না, সুখের বিষয় শ্রীহট্টে সেইরূপ অসম্ভাব নাই, তবে কেহ কেহ বঙ্গের অন্যান্য স্থানের অনুকরণে কখন কখন কায়স্থ বৈদ্য বলিয়া পার্থক্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে পার্থক্য দাঁড়ায় না।"

এই জাতি কাহারা

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরেই শাস্ত্রে বৈশ্যজাতির নাম পাওয়া যায়। অতঃপর তৃতীয় বর্ণের বিষয় আলোচ্য হইতেছে; এই বৈশ্যজাতি কাহারা? ব্রহ্মার উরুদেশ হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি।[১৮] বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, বণিকজাতির ধনরক্ষা এবং শূদ্রের জন্য ত্রিবর্ণের সেবা নিরূপিত হইয়াছে।[১৯] বণিক শব্দে বৈদ্য জাতিই বুঝাইতেছে।[২০] কিন্তু কাল সহকারে বঙ্গীয় বৈশ্যজাতির, বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) ন্যায় ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য এই উভয় জাতিই শূদ্রবৎ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন[২১] এবং তাহাতেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি জাতিই মাত্র দৃষ্ট হয়।[২২] বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুইটি জাতি যে লোক পাইয়াছিল,

১৭. "ব্রাহ্মণাদ্বৈকন্যায়াং অম্বষ্টো জায়তে।"
মনু ১০ম অধ্যায় ৮ম শ্লোক।
"দুহির্পিনাযকশ্চায়ু পন্থত্রিপুরকায়ুকাঃ।
শিয়ালগয়িবিত্যষ্টৌ বাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥"
দুহি, শিয়াল ও গয়িসেন, আয়ু ও পন্থদাস, ত্রিপুর ও পিনাক ও গুপ্ত এবং কাউ নন্দী, এই আটজন মুখ্যকুলীন।

১৮. "মুখোতো ব্রাহ্মণোজাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথাবৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্র সমুম্ভবঃ॥"
বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৭ম অধ্যায়।

১৯. "অস্যাভবণ মুখাদ্বিপ্রাঃ সর্ব্বদেব সমাশ্রয়া।
বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ ধনরক্ষণ হেতবে।
উরুতো বাণিজ্যে জাতাঃ ধনবক্ষণ হেতবে।
এযানাং সেবনার্থার শূদ্রা জাতাস্তু পাদতঃ॥" —বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

২০ যথা— "বৈশ্যস্ত ব্যবহর্ত্তা বিট্‌বার্ত্তিকঃ পণিতে বণিক্।"— ইতি বাজনির্ঘণ্ট।

২১. "কলৌ শূদ্রসমা জ্ঞেয়া তথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ।" ইতি বিষ্ণু।

২২. "যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ।"— ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেণাপ্যুক্তং।

তাহা নহে। ক্ষত্রিয়ের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। "বঙ্গীয় সাহুবণিক প্রভৃতি জাতিই বৈশ্য বা তৃতীয় বর্ণ।[২৩]

"সম্বন্ধ নির্ণয়" গ্রন্থে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও কুসীদব্যবহার। ইহাদের সাধারণ নাম বণিক। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্র মধ্যে পতিত হইয়াছেন।" বিশ্বকোষ মহাভিধানে লিখিত হইয়াছে "ভারতের সর্ব্বত্রই এখনও বৈশ্যজাতির বাস রহিয়াছে। অথচ যে বঙ্গীয় বণিকগণের খ্যাতি পূর্ব্বে দেশ বিদেশে বিশ্রুত হইয়াছিল, বাঙ্গালায় সেই বৈশ্যজাতি এক কালে লোপ পাইল, কে বিশ্বাস করিবে? বাস্তবিক বাঙ্গালায় এখনও বৈশ্যজাতির অভাব নাই, বণিক বা ব্যবসায়জীবী লক্ষ লক্ষ বৈশ্য এখনও গৌড়বঙ্গে বিদ্যমান। এদেশে গন্ধ বণিক, সুবর্ণ বণিক, তাম্বুল বণিক, সাহা বণিক (পূর্ব্ববঙ্গের সাহা মহাজন) প্রভৃতি জাতি যে বৈশ্য বংশধর, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সাহু শব্দের অর্থ কি?

শেষোক্ত সাহা বণিক জাতির কথাই এস্থলে আলোচ্য।[২৪] তাহাদের বৃত্তি, জাতীয় নাম এবং বংশ পদ্ধতি হইতে তাহাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়; ইহা সুধী সমাজের সিদ্ধান্ত। সাহুবণিক জাতির নামতত্ত্ব সম্বন্ধে "সৌলুক কুল কারিকায়" লিখিত আছে যে, "দনুজ গুরুর অভিশাপে সুলুকোদ্ভব সৌলুক্য বা শুল্কজাতি সাহা নামে খ্যাত হয়। শুদ্ধাচারিতা ও ধর্ম্ম নয়া হেতু সাধু নামেও খ্যাত হয়, ইহারা নিঃসংশয়ে বৈশ্য।"[২৫]

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ঘোষ স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন— "সাহা এই শব্দটি জাতিবাচক নহে, যেমন বণিক শব্দে কোন জাতিকে না বুঝাইয়া যাহারা ব্যবসায় করে, তাহাদিগকেই বুঝায়, সেইরূপ পূর্ব্বে সাহা শব্দে কোন জাতিকে না বুঝাইয়া যাহারা ব্যবসায় করে, তাহাদিগকেই বুঝাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সাহা বলিলে একটি জাতিবিশেষকেই লক্ষ্য করে। সাহা শব্দের অর্থ কেবল ব্যবসায়ী নহে। সংস্কৃতে সাধু শব্দের অপভ্রংশে সাহু, সাহা ও সা। সংস্কৃতে সাধু শব্দের অর্থ ধনবান, জ্ঞানবান, ধার্ম্মিক, বণিক, ব্যবসায়ী; সুতরাং সাধু, সাহা ও বণিক এই তিনটি শব্দই একার্থ বোধক।"[২৬]

স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় বলেন— "সাহা শব্দ একটি পুরাতন ও প্রখ্যাত সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ। ঐ শব্দের নাম সাধু। বিহারে, অযোধ্যায়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের আরও নানা স্থানে 'ধু' অন্তক শব্দ 'হু' বলিয়া অভিহিত হয়; যথাঃ— বধু-বহু, গোধুম-গোহুম, দধি-দহি, মধু-মহু, বা মৌ, মধুপুরী-মহুপুরী, অবধূত-অবহুত, দাদুজী-দাউজী ইত্যাদি। এইরূপে ঐ সাধু শব্দ সাহু, সাউ, সাহা, সউহ, সা, সাজী প্রভৃতি শব্দে অপভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সাধু শব্দের অর্থ শুদ্ধচেতা লোক, ত্যাগী, ব্রহ্মদর্শী, ধনবান, বণিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। জাতিতত্ত্বে সাধু শব্দের অর্থ বণিক। বৃহৎ সংহিতার 'সাধুনাং বণিজাম্" এইরূপ লিখিত

২৩. প্রাচ্যবিদ্যামহর্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"— বৈশ্যকাণ্ড।

২৪. বণিক পঞ্চবিধ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ১ম ভাগ ৭ম অধ্যায়ে অন্যান্য বণিক জাতির কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

২৫. "দনুজ গুরু শাপান্তে রাষ্টিকঃ কৃষিকঃ রুচিঃ।
সৌলুক্যঃ সুলুকোদ্ভবঃ শুল্ক সাহা বভূবহ।
সাধুত্বস্যাবভৎ কিল ধর্ম্ম নিষ্ঠা পরাগতিঃ॥"
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ধৃত সৌলুক কুল কারিকার বচন।

২৬. কুল প্রতিভা ৩য় খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা।

আছে। গুজরাটী, মাড়োয়ারী, বুণ্ডেলখণ্ডী, ও কাটিয়াবাড়ী প্রভৃতি ভাষায় 'সাহু' 'সাহুকার' প্রভৃতি শব্দ বণিকের উপাধি। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে সাধু (অপভ্রংশে সাধু) শব্দ বৈশ্যেক উপাধি। বঙ্গের প্রাচীন কাব্যেও "সাধু" শব্দ বণিকের প্রতি প্রয়োজিত হইয়াছে।"[২৭] এস্থলে বলা আবশ্যক যে শ্রীহট্ট অঞ্চলে "সাধু" শব্দ "সাউধ" তথা সাহু, সাউ, বা সৌ রূপে পরিণত হইয়াছে।

তাহাদের বঙ্গাগমন

বৈশ্য আগরবালগণের বঙ্গে আগমন সম্বন্ধে শিরাজগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত ১১২৫ সনের একখানা পাতড়ায় পাওয়া যায় যে, "ইহারা পশ্চিম দেশবাসী ছিল, পরে তথা হইতে অগ্রদাস আর আগোর নামে ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট অশোক বৰ্দ্ধনের সময় মগধে আগমন করেন, তথা হইতে বৈশ্যগণের অষ্টকুলীন বংশ, যথাঃ– পরবর্ত্তীগণ তাম্রলিপ্তে গমন করে এবং তৎপরে বঙ্গের নানা স্থানে ইহারা বিস্তৃত হয়।[২৮]

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা. নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণাক্যের অর্থশাস্ত্র (২/১১ অধ্যায়) হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন যে "আগরবালেরা অগরু (অগুরু) প্রভৃতির ব্যবসায় করিত।" তিনি লিখিয়াছেন– "এই জন্যই পরবর্তীকালে তাঁহারা অগর বা আগরবাল নামে পরিচিত হয়।" ক্রুক সাহেবের মতে উক্ত 'অগরু বিক্রেতাগণ এক সময় আগরায় বাস করিত এবং আগরবাল নামে খ্যাত হয়।[২৯] ও তথা হইতে বঙ্গে আগমন করে।' এই আগরবালগণ বঙ্গে প্রথমতঃ বরেন্দ্রভূমি (উত্তর বঙ্গে) বাস করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ইহারাই বঙ্গীয় সাহাবণিক জাতি। (শৌণ্ডিক জাতীয় শুড়ী সাহাদের সহিত তাহাদের কোনও সংশ্রব নাই।) বর্ত্তমানে ইহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাও আবার বহু উপবিভাগে বিভাগিত।

শ্রীহট্টের সাহু-বণিক

শ্রীহট্ট জেলায় এই জাতীয় বহু লোকের বাস। স্থানান্তর বাসী বারেন্দ্রাদি শ্রেণী বিশিষ্ট সাহাবণিকদের সহিত শ্রীহট্টীয় সাহুবণিগ্বর্গের কোনও সামাজিক সম্পর্ক নাই। ইহাদের সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেনঃ "শ্রীহট্ট শ্রেষ্ঠ অগুরুচন্দনের জন্মভূমি।[৩০] এই কারণে অতিপূৰ্ব্ব কাল হইতেই অগরু-বণিকগণের এখানে গতিবিধি ছিল। সৌলুকগণ সমুদ্র-বন্দরে আসিয়া মিলিবার পর এখানকার সাহুর পরামর্শে শ্রীহট্টেও আসিয়া কেহ কেহ মোকাম স্থান করেন। এসময় অপর সাহুগণও এখানে বাস করিতেন; "সাহাকুল পরিচয়"

২৭. সিদ্ধান্ত সমুজ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৯/১০ পৃষ্ঠা।

২৮. "পশ্চিম প্রদেশে মোদের পূৰ্ব্বপুরুষগণ।
কবিত বসতি মুঞি, কৈরাছি শ্রবণ॥
অপরের বংশধর হৈলা আগরী।
বৈশ্যকুলে জাত সভাই নানা গুণধারী॥
সেই হৈতে আগরবালা বলিত সকলে॥"
বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাস বৈম্যকাণ্ড দৃত বাক্য।

২৯. Crookes tribes and castes of north western Province Vol 1. p. 15.

৩০. এস্থলে শ্রীহট্টের কবি প্যারীচরণ দাসের কবিতা মনে পড়িতেছে, যথা–
"শ্রীহট্টে অগরু আছে আতরের মূল;
যার গন্ধে বিলাসীর পরাণ আকুল।"– ইত্যাদি।

হইতে তাহার আভাস পাই। সেই পূর্ব্বতন আগরুবণিক ও সাহুবণিকগণের বংশধরগণ "সাধুবৃত্তি" অবলম্বন দ্বারা পূর্ব্ব হইতে সাধু'র অপভ্রংশে "সাহু" বা "সাউ" নামে পরিচিত আছেন।[৩১] এই জাতি বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ হইতে পুত্র কন্যা লইয়া যে কেবল বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা নহে, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় অনেক ব্যক্তি এই সমাজে মিশিয়াও পড়িয়াছেন।[৩২] কিন্তু মূল কায়স্থ বা বৈদ্য সমাজের সহিত এই সাহু সমাজের কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই।"[৩৩]

ইংরেজী গ্রন্থের মত ও প্রতিবাদ

কায়স্থ-কন্যাদি গ্রহণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন– "শ্রীহট্টীয় সাহুগণের মর্য্যাদা অনেকস্থলে কায়স্থের পরেই বলিতে হইবে। তাহারা কখনও কখন কায়স্থ কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন; ইত্যাদি।"[৩৪] কিন্তু তিনিই আবার গ্রন্থান্তরে[৩৫] শুড়ীদিগের কায়স্থ কন্যা গ্রহণের উল্লেখ করিয়া ও তাহাদিগকে উক্ত সাহু মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সমাজ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মোনশী শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর মহাশয় একথার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এইঃ- "শ্রীহট্টের ভদ্রবিশিষ্ট সাহাজাতি যে কায়স্থোপজাত, অনুসন্ধান করিলে তাহার চিহ্ন ও প্রমাণ দৃষ্ট হইবে, তবে বর্ত্তমানে উহারা এক ভিন্ন জাতিরূপেই দাঁড়াইয়াছে। হাণ্টার সাহেব বোধ হয় বিক্রমপুরাদি ভিন্ন দেশবাসী আমলাদের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন যে, কায়স্থগণ শ্রীহট্টে শুঁড়ি জাতিকে কন্যা প্রদান করেন। হাণ্টার সাহেব প্রকৃত কথা অবগত না হওয়াতেই এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহারা সাউ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহারাও মৌলিকত্বে কায়স্থ বা বৈদ্যই বুঝিতে হইবে,– শৌণ্ডিক নহে।"

তাহাদের সমাজ

শ্রীহট্টে সাহুবণিক জাতির মধ্যে "শ্রীহট্ট", "দক্ষিণাভাগ" ও "উজান", এই তিনটি সমাজ প্রধান। এই তিন সমাজের বিবরণই প্রধানত পূর্ব্বে[৩৬] বিস্তারিত ভাবে বলা গিয়াছে। তাহার পর "তরফ", "বাণিয়াচঙ্গ" ও "দিনারপুর" নামে আরও তিন সমাজ আছে। তদ্ব্যতীত "ইটা", "ভানুগাছ", ও "চৌয়ালিশ" এবং "কুবাজপুর" ও "পুটিজুরী" নামে আরও পাঁচটি সমাজ আছে।

শেষোক্ত পাঁচটির মধ্যে প্রথম তিনটি দক্ষিণভাগ সমাজ হইতেই বহির্গত ও পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। কুবাজপুর সমাজ বাণিয়াচঙ্গ এবং দিনারপুর সমাজ হইতে উৎপন্ন। পুটিজুরী সমাজ তরফ সমাজের খারিজ। ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাবাসী সাহুবণিগ্বর্গ সহ শ্রীহট্টীয় সাহুবণিকদিগের কোনরূপ (বিবাহাদি) সম্পর্ক নাই।

---

৩১. পশ্চিম শ্রীহট্টীয় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কায়স্থাদি সংশ্রব লক্ষিত হইলেও তাঁহারা মূলতঃ বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত।

৩২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে সাহুসংশ্রবিত ঘটনা বিশেষে সাহুসহ বৈদ্য ও কায়স্থ সংমিশ্রণের বৃত্তান্ত বস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিশ্বকোষ মহাভিধানের ২১শ ভাগ ৬৬৬-৬৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৩. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস– বৈশ্যকাণ্ড, প্রথম ভাগ (উপক্রম খণ্ড) ১ম সংস্করণ, ৩৪১ পৃষ্ঠা।

৩৪. "The sylhet shahus claim to rank with. or immediately below kaistos to whom they give their daughters in marriage. Most of the richer Hindoos in sylhet belong to this caste." Dacca blue book. P 284 A note.

৩৫. See the Satistical Accounts of Assam Vol II (Sylhet) p. 40.

৩৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই তিন সমাজই প্রধানতঃ বৈদ্য ও কায়স্থ সংমিশ্রণ ঘটিত ঘটনা বিশেষে পরে উৎপন্ন হয়; শ্রীহট্টীয় অন্য বণিক সম্প্রদায়ই প্রাচীন।

দাস জাতি

আমরা প্রসঙ্গানুরোধে বৈশ্য বণিগ্বিবরণ বর্ণন করিয়াছি। কায়স্থ জাতির অনুষঙ্গেই শ্রীহট্টের আর একটি প্রবল জাতির কথা উত্থাপন করিতে হয়; ইহারা শ্রীহট্টের জনবহুল দাস জাতি। দাস জাতিকে পণ্ডিত মণ্ডলী শাস্ত্রোক্ত মাহিষ্য জাতি বলিয়া প্রমাণিত করায়, এ জিলার ঐ জাতীয় দুই চারিজন মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশই প্রচলিত 'দাস' নামে থাকিতে চাহিয়াছেন।

মাহিষ্য শব্দের অর্থ যাহারা মহীকে বিদারণ করে অর্থাৎ কৃষি বৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য কন্যায় উৎপন্ন পুত্রই মাহিষ্য।[৩৭] মেদিনীপুর, তমলুক প্রভৃতি স্থানের মাহিষ্যগণ খান্দাত নামে প্রসিদ্ধ। খান্দাত শব্দের অর্থ খান্দা বা খড়গধারী। তাঁহারা যে বীরবংশীয়, তাঁহাদের গড়, নায়ক, বাহুবলীন্দ্র, সামন্ত, রণসিংহ ইত্যাদি উপাধি দ্বারা তাহা বুঝা যায়। মাহিষ্য বিবৃতি পাঠে জানা যায় যে, তমলুক রাজবংশ মাহিষ্য জাতীয়। উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরাদি অঞ্চলে ইহারা মাহিষ্য নামে; ফরিদপুরে পরাশরদাস আখ্যায় এবং ঢাকা প্রভৃতিতে হালিকদাস নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে রায়, মজুমদার, লস্কর, মল্লিক, বিশ্বাস প্রভৃতি উপাধি বিদ্যমান।

ভিন্ন স্থানবাসী মাহিষ্যগণসহ শ্রীহট্টের দাসজাতির সম্বন্ধ নাই। শ্রীহট্টের দাস জাতি সাহসী, সহিষ্ণু ও সৎ। পূর্ব্বে তাঁহারাও যুদ্ধজীবী জাতি ছিলেন।[৩৮] শ্রীহট্ট জিলায় ইহাদের মধ্যে চৌধুরী, পুরকায়স্থ, তালুকদার, বিশ্বাস প্রভৃতি উপাধি; ও তদ্ব্যতীত সেনাপতি, হাজারা, লস্কর, তরফদার প্রভৃতি সামরিক উপাধি অনেকের কাছে। এই জাতির জমিদার তালুকদার চাকরিজীবী প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য সকলেরই ব্যবসায় কৃষিকর্ম্ম।

ইহাদের শ্রীহট্টাগমন

শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত "জীবনবৃত্তান্ত" নামক মুদ্রিত পুস্তকে লিখিত আছেঃ- "দাসদিগের এদেশে আগমন সম্বন্ধে একটি প্রবাদ এই যে, মোসলমান রাজত্ব সময়ে নাগা, কুকি, খাসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা শ্রীহট্টবাসী হিন্দু ও মোসলমানদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিত, তখন এদেশ মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীন ছিল।[৩৯] নবাব বন্যজাতিদিগের অত্যাচার নিবারণ, করিতে অক্ষম হইয়া রাঢ়দেশ হইতে দাসজাতীয় বহু সংখ্যক সৈনিক পুরুষ তন্নিবারণার্থে প্রেরণ করেন। সেই সৈন্যের অধ্যক্ষ সেনাপতি ও তন্নিম্নস্থ কর্মচারী লস্কর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সামান্য দাসগণ সেনাশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিল। যে যে স্থানে অসভ্য বর্ব্বর জাতিদিগের অত্যাচার অধিক, সেই সেই স্থানে সেনাপতি, আর যে সকল স্থানে অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অল্প, সেই সকল স্থানে লস্কর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সেনাপতি ও লস্করেরা বন্যজাতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্য্যে সাহায্যার্থ ভারবাহক লোক ও রসদাদি যুদ্ধোপকরণ দিবার নিমিত্ত দেশবাসী হিন্দু ও মোসলমানদিগকে নানা প্রকার কষ্ট দিতেন। দাস যোদ্ধৃগণের প্রতাপে বন্যজাতি সকল পরাভূত ও নিহত হইয়া দেশ যখন সুশাসনাধীন হইল, তখন দাসদিগের আর যুদ্ধকার্য্যে থাকার প্রয়োজন রহিল না। নবাব সেনাপতি ও লস্করদিগকে ভূসম্পত্তি পুরস্কার দিয়া

---

৩৭. "ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্য কন্যায়াং মাহিষ্যস্য চ সম্ভবঃ।" পরশুরাম সংহিতা।

৩৮. 'According to their own account, the Das were originally a war like race of Bengal. The Report on the census of Assam. 1901, p 127.

৩৯. সুনামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এমন অনেক প্রাচীন দাসবংশ আছে, পুরুষ হিসাবে যাহাদের এদেশাগমন মুর্শিদাবাদ স্থাপনের পূর্ব্বেই বলিতে হয়। এস্থলে মুর্শিদাবাদ নামটি সম্ভবতঃ ভ্রমতঃ প্রদত্ত হইতে পারে।

দেশে বাস করিতে আদেশ করিলেন।"

এই প্রবাদ কতদূর সত্যমূলক বলা যায় না। কিন্তু দাস জাতির দৈহিক বল, শ্রমসহিষ্ণুতা ও সাহসাদি তাঁহাদিগকে এক বীরজাতির বংশধর বলিয়াই প্রতিপন্ন করে। শ্রীহট্টে দাস জাতির মধ্য পদস্থ ও ধনবান অনেক আছেন।

নবশায়ক জাতি

অতঃপর শূদ্র বা চতুর্থ বর্ণ মধ্যে নবশায়ক জাতির বিবরণ এস্থলে প্রদেয়; ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা না করিয়া ২/৪টি কথা মাত্র বলা যাইতেছে।

নবশায়ক কাহারা?—

"গোপস্তিলীচ মালীচ তন্ত্রীমোদক বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্ম-কারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

ইহারও আবার মতান্তর আছে। সে সম্বন্ধে এ স্থলে কোনরূপ বিচার না করিয়া ইহাদেরই কথা বলিতেছি।

কামার— বঙ্গে ইহাদের মধ্যে তিন সমাজ দৃষ্ট হয়। এদেশে ইহারা দত্ত, দেব, দাস প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতে দেখা যায়।

কুমার— ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহ কালে, প্রথানুসারে ঘট স্থাপন করা হইলে, তদুপরি শিবের দৃষ্টিপাত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে এক পুরুষের উদ্ভব হয়; রুদ্র অংশে অদ্ভুত হওয়ায় সেই পুরুষ "ঘটরুদ্র" নামে খ্যাত হন। কুম্ভকারগণ ইহারই বংশসম্ভুত বলিয়া প্রকাশ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে "ঘটখর্পর" বলিয়া ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়, এবং ব্যবহারেও কুমারগণ আপনাদিগকে এদেশে "রুদ্রপাল" বলিয়া লিখাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোয়ালা— শ্রীহট্টে অতিশয় অল্প সংখ্যক আছে। ইহাদের ব্যবসায় দধি, দুগ্ধ বিক্রয়। কৃষি ব্যবসায়ও তাহাদের মধ্যে আছে। পশ্চিম বঙ্গে কৃষি ব্যবসায়ীরা পল্লবগোপ ও দুগ্ধাদি বিক্রেতাগণ আহিরীগোপ নামে খ্যাত। পূর্ব্বাঞ্চলে রাজশাহীতে কতক আহিরীর বাস আছে। ব্রজের গোপরাজ নন্দ এবং এই বংশীয় ছিলেন।

তাঁতি— তাঁতিদের মধ্যে বঙ্গের বসাকগণ প্রসিদ্ধ। ইহারা দে, দত্ত, দাস, শীল, গুই ইত্যাদি উপাধিধারী। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁতিগণ বস্ত্রবয়নে বঙ্গের গৌরবের সামগ্রী। শ্রীহট্টে ইহাদের সংখ্যা যৎসামান্য।

তেলী— ইহাদের উৎপত্তির উপাখ্যানটির বড়ই সুন্দর। কথিত আছে, একদা দেবাদিদেব মহাদেবের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ভগবান বিষ্ণু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলে, সেই স্বেদবারি হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইল, প্রজাপতি গঙ্গাদেবীকে স্বীয় কমন্ডলু মধ্যে ধারণ করিয়া, বিষ্ণুদেহ মার্জ্জন করিলে, নারায়ণ-দেহ হইতে একটি তিল বহির্গত হয়। ব্রহ্মা মনোহর পাল নামক মুনিকে সেই তিল রক্ষার ভার দেন; তজ্জন্য তিনি তিলী বা তেলী নামে খ্যাত হন। কথিত আছে যে, তৈলিকগণ সেই পাল-ঋষি বংশীয় বলিয়া পাল নামে খ্যাত। বঙ্গে ইহাদের মধ্যে চারিশ্রেণী আছে, তন্মধ্যে অনেক বড় বড় জমিদার ও প্রতিপত্তিশালী লোক বিদ্যমান। শ্রীহট্টেও ইহাদের মধ্যে সম্পন্নব্যক্তির অভাব নাই।

নাপিত— কথিত আছে, সৃষ্টির আদিতে ভগবতীর ইচ্ছা ক্রমে হাড়োদাস ও ব্রহ্মদাস নামে দুইজন দৈবপুরুষের উদ্ভব হয়, এই দৈবপুরুষদ্বয়ের সন্তানই নরসুন্দর বা নাপিত নামে খ্যাত। বঙ্গে

ইহাদের প্রমাণিক, শীল, রক্ষিত, নরসুন্দর ইত্যাদি খ্যাতি দৃষ্ট হয় এবং প্রধান ও সামাজিক নামে দুইটি শ্রেণী আছে। শ্রীহট্টে তাহারা নাই বা নাউ ও চন্দ্র বা চন্দ্রবৈদ্য নামে পরিচিত।

বারুজী— বারুই জাতি নবশায়ক জাতির অন্তর্গত বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু অনেক জাতি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগকে বৈশ্য বলিয়াই উল্লেখ করেন। তাহারা নিজেও যে তাহা অনুমোদন করেন, শিক্ষিত বারুজী মধ্যে (পশ্চিম বঙ্গে) "বৈশ্য বারুজী সভা" তাহার প্রমাণ। ইহাদের ভদ্র, মিত্র, দত্ত, নন্দী, দেব, রাহা, রক্ষিত ইত্যাদি পদবী থাকায় কেহ কেহ ইহাদের মূল কায়স্থ বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ আছে। শ্রীহট্টের বহু বারুজী কায়স্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ময়রা— ইহাদের মধ্যে দুই বিভাগ; এক বিভাগ হলিফ বা কৃষিজীবী, অপরেরা মিষ্টান্ন প্রস্তত করিয়া থাকে। দাস, নন্দী, কুণ্ড, রায় ইত্যাদি উপাধি ইহাদের মধ্য দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টে ইহাদের সংখ্যা অতি সামান্য।

মালাকার বা মালী— শ্রীহট্টে প্রায় দৃষ্ট হয় না।

এই নবশায়ক ব্যতীত শূদ্র জাতীয় "দেব" গণের উল্লেখ প্রয়োজন। অবস্থার উন্নতিতে ইহারা কায়স্থ সমাজে প্রবিষ্ট হইতে প্রয়াস পায়, তাহাতে কেহবা কৃতকার্য্য হইয়াও থাকে। সিং বা ভাণ্ডারী মধ্যেও এইরূপ আত্মগোপনের যথেষ্ট উদাহরণ আছে।

এস্থলে "দাস-চূণার" এবং "রাজদাস" প্রভৃতির কথা উল্লেখ না করিলে অন্যায় হয়। চূণারকে অনেকে ছুতারের সমজাতীয় মনে করেন, বস্তুতঃ তাহারা ছুতার নহে ও ইহাদের ব্রাহ্মণ পৃথক। কালারায়ের চক, রাঙ্গাউটিয়া এবং লাতু প্রভৃতি স্থানে চূণারগণের বাস আছে। ইহারা কাষ্ঠমিস্ত্রির কাজ করে। লাতুর চূণারগণ চূণের ব্যবসায়ও চালাইয়া থাকে।

"রাজাদাস" জাতীয়গণ ছাতক প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়; পূর্ব্বোক্ত দাসজাতির সহিত ইহাদের কোনরূপ সামাজিক সম্পর্ক নাই।

রাঢ়জাতীয় ব্যক্তিবর্গের আর্থিক অবস্থাদি মন্দ নহে; ইহারা আনারসের চাষ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে কুশিয়ারের চাষ করিত। তাঁহাদের বাড়ীতে কমলার বাগান প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, তাহাতে বাড়ীগুলি সুরম্য উপবনবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। বৈশ্যাবৃত্ত রাঢ়জাতীয় ব্যক্তিবর্গ নামের শেষে দাস উপাধি ব্যবহার করে। ইহাদের মধ্যে ধনহীনের সংখ্যা বিরল। এবং তাহারা প্রায়শঃ ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিরত এবং ন্যায়-পরায়ণ। তাহাদের সাহস ও বীর্য্য প্রশংসনীয়।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে যোগীজাতির অবস্থা অনেকাংশে উন্নত। যোগীজাতির উৎপত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে আগম সংহিতাদিতে অনেক তথ্য লিখিত আছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহাদের জাতীয় নাম যুগী নহে— যোগী। তাহারা যোগী গোরক্ষনাথের সন্তান বলিয়া নামের শেষে "নাথ" শব্দ ব্যবহার করে।

শ্রীহট্টের অপর যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশে) ১ম ভাগের সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে পুনরুক্ত হইল না। এই সমস্ত হিন্দুজাতি এবং মোসলমান জাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশবৃত্তান্ত এবং কাহার কাহারও জীবনবৃত্তান্ত ইতিবৃত্তের এইং অংশে আমরা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম খণ্ড

উত্তর শ্রীহট্ট

ব্রাহ্মণ-বিভাগ

প্রথম অধ্যায়
মধুকর বংশ বর্ণন

উত্তর শ্রীহট্টের নাম তত্ত্ব

শ্রীহট্ট জিলা পাঁচটি সবডিভিশনে বিভক্ত। তন্মধ্যে উত্তর শ্রীহট্ট উপবিভাগে জিলার রাজধানী শ্রীহট্ট সহর অবস্থিত। এই সহর অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে (১ম ও ২য় ভাগে) বলা হইয়াছে যে, তন্ত্রোক্ত শিবের শত নামে "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" ইতি নাম পাওয়া যায়। হাটকেশ্বর শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। দেবীপুরানোক্ত পীঠপূজা প্রকরণে "শ্রীহট্টে হট্টবাসিন্যৈ নমঃ" ইতি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। এই হট্ট বা হাটক শব্দসহ শ্রীহট্ট নামের সম্পর্ক থাকা অসম্ভাবনীয় নহে। ভাটেরার তাম্রফলকে শ্রীহট্টনাথের উল্লেখ আছে, শ্রীহট্টের নাম তত্ত্বে তাহাও বিবেচ্য।

যে স্থান-সংলগ্নে পুণ্যক্ষেত্র গ্রীবাপীঠ ও অদূরে বামজঙ্ঘাপীঠ অবস্থিত, যে স্থানের অনতিদূরেই পুণ্যপ্রদ বরবক্র নদ ও পূত সলিলা মনু ও ক্ষমা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত যে প্রদেশের স্থানে স্থানে দেব কীর্ত্তি ও দেব মাহাত্ম্যের ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে, সে দেশের প্রধান নগরী দেব দেবীর নামেই পরিচিত হওয়া সম্ভব। নগরীর নামে সমগ্র জিলাই শেষে শ্রীহট্ট নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ বিজয়া পত্রিকার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "শ্রীহট্টের নাম একখানি প্রাচীন লিপিতে বড়ই কৌতূহলবহ ভাবে উল্লেখিত আছে। সিংহপুর রাজকন্যা জালন্ধর রাজবধু ঈশ্বরা দেবী শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার অবদান— প্রশস্তির শীর্ষ ভাগে "শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ" এইরূপ একটি শব্দ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। +++ডাক্তাব বুহলার ঐ প্রশস্তির লিপি আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দের বলিয়া মনে করেন।+++ ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ভাস্কর বর্ম্মার শাসনের পূর্ব্বেই "শ্রীহট্ট" নামক একটি দেশ ছিল।"

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাঙ্গ ভাস্করবর্ম্মার রাজধানীতে গমন কালে এই নগরীকে "শিলিচটল" নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ স্বর্গীয় মহালক্ষ্মীর পদাঙ্কিত এই পুণ্যভূমির শ্রীক্ষেত্র আখ্যা অসঙ্গত হয় নাই। নগরের নামে পরে কথাবার্ত্তায়, বিশেষতঃ মোসলমানদের কর্ত্তৃক "শিলহাট" বলিয়া উল্লেখিত হওয়া অসম্ভব নহে। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বকার বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থেও "শিলহট" বলিয়া এই নগরীর উল্লেখ আছে। ইংরেজগণ সাধারণের কথিত এই "শিলহট" শব্দ হইতে নগর ও জিলার "সিলেট" নাম দিয়াছেন। শ্রীহট্ট জিলা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তর শ্রীহট্টই প্রধানতম বিভাগ।

উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশনে (জয়ন্তীয়ার অষ্টাদশ পরগণা ব্যতীত) চল্লিশটি পরগণা আছে। সবডিভিশনের জনসংখ্যাদি এবং পরগণা সমূহের নামাদি প্রথমভাগে বিবৃত হইয়াছে। অধিবাসি বর্গ মধ্যে যাঁহাদের কীর্ত্তিকথা প্রসঙ্গতঃ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হয় নাই, এ স্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ হইবে। আমরা প্রথমতঃ প্রেমাবতার শ্রীমং চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রপিতামহের

পুণ্য কথার সহিত এই তৃতীয় ভাগ আরম্ভ করিলাম।

সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গ

মিথিলাদেশ অনেকগুণে গৌরবান্বিত। যে দেশ রাজর্ষি জনকের নির্বিকল্প সাধনক্ষেত্র, যে দেশে মহর্ষি গৌতম যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছিলেন, যে দেশ গার্গী, সীতা প্রভৃতি সাধ্বিগণের পদরেণুতে পবিত্রীকৃত, সে দেশ অনেক গুণে গৌরবান্বিত। এই মিথিলার সহিত বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধ কম নহে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির কবিতা বঙ্গভাষার এক অমূল্য সম্পত্তি। মিথিলাপতিগণও "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন; এবং তাঁহাদের রাজ্যে বাঙ্গালার লক্ষ্মণাব্দ চলিত। কিন্তু মিথিলার সহিত শ্রীহট্টের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর।

যখন বঙ্গদেশে কান্যকুব্জীর ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটে নাই, তাহার প্রায় নবতি বর্ষ পূর্ব্বে ত্রৈপুর নৃপতি আদি ধর্ম্মপার আহ্বানে শ্রীহট্টে বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর ও পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন তপস্বীর শুভাগমন হয় বলিয়া কথিত আছে। ইহারা এক বৎসর এদেশে অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন, এবং স্ত্রীপুত্রাদিসহ প্রত্যাগমন কালে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম, এই পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ তাঁহাদের উপরোধ-বাধ্য হইয়া এদেশে আসিয়া বাস করেন। এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক বিপ্র নামে খ্যাত।[১]

সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের আগমনের পরেও বহুতর বিপ্র বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কালে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া সাম্প্রদায়িকবৎ সম্মান ভাজন হইয়াছেন।

এই সাম্প্রদায়িক দশ গোত্রীয়ের আগমনের পরেও মিথিলা হইতে কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। কোন কোন বংশের পূর্ব্ব পুরুষ কান্যকুব্জ হইতেও আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পরবর্ত্তীকালে রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমি হইতেও কেহ কেহ শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন; ও কেহ কেহ যে সাম্প্রদায়িক সমাজে গা-ঢাকা দিবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য বা অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই তাহার উদাহরণ। শ্রীমন্মধুকর মিশ্র[২] বংশের একশাখা সাম্প্রদায়িক শ্রেণীতে অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ঢাকা দক্ষিণের অপর শাখা মিশ্র বংশ বলিয়াই সম্মানিত।

বরগঙ্গা আদিদেব

উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বুরুঙ্গা পরগণা। এই পরগণায় ঘৃত কৌশিক গোত্রীয় পাশ্চাত্যবৈদিক বিপ্রবর্গের আদি বাস; সেই আদি বসতিকারক তদ্বংশে আদিদেব নামে খ্যাত। আদিদেব মিথিলাগত শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের কিঞ্চিৎ পরেই কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন বলিয়া তদ্বংশীয়গণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি তীর্থ পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন এবং চন্দ্রনাথ দর্শনান্তর পত্নীর সহিত "কামরূপ গমন" মানসে[৩] বরবক্র পার হইয়া এক বৃক্ষতলে শ্রান্তিদূর করে উপবেশন করেন। পথশ্রমে তিনি অত্যন্ত কাতর ও ক্লান্ত

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২. প্রেমবিলাসে লিখিত আছে যে, বিশুদ্ধ মিশ্র নামে এক মহাত্মা ছিলেন,-

"তার পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহট্টে কৈল ধাম।"

৩. কামাখ্যা পীঠ খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে প্রকাশিত হন, কিন্তু স্থান মাহাত্ম্য পূর্ব্বাবধি পাবজ্ঞাত ছিল; প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে এই তীর্থ প্রসঙ্গ আছে।

হইয়াছিলেন, এবং অপরিচিত বিদেশে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেহের অবসন্নতায় তাঁহার মনে হইয়াছিল, তিনি ততদূরে যাইতে সমর্থ হইবেন না। পক্ষান্তরে বহুদূরে ভাগীরথী রহিয়াছেন, যদি শেষদিন সমুপস্থিত হয়, গঙ্গাদর্শনও ঘটিবে না। এইরূপ চিন্তায় আদিদেব ক্লিষ্ট হইলে মা কামাখ্য আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিপন্ন সন্তানের প্রতি করুণা হইল, করুণাময়ী তৎপ্রতি সেই স্থানে অবস্থানেরই প্রত্যাদেশ করিলেন; সেই স্থানে গঙ্গাদর্শনেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বর দিলেন।

তাহাই হইল, দেবীর বরে ভাবুক ভক্তের নেত্রপথে গঙ্গার রূপপ্রভা প্রতিভাত হইল— বরবক্র— নীরে তাঁহার গঙ্গা দর্শন ঘটিল! তদবধিই এইস্থান বরগঙ্গা ইতি খ্যাতি লাভ করে। বরগঙ্গা নামের অন্য একটি কারণও আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

এই আদিদেবের ষষ্ঠ পুরুষে হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার এই সুলক্ষণা কন্যা ছিল, উহার নাম চণ্ডীদেবী। বৎস গোত্রজ পাশ্চাত্য বৈদিক মধুকর মিশ্রের সহিত এই চণ্ডীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল।

মধুকর মিশ্র

মধুকর মিশ্র কে ছিলেন? মধুকর মিশ্রকে কেহ কেহ কান্যকুব্জাগত বলিয়া লিখিয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি পূর্বোক্ত পঞ্চ গোত্রীয়ের একতম বৎস গোত্রীয় আনন্দের সন্তান আবার আমাদিগকে কেহ লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, মধুকর মিথিলাগত এবং তিনি বিদ্যাপতির সময়ে আগমন করেন।[৪] এই ত্রিবিধ উক্তির মূলে কোন প্রবল প্রমাণই প্রদর্শিত হয় নাই। কেহ কেহ মধুকর মিশ্রকে যাতপুরাগত দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু মধুকর বংশীয়গণ একবাক্য আপনাদিগকে পাশ্চাত্য বৈদিক বলেন।[৫] ফলতঃ মধুকর মিশ্র সচরাচর মিথিলাগত বলিয়াই পরিকথিত হন।

মধুকরের বরগঙ্গা বাস

যখন বৎস গোত্রীয় মধুকরমিশ্র তীর্থ পর্য্যটনোপলক্ষে নানাস্থান ভ্রমণান্তর বরবক্র-তীরে বরগঙ্গায় উপস্থিত হন, কথিত আছে তৎকালে তিনি বাতব্যাধিতে পীড়িত হইয়া কিছুদিন এস্থানে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তত্রত্য অধিবাসী হিরণ্যগর্ভের চণ্ডী নাম্নী কন্যা অবিবাহিতা

৪. বুরুঙ্গার বামরত্ন ভট্টাচার্য কৃত "শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী" মতে তিনি কান্যকুব্জাগত। বৈদিককুলমঞ্জুরীও কুলপঞ্জিকামতে তদীয় নবম পুরুষ উর্ধ্বে রমানাথ জাত হন, তিনি কান্যকুব্জবাসী ছিলেন। মধুকর রমানাথের বংশ জাত বলিয়া কনোজ ব্রাহ্মণ হইতেছেন। মধুকর মিশ্রের বুরুঙ্গা প্রভৃতি স্থানবাসী পরবর্ত্তিগণ স্বগুণে সাম্প্রদায়িক শ্রেণী ভুক্ত হন, তদৃষ্টে বোধ হয় ইটাবাসী কেহ কেহ ইহাদিগকে মিথিলাগত আনন্দের সন্তান বলিয়া আমাদিগকে লিখিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ বঙ্গীয় কুলগ্রন্থাদি দৃষ্টি করিলেন উপেন্দ্র পিতা মধুকরকে আনন্দ-সন্তান বলা যায় না। মধুকর বিদ্যাপতির সময়েও এদেশে আসেন নাই, তিনি বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক, সমসাময়িক নহেন। সচরাচর তিনি মিথিলাগত বলিয়া উক্ত হইলেও নিশ্চিত বলা যাইতে পারে না যে তিনি কোথা হইতে আসিয়াছিলেন।

৫. মধুকর মিশ্র পাশ্চাত্য না দাক্ষিণাত্য? মধুকর পাশ্চাত্য কি দাক্ষিণাত্য বৈদিক, তদ্বিষয়ে যখন কোন আন্দোলন আলোচনা ছিলনা, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীহট্টাগমনের প্রমাণ সংগ্রহ কল্পে বৃত হইয়া আমরা একখানা হস্তলিখিত "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী" গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। তাহাতে মধুকর মিশ্রকে দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া লিখিত ছিল। ইহার প্রতিলিপি আমরা শ্রীহট্টের উকীল শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দাস মহাশয়কে ও দ্বিতীয় প্রতিলিপি প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে দিয়াছিলাম।

ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ গৃহাগত মধুকর মিশ্রকে তাঁহার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া সেই অনিকেত পুরুষের সহিত স্বদুহিতার বিবাহ দিলেন, মধুকর গৃহবাসী হইলেন।

আদিদেবের সময় হইতে তদ্বংশীয়গণ গঙ্গার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। চণ্ডী সুবোধ মেয়ে, গঙ্গার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহার ভক্তির গাঢ়তায়,– উপসনার তন্ময়তায় লোক বিস্মিত হইয়া যাইত, এ বিষয়ে একটা সুন্দর কাহিনী আছে।

কথিত আছে, চণ্ডীর আরাধনায় গঙ্গা পরিতুষ্টা হন, তখন তৎপ্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তাঁহারা স্ত্রী-স্বামীতে পশ্চাদৃষ্টি ব্যতিরেকে শঙ্খধ্বনি সহকারে বরচক্রতীরে প্রভাতে যতদূর অগ্রসর হইবেন, ততদূর পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইবে।

পরদিন প্রত্যুষে শুদ্ধচিত্তে স্বামীসহকারে শঙ্খধ্বনি করিয়া চণ্ডীদেবী বরবক্রাভিমুখে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিলেন। হঠাৎ চঞ্চল প্রবাহের কুলুধ্বনি না শুনিয়া চণ্ডীদেবী পশ্চাতে চাহিবামাত্র স্রোত স্বাভাবিকরূপে দক্ষিণাভিমুখ হইল;– বরবক্র "চর" দিয়া সরিয়া যাইতেছিল, চণ্ডীর দৃষ্টিপাতে তাহা স্থগিত হইল, দৈবতঃ তাঁহাদের অধিক ভূপ্রাপ্তি ঘটিল না। চণ্ডীদেবী গঙ্গার বরপ্রভাবে স্রোতঃপরিত্যক্ত ভূমি প্রাপ্ত হওযায়, ঐ ভূখণ্ড বরগঙ্গা নামে খ্যাত হয়।[৬] বরগঙ্গা নাম প্রাপ্তির আখ্যায়িকাদ্বয় সূচিত করিতেছে যে, আদিদেবের সময় হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে বরবক্রের গতি পরিবর্তিত হইতে থাকে, এবং এই সময়েই তাহা সুসম্পন্ন হয়। ফলতঃ বরবক্রের পরিত্যক্ত সেই ভূভাগই বরগঙ্গা নামে খ্যাতি লাভ করে। পরে চণ্ডীদেবীকে তদীয় পিতা কর্তৃক সেই ভূমিই প্রদত্ত হইয়াছিল। মধুকর পত্নীসহ বরগঙ্গাবাসী ।[৭] নদীর মধ্যে মধ্যে আবর্ত্তময় গভীর স্থানকে এদেশে "ডহর" বলা হয়। কথিত আছে তত্রত্য একটি ডহরেই

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য বাবু "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী" প্রকাশ করেন। আমাদের প্রেরিত পুঁথি ব্যতীত তিনি অন্য একখানা পুঁথিও পাইয়াছিলেন, তাঁহার অবলম্বিত সেই পুঁথিতে "পাশ্চাত্য" পাঠ থাকাতে তিনি আমাদের প্রেরিত পুঁথির "দাক্ষিণাত্য" পাঠ পাদটিকায় দেন। নগেন্দ্র বাবুও তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" এই দ্বিমতের উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত প্রাচীন কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে মধুকর মিশ্রকে স্পষ্টতঃ যাজপুরাগত বলা হইযাছে। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ২য় ভাগ ৩য় অংশের ১৯৬/১৯৭ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বক গ্রন্থকার এই দ্বিমতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লিখিয়াছেন, "জগন্নাথ মিশ্রের বহু পূর্ব্বেই যে বঙ্গে দাক্ষিণাত্য সংশ্রব ঘটিয়াছিল, পাশ্চাত্য বৈদিগ কুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, পাঁচ শত বর্ষেরও পূর্ব্বে এ দেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস ছিল।" "পুনঃ" গঙ্গা বংশীয় রাজাদিগের সময়ে বহু ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া যাজপুরে বাস করেন। "শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরবাসী, সুতরাং তাঁহারা উত্তর শ্রেণী বা পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের অন্তর্গতি হইতেছেন। গঙ্গাবংশীয় রাজ কর্তৃক কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন বাবদ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে যশোধরাদির ন্যায় তাঁহারাও পাশ্চাত্য বৈদিক হইতেছেন। আবার উৎকল বা দক্ষিণ দেশ হইতে শ্রীহট্টে আগমন প্রযুক্ত তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এই কারণেই মহাপ্রভুর জীবনী তাহার পূর্ব্ব পুরুষকে কেহ "পাশ্চাত্য বৈদিক" কেহবা "দাক্ষিণাত্য বৈদিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ উভয়সমাজে কোন সময়ে সম্বন্ধ স্থাপন হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে।"

গ্রন্থকার বহু আনুষঙ্গিক উদাহরণ যোগে এই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে এ বংশীয়গণকে সকলেই পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া জানে।

৬. "আসী শ্রীহট্ট মধ্যস্থে মিশ্রোমধুকরাভিধঃ।
পাশ্চাত্যে বৈদিকবিপ্রের তপস্বী বিজিতন্দ্রিয়ঃ॥
বরেণাপ্তেব তেনেহ কিয়দ্ভূমিঃ করোৎকর।
বরগঙ্গেত্যপোদেশঃ সুজন্যেঃ পরিগীনত্যো॥" –শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।

৭. "ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বড়গঙ্গা গ্রামে।
বিয়া করি মধু মিশ্র রৈল সেই গ্রামে॥"– প্রেমবিসাল গ্রন্থ।

চণ্ডীদেবী প্রথমে গঙ্গার দর্শন বা কৃপা নিদর্শন ও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। এবং সেই জন্য তাহা "চণ্ডীডহর" নামেই খ্যাত আছে। চণ্ডীডহরের পশ্চিম "চণ্ডীপুর" গ্রাম হিরণ্যগর্ভ এই গ্রাম কন্যাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদেবী চণ্ডীপুরে অবস্থিতি না করিয়া স্বামীর সহিত নিজ বুরুঙ্গাতেই বসতি করেন।

বংশ বিস্তার

কাল সহকারে চণ্ডীর গর্ভে মধুকরের চারিপুত্রের জন্ম হয়।[৮] ইহাদের নাম কীর্ত্তিদ, রঙ্গদ, উপেন্দ্র ও কৃত্তিবাস[৯] এই চারি পুত্রের জন্মের পর চণ্ডী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হন, কিন্তু সেবার মনুষ্য শিশুর পরিবর্ত্তে একটি সর্পশিশু জাত হয়। ধার্ম্মিকা জননী ইহাকে ফেলিয়া না দিয়া দুগ্ধ দানে প্রতিপালন করিতেন।

মধুকর মিশ্রের পুত্রগণ যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের বিবাহাদি দিয়া সাংসারিক সমস্ত ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করতঃ ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত হইলেন। কথিত আছে যে এই সময় একদা কীর্ত্তিদ-পত্নী শাশুড়ীর আজ্ঞায় সর্পকে দুগ্ধ দিতে গিয়া তৎপ্রতি অত্যাচার করায় ফণী ক্রুদ্ধ হইয়া বনে চলিয়া যান, এই ঘটনার পর মধুকর মিশ্র ও চণ্ডীদেবী কাশীধামে গমন করেন।[১০]

১. কীর্ত্তিদ মিশ্রের পুত্রের নাম দিবাকর। কথিত আছে যে ফণীশাপে এই বংশীয়গণ সকলেই মূর্খ ও নির্দ্ধন হয়। এই বংশীয়গণ বুরুঙ্গায় চক্রবর্ত্তী বংশ বলিয়া খ্যাত। একটি বিধবার আখ্যান ব্যতীত এ বংশের কোন কীর্ত্তি কথা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

২. রঙ্গদ মিশ্রের পুত্রের নাম প্রভাকর। এ বংশীয়গণ ভট্টাচার্য্য আখ্যাধারী। এ বংশের অনেকেই জ্ঞানগৌরবে গৌরবিত ও সাধন প্রভাবে মহীয়ান ছিলেন। ইঁহারা বুরুঙ্গা, রেঙ্গা ও ইন্দ্রেশ্বর বাসী।

---

৮. শ্রীমন্মধুকব মিশ্রের বংশাবলী তালিকা ক, খ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৯. শ্রীচৈতন্য চবিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থের ও প্রাচীন বংশ তালিকা মতে উপেন্দ্র মিশ্রের ও তৎ পিতার নাম আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্রই জগন্নাথ মিশ্র কিন্তু অন্যান্য লেখকগণ ইহাদের নাম বিভিন্ন রূপে লিখিয়াছেন। বৈদিক কুলমঞ্জুরী ও কুল পঞ্জিকা মতে উপেন্দ্র মিশ্রের পিতার নাম মধুকর স্থলে যদুনাথ লিখিত হইয়াছে, তাঁহার দশম পুরুষ উর্দ্ধে কনোজা রমানাথের পুত্র শ্রীমানকে ইহাব পূর্ব্বপুরুষ বলা গিয়াছে' কিন্তু গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ মতে উপেন্দ্র নামেব স্থলে বমাপতি ও তৎপিতা মধুকরের নাম শিবরাম বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত শ্রীমান বংশ্য না বলিয়া, শ্রীমানেব ভ্রাতা জিতামিশ্রেব বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে!! আবার কবি জয়ানন্দের মতে উপেন্দ্র মিশ্রেব নাম জনার্দ্দন ও তৎপিতা মধুকর ধনঞ্জয় হইয়া গিয়াছেন!!! এরূপ বৈষম্যের কারণ কি? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সম্বন্ধেই যখন এরূপ, তখন বঙ্গেব সামাজিক ইতিহাসে সত্য প্রকটন কিরূপ দুরূহ যে, মধুকর মিশ্রইহাই বোধ হয় যে, মধুকর মিশ্র শ্রীহট্টে নবাগত; স্থানান্তরে তাঁহার অন্য নাম থাকা অসম্ভব নহে এবং শ্রীহট্টে তিনি মধুকর নামেই পরিচিত হন। পক্ষান্তরে অন্যান্য কুলগ্রন্থ রচয়িতাদেব ভ্রম হওয়াও বিচিত্র নহে; ভ্রম না হইলে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে বিভিন্ন নাম থাকা অসম্ভব হইত। জয়ানন্দের ভ্রম স্পষ্টতঃ দেখা যায়। তিনি উপেন্দ্র নামই উল্লেখ করেন নাই। এস্থলে উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র, ও গৌরপার্ষদ মুরারি গুপ্তের মত এবং প্রেমবিলাসাদি অন্যান্য প্রমাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থের বিবরণ গ্রহণ করাই সঙ্গত। বংশ তালিকায়ও তাহার সহিত ঐক্য হয়। পরবর্ত্তী ৩য় অধ্যায়ে উপেন্দ্র মিশ্রের বংশ কথা দ্রষ্টব্য।

১০. "তবে মধুকর মিশ্র চণ্ডিকা সহিতে।
পুত্রগণে রাজ্য দিয়া গেলেন কাশীতে॥" —শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী।

৩. উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র কংসারি প্রভৃতি। এই বংশীয়গণ ঢাকা দক্ষিণ বাসী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপেন্দ্র-তনয় জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশীয়ের উপাধি মিশ্র।

৪. কৃত্তিবাস মিশ্রের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। এ বংশীয়গণ চৌধুরী খ্যাতি বিশিষ্ট ও বুরুঙ্গাবাসী; কেহ কেহ গোস্বামী উপাধিও ধারণ করেন। এ বংশীয়গণ পূর্ব্বাবধিই বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এ বংশ অতি বিস্তৃত।[১১] পরবর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে আমরা এসব বংশকথা বর্ণন করিব।

১১. এই বিস্তৃত বংশে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত ১৭/১৮ পুরুষ চলিতেছে। দিগ্দর্শন জন্য নিম্নে একটি ধারার মাত্র নামাবলী লিখিত হইল। যথা কৃত্তিবাসের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র, তৎপুত্র কৃষ্ণ চন্দ্র রায়, তাঁহার পুত্র মাধব চন্দ্র, তৎপুত্র মাণিক্য চন্দ্র, তদীয় পুত্র যদুনন্দন ও রাজেন্দ্র।
তন্মধ্যে যদু নন্দনের পুত্র সানন্দ রায়, তৎপুত্র বলরাম রায়, তাঁহার পুত্র শ্রীরাম রায়, তৎপুত্র রামকৃষ্ণ, তৎপুত্র শ্রীরাম, তৎপুত্র রমাকৃষ্ণ, তৎপুত্র রামরুদ্র, তৎপুত্র উমেশ চন্দ্র, তৎপুত্র, রমাবল্লভ, তৎপুত্র বত্ন বল্লভ, তৎপুত্র জয়চন্দ্র, তৎপুত্র পার্ব্বতী চরণ রায়।
পূর্ব্বোক্ত মাণিক্যচন্দ্রের ২য় পুত্র রাজেন্দ্র রায়েব পুত্রের নাম গৌরী কান্ত রায়, তৎপুত্র রূপ রায় ও ত্রিলোক রায়। ত্রিলোক রায়ের পুত্র কাশীরায়, তৎপুত্র কৃষ্ণ রায়, "রায়ের" পরবর্ত্তি "গোস্বামী" উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁহাব পুত্র জয় কৃষ্ণ গোস্বামী, তৎপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ গোস্বামী, তৎপুত্র প্রাণকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি। বোধ হয় গুরুতর অনুরোধেই ইহারা গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রঙ্গদ বংশ বর্ণন

পরগণা- বুরুঙ্গা

শ্রীমন্মধুকর মিশ্রের ২য় পুত্র রঙ্গদ মিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামহের অগ্রজ; তদ্বংশ বর্ণনের পূর্ব্বে আমরা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের পবিত্র নাম স্মরণ করিতেছি। শ্রীমদুপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে বাস করিতেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহারই পুত্ররূপে ধরা পবিত্র করেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদীয় পিতামহীর অত্যন্ত অভিলাষ ছিল; সেই সূত্রে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন।[১]

রামার কথা

শ্রীমহাপ্রভু পিতামহী সম্মিলনে চলিয়াছেন। পথেই বুরুঙ্গ; এই স্থানে তাঁহার পিতামহ জন্মগ্রহণ করেন, এই স্থান তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের দ্বারা অধ্যুষিত। তিনি বুরুঙ্গায় উপস্থিত হইয়া কাহারও বাড়ীতে প্রথমে গমন করেন নাই। একটি শীতল ছায়া বিশিষ্ট অশ্বত্থ তলায় উপবেশ করিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছিলেন।

বসন্তকাল— প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হইয়াছেন; শীতের নীহারদগ্ধ পাদপরাজি বাসন্তিক বায়ু হিল্লোলে যেন প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে,— নবীন কিসলয়ে লতাবিতান সজ্জিত হইয়াছেন— স্তবকে স্তবকে কুসুম গুচ্ছ ঝুলিয়া রহিয়াছে। সে এক গ্রাম্য পুষ্করিণীর প্রান্তবর্তী বৃক্ষবাটিকা। সেই বনাচ্ছন্ন ভূমে দুই একটি গাভী চরিতেছিল, দুই একটি দৈয়ল তরুশাখে বসিয়া সঙ্গীত ঝঙ্করে মধুবর্ষণ করিতেছিল, এমনই সময় শ্রীমহাপ্রভু সেই অশ্বত্থ তলায় উপবেশন পূর্বক শ্রান্তি দূর করিতেছিল। তাহার আগমনে সেই অশ্বত্থ তলায় কি এক বিমল লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল, যমুনা-সৈকতে নীপমূলে যখন শ্যামসুন্দরের শ্যাম লাবণ্য-লীলা প্রকটিত হইত, বুঝিবা এমনই সুন্দর দেখাইত!

মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অশ্বত্থের শীতল ছায়াতলে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। তদীয় অঙ্গের গৌরকান্তিতে অশ্বত্থ-তল হাসিতেছে, শুভ্র শ্রী স্বরূপ ধরিয়া যেন অশ্বত্থ তলায় বিমল লাবণ্যের লীলা-লহরী বিস্তার করিতেছে। প্রখর সুতীব্র রৌদ্র, কিন্তু সে স্থানে যেন চন্দ্রকরোজ্জল স্নিগ্ধতা। জ্বালাময় রৌদ্র-তাপ-প্রতাপে প্রাণীমাত্রই যখন পরিতাপিত হইতেছে, প্রভু দেখিতে পাইলেন যে, তখন একটি কৃষক সন্নিকটে চাষ করিতেছে। "জীবে দয়া" যাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রথম সূত্র, তিনি নিরীহ গো-জাতির প্রতি ঈদৃশ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন— "কৃষক! তোমার নাম কি?"

১. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুইবার শ্রীহট্টে আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; একবার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণোপলক্ষে। তখন শ্রীহট্টের বুরুঙ্গা পর্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই উত্তরাংশে উপসংহারাধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর সন্ন্যাসান্তে তিনি পিতামহী সম্মিলনে পুনর্ব্বার বুরুঙ্গা হইয়া ঢাকাদক্ষিণে গমন করেন।

কৃষক উত্তর দিল— "রামদাস।"

প্রভু বলিলেন— "ভাই রামদাস! বেলা দ্বিপ্রহর প্রায়, প্রখর রৌদ্র, এখন হালের গরু দুটি ছাড়িয়া দাও।"

কৃষক কহিল— "আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আজ আমকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেই হইবে। রৌদ্রে ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া অকর্ম্মণ্য হইতেছে।"

মহাপ্রভু তখন সখেদে বলিয়া উঠিলেন—

"হরি! হরি! একি সর্ব্বনাশ!

ক্ষেত্র নষ্ট হৈবে বলি কর ধর্ম্মনাশ!!

শ্রীমহাপ্রভু আর কিছু বলিলেন না, বলিতে পারিলেন না, তাঁহার অরবিন্দ ক্ষেত্র বাষ্প পূরিত হইল, দেখিতে দেখিতে বাষ্প ধারাকারে পরিণত হইয়া প্রধাবিত হইল। অজ্ঞ কৃষক এরূপ অদ্ভূত চিত্র জন্মাবধি দেখে নাই, সে এদৃশ্যে আশ্চর্য্যান্বিত ও বুদ্ধিহারা হইয়া গেল।

এ নামের গুণ না ভাগবতী শক্তির অখণ্ড প্রভাব?— শ্রীমহাপ্রভুর মুখোচ্চারিত হরিধ্বনি শুনিয়া হালের গরু দুটি উর্দ্ধপুচ্ছে ধ্বনি করিতে লাগিল! যেন অব্যক্ত স্বরে হরি বলিয়া উঠিল![২] এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বিলোকনে রামা চাষা ভীত হইয়া থরহরি কাঁপিতে লাগিল ও দৌড়িয়া গিয়া শ্রীচৈতন্যের পদপ্রান্তে পতিত হইল।

রামার কি সৌভাগ্য, রামা সে রাতুল চরণে স্থান পাইল। শ্রীমহাপ্রভু রামাকে হরিনাম উপদেশ দিয়া উদ্ধার করিলেন। রামাকে বলিলেন— "রামা! এই তরু-মূলে তুমি বেদিকা প্রস্তুত করিয়া নিত্য হরি-আরাধনা করিও, হরিনাম গ্রহণ করিও। অশ্বত্থ তলা পবিত্র স্থান।"

রামা তাহাই করিল; ও সে সেই স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হইয়া গেলে। তাহার বিনয় ভক্তিতে কত লোক আকৃষ্ট হইয়া তথায় আসিত এবং তাঁহারাও তদীয় প্রভাবে— তাঁহার অনুষঙ্গে— পবিত্র জীবন লাভ করিত। এই ঘটনায় বুরুঙ্গায় শ্রীমহাপ্রভুর একটি নূতন নাম হইল,— রামদয়াল।"[৩]

কুটম্ব সম্মিলন

এই ঘটনার পর শ্রীচৈতন্যদেব সহ গৌরীকান্তের মিলন হয়। গৌরীকান্ত মধুকর মিশ্রের প্রপৌত্র— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রাতৃ সম্পর্কীয়; তিনি পুষ্পচয়নে বহির্গত হইয়া পুষ্প সংগ্রহ

২. "মধ্যাহ্ন তন্মুখাচ্ছাত্মা গাবশ্বক্রুর্হরিধ্বনিম।"– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি সুপ্রচারিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে ভাব বিশেষে পশুপক্ষী ইতর প্রাণীব আকৃষ্ট হওয়ার ভূরি উদাহরণ থাকিলেও (আলোচনার অভাবে) অধুনা তাহা অলৌকিক বলিয়া গণ্য। যা' হউক, যে কাহিনী সুপ্রচারিত, অলৌকিক হইলেও তাহা পরিত্যাগ না করিয়া উল্লেখ করিয়া যাওয়াই আমাদের পক্ষে সঙ্গত; বিশ্বাস করা না করা অভিরুচি সাপেক্ষ্য।
এস্থলে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, সন্ন্যাসের পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশাগমন সংবাদ "উদায়বলী" ব্যতীত অপর গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ঠিক এই সময় কেবল শ্রীহট্টে নহে, ঠিক এমনই ভাবে শ্রীমহাপ্রভু যশোড়ায় গিয়া ভক্ত প্রবর জগদীশ পণ্ডিত সহ সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন, সে সংবাদও "জগদীশ চরিত্র বিজয়" নামক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে নাই। এদ্ব্যতীত এই সময়েই কামরূপেও না কি শ্রীমহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন। হাজো নামক এক স্থানে এখনও "চৈতন্য গোফা" (গুহা) প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অতএব এই সময় তিনি একাধিক স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

৩. "তদবধি সেই স্থানে রামদয়াল খ্যাতি।
সেইরূপ জনরব আছিয়ে সম্প্রতি॥"– শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী।

সমাপনে গৃহে যাইতেছিলেন। তিনি রামা হইতে সেই আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণে সে স্থানে উপস্থিত হন ও তরুমূলে সেই মহিমময় মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন। তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এ নবীন উদাসীন কে? শ্রীচৈতন্যের অমানুষ রূপে তিনি যে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন; জগৎ যেন তাঁহার কাছে সুষমাময় বোধ হইল, তাঁহার চিত্ত যেন নির্ম্মল হইয়া গেল, আর তাঁহার মস্তক আপনা হইতেই তদীয় চরণে বিনত হইয়া পড়িল। তখনও তিনি চিনেন নাই যে এ নবীন উদাসীন কে?

"এ কি? সর্ব্বনাশ! আপনে বয়োজ্যেষ্ঠ,– শুদ্ধ সত্ত্ব কলেবর, আপনে প্রণাম করিবেন না।" শ্রীমহাপ্রভুর একথা শুনিয়া গৌরীকান্ত বলিলেন– "না, আপনি অন্যায় করি নাই।"

"অপরূপ তবরূপ বিশ্ব-রূপ হবে।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অন্তরে বাহিরে।"
শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী।

"আমি কিছু অন্যায় করি নাই, আপনে সামান্য সন্ন্যাসী নহেন, আপনার জন-মনোহারি পবিত্র বপুঃ দর্শনে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আপনে মহাপুরুষ, কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছেন।" গৌরিকান্তের কথা শুনিয়া বিনীত সন্ন্যাসী মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

শ্রীগর্ভ মিশ্র কথা

রঙ্গদ মিশ্রের পুত্রের নাম প্রভাকর, তৎপুত্র মহেন্দ্র মিশ্রের শ্রীকর, ইন্দ্রকর, ও দুর্গাবর নামে তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে শ্রীকরের পুত্রের নাম শ্রীগর্ভ। জ্ঞাতি সম্পর্কে এই বালক শ্রীমহাপ্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র। যখন শ্রীচৈতন্য দেব স্বীয় ভ্রাতৃসম্পর্কিত গৌরীকান্তের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তখন দৈবক্রমে বালক শ্রীগর্ভ তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গের সর্ব্বচিত্তাকর্ষী রূপমাধুরীতে বালক শ্রীগর্ভকে অভিভূত করিল। পৌঢ় গৌরীকান্ত আর বালক শ্রীগর্ভ, উভয়েরই একদশা; এই অপরিচিত উদাসীনকে ছাড়িয়া একপদ সরিতে তাঁহাদের চরণ যেন চাহে না; ইঁহারা উভয়েই বাধা পড়িলেন।

সেই স্থানে গৌরিকান্ত শ্রীমহাপ্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।[৪] গৌরীকান্ত ও শ্রীগর্ভ অতঃপর তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদের বাক্য রাখিলেন; তিনি প্রপিতামহ গৃহে গমন করিয়া কুটুম্বগণকে আনন্দিত করিলেন।

গৌরিহরি বুরুঙ্গায় তখন তিন ভাগ্যবানকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, এই তিন মহাত্মা হইতে সেই দেশ উদ্ধারের পন্থা পরিষ্কৃত হয়; তাঁহাদের প্রভাবে নিত্য বহুলোক অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইত।[৫] যে স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর গৌরীকান্তসহ উপবেশন করিয়াছিলেন, তন্নির্দ্দেশ স্মরণার্থ সেই স্থানে একটি বেদিকা বিনির্ম্মিত হয়। চৈত্র মাসে প্রতি রবিবারে তথায় একটি মেলা হইয়া থাকে এবং সে স্থান "শ্রীচৈতন্যের বাড়ী" নামে খ্যাত ও কথিত হয়। লোকে এই স্থান মাহাত্ম্যযুক্ত ও পবিত্র জ্ঞান করে এবং আজিও তথায় শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে বলিয়া বিশ্বাস করে।

---

৪. গৌরীকান্তের নাম বংশ তালিকাতে নাই। শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী গ্রন্থ মতে ইনি শ্রীমহাপ্রভুর জ্ঞাতি ভ্রাতা ও তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। গুরুবৎ আচাব ব্যবহার গ্রহণে তিনি যদি

৫. "প্রভু কৃপা বলে তাব হইল দৈবত্ব।
মানসিক সেবা দেয় নিত্য নিত্য॥"
শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী।

শ্রীচৈতন্যের চণ্ডীদান

বুরুঙ্গায় কুটুম্ববর্গের প্রীতি বিধান পূর্ব্বক যখন শ্রীমহাপ্রভু তথা হইতে প্রভাতে পিতামহের গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তৎকালে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। বিধবা যুক্ত করে বলিতে লাগিলেন— "হে মিশ্রকুল প্রদীপ আশ্রমত্যাগী হইলেও দীন কুটুম্বকে আপনি ত্যাগ করেন না; অবগত হইয়াছি যে আপনি অনাথ শরণ, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনার অন্যতম পিতামহ কীর্ত্তিদ মিশ্রের পত্নী, দেবর ফণিবরের প্রতি অযথা অত্যাচার করায় দৈব্যদোষে ফণিশাপে তদ্বংশ মূর্খ অভাগিনীর সেই বংশের বধূ, অভাগিনীর একটি পুত্র— সে মূর্খ। আমার মূর্খ পুত্রের জীবনোপায় নির্দ্ধারণ করুন, এই প্রার্থনা। আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে।"

বিধবার এই অপকট ব্যবহারে শ্রীমহাপ্রভু বিগলিত হইলেন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ একখানা "চণ্ডী" দিয়া বলিলেন— "এই লও একখানা চণ্ডী। ইহার প্রসাদাৎ তোমার পুত্র ধন ও যশোলাভে খ্যাতিমান হইবে, চণ্ডী যশোদাত্রী।"[৬] ইহার পরই শ্রীমহাপ্রভু, ঢাকা দক্ষিণ গমন করেন।

শ্রীগর্ভ শ্রীমহাপ্রভুর করুণালাভে পরমভাগবত রূপে গণ্য ও ভক্তির অধিকারী হন, বলা বাহুল্য। জ্ঞান ও ভক্তিচিন্তামণির অধিকারী শ্রীগর্ভ অচিরেই "চিন্তামণি" উপাধিতে ভূষিত হন।

রাঘব বিদ্যানিধির বিবরণ

শ্রীগর্ভ চিন্তামণির পুত্রের নাম রাঘব। অধ্যয়নের পর রাঘব, অধ্যাপক হইতে বিদ্যানিধি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে আসিলে সকলে তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শ্রীহট্ট ইহার পূর্ব্বাবধিই মোসলমানাধীন হইয়াছিল, শ্রীহট্টের শাসনকর্তৃগণ তখন আমিল নামে খ্যাত ছিলেন। আমিলদের প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। আমিলগণ সচরাচর নবাব নামে কথিত হইতেন। রাঘব দেশের সেই নবাব সহ পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীহট্টে গমন করিলেন।

তৎকালে নবাব দরবারে হিন্দু ও মোসলমান মৌলবী প্রভৃতি বিদ্বান লোক প্রায়শঃ উপস্থিত থাকিতেন, নবাব সভায় উপস্থিত বিদ্যানিধির বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যে স্বয়ং নবাব ও সভাসদ্বর্গ তুষ্ঠ হইলেন। নবাব তাঁহাকে বহু পরিমাণ ভূমি ব্রহ্মত্র স্বরূপ দিতে চাহিলেন; কিন্তু সম্পত্তি শাসনে জ্ঞানানুশীলনের বাধা জন্মে বলিয়া রাঘব তৎসমস্ত অঙ্গীকার না করিয়া বুরুঙ্গা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম মাত্র গ্রহণে তৎকালের ব্রাহ্মণবর্গ যে কীদৃশ নির্লোভ ছিলেন, তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন।[৭]

৬. এই চণ্ডী শ্রীমহাপ্রভু কোথায় পাইলেন? চণ্ডী কি সঙ্গে ছিল? "যিনি মুকুন্দের" প্রেমে গৃহের বাহির হন, যিনি সন্ন্যাসী হইয়াও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্থাপক, যিনি সর্ব্বদা ভাবোন্মত্ত থাকিতেন, তিনি যে একখানা চণ্ডী গ্রন্থ সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন বা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এমন নহে, কথিত আছে যে, এই চণ্ডী তিনি তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে তৎক্ষণাৎ ইহা লিখিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের চণ্ডীদান কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না, আবার গ্রন্থান্তরে শ্রীমহাপ্রভুর প্রথমাগমনকালে বুরুঙ্গায় শ্রীমদ্ভাগবত দানের কথা পাওয়া যায়, সে কথার প্রতিধ্বনি উহা কি বা বলা যায় না।

৭. অমাবস্যায় চন্দ্রোদয়: রাঘবের এই ব্রহ্মত্র প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ এক অলৌকিক ঘটনা শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে; কথিত আছে যে নবাব সভায় কথা প্রসঙ্গে সেদিন কোন তিথি, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে "অদ্য পৌণমাসী" বলিয়া হঠাৎ রাঘব উত্তর দেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেদিন অমাবস্যা তিথি ছিল এবং রাঘব ভ্রমতঃ পূর্ণিমা বলিয়া ফেলেন। নবাগত পণ্ডিতের এতাদৃশ উত্তরে সভায় হাস্য তরঙ্গ উত্থিত হয়, কিন্তু বিদ্যানিধি ইহতে উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং সগর্ব্বে বলেন—"অদ্য নিশ্চয়ই চন্দ্রোদয় হইবে।" ব্রাহ্মণের এই অসম্ভব দাম্ভিকতায় নবাব বিরক্ত হইলেন এবং চন্দ্রোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিলেন।

রাঘবের মৃত্যুর পর তাঁহার তনয়দ্বয়[৮] মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল; তাহাতে কনিষ্ঠ মহেশ্বর বিশারদ[৯] রেঙ্গায় গমন করেন, তদ্বংশীয়গণ তথায় আছেন।

রাঘবের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাদাস চুড়ামণি। চুড়ামনির একমাত্র পুত্র হরিহর তর্কপঞ্চানন একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। একদা তাঁহাকে বিষধর সর্প দংশন করে, মরণ আসন্ন মনে করিয়া তিনি ইষ্টনাম জপ করিতে থাকেন ও চিত্তের একাগ্রতায়-নামগ্রহণবেশে তিনি অপূর্ব্ব দশা লাভ করেন। কথিত আছে যে সর্প-বিষ তাঁহার শোণিতে বিষক্রিয়া সম্পাদন করিতে না পারাতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও এরূপ এক দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীগৌরানুচর গরুড় পণ্ডিত এইরূপ হরিনাম করিয়াই আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।[১০]

যাঁহার প্রভাবে মানব মর হইয়াও অমরত্ব লাভে সমর্থ, যে মহিমাময় হরিনাম সাধককে নামীর সান্নিধ্যদানে সক্ষম, কালভয়বারণ সেই হরিনামের ফল কেবল মৃত্যুবরণেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না; এ সকল নামের আনুষঙ্গিক ফল, মুখ্য ফল নহে। এ সকল ঘটনা মনের একাগ্রতা বা তজ্জনিত শারীরিক কোন ক্রিয়া বিশেষের ফল বলিয়া মনে করাই যদি সঙ্গত বোধ হয়—আপত্তি নাই, এবং ইহাতে সাধারণের নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাসাধিক্যেরই সম্ভাবনা।

হরিহরের একমাত্র পুত্রের নাম রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কার, ইনি স্বীয় কবিত্বগুণে বিখ্যাত হইয়াছিলেন,[১১] কিন্তু তদীয় কোন কাব্যগ্রন্থের সংবাদ আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। গঙ্গারাম শিরোমণি ইহারই পুত্র।

ব্রাহ্মণ ভক্তিযোগে সিদ্ধ ছিলেন। অতর্কিত ভাবে এইরূপে বিপদে পড়িয়া তিনি ভাবিত হইলেন। ইহার শেষফল কি? হত্যা অথবা জাতি পাত! ব্রাহ্মণ ইহা বুঝিলেন, বুঝিয়া চিন্তান্বিত চিত্তে চিন্তামণির শরণ হইলেনঃ–

"মৌনী হইয়া মানসে স্মরয়ে ভগবান,
কলঙ্ক সমুদ্র হৈতে কর পরিত্রাণ॥"-শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী।

দিবা অবসান হইল, সেই সিদ্ধমহাপুরুষের কাতর ক্রন্দনে "কলঙ্কভঞ্জন" কর্ণপাত করিলেন; অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তির আবির্ভাব ঘটিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আবরিত হইতে না হইতে উষা বিকাশের ন্যায় পূর্ব্বাকাশে এক খণ্ড শুভ্র জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইল,–ঠিক যেন চন্দ্রোদয়!

সভাসদ্বর্গ স্তম্ভিত ও চমকিত হইল. নবাব বিচলিত হইলেন ও পণ্ডিত সকলে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। তিনি পণ্ডিতের সম্মানের জন্য বহুধন ও ভুসম্পত্তি দিতে চাহিলেন। রাঘব তত্তাবৎ গ্রহণ না করিয়া বুরুঙ্গা ও তৎপার্শ্ববর্তী কয়েক খানা গ্রাম মাত্র গ্রহণ করিলেন।

অমাবস্যায় চন্দ্রোদয়!-এই অদ্ভুত ও অসম্ভব বৃত্তান্ত যে এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম, ইহার কারণ যে. এই বৃত্তান্তটি উল্লেখে এ জিলায় বহুতর বংশীয় গণই স্বীয় কোন এক পূর্ব্বপুরুষের গৌরব খ্যাপন করিয়াছেন। যদি সত্যই এরূপ একটা অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়াই থাকে, তবে বহুস্থানে বহু বংশেই এমনটা ঘটিয়াছিল. তাহা বলা যায় না। ইহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা লইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে লোকে টানাটানি করে। এই কথার উদাহবণ জন্যে এই এক ঘটনাই স্থানান্তরে উল্লেখ মাত্র করিয়া পাঠকের স্মৃতিপথারূঢ় করিব। এই ঘটনা নিম্বাদিত্যের আখ্যানটিই প্রথমে স্মরণ করিয়া দেয়।

৮. বংশ তালিকা-ক পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৯. পরবর্তী ৪র্থ অধ্যায়ে ইহার অধোবংশ্য কথা বর্ণিত হইবে।
তদ্ব্যতীত জানা যায় যে বুরুঙ্গা হইতে মধুকর বংশ্য বসন্তরায় নামক এক ব্যক্তি লংলার পূর্ব্ব পাহাড়ে গিয়া আধিপত্য করেন. তাঁহাব নামে "বসন্ত ছড়া" "বসন্তের পথ" প্রভৃতি তথায় রহিয়াছে। কিন্তু বুরুঙ্গার বংশ তালিকায় বসন্ত রায়ের নাম পাওয়া যায় না।

১০. "গরুড় পণ্ডিত লয়েন শ্রীনাথ মঙ্গল।
নাম বলে বিষ যারে না করিল বল॥"–শ্রীচৈতন্যচরিতাকৃত।

গঙ্গারামের পুঠিয়া জয়

সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গারাম দেশে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন মানসে দ্রাবিড় দেশে গমন করেন ও যতীর আচার অবলম্বনে সাত বৎসর তথায় অবস্থিতি করিয়া অধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক কাশীতে উপস্থিত হন। কাশী চিরদিন বিদ্বান্ ব্যক্তির আদর করিয়াছে; গঙ্গারাম আদৃত না হইবেন কেন? অনেক দণ্ডী, অনেক পণ্ডিত, নূতন বিদ্যা-বিলাসীর নাম শুনিয়া আসিলেন; কিন্তু হায়, তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিতে আসিয়া স্বয়ংই হতগর্ব্ব হইতে লাগিলেন।[১২] শ্রীহট্টবাসী গঙ্গারাম কাশীবিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন।

কাশী বিজয়ান্তে গঙ্গারাম সগৌরবে দেশে প্রত্যাগমন কালে পুঠিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পুঠিয়া-রাজের মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল এবং কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গ রাজমাতার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিলেন। গঙ্গারাম বিদেশী ছাত্র, ঐ শ্রাদ্ধে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই, এই জন্য তিনি কাশীর এক পণ্ডিত বন্ধুর সহ ছদ্মবেশে পুঠিয়াতে আসিবেন।

সেই পণ্ডিত সভায় নানা শাস্ত্রের বাদবিতণ্ডা হইতেছিল। গঙ্গারাম মলিনবেশে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া শুনিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে কোন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া তাঁহার অসহ্যবোধ হইল; তিনি সতেজে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তখন সকলেরই সচকিত-দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল; সেই দীনবেশী তখন সংস্কৃত ভাষা অবজ্ঞায় সহিত বলিলেন—"মহাত্মগণ, ভয় নাই, আমি মনুষ্য।" তারপর তিনি অপূর্ব্ব বাগ্বিন্যাস প্রকটিত করিয়া, শাস্ত্র-সাগর মন্থন পূর্ব্বক অদ্ভুত প্রতিভাবলে মধুময়ী সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা পণ্ডিত মণ্ডলীকে স্তম্ভিত ও তাঁহাদের বাক্যে দোষ প্রদর্শন করিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রত্যুত্তরের আর অবসর রহিল না; তখন তিনি সুললিত বাক্য পরম্পরায় সুমীমাংসা করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন।

পরদিন পণ্ডিতবর্গ পুনঃ একত্র সমবেত হইলেন; কিন্তু গঙ্গারামের সম্মুখে সবারই প্রতিভা মলিন হইয়া গেল! তৃতীয় দিনও পণ্ডিতবর্গের জেদ বজায় থাকিল না! তৃতীয় দিনে জয়লাভ করিলে, সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী অকপটে গঙ্গারামের জয়ধ্বনি দ্বারা সভা মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শিরোমণি সভাজয় করিয়া "সবস্ত্র বিদায়" প্রাপ্ত হইলেন।[১৩] শ্রীহট্টের গঙ্গারাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রাদ্ধ অবসানে পুঠিয়ারাজ গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিলেন, নিজ সভায় সভাপণ্ডিতরূপে রাখিতে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। গঙ্গারাম রাজানুরোধ ত্যাগ করিতে না পারিয়া কিছুকাল পুঠিয়া রাজধানীতে অবস্থিতি করিলেন। এই সময়ে তিনি যোগানুষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট সময় নিভৃতে অবস্থিতি করিতেন, কাজেই রাজসমীপে থাকিতে ইচ্ছা না থাকায়; দেশে আসিবার অভিপ্রায় করিলেন ও দেশে চলিলেন। তিনি নৌকাযোগে আসিয়াছিলেন। বাড়ীতে আসিযা যখন পৌছলেন, তাঁহার

১১. "তস্য পুত্র ন্যায়ালঙ্কার রঘুনাথ কবি।
কবি মণ্ডলীতে যথা গ্রহ মধ্যে রবি॥"—শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী।

১২. "কাশীবাসী দণ্ডী ঋষি বেদবিদ্ যত।
সমূহ হইল সর্ব্ব শাস্ত্রে পরাভূত॥"-শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী।

১৩. "কত শত পণ্ডিত সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞানী।
পরাজিত হৈয়া গেল পরাজয় মানি॥
বস্ত্রের সহিত সেই মুদ্রা সমুদয়।
প্রাপ্ত হন শিরোমণি সভা করিয়া জয়॥" —শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী।

ভ্রাতৃবর্গ এবং আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক তিনি পরম আদরে গৃহীত হইলেন।[১৪]

গঙ্গারাম গৃহে আসিয়া বহির্ব্বাটিকায় এক টোল সংস্থাপন করেন, এই টোলে নানা স্থানের ছাত্রবর্গ আসিয়া অধ্যয়ন করিত।

শ্রীহট্টের নবাব নজীবআলী খাঁ বাহাদুর শিরোমণিকে তদীয় গুণের পুরস্কার স্বরূপ বুরুঙ্গা, রেঙ্গা, ইন্দেশ্বর, ইটা ও আগনা হইতে ৩ জলুসে ১৫।২।০ ভূমি ব্রহ্মত্র দান করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে এই ভূমি দানের সনন্দ (নং '৮৩) আছে। ঐ ভূমি ১১৯৬ সালে তৎপুত্র গঙ্গাগোবিন্দের "তছরূপে" ছিল বলিয়া মন্তব্যে লিখিত আছে।[১৫] কি হিন্দু, কি মোসলমান, যাঁহারা স্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই নবাব সরকার হইতে পুরস্কৃত হইতেন; গুণী না হইলে কেহই ভূদান প্রাপ্ত হইতে না।

শিরোমণির তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দ পরম পণ্ডিত ছিলেন, কনিষ্ঠ গৃহত্যাগী হন, মধ্যম

---

১৪. ধীবরের গল্প শ্রীচৈতন্য রত্নাবলীতে গঙ্গা রামের প্রসঙ্গে কয়েকটি অদ্ভুত উপাখ্যান উল্লেখ আছে, তাহা বংশ বৃত্তান্তে সংযোজন যোগ্য না হইলেও উপাখ্যানাংশে মন্দ নহে। যখন তিনি নৌকাযোগে আসিতেছিলেন, হবিগঞ্জের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে দেখিলেন যে এক ধীবর মাথায় মৎস্যের ঝাঁকা লইয়া যাইতেছে। পণ্ডিতের অভিপ্রায় মত নাবিক মৎস্যের প্রকার জিজ্ঞাসিলে ধীবর অবজ্ঞা সহকারে উত্তর করিল যে ইহা চিতল কাতল, ব্রাহ্মণের ক্রয়যোগ্য "ইচা বৈচা" নহে। এই সময় উছট খাইয়া ধীবর ভূপতিত হইল, মৎস্যও মাথা হইতে পড়িয়া গেল; বিস্মিত ধীবর ও তৎপত্নী চাহিয়া দেখে যে মাছ-গুলি "ইচা বৈচা" অর্থাৎ ক্ষুদ্র মৎস্য পরিণত হইয়া গিয়াছে! এ অলৌকিক ব্যাপার দৃষ্টে তথায় বহুলোক একত্রিত হইয়া ইহা নৌকারোহীর যোগবলের ফল বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিল। তাহারা তখন নৌকার অনুসরণে চলিল, কিন্তু নৌকা তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে!

প্রত্যক্ষ প্রদর্শন ইন্দেশ্বর পরগণাস্থ আনন্দকিশোর ভদ্র, শিরোমণির পিতৃশিষ্য ছিলেন। একবার তিনি মহাষ্টমীতে আদ্যাশক্তির অর্চ্চনার অভিপ্রায়ে শিরোমণির নিকট পত্র দেন, কিন্তু শিরোমণি এ পত্রের কথা ভুলিয়া যান। তখন ও বর্ষাজলে, খাল বিল জলপূর্ণ–নৌকা ব্যতীত চলিবার ক্ষমতা নাই। সেই মেঘাচ্ছন্ন অষ্টমীদিনে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ তাঁহার নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ হইল; এখন উপায়? তবে কি পূজা পণ্ড হইবে? শিরোমণির তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিল না, উন্মত্তবৎ তিনি ইন্দেশ্বর যাত্রা করিলেন ও মধ্যরাত্রে পিতৃশিষ্যের গৃহে পৌছিলেন। সকলেই বিস্ময় সহকারে মনে করিল যে সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া বিনা নৌকায় বুরুঙ্গা হইতে তিনি কোন অলৌকিক শক্তির বলেই সে জল প্লাবিত পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি অনতি বিলম্বে দেশসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া অল্পকাল মধ্যেই পূজা সমাধা করিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইলেন, রীতিমত পূজা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। শিরোমণি ইহা বুঝিতে পারিলেন ও আনন্দ ভক্ত-মহিমা প্রকাশের জন্য ভক্তবৎসলার অঘটন ঘটান কিছু আশ্চর্য্য নহে; দেবলীলা তো আর মানবীয় কার্য্য নহে, অলৌকিকত্বই ইহার আদি অন্তও মধ্য। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এমন ঘটনা ঘটিবে, কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার মন "কষা" (বিরক্ত) কেন? আনন্দ কিশোর তখন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন–"প্রভো! পুষ্পদুর্ব্বাদি যথা স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে, আপনি গৃহে প্রবেশ করিয়া অমনি আসিলেন, পূজা হইল কৈ?"

তখন আরক্তনেত্রে "প্রত্যক্ষদেখ" বলিয়া শিরোমণি কুশাঘাতে দেবীর চরণ বিদীর্ণ করিলেন, আর প্রতিমাদেহ হইতে রক্ত স্রোতঃ বহিল!! আনন্দ কিশোর হায় হায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিরোমণি তাহার গৃহে আর তিষ্টিলেন না, "অবিশ্বাসিন্! অদ্যাবধি আমাদের ত্যজ্য হইলি" বলিয়া চলিয়া আসিলেন। সেই রাত্রেই আনন্দকিশোরের গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল–অচির কাল মধ্যেই তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যু হইল, গৃহ শ্মশান হইল! তাহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। কারণ অলৌকিক দেবলীলা কোনরূপ নিয়মে শৃঙ্খলিত নহে।

অমাবস্যায় চন্দ্র প্রদর্শনের ন্যায় এই ঘটনাও শ্রীহট্টের বহুপরিবারে কীর্ত্তিপ্রকাশ কল্পে ঘোষিত হইয়া থাকে। এক একটি প্রধান ঘটনাকে যে অনেকেই স্বায়ত্ত করিতে যত্ন করিয়া থাকেন, এসকল ঘটনা তাহার প্রমাণ। এই ঘটনাটিও একাধিক স্থলে উল্লেখ করিব বলিয়া এস্থলে বর্ণন করিলাম।

১৫ "তছরূপ" অর্থে আত্মসাৎ বা দখল। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্ববর্ত্তীয় ভূমি যিনি পাইতেন, "তছরূপকার" স্থলে তাঁহার নাম সনদের মন্তব্যে লিখিত হইত।

রামরুদ্র তর্কালঙ্কারই "শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী" রচয়িতা রামরত্ন ভট্টার্য্যের পিতা। গ্রন্থকার বাহুল্যের সহিত পিতৃমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার পিতার—"সর্ব্বস্থুল কলেবর, শ্যামঙ্গ সুমনোহর। শমধর সুনিন্দিত হাস্য" ছিল।

রামরুদ্রের গুণ-গৌরব

তিনি লিখিয়াছেন যে একদা স্বগ্রামস্থ শিব প্রসাদ রায় নামক ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের বহু পণ্ডিত-সমাগম ঘটে। সভাস্থলে শাস্ত্রালোচনা হইতেছে, এমন সময় রামরুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন ও কথা প্রসঙ্গে একটু হাস্য করিলেন। সভায় তাঁহার সম্মান দর্শনে কাশীশ্বর তর্কবাগীশ নামক জনৈক পণ্ডিত ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে এই ছল পাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে! আমি তোমার পিতৃতুল্য, আমার সম্মুখে তোমার হাস্যকরা কি সুশিষ্ট ব্যবহার?" তর্কালঙ্কার যুক্ত করে দোষ স্বীকার করতঃ ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে ক্রুদ্ধ পণ্ডিতবর রক্ত বমন করিয়া মুর্চ্ছাগ্রস্থ হইলেন। ইহা দৈব, না রামরুদ্রের প্রভাবসঞ্জাত ঘটনা, অথবা কাকতালীয় ন্যায়, তাহা নির্দ্ধারণ কঠিন।

বাজু সোনাইতা বাসী রামগোবিন্দ ভৌমিক ইহাদের কৌলিক শিষ্য। তত্রত্য কাশীনাথ ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা যে রামগোবিন্দকে শিষ্য করেন। রামগোবিন্দ কিন্তু কৌলিক গুরুত্যাগে সম্মত ছিলেন না। ব্রহ্মচারী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রৌষধি বলে তাঁহাকে পাগল করিয়া দেন। তর্কালঙ্কার এই সংবাদ পাইয়া শিষ্যালয়ে যাত্রা করেন। পথে দৈববশতঃ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইলে শ্লেষভাবে তিনি বলিলেন—"ভাল ব্রহ্মচারিন্! ভাল ব্রহ্মবিদ্যাই প্রকাশ করিয়াছ।" এতৎ শ্রবণে ব্রহ্মচারী কোপে জ্বলিয়া উঠিলেন ও ভূমে পড়িয়া তৃণগুচ্ছ মুখে দিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার সে দিকে দৃকপাত না করিয়া শিষ্যগৃহে উপনীত হইলেন ও বিবিধ প্রক্রিয়া এবং ঔষধ বলে শিষ্যকে আরোগ্য করিলেন।

এদিকে সেই ব্রহ্মচারী প্রকৃতই পাগলবৎ তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কাশীনাথের আত্মীয় স্বজন এতদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া তর্কালঙ্কারের শরণাপন্ন হইলে, ইহাকেও তিনি বিবিধ প্রক্রিয়াতে সুস্থ করিলেন। জীব হিংসন মহাপাপ, ইহাতে অর্জ্জিত জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে এবং শিক্ষিত বিদ্যার হানি হয় ও নিজেরই মন্দ হইয়া থাকে; ব্রহ্মচারী এই উপদেশ দিয়া তিনি বিদায় দিলেন।

এখন বিবেচ্য-ব্রহ্মচারীর উন্মত্ততা তাঁহার, চিত্তবিকৃতি, না শিরোমণির মন্ত্র-শক্তি-সঞ্জাত? ইহা যে মন্ত্রশক্তির প্রভাব নহে, তাহা তাঁহার উপদেশ বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। যিনি পরহিংসা নিন্দনীয় বলিয়া উপদেশ দেন, তাঁহার তাহাতে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নহে।

শ্রীমন্মধুকর মিশ্রের প্রপৌত্র শ্রীকরের সন্তানই বুরুঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ।[১৬] তাঁহার ২য় ও ৩য় প্রপৌত্র ইন্দ্রকর ও দুর্গাবরের বংশীয়গণ বুরুঙ্গাতেই চক্রবর্ত্তী আখ্যাধারণে বাস করিতেছেন।[১৭] ফলতঃ হিংসকের দণ্ডবিধান ভগবানই করিয়া থাকেন।

---

১৬. ক পরিশিষ্টে বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

১৭. এই দুই ভ্রাতার বংশাবলী অতি বিস্তৃত বিধায় পরিশিষ্টে কেবল এক একটি ধারা মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়
উপেন্দ্র বংশ বর্ণন

পরগণা-ঢাকাদক্ষিণ

"শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিতধনী সদগুণ প্রধান॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

উপেন্দ্রমিশ্র কথা

শ্রীমন্মধুকর মিশ্রের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রমিশ্র বুরুঙ্গা হইতে আপন স্ত্রী শোভা দেবীর সহিত ঢাকাদক্ষিণ গমন করেন। উপেন্দ্র মিশ্র ধর্ম্ম-নিষ্ট পুরুষ ছিলেন। সাংসারিকতায় লিপ্ত থাকিতে চাহিতেন না, তাঁহার পত্নীও তদনুরূপা ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তানাদি হয় নাই।

শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ স্থিত কৈলাস শৈলে বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিব ও অমৃতকুণ্ড তীর্থের মহিমা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন।[১] এক সময়ে পতিপত্নীতে তদ্দর্শনে গমন পূর্ব্বক তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সেই স্থানে[২] থাকিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন।[৩] ইহাদের চরিত্র গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী জনগণ ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহাদের সহায়তা করিত। তাহাতে তাঁহাদের আর নির্জ্জনবাস ঘটিয়া উঠিল না এবং তাঁহার উন্মত্ত, তাঁহাদের ভাগ্যে অনেক সময় তাহা দুষ্প্রাপ্য হয়, পক্ষান্তরে—

"যেনা বাঞ্ছে তার হয়, বিধাতা বিহিত।"

উপেন্দ্র মিশ্র বনবাসী হইতে গিয়া ধনী হইয়া উঠিলেন। ধনের সঙ্গে জন,—এইস্থানে তাঁহার সাত পুত্রের জন্ম হয়; তন্মধ্যে কংসারি জ্যেষ্ঠ, তৎপর পরমানন্দ, বং তাহার পর জগন্নাথ মিশ্রের উদ্ভব।

কংসারির কালক্রমে এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম প্রদ্যুম্নমিশ্র; ইহার কথা ৪র্থ ভাগে বর্ণিত হইবে। "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী" নামক সংস্কৃতগ্রন্থ ইঁহারই কৃত।

---

১. "বৃদ্ধ গোপেশ্বর স্তত্র দক্ষিণস্যান্দিশি স্থিতঃ।
শিবগঙ্গা সমীপেচ বাঞ্ছাতার্থপ্রদায়কঃ॥" -শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।

২. এই পুণ্যস্থানের সীমা মনঃ সন্তোষণী গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছেঃ-
"পূর্ব্বে কুশিয়ারা নদী পশ্চিমে কৈলাস।
দক্ষিণেতে বৃদ্ধ গোপেশ্বরের নিবাস॥
উত্তরে কাকিনী নদী এই চতুষ্কোণ।
শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে গুপ্ত বৃন্দাবন॥
অদ্যকালে শ্রীঢাকাদক্ষিণ দেশখ্যাতি।
মিশ্রবংশান্বিত প্রভু যাহাতে বসতি॥"-মনঃসন্তোষণী।

৩. "তত্রস্থিত্বা স বিপ্রর্ষি স্তপস্তেপে নিরাকুলঃ।
শোভয়া ভার্য্যয়াযুক্তোপ্যাশ্চর্য্য গুণ যুক্তয়া॥" -শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।

পরমানন্দের বংশীয়গণ হইতেই ঢাকাদক্ষিণের মিশ্রবংশের বিস্তৃতি।

জগন্নাথ মিশ্র অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি পিতা কর্ত্তৃক বিদ্যাশিক্ষার্থ নবদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

রত্নগর্ভ প্রসঙ্গ

এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীহট্টবাসী অনেকেই বাস করিতেন, কেহবা বিদ্যার জন্য, কেহবা গঙ্গাবাস হেতু। এই সকল নবদ্বীপ প্রবাসী ব্যক্তিদের মধ্যে রত্নগর্ভ আচার্য্য প্রধান।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছেঃ—

> "রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম।
> প্রভুর পিতা সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥
> তিন পুত্র তার কৃষ্ণ-পদ-মকরন্দ
> কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র॥

ঢাকাদক্ষিণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থান, পণ্ডিতবর্গের বহু টোল ঢাকাদক্ষিণের গৌরব বৃদ্ধি করিত;[৪] রত্নগর্ভের বংশীয়গণ এথাকারই অধিবাসী; তাঁহারা বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবাগত জগন্নাথ মিশ্র সহ রত্নগর্ভের বিশেষ সদ্ভাব ছিল এবং উভয়েই নবদ্বীপের এক স্থানেই বাস করিতেছিলেন।

রত্নগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন, নবদ্বীপে তাঁহার ভাগবতের টোল ছিল। অনেক ছাত্রকে তথায় তিনি ভাগবত শিক্ষা দিতেন। তিনি অধ্যাপনা উপলক্ষে নবদ্বীপবাসী হইয়া থাকিলেও ঢাকাদক্ষিণেই তাঁহার মূল বাড়ী ছিল, তাঁহার বংশীয়গণ ঢাকাদক্ষিণেই ছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা রত্নগর্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণানন্দের নামে বংশপরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন; প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল, উক্ত "কৃষ্ণানন্দ ভট্টের গোষ্ঠী" লোপ পাইয়াছে।[৫] তাঁহার দৌহিত্র, বংশীয়গণ এখনও তত্রত্য রায়গড় গ্রামে বাস করিতেছেন। পঞ্চখণ্ডস্থ মিশ্রবংশীয় প্রখ্যাতনামা বিষ্ণু মিশ্রের পুত্র স্বর্গীয় রামলোচন মিশ্র ঐ বংশে বিবাহ করেন, পরে শ্বশুর বংশ লোপ হইলে সস্ত্রীক তথায় গমন করেন ও তত্রত্য অধিবাসী রূপে গণ্য হন।

কৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা কবি ছিলেন, পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ইঁহার বহুতর সুললিত পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। যদুনাথ কবিচন্দ্র নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন; যথাঃ—

> "মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
> যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যনন্দ॥"-শ্রীচৈতন্যচারিতামৃত।

---

৪. ঢাকাদক্ষিণ তৎকালে যে এক পণ্ডিত প্রধান স্থান ছিল, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ) ২য় ভাগ ২ খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ৫ম অধ্যায়ে ঢাকাদক্ষিণের নামতত্ত্ব কথিত হইবে।

৫. এস্থলে একটি বিলুপ্ত বৈদ্য বংশের কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করিতে হইতেছে। উক্ত বাৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের গুপ্ত খ্যাতি বিশিষ্ট এক ঘর যজমান ছিলেন। উক্ত যজমানদের শেষ বংশধর ধনরামের বিধবা পত্নী, পুরোহিতবর্গের শেষ বংশধর রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্যকে তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।
এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান ঠাকুরবাড়ীর পূর্ব্বদিকে মিশ্র বংশীয় বর্গের যজমান আর একটি বিলুপ্ত বৈদ্যবংশের কথা শুনা যায়। কাহারও কাহারও মতে এই গুপ্ত বংশেই মুরারি গুপ্তের উদ্ভব।
মুরারি গুপ্তের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রত্নগর্ভের প্রসঙ্গে মূল বিষয় হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িলেও আর একটা বিষয় আমাদিগকে এস্থলেই বলিতে হইতেছে।

নীলাম্বরের প্রসঙ্গ

পরগণা তরফের অন্তর্গত জয়পুর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। পূর্ব্বে ইহা উদ্যান-অট্টালিকা শোভিত এক সুরম্য নগরী ছিল; প্রতি ব্রাহ্মণ গৃহেই শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনির সহিত দেবার্চ্চনা হইত। একদিকে সুরসিক নাগরিক তথায় যেরূপ নৃত্যামোদে রত রহিত, অন্যদিকে তেমনি পণ্ডিত সদনে ছাত্রবর্গও পাঠ্য পরিচয় প্রদান করিত।[৬] কিন্তু জয়পুরের এ সুদিন বহুদিন রহিল না, এক দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশ ছারখার হইল, তাহাতে—

"নানা দেশে সব লোক মরে গেল পলাইয়া।'

যজুর্ব্বেদী রথীতর গোত্রীয় শম্ভুদাস পণ্ডিতের পুত্র নীলাম্বর জয়পুরবাসী ছিলেন, একথা পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সকল সম্বন্ধ গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। নীলাম্বর মিশ্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও বৈভব যথেষ্ট ছিল।[৭] পূর্ব্বোক্ত দুঃসময়ে তিনি সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িয়া নবদ্বীপবাসী হন,[৮] তৎকালে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিঃ শাস্ত্রে অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে ইহা জানিতে পারা যায়। কিঞ্চিদূন পাঁচশত বৎসর হইতে চলিল, যখন নীলাম্বর দেশত্যাগ করেন, তখন তাঁহার পুত্রকন্যাদি মধ্যে কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র ও দুই কন্যার নাম অবগত হওয়া যায়, কন্যাগণ মধ্যে শচীদেবী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা, জয়পুরেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম বিশ্বেশ্বর,[৯] ইহার নামান্তর যোগেশ্বর; অপর পুত্র রত্নগর্ভ ইনি বিষ্ণুদাস নামে খ্যাত ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম লোকনাথ ছিল। এবং ইহার কন্যাকে গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ বিবাহ করিয়াছিলেন।[১০]

নীলাম্বর নবদ্বীপে গিয়া তত্রত্য বেলপুখুরিয়া নামক পল্লীতে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন।

---

৬. "নাটশাল পাঠশাল চৌখণ্ডী বাঙ্গালী।
ধ্বজ কলহংস পারাবত করে কেলি॥"—কবি জয়ানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

৭. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-ব্রাহ্মণ কাণ্ড ৩য় অংশ ৯১ পৃষ্ঠা।

৮. "নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িয়া উৎপাতে॥"
"গঙ্গাস্নান করিব বসিব নবদ্বীপ।
বৈকুণ্ঠ নিবাস আর কি বা জপতপ॥
দিব্য দোলা চড়ি মিশ্র সবান্ধবে আসি।
গঙ্গা নবদ্বীপে দেখে প্রেমানন্দে ভাসি॥" —জয়ানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।
এই মিশ্র জগন্নাথ, উপেন্দ্র-তনয় জগন্নাথ পুরন্দর নহেন. ইনি নীলাম্বরের খুল্লত শ্রীমহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইহার নপ্তী-পতি ছিলেন।

৯. ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার এই দুই নামই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথাঃ-
ক. "বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী চৈতন্যের মামা।"—বৈষ্ণবাচার দর্পণ গ্রন্থ।
খ. "প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত, দ্বিতীয় শচী হয়।"- প্রেমবিলাস গ্রন্থ।

১০. বিষ্ণু দাসের বংশ সুবিস্তৃত। ইহার প্রপিতামহ মাধব মিশ্রের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ শম্ভু দাস, কনিষ্ঠ জগন্নাথ, শম্ভুদাসের পুত্র নীলাম্বর। ইহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শচী, ইহার পুত্র বিশ্বেশ্বর ও বিষ্ণুদাস। বিষ্ণুদাসের দ্বিতীয় পুত্রের নাম গোপাল দাস, গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি রাজীবলোচন, ইহার মধ্যম পুত্রের নাম রাম গোবিন্দ, তৎপুত্র কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, ইহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম কৃষ্ণ রাম ন্যায় পঞ্চানন, তৎপুত্র চন্দ্রশের বাচস্পতি, তৎপুত্র রতিকান্ত, তৎপুত্র গোপীনাথ, তাঁহার পুত্র তারিণী চরণ, বিষ্ণুদাস হইতে ১০ম স্থানীয় হইতেছেন।

কিছুদিন পরে তিনি শচীর বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় শ্রীহট্টবাসী জগন্নাথমিশ্র নামক এক যুবকের গুণের কথা তাঁহার শ্রুতিগত হয়।

জগন্নাথ পুরন্দরের কথা

বলিয়াছি যে জগন্নাথমিশ্র স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপে প্রেরিত হন। জগন্নাথ প্রতিভাশালী সুন্দর যুবক, তাঁহার চরিত্র-গৌরবে নবদ্বীপের তাবৎ লোক মোহিত হইয়াছিল, অল্পকাল মধ্যেই জগন্নাথ বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎকালে নবদ্বীপ বিদ্যাগৌরবে ও নানাদেশীয় পণ্ডিত সমাগমে বঙ্গ-বিখ্যাত ছিল, সেই নবদ্বীপে জগন্নাথ খ্যাতি লাভ করিলে, অধ্যাপক তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "পুরন্দন" পদবি প্রদান করেন। উপাধি প্রাপ্তির পর জগন্নাথের যশ বিশেষ বিস্তৃত হয়, ইহকেই যোগ্যপাত্র বোধ করিয়া, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বৈদিক-কুলভূষণ ঐ পুরন্দরের করে শচীকে সমর্পণ করিলেন। জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপের মায়াপুর নামক পল্লীতে অন্যান্য শ্রীহট্টবাসী বন্ধুবর্গের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ঐ পল্লীতে শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিত ও মুরারি গুপ্ত এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী ব্যক্তিগণ ছিলেন;[১১] নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বজয়াকে এই আচার্য্যরত্নের করে পরে সমর্পণ করেন।

জগন্নাথ মিশ্রের কথা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বাংশেও[১২] কথিত হইয়াছে। জগন্নাথ মায়াপুরে গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, দেশে যাইবার ইচ্ছা নাই। কালক্রমে শচীদেবীর গর্ভে তথায় তাঁহার আটটি কন্যা জাত হয়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটিও জীবিত রহে নাই; ইহাতে পতিপত্নী নিতান্তই দুঃখিত ছিলেন। তাহার পর তাঁহাদের বিশ্বরূপ নামে এক অপরূপ পুত্রের জন্ম হয়। বিশ্বরূপের তুলনা ছিল না, বিশ্বরূপ যখন দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, সন্তান-কাঙ্গাল পিতামাতার মনের ক্ষোভ তখন অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইল, উভয়েই উৎফুল্ল হইলেন।

এদিকে বহুদিন যাবৎ জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে আছেন, বহুকাল তিনি দেশে যান নাই, তাই স্নেহময় পিতা উপেন্দ্রমিশ্র তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। পথের দুর্গমতা প্রভৃতি বিবিধ কারণে জগন্নাথ মিশ্র দীর্ঘকাল দেশে না গেলেও, এখন পিতার আহ্বানে শচীপুরন্দরের নবদ্বীপের বাস ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল; তাঁহারা উভয়েই শ্রীহট্ট যাওয়া সাব্যস্থ্ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল যে পিতৃসেবা বিরহিত হওয়ার অপরাধেই হয়তঃ তাঁহাদের পূর্ব্বজাত কন্যাগুলি অকালে কাল কবলিত হইয়াছে। তিনি পিতৃ-সন্নিধানে না থাকিয়া পিতামাতার অন্তরে যে যাতনা দিয়াছেন, সন্তান-বিরহে তাঁহাদিগকেও তদনুরূপ ক্লিষ্ট হইতে হইয়াছে; আর যেন তদ্রূপ না ঘটে, পিতামাতার আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের বিশ্বরূপ যেন বাঁচিয়া থাকে। ফলতঃ জগন্নাথ দেশে যাওয়ার প্রস্তাব শ্বশুর শাশুড়ীকে জ্ঞাপন করিলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাবে অমত করিতে পারিলেন না, কিন্তু তৎপত্নী বিলাসিনী দেবী বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। বিশ্বরূপ তখন প্রায় আট বৎসরের বালক; মাতুল-তনয় লোকনাথের সহিত তিনি মাতামহ গৃহে একত্র থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন, তিনি নবদ্বীপে রহিলেন। বিশ্বরূপ শ্রীহট্টে আসেন নাই বলিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীতে তাঁহার উল্লেখ নাই।

---

১১. শ্রীচৈতন্য ভাগবত দেখ। পরবর্ত্তী ৪র্থ ভাগে ইহাদের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইবে।

১২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ-২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপ হইতে ঢাকাদক্ষিণে উপস্থিত হইলে, বধূর সহিত পুত্রকে পাইয়া, উপেন্দ্রমিশ্র ও শোভাদেবী নিরতিশয় সুখী হইলেন। শচীদেবী ও জগন্নাথমিশ্রও বহুদিনান্তর দেশে আসিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন,[১৩] এবং উভয় তাঁহাদের সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, শচীদেবী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিলেন।[১৪]

এই সময়ে একদা রাত্রিশেষে শোভাদেবী স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার বধূর গর্ভে এক মহাপুরুষের অধিষ্ঠান হইয়াছে, সে বিশ্বপ্রেমী মহাপুরুষ গঙ্গাতীরে ভূমিষ্ট হইবেন—এদেশে নহে, অতএব শচীকে সত্বর নবদ্বীপে প্রেরণ করিতে হইবে।

আদেশ প্রাপ্তে যাত্রার বন্দোবস্ত ক্রমে জগন্নাথ স্বল্পগর্ভা ভার্য্যাসহ নবদ্বীপ গমনে উদ্যত হইলেন।[১৫] যাত্রাকালে শোভাদেবী বধূকে কোলে লইয়া কিছু অনুরোধ করিলেন; তিনি বলেন—"মা, তোমার গর্ভে এক মহাপুরুষের অধিষ্ঠান হইয়াছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাকে আমাকে দেখাইতে হইবে। বল মা, তিনি জন্মিলে একটি বার তাঁহাকে আমার এখানে পাঠাইবে কিনা?" শচী স্বীকৃতা হইলেন, তৎপরে হৃদয়ের উল্লাসের সহিত ঢাকাদক্ষিণ হইতে যাত্রা করিয়া যথাকালে পতির সহিত নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন।[১৬]

শচীর এই গর্ভেই শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন; তাঁহার অপূর্ব্ব লীলাকথা উসংহারাধ্যায়ে উক্ত হইবে।[১৭]

জগন্নাথ মিশ্র স্ত্রীপুত্রাদিসহ নবদ্বীপে পরম সুখে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছু কালান্তে যখন সেই সুখের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিতে তিনি ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়েই হায়! তাঁহার সেই সুখের হাট ভাঙ্গিয়া যায়।

জগন্নাথের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ বিদ্বান্ ও পরম প্রাজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন; জগন্নাথ তখন পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। বিশ্বরূপ গীতা ভাগবতাদি লইয়া বিব্রত থাকিতেন। অদ্বৈতাচার্য্যের অনুষঙ্গে ভক্তির অনুশীলন করিতেন। বিবাহে তাঁহার মত ছিল না, তাই তিনি ঐ সময়েই গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার আবাল্যসঙ্গী, মাতুলতনয়-লোকনাথ তাঁহাকে ছাড়িয়া এক তিলও থাকিতে পারিতেন না, তিনিও তাঁহার অনুষঙ্গী হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

---

১৩. "জগন্নাথ শচীদেবী অতিশুদ্ধ মতি।
আপনার দেশে আসি করিলা বসতি॥"-কবি ধুপরাজ কৃত-'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' গ্রন্থ।

১৪. শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীতে লিখিত আছে-
"–জগন্নাথো ভার্য্যয়া সহিতো লঘু।
স্বদেশ মগমদ্ বিদ্বান্ পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্দ্ধয়ন।
গতে কিয়তি কালেচ শ্রীশচী সর্ব্বদেবতা।
ঋতুস্নাতা বভুবাত্র সুন্দরী পূর্ব্বতোধিকা॥"-২য় অধ্যায়

১৫. "পিতৃভ্যান্ত সমাদিষ্টো জগন্নাথখ্য ভূসুরঃ।
প্রয়াণং কর্ত্তুমদযুক্তোঃ ভার্য্যয়াস্বল্পগর্ভয়া॥"-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।

১৬. "কতদিন পরে শচীর মনেতে উল্লাস।
পূর্ব্ব-শ্রীহট্ট ত্যাজি কৈলা গঙ্গাতীরে বাস॥"
কবি দৃপরাজ কৃত 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' গ্রন্থ॥

১৭. ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা যোগে আবির্ভূত হন।
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভুর কথা কতক উক্ত হইয়াছে।

শচী আর জগন্নাথের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু তথাপি ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতা মাতা, পুত্র ধর্ম্মার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছে, এই বলিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া ছিলেন। জগন্নাথ তখন শচীদেবীকে বলিয়াছিলেন, "আমার ছেলে বালক মাত্র, সন্ন্যাসাশ্রম বড় কঠিন; সে যেন তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সে যেন গৃহে না ফিরে, দেবতার কাছে ইহাই প্রার্থনা কর।" কিন্তু হৃদয় দারুণ শোকাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িলে কিছুতেই শান্তি হয় না। কিছুদিন যাইতে না যাইতে এই দারুণ আঘাতের ফল প্রকটিত হইল; একদিন জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপকে ভাবিয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তারপর তাঁহার দেহে জ্বর আসিল; সে দুরন্ত জ্বরের আর ত্যাগ হইল না, মিশ্র অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশিবর্গ আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে গঙ্গায় লইয়া গেলেন, ভাগ্যবান জগন্নাথ জাহ্নবীর পবিত্র বারিস্পর্শে (জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে) দেহত্যাগ করিলেন।[১৮]

পরমানন্দ বংশ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উপেন্দ্র পুত্রগণের নামাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—"সপ্ত পুত্র তাঁর হয় সপ্ত ঋষীশ্বর।

কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্য নাথ,
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈলা জগন্নাথ॥"

কি সূত্রে জগন্নাথের নদীয়াতে গঙ্গাবাস ঘটে, তাহা বলিয়াছি। চৈতন্য চারিতামৃতের জগন্নাথের ভ্রাতৃবর্গের নামগুলি ক্রমানুসারে লিখিত হয় নাই, ক্রমানুযায়ী নামাবলী এইঃ—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্য নাথ।

উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র মধ্যে তিন জনের বংশধর-পরিচয় পাওয়া যায়। অপরেরা বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, অথবা বিবাহ করিয়া থাকিলে কেনই বা তাঁহাদের বংশ নাই জানা যায় না।

সর্বজ্যৈষ্ঠ্য কংসারির পুত্র প্রদুম্ন মিশ্র সন্নাস আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ বিলোপ ঘটিয়াছে। পরমানন্দের বংশীয়গণই ঢাকাদক্ষিণে মিশ্রবংশ।

পরমানন্দ মিশ্রের স্ত্রীর নাম সুশীলাদেবী, তাঁহার গর্ভে রামরত্ন মিশ্রের জন্ম হয়, এই রামরত্ন হইতেই ঢাকাদক্ষিণের মিশ্রবংশের বিস্তৃতি ঘটে।[১৯] ঢাকা দক্ষিণের শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর শ্রীবিগ্রহই মিশ্র বংশের প্রধান অবলম্বন ও উপজীব্য। অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাই বর্ণন করিতেছি।

---

১৮. "হেনকালে মুর্চ্ছা গেল মিশ্র পুরনন্দর।
বিশ্বরূপ শোকে তার গাত্রে আইল জ্বর॥
এইমত জ্বর দাহে মিশ্র পুরনন্দর।
কত কাল গেল নবদ্বীপের ভিতর॥
জ্যৈষ্ঠ-নিদাঘ কালে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
সেই দিন ভূমিকম্প বারি পূর্ণা ক্ষিতি॥
মিশ্র পুরন্দর জ্বলে হৈলা অচৈতন্য।
মৃত্যুকাল প্রত্যাসন্ন দেখে সর্ব্ব শূন্য॥
বিপ্রগণ মেলি কৈল গঙ্গা অন্তর্জলে।
দিব্য সিংহাসনে দিব্য পুষ্পমালা গলে॥" —কবি জয়ানন্দ কৃত চৈতন্যমঙ্গল।

১৯. মিশ্র বংশের পরিশুদ্ধ বংশতালিকা খ(১) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে আমাদিগের দ্বারা বিশ্বকোষে ও দাসী পত্রিকা প্রভৃতিতে যে বংশ তালিকা প্রদত্ত ও প্রকাশিত হয়, অধুনা প্রাপ্ত বংশ তালিকাদ্বয় তৎসহ মিলাইয়া খ(১) পরিশিষ্টের বংশ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহট্টে

শ্রীগৌরাঙ্গের পিতামহী দীর্ঘকাল জীবিতা ছিলেন; তাঁহার পৌত্রের পাণ্ডিত্য যশে চতুর্দ্দিক প্রপূরিত, তৎকালে এবং তাহার পরেও বৃদ্ধা জীবিতা ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পিতৃদেশ দর্শন উদ্দেশ্যে যদিও একবার পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি পিতামহী-গৃহ-ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই, কারণ বশতঃ পথ হইতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন।[২০]

শ্রীগৌরাঙ্গ পিতামহী-গৃহে না গিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া গেলেও বৃদ্ধার ধ্রুব ধারণা যে তাঁহার বধূ অবশ্যই তাঁহাকে পাঠাইবেন; তাই শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন অপেক্ষায় বৃদ্ধার প্রাণ বাহির হইতেছে না।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়; তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইতেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শান্তিপুরে তাঁহার আগমন ঘটে। এই সময় ভক্তবর্গ শচীদেবীকে শান্তিপুর লইয়া গিয়াছিলেন। শচী হারানিধি নিমাইকে পাইয়া; মনের সাধে কয়েক দিন স্বয়ং পাক করিয়া আহার করাইয়া ছিলেন। ইত্যবসরে মাতৃভক্তশিরোমণি গৌরহরি বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, জননীর মনে তিনি বড়ই দুঃখ দিয়াছেন, এখন জননীর আজ্ঞানুসারেই তিনি যে কোন স্থানে অবস্থিতি করিবেন,[২১] তদনুসারে শচীদেবী তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে থাকিবার অনুমতি দেন; এবং তিনি চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হন। এই সময় শচীদেবী তাঁহাকে সংগোপনে আর একটি কথা বলিয়া ছিলেন; প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গ্রন্থ হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

শচীদেবীর মনে হইয়াছিল—"যে নিমাইকে মুহূর্ত্ত-তরে নয়নের অন্তর করিতে পারি নাই, আজ তাঁহাকে শত যোজন দূরে বাস করিতে বলিলাম। শ্বাশুড়ী শোভাদেবীর নাপিত দেখিতে কত সাধ, আমাকে বলিয়া দিলেও সে কথা নিমাইকে কহি নাই—সুদূর শ্রীহট্টে পাঠাইতে ইচ্ছা করি নাই; কিন্তু তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না! আমার এ দুর্ভাগ্য কি শাশুড়ীর আদেশাবজ্ঞার ফল? যাক নিমাই আমার বাঁচিয়া থাক। শাশুড়ীর আদেশের কথা আর লুকাব না; আমার দোষে নিমাইর যেন কোন অনিষ্ট না ঘটে!"

পুত্র-স্নেহ-বিহ্বলা শচীদেবীর মনে এইরূপ চিন্তার উদ্রেকমাত্র তৎক্ষণাৎ পুত্রকে শ্রীহট্টে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতেই শ্রীমহাপ্রভুর পুনর্ব্বার পূর্ব্বদেশাগমন ঘটে। এই সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর আরও দুই এক স্থলে অলক্ষিতে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে। তিনি শ্রীহট্টে আসিলে প্রথমে বুরুঙ্গায় যেরূপে রামা-সম্মিলন ও কুটুম্ব-পরিচয় ঘটে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। বুরুঙ্গা হইতে শ্রীমহাপ্রভু ঢাকাদক্ষিণে উপস্থিত হন।

শোভা-সম্মিলন

সায়াহ্নকাল, অস্তোম্মুখ সূর্য্যের সমুজ্জল স্বর্ণ-কিরণ রেখা হরিত পত্রাবলীতে প্রতিফলিত হইয়া দিক হরিদ্রাভ হইয়া উঠিয়াছে, নির্জ্জন গ্রাম্য বাটিকা যেন হিঙ্গুল রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ পিঙ্গলাভা প্রকাশ পাইতেছে, বায়সকুল ব্যাকুলভাবে পশ্চিমদিকে উড়িয়া

২০. এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ বুরুঙ্গা পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, সে প্রসঙ্গ এস্থলে বর্ণন করা অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল; শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্র উপলক্ষে উপসংহারাধ্যায়ে তাহা বিবর্ণিত হইবে।

২১. এসব প্রসঙ্গ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ কৃত শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৪র্থ ভাগে উপসংহারাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যাইতেছে, এমন সময় প্রতপ্ত কাঞ্চন-লাঞ্ছিত কান্তি গৌরবিগ্রহ পিতামহ গৃহে উপনীত হইয়া বহির্ব্বাটিকায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন ঐ স্বর্ণ প্রতিমার অঙ্গ-কান্তিতে দিক্ প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, হরিত পত্রাবলী পীত-দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরমানন্দ-পত্নী সুশীলাদেবী এই নবীন উদাসীনকে প্রথমেই দেখিতে পাইলেন ও জরাতুয়া শাশুড়ীকে তাঁহার আগমন সংবাদ বলিলেন।

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে কোন প্রকারে আসিলেন; দণ্ডীকে তাঁহার মনুষ্য বুদ্ধি হইল না। তিনি নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য চন্দ্রই তাঁহাকে নিজ পরিচয় দিলেন।

বৃদ্ধার সাধ মিটিল। সুশীলা পরম যত্নে পায়স পিষ্টক প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রভুকে আহার করাইলেন। নাতির সহিত নানাবিধ আলাপ হইল, সাংসারিক সুখদুঃখের কথাও বাকি থাকিল না।

উপেন্দ্র মিশ্র ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে নানা কারণে তৎপুত্রগণের[২২] সাংসারিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছিল, বৃদ্ধা তাই নাতির কাছে সে কথাও বলিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বৃদ্ধার যখন কথা হইতেছিল, স্নেহের ভরে বৃদ্ধার, নাতির প্রতি তখন সন্ন্যাসী বুদ্ধির লেশ মাত্রও ছিল না; স্নেহের গাঢ়তায় তখন নির্ম্মল-হৃদয়া বৃদ্ধার নেত্রে তাঁহার স্নেহাদ্র-মধুর অপূর্ব্ব রূপ প্রতিভাত হইল, স্নেহাবেশে বৃদ্ধা দেখিলেন যে গৌরসুন্দর সন্ন্যাসী বেশে নহেন। যেন গৃহস্থের সরল ছেলে! বৃদ্ধার তখন বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি যেন এক অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার ঈশ্বর-বুদ্ধির উন্মেষ হইল। বৃদ্ধার চক্ষের সম্মুখে হঠাৎ যেন স্বর্ণ-কান্তি ইন্দ্রিনীলমণিদ্যুতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! এ কি? ইহা কি জরাগ্রস্তা শোভাদেবীর দৃষ্টিবিভ্রম? না তাঁহার মানসিক ভাব-সঞ্জাত চিত্ত বিক্রিয়ার ফল? বৃদ্ধা ভক্তি-পূতচিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

"দৃষ্টা রূপদ্বয়ং সাপি বিস্মিতা ভক্তিসংযতা।
নমস্তুভ্যং ভগবতে ইত্যাহ পুলকাবৃতা॥"-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।

আর শ্রীগৌরাঙ্গ তথায় অবস্থান করিলেন না, বিদায় লইয়া চলিলেন ও বৃদ্ধগোপেশ্বর শিব এবং অমৃতকুণ্ড দর্শন পূর্ব্বক চলিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ গোপেশ্বরের কথা, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; অমৃতকুণ্ডের চিহ্নমাত্রও এক্ষণে দৃষ্ট হয় না।

ঢাকাদক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ

মহাপ্রাণ মহাপুরুষ-সকাশে যাচঞা অমোঘ হয়। বৃদ্ধা স্বজনের জন্য ধন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে দু'টি রত্ন দিয়া ঢাকাদক্ষিণ হইতে প্রস্থান করিলেন। সে রত্ন আর কিছু নহে, যে রূপ বৃদ্ধার নয়নে নয়নে লাগিয়া রহিয়াছিল, হিয়ার মাঝারে পশিয়া গিয়াছিল, ইহা তাহাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ। এই দুই রূপই বৃদ্ধার অন্তিম কালের সম্বল হইল; বৃদ্ধা সেই দুই বিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সেই দুই বিগ্রহ তদবধি ঢাকাদক্ষিণে পূজিত

---

২২. এই সময়ে তাঁহার মাত্র দুই পুত্র জীবিত ছিলেন, প্রাচীন মনঃসন্তোসণী গ্রন্থে উক্তি-বাক্যে তাহা জানা যায়।
"তান যেই দুই পুত্র অদ্য বর্ত্তমান।
অদ্য তান সেই সব আছয়ে সন্তান।
বৃত্তিহীন হইয়া তারা বাঁচিবে কেমনে।"-ইত্যাদি।

হইতেছেন।[২৩] এই দুই বিগ্রহের প্রভাবে লোকমণ্ডলী আকৃষ্ট হইল, নানা জনে নানারূপ আশ্চর্য্য দর্শন করিল;[২৪] আর ঠাকুর দর্শনে আসিতে লাগিল; সেই হইতে মিশ্রবাড়া "ঠাকুরবাড়ী" নামে খ্যাত হইল।[২৫]

শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ বহু স্থানে আছেন, কিন্তু কোন স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির পার্শ্বে গৌরমূর্ত্তি স্থাপিত ও পূজিত হইতে দেখা যায় না। বৃদ্ধা যেরূপ দুইরূপ দর্শন করেন, এই বিগ্রহদ্বয় তাহারই স্মারক; ইহার অন্য কোন মীমাংসা নাই।

মিশ্র-সন্তানগণ কালক্রমে দীনদশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলা গিয়াছে, কিন্তু অচিরাৎ তাঁহাদের দিনপাতের নূতন পন্থা শ্রীবিগ্রহ হইতে হইল। লোকের প্রদত্ত প্রণামী ইত্যাদিতে তাঁহাদের জীবনোপায়ের সংস্থান হইতে লাগিল। এই জন্য মিশ্রবংশীয়গণ তাঁহাদের জ্ঞাতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে "স্বগোত্রীয়ের বৃত্তিদাতা" বলিয়া বর্ণনা করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর কাছে শোভাদেবী কথাপ্রসঙ্গে পুত্রপৌত্রাদির দৈন্যদশার কথা বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধার অভিপ্রায় এই উপায়ে তিনি পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহারা সগৌরবে ইহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

উপেন্দ্রমিশ্রের বাড়ী ও দেওয়ানের মন্দিরাদি

বর্ত্তমানে যে বাটিকা "ঠাকুরবাড়ী" নামে পরিচিত, ইহা আদি ঠাকুরবাড়ী অর্থাৎ উপেন্দ্র মিশ্রের মূলবাড়ী নহে। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণরজো ভূষিত সেই পূণ্যস্থান পরিত্যক্ত হইয়া জঙ্গলাচ্ছাদিত নবদ্বীপে মায়াপুরে শচীভবন অপরিচিত হইয়াছিল, লাউড়ের অদ্বৈতগৃহ গহনবনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ গুপ্ত হইয়াছিল, ঢাকাদক্ষিণের শ্রীসেবা জাগ্রত থাকিলেও উপেন্দ্রমিশ্রের মূলবাড়ী জঙ্গলের অন্তরালবর্ত্তী হইবে, বিচিত্র নহে।[২৬] যদি তাই, তবে শ্রীবিগ্রহ নূতনবাড়ীতে আসিলেন কিরূপে?

মোসলমান আমলে শ্রীহট্টে একজন দেওয়ান রাজস্ব বিভাগে সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত থাকিতেন, ইহা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের দ্বিতীয়ভাগে স্থানে স্থানে উল্লেখ করা গিয়াছে। এক স্থানে (৫ম খণ্ডে) ইহাও বলা গিয়াছে যে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদ নামে একজন দেওয়ান লিণ্ডসে সাহেবকে আপন চার্জ সমজাইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ইঁহাদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল এবং মাণিকচাঁদই শেষ দেওয়ান। তবে এই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যখন কার্য্যবশতঃ স্থায়ী দেওয়ানেরা কার্য্যানুরোধে বিদায় কিম্বা অবসর গ্রহণ করিতেন, তখন সাময়িক ভাবে নূতনলোকও তাঁহাদের স্থলে প্রেরিত হইতেন।

শ্রীহট্টের কালেক্টরীর কাগজ পত্রে গোলাবরাম নামে এক দেওয়ানের নাম পাওয়া যায়; ইনি ঐরূপ সাময়িকভাবে শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ী কোন স্থানে ছিল জানিবার

২৩. পূজক বংশের কথা। শোভাদেবী বিগ্রহ স্থাপনের পর যাহারা বিগ্রহ পূজায় নিয়োজিত হন, তাঁহারা আয়ে কোনরূপ অংশ পাইতেন না, পরে তাঁহারা ইহার দাবি করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বিতাড়িত হন। শ্রীমহাপ্রভুর পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় উক্ত ব্রাহ্মণ বংশ ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্নে ও ৪ খানা বাড়ীতে ছিলেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বের বাড়ীটি ঠাকুরবাড়ীর ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বংশীয়গণ ঠাকুরবাড়ী হইতে আরও পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছেন। এই প্রাচীন পূজকবংশ এস্থলে লুপ্ত প্রায়, এখন কেবল এক ঘর মাত্র বর্ত্তমান আছেন। ইহারাই পূর্ব্বে দেবতার ভোগ প্রস্তুতের পারিশ্রমিক পাইতেন। পরে (স্বর্গীয় গৌরকিশোর ও বিষ্ণুণ ঠাকুরদের সময়ে) তাঁহারা মিশ্রবংশীয়গণ কর্ত্তৃক পূজা হইতে বঞ্চিত হন। (−১৮৭৪ ইং ১৫৮নং মোকদ্দমার রায়ের মর্ম্ম)।

২৪. ঢাকাদক্ষিণের শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে নানা আশ্চর্য্য ঘটনা শুনা যায়, এ সকল "বিগ্রহলীলা" ইতিবৃত্তে প্রকাশযোগ্য নহে।

২৫. ঠাকুরবাড়ী শ্রীহট্টের সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণব তীর্থ, ইহার কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

উপায় নাই; তিনি এদেশবাসী ছিলেন না।

তিনি ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন ও মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। তিনি গঙ্গা ছাড়িয়া নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বকই শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে পৌঁছিয়া নিজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি অনুসন্ধান লন যে, নিকটে কোন বিখ্যাত "জাগ্রত" দেবস্থান আছে কি না। তদনুসারে ঢাকাদক্ষিণের ঠাকুরবাড়ীর সংবাদই তিনি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শুনিলেন যে এক ক্ষুদ্রায়তন বাটিকায় কাঁচা ঘরে ঠাকুর আছেন এবং ইহাও জানিলেন যে স্থলপথে শ্রীহট্ট হইতে তথায় যাইবার ভাল পথ নাই।

ঠাকুরবাড়ীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ দেওয়ানের ঠাকুর দর্শনের একান্ত অভিপ্রায় জন্মিল। কথিত আছে, তখন তিনি এই মর্ম্মে এই আদেশ লিপি প্রচার করিলেন যে, শ্রীহট্ট হইতে ঢাকাদক্ষিণের ঠাকুরবাড়ী পর্য্যন্ত একটি জাঙ্গাল (শড়ক) অতি সত্বর প্রস্তুত হইবে, শহর হইতে ক্রমশঃ যাঁহার যাঁহার ভূমির উপর দিয়া ঐ জাঙ্গাল যাইবে, সেই সেই জমিদার তাঁহাদের নিজাধিকৃত ভূমির উপর রাস্তা বাঁধাইয়া দিবেন। তদ্ভিন্ন ঢাকাদক্ষিণের জমিদার প্রতি, সাত দিনের মধ্যে উত্তম স্থানে দেবতার জন্য এক মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ হইল।

আদেশ প্রতিপালিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। শড়ক, সেতু, মন্দির সমস্তই হইল। সংবাদ পাইয়া যথাকালে দেওয়ান দেবদর্শনে আগমন করিলেন ও দেবতা দেখিয়া পর সুখী হইলেন।

পরদিন দেওয়ান ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু সে রাত্রে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিলেন কথিত আছে দেওয়ান দেখিয়াছিলেন যে, দিবাদৃষ্ট দেবমূর্ত্তি বিষাদ মলিন বদনে যেন বলিতেছেন, "এতদিন ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে ভালই ছিলাম তুমি মোসলমানের মসজিদে আনিয়া কষ্ট দিতেছ।"

নূতন মন্দির এত সত্বর কিরূপে প্রস্তুত হইল? দেওয়ানের মনে একথা জাগিয়াছিল; স্বপ্নে সন্দেহের কারণ জন্মিল এবং তিনি ইহার তথ্য গ্রহণে জ্ঞাত হইলেন যে, যথায় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, সেস্থানে এক পরিত্যক্ত মসজিদ ছিল, তাহারই উপকরণে এই মন্দির নির্ম্মিত!

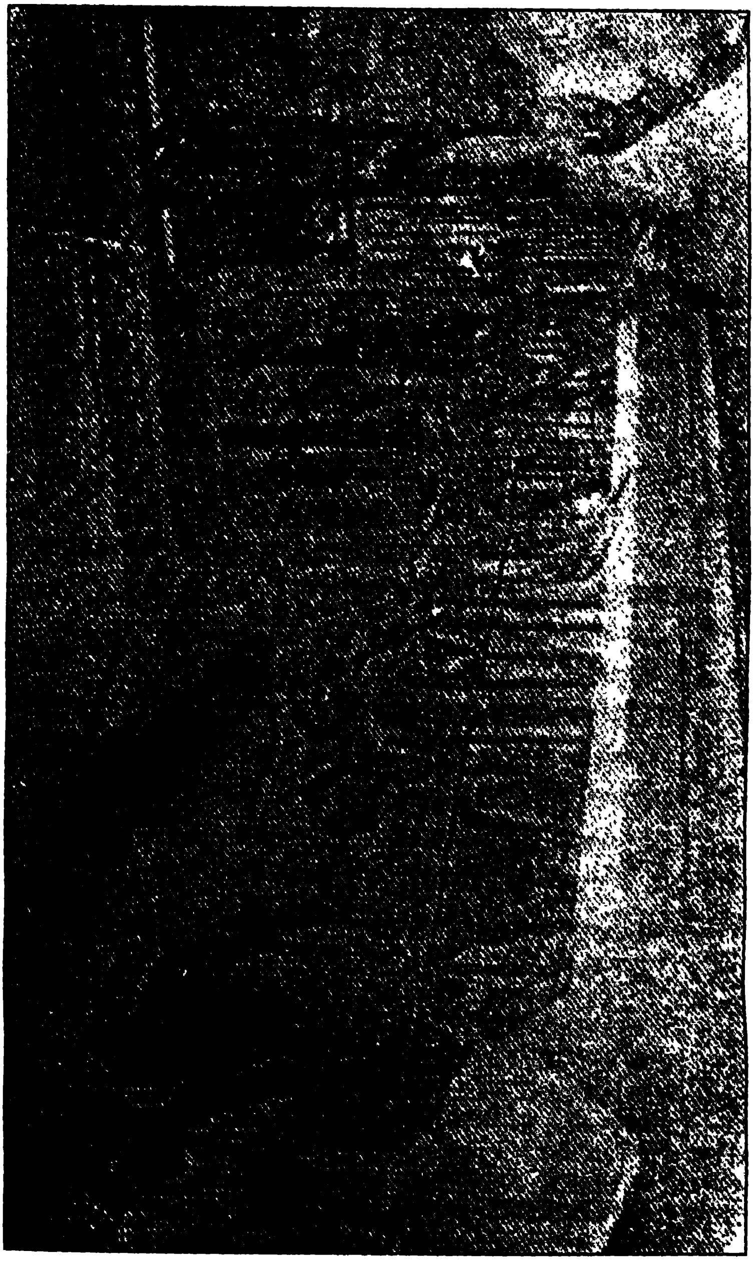
স্বপ্নটি দেওয়ানের মানসিক সন্দেহ জনিত চিন্তা প্রসূত বা যাহাই হউক, এই স্বপ্নের জন্যই তিনি দেবতাকে আর সেই মন্দিরে রাখা সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি স্বয়ং স্থান পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পূজকদের গৃহপার্শ্বে একটি স্থান মনোনীত করিলেন ও অনতিবিলম্বেই নূতন ইষ্টক দ্বারা এক সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করাইলেন। অতঃপর দেবতাকে সেই নবনির্ম্মিত মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়। ফলতঃ যে কারণেই হউক, দেওয়ান কর্ত্তৃক দেবতাকে পর্ণকুটীর হইতে আর এক মন্দিরে এবং অচিরেই সেই মন্দির হইতে অন্য নূতন মন্দিরে নেওয়া হয়।[২৭]

নূতন বাড়ীর সম্মুখে দেওয়ান কর্ত্তৃক এক বিস্তৃত দীঘীও খনিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে শ্রীমহাপ্রভু যে বাড়ীতে আছেন, উহাই সেই বাড়ী। দেওয়ানের দীঘিকাতীরেই "শ্রীচৈতন্যগঞ্জ" নামে বাজার বসিয়াছে। আর দেওয়ান কৃত সেই জাঙ্গালের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমানে "দেওয়ানের শড়ক" নামে খ্যাত আছে। ঐ শড়ক বাউশীর নিকট দেওরভাগা ছড়া পার হইয়াছে, তথাকার উচ্চ ইষ্টক সেতু "দেওয়ানের পোল" নামে খ্যাত। দেওয়ানের শড়ক শ্রীহট্ট শহর হইতে নদীর

---

২৬. শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় মূল বাড়ীর পরিচয় পাওয়ায়, মিশ্রঠাকুরগণ উহা প্রকাশার্থ চেষ্টান্বিত হইয়া কেহ উহার একাংশ পরিষ্কৃত করিয়াছেন, ও তথায় এক নূতন শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন।

২৭. বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহ দেওয়ানের নির্ম্মিত উক্ত মন্দিরে নহেন, কিঞ্চিৎ পরে বিনির্ম্মিত তৎপার্শ্বপর্ত্তী এক মন্দিরে আছেন। দত্তরালির দেব বংশীয় মণিরামের ভ্রাতা লঘাটি নামক স্থানের জনৈক সাহু-কন্যা বিবাহ করিয়া অবস্থার উন্নতির সহিত, মিশ্র বংশীয় পরশুরামের যত্নে এই মন্দির নির্ম্মাণ কবিয়া দিয়াছিলেন। মণিরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জীবিত আছেন।) ভোগ মন্দিরটি ঢাকাদক্ষিণের রায়গড় নিবাসী সাহু জাতীয় জিতবাম প্রায় ১২০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দেওয়ানের প্রাচীন মন্দির ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইল।



ঢাকা দক্ষিণের প্রাচীন মন্দির চিত্র

দক্ষিণ তীরের ধারে ধারে চলিয়া সুলতানপুরের নিকট বর্ত্তমান শ্রীহট্ট কাছাড় রোড পার হইয়া ঢাকাদক্ষিণ চলিয়াছে ও বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরই ক্রমশঃ কৃষক কর্ত্তৃক ক্ষয় পাইতেছে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন এক সময় উক্ত দেওয়ান শ্রীহট্ট সাময়িক ভাবে আগমন করিয়াছিলেন।[২৮]

উপেন্দ্র মিশ্রের বংশে বহুতর প্রধান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ অতি সামান্যই জানিতে পারা যায়।

বংশাখ্যান-হরিণাথ

শ্রীমহাপ্রভু যখন ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন, পরমানন্দের পুত্র রামরত্ন ও তাঁহার পুত্র নীলরত্ন তখন বর্ত্তমান। নীলরত্নের বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম হরিনাথ ন্যায় বাগীশ। ইনি মিথিলা দেশে গিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ন্যায়বাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হন ও দেশে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম ন্যায়শাস্ত্রের এক টোল সংস্থাপন করেন। শ্রীহট্টের ছাত্র দেশে থাকিয়া ন্যায়শিক্ষার সুবিধা পাইয়া তাঁহার টোলে অনেকেই ভর্ত্তি হইয়াছিল। তিনি নিজ পুত্র গোপীনাথকে স্বয়ং ন্যায়শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইঁহার খুল্লতাত-ভ্রাত রামজীবনের পুত্র জগজীবন "মনঃসন্তোষণী" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যের শ্রীহট্টাগমন বৃত্তান্ত লিখিত আছে।[২৯]

শিরোমণির ধর্ম্মপ্রচার-মণিপুরে

ন্যায়বাগীশের জ্ঞাতি সম্পর্কিত, অন্যদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম রামনারায়ণ শিরোমণি। ইনি নবদ্বীপে অধ্যয়নান্তর শিরোমণি উপাধি লাভ করেন। রামনারায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন এবং প্রায়শঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন।

এই সময়ে মণিপুরাধিপতি চিংথোং খোম্বা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান হন এবং মহাপ্রভু দর্শনে ঢাকাদক্ষিণে তিনি আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজের আগমন দিনে শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মহারাজ শিরোমণির সুশ্রাব্য সংস্কৃত উচ্চারণ ও ব্যাখ্যাদি শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন।[৩০] প্রত্যাগমনকালে মণিপুরের সর্ব্বসাধারণ বৈষ্ণব, ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হয়। শিরোমণি কর্ত্তৃক একটি জাতি বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছি ইহা তাঁহার বংশোপযোগী হইয়াছিল।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পরে মহারাজ চিংথোং খোম্বা মণিপুরের সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই মণিপুরীদের সৌভাগ্য যুগের উদয় হইয়াছিল। মহারাজ

---

২৮. পূর্ব্বাংশের ৪র্থ অধ্যায়ে দেওয়ান গোলাব রামের নামোল্লেখ আছে, সেই স্থলে উল্লেখিত তারিখটাতে ছাপার গুরুতর ভ্রম হইয়াছে।

২৯. ভুটিয়াকাগজে লিখিত জগজ্জীবনের পুঁথি আমরা পাইয়াছিলাম এবং বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে তাহা প্রেরণ করিয়াছিলাম। তখন আমরা জ্ঞাত হই যে, এ গ্রন্থ প্রায় দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বেকার। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন তাহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থেও ইহার প্রাচীনত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মিশ্র বংশাবলীতে দুই জগজ্জীবনের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি রামজীবন সুত, দ্বিতীয় জন জনার্দ্দন-পুত্র, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে মনঃসন্তোষণীতে জগজ্জীবনের পিতার নাম স্থলে উক্ত উভয় নামই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা লেখকের ভুল বশতঃও হইতে পারে। তাহা না হইলে প্রথম রামজীবনের নামান্তর জনার্দ্দন ছিল বলিতে হইবে এবং পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্বপুরুষ (উক্ত কৃতিব্যক্তি) দের স্মরণে দ্বিতীয় রামজীবন, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের নাম রাখা হইতেও পারে। ইহা বিচিত্র নহে এবং পূর্ব্ব পুরুষের নামে ঈদৃশ নাম রাখার বহু উদাহরণ এই গ্রন্থেরই বহু বংশ তালিকায় দৃষ্ট হইবে। আমরা পূর্ব্বে যে মিশ্রবংশ তালিকা পাইয়াছিলাম, তাহা বিশুদ্ধ ছিল না। জগজ্জীবন ২০০ বর্ষের প্রাচীন হইলে তিনি প্রথম জগজ্জীবন সন্দেহ নাই। "সঙ্গিনী" পত্রিকায় আমরা মনঃসন্তোষণী মুদ্রিত করিয়াছিলাম।

৩০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায়ে মণিপুর রাজের শ্রীহট্টাগমনে উল্লেখ আছে।

চিংথোং খোম্বা শ্রীমন্দিরে ব্যবহারার্থ শিরোমণির সহিত ৫ মণ ওজনে একটা বৃহৎ কাংস্য ঘণ্টা দিয়াছিলেন; শ্রীবিগ্রহের ভোগ ও সন্ধা আরতি কালে উহা নিনাদিত হইত। প্রায় ৮০/৯০ বৎসর হইল, পাহারাদারের মশাকে অগ্নিতে ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা নাটমন্দির দগ্ধ হয়, তৎসহ ঘণ্টাটিও গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়।[৩১]

পরশুরাম পণ্ডিত

শিরোমণির পুত্রের নাম পরশুরাম; ইনি পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ে (৮ জলুস ৭ রজব) ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর ঢাকাদক্ষিণের আমকোণা মৌজা হইতে ১৫ খানা বাড়ী ও টীলা প্রভৃতিতে৵৩০/হাল ভূমি ইহাকে ব্রহ্মত্র দান করেন।

পরশুরাম দেশের ধনী ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অনুরাগভাজন ছিলেন এবং অর্থ সম্পত্তিও প্রচুর উপার্জ্জন করেন; এমন কি তাঁহার বংশে তিনি "লাখিপরশুরাম" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কলা বিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাঁহার নির্ম্মিত মৃৎপ্রতিমা লোকে আগ্রহ করিয়া দেখিতে আসিত। তিনি, মোমদ্বারা রাধাকৃষ্ণের সুন্দর যুগলমূর্ত্তি প্রস্তুত ক্রমে কাশীতে লইয়া গিয়া কারিগর দ্বারা সেই আদর্শে ধাতুমূর্ত্তি গঠিত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক প্রচুর ব্যয়ে বিবাহ দিয়াছিলেন।

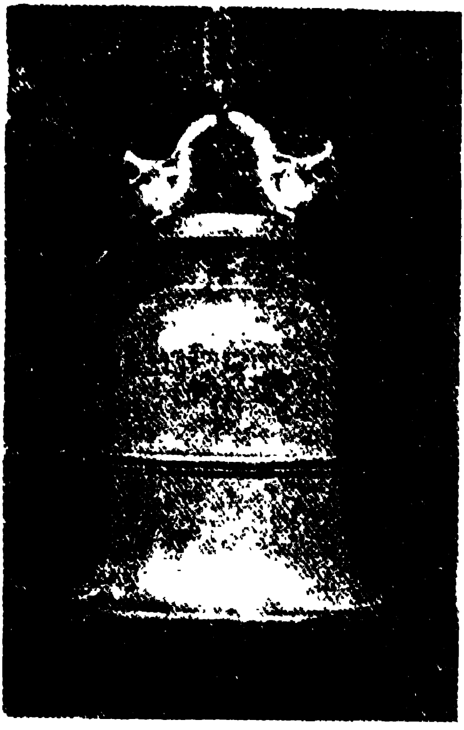
শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে রাজা, দেওয়ান প্রভৃতি গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ যে প্রচুর আয়ের পন্থা স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। মিশ্রবংশে পূর্ব্বাবধি পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মন্দিরের আয়-ভোগের রীতি প্রচলিত থাকায়, যাঁহার পর্য্যায়কালে ইহাদের কাহারও আগমন ঘটিত, তিনিই বিশেষ লাভবান হইতেন। ইহাদের প্রদত্ত অর্থে যাহাতে সকলে বঞ্চিত না হন, তজ্জন্য অতঃপর মিশ্রবংশীয়গণ মধ্যে এক দলিল সম্পাদিত হয়, তাহাতে জানা যায় যে, শ্রীহট্টের কোন কোন নবাবও দেবদর্শনে আগমন করিতেন।[৩২] উক্ত দলিলে পরশুরাম প্রভৃতি যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং পরস্পরে ভ্রাতৃ-সম্পর্কিত ছিলেন।

কমলাকান্ত জনাবদার

ইহাদের জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব তর্ক চূড়ামণি ও কমলাকান্ত। কমলাকান্ত একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, নবাব সহকারে তাহার "জনাবদার" উপাধি ছিল। নিজ গুণ-গৌরবে তিনি নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁর নায়েব আচল সিং হইল ৬ জলুস ১ শরফ তারিখযুক্ত এক সনদে (নং ৮১০ খৃঃ); পং বরায়া হইতে = ভূমি দান প্রাপ্ত হন (১৭৫৯ খৃঃ); আর এক সনদে

৩১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ১ম ভাগ ৮ম অধ্যায়ে চিং থোং খোম্বার সময়ে মণিপুরের প্রচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। চিং থোং খোম্বার বিচিত্র কাহিনী ১৩১৯ বাংলা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সাহিত সংবাদ।
পত্রে "ঐতিহাসিক চিত্র" প্রবন্ধে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে প্রাসঙ্গিক শিরোমণির মণিপুর গমন কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

৩২. উক্ত দলিলের অবিকল প্রতিলিপি এই:—
'ইং শ্রীসিবরাম পণ্ডিত গং ও শ্রীপরূশ রাম পণ্ডিত ও শ্রীকেশব রাম পণ্ডিত গং ও শ্রীঋতুরাম পণ্ডিত অস্য সময় করায় পত্র মিদং কার্জ্জঞ্চ আগে আমরা সকলে জমাবন্ধ (একত্র) ইহআ সময় করিলাম, ঠাকুর সেবায় আমরায় যে বারি (পালা। আছিল তাতে নবাব ও বৈষ্ণব (প্রভৃতি) ও দুর্ল্লভ দাসের নিজ ঘর ও তান সঙ্গে জে আইসেন—সকলর ববান (এজমালি)। আর দুর্ল্লভ দাসর ইথানর (অর্থাৎ ঐ স্থানের) মুহন মালা ও লগুণ (সোনার মোহন মালা ও স্বর্ণ উপবীত) গৈয়র ও খতে যে পাইছি এর (ইহা) বাটীয়া (বিভাগ করিয়া)। লৈমু এতে বের্ত্ত কোন অজাউত তাফাউত (?) করি স্বর্গীয় গুনাগার এতধত্তে সময়কার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ১১৬৬ সাল বাং তারিখ ১১ আষাঢ়।



মণিপুর-পতি প্রদত্ত-ঘণ্টা চিত্র

নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর তাঁহাকে প্রায় ৩০/ হাল ভূমি দান করেন।[৩৩] এই ভূমি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে তৎপুত্র আনন্দ রামের "তছরূপ" ছিল।

কমলাকান্ত ও হেড়ম্বেশ্বর

রতিকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত কমলাকান্তের জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহার স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। মঙ্গলবাবা নামক এক পশ্চিমা রামায়েত শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। মঙ্গলবাব বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; রতিকান্ত ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার কাছে সে অধ্যয়ন করেন।

রতিকান্ত পরে হেড়ম্বেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই সভায় ১৮ জন পণ্ডিত ছিলেন। রতিকান্ত তন্মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া মহারাজ অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মহারাজ একবার তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন বালক হইলেও, স্নেহপ্রযুক্ত ইহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন কাশীধামে উপস্থিত হন, তখন পশ্চিম দেশীয় অপর এক নৃপতি সভাসদ ও পারিষদ্বর্গাদিসহ বিশেষ আড়ম্বরে কাশী বাস করিতে ছিলেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলীয় হেড়ম্ব দেশাধিপতির আগমন শ্রবণে স্বগীয় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে তৎসহ সাক্ষাতের অভিপ্রায় করিয়া, সাড়ম্বরে তথায় গমন করেন।

সেই নৃপতির রাজ্যৈশ্বর্য্যের তুলনায় কৃষ্ণচন্দ্রের কিছুমাত্র জাঁকজমক ছিল না বলিলেই হয়। তিনি তৎসহ সাক্ষাৎ না করিয়া সঙ্গীয় তরুণ পণ্ডিতকে তৎসন্নিবেশিত প্রেরণ করিলেন।

রতিকান্ত সেই নৃপতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জানাইলেন যে, হেড়ম্বেশ্বর তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন, তিনি বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের রাজধানীতে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রকটন পূর্ব্বক রাজবেশে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত,—দীনবেশে সাক্ষাতেও গৌরব জানিয়া সম্ভাবনা, তাই তিনি সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ। পণ্ডিত মুখে কাছাড়পতির পরিচায়ক এই সদুত্তর শ্রবণে সেই নৃপতি লজ্জিত হইয়া পণ্ডিতকেই তদীয় আবাসে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ রতিকান্ত পরদিন গমন করিলে, তৎসহ সভাস্থ পণ্ডিতদের শাস্ত্রালাপ আরম্ভ হইল। পণ্ডিতগণ বেদের একটি কঠিন স্থলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ রতিকান্ত মঙ্গলবাবার নিকট ঐ কঠিন স্থলের প্রসঙ্গ মীমাংসা শিক্ষা করিয়া ছিলেন, সুতরাং অনায়াসে সদুত্তর দিয়া হেড়ম্বশ্বরের মান ও নাম রক্ষা করিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র এতদ্বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে এক হাতী দান করিলেন। দেশে আসিলে রাজদত্ত ঐ হাতী যখন ঢাকাদক্ষিণে প্রেরিত হইল, তিনি নশ্বর জ্ঞানে উহা বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বরের নামে এক শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, উক্ত মন্দির অদ্যাপি আছে। মহারাজ দত্ত কয়েকটি ধাতব উপহার তদগৃহে বর্ত্তমান আছে। তদ্ব্যতীত

(দলিলের দক্ষিণ পার্শ্বে দস্তখত—"শ্রীখতুরাম শর্ম্মণঃ।" দলিলের গর্ভে শেষোক্ত তিন নাম না থাকিলে স্বাক্ষর স্থলে আছে। () চিহ্নের ভিতরকার শব্দার্থ গুলি আমাদের প্রদত্ত। দলিলের লিখিত দুর্ল্লভদাস ধনী ব্যক্তি ছিলেন, ইঁহার কথা পরবর্ত্তী ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে উক্ত হইবে; ইনি শ্রীহট্টে নবাবি পাইয়াও তাহা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জানা যায়। এই দলিল হইতে বুঝা যায় মহাপ্রভুর মন্দিরে তাঁহার নিরূপিত দানের বরাদ্দ ছিল এবং তাহা কোন "খত" বা দলিল লিখিত ছিল।)

৩৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে নায়েব আচল সিং এবং নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুরের সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ২ জলুস ২ রজব তারিখ যুক্ত সনদ (নং ৮১৯) শেষোক্ত নবাব কর্তৃক পং ঢাকাদক্ষিণ হইতে ১১/১৬ ফুরকাবাদ হইতে ২৷৷ এবং পং হইতে ১৬ ভূমি প্রদত্ত হয়। জলুস অর্থে দিল্লীর বাদশাহের রাজত্ব সময়; অর্থাৎ ঐসময় যিনি সম্রাট ছিলেন, তাঁহার রাজত্বের ২য় বসে উহা প্রদত্ত হয়। উক্ত ভূমি পরে "কমলাকান্তের ছেগা" নামে বন্দোবস্ত হয়। "তছরূপ" অর্থাৎ ভোগদখলে থাকা।

তিনি ইটার জমিদার হরগোবিন্দ প্রদত্ত একটি সমস্যা পূরণ পূর্ব্বক উক্ত পরগণাস্থ ফরিদপূরান্তর্গত কিং চামারিয়া হইতে কতক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিদ্যালঙ্কার ও বিদ্যারত্ন

রামগতি বিদ্যালঙ্কার ও কৃষ্ণগোবিন্দ বিদ্যারত্ন জ্ঞাতি সম্পর্কে পরস্পর ভ্রাতা ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন; শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে তিনি সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন ও তদুপলক্ষে শ্রোতৃবর্গকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন। ইনি এক টোল স্থাপন করিয়া ছিলেন, তাহাতে শতাধিক ছাত্র ছিল। এই বংশে তৎপূর্ব্বে কেহ চাকুরী করেন নাই। ইনি জ্ঞাতিবর্গের অমতে নবপ্রতিষ্ঠিত শিলচর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন ও পরে শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পরিবর্ত্তিত হইয়া যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। মৈনা নিবাসী মহাফেজ প্রখ্যাত নামা কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী ও ঢাকাদক্ষিণের বিজ্ঞবর উকিল কৃষ্ণগোবিন্দ দেব সহ সর্ব্বদা তাঁহার আলাপ প্রসঙ্গ চলিত।[৩৪] এই দুই মহাত্মার স্মরণীয় গুণ গ্রামে তৎকালে শহরের সকলই মোহিত ছিল।

রামগতি বিদ্যালঙ্কার একজন জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ ছিলেন; তিনি এক টোল সংস্থাপন করতঃ বহুকার শিষ্য দিগকে শিক্ষাদান করেন। ইনি একদা মণিপুরে গমন করেন, মণিপুর-পতি মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি বাহাদুর পূর্ব্বঘণ্টার অভাব পুরণার্থ ২/দুই মণ ওজনের একটা কাংসাঘণ্টা শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে ব্যবহারার্থ তৎসহ প্রেরণ করেন, উহা এযাবৎ আছে। ঐ ঘণ্টার চতুস্পার্শে বঙ্গাক্ষরে মণিপুরী ভাষায় মণিপুরেশ্বর চন্দ্রকীর্ত্তি ও মহারাণী কুমুদিনীর নাম ইত্যাদি অঙ্কিত আছে।[৩৫]

বিদ্যালঙ্কার একদা রাজধানী আগরতলায় গমন করিয়া পণ্ডিত পরিবেষ্টিত মহারাজাধিষ্ঠিত সভায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিলে মহারাজ তাঁহাকে উপযুক্ত বিদায়ের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ উপহার দেন, উক্ত গ্রন্থ তাঁহার গৃহে সংরক্ষিত আছে।

মিশ্র বংশীয় অনেকেই দেবত্র ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ সকল দান প্রাপ্ত ভূমি পরে "বাজেয়াপ্ত" হইয়া গিয়াছিল। দেবত্র বহুতর ছিল; তাহাও জমা ধার্য্যে "চৈতন্যের ছেগ" বলিয়া গণ্য হয়। বর্ত্তমানে শুধু নৈবিদ্যের সনদ বাহালে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাত্র ১৮ টাকা বাৎসরিক প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৩৬]

---

৩৪. ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে "দাক্ষিণাত্য" পাঠ যুক্ত একখানা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বকোষ আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং বঙ্গের জ্ঞাত ইতিহাসে ইহা হইতে তর্কিত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুথিখানা মোনশী কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী উক্ত বিদ্যারত্ন হইতে সংগ্রহ করেন। আমরা তাঁহার গৃহ হইতে উহার অবিকল নকল আনিয়া পাঠাইয়াছিলাম।

৩৫. অঙ্কিত লিপি যথা ঃ–
"ঢাকাদক্ষিণ শ্রী শ্রী স্বগীয় মহাপ্রভুদা কৎলম্বা সমঙ্গী সরিক্‌ অদু কাইরে হইবা শ্রীমতী মণিপুরেশ্বরী কুমুদিনী মহারাণী নাতাদুনা মজাইঙঙ শ্রীযুক্ত মণিপুরেশ্বর চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ মহারাজদাম্নায়াথং পিদা সরিক অমি হৈদা কৎথী ইতি শকাব্দা ১৮০০ মাহে বৈশাখ। অস্যাঃ ঘণ্টায়া স্বামিত্বং শ্রীরামগতি মিশ্র বিদ্যালঙ্কারস্য নান্যেষমিতি।"

৩৬. এই ১৮ টাকার বৃত্তি অধ্যক্ষ উদয়রাম মিশ্র প্রাপ্ত হইতেন; উদয় রামের মৃত্যুর পর উহা প্রাপ্তি জন্য উদয় রামের "ওয়ারিশ" নিযুক্তি সম্বন্ধে ১২৪৬ বাংলা ১৪ অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার পুত্রগণ নামে যে "এতেলা" বাহির হয়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র মিশ্র হইতে আমরা প্রথমে তাহা প্রাপ্ত হই; উহাতে দৃষ্ট হয় যে, উদয় রামের কনিষ্ঠ পুত্র "বিশ্বনাথ শর্ম্মা" উপস্থিত হইয়া তাঁহার নামে বৃত্তি মঞ্জুরের দরখাস্ত দেন। তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত হয়, সেই আপত্তির মোকদ্দমায় সদর বোর্ডের নিষ্পত্তি মতে ১২৫২ বাংলা ২৭ কার্ত্তিক তারিখে ওয়ারিশ ধার্য্য করা হয়।

তাহার নকল এই ঃ–

চতুর্থ অধ্যায়

বুরুঙ্গা, রেঙ্গা ও ঢাকাদক্ষিণের ব্রাহ্মণ বংশ

পুনঃ পরগণা-বুরুঙ্গা

প্রথম অধ্যায়ে ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় আদিদেবের বুরুঙ্গায় অবস্থিতির কথা বলিয়াছি, এই আদিদেবের ষষ্ঠ পুরুষে হিরণ্য গর্ভের উদ্ভব হয়; হিরণ্য গর্ভের কন্যার নাম চণ্ডীদেবী। চণ্ডীদেবীর সহিত মধুকর মিশ্রের বিবাহ প্রসঙ্গও পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। আদিদেবের বংশের ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। শ্রীহট্টের খ্যাত নামা সুকবি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তৎপ্রদত্ত বিবরণে লিখিত আছেঃ—

"হিরণাগর্ভে ছয়, সদাশিবে নয়।

মায়ের শাপে আটপুরুষ একপিণ্ডা হয়॥"—প্রাচীন প্রবচন।

"রচয়িতা কে, জানিবার উপায় নাই। এই কবিতার অর্থ আদিদেবের পুত্র হইতে হিরন্ময়গর্ভ ষষ্ঠ পুরুষ, আদিদেবের পুত্র হইতে সদাশিব পর্য্যন্ত আট পুরুষ একপিণ্ডা বা একান্বয়ী অর্থাৎ বংশের মধ্যে পিণ্ডদানের যোগ্য একটি মাত্র পুরুষেরই বংশ থাকিত। 'মায়ে শাপে'—কাহার মা কাহাকে কিজন্য শাপ দেন, জানিবার উপায় নাই।"

সদাশিব ও বেগম

সদাশিব আদিদেবের বংশে সুতরাং একাকী ছিলেন। সদাশিব ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন, বিষয় ব্যাপৃত থাকিতে চাহিতেন না; তাঁহার উদাস মন দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া ফিরিত; অবশেষে তিনি দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন, মন অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। একদিন ত্রিশূল ও জপমালা মাত্র সম্বল সহ সস্ত্রীক বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

সদাশিবের পত্নী তখন গর্ভবতী। স্ত্রীলোক তাহাতে নলবনাকীর্ণ দুর্গম পথ, ক্রোশৈক পরিমিত রাস্তা চলিয়াই তিনি পর্য্যটন পরাঙ্মুখী হইয়া অবসন্নদেহে উপবেশন করিলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সদাশিব আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, সেই স্থানেই হস্তস্থিত ত্রিশূল প্রোথিত করিলেন ও শুষ্কনল সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক জপ করিতে লাগিলেন।

"যাহাকে পেনশন দেওয়া যাবেক"

নম্বর সনদ	নাম পেনশনদার সাবেক	নাম হাল পেনশদান	মোট পেনশন
৩২ নং	উদয় রাম শর্ম্মা পূজারী	রামগতি মিশ্র	১৮ আঠার টাকা

তৎকালে মোক্তারপুর পরগণায় চান্দখাঁ নামক এক প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সাধারণতঃ প্রজাবর্গ তাঁহাকে নবাব ও তদীয় পত্নীকে বেগম নামে অভিহিত করিত। এই চান্দ

খাঁ অনুচর বর্গ সহ এক গর্ভবতী অশ্বিনী আরোহণে ভ্রমণে গমন করিয়া সেই নির্জ্জন কাননে ধুম দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন ও তথায় উপস্থিত হইয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

প্রজ্বলিত অনলকুণ্ড পার্শ্বে প্রোথিত ত্রিশূল সন্নিকটে উপবিষ্ট জপনিবিষ্ট সদাশিবকে মোসলমানগণ "দরবেশ" বলিয়াই মনে করিলেন। একজন অনুচর কৌতুকবশে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল যে, সেই গর্ভবতী অশ্বিনী পুং কি স্ত্রী শাবক প্রসব করিবে? "অশ্ব হইবে" বলিয়া সদাশিব সহাস্যে উত্তর দিলেন।

সদাশিবের প্রতি চান্দখাঁর শ্রদ্ধা অথবা দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, তিনি দুইজন অনুচরকে এই নিরাশ্রয় বনাশ্রয়ীর প্রহরায় নিষক্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর চন্দখাঁ বনাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ দম্পত্তির জন্য প্রত্যহ দুগ্ধ ও কদলী এবং আতপ তণ্ডুলাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ একবার করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইতেন।

এদিকে কয়েকদিনের মধ্যে দৈবক্রমে সেই অশ্বিণী এক অশ্বশাবকই প্রসব করিল। সদাশিবের বাক্যে সফল হইয়া গেল; ইহাতে লোকে তাঁহাকে বাক্যসিদ্ধ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।

চান্দখাঁর স্ত্রীর কয়েকটি কন্যা জাত হইয়াছিল, তিনি পুত্রমুখ দর্শনের কাঙ্গাল ছিলেন। তিনি পতি-মুখে সাধুর সংবাদ শ্রবণে সাধুদর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎসুকা হইলেন ও স্বামীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। পত্নীর অনুনয়ে চান্দখাঁ স্বীকৃত হইলে পরদিন বহুজন পরিবৃত হইয়া সস্ত্রীক চান্দ সাধু-সকাশে উপস্থিত হইলেন।

চান্দখাঁ-পত্নী তখন গর্ভবতী। পুত্র কাঙ্গালিনী সকাতরে সদাশিবকে স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। "মা, এ গর্ভে কি জন্মিবে কেমনে বলিব। তবে আশীর্ব্বাদ করি, পুত্রমুখ দর্শন কর?" সাধুর এই আশীর্ব্বাক্যে নবাব-পত্নী হৃষ্টচিত্তে গৃহে গেলেন।

ইতিমধ্যে বনাশ্রয়ী ব্রাহ্মণপত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। চান্দখাঁ তখন নল-জঙ্গল কাটাইয়া পরিষ্কৃত ক্রমে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ গৃহবাসী হইলেন। সদাশিবের এই পুত্রের নাম বাসুদেব।

চান্দখাঁ-পত্নীও কালক্রমে একটি পুত্র জাত হইল। সদাশিবের প্রতি সবারই ভক্তি প্রবৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সূতিকা-কালাবসানেই বেগম বরলব্ধ সেই নবজাত শিশুসহ বনাশ্রমে উপস্থিত, বনাশ্রম আজ আনন্দে কোলাহলে টলমলায়মান। বেগম সাহেবা সদাশিবকে পুত্র দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ লইলেন ও তাঁহার পদপ্রান্তে একখানা সনন্দ রক্ষা করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবা, মাকে লইয়া এইখানেই বাস করিবেন। আমরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইব। এজন্য যাহা করিলাম এ সনন্দে তাহা লিখা আছে।"

ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলেন। নবাব ও বেগমের যুগ্মনাম সাক্ষরিত সেই সনন্দের নির্দ্দেশানুসারে, উত্তরে ধোপাখালী, পূর্ব্বে বরাক ও কাগজপুরের খাল, দক্ষিণে সাদিপুরের খাল, পশ্চিমে নাড়িকানদী, এই চতুঃসীমান্তর্গত বগৈকক্রোশ পরিমিত গোলাকৃতি ভূখণ্ডের সহিত তিনি "চৌধুরী" আখ্যা পাইলেন।

এইরূপে তপস্বী গৃহী হইলেন। তিনি সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেই ভূখণ্ডের উত্তরাংশের নাম বেগমপুর রাখিলেন এবং দক্ষিণাংশকে নবাবপুর নামে খ্যাত করিলেন। বেগমপুরেই তাঁহার গৃহাদি ছিল, বেগমপুর তাই গ্রামে পরিণত হইল এবং নবাবপুর কৃষিক্ষেত্রই রহিল। গ্রামের পূর্ব্বাদিকে সদাশিবের ভিটা ও পুষ্করিণীর নিদর্শনা অদ্যাপি আছে।

মাটির মমতা

ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এই প্রাচীন গ্রামের যাবনিক নাম কেন হইয়াছিল, ইহাই তাহার ইতিহাস। সদাশিবের অধিকার "সদাশিবের মাটি" বলিয়া পরিকথিত হয়। সদাশিব ও তাঁহার মাটির প্রতি আজ পর্যন্ত তত্রত্য লোকের অবিচলিত ভক্তি দেখা যায়। আজ পর্য্যন্ত দুই ব্যক্তিতে তর্ক উপস্থিত হইলে বা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইলে, "সদাশিবের দোহাই"র অব্যাহত প্রভাব লক্ষিত হয়। আজ পর্য্যন্ত লোকের "সদাশিবের কাশী ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।" আজও তাহাদিগকে "সদাশিবের মাটি দয়া" করিয়া থাকে।

পুত্র-প্রসঙ্গ

বাসুদেব ব্যতীত সদাশিবের বাচস্পতি ও রতিকান্ত বা রতাই পণ্ডিত নামে আরও দুই পুত্রজাত হয়। বাচস্পতি নাম নহে। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পুত্রের উপাধিই বাচস্পতি ছিল। রতিকান্তের কোন উপাধি না থাকিলেও বিদ্যা গৌরবে ইনি পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুরুঙ্গার রাঘব বিদ্যানিধির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। রতই পণ্ডিত ইঁহার সমসাময়িক ছিলেন। একদা কোন ব্যাপার উপলক্ষে প্রখ্যাতকীর্ত্তি রাঘব নিমন্ত্রিত হইয়া বেগমপুরে আগমন করেন ও "রাজপণ্ডিতি"র দাবী করেন।

রাজপণ্ডিতি কি?

পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিভিন্ন পরগণায় হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত ব্যাপারাদিতে ব্যবস্থা দিতেন ও তদুপলক্ষে বিদায় পাইতেন এবং বিচার কার্য্যে প্রয়োজনানুসারে ঐ সম্বন্ধে যাহাদের অভিমত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত, তাঁহারাই "রাজপণ্ডিত" গণ্য হইতেন।[১]

রাঘব বেগমপুর হইতে রাজপণ্ডিতির বিদায় পাইবার দাবী করিলে রতাই প্রতিবাদী হইলেন। রাঘব রাজপণ্ডিতি পাইবেন কেন? রাজপণ্ডিতি পাইবার কারণ কি? ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, শাস্ত্র বিচারে জয়লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বত্রই এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রতাই তখন বিদ্যানিধিকে বিচারে আহ্বান করিলেন!

কোথায় বিদ্যানিধির অগাধ বিদ্যা, আর কোথায় রতাইর সামান্য জ্ঞান-নিষ্ঠা? রতাইর উন্মত্ত-গর্ব্বে বিদ্যানিধি হাসিয়া উঠিলেন, সমাগত লোকমণ্ডলী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু যখন রতাই কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইলেন না, যখন বিচার আরম্ভ হইল, তখন রতাইর অপ্রত্যাশিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্তে সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইল। বিদ্যানিধি চমকিত হইলেন। উদার বিদ্যানিধি রতাইর জ্ঞান গৌরবে বিমোহিত হইয়া সহর্ষে পরাজয় স্বীকার করিলেন; আর বিচার চলিল না, বিদ্যানিধি বেগমপুরের রাজপণ্ডিতি পাইলেন না; রতাই সদাশিবের মাটির সম্মান রাখিয়া দিলেন।

অরঙ্গপুরীর চাতুর্য্য

সদাশিবের মাটির কিয়দংশ পরে অরঙ্গপুর গ্রাস করিয়া ফেলে। কথিত আছে, অরঙ্গপুরের এক মোসলমান মহিলার বেগমপুরে এক "ভইনারি" অর্থাৎ সখী বা সই ছিলেন, স্বপুত্রের বাসের জন্য তাঁহার নিকট উক্ত মোসলমান মহিলা কিছু ভূমি দান প্রার্থনা করিয়া দুইহাল ভূমি দান প্রাপ্ত হন;[২] এবং তথায় উঠিয়া গিয়া বাস করেন।

এই দুই হাল ভূমির উপলক্ষে মোসলমানগণের সংখ্যা বেগমপুরে পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ-২য় ভাগ ২য় খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ে রাজপণ্ডিতির উল্লেখ আছে।

পাইতে থাকে। তখন বেগমপুর হইতে আপত্তি উত্থাপিত হয়।

প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের জন্য জলপূর্ণ ঘট সহ মাঠে যাওয়ার রীতি গ্রাম্য অঞ্চলে অনেক স্থলেই আছে। একদিন বেগমপুরবাসিগণ মাঠে গিয়া স্তূপীকৃত মৃত্তিকার এক দীর্ঘ জাঙ্গাল অবলোকন করিল ও অনেকে কৌতূহল প্রযুক্ত কাছে গিয়া দেখিল যে নিম্নে একখাল কর্ত্তন করা হইয়াছে। তখন আর বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, অরঙ্গপুরের মোসলমানগণ বরাকনদী হইতে পশ্চিমমুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত রাতারাতি এই খাল কাটিয়া অন্যায়রূপে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছে।

অরঙ্গপুরের লোকেরাও আসিল। উভয়পক্ষে এতদুপলক্ষে প্রথমতঃ বাগ্‌বিতণ্ডা ও ক্রমে বিবাদ বাঁধিয়া পরে লোষ্ট্রক্ষেপণ আরম্ভ হইল; অরঙ্গপুরের দল অচিরেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।[৩] বেগমপুরের দল জয়শ্রী লইয়া ঘরে আসিল, কিন্তু সেই পর্য্যন্তই। স্থান দখল বিষয়ে আর কিছু হইল না। সেই খণিত খালই অরঙ্গপুরের সীমারূপে গণ্য হইয়া গেল! অরঙ্গপুর ও বেগমপুরে কেবল পূর্ব্বেই যে এরূপ ছিল, তাহা নহে; পরে বাজার সম্বন্ধেও এইরূপ কত মারামারির উদাহরণ আছে।

মহেশ্বরাদি সাধক

বেগমপুর ব্রাহ্মণের স্থান, ব্রাহ্মণগণ ওসব বিষয়ে তত লক্ষ্য রাখেন না, এইজন্যই মোসলমানগণ ছলে বলে কার্য্যসিদ্ধির সুবিধা পায়; তথাপি সেই বংশে যখনই কেহ ঐদিকে মন দিয়াছেন, তখনই তিনি নিজ অধিকার অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বংশে মহেশ্বর ও তাঁহার ভ্রাতা প্রকৃতই বীরপুরুষ ছিলেন, মহাকায় মহেশ্বর জীবিত কালে অরঙ্গপুর, সদাশিবের অধিকারে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। গণিতে ইঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল, অন্যে কাগজে কলমে দুইদণ্ডে যে অঙ্ক কসিতে অসমর্থ হইত, ইনি দুই মিনিটে মুখে মুখে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন; দেখিয়া লোক অবাক হইত। এই সাহসী ও পর উপকারী, সুদীর্ঘ ও মহাকায় পুরুষের মৃত্যুও বড় আশ্চর্য রকমে হইয়াছিল। তাঁহার অসুখের সময় সহধর্ম্মিণী একদিন প্রাঙ্গণে স্নান করাইয়া দিয়াছেন, স্নান বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি রৌদ্রে বসিয়া "সন্ধ্যা" করিতে লাগিলেন ও "গায়ত্রী" জপ করিতে করিতে ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে পরিজনগণ দৌড়িয়া গিয়া দেখিল যে প্রাণ

---

২. পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাত নামা কবি বলিতেছেনঃ–

"ভইনারী আইলা বাটী, পাতি বইলা পাটি।
চাইলা একখান চাটি, পাইলা দুইহাল মাটি॥"

অর্থাৎ সই বাটিকাতে আসিলেন, (বসিতে তাহাকে পাটি দেওয়া হইলে) তিনি পাটি পাতিয়া বসিলেন। এবং (তিনি) একখানা চাটি (বা চাটাই) বিছাইবার উপযুক্ত মাটি (অর্থাৎ সামান্য একটুকু ভূমি) চাহিলেন; (তাহাতে) দুইহাল ভূমি (দানস্বরূপ) প্রাপ্ত হইলেন।

৩. পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাত কবি এ ঘটনাও স্মরণ রাখিয়াছেনঃ–

"একহাতে ইটা, আর হাতে লোটা।
বুকে পিঠে ইটা, সে সয় কয়টা?
এ কি আর মরদানি?–রাইতে মাটি কাটা!
চারি চৌখে করে কাম, সেইত বাপের বেটা॥"

অর্থাৎ বেগমপুরীদের একহাতে লোটা ছিল, তাহারা অন্য হাতে ইটা (লোষ্ট্র) লইয়া (অরঙ্গপুরীর প্রতি) ক্ষেপণ করিয়াছিল। (প্রতিপক্ষের) বুকে ও পিঠে (অর্থাৎ পথে পশ্চাতে সমানে) এটা (পতিত হইতে লাগিল;) কে কতটি সহিবে? (কাজেই পলায়ন করিল।) (তাহারা) রাত্রে মাটি কাটিয়া ছিল (ও চোরের মত খাল খনন করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিল;) ইহাতে আর পুরুষত্ব কি? যে ব্যক্তি চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ্যে কার্য্য করিতে পারে, সেই তো (প্রকৃত) পিতার পুত্র; সেই তো পুরুষ। এই কবিতা দ্বারা গ্রাম্য কবি বেগমপুরবাসীগণের সাহসের প্রশংসা ও অরঙ্গপুরীদের চাতুর্য্যের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে! মহেশ্বরের মৃত্যু সেই দিনকার ঘটনা।

কেবল মহেশ্বরের বলিয়া নহে,—"সদাশিবের আজ্ঞা আছে, এবংশ সাধ বর্জ্জিত হইবে না।" বাস্তবিক একথার সফলতা এযাবৎ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; একজন সাধক এবংশে থাকেনই। উদাহরণ স্থলে "রামকান্ত মুনিগোসাই" এবং শ্যামচরণ চৌধুরী ও স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহারা তিনজনই চিরকুমার ছিলেন। বর্ত্তমানের স্বনাম-ধন্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বংশের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

শ্যামাচরণ ফরিদপুরে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার সত্য-নিষ্ঠা, সদাচার এক সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান সেই বিদেশেও তিনি সম্পূজিত হইতেন। তরফ-বড়কাশি গ্রাম হইতে নন্দনপুর হাটে যাইবার পথে "মুনিগোসাইর গাছ" নামে পরিচিত এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। এই বট মুনিগোইর রোপিত; ইহারই পার্শ্বে তিনি দিবারাত্রি জপে অতিবাহিত করিতেন এবং তাহাতে "মুনিগোসাই" বলিয়া খ্যাত হন। চন্দ্রনাথ একদা নিজ ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে গিয়া একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন, অন্ন জল ত্যাগ করেন, ও শয্যা আশ্রয় করিতে হয়; ইহাতে অচিরেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। একটা মিথ্যা কথা তাঁহার কাছে কঠোর বজ্রসদৃশ অথবা পর্ব্বত পাতের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, ইহা তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণকে একবারে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। এ বংশ শক্তিমন্ত্রের উপাসক; একজন মাত্র নাম চণ্ডা চরণ, জ্যেষ্ঠের সহ বিরোধক্রমে ভেখ গ্রহণে বৈরাগী হইয়া খাড়ু কোণা গ্রামে আখড়া করিয়াছিলেন।[৪]

গৌতম গোত্রীয়ের কথা

বেগমপুরে ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় চৌধুরী[৫] বংশীয়গণ ব্যতীত গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ প্রায় ৯/১০ পুরুষ যাবৎ বাস করিতেছেন। এই বংশে উমাপতি বিদ্যানিবাস এবং বিনোদপণ্ডিত বিশেষ খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। এই বংশীয় জয়গোপাল যোগানুষ্ঠান করিতেন, তাঁহার যোগশক্তির বিবিধ জনশ্রুতি এখনও শুনা গিয়া থাকে। ইহার নামেও তদ্বংশীয়গণ অমাবস্যায় চন্দ্রোদয়ের গল্প করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পরাশর, রথীতর ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি আরও কতিপয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ তথায় আছেন।

ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য্য—বুরুঙ্গাবাসী ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য্য কাশীধামে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিত হন ও জনৈক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সম্মিলিত হইয়া আগরা শহরে এক ঔষধালয় স্থাপন করেন; পরে

৪. আদিদেব হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ২৪ পুরুষ চলিতেছে, সুতরাং আদিদেবের আগমন কাল আট শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে আপত্তি নাই। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মতে আদিদেবের আগমন কাল আরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনি বলেন-"তিনপুরুষ শতাব্দীর গণনা আধুনিক প্রণালী। পূর্ব্বকালে লোক এত অল্পায়ু ছিল না।"

৫. উপাধি দানের ক্ষমতা

এই চৌধুরী বংশের বিবরণ উপলক্ষে এস্থলে একটা কথা আলোচ্য হইতেছে,-চৌধুরী খেতাব নবাব সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। চান্দখাঁ কি প্রকৃতই নবাব ছিলেন? চান্দখাঁ যে শ্রীহট্টের শাসনকর্তৃক পদাভিষিক্ত ছিলেন না, তাহা তাঁহার বিবরণ হইতেই জানা যায়, তবে সাধারণতঃ তিনি নবাব বলিয়া পরিকথিত হইতেন। নিকটবর্ত্তী মোক্তারপুর পরগণায় যে মোসলমান জমিদার বংশীয়গণ আছেন, চান্দখাঁ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইলেও হইতে পারেন। চান্দখাঁ যে একজন প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন, উপাধিদান ক্ষমতা তাহার পরিচায়ক। রাজার নবাবকল্প ভূম্যধিকারিগণও কখন কখন এ উপাধি দান করিতেন ও পরে তাহা স্থানীয় শাসনকর্ত্তার যোগে বা অনুমোদনে বহাল করাইয়া দিতেন। এস্থলে রেঙ্গার মোসলমান জমিদার কর্ত্তৃক ভরদ্বাজগোত্রীয় রামকৃষ্ণকে "রাজপণ্ডিত" বিষয় দানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতঃপর তাহা উল্লেখিত হইতেছে রাজদত্ত চৌধুরী প্রভৃতি উপাধির অর্থাদি বিচার পূর্ব্বাংশে "নবাবি আমলে দেশের অবস্থা" প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জাতীয় উপাধির প্রসঙ্গ এ অংশের উপক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

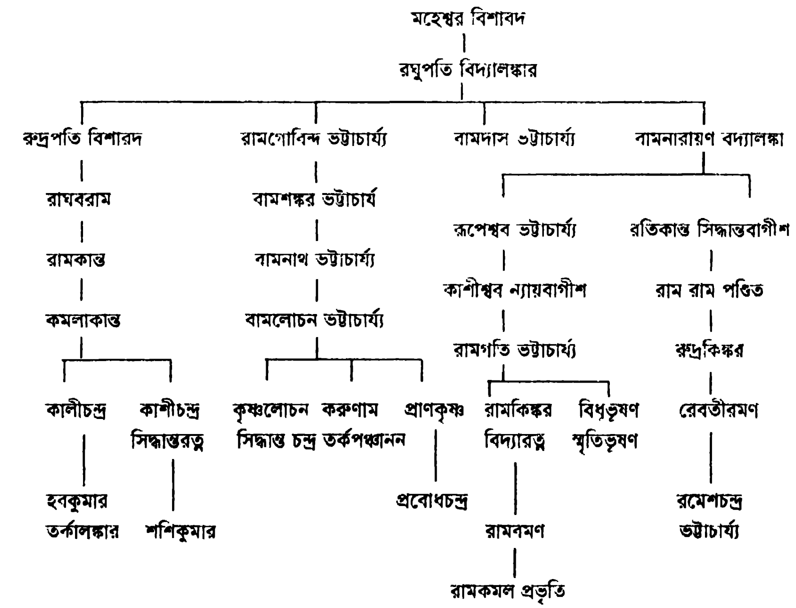
তিনি সম্পূর্ণরূপে উহার স্বত্ত্বাধিকারী হইলেও বানার্জ্জি নামে স্বয়ং তিনি ও তাঁহার ঔষধালয়ের খ্যাতি হয়। ধর্ম্মে বিশ্বাস ও চরিত্রের নির্ম্মলতা হেতু তিনি আগরাবাসীদের ভক্তিপাত্র হইয়া প্রভূত বিত্ত ও যশ উপার্জ্জন করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন; ইঁহার পুত্রগণ এখনও ঔষধালয়টি কথমপি রক্ষা করিতেছেন।

"আশারাশি"—বেগমপুরকে কেহ কেহ "আশরাশি" নামে অভিহিত করিতে শুনা গিয়া থাকে, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত কথা; বেগমপুর আশারাশি নহে। মোহাম্মদ ফরিদ নামে জনৈক ফকির বেগমপুরের এক প্রান্তে থাকিতেন; তাঁহার একটা মুরগী একদা এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎশ্রবণে ফকির অনুতপ্ত হইয়া, সে গ্রাম ত্যাগ করেন ও প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে নদীর ধারে বাড়ী করেন। সে এক রম্যস্থান; কথিত আছে যে, হজরত শাহজলাল শ্রীহট্টে যাইবার পথে এস্থানে একরাত্রি অবস্থান করেন। ফকির এই স্থানের কাছে বাড়ী প্রস্তুত করিলে, তাহা ফকিরপাড়া নামে খ্যাত হয়। এই ফকিরপাড়ার দক্ষিণে একখানা ক্ষুদ্র বাড়ী ও ত্রিহল পরিমিত জমি লইয়াই আশারাশি। এই জমি "আওয়াইর বন্ধ" নামে খ্যাত, আওরাই-ই-আশারাশি এই নামে কথিত হইয়া, কখন কখন পরিসর বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

রেঙ্গার বিশারদ বংশ

বুরুঙ্গার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাঘব বিদ্যানিধির জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাদাসের কথা ২য় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশ্বর বিশারদ বুরুঙ্গা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্রাদি সহ রেঙ্গা পরগণার কান্দিয়ারচর গ্রামে গমন করেন। তিনি তথায় সম্মান ও সম্মতি অর্জ্জন করিয়া সুখে অবস্থিতি করেন, তাঁহার পুত্রের নাম রঘুপতি বিদ্যালঙ্কার, ইহার পুত্রগণ হইতেই এ বংশের বিস্তৃতি ঘটে।[৬] তন্মধ্যে রামনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

৬. ইহাব অধস্তন বংশাবলী এস্থলেই দেওয়া গেলঃ–



গ্রন্থকার রতিকান্ত

বিদ্যালঙ্কার দ্বিতীয় পুত্র রতিকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ চৌষট্টি বর্ষকাল পর্য্যন্ত অনন্যচিত্তে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, উপাধি প্রাপ্তে গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি "চতুর্দ্দশ পরগণার রাজপণ্ডিতি" ও "কৌশলের পণ্ডিতি" লাভ করেন।[৭] হিন্দুর দায়ভাগ সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে আদালতে তাঁহারই ব্যবস্থা প্রামাণ্য গণ্য হইত।

তিনি কল্যাপব্যাকরণের অমূল্যটীকা "সিদ্ধন্তচন্দ্র" নামক এক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, উহা এতদ্দেশীয় টোলে অধীত হইত।[৮] ইঁহার মৃত্যু এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, একদা তিনি সুস্থদেহ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, তদবস্থায় তদীয় ব্রহ্মরন্দ্র ভেদিত হইয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

সদর আমীন রাম রাম

প্রসিদ্ধ রাম রাম পণ্ডিত ইহার পুত্র; পিতৃবিয়োগের পর তিনি "কৌশলের পণ্ডিতি" প্রাপ্ত হন এবং তৎপর "সদর আমীন" নিযুক্ত হন। এই পদ বর্ত্তমান সবজজের তুল্য। অশীতি বৎসর পর্যন্ত রাজকার্য করিয়া তিনি পেন্সন গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীতে গমন করিয়া ছিলেন এবং তৎপরে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। তথায় তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হয়; তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে গঙ্গাতে নাভিজলে উপবেশন পূর্ব্বক জপমালা হাতে লইয়া জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে তনুত্যাগ করেন।

রামরামের সৌভাগ্য ও সম্মান তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রূপেশ্বরের কৃপায় হইয়াছিল। রূপেশ্বর যোগসিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন, রামরাম সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। মৃত্যুকালে রূপেশ্বর তাঁহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তিনি সামান্য চেষ্টা মাত্রে অগাধ বিদ্যার্জ্জনে সমর্থ হইবেন, তিনি ধনে মানে দেশ পূজ্য হইবেন। এই বর দানান্তে রূপেশ্বর সমাধি অবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

সভাবিজয়ী রামকিঙ্কর

রূপেশ্বরের প্রপৌত্র রামঙ্কির বিদ্যারত্ন। ইনি দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ "বিদ্যারত্ন" উপাধি প্রাপ্ত হন ও চন্দ্রনাথ তীর্থে গমন করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। এ সংবাদ প্রাপ্তে পিতা তথায় গিয়া পুত্রকে বাড়ীতে আনয়ন করেন। পরে কাশীবাস জন্য সপরিবারে কাশীতে গমন করিয়াছিলেন।

একদা কাশীধামে বুন্দিরাজ্যের অধীশ্বর রাজসিংহ আগমন পূর্ব্বক হিন্দুস্থানী পণ্ডিতবর্গকে বহুধন বিতরণ করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে কাশীতে ভাল পণ্ডিত নাই, এই এক ভ্রান্ত ধারণা কেহ রাজাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে কাশীতে তখন রামকিঙ্করই শ্রেষ্ঠ, কাশী প্রবাসী বঙ্গীয় পণ্ডিতমন্ডলী প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য ইঁহাকেই ধরিলেন।

বিদ্যারত্ন একটা শ্লোক রচনা করিয়া রাজসদনে প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিত-পালক রাজসিংহ

---

৭ "কৌশলে"-কৌন্সিলেব? কাছাড়ের দণ্ডবিধিব প্রতি প্রকরণের ভূমিকায় এই শব্দেব ভূরি প্রয়োগ সৃষ্ট হয। জয়ন্তীয়া প্রথম বন্দবস্তের কাগজপত্রেও এই শব্দেব ব্যবহার আছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডের স্থানে স্থানে ইহাব উল্লেখ আছে।

৮ এই টীকাব প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেনঃ–
"দুর্গোতি কঠিন্যতমঃ প্রভাবাৎ
সিদ্ধান্তরাত্রৌ নহি নির্গমঃস্যাৎ,
সিদ্ধান্তচন্দ্রং তদিহপ্রযুঙক্তে
সিদ্ধান্তবাগ্নী রতিকান্তশর্ম্মা।"

তৎপাঠে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তখন তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হন। একটি বাঙ্গালী পণ্ডিতকে সভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া পশ্চিমা পণ্ডিত বর্গ অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। কিন্তু যখন বিচার আরম্ভ হইল,—বলিতে আনন্দ হয়, সভা-সমাসীন সে সকল সুশিক্ষিত পণ্ডিতকে শ্রীহট্টের রামকিঙ্কর তখন অবলীলাক্রমে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর নাম রক্ষা করিয়া আসিলেন।[৯] পরাজিত পণ্ডিত মধ্যে অনেকেই তাহার পাণ্ডিত্যে এতাদৃশ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কাছে আসিয়া কেহ কেহ শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপ কাশীতে তাঁহার এক ক্ষুদ্র টোল স্থাপিত হয়। কাশীতে কিছুদিন অবস্থিতির পরে একদা শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাসী অবস্থায় নিশীরাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিদ্যারত্নের পুত্রের নাম রামরমণ, ইনি জ্যোতিষিক পণ্ডিত ছিলেন; নানাবিধ প্রয়োজনীয় "বচন" সংগ্রহক্রমে তিনি "জ্যোতিষ সার নির্ণয়" নামে গ্রন্থ সঙ্কলন দ্বারা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

রেঙ্গার ভরদ্বাজ

ভরদ্বাজ গোত্রীয় আর এক বংশীয় ব্রাহ্মণ রেঙ্গায় আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, আটপুরুষ পূর্ব্বে রামনাথ আসিয়া অবস্থিতি করেন; ইঁহার পুত্রের নাম রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যে, তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র হবিনাথ ভট্টাচার্য্য, ইঁহার পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ তর্কবাগীশ। তত্রত্য মোসলমান জমিদার বর্গ ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহাকে এক অধিকার পত্র দান করেন, তাহার বলে তিনি তথাকার হিন্দুসমাজে "রাজপণ্ডিতি" বিদায়ের অংশ পাওয়ার অধিকার লাভ করেন। নিম্নোদ্ধৃত এই দলিল হইতে ১৬০ বর্ষ পূর্ব্বকার ভাষা, লেখার ভঙ্গী এবং হিন্দুর সামাজিক বিষয়েও যে মোসলমান জমিদারবর্গের প্রভাব খাটিত তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।

অধিকার পত্র, যথাঃ—

"ই আদিকীর্দ্দ শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কবাগীস সদাসয়েষু লীখিতং শ্রী পরগণে রেঙ্গার জমিদারবর্গ কস্য পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাআগে—তুমি পছিম হনে ১ পড়িআ পণ্ডিত হৈআ তর্কবাগীশ উপাদ্ধি হৈআ ২ আসিয়া আমার দেশেত ৩ বান্ধিআ ৪ রহীছ ৫ এতেও তুমার মর্জ্জদা ৭ এই সকলে মীলিআ ৮ করিয়া দিলাম—

আমার দেশের শূদ্র লোক জে আছইন ৯ এরা ১০ শ্রাদ্ধ বিবাহ কর্ণবেদ আদি যে কর্ম্ম করিব সে পান ১১ দিতে রাজপণ্ডিতর ইখানে ১২ পান দিতে তুমার এক গাহা ১৩ পান গুআ ১৪ বার্ত্তন দিব ১৫—

আর শ্রাদ্ধ আমি কর্ম্মেত ১৬ রাজপণ্ডিতরে দিতে তোমার একদান পায় ১৭ দিব ১৮ এই মান্যতা তোমারে করিআ দিলাম এবে ১৯ না করে স্বগীয় শুভ না পায় এতদর্থে পত্র দিলাম। ইতি ১১৬০ সালে ১০ পৌষ।"[১০]

(উক্ত দলিলের পার্শ্বে "শ্রীমহাম্মদসফি, শ্রীজগন্নাথ দাস" প্রভৃতি আটটি দস্তখত আছে,

---

৯. এস্থলে বলা অসঙ্গত হইবে না যে স্বগীয় কাশীধামে বাঙ্গালীর সমাজে প্রায়শঃ শ্রীহট্টের পণ্ডিতবর্গেরই প্রাধান্য থাকিত। স্বগীয় কৃষ্ণহরি বিশারদ ও তৎপুত্র স্বগীয় গঙ্গাহার বিদ্যারত্ন এইরূপ শ্রেষ্ঠপদের শেষাধিকারী ছিলেন।

১০. শব্দার্থঃ-১. পশ্চিম হনে-পশ্চিম দেশ হইতে, ২. উপাদ্ধি হইআ-উপাধি পাইয়া, ৩. দেশেতে- দেশে, ৪. ঘরবান্ধিয়া-বাড়ী করিয়া, ৫. রহীছ-রহিয়াছ, ৬. এতে-ইহাতে, ৭. মর্জ্জদা-মর্য্যাদা, ৮. মীলিয়া-মিলিয়া, ৯. আছইন-আছেন, ১০. এরা-ইহারা, ১১. পান-নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরিত পাণ, ১২. ইখানে-এইখানে, ১৩. গাহা-১০ গুপারিতে ১ গাহা হয়, ১৪. পাণ গুয়া-পাণ সুপারি, ১৫. বার্ত্তনদিব-নিমন্ত্রণ দিবে, ১৬. কর্ম্মেত-কর্ম্মে, ১৭. একদান-একবিদায়, ১৮. দিব-দিবে, ১৯. এবে-ইহা।

এবং "উগাহী" শব্দের নীচে "শ্রীমছউদবখত" নাম লিখিত আছে।)

উক্ত রামকৃষ্ণের পুত্রের নাম রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র রতিনাথ বিশারদ, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণী নাথ জীবিত আছেন।

পরগণা–ঢাকাদক্ষিণ

রায়গড়ের সাম্প্রদায়িক বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের বিবরণ প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে বলা গিয়াছে যে ইটার রাজা সুবিধ নারায়ণের সময়ে এক সামাজিক বিবাদমূলে বৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ ঢাকাদক্ষিণ, লংলা ও তরফ প্রভৃতি পরগণায় গমন করেন। ঢাকাদক্ষিণে যিনি আগমন করেন, কথিত আছে তিনি প্রথমতঃ রণাডহর নামক স্থানবাসী ছিলেন, ইহার নাম কেশবমিশ্র,[১১] ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীবৎস ও তৎপুত্রের নাম পরমেশ্বর ছিল; পরমেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য কোন কারণে রণাডহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রায়গড় গ্রামে চলিয়া যান; তথায় ইহার বাসস্থান "ভটেরপাড়া" বলিয়া খ্যাত হয়। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী, তাঁহার রামকৃষ্ণ; কমলাকান্ত, গোবিন্দ, ও অনন্ত নামে চারিপুত্র হয়, ইহাদের বংশধরবর্গ সসম্মানে ঢাকাদক্ষিণে বাস করিতেছেন।

রামকৃষ্ণের কথা

গঙ্গারামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকৃষ্ণ তপোনিষ্ঠ ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন; তিনি মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে বহুদিন বাস করেন। কথিত আছে যে, একদা নবাব দরবারে উপস্থিত হইলে তপস্বী-বেশী রামকৃষ্ণকে নবাব তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট জামাতা বাঁচিয়া আছেন এবং কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করেন; রামকৃষ্ণ অঙ্কপাত করিয়া কিছুক্ষণ পরে উত্তর দেন যে তিনি অচিরাৎ আসিয়া পৌছিবেন। তাহার পরদিন জামাতা আসিয়া পৌছিলে, সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল এবং নবাব কর্তৃক শেষভাগে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, নবাব তাঁহাকে শ্রীহট্টের "পত্র-নবিশ" নিযুক্ত করেন, আদালতে হিন্দু আইন ঘটিত কোন উপস্থিত হইলে ইহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত। ইনি তাহার মীমাংসা পত্র প্রদান করিতেন, এবং তাহাই গ্রাহ্য হইত।

তপস্বী রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘবেন্দ্র সর্ব্বভৌম "পত্র নবিশ" পদ প্রাপ্ত হন, ইহার পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণও এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রাঘবেন্দ্র গুণী পুরুষ ছিলেন, মুর্শিদাবাদের নবাব হইতে বার্ষিক ৩৬৫ কাহন কোড়ি প্রাপ্তির সনদ তিনি লাভ করেন। ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য পিতার মৃত্যুর পর "পত্র-নবিশ" নিযুক্ত হন। ইহার পুত্রের মধ্যে রামকান্ত জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনি জয়ন্তীয়া-পতি হইতে বাইওঙ্গপুর মৌজায় ১০/০ হাল ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন ও এক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বংশাখ্যান

শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর পিতামহ রামকৃষ্ণের ন্যায় তপস্বী ছিলেন এবং পিতামহের ব্যবহৃত স্ফটিকমালা ধারণ করতঃ সাধন করিতেন। রামশঙ্করের দুইপুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ রামগোবিন্দ ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া হেড়ম্বেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের অন্যতম সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি কাছাড়রাজ হইতে অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়া শিবালয়

১১. পরিশিষ্ট ইহার বংশাবলী দেখ।

প্রভৃতি প্রস্তুত ও নৌকা পূজাদি[১২] সৎকার্য্য করেন।

রাম গোবিন্দের ভ্রাতুস্পুত্র রামগঙ্গা খুল্লতাতের চেষ্টায় মহারাজ গোবিন্দ নারায়ণের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। কাছাড়া রাজ্যের ধ্বংসের পর পেন্সন প্রাপ্ত রাণী ইন্দুপ্রভা তাঁহার কনিষ্ঠ হরপ্রসাদকে নিজ সভাসদ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাণী ইন্দুপ্রভা পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া ও রাজোচিত ভাবে থাকিতেন।[১৩]

কমলাকান্তের সন্তানগণ

পূর্ব্বোক্ত গঙ্গারামের দ্বিতীয়পুত্র কমলাকান্তের সাতপুত্র হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ। বাসুদেব একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, ইনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও পরম জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন; ইহার গুণে বিমোহিত হইয়া শ্রীহট্টের নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর তাঁহাকে "জনাবদার" উপাধির সহিত ৮/০ হাল পরিমিত ভূমি দেবত্র দান করেন। এই ৮/০ হাল ভূমি মধ্যে দেব্যর্চ্চনায় দ্রব্যাদি ক্রয় জন্য ৪/০ হালের উপসত্ত্ব এবং নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ৪/০ হালের আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সনদে প্রাপককে "জরিবানা" "তীরমারা" ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[১৪] ইহাতে বোধহয় যে কোন কোন স্থলে প্রাপকবর্গকে এ সকল উৎপাত ভোগ করিতে

১২. নৌকাপূজা শ্রীহট্ট অঞ্চলের একটা আড়ম্বরপূর্ণ পূজানুষ্ঠান, ইহার বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগে ৮ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

১৩. "ঐতিহাসিক চিত্র" পত্রিকা ১৩১৮ সাল-আশ্বিন-কার্ত্তিকের যুগ্মসংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "রাণী ইন্দুপ্রভা" প্রস্তাবে ইহার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

১৪. উক্ত সনন্দে এই লিখিত আছে, যথা–

সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গয়রহ পরগণার মৎসুদ্দিগণ, চৌধুরীবর্গ ও কানুনগো সকল জ্ঞাত হইবেন যে প্রার্থী বাসুদেব ভট্টকে ৮/০ হাল জমি খারিজ-জমা করিয়া দেওয়া গেল। পরগণা মজকুরের মৌজাজাত হইতে পূজার সরঞ্জাম খরচ ও সেই জনাবদার পূজারীর খুরাখি খরচের জন্য ইহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, অতএব জনাবদার পূজারী ইহাতে, পূজার সরঞ্জাম ও নিজের খরচের জন্য ব্যয় করিতে থাকে। কোন বিষয় জরিপ, জরিবানা শিকার, তীরমারা ইত্যাদি কষ্টকর বিষয় গয়রহ দেওয়া হইবে না। বৎসর নূতন সনদ তখন করা না হয়, ইহা তাগিদ জানিবা।১২ রবিয়সসানি ৮ জলুস।

উক্ত সনন্দে পৃষ্ট লিপিতে লিখিত যথাঃ–

মোং ৮/০ হাল জমি খারিজ জমা, যাহা বাসুদেবভট্ট ও তাঁহার পিতার খরিদ মধ্যে পরিগণিত, ইহা ঐ পূজারী জনাবদারের নিজ খরচ বাবত ও পূজার সরঞ্জাম ক্রয় বাবত বহাল করা গেল। মোং ৮/০ হাল। তন্মধ্যে পূজার সরঞ্জাম ৪/০ হাল, নিজের খরচের ৪/০ হাল, মোট তপসিলঃ–পং বাহাদুরপুর ৪।১, পং ঢাকাদক্ষিণ ১/০, পং পঞ্চখণ্ড ১, নেগাল ১৷২, মোট ৮/০ হাল।

এস্থলে "পূজারী" শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। সনন্দে জনাবদার উপাধি প্রাপ্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় বাসুদেব ভট্টাচার্য্যকে পূজারী শব্দে সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। অধুনা কোন কোন স্থলে বেতনভোগী দেবপূজকের-প্রতি পূজারী শব্দ প্রযোজ্য হইতে দেখা যায়; পূর্ব্বে এই শব্দ হীনার্থক ছিল না, প্রকৃতিবোধাদিতে ইহার পুরোহিত অর্থ দৃষ্ট হয়; আসামের কোন কোন স্থানে পুরোহিত অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোসলমান আমলে রাজকর্ম্মচারিবর্গ দেবসেবার অধ্যক্ষদিগকে পূজারী বলিয়া লিখিতেন। আমরা সাধুহাটীর গঙ্গারাম শিরোমণির বৃত্তির কাগজেও "পূজারী" শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। বস্তুতঃ "পূজারী" শব্দ যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ব্যবহৃত হইত, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত "পূজারী গোস্বামী" ইত্যাদি উপাধি হইতেও তাহা জানা যায়। বেতনভোগী দেবপূজকেরা "দেবল" শব্দে কথিত হওয়া দৃষ্ট হয়। দেবলদের নামে কোথায় কোন সনন্দ দৃষ্ট হয় না। "পূজারী" শব্দ মোসলমান আমলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, ইংরেজ আমলের প্রথমেও সেরেস্তার কাগজপত্রে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাধ্যায়ে ঢাকা দক্ষিণের রামগতি মিশ্রের পেন্সন মঞ্জুরীর কাগজে তাহা দৃষ্ট হইবে। উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহাকেই পূজারী হইয়াছে। উত্তরাধিকারীর নামে কৌলিক উপাধি লিখা আছে। আমরা আর একখানা অনেক গোসইকে পূজারী বলা হইয়াছে। পাইয়াছি, উক্ত সনন্দের নং ৪৩২ প্রাপক-গোসাই পূজারী কসবে শ্রীহট্ট দাতা নবাব শুকুরুল্লা খাঁ; দেবত্র ইসাকপুরে-৫।২৷১ ভূমিমাত্র।

হইত এবং প্রতিবৎসর তাঁহাদের সনন্দ "তলব" করা হইত।

বাসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভবদেব পঞ্চানন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নবাব নুরউদ্দীন খাঁ বাহাদুরের মোহরাঙ্কিত সনন্দে তিনি আজমিরীগঞ্জ হইতে দৈনিক একপণ কৌড়ি প্রাপ্ত হইতেন।

ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র ন্যায়লঙ্কারও জ্যেষ্ঠের ন্যায়ই যশস্বী ছিলেন; তিনি "আখ্যাতবাদ" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ন্যায় দর্শনের এক সুন্দর ব্যাখ্যা রচনা করিতে আরম্ভ করেন, উহা পূর্ণ হয় নাই। আংশিকভাবে অদ্যাপি রহিয়াছে।

ভবদেবের চারি পুত্র হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামগোবিন্দ অনুজ বিশ্বনাথের সহিত নহাই গ্রামে গিয়া বাস করেন; ১১৯১ বাং ১৫ই চৈত্র তারিখের সম্পাদিত এবং দলির্ল বলে সরকার বাহাদুর হইতে তিনি বাৎসরিক একপালি পরিমিত ধান্য পাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন।

ভবদেবের তৃতীয় পুত্র কালী চরণ তর্কবাগীশ ন্যায়শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন। তৎকৃত "দায়াদর্শ" ও "ভক্তিবাদ" গ্রন্থদ্বয় অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। কালীচরণের পুত্র ত্রিপুরা নাথ তর্কোপাধ্যায় বিরচিত "জপরহস্য" ও "মহিম্নস্তরব্যাখ্যা" তদীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে বিদ্যমান আছে। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অবন্তীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় হইতে আমরা এই বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

রঘুদেব ও তৎপুত্রগণ

কমলাকান্তের চতুর্থ পুত্র রঘুদেব, ইহার কৃত ন্যায় শাস্ত্রের কয়েক খানা "পাতুড়া" আছে, ইনি গীতা পাঠ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্রই উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। ইহাদের নাম—হরিরাম বিশারদ, রাম রাম সর্ব্বভৌম; রুদ্ররাম বাচস্পতি এবং রতিরাম তর্কালঙ্কার। তন্মধ্যে বিশারদ হেড়েম্বেশ্বর হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের সভাসদ্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও হরিটিকরে রাজদত্ত ১০/ হাল ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র রূপরাম ভট্টাচার্য্যও জয়ন্তীয়া-পতির দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত হন; ইহার কনিষ্ঠ পুত্র বিদ্যানন্দ ন্যায় বাগীশ ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন ও জনৈক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাপগ্রস্ত হন; কথিত আছে তাহার পরই তদীয় মৃত্যু হয়। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় বর্ত্তমান আছেন।

কানিশালির মৌদ্‌গুল্যগণ

ঢাকাদক্ষিণের কানিশালি গ্রামে মৌদ্‌গুল্য গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকগণের বাস। মৌদ্‌গুল্য গোত্রের প্রথমাগত মহাত্মার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। এই বংশে অনেক প্রধান ব্যক্তির উদ্ভব হয়। মৌদ্‌গুল্য গোত্রীয় কানিশালির রতিরাম বিশারদের নামীয় সনন্দ শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নবাব হাজি হুসেন খাঁ বাহাদুর আরাঙ্গাবাদ ও ভাদেশ্বর হইতে তাঁহাকে ১৫৮০ ভূমি ব্রহ্মত্র দান করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ঐ ভূমি তছরূপ করেন। নবাব অইলওর খাঁ বাহাদুর তৎপূর্ব্বে ঢাকাদক্ষিণ হইতে তাঁহাকে ৪৷৷১ ৬৷৷০ ভূমি ব্রহ্মত্র দান করিয়াছিলেন।

এ বংশে রূপেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, গণেশ্বর শিরোমণি, প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন। গণেশ্বর পাণ্ডিত্যগুণে নবদ্বীপে "পার্ব্বতী পুত্র গণেশ" নামে খ্যাত ছিলেন। ইনিও ভিন্ন ভিন্ন সনন্দে অনেক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এবংশীয় রাঘব রাম ভট্টাচার্য্যের নামেও নবাব হাজি হুসেনের প্রদত্ত ভূমিদানে সনন্দ আছে। তাহাতে রাঘবের পুত্রের নাম রত্নবল্লভ ছিল

বলিয়া পাওয়া যায়।

এবংশে কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন; তিনি নবদ্বীপে এক চতুষ্পাঠী স্থান করেন; প্রখ্যাত নামা শ্রীরাম শিরোমণি তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অনেক দিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবংশে বাণী নাথ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে একজন খ্যাতিমান্ পণ্ডিত ছিলেন; এবং শম্ভুনাথ ন্যায়রত্ন ন্যায় শাস্ত্র ও জ্যোতিষের আলোচনা করিয়া স্ববংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

কানিশালি গ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের এক বংশ ছিল, সে বংশেও অনেক প্রধান পুরুষের উদ্ভব হয়, বর্ত্তমানে ঐ বংশ বিলুপ্ত প্রায়।

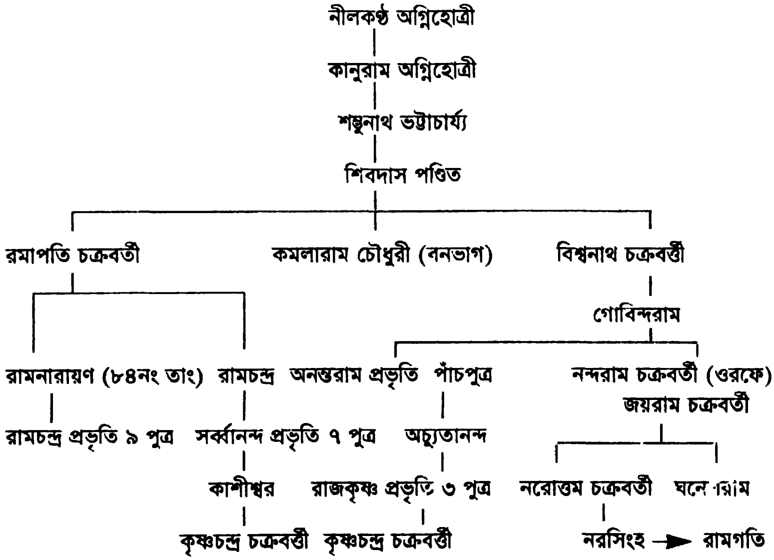
এই ঢাকাদক্ষিণে বাণীনাথ বিদ্যাসাগর কাতন্তের বিদ্যাসাগরী টীকা লিখে তাঁহার বংশীয়গণ আজিও "সাগরের বংশ" নামে পরিচিত। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর ও বিদ্যাসাগর উপাধি ছিল, এবং তৎকৃত ব্যাকরণের টীকাও "বিদ্যাসাগরীটীকা" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সে প্রসঙ্গে উপসংহারে কথিত হইবে।

অগ্নিহোত্রী বংশ

পং ঢাকাদক্ষিণের নিজ ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে চক্রবর্ত্তী বংশের বাস; ইঁহারা ফুলিয়া মেলের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বীজী পুরুষের নাম নীলকণ্ঠ অগ্নিহোত্রী। শ্রীহট্টের দস্তিদার বংশের আদিপুরুষ কবি বল্লভ রায় এই বংশের যজমান ছিলেন। তদবধি ইঁহার দস্তিদার বংশের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। নীলকণ্ঠের পূজিত গোপীনাথ বিগ্রহ এইবংশের ইষ্ট দেবতা ছিলেন, ঐ সেবা নির্ব্বাহের জন্য নবাব হরকিষূণ মনসুর উল মুল্ক বাহাদুর এক সনন্দে (নং ৩৫৪) পং ঢাকাদক্ষিণ ও পঞ্চখণ্ড হইতে এই বংশীয় জয়রাম পূজারী ও নরোত্তম পূজারী নামে ৬॥২॥৪৸ভূমি দেবত্র ছিলেন।[১৫] জয়রাম ও নরোত্তম পিতাপুত্র ছিলেন।[১৬] ১১৯১ সালে

১৫. দেব-সেবার অধ্যক্ষ বাচক পূজারী শব্দ সম্পর্কে পূর্ব্বটীকা দ্রষ্টব্য।

১৬. ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা এইঃ-



জয়রামের মৃত্যু হয় এবং ১১৯৩ সালে নরোত্তমেরও মৃত্যু হয়; নরোত্তমের পর গোপীনাথ বিগ্রহ জনৈক সন্ন্যাসীকে প্রদত্ত হয়।

পালপাড়ার বংশ

ঢাকাদক্ষিণের পালপাড়া গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় এক বংশ ব্রাহ্মণ আছেন, ইঁহাদের উপাধি লস্কর। "লস্কর" সৈনিকদের একটি পদ। এই উপাধি দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ পূর্ব্বে শ্রীহট্টের নবাবি সৈন্য-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। এবংশে উদয়নারায়ণ ও জয়শঙ্কর শেষ সৈনিক কর্ম্মচারী। উদয়নারায়ণের প্রপৌত্র লংলা পরগণাস্থ কুলাউড়া গ্রামে বর্ত্তমানে বাস করিতেছেন।[১৭] শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও বহুতর বীরবংশ ছিল, লস্কর বংশই তাহার উদাহরণ। লংলা পরগণার ৪৬৩নং তালুক উদয় নারায়ণের নামে নামান্বিত হইয়াছে।

সাবর্ণ গোত্র

সাবর্ণ গোত্রীয় প্রাচীন এক ব্রাহ্মণ বংশ ঢাকাদক্ষিণের ব্রহ্মপুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। দত্তরালি ও কানিশালির সন্নিকটে ঐ গ্রাম এখন জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু অশীতি বৎসর পূর্ব্বে উহা একটি ব্রাহ্মণ বসতি ছিল। তারা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক সামবেদী সাবর্ণ গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ কোন কারণে স্বদেশ বরিশাল ত্যাগ করিয়া এ স্থানে আগমন করেন, তিনি নিজ জন্মস্থানের স্মরণে ঢাকাদক্ষিণে আপন বসতি স্থানকে ব্রহ্মপুর নামে সংজ্ঞিত করেন বলিয়া কথিত আছে। আরও কথিত আছে যে নবাব হইতে তিনি ধরাধর খ্যাতিতে পরিচিত হইয়াছিলেন; ইঁহার বংশধরবর্গ এখন ঢাকাদক্ষিণবাসী।

১৭. উদয় নারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ চক্রবর্ত্তী আমাদিগকে যে উদয় নারায়ণে বর্ম্ম ও তরবারি তাঁহারা পাইয়াছেন এবং তাঁহার নামের মোহরাঙ্কিত কাগজও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়
বনভাগ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ বিবরণ

পরগণা-বনভাগ

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের আদি স্থান পঞ্চখণ্ড। পঞ্চখণ্ড হইতে প্রথমতঃ ইটা ও তৎপর ঢাকাদক্ষিণ, লংলা, প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁহাদের বিস্তৃতি ঘটে। যখন ইটার রাজা সুবিদনারায়ণ নিহত হন এবং তাঁহার পুত্রগণকে জাত্যন্তরিত করা হয়[১] তখন যে কেবল রাজভ্রাতৃগণ প্রাণ ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তাহা নহে; আরও অনেকেই ভীত হইয়া দেশত্যাগ স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। মৈথিল্য বিপ্রবর শ্রীপতির বংশজাত বিজয়রাম উপাধ্যায় তন্মধ্যে একজন।

স্বশিষ্য উপাধ্যায়ের স্বস্থান ত্যাগ

বিজয় রাম উপাধ্যায়ের এক বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বিধর খাঁ। পূর্ব্বে হিন্দুগণকেও "খান" উপাধি দেওয়া যাইত।[২] ইটার বীভৎস কাণ্ড দর্শনে এই গুরুশিষ্যে মন্ত্রণা করিয়া দেশ পরিত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহারা অচিরেই তরণী আরোহণে সপরিকর ও সানুচর সে দেশ ত্যাগ করিলেন। কোথায় যাইবেন স্থির নাই, কাপনা নামক নদী দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহারা এক অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল, তখন সেই বনের মধ্যেই কিয়ৎ পরিমিত স্থান পরিষ্কৃত করিয়া তাঁহারা পাকাদি সম্পাদনান্তর আহারাদির পর সেই বনেই নিশা যাপন করিলেন। পরে উপাধ্যায়ের প্রস্তাবে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন, সাব্যস্থ হইল।

পরদিন নিকটেই যেন মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল। সেই ধ্বনি লক্ষ্যে অনুসন্ধানে তাঁহারা কয়েক ঘর মনুষ্য দেখিতে পাইলেন, দস্যুবৃত্তিই তাহাদের উপজীবিকার উপায়। বিধরের (নামন্তর ধরানন্দের) বৃহৎ দল বল দৃষ্টে সেই বন্য দস্যুদল ভীত হইল ও সে স্থান ত্যাগ করিল। বিধরের লোকজন সেই বন-ভাগ ক্রমশঃ আবাদ ক্রমে "বনভাগ" নামে অভিহিত করিল। বিধর কাপনা নদীর যে স্থানে নৌকা সংলগ্ন করিয়া তীরে উঠিয়াছিলেন, তাহা তদবধি "বিধর ঘাট" নামে খ্যাত হয়। সে স্থানে দস্যুগণ বাস করিত, দস্যুসর্দ্দার জুলার নামানুসারে এ যাবৎ সে ভূখণ্ড "জুলার চিরি" নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

উপাধ্যায়ের বংশ বিস্তার

বিজয় উপাধ্যায়ের দুই পুত্র-বলদেব ও হরিদেব। ইঁহাদের উপনয়ন কাল উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ-শাসন নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণকান্তকে বহু আয়াসে আনয়ন করিয়া, উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। উক্ত বলদেবের বংশে পরে গোপীনাথ বাচস্পতি এবং হরিহরের বংশে নিত্যানন্দ

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায় দেখ।
২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে ইঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে

সার্ব্বভৌম জন্ম গ্রহণ করেন; ইঁহাদের উভয়েরই নামে তালুক আছে। গোপীনাথের তিন পুত্র,—বিশ্বনাথ, শিবনাথ ও গঙ্গাহরি। তন্মধ্যে শিবনাথের হৃষীকেশ ও জগদীশ (অপর নাম কৃষ্ণানন্দ) নামে দুই পুত্র হয়। জগদীশ স্বীয় গুণে স্থানীয় নবাব হইতে দৈনিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইঁহার পুত্র জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (অপর নাম কেশব) দৈনিক বৃত্তি অনেক দিন ভোগ করিয়া ছিলেন।

হৃষিকেশের পুত্রের নাম চণ্ডীপ্রসাদ বিদ্যারত্ন, ইনিও স্থানীয় জমিদার হইতে কতক ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই "চণ্ডী পণ্ডিত ছেগা" নামে খ্যাত হয়। নিত্যানন্দের বংশোদ্ভব রাজীব লোচন তর্কবাগীশ জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া পরে ধর্ম্মদা গ্রামবাসী হন।

বিবিধ বংশোল্লেখ

বনভাগের সমস্ত ব্রাহ্মণ কেবল এই বংশীয় নহেন। প্রসিদ্ধ নিধিপতি বংশীয়[৩] কেহ উপাধ্যায় বংশের পরে বনভাগের দণ্ডপাণিপুরে আগমন করেন; কথিত আছে যে বন্য পশুর উপদ্রব নিবারণার্থে ইঁহারা সর্ব্বদা হস্তে দণ্ড ধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের বাসস্থান উক্ত নামে আখ্যাত হয়। কেহ কেহ তৎপরে তথা হইতে কালীজুরী গমন করেন, ইঁহারা ভূম্যধিকারী। তন্মধ্যে কালীজুরী বাসী ব্রাহ্মণবর্গ চৌধুরী এবং দণ্ডপাণিপুরে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা পুরকায়স্থ পদবি বিশিষ্ট। ইঁহাদেরই স্বগোত্রীয় এক বংশ মৌজপুরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা বনভাগ পরগণার জমিদার। এ বংশেও কেহ কেহ চৌধুরী এবং কেহ কেহ বা পুরকায়স্থ্ তন্মোধ্যে দুর্গাদাস চৌধুরী বিশেষ ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাহা হইতে অনেকেই নানাবিধ বৃত্তি ইত্যাদিতে পুরস্কৃত হন। দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের সম্যক্ বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

কাশ্যপ গোত্রীয় ভট্টাচার্য্য বংশ

কালীজুরী হইতে নিধিপতি বংশীয় যিনি মৌজপুরে গমন করেন, তাঁহার নাম যশোমন্ত। ঐ সময় তথায় ব্রাহ্মণ বসতি না থাকায় প্রথমতঃ তিনি ডলার কাশ্যপ গোত্রীয় ভবদেব ভট্টাচার্য্যকে সেইস্থানে আনয়ন করিতে বিশেষ উদ্যোগী হন। তাঁহার চেষ্টায় ভবদেব এই স্থানে আগমন করিয়া প্রভূত সম্মান সহকারে বাস করিতে থাকেন। "ভবদেব" স্বগীয় শিবের নামান্তর বিধায়, ভবদেবের বাসভূমি আমুগাও তদীয় সম্মাননার জন্য "কাশীপুর" বলিয়া খ্যাত। এবং তথাকার প্রধান ব্যক্তিবর্গ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। কালক্রমে ইঁহার বংশবৃদ্ধি হয় এবং তাঁহারা তথাকার আদিভট্টাচার্য্যবংশ বলিয়া খ্যাত হন।

ভবদেবের চারিপুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলদেব ও কনিষ্ঠ পুরুষোত্তম বংশ প্রবর্ত্তক।[৪] কিন্তু কালক্রমে পুরুষোত্তমের বংশধরগণ পৈতৃক বিষয় ভ্রষ্ট হইয়া দীনদশায় পতিত হন। পরে পুরুষোত্তমের ষষ্ঠ পুরুষ নন্দীশ্বর জ্ঞাতিগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া যাজনিক কার্য্যের শিকি অংশ প্রাপ্ত হন।

ভবদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলদেব পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্র কামদেব তৎপুত্র কামদেব নামান্তর দুর্গাচরণ, তৎপুত্র হরিচরণ, ইঁহার রতিপতি ও রামভদ্র নামে দুইপুত্র হয়। তন্মধ্যে রতিপতির পুত্র কৃষ্ণরাম বাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। মিথিলার রাজসভায় গমন

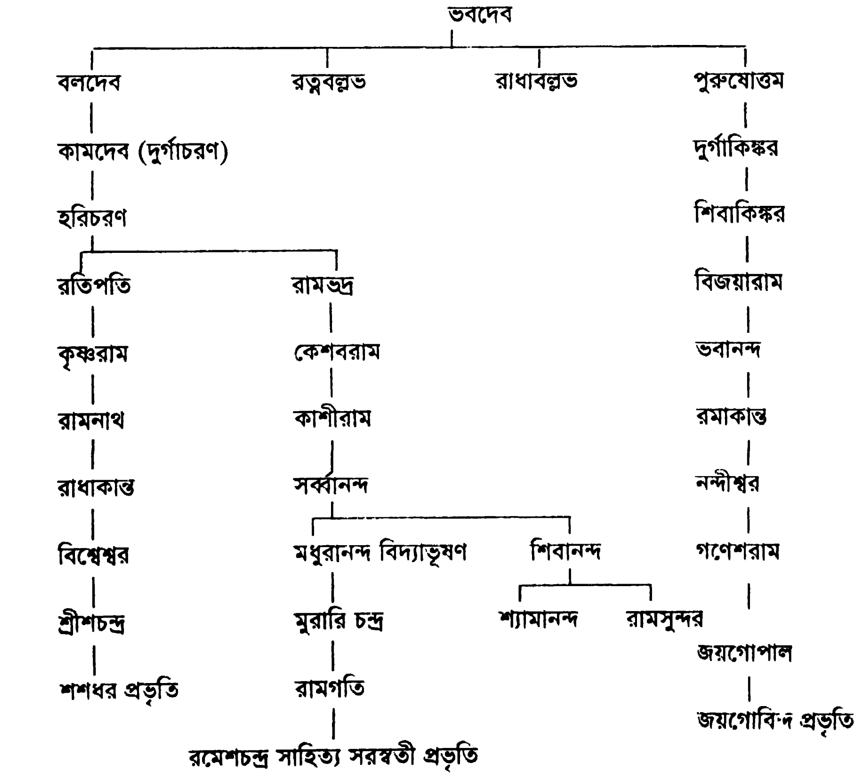
৩. নিধিপতির বিস্তৃত বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে দ্রষ্টব্য।
৪. ইহদের সংক্ষিপ্ত ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা এই–

করিয়াছিলেন ও তত্রত্য সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাভূত করতঃ রাজকর্তৃক পুরস্কৃত হন। পুরস্কার প্রাপ্ত সেই বিত্তসহ দেশে প্রত্যাগমনকালে পথে তিনি দস্যুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

রাম ভদ্রের পুত্রের নাম কেশব রাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র মথুরানাথ বিদ্যাভূষণ। বিদ্যা—প্রেমিক তপস্বিগণের মধ্যে ইঁহার নাম স্মরণীয়। ইনি বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে বাল্যকালে দেশ পরিত্যাগ করেন ও নবদ্বীপ মিথিলা, ও কাশীতে যথাক্রমে জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি ভ্রাতা অনুসন্ধান করিতে করিতে কাশীতে অধ্যয়ন নিরত মথুরানাথকে প্রাপ্ত হইয়া দেশে লইয়া আসেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর। দেশে আসিলে সকলেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন; অনুরোধে পঞ্চষষ্টি বর্ষীয় বৃদ্ধ বিবাহ করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে অচিরেই তাঁহার একটি পুত্র হয়, ছয় মাসের সেই শিশু পুত্র রাখিয়া বিদ্যাভূষণ মানবলীলা সংবরণ করেন। এই পুত্র ব্যতীত বিদ্যাভূষণ এক খানা সংস্কৃত কাব্য রূপ এক মানস পুত্রও রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, ঐ কাব্যের নাম আমরা অবগত হইতে পারি নাই। বিদ্যাভূষণের প্রপৌত্র হইতে আমরা এই বংশবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিদ্যাবিনোদের বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে—পূর্ব্বাংশে নিধিপতির পুরোহিত বাৎস্য গোত্রীয় বিদ্যাবিনোদের নামোল্লেখ করা গিয়াছে।[5] বিদ্যাবিনোদের প্রকৃত নাম হৃষীকেশ, কিন্তু তাঁহার উপাধিতেই তিনি



সুপরিচিত। বিদ্যাবিনোদ তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মন্ত্রকোষ ও তন্ত্র চূড়ামনি নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে; ইঁহার মাহাত্মে মুগ্ধ হইয়া ইটা-পতি নিধিপতি তাঁহার কাছে মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং নিকটেই গুরুকে কতক ভূমি দিয়া স্থাপন করেন, গুরুগৃহ বা গুরুঘর হইতে উক্ত স্থান গয়ঘর নামে খ্যাত হয়।

বিদ্যাবিনোদের পুত্রের নাম জনার্দ্দন, তৎপুত্র জগদীশ, তাঁহার পুত্র ধরাধর, তৎপুত্র পশুপতি, তৎপুত্র নরোত্তম, তৎপুত্র গিরিধারী, ইঁহার পুত্র হলায়ুধ, তাঁহার পুত্রের নাম নিশাকর, নিশাকরের পুত্রের নাম কংসনারায়ণ, ইনি ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের সমসাময়িক।[৬]

এক সামাজিক বিষয়ে রাজা সুবিদনারায়ণের সহিত ব্রাহ্মণগণের দ্বিমত ঘটে, ইহাতে অনেক ব্রাহ্মণ দেশত্যাগী হন; কংসনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সেই সময়েই বনভাগ গমন করেন। কংসনারায়ণও রাজসন্নিধানে থাকা অবৈধ বোধে এই সময় ইটা হইতে চৌয়ালিশ গমন করেন। চৌয়ালিশের গুপ্ত ও দত্ত বংশীয় তদীয় শিষ্যবর্গ ইহাতে আনন্দিত হইয়া মনুতীরে তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন; পূর্ব্বস্থানের নামানুসারে এই স্থানও গয়ঘর বলিয়া খ্যাত হয়।

কংস নারায়ণের পুত্রের নাম সদাশিব, তৎপুত্র জানকী বল্লভ, তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জগদীশ। এই শাখা তথা হইতে লক্ষ্মীপুর আগমন করেন, এবং তাহা হইতে অন্যশাখা মদনপুর ও কালীজুরী বাসী হন।

জগদীশের পুত্র পশুপতি, তৎপুত্র রাম গোবিন্দ, তাঁহার পুত্র রামগতি, ইঁহার পুত্র রাম গোপাল ন্যায়পঞ্চানন এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুটিয়া রাজ্যের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। "কাল নির্ণয়", "প্রায়শ্চিত নির্ণয়", "অশৌচ নির্ণয়", "প্রেতাধিকারী নির্ণয়", "সম্বন্ধ নির্ণয়" প্রভৃতি স্মৃতি নিবন্ধ প্রণয়ন পূর্ব্বক তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। রাম গোপালের পুত্র রামবল্লভ, তৎপুত্র রঘুদেব কাশী-বাসী হন; ইঁহার তিন পুত্র-কাশীরাম বিদ্যালঙ্কার, রূপরাম সর্ব্বভৌম ও রাধাকান্ত শিরোমণি; ইঁহারাও কাশীধামে ছিলেন; কাশীস্থ বাঙ্গালী পণ্ডিত সমাজে তাঁহাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

নাটোরের সুবিখ্যাতা মহারাণী ভবানী স্বগীয় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে এক মঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কাশীতে "ভবানীশ্বর" শিব স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। উক্ত মন্দির গাত্রে যে শ্লোকদ্বয় খোদিত হয়, তাহার প্রথম শ্লোকটি রূপরাম সর্ব্বভৌম কৃত,[৭] শ্লোকটি এই ঃ—

"গৌড় বারেন্দ্র ভূমীন্দ্র রামকান্তস্য ভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বর মন্দিরম্॥"

অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভবানী, সার্ব্বভৌমের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় শ্রীহট্ট দেশীয় দেওয়ান রামভদ্র[৮] কাশীতে ছিলেন, তিনি স্বদেশী পণ্ডিতত্রয়কে দেশে আনিতে যত্ন করেন ও মহারাণীর কাছে সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। মহারাণী বিদ্যালঙ্কার ও সার্ব্বভৌমকে দেশে যাইতে অনুমতি দেন, কিন্তু কনিষ্ঠ শিরোমণিকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরস্থ বরনগরে গমন করেন; শিরোমণি মহারাণীর বৃত্তিভোগী হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

---

৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম অধ্যায় দেখ।

৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে ইঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

৭. কেহ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ইটার কাছাড়ী গ্রামবাসী মুকুন্দ বিশারদ এই শ্লোক রচিতা; সে কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না।

রামভদ্র দেওয়ান, বিদ্যারত্ন ও সার্ব্বভৌম সহ দেশে আসিয়া, শ্রীহট্টের নবাব হইতে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মত্র দেওয়াইয়া গোধরালিতে স্থাপন করেন; ইঁহারা যে স্থানে বাস করেন, সে স্থান "ভটের গাও" নামে খ্যাত হয়। কিন্তু এই স্থানে ইঁহারা স্থায়ী হন নাই, কোন কারণে রূপরাম জানাইয়া গ্রামে চলিয়া যান।

রূপরাম সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামনাথ, তৎপুত্র রামশঙ্কর, তাঁহার পুত্র জগন্নাথ; জগন্নাথের পুত্রের নাম কূলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ। ন্যায়বাগীশের পুত্র শ্রীযুক্ত করুণাময় বিদ্যানিধি হইতে আমরা এই বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি।

এ বংশের জনৈক পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ্মীপুর হইতে আসিয়া কৌড়িয়ার মদনপুরবাসী হন, তদ্বংশে শুকদেব ভট্টাচার্য্য নামে একব্যক্তি ছিলেন, ইনি কালীজুরী আগমন করেন, ইঁহার পুত্র শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি ত্রিপুরার মহারাজের পক্ষে তিন মাস কালব্যাপী এক স্বস্ত্যয়ন করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন।[৯]

খালিসা বনভাগের চৌধুরী বংশ

খালিসা বনভাগের ব্রাহ্মণ চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ দুর্ল্লভরাম পণ্ডিত বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীরামের পুত্র রঘুদেব, তৎপুত্র রামজীবন; ইনিই চৌধুরাই সনন্দ লাভ করিয়া খালিসা বনভাগের কতকাংশ প্রাপ্ত হন; ইঁহার সপ্তম পুরুষে রাম শঙ্কর চৌধুরীর উদ্ভব হয়, রাম শঙ্কর একজন প্রতাপশালী মিরাশদার ছিলেন; যত কেন ক্ষমতাশীলী হউক না, অন্যায় ব্যবহার করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন ও প্রায়শঃ কৃতকার্য্য হইতেন; তাঁহার ভয়ে সহজে কেহ অন্যায় করিত না; ইঁহার প্রপৌত্র জীবিত আছেন।

ব্রাহ্মণ শাসনের ভট্টাচার্য্য বংশ

ব্রাহ্মণ শাসনের ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ প্রায় ৭/৮ পুরুষ পূর্ব্বে সে স্থান বাসী হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আদিশূরের আনীত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভব বরাহভট্ট এই বংশের আদি পুরুষ ছিলেন; তাঁহার বংশীয় রঘুনন্দন মিশ্র পূর্ব্বে বরশালায় ছিলেন, তথা হইতে তিনি এ স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এক খানা দলিল হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি পরগণা খিত্তা প্রভৃতি স্থানের রাজপণ্ডিতি পাইয়াছিলেন। রঘুনন্দের পুত্র রামনাথ পিতার মৃত্যুর পর রাজপণ্ডিতি নিযুক্ত হন। রাজপণ্ডিতি দলিল হইতে জানা যায় যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ রাজপণ্ডিতি প্রাপ্ত হন, তৎপর তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে; কিন্তু ইঁহার বয়ঃক্রম অল্প ছিল বলিয়া রামভদ্র রাজপণ্ডিতির দখলকার হন; শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হরিশঙ্কর কার্য্যদক্ষ হইলে, পৈতৃক অধিকার লাভে সমর্থ হন।[১০] এই দলিলে দৃষ্ট হয় যে, ইঁহারা ৪৪ পরগণার রাজপণ্ডিতি পাইয়াছিলেন; ঈদৃশ সম্মান যে একরূপ দুর্লভ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এ বংশে[১১] মুকুন্দ রাম, হরিশঙ্কর বিদ্যালঙ্কার, গণেশ্বর শিরোমণি, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রতি অতি সম্মানিত প্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে গণেশ্বর বা গণেশ শিরোমণি অনেকগুলি সনন্দ প্রাপ্ত

৮. রামভদ্র দেওয়ানের বংশে দিগলী মৌজায় শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দাস মোক্তার মহাশয় বর্ত্তমান আছেন।

৯. বিদ্যাবিনোদ বংশের অপর এক শাখা লক্ষ্মীপুর হইতে পং ডেওয়াদিতে গমন করেন, দ্বিতীয় খণ্ডে তদ্বিবরণ কথিত হইবে।

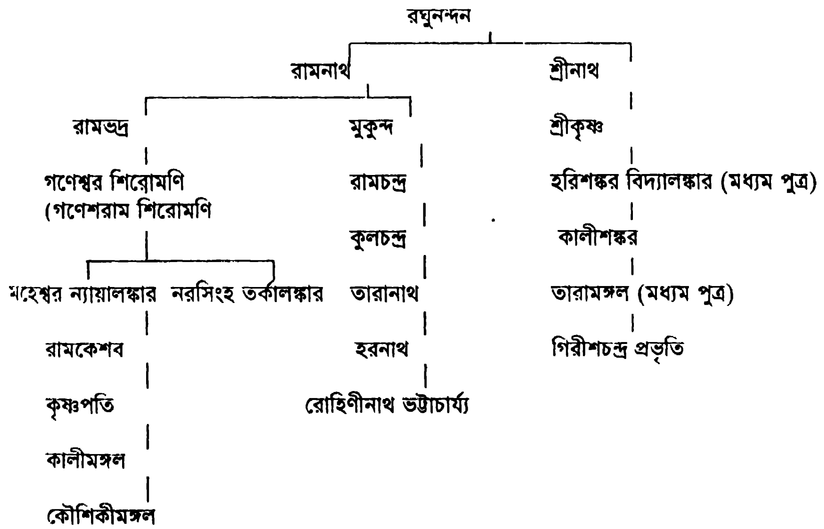
১০. মূল পারস্য দলিলের নিম্নভাগে বঙ্গাক্ষরে তাহার অনুবাদও লিপিবদ্ধ আছে; যে যে স্থান পাঠ করা যায় নাই, x চিহ্ন তথায় সন্নিবেশিত করিয়া উহা উদ্ধৃত করা গেল–

হইয়াছিলেন। একখানি সনন্দে (নং ২৮৬) দৃষ্ট হয় যে, নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর ৫ জুলুসে কজাকাবাদ হইতে তাঁহাকে ৬/৷৩৷৷ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করেন। আর একখানি সনন্দে (নং ৩০০) নবাব বিকুখাঁ বাহাদুর পং কৌড়িয়া হইতে তাঁহাকে ১৪৸০৷৷৩৲ভূমি দান করেন। সনন্দগুলির মন্তব্যে লিখিত আছে যে, ১১৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নরসিংহ তর্কালঙ্কার উক্ত ভূমি তছরূপ করেন। রাজপণ্ডিত হরিশঙ্করের নামেও সনন্দ আছে; নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উল-মুল্‌ক ৩ জলুসে একখানা সনন্দে (১০৪২) পং কৌড়িয়া হইতে তাঁহাকে ২৩/১৷৷৬৷৷ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

সতী—এ বংশে একজন সতীর পুন্যকীর্ত্তি পরিকথিত হইয়া থাকে; এই পতিব্রতা সতীর নাম সারদা দেবী। ইনি শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পত্নী। পতির মৃত্যুর পর যখন সালঙ্কৃতা সতী

"নকল বতারিখ ১৭ x সন ১১৭১ সাল ইহাদিকীর্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীহরি শঙ্কর বিদ্যালঙ্কার স্বগীয় স্বর্গীয় ভট্টাচার্য্য সদাসত্রসু পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে x খিত্যা গং পরগণা সকলর রাজ পণ্ডিতি তুমার প্রপিতামহ ভট্টাচার্য্য মকরর আছিলা—পত্রেতে তান দছগত হইত, তাইন পরলোক হইলে তুমার পিতামহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম নাথ ভট্টাচার্য্য মকরর হৈছিলা—তান কাল হৈলে পর তুমার পিতা x অল্প বএস প্রযুক্ত কার্য্যেতে দখল না আছিল ও রামভদ্র দখলকার হৈলা পত্রেতেও তাইন দছগত করিতা, অখন তুমিও কার্য্যদক্ষ্য প্রযুক্ত বদস্তুর সাবেক তুমার পিতামহর বিষয় x করিলাম তুমীও তুমার পিতামহর বিষয় দছগত করিবার এতদর্থে পত্র করিয়া দিলাম।"
(দস্তখত স্থলে—পারস্য ভাষায় লিখিত মূলের দক্ষিণ পার্শ্বে "শ্রীরঘুনন্দন রায়, শ্রীনাথ রায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ রায়" এই চারি দস্তখত ব্যতীত "শ্রীমছউদ বক্ত" এই দস্তখতটিও আছে। মসউদ বখত
শ্রীহট্টের সদর কানুনগো ও মজুমদার বংশ ছিলেন। সনদের তপসিল স্থলে তিন লাইনে ৪৪টি পরগণার নাম লিখিত আছে, অনাবশ্যক বিধায় এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।)

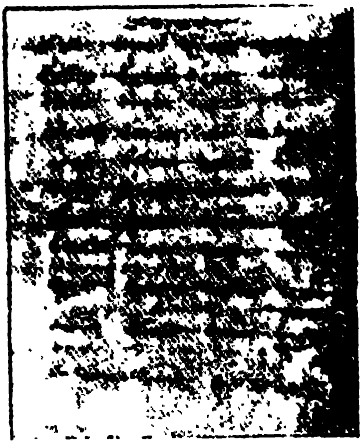
১১. রঘুনন্দের বংশ-শাখা নিম্নে দেওয়া গেল—



আমাদের প্রাপ্ত বংশাবলী নির্ভুল বলিয়া বোধ হয় নাই; এস্থলে আমরা দলিল দৃষ্টে অনেকটা সংশোধন করিলাম। রাজপণ্ডিতি দলিলে শ্রীনাথের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, বংশাবলীতে ইঁহার নাম নাই ও শ্রীকৃষ্ণাদি সকলই রামনাথের পুত্র বলিয়া লিখিত। তদ্ব্যতীত গণেশ্বরের ব্রহ্মত্র প্রাপ্তির সনন্দে দৃষ্ট হয় যে গণেশ্বরের পুত্রের নাম নরসিংহ, কিন্তু বংশাবলীতে নরসিংহের পিতার নাম রামভদ্র ও পুত্রের নাম গণেশ্বর লিখিত হওয়ায় প্রেরকের স্পষ্ট ভ্রম সৃষ্ট হইতেছে।



(১) রাজপণ্ডিত নিযুক্ত-পত্র
প্রাপক - হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ব্রাহ্মণ শাসন



(২) ঐ পৃষ্ঠালিপি

পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রজ্বলিত চিতারোহণে সমুদ্যতা হন, সমাগত ব্যক্তিবর্গ তখন সতীর জয়ধ্বনি করিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। সারদা দেবীর জনৈক আত্মীয় তৎক্ষণাৎ একজোড়া খড়ম আনিয়া রাখিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় মত সতী তাহাতে পদস্পর্শ করিলেন; আর তাহার পর পতির চিতারোহণে তিনি নারী-ধর্ম্মের মহিমা সূচক উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। সতীর পদস্পৃষ্ট সেই পূত-পাদুকা এখনও তদ্বংশে পূজিত হইয়া সতী মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত করিতেছে।

ব্রাহ্মণ শাসনের চক্রবর্ত্তী বংশ

আখালিয়ার ব্রাহ্মণ শাসনের মৌলিক অধিবাসী বলিয়া ভরদ্বাজ গোত্রীয়গণ গৌরব করিয়া থাকিয়া থাকেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কামদেব বিদ্যালঙ্কার রাঢ়দেশ হইতে এস্থানে আগমন করেন। কিন্তু এ বংশে জনবলের হীনতা প্রযুক্ত ইঁহাদের পূর্ব্ব প্রভাব হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বংশীয়গণ আখালিয়ার দাস মজুমদারের সাহায্যে "রাজপণ্ডিতি" প্রাপ্ত হন ও ক্রমশঃ ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত শ্রীহট্ট জিলার অনেকটি পরগণায় রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হন।

কামদেবের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর হইতে ২ জলুসের এক সনন্দে (নং ১৮৮) পং হাউলি সোণাইতাতে ৩/১৷৷ এবং পং কৌড়িয়াতে ১৩/ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন; ১১৮২ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে এই ভূমি তাঁহার পুত্র শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী ভোগ করেন। শ্রীকান্তের পুত্র কান্তরাম চক্রবর্ত্তী ভোগ করেন। শ্রীকান্তের পুত্র কান্তরাম চক্রবর্ত্তী লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় এই ভূমি একটি নিষ্কর পাট্টাতে বন্দোবস্ত করেন। কান্তরামের প্রপৌত্র কমলাকান্ত, কমলাকান্তের প্রপৌত্রের নাম দীননাথ পণ্ডিত, দীননাথের পৌত্রের নাম রমণী চক্রবর্ত্তী, ইঁহার পুত্র শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জীবিত আছেন।

বরমচালাগত ভট্টাচার্য্য বংশ

রামহরি ভট্টাচার্য্যের বাস আখালিয়ার ব্রাহ্মণ শাসন; কিন্তু রামহরির পূর্ব্বপুরুষগণ এস্থানবাসী ছিলেন না। রামহরির বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামদেব ভট্টাচার্য্য ও অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ জয়রাম ভট্টাচার্য্য বরমচালের সিঙ্গুর গ্রামবাসী ছিলেন; ইঁহারা উভয়েই নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উল মূলক বাহাদুর হইতে বরমচালে যথাক্রমে ।১৷৴২৷৷০ এবং ৺ ভূমি দেবত্র প্রাপ্ত হন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রামদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য উক্ত ভূমি "তছরূপ" করেন। রামদেবের সনন্দ পাঠে জানা যায় যে তিনি চারি কেদার জঙ্গল ভূমি পাইবার প্রার্থনা করিলে উহা গ্রাহ্য হইয়াছিল। রামহরির বিবাহ ব্রাহ্মণ শাসনে হয়, শ্বশুরকুলে বংশাভাব হওয়াতে তিনি এখানে আসেন, তাঁহার পুত্র মাতামহ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এখানকার অধিবাসীরূপে গণ্য হন।

পরগণা-দুলালী

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ

দুলালীর সামবেদী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ধরাধর মিশ্র তত্রত্য লস্কর নারায়ণ দাসের[১২] গুরু ছিলেন। ধরাধরের পুত্র ও পৌত্রের নাম জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, তাঁহার প্রপৌত্রের নাম বিদ্যাবল্লভ। ইঁহার দুই পুত্র[১৩] হইতেই এই বংশের বিস্তৃতি ঘটে।

এ বংশে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির উদ্ভব হয়। অনেকেই তাঁহাদের নিকট হইতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিন্ন দেশীয় ভূপতিবৃন্দও তাঁহাদের পাণ্ডিত্যাদি বিবিধ গুণগ্রামে মোহিত হইয়া

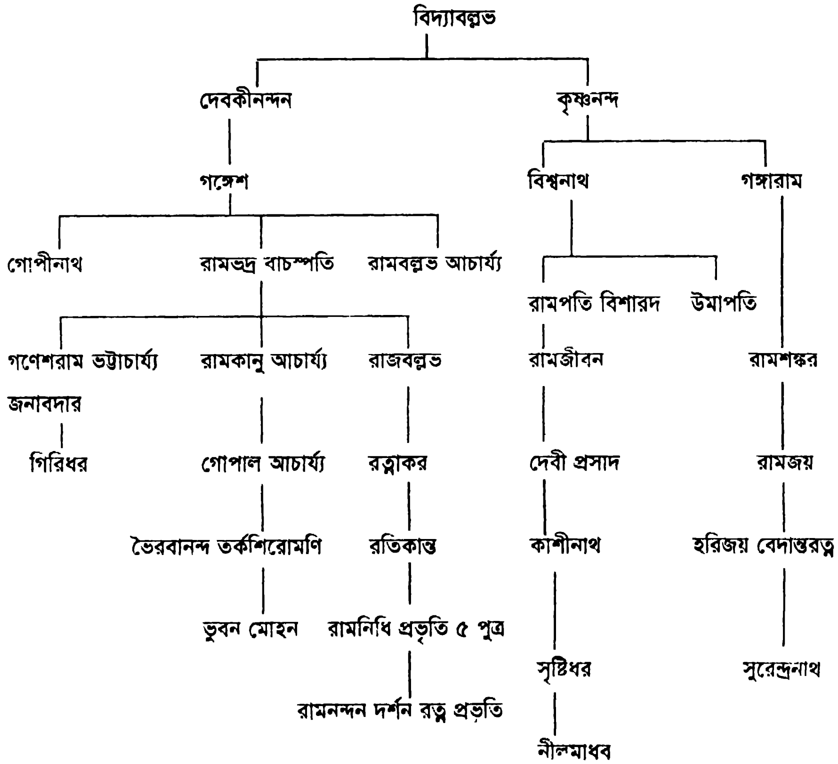
১২. ইঁহার বিষয় পরে কথিত হইবে।

তাঁহাদিগকে ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তদ্বংশীয়গণ বলেন যে নাটোরের মহারাজ হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ৩০০/বিঘা এবং আসাম বিজনীবাজ বলিত নারায়ণ ভূপ হইতে ১৪৮০/বিঘা ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। শ্রীহট্টের কালেক্টরীতেও এ বংশীয় অনেকের নামের সনন্দ দৃষ্ট হয়; এ বংশীয় রামভদ্র বাচস্পতি[১৪] রামবল্লভ আচার্য্য,[১৫] জনাবদার গণেশরাম[১৬] হরিরাম[১৭] প্রভৃতির নামীয় সনন্দ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভট্টাচার্য্য বংশ

দুলালীর বিমলানন্দ ভট্টাচার্য্যের বংশ অতি বিস্তৃত। এই বংশে বহুতর গুণবান ও খ্যাতিমান মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছিল। বিমলানন্দের তিনপুত্র হইতেই এই বংশ বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত

১৩. ইহাদের বংশাবলী এই-



১৪. নবাব হরকিযুণ দাস মনসুর উলমুলক বাহাদুর ৩ জলুসের এক সনন্দে (১নং ৫৫৬) ইঁহাকে হবিনগর ও দুলালীতে ১৷৷১৪ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করেন। ১১৯৫ সনে বাচস্পতির মৃত্যু হয়।

১৫. নবাব আজদা খাঁ বাহাদুর ২৬ জলুসের এক সনন্দে (নং ৫৫১) ইঁহাকে দুলালীতেই ৯/১২/৩১ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করেন। সনন্দের মন্তব্য পাঠে জানা যায় যে ১১৭১ সনে ইঁহার মৃত্যু হয়।

১৬. নবাব হরকিযুণ দাস মনসুর উলমুলক বাহাদুর ৩ জলুসের এক সনন্দে (নং ৩৫৩) ইঁহার নামে কজাকাবাদ পরগণায় [illegible] ৩৷৷ ভূমি দেবত্র প্রদান করেন। ১২০৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৭. নবাব জান মোহাম্মদ খাঁ বাহাদুর হইতে পং দুলালীতে ও হবিনগরে ইনি ১/২ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন; ১১৫৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র ঐ ভূমি "তছরূপ" করেন।

হইয়াছে।[১৮] কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবে সে সকল মহাত্মার কীর্ত্তিকথা জানিতে না পারায় এস্থলে সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না। আমরা কালেক্টরী হইতে যে সমস্ত সনন্দ পত্র সংগ্রহ করিয়াছি, তন্মধ্যে অনেকটিই দুলালীয় গণের প্রাপ্ত। দুঃখের বিষয় যে আমরা দুলালী, কালীজুরী, মদনপুর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি প্রধান স্থানগুলির সম্ভ্রান্ত বংশ সমূহের বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। সমাজে ইঁহারা অতি সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন।

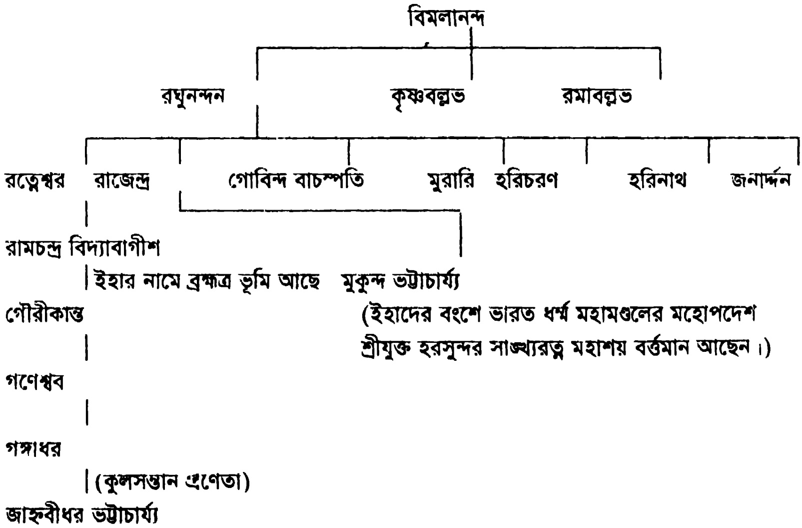
পরগণা-কৌড়িয়া

কৌড়িয়ার ভট্টাচার্য্যবংশ

কৌড়িয়া পরগণার দিঘলী নিবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় বারাণসী ভট্টাচার্যের আঁদি বাসস্থান রাঢ় দেশ, কোন কারণে তথা হইতে আসিয়া তিনি এস্থান বাসী হন।[১৯] বারাণসীর পুত্রের নাম রামকান্ত, ইঁহার রতিকান্ত ও গঙ্গারাম নামে দুই পুত্র হয় গঙ্গারাম এক নূতন বাটিকা প্রস্তুত ক্রমে তথায় চলিয়া যান, তদ্বংশীয়গণ সেস্থানেই আছেন।

রতিকান্তের চারিপুত্র; তন্মধ্যে কমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। মুর্শিদাবাদের জনৈক নবাব পুত্র রত্নে বঞ্চিত ছিলেন; একদা কমলাকান্ত উপস্থিত হইলে নবাব জ্যোতিষীকে পুত্রবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গণনা করিয়া বলেন যে, এক বৎসরের মধ্যেই নবাব এক পুত্র প্রাপ্ত হইবেন। এই গণনার সত্যতা দর্শনে পণ্ডিতের পারিতোষিকের ব্যবস্থা হইবে আদেশ দিয়া, নবাব "নজরবন্দি" করিয়া তাঁহাকে রাখিয়া দেন। কিন্তু গণনা সফলই হইল, বৎসর-শেষে নবাবের একটি পুত্র সন্তান হইল; তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া কমলাকান্তকে বহু পরিমিত ধনরত্ন, সুবর্ণমুদ্রা ও একখানা উৎকৃষ্ট শালবস্ত্র, এবং ২৭০/০ হাল ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করেন। কথিত আছে যে সন্তান গর্ভ থাকাকালেই তিনি গণনা দ্বারা সন্তানের ভাগ্যফল স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সন্তান জাত হইলে তাহা নবাবের গোচর করেন। ইহাতে নবাব তৎপ্রতি অতিশয় তুষ্ট হন ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নামে শ্রীহট্টের রাজকোষ হইতে দৈনিক এক কাহন কৌড়ি প্রদানের

১৮. দুলালীর ভট্টাচার্য্য বংশের একটি সামান্য অংশ মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল–



আদেশ গমন করেন! ইঁহারা তাহা যথারীতি প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহার পুত্র মহাদেব তর্কভূষণের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই বংশীয় অনেকেই অনেক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ ১৩০/০ হাল ছিল বলিয়া জানা যায়, এই ভূমি পরে সাতটি তালুকে পরবর্ত্তী বংশধরবর্গের নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

কৌড়িয়ায় মহেশ্বর

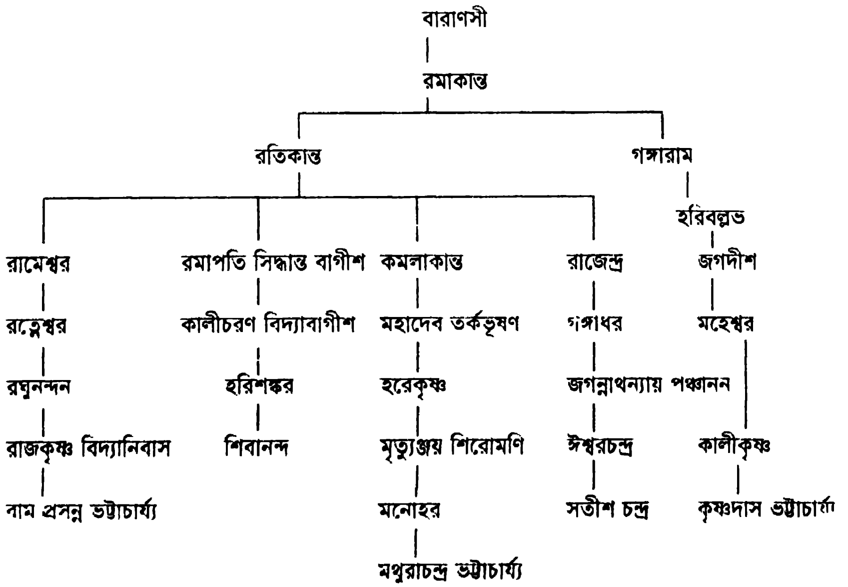
দুলালীর ন্যায় কৌড়িয়ায় বিবরণও আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই; এস্থলে আমরা কৌড়িয়ার আর এক ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া এই বিষয় শেষ করিতেছি। যখন নবাব হাজি হুসেন খাঁ বাহাদুর শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার নামক এক ব্যক্তি কৌড়িয়াতে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য। নবাব ন্যায়ালঙ্কারের গুণগ্রামে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কতক ভূমি ব্রহ্মণ দান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ) তৎপুত্র বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য "তছরূপ" করেন। বৈদ্যনাথের পুত্র রাম সুন্দর ভট্টাচার্য্যও উক্ত ভূমি ভোগ দখল করিয়া ছিলেন; রামসুন্দরের প্রপৌত্র এখন উত্তরাধিকারী স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন।

কুরুয়ার গোস্বামী বংশ

গোস্বামী ও মহান্ত খ্যাতি

গোস্বামী উপাধি বহুকাল হইতে বৈষব সমাজে যে বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন পরিবারে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, নানা গ্রন্থ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে "স্বামী" উপর গৃহীত হইয়া থাকে, তদনুকরণে তাহার পরিবর্ত্তে সমাজে "গোস্বামী" উপাধি প্রচলিত হইয়া

১৯. ইহার সংক্ষিপ্ত বংশাবলী এই–



থাকিতে পারে। সচরাচর নিত্য ও অদ্বৈত বংশীয়গণ এই উপাধি দ্বারা উদ্দিষ্ট হইলেও পরে এই উপাধির বিস্তৃতি ঘটে; এমন কি যাঁহারা কয়েক ঘর শিষ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন, শিষ্যর কাছে তাঁহারাও "গুরু গোস্বামী" বলিয়া অভিহিত হন; এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট মহাপ্রভুর প্রধান ভক্তবর্গ মহান্ত আখ্যায় অভিহিত হইতেন, তন্মধ্যে মহান্তই প্রধান।

শ্রীহট্টে কোন কোন বৈষ্ণব বংশে গোস্বামী উপাধি গৃহীত হইয়াছে। বাণী বংশ এবং বৈষ্ণব রায়ের বংশই প্রধান। কুরুয়া ও বিষ্ণুপুরেই রায়ের বংশীয়গণ বাস করিতেছেন।

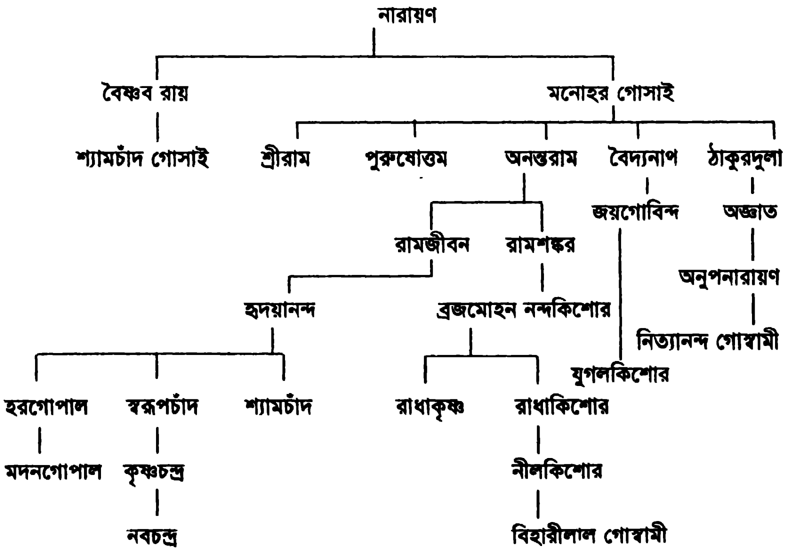
প্রায় সাত পুরুষ পূর্ব্বে রাঢ়ী শ্রেণীয় শাণ্ডিল্য গোত্রোৎপন্ন (স্বর্ণ ঘাটি গাঁঞি) নারায়ণ মহান্ত নামক একব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত চতুঃষষ্টি মহান্ত-বংশে উদ্ভুত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অদ্বৈত বংশীয়ের শিষ্য ছিলেন এবং গুরু ক্রমে ধর্ম্ম প্রচারার্থে অদ্বৈতের জন্ম স্থান শ্রীহট্টে আগমন করেন। ইহা হইতেই কোন কোন রাঢ়ীয় বিপ্রের শ্রীহট্টে আগমন করার সংবাদ পাওয়া যায়। নারায়ণ শ্রীহট্টে আসিয়া তদ্রূপ কোন এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রীহট্টে বাস করিতে থাকেন।

কথিত আছে যে তিনি বিবিধ দৈবশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং নবাগত হইলেও শীঘ্রই সকলের সুপরিচিত হইয়া উঠেন; তাহাতেই তাঁহাকে কন্যাদিতে কাহারও দ্বিমত হয় নাই। বিবাহ করিয়া নারায়ণ বিষ্ণুপুরেই বাস করেন। বিষ্ণুপুর হইতে এক শাখা পরে কুরুয়াতে আগমন করেন।

বৈষ্ণব রায়ের বংশ

নারায়ণের উপাধি বাচস্পতি, তাঁহার, জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রায়; ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম মনোহর রায়।[২০]

২০. নারায়ণ বাচস্পতির বংশাবলী এই-



১. এই মদনগোপাল গোস্বামী বৃন্দাবনে দা[illegible] রামণের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও তথায় শ্রীহট্টবাসিগণের এক প্রধান আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছেন।

বৈষ্ণব রায় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, অসাধারণ ব্যক্তি পরায়ণ ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মহাত্ম্যে সর্ব্ব সাধারণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বৈষ্ণব রায় হইতেই এ বংশীয়গণ গোস্বামী উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

বৈষ্ণব রায়ের শ্যামচাঁদ নামে এক পুত্র ছিলেন। ইনি পিতার বাধ্য ছিলেন না, এবং তজ্জন্য পিতৃশাপে ভস্মীভূত হন।[২১] পুত্রশোকে শ্যামচাঁদের গর্ভধারিণী উন্মত্তার প্রায় হইয়া উঠেন, তখন পুত্রশোক-সন্তাপ্তা ভ্রাতৃজায়ার মনোরঞ্জনা মনোহর রায় আপনার এক পুত্র তাঁহার কোলে স্থাপন করিয়া বলেন "অদ্যাবধি আমার পুত্রই তোমার পুত্র হইল এবং অদ্যাবধি তাঁহারা বৈষ্ণব রায়ের বংশ বলিয়া খ্যাত হইবে।" মনোহর রায়ের সন্তানেরা তদবধিই "বৈষ্ণব রায়ের বংশ" বলিয়া খ্যাত।

মনোহরের পাঁচ পুত্রের মধ্যে অনন্তরাম ও বৈদ্যনাথ বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরয়াতে আসিয়া বাস করেন। কুরুয়ার গোস্বামীগণ ইহাদেরই সন্তান। কুরুয়াতে তত্রত্য বৈদ্যনাথ পঙ্গ্ নামে কতক ভূমি, চৌয়ালিশবাসী জগন্নাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়, ইহার কাগজ কালেক্টরীতে পাওয়া যায়। এই "পঙ্গ্" বা পং অর্থাৎ পণ্ডিত (যথা চঙ্গ্= চং= চণ্ডাল) বৈদ্যনাথ, গোস্বামী বংশীয় বৈদ্যনাথ হইতে অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। বৈদ্যনাথ গোস্বামীর পুত্র জয়গোবিন্দ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার নামের দুই খানা ব্রহ্মত্রের সনন্দ কালেক্টরীতে পাওয়া যায়, ইহাতে ১৮/০ হাল ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।[২২]

অনন্তরামের পুত্রের উপাধি তাঁহার প্রাপ্ত সনন্দে "মহান্ত" বলিয়া লিখিত আছে। নবাব শমশের খাঁ বাহাদুর হইতে একখানা সনন্দে (নং ১০২) তিনি কুরুয়া হইতে ৫৸২৷২৷০ ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ঐ নবাবই দ্বিতীয় সনন্দে তাঁহাকে পং কাজাকাবাদ, ইন্দেশ্বর, খালিসা বনভোগ ও হাউলি সোনাইতা হইতে মোটে ১৩৷২৷৫৷০ ভূমি ব্রহ্মত্র দেন।[২৩]

যুগলটীলার প্রতিষ্ঠাতা

অনন্তরামের ভ্রাতা বৈদ্যনাথের পৌত্র যুগলকিশোর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়ে যুগলটীলার আখড়ার কথা লিখিত হইয়াছে, যুগলকিশোর গোসাঞিই এই আখড়ার স্থাপয়িতা। তিনি ভেখ্ আশ্রয় পূর্ব্বক যে টীলায় স্বীয় সাধনাশ্রম প্রস্তুত করেন, তাহাই তাঁহার নামানুসারে যুগলটীলার আখড়া নামে খ্যাত হয়। নবাব

২১. অদ্ভুত বকুলবৃক্ষ। কথিত আছে যে পতিশাপে পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে পত্নী পুত্রশোকে আকুলিত হইয়া অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক এক গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক বকুল বৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক স্বামীকে বলিয়াছিলেন "পুত্রশোকে আমার অন্তর কিরূপে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বৃক্ষ তাহার সাক্ষ্য দিবে।" বিষ্ণুপুরে উক্ত বকুলবৃক্ষ অদ্যাপি জীবিত আছে; আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহার শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিলে তাহার মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।
মতান্তরে কথিত হয় যে, বৈষ্ণবরায়ের পুত্রশোকাতুরা পত্নী প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় এক সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করেন, বৈষ্ণবরায় তদীয় কেশগুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক বাধাদেন, তাহাতে তাহা উৎপাটিত হইয়া যায় ও পরে বৈষ্ণরায়ের প্রভাবে তাহাই বকুলবৃক্ষে পরিণত হয় এবং তাহাতেই ইহার অভ্যন্তর ভাগ কেশের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট।

২২. ১. সুনন্দ নং ১৭৮ দাতা নবাব মীর আলী খাঁ বাহাদুর, ভূপরিমাণ ৩৷০।২ স্থান কুরুয়া।
২. সনন্দ নং ২৬২ দাতা সৈয়দ কুতব খাঁ বাহাদুর, ভূপরিমাণ ১৪৷১৴স্থান ৷ স্থান বোয়ালজুর।

২৩. কালেক্টরীতে আনন্দি চাঁদ গোসাঞির নামে নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ বাহাদুরের মোহরাঙ্কিত দুই খান সনন্দে ছয়টি পরগণা হইতে যথাক্রমে ৪১/৷৬ এবং [illegible]/৷০ দেবত্র দানের কথা অবগত হওয়া যায়। সনন্দের মন্তব্যে দৃষ্ট হয় যে আনন্দি চাঁদের ১১৮১ সালে মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র সর্ব্বব্রত শিরোমণি উহা "তছরূপ" করেন। এই আনন্দিচাঁদ কুরুয়াবাসী ছিলেন বলিয়া লিখিত থাকায়, ইঁহাকেও ঐ একই বংশোদ্ভব বলিয়াই জানা যায়।

হরকিষুণ দাস, মনসুর উলমুলক বাহাদুর প্রদত্ত সনন্দে (৩ জলুস) পলডর পরগণা হইতে দেবত্রসূত্রে তিনি ৯২৫/০ হাল ভূমি দান প্রাপ্ত হয়।

রাজগুরু নিত্যানন্দ

যুগলকিশোর জ্ঞাতি ভ্রাতা অনুপনারায়ণও পৈতৃক স্থান পরিত্যাগী ছিলেন, তিনি শিষ্যানুরোধে বিষ্ণুপুর হইতে ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন। সেন বংশীয় সেই শিষ্যের বংশও এক্ষণে বিলুপ্ত। উক্ত শিষ্য গুরুকে দক্ষিণভাগ মৌজাস্থ এক সুশোভন টীলার উপরে বাড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বৃহৎ দীর্ঘীসহ তাহা "গোসাঞির বাড়ীর টীলা" নামে কথিত হয়। "অনুপরাম" (মৃত্যু ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ) নবাব হায়দর আলী খাঁ বাহাদুর হইতে ঢাকাদক্ষিণে ।০।৫।০ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্রের নাম নিত্যানন্দ গোসাঞি। নিত্যানন্দ জ্ঞান-গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, জয়ন্তীয়া-পতি দ্বিতীয় রামসিংহ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাজা রামসিংহ হইতে তিনি জয়ন্তীয়ায় ৩৮/০ হাল ভূমি দেবত্র প্রাপ্ত হন।[২৪]

কেবল ঢাকাদক্ষিণে নহে, এই বংশীয় গোস্বামীগণ পরে বাউসী, বাউরকাপন, দশঘর, জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। একঘর নবদ্বীপবাসী হইয়াছেন।[২৫] কিন্তু বিষ্ণুপুর ও কুরুয়াই প্রধান গদী। কামরূপের অন্তর্গত সুয়ালরুচি নামক স্থানের কিঞ্চিৎ ভাটিতে একটি দেবালয় আছে, উহার অধিকারী "শিলটীয়া গোসাই" নামে খ্যাত। উহারা এই বংশীয় কি না, জানা যায় নাই। গুণাভিরাম কৃত আসাম বুরুঞ্জীতে শ্রীহট্ট হইতে আসামে ব্রাহ্মণ উপনিবেশের কথা আছে।

পরগণা–বোয়ালজুর

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৩য় খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে মহারাজ বিজয় সিংহের গুরু রাঘব ভট্টাচার্য্যের নামোল্লেখ করা গিয়াছে। ভরদ্বাজ গোত্রীয় উক্ত রাঘব ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র সাচায়নিতে বাসস্থান স্থির করেন। মধ্যমপুত্র পঞ্চখণ্ডবাসী[২৬] হন; তাঁহার তৃতীয় পুত্র বংশীবদন বোয়ালজুরে গিয়া বাস করেন ও তথায় প্রতিপত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তত্রত্য "রাজ পণ্ডিত" প্রাপ্ত হন। ইঁহার দুই পুত্র হরিহর ও মহাদেব। মহাদেবের অষ্টম পুরুষে কালীশঙ্কর ন্যায়পঞ্চাননের পুত্রাদি না তাকায় এই শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে।

হরিহরের দুইটি বিবাহ ছিল, তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের নাম জগন্নাথ বিশারদ। তদীয় দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ভবদেব ভট্টাচার্য্যে কর্ত্তৃক জৈষ্ঠ্য পৈতৃক সম্পত্তি হইতে প্রথমে বঞ্চিত হইয়া রেঙ্গা পরগণায় নিজ মাতুলালয়ে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ও শিষ্য সম্পদ প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত তত্রত্য গজেন্দ্র নন্দী, অনন্ত নন্দী, রঘুনাথরায়, শেখ্ হাশিম প্রভৃতির সম্পাদিত ১লা জ্যৈষ্ঠ ১১৩১ সালের এক দানপত্রে "বেদীয়া ডাকাতির ভিটার পূর্ব্ব, বড়খালা পশ্চিম; মাইনকার হদ্দের খালর দক্ষিণ ও জানের উত্তর" এই চতুঃসীমান্ত গর্ত একখণ্ড ভূমি দান প্রাপ্ত হন এবং তত্রত্য সুবিদরায়, গন্ধর্ব্বারায় ও রঘুরায় প্রদত্ত ১১৩৭ সালে সম্পাদিত এক দলিলে বোয়ালজুরের রাজপণ্ডিতি লাভ করেন।

২৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৫. নবদ্বীপে এই শাখায় শ্রীযুত পদ্মলোচন, নন্দলাল ও কুঞ্জলাল গোস্বামী প্রভৃতি জীবিত আছেন।

২৬. পঞ্চখণ্ড হইতে এক শাখা ইন্দশ্বেরবাসি হইয়াছেন; তত্রত্য শ্রীযুত কালী কুমার তর্কচূড়ামণি এই শাখা সম্ভূত।

ভবদেবের পুত্র কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যও তত্রত্য সহদেবরায় ও উছবরায় হইতে ১৪ই চৈত্র ১১৭১ সালে সম্পাদিত এক দানপত্রে খানপুরে ৩/ হাল ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ইঁহার চারিপুত্র-রামগোপাল, রত্নাকর, রঘুপতি ও মহেশ্বর। তন্মধ্যে রঘুপতি খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন, তিনি "সাদেকুল হরমানিক"[২৭] মোহারাঙ্কিত এক সনন্দে (নং ২৯০) ১৪ জলুসে বাজুসোণাইতা হইতে ৩।০৷৷০৸০ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ১২০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা মহেশ্বর উক্ত ভূমি "তছরূপ" করেন। রত্নাকর, রঘুপতি ও মহেশ্বরের বংশ এক্ষণে বিলুপ্ত।

"তন্ত্র রত্নমালা" সঙ্কলিতা

রামগোপালের পুত্রের নাম রাম রাম ভট্টাচার্য্য, ইনি নিখিল তন্ত্র শাস্ত্র হইতে "তন্ত্র রত্নমালা" নামক একখানা সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রত্নাকরের পুত্রের নাম রামগোবিন্দ, ইনি গোহাটী গমন করিয়া তত্রত্য বড়ুয়া বংশীয় কয়েক ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়াছিলেন। তন্ত্ররত্নমালাকার রামরামের চারিপুত্রের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ পুত্র রাম কেশব স্মৃতিরত্ন ও রামদয়াল ভট্টাচার্য্যের বংশ নাই; প্রথম পুত্র রামচরণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের সন্ততিবর্গই এক্ষণে সসম্মানে পৈতৃক ভিটায় বাস করিতেছেন।

রায়নগরের ভট্টাচার্য্য বংশ

শ্রীহট্ট সহরের ভট্টাচার্য্য বংশীয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ২/৪টি কথার উল্লেখ করিয়া এ খণ্ডের ব্রাহ্মণ বিভাগ সমাপ্ত করিতেছি। ইঁহার সাহু বণিক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে পূর্ব্বাংশে ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণের সভা পণ্ডিত পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের কথা বলা গিয়াছে, রাজকোপে তিনি পদচ্যুত হন, তাঁহার বংশ বহু বিস্তৃত। গৌতম গোত্রীয় তদীয় দৌহিত্র বংশ এবং কুটম্ব পূতিমাস প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই তৎকালে সাহু সমাজের পৌরহিত্যে বৃত হইয়াছিলেন।

বলা গিয়াছে যে, রাজা সুবিদনারায়ণ ও শ্রীহট্টের দেওয়ানের বিবাদ কালে শ্রীহট্ট শহরে দেওয়ানের উপলক্ষে এক সভা আহূত হয়,[২৮] সেই সভায় সমাগত বহুতর ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোক পরে রাজকোপে সমাজত্যক্ত হন, সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন একজনের পৌত্র বা প্রপৌত্রের নাম কৃষ্ণকান্তভট্টাচার্য্য।[২৯] কৃষ্ণকান্তের সুদাম নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার দুই পুত্র রাজারাম ও সুখদেব। এই দুই শাখা হইতে বংশ বিস্তৃতি ঘটিয়াছে।

সফল স্বপ্ন

সুদাম ভট্টাচার্য্য একদা স্বপ্ন দর্শন করেন যে আমুড়া বিলে তিন কোলে গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রভাতে ব্রাহ্মণের মনে ধনলিপ্সা জাগিয়া উঠিল তিনি অনতিবিলম্বেই আমুড়া বিলে গিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; তথায় তিনি ধনের পরিবর্ত্তে এক অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইলেন, তন্মধ্যে শ্রীবংশীধারী বিগ্রহ।

অপর এক সুদাম বিপ্রের কথা পাঠক স্মরণ করুণ, দ্বাপর যুগের সেই দরিদ্র সুদাম ধনের আশায় বন্ধুর নিকট দ্বারকায় গিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বংশীধারী পার্থিব ধনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অতুল পারত্রিক সম্পদের অধিকারী করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রাগুক্ত সুদাম ভট্টাচার্য্যও বংশীধারী বিগ্রহ লইয়া গৃহে আসিলেন, এবং নিজ

---

২৭. এই মোহরের বিবরণ ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গৃহেই ঐ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সুদামের পুত্রদ্বয় শ্রীহট্টের নবাব হইতে ঐ দেবতার বৃত্তি দৈনিক দুই পণ কৌড়ি মঞ্জুর করাইয়া লন।

রাজারাম সুদামের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইঁহার পুত্রের নাম বলভদ্র; বলভদ্রের সুসন্তান না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নিঃসন্তান জানিয়া তদীয় পৈত্রিক বৃত্তির এক অংশে একপণ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি নিকটবর্ত্তী বংশ হইতে নীলাম্বর নামে এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই নীলাম্বরের বংশধর বর্গ মধ্যে অনেক প্রধান ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল।

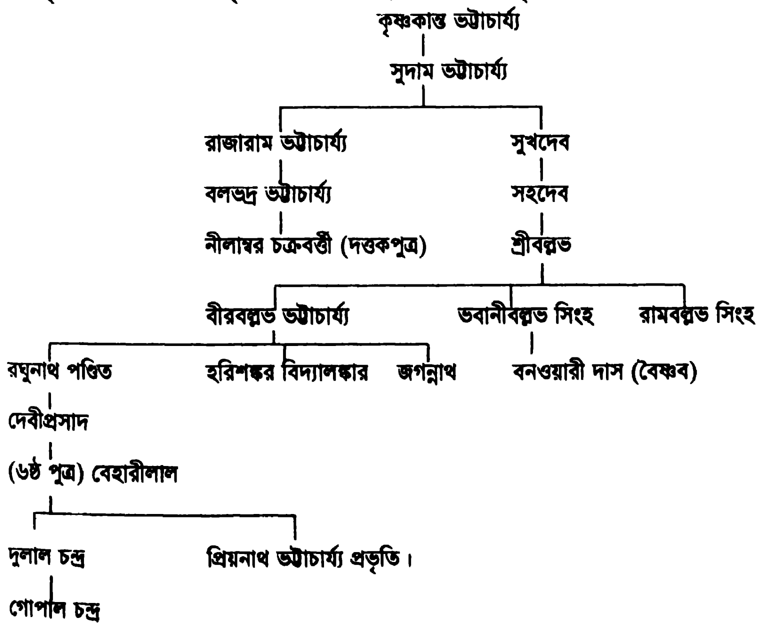
ব্রাহ্মণ ও সিপাহী ও গোলাপগঞ্জের ঘাঁটি

সুখদেবের পৌত্র শ্রীবল্লভের তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে ও কনিষ্ঠ, উভয়েই শ্রীহট্টের সরকারী সৈন্যদলে সৈনিকের কর্ম্ম স্বীকার করায়, ভবানীবল্লভ সিংহ ও রামবল্লভসিংহ নামে খ্যাত হন।

শ্রীহট্ট শহর হইতে প্রায় দশ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে, গোলাপগঞ্জে নদীর উপরে একটি টীলা দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঘাঁটি ছিল। জয়ন্তীয়ার অসভ্য খাসিয়াদের অত্যাচার নিবারণ কল্পে এ স্থানে কয়েকটি সৈন্য থাকিত; উক্ত দুই ভ্রাতা সেই ঘাটির অধিনায়ক ছিলেন এবং তথায় থাকিতেন।

ভবানীবল্লভের এক পুত্র একদা ভ্রমণোপলক্ষে পং পানিশালির আখড়াতে গমন করিয়াছিলেন, শাস্ত্রালাপ প্রসঙ্গে তত্রত্য বিজ্ঞ অধিকারী-বৈষ্ণব তাঁহাকে বিশেষভাবে লজ্জা দান করিলে তিনি তাহাতে নিতান্ত অপমান বোধ করেন এবং আর বাড়ীতে না গিয়াই বিদ্যা লাভের জন্য তথা হইতে "দ্রাবিড়" দেশে গমন করেন ও বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরান্তে পানিশালির মূল স্থান হয়বৎনগরের আখড়াতে বিচারার্থী হইয়া উপনীত হন; তথায় গোসাঞি

২৯. কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের বিস্তৃত বংশের একটি ক্ষুদ্র শাখা নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ–



কৃষ্ণমহলের সহিত তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়।

শ্রীজীব গোস্বামীর দার্শনিকগ্রন্থ সমূহ তখন প্রত্যেক বৈষ্ণব-প্রধান স্থানেই আলোচিত হইত। কৃষ্ণমঙ্গল বৈষ্ণব-দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ তখন তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি সকলেই সযত্নে আয়ত্ত করিয়া রাখিত। সুতরাং সৈনিক তনয়ের যুদ্ধ-পিপাসা সেইখানেই নিবৃত্ত হইল, তিনি শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত হইয়া ভেখ্ গ্রহণ করিলেন ও বনওয়ারি দাস নামে খ্যাত হইলেন।

বওয়ারী দাস তৎপরে শ্রীহট্ট শহরে আসিয়া স্বগীয় বিশ্বম্ভরের সেবা স্থাপনা পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। উক্ত দেব-সেবা পরিচালনার্থ তিনি নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর হইতে এক সনন্দে (নং ৫৩৬) খিত্তা পরগণায় ৫৷০।০। ভূমি দেবত্র প্রাপ্ত হন, আর এক সনন্দে (৫৩৫) তিনি উক্ত নবাব হইতে বরায়া পরগণায় আরও কতক ভূমি দেবত্র পাইয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভূমি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তীয় শিষ্য রাধাচরণ দাসের নামে "তছরূপ" থাকা দৃষ্ট হয়।

বীরবল্লভ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ কাশীতে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করে "পণ্ডিত" বলিয়া খ্যাত হন, তিনি গৃহ-পূজিত দেবতার জন্য দেবত্র প্রার্থী হইয়া নবাব দরবারে আবেদন করিলে, হিন্দি ভাষায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্তে তুষ্ট হইয়া সরকার পক্ষ তাঁহাকে ৭৫/০ কুবলাভূমি দেবত্র দেন; এভূমিও খিত্তাতে প্রদত্ত হয়।[৩০] রঘুনাথের কনিষ্ঠ সহোদর হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ঐ সময় নবদ্বীপ হইতে "বিদ্যালঙ্কার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে আগমন করেন ও দেশে আসিয়া জয়ন্তীয়াপতি দ্বিতীয় রামসিংহের সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং রামসিংহ হইতে ৩২৫/০ বিঘা ভূমি দেবত্র প্রাপ্ত হন।[৩১] কেবল তাহাই নহে, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম বাহাদুরের সময়ে

---

৩০. রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রাপ্ত সনন্দের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। এই দেবত্র পশ্চাৎ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রহিত হইলেও তাহা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নালিশ হইলে, শ্রীহট্টের সবজজ আদালতে ৩০/১১/১৮৯৮ইং তারিখে যে নিষ্পত্তি হয়, তদ্বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৯৯ ইং ১৮০ নং আফিলের ব্রাফ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। চিহ্নিত স্থান কীট ভক্ষিত।*

"Seal of Nusirul Mulk Bahadur."

"Know ye Mustuddis of affirs of the present and future times and choudhuris and Kunungoes of perganuah Ketta &c. in Sircar Sylhet.

It appears that Raghu Nath Pandit of Kasba Sylhet* who is we served Hindi has no means of livelihood, and passes his days with difficulty and whereas has made application for * * a grant of chanrity of 75 Kubla (plough) of jungle khiraj jamma culturable land as Debottar in his favour, so that he may apply the proceeds thereof to the performance of the worship of the Thakur, to the feeding of Pujari Brakmins and to support of himself and his children, * Therefore* is granted to him as Debotter for meeting the necessary expense of the worship of Thakur * * * according to Zeemin (remarkon the back). You will all the same to be enjoyed by him in order to enable him to apply the ceeds of the said land to the worship of the Thakur, in the feedin poojari Brahmins and of the support of himself and children and offering prayers for Zeemin (note), 75 Kubla of jungle* culturable land* ----Debotter* are granted to Reghu Nath Pandit of Kasba Sylhet as per detail given below * *

৩১. এই সনন্দের মর্ম্মও হাইকোর্টের পূর্ব্বোক্ত ব্রীফ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল–

"Brief History of permanently settled Eastate and Porgana Satbank"

"The area 325 bigkas (in the Village Lahar chak, no. of mohals 5811, 3 & 1 was granted rent free by Raja Ram Sin... in 1202 B. S. to Harisanker B..a. for maintaining the temple o. Madan Mohan and orther gods. After the first survey this land was rusumed and assumed at full rates, but no appeal the Commissioner ordered it to be permanently settled in 1839.

শ্রীহট্টের নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ হইতে তিনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে এক সনন্দের দ্বারা এ জিলার প্রতি মহাল হইতে দৈনিক ১২৷৷০ গণ্ডা কৌড়ি হিসাবে দেব-সেবার ব্যয় পাওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সনন্দের আদেশ সরকারী কর্ম্মচারিবর্গের উপর জারি হইয়াছিল।[৩২]

রঘুনাথ পণ্ডিত ও হরিশঙ্কর বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু এক বৎসরেই হইয়াছিল। তখন এই দৈনিক বৃত্তি নানা কারণে রহিত হইয়া যায়। রঘুনাথের পুত্র দেবী প্রসাদ পৈতৃক বৃত্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করিলে (৪ঠা অক্টোবর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ) শ্রীহট্টের কালেক্টর আমুটী সাহেবের দস্তখতে (৬ই তারিখে) এই হুকুম হয় যে "দেবী প্রসাদ শর্ম্মার পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত বৃত্তি বিনা ওজনে প্রতিদিন দেওয়া যায়।" দেবীপ্রসাদের মৃত্যুর পরে গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যকবোধে এই বৃত্তি রহিত করেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৃত্তি বাহালের জন্য প্রতিকার করেন, কিন্তু তমাদিদোষে বৃত্তি চিরকালের জন্য বারিত হয়।

যে দেবতার জন্য উক্ত প্রভূত পরিমাণ ভূমি ও নগদ দৈনিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে দেবতা পূর্ব্বোক্ত বংশীধারী এবং মদন মোহন। তাঁহাদের সঙ্গে আরও তিনজন দেবতা ছিলেন, এ সব দেবতার মন্দিরই রায়নগরের "পঞ্চরত্ন মন্দির" নামে খ্যাত। ভূকম্পের পূর্ব্বে ইহার ভগ্নাবস্থা আমরা দেখিয়াছিলাম। এই মন্দির লালা আনন্দরামের ব্যয়ে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।[৩৩]

---

৩২. প্রাচীন সনন্দের মর্ম্ম ঃ-

শাহ আলম গাজি বাহাদুর ফিদ্দরি

সৈয়দ মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর ১১৫৫ পারস্য মোহর।

সাল ৮ জলুস

"কর্ম্মচারীয়ান ও তহশীলদারান সরকার শ্রীহট্ট জানিবা যে হরিশঙ্কর বিদ্যালঙ্কার সাং কসবে শ্রীহট্ট জেলার রায়নগর স্বগীয় পূজার স্থান নিযুক্ত করিয়াছেন উক্ত হরিশঙ্করের দেবসেবা চালাইবার উপায় না থাকা কারণে সরকার মজকুরের প্রতি মহালের রাজস্ব আয় হইতে প্রতিদিন ১২৷৷০ গণ্ডা কৌড়ি হিসাবে দেওয়া যায়। এই উপসত্ত দ্বারায় পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঠাকুর পূজার কাজ চালাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে। কর্ম্মচারীয়ান ইহা দিতে একদিন ক্রটি করিবেক না প্রতি দিবস দিতে থাকিবেক। তদ্দারা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঠাকুর সেবার কাজ চালাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে।"

৩৩. "An inscription in Bengali on the Temple of idol Bansidari in Sylhet sets forth that the Temple was built in the honour of the god Bansidari in 1704 sakera."
The Report on the progress of Historica Researc[illegible] in Assam p 9 and vide [illegible] of the Archoelogical Survey of Province of Assam.
লালা আনন্দরামের উল্লেখ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ২য় অধ্যায় এবং পরবর্ত্তী ৪র্থ ভাগে দ্রষ্টব্য।

সাধারণ বিভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়
বৈদ্য ও কায়স্থাদির কথা

শহরের প্রাচীন বংশ

উত্তর শ্রীহট্টের বিবরণ বলিতে গেলে প্রথমেই শহরের কথা বলা উচিত, কিন্তু বিধাতার অভিশাপে শহরের প্রধান বংশীয়গণ প্রায় নির্ব্বংশ হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পের পর আসামের কাল কালাজ্বরের করাল কবলে দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারা গ্রাসিত হইলেন! শহর একরূপ নির্ম্মানুষ্য হইয়া গেল! জনশূন্য বাটিকা সমূহে শহর পরিপূর্ণ হইল, প্রতি গৃহ প্রাঙ্গন শ্মশানে পরিণত হইল, পল্লীগুলি উচ্ছন্ন হইয়া জঙ্গলপূর্ণ হইল, এই মহামারীতে রায়নগর-বাসীরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সকল কথা লিখিতে গেলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে; "শাহজলাল" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুত বাবু রজনীরঞ্জন দেব এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রীহট্ট শহরের রায়নগরে ইংরেজ রাজত্বের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অনেক প্রতাপশালী দেব, দাস, সেন ও মজুমদার প্রভৃতি বৈদ্য ও কায়স্থ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দেব ও রায়গণের রায় উপাধি ছিল। দাসগণ বর্ত্তমানে নির্ব্বংশ, দেবদের একশাখা নদীর দক্ষিণ পারে উঠিয়া যান ও নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া দেওয়ান উপাধি পান ও দেওয়ানগাও স্থাপন করেন। অন্য শাখা রায়নগরে অবস্থান করেন; এই বংশে সুপ্রসিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় দারোগা জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় দারোগা ও লালা আনন্দ রাম প্রায় সমসাময়িক, ইঁহারা প্রথমে এ অঞ্চলে দালান-বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। স্বর্গীয় গিরীশ রাজার বাড়ীর পূর্ব্বে টীলায় মৃত্যুঞ্জয় বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। হালাবাদী জরিপের দাগ মৃত্যুঞ্জয়ের নামে আছে।"[১]

রায়বাহাদুর রাধানাথ

"ঐ মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে রায় বাহাদুর রাধানাথের বাড়ী ছিল। তিনি এক সময় ধন-গৌরবে, কুল-গৌরবে ও পদমর্য্যাদায় শ্রীহট্ট জিলার সর্ব্বত্র কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত হন। তিনি একবার দোল উপলক্ষে কৃত্রিম বৈলাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তরফ, মান্দারকান্দি, ইটা, চৌয়ালিশ, লংলা দুলালী প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোক আহূত হইয়া আসিয়াছিলেন। "রায়বাহাদুরের খালি বাড়ী" রায়নগরের বালকের নিকটও সুপরিচিত। বাড়ীর ঈশান কোণে টীলার ন্যায় কৈলাস অবস্থিত, লোকে এখনও তাঁহাদিগকে রায়নগরের স্থাপয়িতা বলিয়া "রায়" বলিয়া সম্বোধন করে।"[২]

---

১. লালা আন্দরাম ইংরেজ আমলের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় হালাদি জরিপের সময় বর্ত্তমান থাকিলে লালার শেষাবস্থাতেই দারোগার অভ্যুদয় হইয়া থাকিবেক। সুতরাং উভয়কে প্রায় সমসাময়িক বলা অন্যায় নহে। মৃত্যুঞ্জয়ের টীলা পরে রাজা গিয়া চন্দ্রের অধিকার ভুক্ত হয়। লালা আনন্দরাম ও রাজা গিরীশচন্দ্রের জীবন কথা চতুর্থভাগে বর্ণিত হইবে।

২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংং। ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে দেওয়ান আনন্দ নারায়ণের প্রসঙ্গোপলক্ষে বলা হইয়াছে যে তাঁহার "রায়" উপাধি হইতে শ্রীহট্টের রায়নগরের নাম হয়। এ বিবরণ সে কথারই প্রতিবাদ।

"ইহাদের গৃহজামাতারূপে সেন বংশ আসেন ও কুলমর্য্যাদায় রায়নগরের কায়স্থ সমাজের শ্রীকর্ণীত্ব প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে সেনদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। ইঁহাদের ভবিষ্যত কি হয় জানিনা, তবে এখনও ক্ষীণহস্তে ইহারা সমাজে কর্ণধার হইয়া চলিয়া আসিতেছেন।"

"মজুমদারগণ—বরশালার মজুমদার; ইঁহাদের দুই শাখা ছিল, এক শাখা নির্ব্বংশ (মাত্র এক বিধবা জীবিতা আছেন) ও অন্য শাখা স্থানত্যা বরশালার মজুমদারের হিন্দুশাখা রায়নগরের মজুমদার ও মোসলমান শাখা গড়দুয়ারের মোসলমান মজুমদার বংশীয়গণ।"[৩]

রাম তারক মজুমদার

"রায়নগরের রামতারক মজুমদার (যাঁহার বিধবা বর্ত্তমান) সম্প্রতি মারা গিয়াছেন; বরশালায় তাঁহার সম্পত্তি ছিল। মোসলমান মজুমদার ও রামতারক মজুমদার মধ্যে অনেক তালুক লইয়া বিবাদ বিসম্বাদও হয়। হামিদ বখত মজুমদার সাহেব রামতারককে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি দিতেন, বর্ত্তমান খাঁ বাহাদুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

"বরশালার মজুমদার বংশ বিভক্ত হইয়া গেলে তাঁহাদের দেবতা বাসুদেব রায়নগরেই আনীত হন, সেই দেবতা সেদিন মাত্র নরসিংহ টীলায় গিয়াছেন।"[৪]

"রামতারক বড় তেজস্বী ও জাত্যভিমানী ব্যক্তি ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে দারিদ্রের চরম অবস্থায় নিয়া গিয়াছিলেন। উপবাসে তাঁহার অনেক দিন গিয়াছে, তবুও লোকে তাঁহাকে পাদুকাহীন অবস্থায় দেখে নাই, বাজারে জিনিস ক্রয় বিক্রয়ে দেখে নাই; চাকর নাই, হাতে পয়সা আছে, তবুও উপবাস করেন, বাজার হইতে চাউল ডাল কে আনিয়া দিব?"

"রাজা গিরীশ চন্দ্র একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'আপনি কষ্ট পাইতেছেন, আমার এখানে রোজ একবার আসিয়া কিছু আলাপ প্রসঙ্গ করিবেন, আপনাকে ৩০ টাকা করিয়া দিব।" রামতারক বলিলেন—"তাহা পারিতাম, তবে আজ আপনি আমাকে যেরূপ অভিবাদন করিয়াছেন, আপনার প্রস্তাবে রাজি হইলে আপনাকেই তদ্রূপ অভিবাদন করিতে হইবে।"

"এই মজুমদারগণ গুপ্ত উপাধিধারী। ইঁহারা যদিও অপর স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তবুও দেব (বা রায়) হইতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হন। কারণ দেবগণ বহু বৎসর ব্যাপিয়া বড় দুর্গতিতে পড়িয়াছিলেন।"

বিভিন্ন বংশ

"এতদ্ব্যতীত রায়নগরে মোহন রায়ের একটি বংশ ছিল, তাঁহার বাড়ীর চিহ্ন আছে, প্রায় ২০০ বৎসর হইল, সেই বংশ লোপ পাইয়াছে। শম্ভুরায়ের আর একটি বংশ ছিল, শম্ভুরায়ের দীঘী ও দুইটি শিবালয়ের ভূকম্পের অবশিষ্ট ভগ্নাবশেষ আছে।" "রায় নগরে দানী রায় বলিয়া

৩. শ্রীহট্ট দর্পণ এবং Mazumdar family গ্রন্থের নির্দ্দেশ মতে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে সর্ব্বানন্দকে দস্তিদার বংশীয় বলা হয়, এ বিবরণ প্রকৃষ্ট প্রতিবাদ। মতান্তরে রায়নগরের মজুমদারের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ বরশালা হইতে আখালিয়াতে গমন করেন এবং তথা হইতে রায়নগরে সমাগত হন।

৪. মোগল রাজত্বের অবসান কালে বাবা শান্তিদাস শ্রীহট্টে আসিয়া এক সুরম্য স্থানে নিজ সিদ্ধাশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার জটাকলাপ মধ্যে নরসিংহ দেবতাকে তিনি রাখিতেন। এই স্থানে সে দেবতা স্থাপন করিলে আশ্রমটি নরসিংহ টীলা নামে খ্যাত হয়। নরসিংহ দেবের সেবাব্যয় সুদীর্ঘকাল মণিপুরাধিপতি প্রদান

আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। দানীরায় দেব ছিলেন।"[৫]

"ইহা ছাড়া রায়নগরে একটি আদিত্য বংশ ছিল, তাঁহার বাড়ীতে মণিপুরীরা বাস করিতেছে, তাহা এখন আদিত্য পাড়া নামে খ্যাত। মণিপুরীরা প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় পলাইয়া আসিয়া লালা আনন্দ রামের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আনন্দগঞ্জে (গোয়ালিনীর তীরে) বাস করে ও তাহার পরে আদিত্যের বাড়ীতে আসিয়া বাস করে। আদিত্য বংশের শেষ ব্যক্তি রায়াদিত্য (১২৫৮ বঙ্গাব্দ)"[৬]

"এই আদিত্য বংশও রায়নগরের আদিম অধিবাসী নহেন। দেব ছাড়া কেহই প্রাচীন নহেন। এই আদিত্য কাহারা, তাহা বলা যায় না, তবে লোক মুখে শুনা যায় যে আদিত্যেরা অতি প্রাচীন বংশ সম্ভুত, ইহারাও বরশালার লোক।"[৭]

"এতদ্ব্যতীত রায়নগরে একটি চৌধুরী বাড়ী ছিল, চৌধুরীদের বংশ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বংশ হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তিনি 'বুড়াশিব।' তাঁহার আদি অন্ত নাই, কেহ তাঁহাকে স্থাপন করে নাই।"[৮]

"রায়নগরের কায়স্থের কথা বলিতে একঘর সাহুদের কথা বলিতে হয়, তাঁহারা পুরকায়স্থ উপাধিধারী, তাঁহারা মূলতঃ কায়স্থ ছিলেন। সমাজে রাজা গিরীশ চন্দ্রের পরেই তাঁহাদের স্থান। কিন্তু কায়স্থেরা ইঁহাদের সঙ্গেই বেশী মিলিয়া থাকেন। সেন, মজুমদার; রায়দেব সম্মানের মত পুরকায়স্থকেও লোকেরা সম্মান করিয়া থাকে, তবে কায়স্থ ও সাহু এই যা প্রভেদ।"

সুপ্রসিদ্ধ রাজা গিরীশচন্দ্রের মাতামহ বংশীয় দেওয়ান মুক্তারাম ও মাণিকচাঁদ প্রভৃতির কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় ভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে উক্ত হইয়াছে; দেওয়ান মাণিকচাঁদের পুত্র বাবু মুরারিচাঁদের ও তদীয় দৌহিত্রের কথা ৪র্থ ভাগে কথিত হইবে।

আখালিয়া

প্রসিদ্ধ দস্তিদার বংশের কাহিনী আমরা পূর্ব্বেই[৯] বর্ণন করিয়াছি, ৪র্থ ভাগে তদ্বংশীয় দয়ালকৃষ্ণের কথা কথিত হইবে। এ বংশীয় সুবিদরায়ের নামানুসারে "সুবিদরায়ের গৃধা" বলিয়া

---

৫. দানীরায়ের বাড়ীর শ্রেষ্ঠাংশেই এই বিবরণ প্রদাতা শ্রীযুত রজনীরঞ্জন দেব মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন। রজনী বাবু লিখিয়াছেন-"দানী রায়ের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, প্রসিদ্ধ রায় বংশের সহিতও সংশ্রব নাই। রাঢ়দেশ হইতে আসিয়াছি এই মাত্র জানি, রায়নগরে কুলগৌরবে কখনও শ্রেষ্ঠ হইতে পারি নাই, তবে গোত্র ও প্রবরের হিসাবে তাহা বলা যাইতে পারে।"

৬. রজনীবাবু লিখিয়াছেন-"রায়দিত্য ১২৫৬ বঙ্গাব্দে একখণ্ড ভূমি আমার পিতামহকে বিক্রয় করেন; তাঁহার হস্তাক্ষর ও দলিল আমার কাছে আছে।"

৭. প্রাপ্ত প্রস্তর ফলক-আদিনা মহলায় প্রাপ্ত একখণ্ড শিলালিপি মজুমদার সাহেবগণ সযত্নে রক্ষা করেন। Historical Researehes in Assam গ্রন্থে ৪র্থ পৃষ্ঠায় উহা Undecipehereable বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তর ফলক সম্প্রতি দস্তিদারদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার পশ্চাৎভাগে দুইটি শৃগাল অঙ্কিত আছে এবং সম্মুখভাগে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে কিছু লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত রজনী বাবু বলেন "আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি মতে যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে 'বরছরা গ্রামে জনৈক কে ভূমিদান করিয়াছেন। বৎসর ৯০১' বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহারাই কি রায়নগরের আদিত্য?"

৮. এই অনাদিলিঙ্গ শ্রীযুত রজনী বাবুদের অধিকারে আছেন। "এই বৃহৎ লিঙ্গটি একজনে তুলিতে পারে না; কিন্তু প্রায়শঃ একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত হইতে দৃষ্ট হয়, কে নেয় বলা যায় না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে "ব্রহ্মদৈত্য" কর্ত্তৃক শিবলিঙ্গ এইরূপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইয়া থাকেন। এই লিঙ্গ কোন মন্দিরে থাকেন না, কেহ কেহ মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিপদগ্রস্ত হওয়ায় আর মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। প্রধানতঃ একটা সেওড়াগাছের তলাতেই শিব থাকেন; বৃক্ষটি দীর্ঘকালাবধি একই অবস্থায় আছে।"

যেমন তাঁহার বাসস্থান পরিচিত, আখালিয়াতেও তদ্রূপ "চান্দরায়ের গৃধা" ও "রাজেন্দ্ররায়ের গৃধা" নামে দুই মহল্লা আছে। চান্দরায় ও রাজেন্দ্ররায় উভয়েরই মজুমদার উপাধি ও কানুনগো পদ ছিল। রাজেন্দ্ররায়ের আলম্বায়ন গোত্র ও পাল পদ্ধতি ছিল; সাধারণতঃ রাজরাম নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি আখালিয়ার মজুমদারগণেব এক বংশে পূর্ব্ব-পুরুষ।

আখালিয়ার মোনশী দেবীপ্রসাদ রায় ইউরোপীয় শিক্ষার্থীর জন্য Poly glotd Grammar প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রামার পারস্য, আরবিক, হিন্দি, উর্দ্দূ, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থ বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল। দেবীপ্রসাদের ভ্রাতার পৌত্র বর্ত্তমান আছেন।

আখালিয়াতেই "বিদ্যোদয়" প্রণেতা জয়গোপালের জন্ম। একখানা দানপত্র ইহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তদীয় পিতামহ শোভারাম ১১৭০ বঙ্গাব্দে স্বীয় কুল দেবতা স্বগীয় মদনমোহনের নামে ৫/ হাল ভূমি দেবত্র প্রদান করেন। শোভারামের তিন পুত্র, —লালা জয়কৃষ্ণ, রামসুন্দর ওরফে জীবনকৃষ্ণ ও জয়নারায়ণ। তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে ঢাকা জলালপুর জেলার কালেক্টারের দেওয়ান হইয়া প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন এবং বাড়ীর বহির্ভাগে এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, এই ভ্রাতৃত্রয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ জয় নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই জয়গোপাল। জয়গোপাল পারস্যভাষায় বুৎপন্ন হইয়া মোনশী নামে খ্যাত হন। আসাম ইংরেজাধীন হইলে জয়গোপাল তথায় গমন করেন, তিনি তত্রত্য জুডিসিয়াল কমিশনার মেথী সাহেবের পেস্কার ছিলেন। মেথী সাহেব এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের বালকবর্গকে উপদেশ দিবার জন্য মেথী সাহেবের অনুরোধে "বিদ্যোদয়" গদ্যে রচিত হয়। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় নাই, "বিদ্যোদয়" সেই সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে ইহার মূল্য আছে। জয়গোপাল পেস্কারী হইতে সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন ও পরে গোয়ালপাড়ার সদর আমীনের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি সেতু ও এক শিবমন্দির অদ্যাপি আছে। লালা জয়কৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ এবং জয়নারায়ণের বংশধরবর্গ সসম্মানে আখালিয়াতে বাস করিতেছেন।[১০]

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে (২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায়) ইংরেজ আমলের প্রথমকার পুণ্যাহ প্রথার কথা কথিত হইয়াছে, আখালিয়ার শ্রীযুক্ত গোকুলনাথ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষই পুণ্যাহে "পুষ্প-চন্দন" প্রাপ্ত হইতেন। আখালিয়ার সাহুবংশে ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ, মর্য্যাদায়ও ইঁহারা শ্রেষ্ঠ।

দুলালীর বৈদ্য বংশ

"দুলালী দুর্ল্লভ স্থান, মঙ্গলচণ্ডীর অধিষ্ঠান" এই প্রবাদোক্ত দুলালী পরগণা ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদির বাস হেতু তদঞ্চলে দুর্ল্লভ স্থানই হইয়াছিল। মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে দাসপাড়া ও হুজুরী গ্রামবাসী বৈদ্যবংশের আদিপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস স্বীয় গুরু পুরোহিতাদি সহ দুলালীতে আসিয়া বাস করেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত (অধুনা পদ্ম-গর্ভগত) নোয়াপাড়া নামক গ্রাম তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল বলিয়া কথিত আছে। দাসপাড়া নিবাসী ভট্টাচার্য্যগণের আদি পুরুষ ধরাধর মিশ্র লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের গুরু ও পুরোহিত ছিলেন।

হুগলী জিলার অন্তঃপাতী গুপ্তিপাড়া গ্রাম হইতে গুপ্তপাড়া ও পুরকায়স্থপাড়া নিবাসী গুপ্তগণের আদি পুরুষ সহস্রাক্ষ গুপ্ত আগমন করেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের কন্যাকে বিবাহ

৯. শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস, এম,এ,বি,এল, প্রভৃতি জীবনকৃষ্ণের প্রপৌত্র স্থানীয়।

করিয়া দুলালীতে অবস্থিতি করেন।

ইহার পরে হবিনগর, মাজপাড়া, ইলাসপুরবাসী গুপ্তগণের আদি পুরুষ কাশীনাথ গুপ্ত দুলালীতে আসিয়া বাসভূমি নির্দ্ধারণ করেন। কাশীনাথ রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া প্রথমতঃ শ্রীহট্ট শহরের প্রান্তবর্ত্তী বরশালা গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে দুহালীতে চলিয়া যান।

কাশীনাথের পুত্র ভরতরায় মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন, তিনি হরিনগর পরগণা নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। হরিনগর পরগণা দুলালীর সহিত ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত। দাস বংশীয় প্রতাপনারায়ণ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে পেশকার ছিলেন। ঐ বংশীয় কান্তনাথ দাস শ্রীহট্ট জজ আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন।

গুপ্তবংশের তিলকরায় কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, "তিনি শিরোমণি" উপাধি লাভ করেন। তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শ্রীহট্ট গোস্বামীকৃত একখানা গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অধুনা-প্রকাশিত রঘুনাথ লীলামৃত নামক এক পুস্তকে লিখিত আছে যে শ্রীহট্টের তিনি সহজ ভজন মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই মত প্রচারক শ্যামকিশোর ঘোষ,[১১] ও রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য[১২] প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ শিষ্য করায় শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার একান্ত বিরুদ্ধ ছিলেন; এবং তজ্জন্য উভয় শাস্ত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়াছিলেন।

গুপ্তবংশী গৌরীচরণ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন; তিনি মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তপাড়ার যুগলকিশোর গুপ্তের পুত্র স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু গুপ্ত বৈষ্ণব ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত রূপচিন্তামণি গ্রন্থের পদ্যানুবাদ তিনি প্রকাশ করেন। তৎকৃত "অপূর্ব্ব দর্শন" পদাবলী পাঠে তদীয় ভজননিষ্ঠার পরাকাষ্টর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোসলমান রাজত্বকালে দাসপাড়ার দাসবংশীয় যোগ্যতম ব্যক্তি পরগণার পাটওয়ারীর কাজ করিতেন। জগন্নাথ পুরকায়স্থ শেষ পাটওয়ারী। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই পদ উঠিয়া যায়। দাস বংশের বর্ত্তমান গৌরবভাজন পেনশন প্রাপ্ত ডিঃ মাঃ শ্রীযুত সদয়াচরণ দাসের প্রপিতামহ সমীপবর্ত্তী আখালিয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। ইঁহারা এখনও আখালিয়া বাসী।

দুলালীস্থ তেরহাতী দত্তকাপনের সেন বংশে মনোহর সেনের উদ্ভব হয়। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে গুণরাজ খানের ন্যায় তিনি "কৃষ্ণ বিজয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ব্যতীত "হাস্যনাথের পাঁচালী" ও কৃষ্ণলীলাত্মক সঙ্গীতাবলী তাঁহার কৃত। ঐ সকল সঙ্গীতের পসার এখনও আছে।

"সেন মনোহরে বলে গুনহে কালিয়া।
নিভাইল প্রেমের আগুণ কে দিল জ্বালাইয়া॥"

তাঁহার নাম যুক্ত এই ভণিতাটি হইতেই বুঝা যায় যে তিনি প্রেম-রসে রসিক ছিলেন।

ইলাসপুরের গুপ্তবংশে শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ মুরারি গুপ্ত জাত হইয়াছিলেন।[১৩] ৪র্থ ভাগে ইহার সংক্ষিপ্ত কথা কথিত হইবে। কিন্তু ঢাকাদক্ষিণের মিশ্রবংশীয়গণ বলেন যে, মুরারি গুপ্ত তত্রত্য "বেজের পাড়া" নামক পল্লীবাসী ছিলেন। বেজের পাড়ার গুপ্তবংশ মিশ্রবংশেরই যজমান ছিলেন। এক্ষণে এ বংশ বিলুপ্ত কেবল তাঁহাদের বাটিকাদির চিহ্ন পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতে বর্ত্তমান আছে। দশসনা বন্দোবস্তের পর পর্যন্ত এ বংশের ধারা চলিয়াছিল, তখন এ বংশীয় রঘুদেবের

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৮ম অধ্যায়ে ইঁহার কথা উক্ত হইয়াছে।
১২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৪র্থ ভাগে ইঁহার জীবন চরিত বর্ণিত হইবে।
১৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৪র্থ ভাগে ইঁহার জীবনচরিত বর্ণিত হইবে।

নামে একটি তালুক বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এ বংশের শেষ বংশধরের নাম ভানুরাম, ইনি উকীল ছিলেন।

ঢাকাদক্ষিণে আর এক বংশ বৈদ্য ছিলেন, উক্ত বিলুপ্ত বৈদ্য বংশের উল্লেখ পূর্ব্বে[১৪] করা গিয়াছে।

ঢাকাদক্ষিণের চৌধুরী বংশ

নামতত্ত্ব

শ্রীহট্টের একাংশের নাম যেমন মগধ ছিল, শ্রীহট্টে যেমন এক গৌড় ছিল, তদ্রূপ শ্রীহট্টে মিথিলা বলিয়া কোন স্থান ছিল না কি? পুরন্দরকৃত "চৈতন্য চরিত" নামক এক গ্রন্থে[১৫] লিখিত আছে যে, শচী ও জগন্নাথ তাঁহাদের স্বদেশ মিথিলায় গিয়াছিলেন তথায় শচী দেবী গর্ব্ভধারণ করিলে এক স্বপ্ন দর্শন পূর্ব্বক তাঁহারা নবদ্বীপে গমন করেন। তথায় শ্রীমহাপ্রভুর উদ্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলীতেও ঠিক এই রূপ কথা পাওয়া যায়।[১৬] কিন্তু তাহাতে ঢাকাদক্ষিণের নামের স্থলে "গুপ্ত বৃন্দাবন" লিখিত। "চৈতন্য চরিতের" পাঠকের মনে এ প্রশ্নটি জাগিতে পারে না কি যে উক্ত মিথিলা কোন মিথিলা? উহা উদয়াবলীল "গুপ্তবৃন্দাবন" বা ঢাকাদক্ষিণের উদ্দেশ্যে লিখিত না কি?

কাছাড় রাজগণের উপাধি নারায়। নারায়ণ বংশীয় রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাঁরা সুরমা উপত্যকার সমতল ভাগের আধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু কথিত আছে যে উক্ত বংশীয় জনৈক রাজা ঢাকনলাল ওঝা নামক জনৈক পশ্চিমা পাড়েকে কুশিয়ারার পশ্চিমে কতক ভূমি দান করিয়াছিলেন, ঐ ভূমিই ঢাকন লালের নামানুসারে ঢাকাদক্ষিণ এবং তদুত্তর ভাগ ঢাকাউত্তর নামে খ্যাত হয়।[১৭]

ঢাকনালের সময় বর্ত্তমান কালের প্রায় দ্বাত্রিংশৎ পুরুষ উর্দ্ধে।[১৮] পক্ষান্তরে কাছাড় রাজ্যের সীমা কোনকালে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া জানা যায়না। "জীবন-বৃত্তান্ত" পুস্তিকার এতদ্বিষয়ক জনশ্রুতি মূলক বৃত্তান্তে সম্ভবতঃ অন্য কোন রাজার স্থলে কাছাড়রাজ লিখিত হইয়া থাকিবে। ঢাকনলাল স্নান জন্য যে পথে নদীতে যাইতেন, তাহার ক্ষীণ চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে আছে, উহা "পাড়ে ওঝার জাঙ্গাল" নামে কথিত হয়।

দেবদাসের কথা

রায়গড়ের ভরদ্বাজ গোত্রীয় দেবোপাধি চৌধুরী বংশীয়গণই ঢাকাদক্ষিণের প্রাচীন কায়স্থ বংশ। কথিত আছে যে এ বংশীয় বীজী পুরুষ দেবদাস গোকর্ণ, মতান্তরে কর্ণকেশী গ্রাম হইতে আগমন করেন এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত পাড়ের যজমানত্ব স্বীকার করেন; ইহা খৃষ্টীয় একাদশ

---

১৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশে ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৩য় অধ্যায়ের টীকা দেখ।

১৫. এ গ্রন্থের প্রায় ১০৫ বৎসর পূর্ব্বকার হস্তলিখিত পুঁথি আমাদের কাছে আছে; গ্রন্থকারের পরিচয়সূচক কিছু লিখিত নাই।

১৬. শচী ও জগন্নাথের ঢাকাদক্ষিণ গমন ও তথা হইতে পুনঃ নবদ্বীপাগমন পূর্ব্বোক্ত ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭. "জীবন-বৃত্তান্ত" নামক পুস্তিকা অবলম্বনে ইহা লিখিত, তাহাতে এইরূপই উল্লেখিত। কিন্তু কেহ বলেন, একস্থান ঢাকাবিল নামে খ্যাত ছিল এবং তাহার উত্তর ও দক্ষিণই যথাক্রমে ঢাকাউত্তর ও ঢাকাদক্ষিণ নাম প্রাপ্ত হয়।

১৮. ঢাকনলাল ওঝার বংশীয়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক, রামবল্লভ ভট্টাচার্য্যের পরবর্ত্তিগণ ঢাকাদক্ষিণের রায়গড়ের উত্তরাংশে বাস করিতেছেন।

শতাব্দীর ঘটনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

দেবদাস হিন্দু নৃপতি হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহার বসতি স্থলই "রায়গড়।" দেবদাসের চতুর্দ্দশ পুরুষে তদ্বংশ দুই শাখায় বিভক্ত হয়; এক শাখা হরিলোচন ও দ্বিতীয় শাখা রবিলোচনের নামে খ্যাত। হরিলোচনের দশম পুরুষে (আদি পুরুষ দেবদাস হইতে ২৪শ পুরুষে) অনন্ত দাসের উদ্ভব হয়, ইনি দিল্লী হইতে চৌধুরাই সনন্দ লাভে চৌধুরী বলিয়া সম্মানিত হন।

বিষ্ণুদাস ও চৌধুরাই দস্তখত

অনন্ত দাসের[১৯] মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনন্দ "চৌধুরাই" প্রাপ্ত হন, তৎপূর্ব্বে খেতাবি ছিল "রঘুনন্দন শিকদার"। তৎকালীয় রাজবিধান মতে তাঁহার পুত্র বিষ্ণুদাস রাজমহলে রাজকীয় কার্য্যে থাকিতেন। তিনি বিদায় গ্রহণে বাড়ী আসিয়া আর স্বকার্য্য প্রত্যাগমন না করায়, রঘুনন্দন স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচরণকে পুত্রের কার্য্যে প্রেরণ করেন।

ইহার পর রঘুনন্দনের মৃত্যু হইলে, পুত্র বিষ্ণুদাসই "চৌধুরাই" কার্য্য পরিচালনা করেন।

ভ্রাতার মৃত্যুর অবসরে শম্ভুচরণ, ভ্রাতুষ্পুত্র বিষ্ণুদাসকে "চৌধুরাই" হইতে বঞ্চিত করার মানসে "কবি" এই উপনামে এক চৌধুরাই সনন্দ আনয়ন করেন। প্রকৃত পক্ষে "কবি" নামে কেহ ছিল না। শম্ভুচরণ বিষ্ণুদাসকে "কবি" নামই স্বীকার করিতে বলেন, কিন্তু তিনি ইহা খুল্লতাতের কোনরূপ কৌশল মনে করিয়া কবি নামে দস্তখত করিতে অস্বীকৃত হন ও পিতৃনাম দস্তখত পূর্ব্বক কার্য্য চালাইতে থাকেন।

ইহার পরে বিষ্ণুদাস "কবি" এই মিথ্যা দস্তখত সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া নিজ নামে চৌধুরাইর জন্য আবেদন করিলে তাহা সরকারে গ্রাহ্য হয়; কিন্তু এই সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইতে পারে নাই। শম্ভুচরণ নিজপুত্র মথুরেশকেই "কবি" নামীয় চৌধুরীই সনন্দ গ্রহণ করাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; ইহাতে মথুরেশ "কবিঠাকুর" বলিয়া

---

১৯. অনন্তরাম দাস চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বংশাবলী উদ্ধৃত করা গেল–

অনন্তরাম দাস চৌধুরী
- অচ্যুতানন্দ
- রঘুনন্দন চৌধুরী
  - বিষ্ণুদাস
    - চান্দরাম
      - রাধারাম
        - ফুলরাম
        - দুর্ল্লভরাম
        - সোণারাম
          - ধনরায়
            - রাধামোহন
              - রমণী মোহন প্রভৃতি (১) তিন পুত্র। কুঞ্জলতা (কন্যা)
          - হুলাসরায়
          - সুবিদ রায়
            - প্রকাশচন্দ্র দেব
            - জগচ্চন্দ্র
              - যামিনী কুমার প্রভৃতি চারিপুত্র
          - রায়কৃষ্ণ
- মহেশচন্দ্র
- শম্ভুচরণ
  - মথুরেশ চৌধুরী
    - চণ্ডীচরণ
      - রাঘবরাম
        - গোলাপ রাম
          - রামকিঙ্কর
            - রামগোপাল
              - বিপিন বিহারী
                - নির্ম্মলা সুন্দরী (কন্যা)
- গোবিন্দদাস

খ্যাত হন। এই কবি নাম যে অপ্রকৃত তাহা ১০৫ সালের লিখিত "হকিগত নামা" হইতে জানা যায়।[২০]

ভাইয়া পরশুরাম ও পং ফরক্কাবাদ

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় (রবিলোচনের) শাখায় পরশুরাম দাস এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ইনি প্রথম শাখার চণ্ডীচরণ চৌধুরীর সমসাময়িক। পরশুরাম বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত নিরক্ষর ছিলেন; একদা পরশুরাম আহার করিবার জন্য বসিলে তাঁহার মাতা অন্নের পরিবর্ত্তে একথালা ছাই দিয়া পুত্রকে বলিলেন, "খাও, মুর্খের খাদ্য ইহাই।" পরশুরাম মাতা কর্ত্তৃক এইরূপ অবজ্ঞাত হওয়ায় নিজমনে ধিক্কৃত হইলেন ও সেই দিনই দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে গিয়া তিনি পারস্য ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করেন।

শম্ভুচরণের পৌত্র চণ্ডীচরণ ঐ সময় কোন কারণে দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন; তখন

---

(১) পেন্সনার। আসাম সেক্রেটারীয়েটে সুপারিনটেনডেন্টের পদে কার্য্য করিয়া ১৭৫ টাকা পেন্সন্ পাইতেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রায়সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি স্বীয় চরিত্র মাধুর্য্য সর্ব্বসাধারণের সম্মান ভাজন হইয়া আছেন।

২০. নিম্নোদ্ধৃত হকিগত নামা (স্বত্ব নামা) হইতে ১০৫৪ সালের ভাষা ও লিখন পদ্ধতির উদাহরণ পাওয়া যাইবে, যথা ঃ–

"হকিগত নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমরা আপনা বুরব্বি (১) সকলের পাসত (২) শুনিয়াছি জয়ার বায়গড়ের রঘুনন্দন চৌধুবী আছিলা দচপত (৩) তান আছিল। পগণাব সিকদার আছিলা স্বগীয় খিতাবী নাম রঘুনন্দন সিকদার আছিল–তান বেটা (৪) বিষ্ণুদাস দেবে রাজ হলে উনকামাইতা (৫) সে খানত আসিয়া সাদি (৬) করিয়া পুনশ্চ উন গেছিলা (৭) পরে অনেক বছর বাদে (৮) এক আসা বরদার (৯) সঙ্গে লৈয়া এক মাসর বিদায় লৈয়া বাড়িতে আসিলা একমাস বাদে আসাবরদারে নিবার (১০) একীয়ত করিল (১১) তাতে বিষ্ণুদাস দেব উন যাইবার কবুল (১২) না করণে তান পিতা চৌধুরীএ অনেক কহিলা তথাচ উন জাইবার কবুল না করিলা পরে রঘুনন্দন চৌধুরী উন জাও তাইন (১৫) উন জাইবার কবুল করিলা তান উপর খুস (১৬) হৈয়া পাগুড়ি (১৭) বান্দিয়া রাজমহলে উন দিলা–শম্ভুরামদেবে অনেক বছর (১৮) উন কামাইলা পরে রঘুনন্দন চৌধুরীর কাল (১৯) হৈলে পরে শম্ভুরাম দেবে কবি নামে চৌধুরাই ছনদ হাসিল করিয়া (২০) আনিয়া পরে বিষ্ণুদাস দেব গং স্বগীয় ইখান (২১) নালিস করিলা আমার পিতা রঘুনন্দন চৌধুরীর নামে দচখত আছিল শম্ভুবাম দেবে কবি নামে ছনদ আনিলা ছববকি (২২) তাতে শম্ভুরাম দেবে জবাব দিলা আমার কেওর (২৩) নাম কবি না হয় বিনাম ছনদ আনিছি (২৪) জুয়ারর ছরবরা করিয়া স্বগীয় কাম জে দেয় তার নাম কবি–এই ছনদ বিষ্ণুদাস দেবের হৈল তাইন (২৫) কবি নামে দছখত করূকা (২৬) পরে বিষ্ণুদাস দেবে জবাব দিলা বিনামের দচগত আমি না করিমু আমার পিতা রঘুনন্দন চৌধুরী নামে দচগত আছিল এখন ফয়েতি (২৭) হৈছে হাদুজ সেই নামে দচগত করিতেছি এখন সেই নাম লেখিমু পরে আমার নামে ছনদ হাসিল করিমু এইকথা স্বগীয় সাক্ষাত মঞ্জুব হৈল-কবি নামর ছনদ জারি না হৈল-বিষ্ণুদাস দেবে জুয়ারর ছরবরা করিয়া কাম দিতা (২৮) পরে বিষ্ণুদাস দেব কাহিলা হৈয়া ঘর বসিলা শম্ভুরায় দেবে কামহিমতে করিয়া কবি নামের ছনদ জারি করি মথুরেশ নামে দছগত কারলা বিষ্ণুদাস দেব গং না জানিয়াই---(২৯)---মজাহিম না মানিলা---হৈতে---আমরা মুরবিব সকলর পাসত শুনিছি জানি শুনিয়া হকিগত পত্র লিখিয়া দিলাম ইত সন ১০৫৪ (তারিখ কীট ভক্ষিত)

শব্দার্থ– (১) প্রাচীন (২) নিকটে (৩) দস্তখত (৪) পুত্র (৫) উন কার্য্য? (৬) বিবাহ (৭) গিয়াছিলা (৮) বৎসর অতীতে (৯) আসাধারী কর্ম্মচারী (১০) লইবার (১১) জানাইল (১২) সম্মত (১৩) ক্রুদ্ধ হইয়া! (১৪) বলিলেন (১৫) তিনি (১৬) আনন্দিত (১৭) উষ্ণীষ (১৮) বৎসর (১৯) মৃত্যু (২০) মঞ্জুর করিয়া (২১) এই খানে (২২) কারণ কি? (২৩) কেহর (২৪) আনিয়াছি (২৫) তিনি (২৬) করুণ (২৭) মালীক শূন্য (২৮) দুর্ব্বল (২৯) এই স্থানে কীট দংষ্ট প্রায় দুই ছত্র আছে।

এই দলিলে ঢাকাদক্ষিণ ও ঢাকাউত্তরের ১১ জনা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম সাক্ষব আছে, যথা–মথুরেশ, শম্ভুচরণ, রাজারাম গুপ্ত, শেখ বিরাহিম ইত্যাদি।

বাদশাহ ফরকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট (খৃঃ ১৭১৩-১৯) ছিলেন। চণ্ডীচরণ চৌধুরী সম্রাটের অনুকম্পা লাভ করিয়া ঢাকাদক্ষিণ হইতে তাঁহাদের বাসস্থান খারিজ করিয়া লন। সম্রাটের নামানুসারে তাহা ফরক্কাবাদ পরগণা বলিয়া খ্যাত হয়। চণ্ডীচরণ সম্রাটের অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরেই হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁহার ভাগিনেয়ই সনন্দ গ্রহণ করেন; কিন্তু দৈব বশতঃ ইঁহারও তখন মৃত্যু হয়। পরশুরাম তখন চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিচয়ে দরখাস্ত করিয়া ফরক্কাবাদ প্রাপ্ত হন।[২১] অধিকন্তু স্বীয় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি "ভাইয়াজি" "ভাইয়ার দীঘী" প্রভৃতি তাঁহার নামের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। পরশুরামের পুত্র রাজবল্লভ নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা রাধাবল্লভের বংশীয়গণ বৰ্ত্তমান আছেন।

ঢাকা দক্ষিণের দত্ত বংশ

দত্তরালি গ্রাম

চৌধুরী বংশের বীজীপুরুষ পূর্ব্বোক্ত দেবদাসের বংশে হলধর নামে এক খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ঢাকাদক্ষিণে বহুতর ভদ্রলোকের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি দত্ত বংশীয় হৃদয়ানন্দ নামক এক দরিদ্র ভদ্র ব্যক্তিকে পুত্র ও পৌত্রাদি সহ সপরিবারে "রাণীঘাট" হইতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন ও নিজ তনয়া সুতপাকে তাঁহার পৌত্র বিপুলানন্দের কাছে বিবাহ দেন। এই "রাণীঘাট" কোথায় ছিল? এ রাণীঘাট নদীয়ার রাণীঘাট বলিয়া বোধ হয় না। কুশিয়ারা নদীর পশ্চিমে "রণাডহর" বলিয়া একটা স্থান আছে, উহাই উক্ত রাণীঘাট নামে কখনও খ্যাত ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে, হৃদয়ানন্দ কুশিয়ারার পূর্ব্বতীরে অবস্থিতি করিতেন। হলধর কর্ত্তৃক যে স্থানে হৃদয়ানন্দ দত্তের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, দত্তদেব বাস নিবন্ধন তাহা "দত্তরালি" গ্রাম নামে খ্যাত হয়।

বংশবিস্তৃতি

হৃদয়ানন্দ দত্তের[২২] পুত্র ছিলেন নয়নানন্দ, ইঁহার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ দেবকীনন্দন, মধ্যম দেবীদাস এবং কনিষ্ঠ বিপুলানন্দ। কালে ইঁহাদের বংশ বিস্তৃতির সহিত তাঁহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক বাড়ীতে বাস করায়, উক্ত স্থান যথাক্রমে পূর্ব্বপাড়া, মাইজপাড়া ও উত্তরপাড়া নাম খ্যাত হয়; উত্তরপাড়াতেই বিপুলানন্দ ও সুতপার সন্তান বর্গের বাস

দৈবকীনন্দের পুত্রের নাম শ্রীনাথ। শ্রীনাথ অতি প্রতাপান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ক্ষমতায় ঢাকাদক্ষিণ মধ্যে তিনি প্রধান স্থান অধিকার করেন।

---

২১. রাজধানী মুর্শিদাবাদের অধীন পং ঢাকাদক্ষিণ হইতে এই নূতন পরগণা খারিজ করার কথা একখানা সুরতহাল পত্রে লিখিত আছে তাহাতে জানা যায় যে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের পরে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়; যথাঃ– "হবিগত ছুরতাল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে সন ১১২৫ সাল ভাইরা পুরুষ রাম দাস মোকাম মুর্শিদাবাদ পং ঢাকাদক্ষিণ হনে পং ফুরকাবাদ খারিজ করিতে মুচ্ছদি সকলে তোমার আধা খর্চ্চ পাকড় করিছিলা তাতে ভাইয়া মুজকরে বহুত তোল্লাস করিয়া তোমার তিহাই হিস্বা নং ৭০০ সাত শত কাহণ কৌড়ি মহাজনি করিয়া খৰ্চ্চ দিলা–মোকাম মজকুর পরগণা মজকুর খারিজ করিলা। এক সেহাই মোকাম শ্রীহট্ট মুফস্বল খারিজ করিতে একশত কাহণ কৌড়ি খৰ্চ্চ হইল। এতে পরগণা মজকর খরিদ করিতে আমরাও রাজি আছিলাম। রাজিনামা দেওয়ানী দফৰ্দ্দক স্বগীয় মহরে দিছি এই সমাচার আমরা জানি এতদার্থে ছুরতাল পত্র দিলাম। ইতি সন ১১২৯ সাল ২৩শে অগ্রহায়ণ সহরে মহরম।"

২২. ঘ পরিশিষ্ট দেখ। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামনির্দ্দেশে তত্রস্থানে তাঁহাদের প্রসিদ্ধির কথা বলা যাইবে।

"শ্রীনাথ কবি
দিল মোহাম্মদ নবি"

নামে ঢাকাদক্ষিণে চারি দস্তখত প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে প্রথম দস্তখতই শ্রীনাথ দত্তের নামান্বিত। দত্তরালীর দত্তগণই এই সম্মানের অধিকারী। স্বর্গীয় কালিকাপ্রসাদ চৌধুরী ইদানিং দৈবকীনন্দনের বংশে একজন ক্ষমতাশালী মিরাসদার ছিলেন।

"কবি"—এই অস্তিত্ববিহীন দস্তখতের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রায়গড়ের চৌধুরী বংশীয়গণ এই সম্মানের অধিকারী।

দিল মোহাম্মদ বংশীয়গণ কাণিশালি গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। নবি বংশীয়গণ রণকেলী (রণিকাইল) ও আমুড়ার চৌধুরী বংশ। এই বংশীয় প্রতাপান্বিত জমিদার মৌলবী আবদুল রহিম চৌধুরী একটি খাল সুরমা নদী পর্য্যন্ত খনন করাইয়াছিলেন, উহাই "মৌলবী খাল" নামে প্রসিদ্ধ।

পৃথকবংশ

দত্তরালির মোনশীর পাড়ায় কৃষ্ণাত্রেয় গৌত্রীয় আর এক দত্ত বংশের বাস। এই বংশে জানকীরাম দত্ত একজন উন্নত পুরুষ ছিলেন; তাঁহার রতিকান্ত ও মধুসূদন নামে দুই পুত্র ছিলেন। মধুসূদনের দুই পুত্র, ইঁহাদের নাম গণেশরাম ও জয়রাম। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নামে যথাক্রমে তত্রত্য ১২৭ নং, ১২৮ নং তালুকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জয়রামের ধনরাম ও জগজ্জীবন নামে দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ধনরামের পুত্রের নাম দত্ত এবং জগজ্জীবনের রামগঙ্গা, রামগোবিন্দ, রামকেশব ও রামরত্ন নামে চারিজন পুত্র ছিলেন; ইঁহাদের সময়ে হালাবাদি জরিপ হয়। রামগঙ্গা ও গোবিন্দের নামে ১২৬ নং "গোবিন্দগঙ্গ" তালুক এবং চণ্ডীদত্তের নামে ১৩২ নং তালুক বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

রামগঙ্গা সদর বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন, এই পদ রেজিষ্টারের পদের তুল্য ছিল। রামগঙ্গা মিশ্রবংশীয় রতিকান্ত তর্কসিদ্ধান্তকে ব্রহ্মত্র দান করেন, পুত্রের নাম ব্রজমোহন; ইনি ঢাকাদক্ষিণের শ্রীমহাপ্রভু বিগ্রহ দর্শনে গিয়া শ্রীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া ভাববশে সঙ্গীত রচনা করিতেন; দুই একটি সঙ্গীত এখনও লোক-মুখে শুনা গিয়া থাকে। তাঁহার পুত্র মাধবচন্দ্র ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোলক চন্দ্র তৎকালীন ইংরেজী উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবজজ পদে নিয়োজিত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত রামগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দ; তন্মধ্যে রাধাগোবিন্দের পুত্র নবকিশোর দত্ত একাউন্টেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়া পরে ইনসপেক্টারের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইঁহার পুত্রাদি বর্ত্তমান আছেন।

কর-বংশ-কথা

ঢাকাদক্ষিণের নিজ ঢাকাদক্ষিণ গ্রামবাসী করবংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ কর নিজ পুরোহিত সহ এস্থানে বাস করেন, বাণীনাথ বিদ্যাসাগরের বংশই ইঁহাদের পুরোহিত বংশ। এই বংশের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। বংশ তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, এই বংশে জনসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি জন সংখ্যার অল্পতাই পরিলক্ষিত হয়। এই বংশীয় রামনাথ, নরহরি ও বিদ্যানন্দ কর প্রভৃতি ঢাকাদক্ষিণের ভূমির কর নির্দ্ধারণ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন বলিয়া

২৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ১ম অধ্যায় দেখ।

কথিত আছে। পরমানন্দের পুত্র লক্ষ্মণরাম, তাঁহার পুত্র মহাদেব কর; তাঁহার পুত্র রতিনাথ ও রামকৃষ্ণ। রতিনাথের পুত্র রাধারাম তৎপুত্র মুকুন্দরাম, তাঁহার পুত্র মাণিকরাম, তৎপুত্র রামগঙ্গা, তাঁহার পুত্র শ্রীযুত রামগতি কর হইতে আমরা তাঁহাদের বংশ তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

পরগণা-লক্ষ্মীপুর

মহান্ত বংশ

মহাত্মা কামদেব কায়স্থ বংশোদ্ভব এবং লাউড়ের ব্রাহ্মণ নৃপতির কর্ম্মচারী ছিলেন। লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ বৃদ্ধাবস্থায় শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর নিকটে গমন করিয়া কৃষ্ণদাস নামে তথায় অবস্থিতি করেন।[২৩] কামদেব ঐ সংবাদ শ্রবণে ঐ সময়েই শান্তিপুরে গমন করিয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর অভিপ্রায় মত তথায় তিনি বিবাহ করেন, কালক্রমে তাঁহার একটি পুত্র হয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম স্মরণে ইঁহার চৈতন্যদাস নাম রাখা হয়। ইঁহারা পিতাপুত্রে অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন।

অদ্বৈত প্রভুর শাখা গণনায় ইঁহাদের নাম আছে—

"নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস—"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্যদাসের পুত্রের নাম নরহরি। তিনি স্ত্রীকে লইয়া পিতামহের জ্ঞাতিবর্গ সহ সম্মিলনে শ্রীহট্টে আগমন করেন।

জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে পাইয়া অদ্বৈত্যের পার্ষদ বংশধর জ্ঞানে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন ও এদেশে থাকিতে নিরতিশয় আগ্রহ করিলেন। তিনি তাঁহাদের অত্যাগ্রহ প্রত্যাখান করিতে সমর্থ হইলেন না।

তাঁহারা তাঁহাকে ভূমিদান করিলেন, নরহরি সেই ভূমে—হুসিয়ারপুর গ্রাম স্বগীয় জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক সেবাধিকারী রূপে বাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নরহরির কাছে অনেক ভদ্রলোক দীক্ষাগ্রহণে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তাঁহার বাড়ী "জগন্নাথের আখড়া" নামে খ্যাত হইয়া পড়িল।

ইঁহার পুত্র নিত্যানন্দ এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার সংবাদ শুনা যায়। মোহাম্মদ আলী নামক জনৈক জমিদার ইঁহার গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ হইতে এ বংশের মহিমা ও সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং তদবিধই ইঁহারা সাধারণতঃ "লক্ষ্মীপুরের গোসাঞি" এই নামে কথিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের উপাধি প্রাপ্তির কোনও বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ ভেখাশ্রিত বৈষ্ণবের রীতিমত সমাহিত করা হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি তাঁহার অনেক ভক্তকে মৃত্যুব পরেও ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের পৌত্রের নাম পীতাম্বর, তৎপুত্র দুর্ল্লভদাস, তাঁহার পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পুত্রের নাম বৃন্দাবন চন্দ্র, ইঁহার দুই—পুত্র মাধব ও বিশ্বম্ভর। মাধবের পুত্র গোরাচাঁদ এবং বিশ্বম্ভরের পুত্র নিমাই পণ্ডিত। এই দুই ভাইর মধ্যে নিমাই পণ্ডিত অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

গোরাচাঁদ একদা এক শিষ্যবাড়ীতে গমন করিয়া তত্রত্য একটি রমণীর রূপে বিমুগ্ধ হন। উক্ত রমণীর উপদেশে তাঁহার মোহ বিদূরিত হয় এবং তিনি ঢেউপাশা নামক স্থানে গমন করিয়া

কিশোরী-ভজন মতানুবর্ত্তী রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের কাছে উপদিষ্ট হন। ইনি মহলালের প্রসিদ্ধ শ্যামাকিশোর ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪র্থ ভাগে জীবনী প্রসঙ্গে এই বিষয় কথিত হইবে। ইঁহার পুত্রের নাম গোবিন্দ চাঁদ অধিকারী, তৎপুত্র শ্রীযুত গোপেন্দ্র কুমার জীবিত আছেন।

পরগণা-গোধরালি

গোধরালি পরগণার পুরকায়স্থগ্রাম তত্রত্য পুরকায়স্থ বংশীয়গণের মৌলিকত্ব প্রচার করিতেছে। কথিত আছে, রামচন্দ্র দেব ও শ্যামরাম দেব স্থানান্তর হইতে তথায় গিয়া বাস করেন ও তত্রত্য পাটওয়ারি নিযুক্ত হন; এই দুইজনই তথাকার আদি পুরকায়স্থ। ইঁহাদের পরবর্ত্তী বাসুদেব পুরকায়স্থ এক কীর্ত্তিমান ব্যক্তি। তাঁহার কৃত একটি জলাশয় শ্রীহট্ট- ফেঞ্চুগঞ্জ রাস্তার ধারে "বাসুদেব-তালাব" নামে খ্যাত থাকিয়া এখনও পথিককে জলদান করিতেছে। দক্ষিণাঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা কল্পে তিনি যে খাল কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীহট্ট শহর হইতে বালাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার পক্ষে তাহাই সুগম পন্থা।

বাসুদেবের ভ্রাতা কেশবরামের নামে গোধরালি পরগণার ৮নং এবং ৯নং তালুকের নাম হয়। বাসুদেবের পুত্র গোকুলচান্দও পিতার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তৎকালে শহরে যাইবার ভাল পথ ছিল না, গোকূলচান্দ সে অসুবিধা দূর করেন—"গোকুলচান্দের জাঙ্গাল" আজও তাঁহার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে।

গোকুলানন্দের পুত্র গোলাবচান্দ নিজ বাটীতে স্বগীয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। আজ কাল শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বড় গুরুত্ব না থাকিলেও পূর্ব্বেই ইহা বিশেষ গুরুতর ও পুণ্যকার্য্য বলিয়া অবধারিত ছিল।

অপর পুরকায়স্থ বংশ

এই পুরকায়স্থ বংশীয়গণ ব্যতীত গোধরালিতে আরও এক পুরকায়স্থ বংশ বিদ্যমান। গোধরালির এই দ্বিতীয় পুরকায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ যে বৈদ্য জাতীয় ছিলেন, তাঁহার বাণীবেজ নাম হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। বাণীবেজ বংশীয়গণ মৌদ্‌গুল্য গোত্রীয়. ইঁহারা প্রথমতঃ আখালিয়াতে ছিলেন। আখালিয়াতে এখনও "বেজের টীলা" বলিয়া একটা স্থান আছে। তথা হইতে তদ্বংশীয় রমাবল্লভ গঙ্গানগরে গিয়া বাস করেন; তিনিই পূর্ব্বোক্ত গোকূলচান্দের কন্যা বিবাহ ক্রমে. তথা হইতে শ্বশুরের গ্রামে বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন।[২৪]

দিগলী

এইরূপ দিগলীতে "কবের দীঘী" "করের দেউড়ী" "করেরবাড়ী" ইত্যাদির চিহ্নাদি দৃষ্টে বোধ হয় যে কর বংশীয়গণই তথাকার আদি অধিবাসী। দিগলীর সংলগ্ন শ্রীমানপুরে ধর বংশীয়গণ ছিলেন। দশহাল ব্যাপিয়া তাঁহাদের খানেবাড়ী ছিল; তাঁহাদের বৃহৎ দীঘী ইত্যাদির চিহ্ন দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাঁহারা এক সময় কম ক্ষমতাশালী ছিলেন না। ইহাদের সন্নিকটেই কাশ্যপগোত্রীয় দাস বংশীয়গণ ছিলেন। দাস বংশীয়ের আদি পুরুষ কালিদাসের নামে তাঁহার বসতি-স্থান কালিদাসপাড়া বলিয়া খ্যাত হয়। এই বৈদ্য বংশীয়গণ কর্ত্তৃকই গয়ার পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

২৪. স্নেহভাজন শ্রীমান মহেন্দ্র নাথ দে পুরকায়স্থ হইতে প্রাপ্ত।

অপর দাস বংশ

দিগলীর উক্ত কর ধর ও দাস এবং দত্ত বংশীয়গণই মৌলিক ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তত্রত্য ধূর্জ্জটি দাসের বংশধরবর্গের প্রভাবে ইঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে হীনবস্থা হইয়া পড়েন। ধূর্জ্জটির মহাশয়ের কেহ কেহ শ্রীহট্টের নবাব সরকারে উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন; এই বংশের বিজয়রাম দাস চট্টগ্রামের দেওয়ান ছিলেন। সোণারাম দেওয়ান নামক অপর এক ব্যক্তি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ক্রমে এ অঞ্চলে ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইদানীং এই বংশীয় স্বরূপচন্দ্র দাস শ্রীহট্টের কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন; ইঁহার পুত্র রায় শ্রীযুত সীতামোহন দাস বাহাদুর ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস জীবিত আছেন। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় সারদা মোহনের নাম তদীয় বন্ধু কবি প্যারীচরণের "মিত্রবিলাপ" অমর করিয়া রাখিয়াছে। সারদা মোহন "কপটতা বিষয়ক প্রবন্ধ" নামক এক উপদেশ-পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরগণা-বনভাগ

পূর্ব্বাধ্যায়ে বনভাগের বিবরণে বিধর খাঁর কথা কথিত হইয়াছে; বিধর খাঁর কথা এস্থলেই বলা সঙ্গত। বিধরখাঁ কর্ত্তৃক বনভাগ বহুলাংশে আবাদ হইলে, তিনি প্রথমতঃ সেই স্থানের মালীক হন। বিধরখাঁর বংশে পরবর্ত্তীকালে ধনঞ্জয়ের উদ্ভব হয়; তাঁহার সময়ে এই পরগণা খালিসা বনভাগ, বাজুবনভাগ ও কাজাকাবাদ এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইলে, বাজুবনভাগ তাঁহারই জমিদারী ভুক্ত থাকে। বাজু বনভাগের অনেকাংশ অদ্যাপি তদ্বংশীয়ের অধিকারে আছে। এই বংশীয় রামনাথ ধর পূর্ব্বাধ্যায়ে উল্লেখিত গোপীনাথ বাচস্পতির সমসাময়িক ছিলেন।

রামনাথের পুত্র রামজীবন চৌধুরী;[২৫] ইনি গোপীনাথ নামে বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেবা স্থাপন করেন। রাম জীবনের পুত্রের নাম ভবানী শঙ্কর,[২৬] তাঁহার পুত্র রাম শঙ্কর, তৎপুত্র বিশ্বনাথ চৌধুরী। প্রসিদ্ধ "বিশ্বনাথের বাজার" তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। বিশ্বনাথের পুত্র ব্রজনাথ স্থানীয় মহাপ্রভুর আখড়া স্থাপন করেন; তৎপুত্র বৈকুণ্ঠ নাথ, তাঁহার পুত্র বরদা নাথ একজন সুকবি।

---

২৫. ইঁহার নামীয় এক খানা মনুষ্য ক্রয়ের দলিল এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে সম্রাট আরঙ্গজেবের সময়ে ঢাকার নবাবের অধীনে শ্রীহট্টের নবাবের নাম আছে। দলিলে নবাবের নামের মধ্যের অক্ষর কীটদংষ্ট, ইহা যে "ইনাত" অর্থাৎ ইনায়েত খাঁ নবাবের নাম, তা স্পষ্টই বুঝা যায়। পূর্ব্বাংশ প্রণয়ন কালে ইঁহার সময় নিরূপিত হইতে পারে নাই, এতদ্বারা তাহা হইল; অবিকল দলিল খানা এই–

"শ্রী শ্রীমতাং শুলতান ওরঙ্গ সাহা দেব

পাদপদ্মানা–

স্বস্তি নবতি নবত্যুত্তর সহস্রাব্দে চৈত্রন্য একবিংশতি দিবসে স্বগীয মভ্যাদয়িনি রাজ্যে গৌড়বঙ্গের শ্রীযুত নবাব ইব্রাহিম খাঁন মহাশযানাং ঢক্কাবস্থিতি কালে শ্রীহট্টাধিপতৌ শ্রীযুত নবাব সৈদই+ত খাঁ মহাশয়স্য বিষয়ে পরগণে বাজু বনভাগ চত্বরকান্তর্গত মৌজে মসুনা গ্রাম পাটকস্থ শ্রীরাম জীবন চৌধুরী শকাশাত মোড়শকার্য্যাপণান গৃহীত্বা তত পরণান্তর্গত তদগ্রাম নিবাশনা শ্রী-ঙ্গা রামধরেন নিজ দাশী শ্রীবদজানন্দীঃ স্বেচ্ছয়া বিক্রিতামিত–অত্র প্রাণি এক অজয়মাল ১৬ সুল্ল কাহন ইতি সং ২০২৯ সালতে ২১ চৈত্র।"

(নিম্নে এই স্থান "অত্রাত্রে সক্ষিণঃ–" বলিয়া বিভিন্ন হস্তাক্ষরে সামধর প্রভৃতি তিনজনের সাক্ষর আছে এবং পার্শ্বে দলিল লেখকের হস্তক্ষরে "শ্রীগঙ্গারাম ধরস্য মতং শ্রীবদনী দাসী নাম্নী খতঞ্চ" এইরূপ লিপিত। ও নিম্নের দক্ষিণ কোণে "উভয়ানুমত্যা শ্রীগণেশরাম শর্ম্মণা লিখিতামি বলিয়া লেখকের দস্তখত আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে "উগাহী" শব্দের নিম্নে দুই ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। + চিহ্নত স্থল কীট দংষ্ট বটে।)

জানাইয়ার দত্ত বংশ

এই দত্তবংশীয়গণ আপনাদিগকে চক্রদত্ত বংশজ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। লাখাই ও সপ্তগ্রামের বিবরণে চক্রদত্ত বংশকথা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে ঘড়ুয়াবাসী কেশবরায় দত্তচৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র পৈতৃক বাসস্থানত্যাগ করিয়া বনভাগ আগমন করেন ও পূর্ব্বোক্ত বিশ্বনাথ চৌধুরীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়া এই স্থানবাসী হন, তৎপুত্র জয় গোবিন্দ দত্ত, তাঁহার পুত্রের নাম হরগোবিন্দ; ইঁহার পৌত্রগণ জীবিত আছেন।

পরগণা–রেঙ্গা

পুরকায়স্থ বংশ

চতুর্থ অধ্যায়ে রেঙ্গা পরগণার ব্রাহ্মণবংশ বর্ণনে বিশারদবংশের স্থাপয়িতা মহেশ্বর, কেন পরিজন ও বাসস্থান পরিত্যাগ রেঙ্গাবাসী হইয়াছিলেন, তাহা বলা হয় নাই; তাহা বলিতে গেলেই তত্রত্য পুরকায়স্থ বংশের উল্লেখ করিতে হয়। রেঙ্গার পুরকায়স্থগণ এক প্রাচীন বংশীয়, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের আদি পুরুষ অর্জ্জুনরাম দাস দক্ষিণারাঢ় হইতে এদেশে আগমন করেন। এ বংশের অনেক কীর্ত্তিই আছে, তন্মধ্যে "হাট পুরুষোত্তম"—পুরুষোত্তম দাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোগল নামে ঢাকা বাসী জনৈক মোসলমানের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল, মোগল যখন এদেশ হইতে চলিয়া যান, তখন তাঁহার নামের স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় অভিপ্রায় মতে তিনি বন্ধুর নামে নিজের স্থাপিত স্বনামীয় রাজারটিকে "মোগলের বাজার" নাম দান করেন। এই কথাটা সামান্য হইলেও কম উদারতার কথা নহে। এই বংশীয় জনৈক ব্যক্তি বিশারদের শিষ্য ছিলেন এবং তিনিই তাঁহাকে রেঙ্গায় আনিয়া স্থাপন করেন। ইংরেজ আমলের প্রথমে এই বংশের কেহ কেহ পাটওয়ারি নিযুক্ত হন; বর্ত্তমান সময়েও অনেক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

যুগ্ম নাম

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল বংশের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি, রেঙ্গা-বরায়া প্রভৃতি স্থানে তদ্ব্যতীত বহুতর উল্লেখযোগ কায়স্থ বংশীয়ের বাস আছে। আমরা সে সমস্ত বংশ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই নাই। রেঙ্গা-বরায় ইত্যাদি স্থান বাচক যুগ্ম নামে উভয় স্থানে একটা সম্বন্ধের ভাবই সূচীত হয়। পাশাপাশি দুইটা পরগণা বা গ্রামের নামোল্লেখ সাধারণতঃ লোকে একত্র করিয়া থাকে; উদাহরণ যথা—খানাকুল কৃষ্ণনগর, জিরাট-বলাগড়, টাকী-শ্রীপুর ইত্যাদি। শ্রীহট্টের যথা-সরাইল-বেজোড়া, তরফ-বাণিয়াচঙ্গ, প্রতাপগড়-জফরগড়; এইরূপে ইন্দানগর-মৌরাপুর নামও যুগ্মভাবে কথিত হয়।

ইঁহাব নামীয চৌধুরাইর সনন্দ, যথা–"সরকাব শ্রীহট্ট বাজুবনভাগর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের চৌধুরীগণ কানুনগোগণ জানিবেন যে পরগণা মজকুরের বামজীবন চৌধুরী ঈশ্বর ইচ্ছায় মৃত্যু হইয়াছে তাহাব পুত্র ভবানী দাস সরবরকার ও সুভানুদ্যায়ী সরকার বটে তজ্জন্য চৌধুরীগিরির উপযুক্ত ভবানী দাস নাম ইস্তক ১১৩৯ বাঙ্গালা অবাধ নিযুক্ত করা গেল। উচিত যে উক্ত ব্যক্তিকে সেই স্থানের উপযুক্ত চৌধুরী জানিয়া তাহার প্রকৃত বাক্য হইতে যে সরকার বাহাদুরের উপকার ও প্রজাগণের উপকার হইতে পারে তাহা হইতে বাহির হইবান না আর তাহার দস্তখত প্রকৃত কাগজে মজ্জুত মাতব্বর জানিয়া নানকার ও খানেবড়ী চিরকাল মত তাহার দখল ছাড়িয়া দিবাএ যদ্দারা সে খাতিরজমা হইয়া এবং দখলকার হইয়া সনত সন্তুষ্ট থাকিবেক এ বিষএ দৃঢ় তাগিদ জানিয়া উপযুক্ত কর্ম্মচরণ করিবে। ইতি সন ১৫ জলুস ৭ জমাদিউচ্ছানি।"

মৌরাপুর ও ইন্দানগরের সম্বন্ধ সূচক বংশোল্লেখ

শ্রুতি সুখকর বলিয়াই যে এইরূপ যুগ্মনাম প্রদানের পদ্ধতি প্রচলিত, কেবল তাহা নহে; এইরূপ যুগ্মনামাত্মক স্থানে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনুসন্ধান করিলেই এই সম্বন্ধের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। প্রতাপগড়-জফরগড়ের ন্যায় ইন্দানগর মৌরাপুরে ভূস্বামীর স্বত্ব সম্পর্ক স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়। ইন্দাইপাল নামে কোন এক ব্যক্তির নামে ইন্দানগরের নাম হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে; মহুরাপুর বা মৌরাপুর উক্ত ইন্দাইপালেরই অধিকার ভুক্ত ছিল। ইন্দাইপালের কর্ম্মচারী যাদব দাস বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ইহা নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ার জনশ্রুতি অদ্যাপি শুনা যায়।

সম্রাট শের শাহের সময়ে ইন্দানগর মণ্ডল বংশীয় জমিদারদের হস্তগত হয়। নারায়ণ মণ্ডল ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইন্দানগর পরগণার প্রায় বারপণ অংশ এযাবৎ উক্ত চৌধুরী বংশের[২৭] অধিকার আছে।

ইন্দানগরের পশ্চিমদিকে একটি মোকাম আছে। এই মোকামে একজন সিদ্ধ ফকির একটা প্রস্তর লইয়া সর্ব্বদা খেলা করিতেন। চৌধুরী বংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে একদা তিনি উহা প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যতদিন সে প্রস্তর তাঁহাদের হস্তচ্যুত না হইবে, ততদিন সম্পত্তির ধ্বংস নাই; যত দিন প্রস্তরটি বর্দ্ধিত হইবে, একহস্তে কন্দুক ক্রীড়ন যোগ্য ক্ষুদ্র প্রস্তরটি এক্ষণে তদ্রূপ আকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছে।

চৌধুরী বংশীয়দের স্থাপিত "চৌধুরী বাজার" শ্রীমদন মোহন বিগ্রহ, মন্দির এবং প্রাচীন দীর্ঘিকাদি তাঁহাদের কীর্ত্তি চিহ্ন। উক্ত পরগণার ১নং হইতে ১০নং পর্য্যন্ত তালুকগুলি এই বংশীয় ব্যক্তিবর্গের নামে পরিচিহ্নিত। এই দশটি মূল তালুক হইতে পরে আরও অকেন তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে।

উত্তর শ্রীহট্টের বৈদ্যকায়স্থাদি বংশ বৃত্তান্ত, তুলনায় পাই নাই বলিলেই হয়; সুতরাং এইরূপ দীনভাবে ইহা শেষ করিতে হইতেছে। শ্রীহট্টের কোন্ স্থান কায়স্থ অধ্যুষিত নহে? কোন্ বংশে ২/১টি কীর্ত্তি কথা নাই? তাহা পাইলে এ অধ্যায়টি অন্যরূপ হইত।

২৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে উল্লেখিত বিষয় বিশেষের অনুরূপ উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য এই বংশাবলী ৩য় ভাগে প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম, ও পরিশিষ্টে তাহা প্রদত্ত হইবে। যাঁহাদের নামে তালুকের নামাদি হইয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

মোসলমান বংশ বর্ণন

সদর

মজুমদার বংশ

শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মোসলমান বংশীয়গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে গড়দুয়ারের মজুমদারদের কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হয়। এই বংশের কার্য্য পরম্পরার সহিত শ্রীহট্টের ইতিহাস অনেকাংশে জড়িত। সৈয়দ হুসেন শাহের সময় হইতে ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৩৩ বর্ষ কাল ইঁহারা শ্রীহট্টের উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে দ্বিতীয় ভাগের অনেক স্থলেই ইঁহাদের বিষয় পাওয়া যাইবে।[১] তাহাতে মসুদ বখতের কানুনগো পদ প্রাপ্তির বিবরণ পর্য্যন্ত উল্লেখিত হইয়াছে। মসুদ বখতের পরেই কানুনগো পদ উঠিয়া যায়, কিন্তু হস্তবোধ জরিপের সময়ে আবার তাঁহাদের সহায়তা পাওয়ার আবশ্যক হয়।[২] তখন দেলারজঙ্গ বাহাদুর নামে খ্যাত জন উইলিস সাহেব ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর মসুদ বখতের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ বখৎ মজুমদারকে কিছুকালের জন্য কানুনগো নিযুক্ত করেন।[৩] মোহাম্মদ বখৎ নিজ নামে মোহাম্মদাবাদ গ্রাম স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্রই হাজি সৈয়দ বখৎ মজুমদার। তিনি আদালতে উপস্থিত না হইয়াই সরকারী যে কোন কার্য্য (সাক্ষ্য প্রদান আদি) করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হন;[৪] ইহা কম সম্মান সূচক নহে। তিনি নানাবিধ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করেন, তাহা পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।[৫] তদীয় সৎকার্য্যের জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ প্রশংসা-সূচক এক সনন্দ প্রদান করেন।[৬]

হাজি সৈয়দ বখতের জ্যেষ্ঠপুত্র মৌলবী হামিদ বখৎ মজুমদারও পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।[৭] তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েলস্ বাহাদুরকে কয়েকটি উপহার দেওয়ায় তিনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।[৮] তিনি উর্দ্দু ভাষায় "আইন-ই-হিন্দ" নামে একখানা ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশোভাজন হইয়াছেন; এই গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ে শ্রীহট্টের বিবরণ লিখিত আছে।

---

১. পূর্ব্বাংশ-২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় এবং ৯ম অধ্যায় দেখ। মজুমদারদের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা চ পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।

২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায় দেখ।

৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায় দেখ।

৪ "No 610 Home Department.-Judicial. Simla, the 17th April 1877 Notification -under the provision of section 22 of Act VIII of 1859, the Governor-General in Council is Pleased to exempt Hazi Sayed Bakht Mujmalar, land-holder in Sylhet, in Assam from personal appearance in Civil Courts "
From Arthur Howell, Officiating Secretary to the Government of India

৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।

৬. Vide Copy of a Sanad given below :-"By command of His Excellency the Viceroy and Governor-General, this Certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty Victoria, Empress of India, to Haji sayed Bakht Majumdar of Sylhet, recognition of his general loyalth, and of assistance given by him to government on various occasion.

৭ পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।

৮ 4th March, 1876.

তদীয় গুণমুগ্ধ আসামের চিফ কমিশনার বাহাদুর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে দুখানা চিত্র উপহার দেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ ৩রা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত আসাম গেজেটের ১নং নোটিফিকেশনে তাঁহাকেও আদালতে উপস্থিত না হইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ ২২শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। তদুপলক্ষে শ্রীহট্টের প্রত্যেক আফিস আদালত এক দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল।

মজিদ বখৎ মজুমদার সাহেব তাঁহারই অনুজ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজশাহীর ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হন ও তাহার পর একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনার রূপে আসাম প্রদেশে বদলী হইয়া আসেন। তিনি লুশাই যুদ্ধে ও বিগত মণিপুর যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে নানারূপ সহায়তা করেন। লুশাই যুদ্ধে সাহায্য প্রদান জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ সূচক চিঠি[৯] প্রাপ্ত হন এবং মণিপুর রাজ্য বিজিত হইলে, যুদ্ধে সাহায্য জন্য পুরস্কার স্বরূপ মণিপুর রাজের হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত ছত্রদণ্ড ও সুবর্ণ-রঞ্জিত ছত্র প্রাপ্ত হন।

মজিদবখৎ সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট খান বাহাদুর উপাধি দান করেন, এই উপাধি দানোপলক্ষে তাঁহাকে সুবর্ণ হাতাযুক্ত মূল্যবান এক তরবারি প্রদত্ত হয়। তিনি ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের সম্রাট উপাধি গ্রহণোপলক্ষে দিল্লী দরবারে গমন ও তথায় একটি করনেশন পদক প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে তিনি সভ্রাতৃক মক্কাগমন কালে জাহাজে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভগবৎ কৃপায় উদ্ধার পান, তৎকৃত Majumdar family পুস্তিকায় তাহা বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

এই বংশে আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে আশ্রব আলী মজুমদারের নাম করা যাইতে পারে। ইনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন। কুস্তিবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ লোক দৃষ্ট হইত না। বিদেশাগত কোন পলোয়ানই তাঁহার সহিত বল পরীক্ষায় বিজয়ী হইতে পারে নাই। তাঁহার এতাদৃশ পরাক্রম দর্শনে লোকে বিস্মিত—চিত্তে ভাবিত যে মানুষে তদ্রূপ বল কোন রূপে কখন সম্ভবে না; তিনি নিশ্চিত দৈববল সম্পন্ন-- "পরীসাধনায় সিদ্ধ" আশ্রব আজীবন কুমার ব্রতাবলম্বী ছিলেন।

মুফতি বংশ

বুরহানউদ্দীন কেতান

হজরত শাহজলাল মুজররদ সহ আরব হইতে যে দ্বাদশজন আউলিয়া আগমন করেন, তন্মধ্যে একজনের নাম খাজা বুরহানউদ্দীন কেতান। খাজা উপাধির ন্যায় কেতান (কত্তাল) একটা উপাধি। ফকিরী বা বৈরাগ্যে যাঁহাদের পারদর্শিতা লক্ষিত হইত, তাঁহারাই কেতান উপাধির অধিকারী হইতেন। বুরহানউদ্দীন, প্রথম খলিফা আবু বখারের বংশীয় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইঁহার পৌত্র[১০] শাহ জামালউদ্দীন আতুয়াজান পরগণায় গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, তথায় তাঁহার দরগা আছে; স্থানীয় যাত্রিবর্গ প্রায়শঃ সেই দরগা দর্শনে গমন করে।

মওলানা জিয়াউদ্দীন

তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জিয়াউদ্দীন বিশেষ বিদ্বান্ ও মওলানা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি দরগা মহল্লায় এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ইংরেজ আমলে পারস্যের স্থলে বাঙ্গালা ভাষা আদালত-ব্যবহার্য্য ভাষার স্থান অধিকার না করা পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘকাল এই মাদ্রাসা বিদ্যমান ছিল। এই মাদ্রাসা পারস্য ভাষা শিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। হিন্দু-মোসলমান সকলেই এই স্থানে পারস্য শিক্ষা করিত। জিয়াউদ্দীনের পুত্রও বিদ্যার্জ্জনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং

৯. Letter No. 7743 Dated 22nd February, 1890, Vide letter No. 1829 p. Dated 15th March, 1890.
১০. দ্র পরিশিষ্টে মুফতির বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

কৃতিত্বের সহিত মওলানা উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শেখ আহমদ, তৎপুত্র ফতে মোহাম্মদ যে কেবল বিদ্যার্জ্জনে মওলানা উপাধি পাইয়াই প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন তাহা নহে, সর্ব্বসাধারণ তাঁহার দয়ার নিদর্শন প্রাপ্তে উপকৃত হইয়া তাঁহার কাছে বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল।

মুফতিপদ

মওলানা ফতে মোহাম্মদের পুত্র প্রসিদ্ধ হাসন মোহাম্মদ আরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালে শ্রীহট্টের মুফতি পদ প্রাপ্ত হন। আদালতে মোহাম্মদীয় আইন সংক্রান্ত জটিল বিষয় উপস্থিত হইলে মুফতিগণই মীমাংসা করিতেন; মোসলমানদের সাধারণ আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। ইঁহারা চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আশিম পিতার মৃত্যুর পর মুফতি পদ প্রাপ্ত হন। কাশিমের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা কাশিম শ্রীহট্টের মুফতি নিযুক্ত হন এবং কাশিমের পুত্র মোহাম্মদ হাজিম খুল্লতাতের নায়েব স্বরূপ কার্য্য করেন।[১১] বার্দ্ধক্য বশতঃ আশিমকে সত্বরেই মুফতি পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের সময়ে নিজ পুত্র মোহাম্মদ দাইমের নামে জায়গীর ভূমির সনন্দ বাহাল করিয়া আনয়ন করেন ও তাঁহাকে মুফতি পদ প্রদান করেন।[১২]

সেখ মোহাম্মদ কাজিম (আশিমের ভ্রাতা) "খানকা" অর্থাৎ ছাত্র নিবাস প্রস্তুত ক্রমে তাহার তত্ত্বাবধান ও ছাত্রবর্গকে আহার্য্যদানে উক্ত খানকা পরিচালন জন্য নিজ নামে দুই খানা সনন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবাব মীর মোহাম্মদ হাদি বাহাদুর কর্ত্তৃক "খরচা মদরশা" বাবতে পরগণা লংলা হইতে ৪৪/১।৪ হাল ভূমি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় সনন্দে পরগণা রেঙ্গা হইতে ৪৭/কুবলা ভূমি প্রদত্ত হইযাছিল।[১৩]

খাদিমী পদ

এই সময়ে শাহজলালের দরগার খাদিমী কার্য্য আট ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। খাদিমগণ দরগার প্রত্যেক বিষয়ে তত্ত্বাবধান রাখিতেন। খাদিমদের "চৌকিবন্দি" লিষ্ট হইতে জানা যায় যে ঐ আট ব্যক্তির এক এক জনের অধীনে তাঁহাদের মনোনীত আরও অনেক কর্ম্মচারী থাকিতেন। মুফতি মোহাম্মদ দাইম তন্মধ্যে প্রথম চৌকির প্রধান ছিলেন।[১৪]

মুফতি দাইমের পরে তদীয় ভ্রাতা মোং কাইম মুফতি পদ পাইয়াছিলেন। তিনিও নবাব মীর মোহাম্মদ হাদি বাহাদুর হইতে এক সনন্দে রেঙ্গা, বরায়া ও শমশের নগর গং পরগণায় ৪৭/০ হাল মদতমাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মোং নাইম ঐ পদ প্রাপ্ত হন, ইনিই শেষ মুফতি; ইঁহার সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই পদ উঠাইয়া দেন।

মুফতি বংশীয়গণ শ্রীহট্টের বিভিন্ন পরগণা হইতে যে সমস্ত ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন, তাহার পরিমাণ অল্প ছিল না; ইহার সমষ্টি প্রায় ১১২০/০ হাল। পরবর্ত্তীকালে এই সমস্ত ভূমির

---

১১. শ্রীহট্টের নবাব নোওয়াজিস মোহাম্মদ খান বাহাদুর হইতে আশিম মাদ্রাসার ব্যয় সঙ্কুলান জন্য "মতালকান জায়গীর" উল্লেখে পং ইটা হইতে এক সনন্দে (নং ২৮৫) ১৫৪ ভূমি প্রাপ্ত হন। উক্ত সনন্দে উল্লেখ আছে, তৎসংসৃষ্ট কতক ভূমি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুফতি হাশন ও কাশিম প্রাপ্ত হইযাছিলেন।

১২. উক্ত সনন্দের একখানা নবাব নাজিরউল্লার সময়ে (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ) এবং অন্য খানা নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুরের সময়ে প্রাপ্ত হন।

১৩. কালেক্টরীতে উক্ত সনন্দদ্বয়ের নং যথাক্রমে ২৪৮ এবং ২৮২ দৃষ্ট হয় এবং উভয় সনন্দ ৩ এবং ৪ জলুসে প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৪. চৌকির লিষ্ট, যথা–১ম মোং দাইম; ২য় সোণাউল্লা, ৩য় মোং গণি, ৪র্থ মসুদ সর্কুম, ৫ম আকবর, ৬ষ্ঠ আহমদউল্লা, ৭ম নাজিমউদ্দীন, ৮ম কলিমউল্লা।

অধিকাংশের উপর করধার্য্য হয় এবং অধিকাংশই তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল।

মুফতি পদ উঠিয়া গেলে মোং কাইমের পুত্র গোলাম মহিউদ্দীন হিঙ্গাজিয়া ও রাজনগর থানার দারোগা নিযুক্ত হন এবং ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মোং শালিম রসুলগঞ্জের মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীহট্টের সদর আমীন (সব জজ) রূপে উন্নীত হইয়া আসেন ও কার্য্যান্তে বহুকাল পেন্সন ভোগ করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন; ইঁহার পুত্র হাশন কাজি-আদালতের বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-তনয় নজম উদ্দীন মোহাম্মদ জীবিত থাকা কালে দিল্লীর ভাগ্যচ্যুত সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র ফেরোজ শাহ্, হজরত শাহজলালের দরগা দর্শনে এক সুন্দর সুরঞ্জিত নৌকারোহণ শ্রীহট্ট শহরে আগমন করেন (১৮৫০ খৃষ্টাব্দ) ও তাঁহার কাছে এক খানা চিঠি লিখেন। তাহার ফলে সম্রাট তনয়ের সহিত তদীয় সাক্ষাৎ ও আলাপ প্রসঙ্গ ঘটে। সম্রাট তনয় তাঁহাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

সম্রাট পুত্রের চিঠি

"মর্য্যাদা মাহাত্ম্যের আশ্রয়, ভদ্রতা ও কৌলিণ্যের অবলম্বন মৌলবী নজম উদ্দীন মোহাম্মদ ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে জীবিত থাকুন। মনের শান্তি, আমোদ এবং মৃগয়া উপলক্ষে দিল্লী হইতে কলিকাতা ও তথা হইতে মুর্শিদাবাদ নগরে আসিয়াছিলাম, তথা হইতে আমি অনুচরবর্গ সহ দিল্লী প্রত্যাগমনোদ্দেশে যাত্রা করিয়া কয়েকটি স্থান অতিক্রম না করিতেই স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রযুক্ত বায়ু পরিবর্ত্তন ও সুচিকিৎসার্থ ঢাকা নগরীতে গিয়া আরোগ্য লাভ করি; তখনই সন্নিকটবর্ত্তী পুণ্য স্থান শ্রীহট্টস্থ শাহজলালের দরগা দর্শনের জন্য আগ্রহ হয়; তাহাতেই অমাত্যবর্গ সহ এখানে আগমন করিয়াছি। ভগবদীচ্ছায় সমাধি প্রদক্ষিণের সৌভাগ্য লাভের পর দিল্লী যাইবার অভিলাষ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে শহরের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত মোসলমান ভদ্র মণ্ডলীর কুশল সংবাদ অবগত হইবার মানসে তাঁহাদিগকে পত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া কিছু কষ্ট দিতে প্রস্তুত হইলাম। অতএব আপনে ভদ্র-মণ্ডলীসহ, সন্তোষ বিধায়ক দর্শন দানে আহ্লাদিত করিবেন; ইহা আপনাদের ভদ্রতা ও বিনীত ব্যবহারের বহির্ভূত নহে।"

মুফতি নজম উদ্দীনের ২য় ও ৩য় তনয়দ্বয়ই অত্রত্য মোসলমান সমাজে সর্ব্ব প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন; তন্মধ্যে আব্দুল কাদির অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ডিপুটী কমিশনার মিঃ লটমন জনসন সাহেব শ্রীহট্টে আগমন করেন। তিনি আসামের চিফ কমিশনার বাহাদুর বরাবরে শ্রীহট্ট জিলার মোসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহাতে প্রশংসার সহিত মুফতিদের স্থাপিত মাদ্রসার উল্লেখ প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছিল।[১৫]

১৫. "I have Made careful search, and have not found that any grants for educational usese only were resumed in the resumption proceedings of 1828 to 1848. No Muhammadan gentleman of the District have been able to refer me to one. I have found two cases which no doubt included among other uses They are-

(Sanad) No 284 - For the expense of the students of the Madrasa and of travel'ers and of the Khanka (a boarding house for persons who devote themselves to study and prayers) No 285 As an allowence and a help towards the maintenace of the said Mufti Muhammad Asiam and for the expenses of the Madrasa

No. 284 -Has beeb assessed at 85 and No. 185 at 275 &c Extract from Repor no 3890 dated the 17. 8. 1882

ইংরেজী স্কুল

বহুকালের প্রাচীন মাদ্রাসার রক্ষাকল্পে মুফ্‌তি বংশীয়গণ যে কৃতিত্ব ও শিক্ষানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইংরেজ আমলে একটি ইংরেজী এনট্রেন্টস স্কুল স্থাপনে তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। এই স্কুল "মুফ্‌তি স্কুল" নামে খ্যাত ছিল; মুফ্‌তি নুরউদ্দীন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে উহা স্থাপন করেন। পরবৎসর আগষ্ট মাসে লর্ড বিশপ বাহাদুর শ্রীহট্টে আসিলে, এই স্কুল পরিদর্শনে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই স্কুল পরে অন্যের হস্তে গিয়া শ্রীহট্ট নেশনেল স্কুল রূপে পরিণত হয়।

ডিপুটী কমিশনার জনসন সাহেবের চেষ্টায় শিক্ষানুরাগী মুফ্‌তি নুরউদ্দীন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুলাই হইতে সদরের স্কুল সমূহের সবইনিস্পেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি বহুকাল সদর কোমিটীর মেম্বর ও শ্রীহট্ট মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন।

ফলতঃ সদরের মোসলমান সমাজে ইঁহাদের মর্য্যাদা সামান্য নহে। প্রথমতঃ হজরত শাহজলালের অনুচর স্বরূপে ইঁহারা সম্মাননীয়, তৎপর দরগার খাদিম স্বরূপে তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বসম্মত, এইজন্য বিভিন্ন সনন্দে তাঁহারা ১৮৪/০ হাল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পারস্য শিক্ষার উৎসাহ দাতা রূপে ইঁহারা চিরদিন শ্রীহট্টবাসীর ধন্যবাদের পাত্র, এইজন্য বিভিন্ন সনন্দে তাঁহারা ৫৪২/০ হাল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে এদেশবাসীগণের মধ্যে ইংরাজী এনট্রেন্স স্কুল স্থাপন দ্বারা দেশীয়দের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন। তৃতীয়তঃ মুফ্‌তি বা মোহাম্মদীয় আইনের মীমাংসক স্বরূপে এবংশের প্রাধান্য কম বলা যায় না;—এইজন্য তাঁহারা ৩৯৪/০ হাল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মৌলবী পরিবার

শহরের আর একটি বংশের উল্লেখ করিব, কাজির বাজারস্থিত মৌলবী পরিবারের কথাই এস্থলে নির্দ্দেশই করিতেছি। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ত্রিপুরাবাসী ছিলেন। মৌলবী মোহাম্মদ ইদ্রিশ খাঁ শ্রীহট্টের সবজজ পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন ও বহুবৎসর এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া নীলামে প্রভূত ভূসম্পত্তি ক্রয় করতঃ শ্রীহট্টের অন্যতম জমিদাররূপে পরিণত হন এবং এই স্থানেই বাড়ী নির্ম্মাণ ক্রমে এখানকার অধিবাসী হইয়া পড়েন। তাঁহার দুই পুত্র, মৌল্বী আব্দুল কাদির ও মৌলবী আব্দুর রহমান। আব্দুর রহমান বিলাস-সাগরে মগ্ন হইয়া বহু সম্পত্তি নষ্ট করেন। আব্দুল কাদির সাহেব কাজি আদালতে কিছুকাল বিচারক ছিলেন। আব্দুল কাদের সাহেবের মৃত্যুর পর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। আব্দুল কাদির সাহেবের একমাত্র পুত্র মৌলবী মোহাম্মদ এহিয়া খাঁন বাহাদুর এক্ষণে ঐ পরিবারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। গবর্ণমেন্ট এ পরিবারে বিনাপাশে বন্দুক রাখিবার ক্ষমতা দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

পরগণা-জলালপুর

মকদ্দুম রহিম উদ্দীন হজরত শাহজলালের অন্যতম অনুষঙ্গী ছিলেন। তিনি শহর হইতে জলালপুরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়া হস্তের "আসা" (লাঠি বিং) স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাহাতে তথায় একটি বটবৃক্ষের উদ্ভব হয় এবং তাহা অদ্যাপি আছে। জলালপুরের দরগার ফকিরগণ এই গাছের পাতা সংগ্রহ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে গমন করিয়া মোসলমানগণ মধ্যে

তাহা বিতরণ করে। সাধুর হস্ত রোপিত বৃক্ষ-পত্র সাদরে গৃহীত হয়। রহিম উদ্দীনের পুত্র-সিরাজ উদ্দীন ও আব্দুল মনাফ, ইঁহার প্রপৌত্রের নাম মক্‌লিস খাঁ, ইঁহার প্রপৌত্র জুনিদ খাঁ, ইঁহার প্রপৌত্র লাল মোহাম্মদ, ইঁহার প্রপৌত্র মোহাম্মদ জসির, ইঁহার পুত্রগণ জীবিত আছেন।

ভাদেশ্বরের শেখ বংশ

শেখ্ করমমোহাম্মদ আরব দেশবাসী ছিলেন। যখন হজরত শাহজলাল শ্রীহট্টের আগমন করেন, তাহার অব্যবহিত পরে তিনি আরব হইতে যাত্রা করিয়া শাহজলালসহ সম্মিলিত হন ও ৩৬০ আউলিয়ার একতমরূপে গণ্য হন।

শেখ করম মোহাম্মদ বিবাহ করিয়াছিলেন, শ্রীহট্ট শহরেই তাঁহার বংশীয়গণ ছিলেন। যখন শ্রীহট্টে নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর নবাব হইয়া আগমন করেন, শেষ বংশে তখন ফয়জুল্লা নামে এক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। এক্রামউল্লা খাঁ ইঁহাকে "ওস্তাদ" বা গুরু জ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং "বখশী" উপাধি দান করেন। বখশীকে প্রত্যহ নবাব দরবারে উপস্থিত হইতে হইত।

একদা রাজস্ব বাকির দায়ে ঢাকাদক্ষিণ ও ঢাকাউত্তরের জমিদার বর্গ ধৃত ও শ্রীহট্টে নীত হইয়া অশেষ অত্যাচার ভোগ করিতে ছিলেন। ইহা দর্শন করিতে না পারিয়া বখশী ফয়জুল্লা পরদিবস দরবারে অনুপস্থিত হন। জিজ্ঞাসায় নবাব অবগত হন যে পরদুঃখ কাতর ফয়জুল্লা জমিদারদের তাড়না দর্শন করিতে অসমর্থ বলিয়া দরবারে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। ইহাতে নবাব লজ্জিত হন ও জমিদারদিগকে অব্যাহতি দেন। জমিদারেরা এই উপকারী সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ফয়জুল্লা প্রথমে ঢাকাউত্তরে ও পরে ভাদেশ্বরে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হন এবং তথায় প্রায় একহাল পরিমিত ভূমি নিষ্কর দান করেন, সেই দান প্রাপ্ত ভূমে ফয়জুল্লা পুত্রদ্বয়ের সহিত বাস করেন, সেই স্থানই অধুনা "শেখপাড়া" নামে খ্যাত হইয়াছে। ফয়জুল্লার পুত্র শেখ গোলাম নবি ও শেখ গোলাম মোহাম্মদ; শেখ নবির আব্দুল গণি প্রভৃতি তিন পুত্র হয়; শেখ আব্দুল গণির আব্দুল মনাফ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ছিলেন; আব্দুল মনাফেরও আব্দুল হেকিম প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মেন, এই বিবরণ প্রদাতা শ্রীযুত আবদুল রহিম ইঁহারই পুত্র।

সমাপ্তি

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড এই স্থানেই সমাপন করা হইল। উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশনে পঞ্চ লক্ষাধিক অধিবাসী বাস করেন, হিন্দু মোসলমানে এই অধিবাসী মধ্যে কয়টি বংশের বিবরণ এস্থলে বিবৃত হইল? আমরা নিজ বংশ কাহিনী রক্ষার প্রতি কিরূপ মনোযোগী, এতদ্দারা তাহা বেশ বুঝা যায়। উত্তর শ্রীহট্টে কত প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের গৌরব সূচক কাহিনী অল্পলোকেই স্মরণ রাখিয়াছেন, আমরা এই জন্যই কি বহুতর সম্ভ্রান্ত বংশের বিবরণ পাই নাই? যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বংশকথা পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ শুধু বংশপত্রিকা দিয়াছেন, কেহ কেহ বা নামের লিষ্ট সহ দুই চারিটি কথা পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কীর্ত্তিকথা ব্যতীত এরূপ বংশ তালিকা বা নামের লিষ্ট ছাপাইলে সাধারণের তাহা সুপাঠ্য হইবে কেন? যাঁহারা পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের বংশ সম্ভ্রান্ত হইতে পারে, বহু গুণবান পুরুষ সে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু কোনও কীর্ত্তিকাহিনীর সহিতই তাঁহাদের নামের

সম্বন্ধ না পাওয়াতে, আমাদিগকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কেবল যে উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশনের সম্বন্ধেই এরূপ বলিতেছি, তাহা নহে; অন্যান্য সবডিভিশনে অধিবাসীগণ সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য; এই এক স্থানেই আমরা তাহা বলিয়া রাখিলাম মাত্র।

আমরা উত্তর শ্রীহট্টের যে সব বংশ বিবরণ পাইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বংশ বিবরণ পাইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বংশ বিবরণ বর্ণন করিয়াছি; উপেন্দ্র মিশ্রের মাতামহ বংশ-বুরুঙ্গার ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় চৌধুরীদের বংশের উল্লেখও করা হইয়াছে। বুরুঙ্গার পর রেঙ্গার বিশারদ বংশ-কথা বর্ণিত হইয়াছে তৎপর রেঙ্গার ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ করিয়াই ঢাকাদক্ষিণের সম্প্রদায়িক বৎস ও মৌদগুল্য গোত্রীয়গণের বিবরণসহ তত্রত্য অগ্নিহোত্রী ও লস্করবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর বনভাগের উপাধ্যায় বংশ কথা, মৌজপুরের ভট্টাচার্য্য ও লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্যাবিনোদ বংশ কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর ব্রাহ্মণ কথা, ও কৌড়িয়ার ভট্টাচার্য্য এবং কুরুয়ার গোস্বামী বংশ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; তৎপরে বোয়ালজুরের ও রায়নগরের ব্রাহ্মণ কথার সহিত "ব্রাহ্মণ-বিভাগ" সমাপ্ত হইয়াছে। "সাধারণ বিভাগে" প্রথমেই শহরের সম্ভ্রান্ত বৈদ্য ও কায়স্থাদির বংশের উল্লেখ করা গিয়াছে; তাহার পর দুলালীর বৈদ্য বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদনন্তর ঢাকাদক্ষিণের দেব, দত্ত ও কর বংশের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর গোধরালি, দিগলী ও বনভাগ এবং রেঙ্গা প্রভৃতি স্থানের ভদ্র পরিবারের ২/৪টি কথা সামান্যতঃ বলা হইযাছে। মোসলমানগণের বংশের মধ্যে শহরের মজুমদার, মুফতি ও সর্কুম এই তিনটি শ্রেষ্ঠ বংশের বিবরণসহ মৌলবী পরিবারের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা গিয়াছে। এবং জলালপুরের সকদ্দুম রহিম উদ্দীনের বংশের নামোল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। তৎপর ভাদেশ্বরের শেখ বংশ কথা, তাহাতেই এখণ্ড পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

করিমগঞ্জ

ব্রাহ্মণ-বিভাগ

প্রথম অধ্যায়
পঞ্চখণ্ডের ব্রাহ্মণগণ

নামতত্ত্ব

করিমগঞ্জ সবডিভিশনের উত্তরে জয়ন্তীয়া পাহাড়, পূর্ব্বে কাছাড় জিলা. দক্ষিণে লুশাই ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, পশ্চিমে দক্ষিণ শ্রীহট্ট ও উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশন। করিমগঞ্জ সবডিবিশন ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, যে স্থানে বর্ত্তমানে সবডিভিশনেল শহর সংস্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তথায় কিছুই ছিল না। নটীখালের পূর্ব্বতীরে,—নটীখাল কুশিয়ারা-সঙ্গম স্থল হইতে প্রায় তিন পোয়া মাইল দক্ষিণে তখন একটি বাজার মাত্র ছিল, এই বাজার স্থানীয় মিরাশদার মোহাম্মদ করিম চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া করিমগঞ্জ নামে খ্যাত হইয়াছিল। হেমন্তে নটীখালে জল থাকে না বলিয়া অসুবিধা বিধায় এই বাজার ১২৭২ বঙ্গাব্দে বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

করিমগঞ্জ সবডিভিশনে লাতু একটি পরিজ্ঞাত স্থান, এই স্থানে রাজস্ব সংগ্রহের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, লাতুর বাজারের সন্নিকটবর্ত্তী মাল-গড়ের টীলাতে গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সংগৃহীত রাজস্বাদি তথায় রক্ষিত হইত; তথায় বহুদিন যাবৎ একটা মুন্সেফ কোর্টও ছিল, পরবর্ত্তীকালে এই কোর্ট ফেঁচুগঞ্জে উঠিয়া যায়। করিমগঞ্জ সবডিভিশন স্থাপনের প্রাক্কালে ফেঁচুগঞ্জ হইতে উঠাইয়া আনা হয়। বর্ত্তমান করিমগঞ্জ বাজারের ঠিক উত্তরে নদীর পরপারে জকিগঞ্জ নামক স্থানে তখন ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পরে, নটীখালের পরপারে ফৌজদারী কাছারী গৃহাদি নির্ম্মিত হইলে মুন্সেফ কোর্টও জকিগঞ্জ হইতে এথায় চলিয়া আসে।

করিমগঞ্জে ষ্টিমার ও রেলওয়ের সংযোগ থাকায় ইহা ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। করিমগঞ্জ সবডিভিশনে ৪০টি পরগণা আছে। সবডিভিশনের আয়তন ও জনসংখ্যাদি এবং পরগণা সমূহের নামাদি বিবরণ প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। অধিবাসীবর্গ মধ্যে যাঁহাদের কীর্ত্তিকথা প্রসঙ্গতঃ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হয় নাই, এস্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ হইবে। আমরা পঞ্চখণ্ডের স্বগীয় বাসুদেব সংসৃষ্ট কাহিনীর সহিত এই খণ্ড আরম্ভ করিলাম।

দেব-লীলা

প্রথম ভাগের ৯ম অধ্যায়ে স্বগীয় বাসুদেবের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে, জয়ন্তীয়া রাজ কর্ম্মচারী দুর্গাদলইর পুষ্করিণী খননকালে বাসুদেব বিগ্রহ পাওয়া গেলে, বিজয়কৃষ্ণ পাঠক নামক এক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণকে উক্ত বিগ্রহ প্রদত্ত হয়। বিজয় কৃষ্ণ পরশর গোত্রীয় ছিলেন। বাসুদেবের সেবাধিকারী বিপ্র বর্গ তাঁহারই বংশধর।

বিজয় কৃষ্ণের দুইটি পুত্র ছিল। একদা এক ব্যক্তি বাসুদেবের উদ্দেশ্যে দুইটি সুপক্ক আম্র প্রদান করিল; বালকদ্বয় সুপক্ক আম্রের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া দেবোদ্দেশে প্রদত্ত আম্র দুইটি ভক্ষণ করিল। সেই আম্র ভক্ষণের পর তাহাদের পেটে অসুখ জন্মিল, আর তাহাতেই তাহাদের উভয়ের মৃত্যু হইল। পুত্রদ্বয় প্রাণ ত্যাগ করিলে পাঠকপত্নী ভূপতিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হায় দেবসেবার কি এ ফল? আম্র ভক্ষণে মৃত্যু হইবে কেন? আম্রতো আর

বিষাক্ত ছিল না যে খাইয়াই বালক দুটি অজ্ঞান হইয়া পড়িবে? এ আর কিছু নহে, ইহা দেবলীলা।

বিজয়কৃষ্ণ পাঠক তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু ঘটনা দেবলীলা বলিয়াই বোধ করিলেন; তখন দেবতার উপর ভক্তের অভিমান হইল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর দেবসেবা করিবেন না।

দেবতা অজ্ঞান বালকের দোষ গ্রহণ করিলেন কেন? অজ্ঞানের জ্ঞানাভাব দোষেই যদি মৃত্যুদণ্ড বিহিত হয়, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক পূজাপরিত্যাগের প্রত্যবায় জনিত দোষেও মৃত্যুদণ্ড প্রযুক্ত হউক। পুত্রদ্বয়কে দেবতা যে পথে নিয়াছেন, তিনিও সে পথেই যাইতে চাহেন; কাজেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর দেবসেবা করিবেন না।

গোবিন্দ ঘোষের কীর্ত্তিও এইরূপ। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবনোদ্দেশে যখন রামকেলি পর্য্যন্ত গমন করেন, তখন পদকর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় শ্রীমহাপ্রভু প্রায় সর্ব্বসময় কৃষ্ণপ্রেমে একরূপ বাহ্যজ্ঞান বিরহিত রহিতেন। অভ্যাস বশেই স্নানাহাবাদি চলিত। একদা আহারান্তে মুখসিদ্ধির জন্য তিনি হরীতকী পাইতে হাত পাতিলেন, নিকটে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন, অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনি দৌড়িয়া গ্রামে গেলেন ও একটা হরীতকীর অর্দ্ধাংশ আনিয়া দিলেন। পরদিন প্রভু অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তেমনি হরীতকীর আনিয়া অর্দ্ধাংশ দিলেন। পরদিন প্রভু অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তেমনি হরীতকীর জন্য হাত পাতিলেন, গোবিন্দ অগ্রবর্ত্তী হইয়া তখন হরীতকীর অপরার্দ্ধ প্রদান করিলেন। সর্ব্বদা যিনি ভাবান্তরে বাহ্য বিস্মৃত, গোবিন্দ হরীতকী খণ্ড দিবা মাত্র তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। এবং গোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "গোবিন্দ! তোমার সঞ্চয় বুদ্ধি এখনও রহিয়াছে, তুমি গৃহত্যাগের উপযুক্ত হও নাই, কিছুকাল গৃহধর্ম্ম কর।" গোবিন্দ বিবাহাদি করেন নাই এবং উদাসীন ব্রতী ছিলেন, এক্ষণে মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহাকে অগ্রদ্বীপে থাকিতে হইল। অগ্রদ্বীপে তিনি বিবাহ করিলেন ও গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। কালক্রমে তাঁহার একটি পুত্র জাত হইল। গোপীনাথের প্রতি গোবিন্দের যে বাৎসল্য ছিল, এক্ষণে পুত্রও সেই প্রীতির অংশ গ্রহণ করিল। এই সময় একদিন হঠাৎ তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় গোবিন্দ, গোপীনাথের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া অভিমান করিয়া বসিলেন। সেবা পূজা বন্ধ হইল, গোবিন্দ বলিতে লাগিলেন— "গোপীনাথের পূজা করিয়া আমার পিণ্ড প্রাপ্তির আশা লুপ্ত হইল, ইহাই তো পূজার ফল! আমি আর গোপীনাথের পূজা করিব না।" ইহার পর গোপীনাথ কর্ত্তৃক পিণ্ডদানের ব্যবস্থা হইল এবং গোবিন্দও পূর্ব্বমত পূজায় বৃত হইলেন। অগ্রদ্বীপে আজ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর গোপীনাথ বিগ্রহ গোবিন্দ ঘোষকে[১] পিণ্ড প্রদান করিয়া আসিতেছেন!

ভগবানের প্রতি ভক্তের—উপাস্যের প্রতি উপাসকের এইরূপ প্রেমাভিমান তাঁহাদের সামান্য ভক্তি নিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। এইরূপ প্রেমেই ভগবানকে ভক্তের ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

বিজয়কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর দেবসেবা করিব না। কাজেই এই প্রগাঢ় প্রেমের প্রতিদানে দেবতাকে তাঁহার অভাব পূরণ করিতে হইল, স্বীকার করিতে হইল যে, তাঁহাদের ত্রুটি গৃহীত হইবে না।

বাসুদেব বিজয়ের প্রেমে মুগ্ধ, বিজয়ও বাসুদেবের একান্ত ভক্ত; তাই বাসুদেব বিজয় এবং বিজয়ের বংশধর ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা পূজিত হইতে চাহেন না। বিজয় যথাকালে পুত্রের হাতে সেবা সমর্পণ করিয়া যোগ্যধামে গমন করিলেন।

১. ইঁহার ভ্রাতৃবংশ-বিবরণ দক্ষিণ শ্রীহট্টের বংশ বৃত্তান্ত খণ্ডে কথিত হইবে।

এই দুই জনের ছয়টি পুত্রজাত হয়, তাঁহাদের বংশধরগণই বাসুদেবের সেবাধিকারী; বাসুদেবের যাহা কিছু আয়, ইঁহারাই তাহা প্রাপ্ত হন। নবাব শুকুরুল্লা খাঁ বাহাদুরের সময়ে বাসুদেবের সেবা পরিচালনার জন্য ৪৫ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। সেই সময় হইতেই রথযাত্রা ও বারুণীর মেলা আরম্ভ হয়।

এই বংশীয় হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শম্ভুদেব, তৎপুত্র শুকদেব, তাঁহার পুত্র বাসুদেব, ইঁহার পুত্র চণ্ডীচরণ তর্কভূষণ। ইনি ত্রিপুরাধিপতির পণ্ডিত-সভায় প্রায়শঃ যাইতেন, তথায় তাঁহার বার্ষিক ৫০ টাকা বৃত্তি অবধারিত ছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাকান্ত জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং চতুর্থ পুত্র অভয়াচরণ বহুদর্শী চিকিৎসক ছিলেন। চণ্ডীচরণের ৩য় পুত্রের নাম চন্দ্রকান্ত, ইঁহার পুত্র শ্রীযুত নীরদ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অনিপণ্ডিতের পরাশরগণ

পঞ্চখণ্ডের নাম পূর্ব্বাংশে করা গিয়াছে। পঞ্চখণ্ডই সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের আদি নিকেতন। সম্প্রতি (১৩২০ বাং) পঞ্চখণ্ডে ভাস্কর বর্ম্মার যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, পঞ্চখণ্ডের সহিত তাহার সম্বন্ধ না থাকিলেও এ স্থানে উহা আসিবার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, তাম্রশাসন প্রাপক বা তদীয় উত্তরাধিকারী পূর্ব্বকালে এস্থলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।[২] মিথিলাগত পঞ্চবিপ্রের বাসভূমি পঞ্চখণ্ড অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত ভূমি। পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বে এ স্থলে টেঙ্গরী নামক কুকি সম্প্রদায় বাস করিত, তাহা বলা গিয়াছে। উক্ত কুকি সম্প্রদায়ের বাস হেতু পঞ্চখণ্ড "টেঙ্গইর" নামে খ্যাত ছিল, সেই পুরাতন নামের স্মৃতি এতকাল পরেও জনশ্রুতি বিস্তৃত হয় নাই।[৩] মিথিলাগত পঞ্চ বিপ্র-বংশীয়দের মধ্যে পরাশর গোত্রীয়গণ অন্যতম। পঞ্চখণ্ডে পরাশর গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক আর এক বংশীয় ব্রাহ্মণ আছেন; পঞ্চখণ্ডের অনিপণ্ডিত নামক স্থানে জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার নামানুসারে তদীয় বসতি স্থান "অনিপণ্ডিত" নামে খ্যাত হয় এবং তদ্বংশীয়গণ তদবধি "পণ্ডিত" এই সাধারণ উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। "অনিপণ্ডিত" গ্রামের মহাত্মা অনিপণ্ডিত দেবকল্প সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালেও এই বংশে শুকদেব সিদ্ধান্ত, রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ, রতিকান্ত ন্যায়ভূষণ, রতিকান্ত বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি খ্যাত নামা পণ্ডিতবর্গের উদ্ভব হয়। এই বংশে তীক্ষ্ণধী শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়। একদা জনৈক বৈদেশিক পণ্ডিত[৪] হেড়ম্বেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের[৫] সভায় উপস্থিত হইয়া তিনটি প্রশ্নের উত্তর চাহেন, উত্তরটি একটি বাক্যে হইবে।

শ্যামানন্দ পূর্ব্বে কাছাড় রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন, তখন অবসর গ্রহণে বাড়ী আসিয়াছেন। রাজসভায় অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ প্রশ্নের নানারূপ উত্তর দিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃত উত্তর হইল না। তখন শ্যামানন্দকে দেশ হইতে ডাকিয়া নেওয়া হইল, তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া প্রশ্নটি শুনিতে চাহিলে পণ্ডিত বলিলেনঃ—

২. বিজয়া পত্রিকা-আষাঢ় ১৩২০ বাংলা।
৩. পঞ্চখণ্ড উৎকৃষ্ট আনারসের জন্মভূমি; ঐ আনারস পূর্ব্বে "টেঙ্গরী আনারস" নামে খ্যাত ছিল। ইদানীং "জলডুবি আনারস" বলিয়া কথিত হয়। সাধারণ লোকে "আনারস" অথবা "বিরতুম" বলে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে আনারস নামটি ব্রেজিল দেশীয়, ইহার লেটিন নাম আনানাস সেটাইবা।
৪. উক্ত পণ্ডিত পূর্ব্বে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপতি ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।
৫. মতান্তরে গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ।

"পঞ্চপাদঃ কথং সিংহঃ ঘ্রম্বিঃ স্যাৎ কেন ভাস্করঃ
নৃপতিঃ কস্যতুলোসৌ দীয়তামেক মুত্তরম্।"
শুনিয়া শ্যামনন্দ বলিলেনঃ—

'উত্তর রাক্যঞ্চ মঘোনঃ।'[৬]

সভায় শ্যামানন্দের জয় জয়কার পড়িল, রাজা প্রভৃত পুরস্কার প্রদানে প্রাচীন পণ্ডিতকে প্রসন্ন-চিত্তে বিদায় করিলেন। "রুক্মিণীহরণ নাটক" প্রণেতা তত্রত্য টোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র কৃতিরত্ন তদ্বংশ বর্ত্তমান আছেন।

পঞ্চখণ্ডের অনিপণ্ডিত বা পণ্ডিত পাড়ার পরাশর গোত্রে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির জন্ম হয় বলিয়া কথিত আছে। শ্রীবাসের পিতার নাম জলধর পণ্ডিত, শ্রীবাস যখন ষোল বৎসরের বালক, তখন সস্ত্রীক জলধর নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর নলিন পণ্ডিতের একমাত্র কন্যার নাম নারায়ণী; শ্রীবাসের কনিষ্ট শ্রীরাম পণ্ডিত ও শ্রীকান্ত পণ্ডিতের কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে আছে।[৭] ৪র্থ ভাগে আমরা শ্রীবাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিব।

সুপাতলা ও নয়াগ্রামের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয়গণ

ত্রিপুরাধিপতির যজ্ঞে[৮] কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় শ্রীপতি আচার্য্যের আগমন হয়, পরবর্ত্তী কালে এই বংশে উমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার পুত্রের নাম রূপেশ্বর, তৎপুত্র মুকুন্দ রাম বিশারদ, তাঁহার পুত্রের নাম মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার। মহেশ্বর হইতে এ বংশ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। মহেশ্বরের পুত্রের নাম শ্রীরাম বিশারদ, তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ এবং তৎপুত্র রমাকান্তের, রামনারায়ণ নামে এক পুত্র হয়। ইঁহার পুত্রের নাম কৃষ্ণচরণ, তাঁহার পুত্র শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথের পুত্র তারা নাথ ও তৎপুত্র শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন। শম্ভুনাথের পুত্র তারা নাথ ও তৎপুত্র শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার—

শ্রীহট্টের গৌরব স্বরূপ মহেশ্বর এক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার।[৯] তিনি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশের ছাত্র ছিলেন। তিনি কাব্য প্রকাশের "ভাবার্থ চিন্তামনি" নামক অপূর্ব্ব টীকা প্রণয়ন পূর্ব্বক অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই টীকা কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজ এবং বঙ্গের অন্যান্য সংস্কৃত বিদ্যালয় সমূহে অধীত হইয়া থাকে। তৎপ্রণীত "স্মৃতি ব্যবস্থা" ও দায় ভাগের টীকা' সংস্কৃত গ্রন্থ-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন বিশেষ। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, তাঁহারই ন্যায় তিনি অষ্টাবিংশতি "প্রদীপ" প্রণয়ন করেন।

---

৬. শ্লোকার্থঃ-সিংহ পঞ্চপাদ বিশিষ্ট কিরূপে হয়? ঘ্রম্বি ভাস্কর হন কি কারণে? এই রাজা কাহারতুল্য? একটি বাক্যে উত্তর দিন।
উত্তরে-"মঘোনঃ।" যথা-(১) মঘয়া উনঃ মঘোনঃ। নয় পাদ নক্ষত্রে এক রাশি হয়, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, ও উত্তর ফাল্গুনীর, একপাদে সিংহরাশি; এখন মঘা ছাড়িয়া সিংহ পঞ্চপাদ হয়।
(২) মঘাভ্যামূনঃ-ঘ্রম্বি শব্দ হইতে 'ঘ' এবং 'ম' অক্ষর ত্যাগ করিলে "রবি" অবশিষ্ট থাকে; রবি অর্থে ভাস্কর।
(৩) মঘোনঃ শব্দে ইন্দ্রেয় বুঝায়, অর্থাৎ এই নৃপতি ইন্দ্রতুল্য।
৭. নাম যথা-শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত। শ্রীপণ্ডিত আর শ্রীকান্তপণ্ডিত।-প্রেম বিলাল।
৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় দেখ।
৯. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭/৮ম অধ্যায়ে টীকাধ্যায়ে ইঁহার কাল নিরূপণাদি অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

উক্ত প্রদীপ গ্রন্থাবলীর নাম এইঃ—

১। সিদ্ধান্ত প্রদীপ
২। কাল প্রদীপ
৩। আহ্নিক প্রদীপ
৪। দেশ প্রদীপ
৫। দায় প্রদীপ
৬। অশৌচ প্রদীপ
৭। উদ্বাহ প্রদীপ
৮। তিথি প্রদীপ
৯। প্রায়শ্চিত প্রদীপ
১০। জ্যোতিঃ প্রদীপ
১১। মলমাস প্রদীপ
১২। তীর্থ প্রদীপ
১৩। প্রতিষ্ঠা প্রদীপ
১৪। ব্যবহার প্রদীপ
১৫। দ্বৈত প্রদীপ
১৬। বাস্তু প্রদীপ
১৭। পরীক্ষা প্রদীপ
১৮। বিচার প্রদীপ
১৯। তন্ত্র প্রদীপ
২০। সংস্কার প্রদীপ
২১। দুর্গোৎসব প্রদীপ
২২। বর্ণধর্ম্ম প্রদীপ
২৩। একাদশী প্রদীপ
২৪। জ্ঞান প্রদীপ
২৫। শ্রাদ্ধ প্রদীপ
২৬। দোলযাত্রা প্রদীপ
২৭। ব্রত অধিকারি প্রদীপ
২৮। অধিকারি প্রদীপ

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এই অমূল্য গ্রন্থাবলীর অনেকটিই এক্ষণে পাওয়া যায় না। মহেশ্বরের "ভাবার্থ চিন্তামণি টাকা" মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।[১০] অপর সকল গুলিই অমুদ্রিত রহিয়াছে। তৎকৃত "সিদ্ধান্ত প্রদীপ" গ্রন্থও এতদঞ্চলের চতুষ্পাঠী সমূহে পঠিত হইয়া থাকে।[১১] "দেশ প্রদীপ" গ্রন্থে তিনি স্বদেশের প্রসিদ্ধ বাসুদেব দেব-বিগ্রহের স্মরণ করিয়াছেন এবং পঞ্চখণ্ডের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পাল ও দত্ত বংশীয় ভূস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন; তত্রত্য সুরস আনারসের কথাও ভুলেন নাই।[১২] মহেশ্বর নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ জগদীশের নিকট[১৩] শিব পাঠ সমাপন করিয়া তথায় এক টোল প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর টোল পাঠার্থি-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনিও তথায় খ্যাতিপন্ন হন। নবদ্বীপে কোন এক সভায় তিনি সগর্ব্বে গৌরব খ্যাপন উপলক্ষে বলিয়াছিলেনঃ—

"সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকাঃ উত্তমাধব মধ্যমাঃ।
শ্রীহট্টে মধ্যমোনাস্তি চট্টলে নাস্তিচোত্তমঃ।"

কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে নয়াগ্রামে আত্মারাম ভট্টাচার্য্য নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি

---

১০. কাব্য প্রকাশের টীকায় মহেশ্বর লিখিয়াছেন–
"দুর্ব্বাখ্যা জনিত প্রমোহ শমনী বৈষব্য বিধ্বংসিনী;
বৈশদ্যাদতি রোচনী বসখনি কাব্যার্গলোদ ঘাটিনী।
টীকা বিজ্ঞজন প্রমোদ জননী ভাবার্থ চিন্তামনি,
ভট্টাচার্য্য মহেশ্বরেণ রচিতা কাব্য প্রকাশোপরি"।
যাঁহারা তাঁহার টীকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অম্লান বদনে এই উক্তির সার্থকতা স্বীকার করিবেন।

১১ এই গ্রন্থের আরম্ভন শ্লোক এই–
"প্রণম্য বচসাং দেবীং ভট্টাচার্য্য মহেশ্বরঃ।
সিদ্ধান্ত দীপং কুরুতে ন্যায়শাস্ত্রস্য শাস্ত্রবিৎ॥"
"যত্র শ্রীবাসুদেবো জলধি তনয়া সারদা সর্ব্বদাহত্র।

১২. যথা–
"যত্র শ্রীবাসুদেবো জলধি তনয়া সারদা সর্ব্বদাহত্র।
যত্রান্তে পঞ্চখণ্ডে সতত বুধ সভা পালদত্তৌক্ষিতীশৌ।
বাসস্থানং সুরম্যং ফলমিতি সুরসাং বেষ্টিতং ত্বিক্ষুনদ্যা।
তদ্রাজ্যং স্বর্গতুল্যং ত্রিভুবন বিদিতং তত্র সন্তোব সন্তঃ।"

কাছাড়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন; এই জন্য তিনি চাপঘাট পরগণা হইতে কতক ভূমি প্রাপ্ত হন। উক্ত ব্রহ্মত্র ভূমি "ভটের-চক" নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপি তদ্বংশীয়গণের অধিকারে আছে।

বিদুষী—এই কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে নয়াগ্রামে বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সহধর্ম্মিনী অপূর্ণাদেবী জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। সর্ব্বসাধারণে তিনি "দ্বিতীয় খনা" বলিয়া কথিতা হইতেন। এ বংশীয় তারাকান্ত তর্করত্ন নবদ্বীপে টোল স্থাপন পূর্ব্বক বহুকাল অধ্যাপনা করেন।

নয়াগ্রামের রামভদ্র ভট্টাচার্য্য তন্ত্র, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদও আলোচনা করিতেন। এসকল মহাত্মাদের আবির্ভাবেই পঞ্চখণ্ডের গৌরব। যে দেশ বিদ্বজ্জন সমালঙ্কৃত, সে দেশের গৌরব কে না করে?

স্বর্ণ কৌশিক গোত্রীয়গণ

স্বর্ণ কৌশিক গোত্রীয় জনার্দ্দন মিশ্র মিথিলা হইতে শ্রীহট্টে আগমন করেন; সে বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে জনার্দ্দনের একটি বংশধারা দেওয়া যাইবে। তদ্বংশে ২০শ ও ২১শ পর্য্যায়ে শ্রীপতি বিদ্যার্ণব ও গঙ্গাধর সার্ব্বভৌম এবং ২৭শ পর্য্যায়ে ব্রজগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।[১৪] এবংশে উদ্ভূত রঘুনাথ তর্কবাগীশ ও তৎপুত্র হইতে পঞ্চখণ্ডের স্বর্ণকৌশিকগণ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। রঘুনাথের পুত্রের নাম মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মধুসূদন তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবভক্তি অনন্য সাধারণ ছিল, তিনি ইষ্টচিন্তা ও ভগাবদর্চ্চনায় তন্ময় থাকিতেন। একদা এক অলৌকিক মহাপুরুষ তাঁহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৫] ইনি যে তদীয় আর্চ্চনায় বস্তু, তাঁহার ব্যবহারে তাহা জানা গিয়াছিল।

এই শ্লোকটি কবি প্যারী চরণের–
"শ্রীহট্ট লক্ষ্মীর হাট আনন্দের ধাম; স্বর্গাপেক্ষা প্রিয়তর এ ভূমির নাম;
জন্মভূমিতেই ইহা আমার নিকটে জিনিয়া ত্রিদশালয় গৌরব প্রকটে।"
ইতি বাক্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৩. মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারকে এ দেশের কেহ কেহ বঙ্গ গৌরব রঘুনাথ শিরোমনির মহোদয় বলিতে নিষেধ করেন, তাহা যে একান্ত ভিত্তি শূন্য, জগদীশের ছাত্র যে রঘুনাথের সহোদর হইতে পারেন না, রঘুনাথ যে মহেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তাহা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭/৮ম অধ্যায়ের টীকাধ্যায়ে বলা গিয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

১৪. ইঁহাদের বংশ-তালিকা জ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৫. মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ও ব্যাদিত-বদন মহাপুরুষ

কথিত আছে যে, মধুসূদন জগন্নাথ নীলাচলে স্বীয় মাতৃদেবীসহ যাইতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার উদ্যোগ করিতে ছিলেন। এমন সময় এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করেন। দেখেন যে তাঁহার ইষ্টদেব দারুব্রহ্ম রূপী জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন–"মধুসূদন, ক্ষেত্রে গিয়া তোমার প্রয়োজন নাই, তোমার ভক্তিবশে আমি তোমার দ্বারে আবদ্ধ। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? "অমুক" দিনে আমি একথার প্রমাণ দিব" স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নটি অদ্ভুত হইলেও ইহা এতাদৃশ সুস্পষ্টরূপে দেখিয়াছিলেন যে তিনি হইতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস না করিয়া, ভগবাদাদেশ বলিয়া জ্ঞান করিলেন ও ভক্তি সহকারে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; তীর্থযাত্রা আপাততঃ স্থগিত হইল।

ক্রমে সেই দিন সমাগত হইল, মধুসূদন সাধ্যমত উত্তমভোজ্য দ্রব্য, সুগন্ধ কুসুমহার প্রভৃতি অনুরাগভরে দেবগৃহে নিয়া রক্ষা করতঃ নিত্যান্ত সমাপন পূর্ব্বক একচিত্তে চিন্তামণির চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মধুসূদনের কনিষ্ঠ পৌত্র রামকৃষ্ণ, তৎপুত্র কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য হেড়ম্বেশ্বর হইতে কতক ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন, তিনি এদেশ প্রচলিত নৌকাপূজা বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন করেন এবং এক মৃন্ময়ী রক্ষাকালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যশস্বী হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ গোপীনাথ শিরোমণি তর্কশাস্ত্রে ও তন্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা যোগশাস্ত্র আলোচনা করিতেন ও যোগ্যানুষ্ঠান নিরত ছিলেন। তিনি প্রণায়াম পূর্ব্বক জলের উপর ভাসমান থাকিতেন, জলের উপর দিয়া হাঁটিতে পারিতেন এবং "নেতি ধৌতি" যোগে নাড়ী শোধনাদি প্রক্রিয়া করিতেন। হেড়ম্বাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র নারায়ণ তাঁহার গুণগ্রাম জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সভাসদ নিযুক্ত করেন ও বহুতর নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন।[১৬]

গোপীনাথের ভ্রাতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য। তিনি পূর্ব্বোক্ত মৃন্ময়ী মূর্ত্তির জন্য এক ইষ্টক-মন্দির প্রস্তুত করেন এবং গ্রাম দুর্গম পথগুলিকে সুগম শড়কে পরিণত করিয়া সাধারণের হিত সাধন করেন। ইঁহার পুত্র অভয়ানাথ ন্যায়পঞ্চানন দেশে একটোল স্থাপন পূর্ব্বক বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী মহাশয় উক্ত গোপীনাথেরই সুযোগ্য পুত্র। মধুসূদন কাহিনী তিনিই আমাদের নিকট প্রেরণে উপকৃত করিয়াছেন।

মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম গঙ্গাধর, তাঁহার রূপেশ্বর ও হরিকান্ত নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে রূপেশ্বরের পৌত্রের নাম রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত। ইঁহার টোলে ইটার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজ গোবিন্দ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অধ্যায়ন করিয়াছিলেন; মুদ্রিত 'বিধবা বিবাহের চরম বিচার' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা খাসা টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যারত্ন ইঁহারই পুত্র। তাঁহার প্রেরিত বিবরণী অবলম্বনে পরাশর কৃষ্ণাত্রেয় প্রভৃতি গোত্রীয়গণের বিষয় এস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত রজনী নাথ ভট্টাচার্য্য হইতে আমরা স্বর্ণকৌশিক কথা প্রাপ্ত হইয়াছি।

কাত্যায়নাদি গোত্রীয়গণের কথা

পঞ্চখণ্ডের কাত্যায়ন ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, মধুসূদনের চিত্ত চঞ্চল। হায়, তবে কি সে স্বাভিলষিক সুস্বপ্ন সফল হইবে না? ইহা কি চিত্তের আত্মবঞ্চনা মাত্র? না তাহা নহে; সাংসারিক আবিলতা শূন্য নির্ম্মলান্তঃকরণ ভক্তের চিত্তে সত্যের ছায়াই যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ভক্তের স্থির চিত্তের সে স্বপ্ন বিফল হইবে কেন? অকস্মাৎ বাকশক্তি-বিহীন এক কুষ্ঠরোগ সন্ন্যাসী দেবালয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; সন্ন্যাসী মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মধুসূদন তখন ধ্যান নিমগ্ন। তিনি ইঁহাকেই জগন্নাথ বলিয়া ধ্যানে অনুভব করিলেন ও ধ্যান ভঙ্গে সংগৃহীত ভোজ্য দ্রব্যাদি ভক্তি ভরে তদীয় ব্যাদিত বদন-গহ্বরে অর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংগৃহীত সমস্ত গলাধকরণান্তে সে ব্যাদিত বদন সঙ্কুচিত হইল না! নিরূপায় হইয়া মধুসূদন তখন দেবগৃহে সহিত জল কলস মুখে ঢালিয়া দিলেন। তাহাতে ভোজনের অভিপ্রায় নিবৃত্ত হইল না, বদন পূর্ব্ববৎই ব্যাদিত রহিল! মধুসূদন আর দিবেন? অগত্যা তিনি মাকে ডাকিলেন ও ঘরে যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে, আনিয়া দিতে বলিলেন; অমনি সে মূর্ত্তি লুক্কায়িত হইল।

মধুসূদন বিষাদিত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, এইরূপে দিবা অতীত হইল রাত্রে কিঞ্চিত নিদ্রাকর্ষণ হইলে, স্বপ্নে পূর্ব্ববৎ তিনি দেব দর্শন পাইলেন। জগন্নাথ তাঁহাকে সান্তনা দান করিলেন।" বলিলেন-তোমার স্বহস্তে আমি আহার করিয়াছি। তোমার আমি দুঃখ কি? তোমার বংশে কেহ ক্ষেত্রধামে না গেলেও আমি সন্তুষ্ট থাকিব, তোমার সন্তোষার্থ প্রতিজ্ঞা করিলাম।" আজ পর্য্যন্ত এ বংশীয় কেহ শ্রীক্ষেত্র যান নাই।

১৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশের উপসংহারাধ্যায়ে এই ভূদান সনন্দ উদ্ধৃত হইয়াছে

হওয়া যায় নাই। কাত্যায়ন গোত্রীয় প্রথমাগমন শ্রীধরাচার্য্য হইতে ১৫শে পুরুষে[১৭] বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের উদ্ভব হয়; তিনি বঙ্গাধিপ শ্যামল বর্ম্মার (১০০১ শকাব্দ) সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার জীবন চরিত "শ্যামল বর্ম্ম চরিত" রচনা করেন। ইঁহার ভ্রাতা শ্রীগর্ভের পুত্র ভূধরোপাধ্যায়, ভূধরের দ্বাদশ পর্য্যায়ে "শুদ্ধি দীপিকার টীকা প্রণেতা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর উদ্ভব হয়। ইটার রাজজামাতা রঘুপতি ও চিন্তামণি দীধিতি" প্রণেতা ভারত বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি ইঁহারই পুত্র। রঘুনাথ শিরোমণির বৃত্তান্ত শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশে[১৮] বিবর্ণিত হইয়াছে। রঘুপতি ইটার রাজকন্যা বিবাহ করিয়া ইটাবাসী হন, তদ্বংশীয়গণের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত হইবে। পঞ্চখণ্ডের কাত্যায়ন তত্রত্য নয়াগ্রামবাসী।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় কথা

ভরদ্বাজ গোত্রীয় আতুয়াজান বাসী রাঘব বেদান্তের পঞ্চখণ্ডে বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ত্রয় পঞ্চখণ্ডে আনীত হন,[১৯] বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠ, দেশে গমন করেন, কিন্তু মধ্যম পুত্র রমানাথ দেশে না গিয়া নয়াগ্রামেই বাস করেন; তৎপুত্র রামেশ্বর তপোবলে মহাদেব হইতে ত্রিশূল অথবা ত্রিশূলের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে এবং তাহাতে তদ্বংশ "ত্রিশূলী বংশ" নামে খ্যাত হয়; এ বংশ একটি প্রসিদ্ধ বংশ, এ বংশে শ্রীযুত রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি জীবিত আছেন।

মিশ্র বংশ কথা

সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গ ব্যতীত পঞ্চখণ্ডে অন্য যে সমস্ত বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ বিদ্যমান, তাহাও অল্প প্রাচীন নহে; তন্মধ্যে সুপাতলাবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মিশ্র বংশের উল্লেখই এস্থলে যথেষ্ট হইবে। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মিথিলাগত বলিয়াই প্রকীর্ত্তিত। তাঁহাদের বংশ প্রবর্ত্তক আদিপুরুষ মিথিলাগত বলিয়াই প্রকীর্ত্তিত। তাঁহাদের বংশ প্রবর্ত্তক আদিপুরুষ কে ছিলেন, তিনি কবে পঞ্চখণ্ডে আগমন করেন, জানা যায় না।[২০] প্রায় সপ্তম পুরুষ উর্দ্ধস্থলীয় হরিহর মিশ্রের সময় হইতে এবংশের বিবরণ ধারাবাহিকরূপে অবগত হওয়া যায়।

হরিহরের পুত্র রামকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশের পুত্র কাশীনাথ মিশ্র ও রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। এই ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট আরঙ্গজেবের সময়ে শ্রীহট্টের নবাব হইতে এক সনন্দে পঞ্চখণ্ডে বিশহল ভূমি "মদতমাস" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাশীনাথের পুত্র হরিনাথ ও রামনাথ।[২১] তন্মধ্যে হরিনাথের বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ নামে দুই পুত্র হয়, রামনাথের এক মাত্র পুত্রের নাম ধনমিশ্র। উক্ত ধনমিশ্রের নামে যে সনন্দ পাওয়া যায়, তাহার "জিমিন" বা পৃষ্ঠলিখিতে লিখিত আছে—"ধনমিশ্র স্বীয় জীবিকার জন্য পূর্ব্বপুরুষদের প্রাপ্ত সনন্দ বহাল রাখিতে দরখাস্ত দিলে, রামচন্দ্র ও কাশীনাথের প্রাপ্ত মদত মাস বাবতে পূর্ব্ব সনন্দে যে ১৩ টাকা ধার্য্য ছিল, (তাঁহাদের মৃত্যুর পরে) তাহা হইতে রামচন্দ্রের অংশ ৯ টাকা "মিনা" (বাদ) দিয়া অবশিষ্ট ৪ টাকা তাং কাশীনাথ-হরিনাথ হইতে ১১৪০ পং সনে তদীয় ভরণ পোষণের জন্য দেওয়া হয়।[২২]

১৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ঋ পবিশিষ্ঠে কাত্যায়ন বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৮. ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায় দেখ।

১৯. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২০. এই বংশীয়গণ বলেন যে বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা এস্থানবাসী, শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তাঁহাদেব বংশে জ্ঞানবর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন।

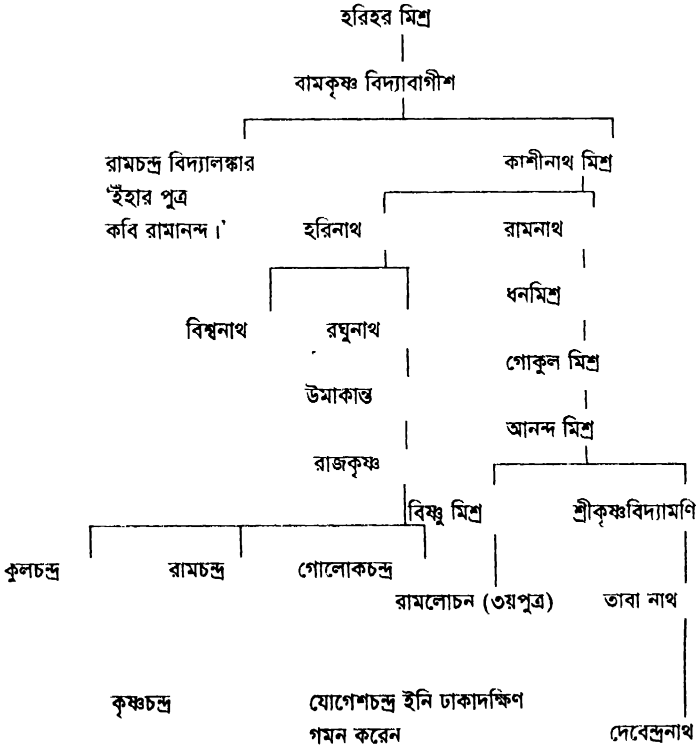
মদতমাস প্রাপক সহোদর ভ্রাতা রামচন্দ্র ও কাশীনাথের প্রাপ্ত ভূমি হইতে রামচন্দ্রের অংশ "মিনা" দিয়া. অবশিষ্টাংশ ধনমিশ্রকে দেওয়া হইল কেন? উভয়ের প্রাপ্ত ভূমির মোট উপস্বত্ব ১৩ টাকা হইতে, রামচন্দ্রের অংশে ৯ বাদ যাওয়াতে, স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, উক্ত মদতমাস ভূমির কিঞ্চিদধিক দ্বিতৃতীয়াংশ রামচন্দ্রের ও অবশিষ্ট কাশীনাথের স্বত্ব ছিল। রামচন্দ্র বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনিই এই সনন্দোল্লিখিত অধিকাংশ ভূমি প্রাপ্ত হন, তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রাপ্ত আরও ব্রহ্মত্র ভূমির কথাও শুনা যায়।

দ্বিতীয়তঃ রামচন্দ্রের অংশ "মিনা" (বাদ) যাইবার কারণ এই যে, রামচন্দ্রের পরবর্ত্তী বংশধর কেহ না থাকায় উহা রহিত হইয়া যায়।[২৩] এবং তাঁহার পিতামহের অংশে ৪ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হন।

রসতত্ত্ব বিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণব প্রচারক বার্ত্তা

"রসতত্ত্ব বিলাস" নামক বাঙ্গালা পদ্যে বিরচিত একখানা প্রাচীন পুস্তকের রচয়িতার নাম রামানন্দ। গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীহট্টবাসী, ইহা উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে। গ্রন্থকার কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে স্পষ্টতর ভাবে কিছু না বলিলেও গ্রন্থের শেষ ভাগে যে দুই চারিটি কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে

২১. সম্বন্ধ-নির্ণয়ার্থ বংশ তালিকা এস্থলে দেওয়া গেলঃ-



২২. এই সনন্দ শ্রীহট্টের নবাব বশারত খাঁ বাহাদুর কর্ত্তৃক ১১৪০ পরিগণাতিসনে (১১৩৭ বঙ্গাব্দে) প্রদত্ত হয়। উহা বঙ্গাব্দের তিন বৎসর পশ্চাদগামী। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পরিশিষ্টে কয়েকটি সনন্দে উভয় সনের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে।

মিশ্রবংশীয়গণ তাঁহাকে স্ববংশীয় বলিয়া থাকেন, এই দাবির প্রকৃষ্ট কারণও আছে।

উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় ভক্ত রামদাস ও মাধব দাস নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকিয়া, হরিনাম প্রচারার্থ উত্তর দিকে প্রেরণ করেন এবং উপেন্দ্রতনয় জ্ঞানবর ও কল্যাণবরকে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে আদেশ করেন।[২৪] এস্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে, শ্রীমহাপ্রভু কোথা হইতে এই আদেশ করিয়াছিলেন? আর আদেশ পাইয়া প্রচারকগণই বা কোথায় প্রচারার্থ গিয়াছিলেন?

জ্ঞানবর ও কল্যাণবর পূর্ব্বদিকে গমন করেন। তাঁহারা হেড়ম্ব রাজ্যে (কাছাড়) ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃ গ্রন্থে লিখিত আছে।

শ্রীমহাপ্রভু ১৪৩১ শকাব্দে শ্রীহট্টে দ্বিতীয়বার আগমন করেন, ইতিপূর্ব্বে (৩য় ভাগ ১ম খণ্ড) তাহা বলা গিয়াছে। শান্তিপুর হইতে তিনি বুরুঙ্গাতে উপস্থিত হইলে, তদীয় স্বজ্ঞাতি (ইন্দকর ও দুর্গাবরের) সম্পর্কিত ভ্রাতা গৌরীকান্ত প্রভৃতির সহিত যেরূপে তঁহার সম্মিলন হইয়াছিল এবং যেরূপে তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হন, সংক্ষেপে তাহাও বলা হইয়াছে; তৎপরে তথা হইতে তিনি ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন। রসতত্ত্ববিলাসের উল্লেখত জ্ঞানবর ও কল্যাণবরকে তিনি এই সময়ে এ স্থান হইতেই কাছাড়াঞ্চলে পাঠাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকেই হেড়ম্ব বা কাছাড় রাজ্য।[২৫]

শ্রীমহাপ্রভু রামদাস ও মাধবদাসকে উত্তরদিকে প্রেরণ করেন; কাজেই উহা শ্রীহট্টের উত্তরাঞ্চল বলিয়া অবধারিত হইতেছে। কিন্তু দেখা আবশ্যক উত্তরদিকে তাঁহাদের প্রচারের অনুমানসিদ্ধ কোন চিহ্ন আছে কি না?

---

২৩. রাজকীয় কোন বৃত্তি প্রাপকের বংশ বা পুত্রাদি না থাকিলে বৃত্তি রহিত হইত, বিশেষ কারণ ব্যতীত ভ্রাতৃবংশ তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন না। ইহার উদাহরণ ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড অধ্যায়ে "রায়নগরের ভট্টাচার্য্য বংশ" বিবরণ প্রসঙ্গে পাঠক পাইয়াছেন। রামচন্দ্র অপুত্রক না পুত্রবান ছিলেন? আমরা পঞ্চখণ্ড হইতে মিশ্রবংশের দুইখানা তালিকা পাইয়াছি। প্রথম তালিকায় রামচন্দ্রের নামের নীচে শূন্য দেওয়া আছে, ইহার প্রেরক শ্রী কুলচন্দ্র মিশ্র। পরে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মিশ্র প্রেরিত দ্বিতীয় তালিকায় তাঁহার নামের কবি রামানন্দের নাম তৎপুত্র বলিয়া লিখিত দৃষ্ট হয়। রামচন্দ্রের পুত্র রামানন্দ; রামানন্দের পুত্রাদি না থাকায়, রামচন্দ্রের বংশ বিলোপ প্রযুক্ত সনন্দোল্লিখিত তদীয় অংশ "মিনা" যাওয়া অসঙ্গত নহে।

২৪. "এতবলি মহাপ্রভু ডাকে রামদাস।
দুই ভাই সঙ্গে চলে মাধব দাস॥
এই নাম বিলাইবা উত্তর দিগেতে।
জ্ঞানবর কল্যাণবর ডাকয়ে ত্বরিতে॥
মোর আজ্ঞাবল বাপু পূরব দিগেতে।
যারে তারে এই নাম বিলাও ভালমতে॥
জন্মে জন্মে তুমা দোহার হৃদয়ে বসিয়া।
আমি প্রেম বিলাইব নিশ্চয় জানিও॥"-রসতত্ত্ব বিলাস।

২৫. যদি বলা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপ হইতেও তো পাঠাইতে পারেন, ঢাকাদক্ষিণ হইতে বলিব কেন? কিন্তু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, নবদ্বীপ হইতে পাঠাইলে, নবদ্বীপের পূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন স্থানই প্রচার ক্ষেত্র হইত-কাছাড় হইত না। নবদ্বীপ হইতে প্রেরিত হইলে অগ্রে সম্ভবতঃ তদীয় পিতৃভূমি শ্রীহট্টের কথাই হইত। পরন্তু কাছাড়, শ্রীহট্ট জিলার তথা ঢাকাদক্ষিণেরই ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী। বিশেষতঃ মিশ্র বংশায়গণ বলেন যে তাঁহারা পঞ্চখণ্ডের বহু প্রাচীন অধিবাসী তদবস্থায়, মহাপ্রভু ঢাকাদক্ষিণ আসিলেই জ্ঞানবর তৎসদনে গিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

হাজঙ্গ জাতি ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

ময়মনসিংহের উত্তরপর্ব্বে প্রান্তস্থ (শ্রীহট্টের প্রায় সংলগ্ন) সুসঙ্গদুর্গাপুর নামক স্থানে হাজঙ্গ জাতীয় যে সকল পার্ব্বত্যলোকের বাস, তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হাজঙ্গেরা গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে এবং আচার ব্যবহারে সর্ব্বত্রই ইহাদের অনুরূপ। কিন্তু সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের হাজঙ্গদের অবস্থা তদ্রূপ নহে; ইহাদের গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অঙ্গন সর্ব্বদা গোময় লিপ্ত এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই তুলসী বৃক্ষ রোপিত আছে। ইহারা বিনীত এবং অতিথি পূজাপরায়ণ, জীব হিংসা না করিয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের হাজঙ্গগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী; মৃদুঙ্গ করতাল সহ সঙ্কীর্ত্তন করাও তাহাদের মধ্যে অপরিজ্ঞাত নহে। এমন কি তাহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত গুরু ও পঞ্চতত্ত্ব প্রণামাদি শ্লোক বংশানুক্রমেও জানে ও বলিতে পারে। তাঁহারা জন্মাষ্টমী, রাস ও দোলযাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের খ্যাতি অধিকারী, তাহাদের গৃহে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন,—অধিকাংশ মূর্ত্তিই রাধাকৃষ্ণ অথবা গোলাপের।[২৬] ফলতঃ ইহারা আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব। আজকাল বৈষ্ণব হয় নাই—পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব।

এই অঞ্চলের হাজঙ্গেরা ঈদৃশ ভাব ও ধর্ম্ম কোথায় পাইল? ইহা অল্প অনুশীলনের এবং বাঙ্গালীর অনুকরণের ফল নহে, তাহা হইলে বাঙ্গালী-পল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী অপর পার্ব্বত্য জাতিরাও এইরূপ আচার বিশিষ্ট হইত। কোনও পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিকে তাহার চিরাচরিত প্রাচীন সংস্কার ও আচার ত্যাগ করান সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। হয় স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু ঐ স্থানে গমন করায় তাঁহার প্রভাব এই বন্য প্রদেশেও অমৃত-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছে; নয় কোন শক্তিমান বিশিষ্ট ভক্ত দ্বারা ইহারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে।

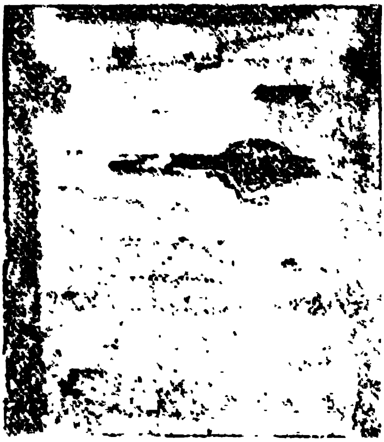
পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহট্টাগমন কালে এই স্থানে যাওয়ার কথা উল্লেখ নাই।[২৭] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেদয়াবলীতে সন্ন্যাসের পরে তাঁহার শ্রীহট্টাগমন বার্ত্তা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভাবে এমত বুঝা যায় না একদা ব্যতীত তিনি পথে কোথাও কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রসতত্ত্ববিলাসের বর্ণনানুসারে শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞাবলে যখন শ্রীহট্টবাসী মাধব দাস ও রামদাসের উত্তরদিকে ধর্ম্ম প্রচারের সংবাদ পাইতেছি, তখন ইঁহারাই গারুঙ্গ জাতির উদ্ধার কর্ত্তা, তাহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতেছে। সুসঙ্গ দুর্গাপুর শ্রীহট্টের প্রায় সংলগ্নভাবে উত্তরাংশেই বটে।[২৮]

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন; তাঁহার আগমনের স্মৃতি ও চিহ্ন চারিশত বৎসরের ব্যবধানেও বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার পিতৃ ও মাতৃভূমি শ্রীহট্ট (-বুরঙ্গা

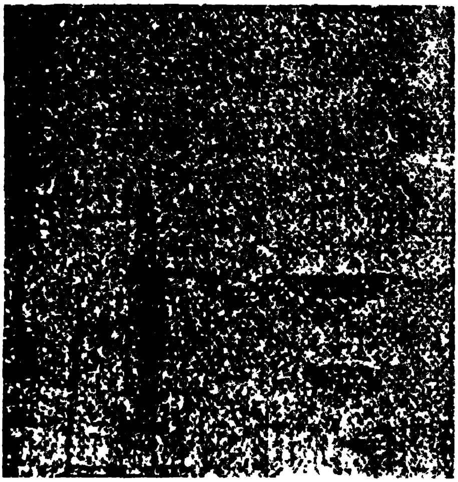
২৬. সুসঙ্গ-দুর্গাপুর হইতে সেরপুরের হাজঙ্গেরা বৈষ্ণব হয়, তত্রত্য হাজঙ্গ বসতির মধ্যে অনেক গ্রামেই অধিকারীদের বাস ও শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন। দাউধারা গ্রামের অধিকারীর গৃহে শ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ স্থাপিত।

২৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরার্দ্ধে উপসংহারাধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য চরিত দ্রষ্টব্য।

২৮. তৎকালে সুসঙ্গ-দুর্গাপুর সরকার শ্রীহট্টেরই অন্তর্গত ছিল। এমন কি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে পদ্মার পূর্ব্বতট-ভূমি "ভাটি চাকলা" ভুক্ত হয়, তন্মধ্যে ৫ম চাকলার পূর্ব্বাংশবর্ত্ত অনেকটা স্থান, সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের কিছুটা অংশ, শ্রীহট্ট ভুক্ত থাকা দৃষ্ট হয়। (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার কৃত ময়মনসিংহের ইতিহাসেও ইহার উল্লেখ আছে।



(১) গোকুল মিশ্রের প্রাপ্ত সনন্দের সম্মুখ দিক



(২) ঐ পৃষ্ঠালিপি

এবং ঢাকাদক্ষিণ) তদীয় পদরেণু ধারণে পবিত্র মাতৃভূমিতে পরিণত হইতেছে। শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্ত্তী স্থল গুলিতেও সেই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে, বিচিত্র কি? উত্তরদিকে সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের হাজঙ্গগণ হইতে তাহারই নিদর্শন কি পাওয়া যাইতেছে না? শ্রীহট্টের রামদাস ও মাধবদাস শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে উত্তরদিকে গিয়া "কেবল নাম প্রচারে" ইহাদিগকে তরাইয়া ছিলেন।[২৯]

জ্ঞানবর ও কল্যাণবর কোথায় কি করিয়াছিলেন

জ্ঞানবর ও কল্যাণবর কি করিয়াছিলেন? ইঁহার নাম প্রচারার্থে পূর্ব্বদিকে গমন করেন বলা গিয়াছে। শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান কাছাড় জিলা কিন্তু তৎকালে[৩০] কাছাড়ের রাজধানী তদুত্তর প্রদেশে—ডিমাপুরে ছিল।[৩১] তবে কাছাড়ের সমতল প্রান্তর তখনও হেড়ম্ব রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং সেই অঞ্চলে লোকের বসতি অতি বিরল ছিল। জ্ঞানবর কল্যাণবর সেই বিরল-বসতি স্থলে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়া, সেই অল্প সংখ্যক জড়পূজক অধিবাসী মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ প্রোথিত করেন। অদ্যাপি যে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা সেই প্রচার কার্য্যের অবশেষ কি না কে বলিবে?

জ্ঞানবর ও কল্যাণবর প্রচারান্তে হেড়ম্বেশ্বরের অধিকার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কাজ শেষ হওয়ায় আর তথায় থাকার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহারা তথা হইতে ফিরিয়া পঞ্চখণ্ডে আগমন করেন। সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের আদি ভূমি উন্নত স্থান পঞ্চখণ্ডতেই তাঁহাদের প্রচারক্ষেত্রের কেন্দ্র হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই বংশেই শ্রীরামমিশ্রের উদ্ভব।[৩২]

---

২৯. "প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া আইলা এ চারি গোসাই।
রামদাস রাধবদাস উত্তরদিকে যাই॥
তথা যায়া বিলাইয়া প্রভুর আজ্ঞাবলে
কেবল নাম প্রচারে সে দিকে তরাইলে॥'-রসতত্ত্ব বিলাস।

৩০. খৃষ্টীয় ষোড়ষ শতাব্দীর প্রথম দশাব্দে;-(১৫০৯ খৃষ্টাব্দে?)

৩১. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ কৃত "হেড়ম্বের দণ্ডবিধির ভূমিকা" গ্রন্থে লিখিত আছে, "শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের মতে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে আহোমগণ কর্ত্তৃক ডিমাপুর বিধ্বস্ত হইলে পর কাছাড়ীগণ ধনশ্রী নদীর তীর ভূমি (ডিমাপুর) পরিত্যাগ করিয়া মাইবঙ্গে নূতন রাজধানী স্থাপন কবে। কিন্তু মাইবঙ্গের রাজধানীব নির্ম্মাণ কার্য্য তৎকালেই সমাপ্ত হইয়াছিল। একথা বলা যায় না।"-১২ পৃষ্ঠা।

৩২. "কতদিন রহিলেন মিশ্র কল্যাণবরে।
গৃহস্থ হৈয়া সুখে প্রভু কৃপাবলে॥
সে দেশের রাজস্থানে প্রভু ইচ্ছা যায়া।
একদিন গোসাঞিকে ভকতি করিয়া।
করযোড় করি কহে গোসাঞি সাক্ষাতে।
চলু যাও মহাশয় পূরব দিগেতে॥
রাজআজ্ঞা লৈয়া মিশ্র পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া।
চৌদ্দশত পাছতশাকে প্রাচ্যে উত্তরিলা॥
তাহার কুলেতে জন্ম শ্রীরূপ রামানন্দ।
জয় জয় ইষ্টদেব প্রেম রসকন্দ॥
ইহেন গুরুপদে করিয়া বন্ধন।
রসতত্ত্ব বিলাস গ্রন্থ কৈলা সুগঠন॥
পতিতের অগ্রজ রামানন্দ মতিহীন।
সবস্রোতা পদরেনু মস্তক ভূষণ॥'-রসতত্ত্ব বিলাস।

এই রাম মিশ্র কে? পঞ্চখণ্ডের মিশ্র বংশীয়েরা বলেন যে, রামমিশ্রই পূর্ব্বকথিত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। রামচন্দ্র আধুনিক ব্যক্তি হইলেও যে বংশে জ্ঞানবর ও কল্যাণবরের উদ্ভব হয়। সেই "মহাগোষ্ঠিতে" তাঁহারও উৎপত্তি হইয়াছিল এবং কবি রামানন্দ "পুণ্যশরীর" ইত্যাদি বাক্যে পিতৃমহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

জ্ঞানবরের বংশ সম্বন্ধীয় এসব কথা ব্যতীত কল্যাণবর সম্বন্ধে আর এক সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি "চৌদ্দশত পাছত" (১৪৭৫) শকে পুনঃ পূর্ব্বদেশে স্ত্রীপুত্রসহ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে শ্রীরূপ ও রামানন্দ নামে দুই ব্যক্তির জন্ম হয়; ইঁহার একজন গ্রন্থকর্ত্তা রামানন্দের "ইষ্টদেব" ছিলেন। কিন্তু কল্যাণবরের বংশীয়গণ এক্ষণে কোথায়? থাকিলে কোথায় আছেন?[৩৩]

পরবর্ত্তী কীর্ত্তি কথা

রসতত্ত্ব বিলাসের কথা উপলক্ষে প্রাসঙ্গিকভাবে এসকল কথা বলিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ধনমিশ্র স্বীয় পিতামহের সনন্দমূলে ৪ চারি টাকা বৃত্তি বাহাল করাইয়াছিলেন। ধনমিশ্রের পুত্র গোকুলমিশ্র, বিশ্বনাথ মিশ্রের একযোগে পূর্ব্বোক্ত নবাব বশারত খাঁ বাহাদুর হইতে উক্ত ৪ টাকা বৃত্তি এবং ১০/০ হাল ভূমি ও একবাড়ী নিষ্কর ভোগের জন্য এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। উক্ত ভূমিবাড়ী তাঁহাদের দানপ্রাপ্ত ছিল।[৩৪] শ্রীহট্টের কালেক্টর সাহেবের রুবকারিতে জানা যায় যে এই ভূমিতে জমা ধার্য্যের জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে সরকার বাহাদুর বাদীতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় ও শ্রীহট্টের কালেক্টর মিঃ এ, বি, বিডউয়েল সাহেবের বিচারে তাহা "ডিসমিস" হইয়া নিষ্কর বাহাল থাকে। তদ্ব্যতীত কাপ্তান ফিশার সাহেবের কাছাড় সম্বন্ধীয় রুবকারিতে জানা যায় যে, গোকুলমিশ্র, মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র নারায়ণ হইতে সিদ্ধিপুরে (সিদ্ধেশ্বরে) কতক নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গোকুল মিশ্রের পুত্র আনন্দ মিশ্র কাছাড়রাজ-সরকারে উকীল ছিলেন এবং ঐ ভূমি ভোগ করিতেন। কাছাড়রাজ্য ইংরেজাধিকার ভুক্ত হইলে উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে করধার্য্যের জন্য জরিপ হইলে, তদুপলক্ষে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন কৃষ্ণকান্ত বিদ্যামণি পৈতৃক সনন্দ প্রদর্শন করিলে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ উক্ত ব্রহ্মত্র নিষ্কর বাহাল থাকার আদেশ হয়।

---

৩৩. যদি বলা যায় যে, কল্যাণবর ১৪৭৫ শকে কাছাড়ের পূর্ব্বে মণিপুরেই গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকিবেন; তবে তাহা প্রকৃত কথা হয় না। মণিপুরে ঢাকাদক্ষিণের রামশিরোমণি কর্ত্তৃক চিংথোং খোম্বার রাজত্ব সময় ইহার বহুপরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয়; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ১ম ভাগে তাহার উল্লেখ আছে এবং উত্তরাংশে প্রথম খণ্ডে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কল্যাণবর কাছাড়ের পূর্ব্ব প্রাপ্ত পর্য্যন্ত গিয়া থাকিবেন। চাপঘাটে যে মিশ্র বংশ আছে, কল্যাণবরের সহিত উহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে না কি?

৩৪. নবাব বশারত খাঁ বাহাদুর প্রদত্ত উক্ত সনন্দের মর্ম্মঃ-

সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড কালার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ম্মচারী ও চৌধুরী ও কানুনগো সকল জ্ঞাত হইবেন যে পূর্ব্ব সনন্দানুসারে বার্ষিক মং ৪ টাকা ও ১০/০ হাল জমি ও এক বাড়ী খরিদা xx তাং কাশীনাথ ও হরিনাথ হইতে ও তাং দুর্ল্লভরাম চৌধুরী হইতে ৷৷০ ছয় কেদার জমি গোকুল মিশ্রের ও বিশ্বনাথ মিশ্রের মদতমাস বাবতে আছে। অদ্য পূর্ব্ব নিয়মে তাহা বাহাল করা গেল। উচিত যে তাহাদের দখলাধিকারে থাকে। সন সন সনন্দ তলব ইত্যাদি কষ্ট দেওয়া না হয়। আর জমি আবাদ ক্রমে তাহার উপস্বত্ত্ব ভোগ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে, ইহা তাগিদ জানিবা। তাং রমজান ৩ মোবারক সন ৩।

(মোহরে-মোহাম্মদ শাহ গাজী বাদশাহ ফিদ্দরি বশারত খান বাহাদুর লিখিত) পরবর্ত্তীকে পূর্ব্ববর্ত্তীর সনন্দ দাখিল ক্রমে বাহাল করাইয়া নিতে হইত। এই সনন্দে তাহা হইতে মুক্ত দেওয়া হয়। ইহাতে জানা যায় যে কাশীনাথ ও হরিনাথের প্রাপ্ত ভূমি তাঁহাদের উভয়ের যুক্ত নামে এক তালুকে পরিণত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সনন্দ প্রাপক বিশ্বনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র উমাকান্তের রাজকৃষ্ণ নামে পরম সুন্দর একটি পুত্র হয়, ইঁহার চরিত্র অতি মধুর ও পবিত্র ছিল; তিনি একদা গোবিন্দজি দর্শনে মণিপুরে গমন করেন। মণিপুরাধিপতি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও নির্ম্মল চরিত্র-গৌরবে মোহিত হইয়া তাঁহাকে একখানা শাল ও একশত মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করেন। রাজদত্ত এই মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তিনি কামাখ্যাতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র মিশ্র হইতে এই বংশীয়গণের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পঞ্চখণ্ডের পাল ও সেন প্রভৃতি অন্যান্য বংশ বিবরণও তিনি সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

পঞ্চখণ্ডের অন্যান্য ব্রাহ্মণ বংশ

ঘুঙ্গাদিয়ার কাশ্যপ গোত্র

পঞ্চখণ্ড বহু ব্রাহ্মণের বসতি স্থান, আমরা অল্প কয়েকটি বিবরণই প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত পরিচয় তত্রত্য সনন্দ প্রাপকবর্গের নামাদি দ্বিতীয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। পঞ্চখণ্ডের ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বেশ সম্মানিত; কাশ্যপ গোত্রে রতিরাম চক্রবর্ত্তী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নবাব শমশের খাঁ বাহাদুর হইতে এক সনন্দে (নং ৮৫০) পঞ্চখণ্ড কালায় ১৮[illegible] ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ঐ কাশ্যপ গোত্রে নয়াগ্রামে সানন্দরাম তর্কবাগীশ নামে আর এক বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্বগুণে নবাব মীর মোহাম্মদ হাদী বাহাদুর হইতে ৪ জলুস ৯ সাবান তারিখ যুক্ত সনন্দে (নং ৪৫০) পঞ্চখণ্ড কালা হইতে [illegible]৩ ভূমি ব্রহ্মত্র পাইয়াছিলেন; ১১৯৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র উহা ভোগ করেন। তিনি বহুতর ব্রহ্মত্র ভূমি প্রাপ্ত হন, ঐ সকল ভূমি "তাং সানন্দরাম" নামে খ্যাত হয়। গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় এ যাবৎ যাঁহার ন্যায় কেহই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, এই বিবরণ প্রদাতা পঞ্চখণ্ডের সেই শ্রীযুক্ত রাতমনু ন্যায়সাঙ্খ্যাচুঞ্চু মহাশয় উক্ত তর্কবাগীশের বংশোদ্ভব।

তত্রত্য গৌতম গোত্রীয়গণ

এই ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামের গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশও বিখ্যাত বটে। এই বংশের বীজী পুরুষ রামভদ্র ভট্টাচার্য্য মিথিলা হইতে আগমন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম রামকান্ত ন্যায়ভূষণ, তৎপুত্র হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার পুত্রের নাম রামজীবন তর্কপঞ্চানন। ইঁহার এক চতুষ্পাঠী ছিল। তদীয় জনৈক শিষ্য হইতে তিনি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কতক ভূমি দান প্রাপ্ত হন। রামজীবনের প্রাপ্ত ভূমি "রামটিকর" নামে অভিহিত হয়। রামজীবনের পুত্র কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পুত্রের নাম বলভদ্র চূড়ামণি। ইনি একটি বৃহৎ দীঘী খনন করিয়া যশস্বী হন; ঐ দীঘী "চূড়ামণির দীঘী" নামে অদ্যাপি খ্যাত আছে। চূড়ামণির দুই পুত্র রামরাম ও বলরাম এই, দুই ভ্রাতা হইতে দুইটি শাখায় এবং বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

রাম রামের পুত্রের নাম শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পুত্র নরসিংহ চক্রবর্ত্তী, রতিদেব চক্রবর্ত্তী ও রুদ্ররাম বাচস্পতি। ইনি নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উল্‌মুল্‌ক বাহাদুর হইতে বার্ষিক ৯০ কাহন কৌড়ির বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে উক্ত বৃত্তির পরিবর্ত্তে ১৮টি তালুক হইতে ৯০/ হাল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা অনেক দিন যাবৎ তাঁহাদের অধিকারে ছিল। রতিদেব চক্রবর্ত্তী ঐ ভূমির শাসন সংরক্ষণ করিতেন, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত অনেক কাগজ পত্র এখনও পাওয়া যায়।

পরে (বন্দোবস্ত কালে) যখন নিষ্কর তালুক জরিপ হয়, তখন ঐ ভূমির অধিকাংশেই কর নিরূপিত হয় এবং অল্পাংশ নিষ্কর রূপে গণ্য হয়।

রতিদেবের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম পরশুরাম, তাঁহার তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম পুরুষোত্তম, তাঁহার পুত্র রাম শরণ, ইঁহার পৌত্রাদি বর্ত্তমান আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সনন্দ প্রাপক রমাকান্ত

পঞ্চখণ্ড কালাস্থ্ আর এক সনন্দ প্রাপকের নাম রমাকান্ত তর্কালঙ্কার। ইঁহার পিতা পরগণা লক্ষ্মীপুর হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করেন। রমাকান্ত নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উল্‌মুল্‌ক বাহাদুর হইতে পঞ্চখণ্ড কালা ও বাহাদুর পুরে এক সনন্দে (নং ১৭৩) ৭।১॥৩ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ১২০৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কালীচরণ ভট্টাচার্য্য উহা "তছরূপ" করেন। কালীচরণের পৌত্র নিত্যানন্দ তাঁহার পুত্র শ্রীযুত চন্দ্রমণি ভট্টাচার্য্য এই ক্ষুদ্র বিষয়টি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিবিধ বংশের উল্লেখ

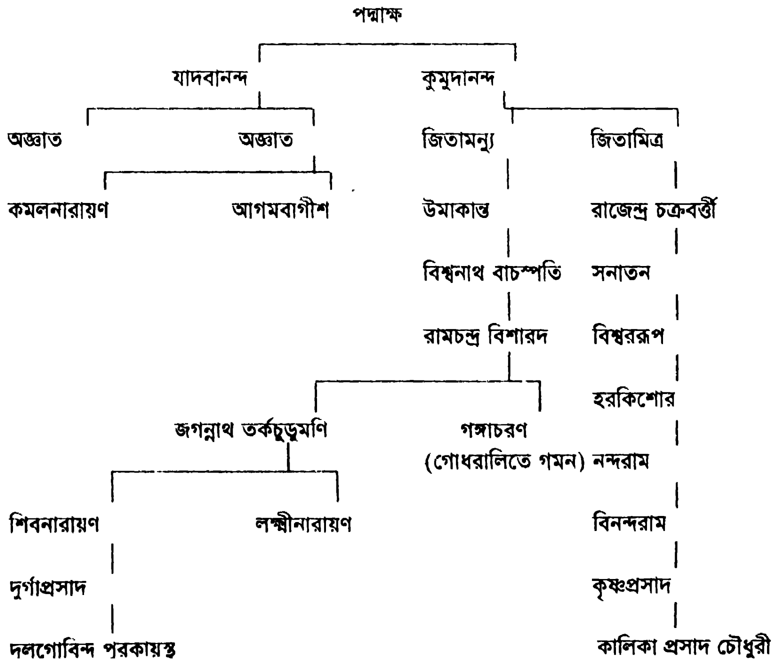
পরগণা-সেনগ্রাম

সেনগ্রাম পুরকায়স্থ

সেনগ্রাম পরগণা চুড়খাই হইতে খারিজ হইয়া পৃথক হয়। সেনগ্রাম তত্রত্য সেন বংশীয়গণের নাম ঘোষণা করিতেছে। সেনগ্রামে বহুকাল হইতে কাশ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। ইঁহাদের উপাধি পুরকায়স্থ; ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়বাসী ছিলেন। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে পদ্মাক্ষ কবিচন্দ্র নামক একব্যক্তি তথা হইতে ব্রহ্মপুত্র তীরে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন এবং তৎপর সেই স্থান হইতে শ্রীহট্টের বেজোড়া পরগণায় আগমন করেন ও এক বাটিকা প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন। সেই স্থানে অব ঃতি কালে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে যাদবানন্দ ও কুমুদানন্দ নামে দুই পুত্র হয়।[১]

এই দুই ভ্রাতা অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। ক্ষমতায় একটা স্থান করায়ত্ত করা চাই, এই বৃদ্ধিতে ইঁহারা বেজোড়া হইতে পূর্ব্বোত্তরে চুড়খাই পরগণাতে উপস্থিত হন ও তত্রত্য ভূম্যধিকারী বদল খাঁকে নিহিত করেন। বহু বিবাদের পর তাঁহারা বদল খাঁর ভূসম্পত্তি হইতে কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি

১. পরবর্ত্তী ৪র্থ খণ্ডে উল্লেখিত বেজোড়ার কাশ্যপ গোত্রীয় বিশারদ বংশে ১০/১১ পুরুষ পূর্ব্বে "পদ্মাক্ষ স্থলে" অপর ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হইবে, সুতরাং সেই বংশের সহিত এ বংশের সম্বন্ধ নাই। সেনগ্রামের ব্রাহ্মণ বংশ তালিকাটি এ স্থানেই দেওয়া গেলঃ-



অধিকার করিতে সমর্থ হন ও সেই স্থানেই বসতি স্থাপন করেন।

কুমুদানন্দের জিতামন্যু ও জিতামিত্র নামে দুই পুত্র হয়। তন্মধ্যে জিতামন্যুর পুত্র উমাকান্ত এবং জিতামিত্রের পুত্র রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অতি পরবর্ত্তী কালে ইঁহাদের বংশে যথাক্রমে পুরকায়স্থ; চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়াছেন।

যাদবানন্দের দুইজন পৌত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একজনের নাম কমল নারায়ণ, অপর আগমবাগীশ বলিয়া খ্যাত। আগমবাগীশ এই বংশের প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন, তিনিই প্রসিদ্ধ হাটকেশ্বর শিব জয়ন্তীয়া হইতে সেনগ্রামে আনিয়া স্থাপন করেন। আগমবাগীশ এই বংশের প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন, তিনিই প্রসিদ্ধ হাটকেশ্বরের বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আগমবাগীশ জয়ন্তীয়ারাজ জয়নারায়ণের (খৃঃ ১৭০৮-১৭৩১) সমসাময়িক ছিলেন।

জিতামন্যুর বংশে জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খানার সর্ব্বোচ পদে ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ গঙ্গাচরণের নামে একটি নিষ্কর ব্রহ্মত্র মঞ্জুর করাইয়া নেওয়াইয়া ছিলেন।[২] তর্কচূড়ামণির পুত্র শিবনারায়ণ শ্রীহট্টে পাটওয়ারি নিযুক্ত হন। ইনি আখালিয়াবাসী নিজ গুরু করুণাময় ভট্টাচার্য্য দ্বারা এক পঞ্চবটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাকাল ভৈরব প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। উক্ত পঞ্চবটীস্থ বকুলবৃক্ষে অদ্যাপি ভৈরবের পূজা হইয়া থাকে। এই বংশীয় বিশ্বেশ্বর ও রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নামীয় দুইটি তালুক আছে। শিব নারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র পুরকায়স্থ হইতে এ বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বংশীয় সুয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, নবাব আবুল হুসেন বাহাদুর এক সনন্দে (নং ৪৫৪) তাঁহাকে সেনগ্রামে তিন কেদার ভূমি ব্রহ্মত্র দেন। ১১৬১ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ ভূমি তৎপুত্র রমাকান্তের "তছরূপে" থাকে।

সেনগ্রামের সেনদের দানপত্র হইতে জানা যায় যে, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ও রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারা দেড়কুবলা ভূমি দেবত্র প্রাপ্ত হন; তাঁহাদের পুত্রাদি নাই, তাঁহাদের মৃত্যুর পর সুরানন্দ উক্তভূমি প্রাপ্ত হন।[৩]

জগন্নাথ স্বয়ং স্বদেশে, নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর হইতে কতক ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন, ইহাব নিদর্শন শ্রীহট্টের কালেক্টরীর কাগজে আছে।

দানপত্র, যথা (অবিকল)ঃ-

"ইয়াদকির্দ্দ শ্রীগোবিন্দ রাম চক্রবর্ত্তি ও শ্রীরঘুনন্দন চক্রর্বর্ত্তি সাদাসয়েষু-

লিখিতং শ্রীপরগণা সেনগ্রামের চৌধুরী ও পুরকাইস্ত স্বগীয় পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে-আমার পরগণা মজকুব ময়াজি ১॥০ দেড় কুবলা জমিন খারিজ জমা জঙ্গলা শ্রীশ্রী স্বগীয় ++ পূজা ও তুমার ভরনপুসনব কারণ মকরর আছে আমরার সেই ময়াজি মকজুর মহাফিক তপছিল আবাদ আবাদানা করিয়া শ্রীশ্রী স্বগীয় সেবা করিয়া পুত্র পৌত্র ক্রমে ভুগ করহ আমরায় প্রকাশ সদর জন্দ জমাবন্দি হৈতে যাহার চিঠা সামিল লেখাইয়া দিব এতদর্থে ব্রহ্মউত্তর ও দেবউত্তর পত্র লেখিয়া দিলাম ইতি সন ১১০৩ সাল মাহে ৫ বৈশাখ।"

দাতার নাম-"সর্ব্বানন্দ সেন, শীবরাম সেন, ধনরাম সেন, যাদবরাম দেব, মহমুদ ছালে আসাদ খাঁ।" এই দানপত্র কালেক্টরী হইতে সংগৃহীত, ইহার নীচে নিম্নলিখিত মন্তব্যলিপি লিখিত আছেঃ-

"প্রাপ্ত কাগজ গোবিন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী সাং সেনগ্রাম। ইহারা সজীব থাকিতে সহদব ভ্রাতা সুরানন্দ ভট্টাচার্যের তছরূপ ছিল, ১১২০ সালে রঘুনন্দন ও ১১৪৭ সালে গোবিন্দরাম চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু-উহারা নিঃসন্তান থাকায় সুরানন্দ ভট্টাচার্য্যের তছরূপ ছিল সন ১১৬১ সালে সুরানন্দর মৃত্যুপব তান পুত্র রামাকান্ত ভট্টাচার্য্যের তছরূপ ছিল সন ১১৯০ সালে রমাকান্তর মৃত্যুপর উহান পুত্র রতিকান্ত শর্ম্মাব তছরূপ আছে।" উক্ত রতিকান্তের পুত্র কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য তৎপুত্র কালীচন্দ্র নিঃসন্তান থাকায় তদীয় পিতৃব্য পুত্র রজনীকান্ত প্রভৃতি বর্ত্তমানে বর্ণিত ভূমির স্বত্ববান হইয়াছেন।

লাউতার ব্রাহ্মণ বংশ

লাউতায় আগমন

লাউতার কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ ও সেনগ্রামের কাশ্যপ এক বংশসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ। লাউতার কাশ্যপেরা তাঁহাদের বংশ প্রবর্ত্তক মথুরানাথ তর্কবাগীশকে সেনগ্রামী যাদবানন্দের জ্যেষ্ঠপৌত্র বলিয়া পরিচয় দেন। লাউতার মথুরানাথ হইতে এ পর্য্যন্ত দশম পুরুষ চলিতেছে, পক্ষান্তরে সেনগ্রামের বংশ তালিকায় যে যাদবানন্দের নাম দৃষ্ট হয়, তাঁহার ভ্রাতা কুমুদানন্দ ৯ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি মাত্র![৪] যাহা হউক, মথুরানাথ একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় মথুরানাথের কৃত "আখ্যাতের টীকা" অমুদ্রিতাবস্থায় আছে বলিয়া শুনা যায়। মথুরানাথের পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ বিদ্যাভূষণ, ইনি সেনগ্রামের জনৈক সেন জমিদারের স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত জমিদার আশু ফললাভে তাঁহাকে তত্রত্য "রাজপণ্ডিতি" প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার এক মাত্র পুত্রের নাম আনন্দ মোহন শিরোমণি, তাঁহার পুত্র হরিহর তর্কবাগীশ সেনগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাউতাগ্রামে গমন করেন। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণচরণের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জয়কৃষ্ণ বাচস্পতি। তদীয় দ্বিতীয় পুত্র রামজীবন তর্কালঙ্কার একদা নবদ্বীপ বহু পণ্ডিতকে বিচারে পরাভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু বিজয়গৌরব অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই, সপ্তাহ মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী বর্গের সনন্দ প্রাপ্তি

ইঁহার অনুজ ভ্রাতা রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি নবাব হরকিষুন দাস মনসুর উল্‌মুল্‌ক বাহাদুর হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চখণ্ড কালাতে এক সনন্দে (নং ১০৯৯)॥ ১/৪ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্র রতিকান্ত আগমবাগীশ ও শ্রীকান্ত। এই আগমবাগীশ জয়ন্তীয়াপতি দ্বিতীয় রামসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীকান্তের পুত্র শিবচরণ বিদ্যালঙ্কার। ইঁহার চারিপুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, ইঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমান আছেন। শিবচরণের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রশেখর রংপুরের বর্দ্ধনকুটীর রাজা শ্যামকিশোর রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণচরণ পঞ্চননের চতুর্থ পুত্র কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, ইঁহার অনুজের রাম রাঘবরাম সার্ব্বভৌম। উভয়েই সুবিজ্ঞ ছিলেন এবং স্বগুণে আদৃত হইয়া ছিলেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য নবাব হরকিষুণ দাস মনসুরউলমুলক বাহাদুর হইতে প্রাপ্ত সনন্দে (নং ১১০) ১৭২১ খৃষ্টাব্দে লাউতায়॥০ অর্দ্ধকেদার ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন এবং উক্ত নবাব হইতে অন্য এক সনন্দে (নং ১০৭০) পরবর্ষে পং বাহাদুরপুর হইতে আরও॥২ /৫ ভূমি ব্রহ্মত্র পাইয়াছিলেন। তিনি আরও একখানি সনন্দে (নং ১১০২) ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নবাব নজীব আলী খাঁ বাহাদুর হইতে পং বাহাদুরপুর মৌং উলুউরিতে ৫॥০ ।১ ভূমি ব্রহ্মত্র লাভ করেন। ১১৯৮ পং সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সার্ব্বভৌমের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র কালীচরণ বিদ্যানিবাস উহা "তছরূপ" করিয়াছিলেন বলিয়া সনন্দের মন্তব্যে লিখিত আছে। বিদ্যানিবাস জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন; জয়ন্তীয়াপতি দ্বিতীয় রামসিংহের সভায় তিনি নানা বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহার পুত্রের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ, তৎপুত্র রাজেন্দ্র, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্য হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপঞ্চাননের পঞ্চমপুত্র রাঘব সার্ব্বভৌম সন্তানাদি শূন্য ছিলেন, নবাব নজীব আলী খাঁ বাহাদুর প্রদত্ত সনন্দে (নং ১১০৪) ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পং বাহাদুরপুরে তিনি [illegible] পরিমিত

৪. একই বংশের বিভিন্ন শাখায় পুরুষ সংখ্যার এইরূপ অনৈক্য, পঞ্চখণ্ডের পালবংশ তালিকাতেও দৃষ্ট হইবে।

ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন; ঐ ভূমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রতিকান্ত আগমবাগীশ "তছরূপ" করিয়াছিলেন। রতিকান্ত অতি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, শ্রীহট্টের রাজা গিরিশ চন্দ্রের মাতামহ "বাবু" মুরারি চন্দ্র রায়কে তিনি দৈববলে কদম্ববৃক্ষে এক অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এ বংশীয়গণ বিদ্যাগৌরবে এক সময় এ অঞ্চলে যে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন, তাঁহাদের এসব কীর্ত্তি কথা তাহা প্রমাণিত করিতেছে।

পরাশর গোত্রীয় কথা

লাউতা গ্রামের পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ উপেন্দ্র পণ্ডিত মিথিলাগত বলিয়া কথিত। নবাগত বিদেশীয় হইলেও তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া দেশবাসী সকলে তাঁহাকে রাজপণ্ডিতি বিদায় পাওয়ার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়গণ সে সম্মান ভোগ করিয়াছেন। রাজপণ্ডিতি পাইলেও ইঁহাদের অবস্থা অতি অসচ্ছল ছিল, একটি রমণীর কার্য্যকারিতায় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয়।

রমণীর কার্য্যকারিতা

একদা এক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী (নায়েব ফৌজদার) শিকারোপলক্ষে তদঞ্চলে আসিয়াছিলেন, তিনি রাত্রে পথভ্রষ্ট ও অনুষঙ্গিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্য পার্শ্ববর্ত্তী এক বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বাড়ীতে স্বামী হীনা এক ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করেন। গৃহে তণ্ডুল ব্যতীত অন্য সামগ্রী ছিল না, তিনি সন্নিকটবর্ত্তী চারা ভূমি হইতে "হালি" (ধানের কোমল কচি চারা) আনিয়া তাহার দ্বারা শাক প্রস্তুত করিয়া সেই শাকান্ন খাইতে দিলেন। ক্লান্ত কর্ম্মচারী ইহাতেই তৃপ্ত হইলেন; বিধবার ব্যবহারে তিনি নিতান্ত তুষ্ট হইয়া ছিলেন এবং তাঁহার অবস্থা দৃষ্টে তদীয় দয়া জন্মিয়াছিল; তিনি শ্রীহট্টের গিয়া বিধবার পুত্রের নামে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া তাঁহাদের আহারের সংস্থান করিয়া দিলেন; বিধবার সেই পুত্রের নাম দুর্ল্লভ রাম।[৫]

আদিপুরুষ উপেন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ ছিল, ইঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম গঙ্গাহরি; গঙ্গাহরি দুর্ল্লভরামের ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিলেন।[৬] গঙ্গাহরির পুত্র রামকৃষ্ণের দুইপুত্র ছিলেন, ইঁহাদের সময়ে দশসনা বন্দোবস্ত হয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেবের নাম তালুক আছে; কনিষ্ঠ কৃষ্ণদেব একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। রামদেবের পুত্র গণেশ্বর বিদ্যাবাগীশ দেশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

জিগীষায় আত্মোন্নতি

গণেশ্বর বিদ্যাবাগীশকে পঞ্চখণ্ডের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ এক সভায় বিচারে পরাভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচার ন্যায়তঃ হয় নাই বলিয়া তদীয় পুত্র গিরিধরের মনে জিগীষার উদয় হয়। গিরিধর দুঃখিত চিত্তে নবদ্বীপে গমন করেন এবং তদনন্তর কাশীতে গিয়া বহুকাল অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হন ও দেশে আসিয়া পঞ্চখণ্ডের পণ্ডিত বর্গকে বিচারে আহ্বান পূর্ব্বক পরাস্ত করিয়া পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

৫. ইনি আদিপুরুষ দ্বিতীয়পুত্র যুধিষ্ঠিরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছিলেন। দুর্ল্লভ রামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বীয় বংশবৃত্তান্ত প্রেরণে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

৬. সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা, যথাঃ-

রাজানুগ্রহ লাভ

রামকান্তের পুত্র হরিশ্চন্দ্র অধ্যয়ন ব্যাপদেশে বাল্যকালে সুপাতলাবাসী পণ্ডিত বনমালী সিদ্ধান্তসহ আগরতলায় গমন করেন। সিদ্ধান্ত মহাশয় মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সভায় হরিশ্চন্দ্রও যাইতেন। একদা তাঁহার প্রদত্ত একটি ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট হওয়াতে মহারাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে কার্পাস মহালের আয়ের টাকা প্রতি বৃত্তি দেওয়ার আদেশ করেন; ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ লভ্য হইত। মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিলেন ও তদীয় ব্যবহার তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "বাহাদুর" উপাধি দানে সম্মানিত করিয়া স্বীয় সভাপণ্ডিত পদে বরণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি উক্তপদে আগরতলায় ছিলেন।

ভট্টশ্রীর ভট্টাচার্য্য বংশ

ভট্টশ্রী শাহবাজপুর পরগণার অন্তর্গত। পরবর্ত্তী ৫ম অধ্যায়ে পরগণা শাহবাজপুরের নামতত্ত্ব কথিত হইবে। এই পরগণায় রথীতর গোত্রীয় ভট্টাচার্য্যে বংশের এক শাখার বাস। রথীতর গোত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাতামহের উদ্ভব হয়, তিনি তরফ হইতে নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।[৭] সেই সময় ঐ বংশীয় এক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী, (শ্রীহট্টের) সপ্তগ্রামে গমন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম কৃষ্ণানন্দ ভাগবতাচার্য্য।

কৃষ্ণানন্দ ভাগবতাচার্য্যের তিন পুত্র হয়, এই তিনব্যক্তি পরম সাধক ছিলেন, আজ পর্য্যন্ত একটা প্রবাদ আছে, যথা—

"কবি, বাণী, রামেশ্বর।
তিনই সাধকের ঘর॥"

- উপেন্দ্র পণ্ডিত
  - পুণ্ডরী কাক্ষা
    - শ্রীকৃষ্ণ
      - রমাপতি
        - গোপীনাথ
          - গঙ্গাহরি
            - বামকৃষ্ণ
              - রামদেব
              - কৃষ্ণদেব
                - রামকান্ত
                  - হরিশ্বরচন্দ্র বাহাদুর
                    - প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য
                - জগন্নাথ
                  - বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্ত
                    - বাগীশ
                - গণেশ্বর বিদ্যাবাগীশ
                  - গিরিধর বিদ্যালঙ্কাব
                    - ভৈরবচন্দ্র
  - যুধিষ্ঠিব
    - রামচন্দ্র
      - কৃষ্ণচন্দ্র
        - মধুসূদন
          - দুর্ল্লভরাম
            - নন্দরাম
              - কালীচরণ
                - চন্দ্রনাথ
                  - যোশেচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এই তিন জনের মধ্যে কবিবল্লভ ও বাণীবল্লভের সন্তানগণ মাধবপাশা, মান্দারকান্দি প্রভৃতি স্থানবাসী। কবিবল্লভ নবিগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী এক গ্রামবাসী হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কবিবল্লভ কবি ছিলেন; ইঁহার নামে পদ্ম পুরাণের ভণিতা পাওয়া যায়।[৮] সর্ব্বকনিষ্ঠ রামেশ্বরের একমাত্র পুত্র মাধবানন্দ বাচস্পতি পঞ্চখণ্ডের কাউয়াকোণা নামক স্থানবাসী হন; কাউয়াকোণাই পরে শাহবাজপুর পরগণায় পরিণত হয়।

পণ্ডিত মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্যের বসতি-ভূমি অল্পকাল মধ্যেই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, এই জন্য উহা ভট্টশ্রী নামে খ্যাত হয়। ভট্টশ্রী সাধারণতঃ ভাটাউশী নামে কথিত হইয়া থাকে।[৯]

মাধবানন্দের পুত্র গৌরীদাস শর্ম্মা কতক ব্রহ্মত্র ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, উহা তদীয় পুত্র রামকান্ত ভট্টাচার্য্যের "তছরূপে" ছিল। সনন্দের মন্তব্যে গৌরীদাসের পৌত্রের নাম স্থলে "বৈছমে রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য" বলিয়া লিখিত আছে। রমাকান্ত শাহবাজপুর কতক ব্রহ্মত্র লাভ করিয়াছিলেন, উহা হইতে তিনি বার্ষিক ১৩০৬ কৌড়ি প্রাপ্ত হইতেন।

রমাকান্তের তিন পুত্র, ইহাদের নাম রামজীবন শর্ম্মা, রামেশ্বর ও মথুরেশ্বর। ইঁহাদের সন্তানবর্গ হইতেই এই বংশের বিস্তৃতি ঘটে। রামজীবনের পুত্রের নাম গঙ্গারাম; শাহবাজপুর ও বাহাদুরপুরের চৌধুরীবর্গ হইতে তিনি পরগণার "রাজপণ্ডিতি" প্রাপ্তির অধিকার লাভ করেন। এই দলিল হইতে জানা যায় যে, তদীয় পিতামহ রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য পরগণার রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১০] ১১৪০ সালের একখানা সনন্দে ইঁহার নামে ১৭৷৷০ কাহন

কৌড়ি আয়ের উপযুক্ত ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদত্ত হইয়াছিল দৃষ্ট হয়। গঙ্গারামের পুত্রের নাম সোণারাম শর্ম্মা, তৎপুত্র শুকদেব সিদ্ধান্ত, ইঁহার পুত্রের নাম হীরাকান্ত ভট্ট, তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ, তৎপুত্র পরম প্রবীণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র কুমার ন্যায়রত্ন হইতে আমরা এতদ্বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

পরগণা-চাপঘাট, দেশমুখ্য বংশ

মহারাষ্ট্র পরিত্যাগ

চাপঘাটের দেশমুখ্য গণের আদি নিবাস মহারাষ্ট্র দেশে ছিল। গার্গ্য গোত্রীয় এই দেশমুখ্য গণের পূর্ব্বপুরুষ সদাশিব তত্রত্য মাউলী গ্রামে বাস করিতেন। মহারাষ্ট্র-পতির মন্ত্রীসমাজে তিনিও অন্যতম ছিলেন। মহারাজ শিবজীর পুত্র সাহু তাঁহার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া

৭. ইঁহার কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী ৪র্থ খণ্ডের ১ম অধ্যায়ে উক্ত হইবে।

৮. পরবর্ত্তী ৪র্থ ভাগে নারায়ণ দেবের কথা প্রসঙ্গে কবিবল্লভের বিষয়ও কথিত হইবে।

৯. ভট্টশ্রী নামটি প্রাচীন কাগজপত্রে থাকিলেও সাধারণতঃ উহা প্রচলিত নহে। ১১৯০ সাল ১৫ই বৈশাখ তারিখ যুক্ত একখানা দলিলে দৃষ্ট হয় যে, তত্রত্য ব্রাহ্মণবর্গকে বিবাহাদিতে "নবত (নহবত বাদ্য?) করিবার জন্য" পরগণার চৌধুরী ও পুরকায়স্থদের অনেক ব্যক্তি অনুমতি দিয়াছিলেন, এই অনুমতি পত্রে ১৩ জন ব্যক্তির সাক্ষর আছে; এই দলিলে ব্রাহ্মণবর্গের ঠিকানা স্থলে "সাকীন মৌজে ভট্টশ্রী" স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

১০. রাজপণ্ডিতির অধিকার পত্র (অবিকল নকল)–

"শ্রীগঙ্গারাম চক্রবর্ত্তি সদাশয়েযু লিখিতং শ্রীসাহবাজপুরের চৌধুরিয়ান ও কানোনগোই ও পাটোয়ারিয়ান বর্গস্য পত্র মিদং কার্জ্যঞ্চ আগে আমরার পরগণা মজকুরেত পূর্ব্বে তুমার পিতামহের রাজপণ্ডিতি আছিল এখানেই আমরা রজাবন্দ হৈয়া তুমারে রাজপণ্ডিতি করহ এতদর্থে পত্র লেখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৫০ সাল তাং ১ কার্ত্তিক।"

(এই দলিলের দক্ষিণ পার্শ্বে দস্তখত-"শ্রীমাহামদ ছাদনস, শ্রীফতে মাং মাহাম্মদস্য ও শ্রীরাঘব রাম দেবস্য, শ্রীগুলমাহাম্মদস্য" এবং একটি পারস্য দস্তখত আছে। উক্ত নাম চারিটি যথাক্রমে বাহাদুরপুরের জমিদার, শাহবাজপুরের জমিদার, লাউতার পুরকায়স্থ বাড়ু হুদার চৌধুরীর দস্তখত।)

প্রদত্ত জায়গীর ভূমি কাড়িয়া লন। সদাশিবি মহারাষ্ট্র দেশে থাকা সঙ্গত বোধ করিলেন না, স্ত্রী এবং লক্ষ্মীকান্ত ও রত্নেশ্বর নামক পুত্রদ্বয় সহ তিনি মাউলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গঙ্গাতীরে নৈহাটীর অন্তর্গত কাঠালপাড়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।[১১]

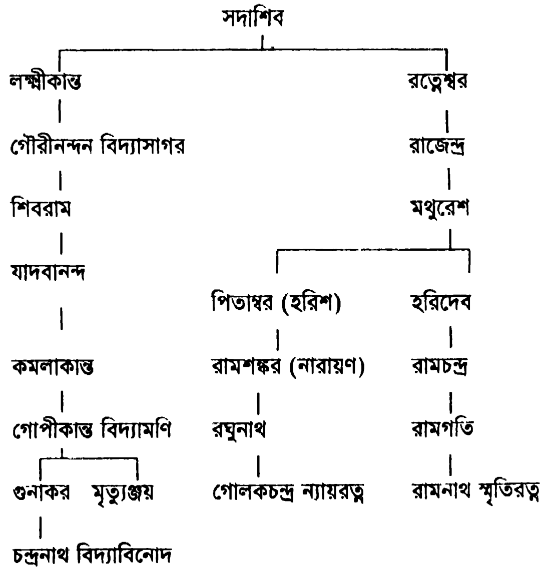
সদাশিবের সঙ্গে তাঁহার গৃহদেবতা অনন্তদেব নামক শালগ্রাম ছিলেন। তিনি নিজ সঙ্গে স্বর্ণ রৌপ্যাদি সামান্য যে কিছু অস্থাবর বিত্ত আনয়ন করিয়া ছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, লক্ষ্মীকান্ত ও রত্নেশ্বর পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বদেশ ও স্বজন বর্জ্জন জন্য সদাশিবের মনে কিছুমাত্র সুখ ছিলনা, তিনি সর্ব্বদাই অনন্তদেবের অর্চ্চনায় বৃত রহিতেন। ঐরূপে তিন বৎসর গত হইলে তিনি গঙ্গাতীরে তনুত্যাগ করিলেন।[১২]

ব্যয়াবশিষ্ট অস্থাবর বিত্ত যাহা ছিল, পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনে তাহা ব্যয়িত হইয়া গেল, পিতৃহীন ও স্বজন-শূন্য ভ্রাতৃদ্বয় জীবিকার জন্য চিন্তিত হইলেন এবং নৈহাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রৈপুর রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় পরম ধর্ম্মমাণিক্য (১৭৩২ খৃঃ) ত্রিপুরার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন; তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের অবস্থা অবগত হইয়া ও তাঁহাদের গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া, এক একটি উচ্চপদের তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহারা ত্রিপুরাতেও স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারেন নাই; পরবর্ত্তী নৃপতি মুকুন্দ মাণিক্যের সময়ে রাজ্যে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়। এবং রাজার সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতানৈক্য ঘটে; তদবস্থায় তাঁহারা উদয়পুর পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ রোধ করিয়া, তথা হইতে শ্রীহট্ট জিলায় উপস্থিত হন এবং শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশে চাপঘাট নামক স্থানে কতক জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি "আমল" অর্থাৎ অধিকার করেন; এইস্থানে তাঁহাদের "সিদ্ধি" বা অভীষ্টপূর্ণ হওয়ায়, উহা "আমলসিধ" নামে খ্যাত হয়। কালক্রমে "আমলসিধ" অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ভদ্রলোকের বসতি স্থানে পরিণত হয়।

---

১১. ইহার পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর পূর্ব্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্য (কর্ণটরাজ্য) হইতে এই নৈহাটিতেই আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে।

১২. দেশমুখ্যদের বংশতালিকার একাংশ এইঃ–



লক্ষ্মীকান্তের পুত্রের নাম গৌরীনন্দন এবং রত্নেশ্বরের পুত্রের নাম রাজেন্দ্র; ইঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন গৌরীনন্দন বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। ইঁহার পুত্র শিবরাম রাজেন্দ্রের পুত্র মথুরেশ নিজনামে দশসনা তালুক বন্দোবস্ত করেন। শিবরামের পৌত্র কমলাকান্ত একজন বীরপুরুষ ছিলেন, লোকে ইঁহার নাম শুনিলেই ভীত হইত; ইঁহার পৌত্র গুণাকর ও মৃত্যুঞ্জয় কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা স্বগীয় অনন্তদেবের মন্দির নির্ম্মাণ ও নৌকাপূজাদি সদনুষ্ঠান করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় শেষকালে কাশীতে গমন করিয়া "কাশীপ্রাপ্ত" হন। গুণাকরের পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শিষ্যবিনোদ হইতে আমরা এই বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই দেশমুখ্যবংশে তত্রত্য শম্ভুনাথের জন্ম; ৭০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নৌকাযোগে কাশী গমন করেন, যে যে নদীপথে তাঁহার নৌকা অগ্রসর হইয়াছিল ও তাঁহার তীরে কি কি দ্রষ্টব্য ছিল, তৎসমস্তের, দৈনিক উল্লেখসহ, তিনি একখানা নির্যাতন মানচিত্র প্রস্তুত করেন, উহা অদ্যাপি (শ্রীযুক্ত রামতারক দেশমুখ্য মহাশয়ের নিকট) আছে।

দেশমুখ্য বংশ ব্যতীত আমলসিধের সাবর্ণি গোত্রীয় আচার্য্য বংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ এবং শ্রীগৌরীস্থ চক্রবর্ত্তী বংশীয়বর্গ ও বিয়াবাইলের পুরকায়স্থ বংশ বিশেষ সম্মানিত। আচার্য্য বংশে বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তর্কতীর্থ একজন প্রাচীন পণ্ডিত।

ইচ্ছামতীর ভট্টাচার্য্য বংশ

চাপঘাট পরগণার উত্তরাংশে ইচ্ছামতী পরগণা অবস্থিত। এই পরগণার ভাটপাড়া গ্রামে ভট্টাচার্য্য বংশের বাস। এ বংশের পূর্ব্ব-নিবাস মালদহের পাণ্ডুয়াতে ছিল। পাণ্ডুয়া হইতে কমলেশ্বর ভট্টাচার্য্য তীর্থ পর্য্যটনে আসিয়া জয়ন্তীয়ার বাউরভাগে কালীদর্শনে গমন করেন। সেইস্থানে ইচ্ছামতী পরগণার অধিকারী, দত্ত বংশীয় দুর্ল্লভরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; দুর্ল্লভরাম তাঁহার সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন ও তাঁহাকে ২২ হাল ভূমি দান করিয়া, সেইস্থানে স্থাপন করেন, ঐ স্থানই ভটপাড়া বা ভাটপাড়া বলিয়া খ্যাত হয়।

কমলেশ্বর এস্থানে বাটিকা প্রস্তুত করিলে, তদীয় খুল্লতাত মধুসূদন, এবং রমানাথ, রামনাথ ও সর্ব্বানন্দ নামে মধুসূদনের পুত্র ত্রয় এদেশে আগমন করেন। কমলেশ্বর একজন যোগী পুরুষ ছিলেন, রত্নেশ্বর ও রামেশ্বর নামে তাঁহার দুইপুত্র ছিলেন। ইঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন; ইঁহাদের বংশধরবর্গ অদ্যাপি সসম্মানে তথায় অবস্থিতি করিতেছে।

ডৌয়াদির ব্রাহ্মণ বংশ

ভরদ্বাজ গোত্র

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে[১৩] "ডেওয়াদিগ" (ডৌয়াদি) নিবাসী নন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নামোল্লেখ ও তাঁহার প্রাপ্ত জায়গীর ভোগের সনন্দের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। নন্দরামের পূর্ব্বপুরুষ ভরদ্বাজ গোত্রীয় শিকদার বংশোদ্ভব রামদেব ভট্টাচার্য্য বালিশিরা পরগণা হইতে এই অঞ্চলের সিঙ্গারি নামক স্থানে আগমন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম রামরূপ, তৎপুত্র রামরতন সেইস্থানেই বাস করেন। রামরতনের পুত্র রূপ চক্রবর্ত্তী তথা হইতে কায়স্থগ্রামে (কায়েত কোণাতে) আসিয়া আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার দুই পুত্র,—কৃষ্ণদেব ও গুরুদেবের নামে দশসনা তালুক আছে। কৃষ্ণদেবের পুত্র অনন্তরাম, তৎপুত্র নন্দরাম চক্রবর্ত্তীই পূর্ব্বোক্ত জায়গীর ভোগের এক সনন্দ

১৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় "নবাবি আমলে দেশের অবস্থা" প্রকরণ দেখ।

এবং রাজপণ্ডিতির অন্য এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজপাণ্ডিতি সনন্দের বলে তিনি "ডেওয়াদিগ" (ডৌয়াদি) পরগণার সমস্ত এবং প্রতাপগড় ও জফরগড় পরগণার অর্দ্ধ "বিদায়" প্রাপ্ত হইতেন। নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর অন্য একখানা সনন্দে (নং ২১১) তাঁহাকে "কায়েত কোণা" হইতে/১০॥ এবং "বাটইহা" হইতে১৸১২৲ ভূমি ব্রহ্মত্র করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত শুকদেবের পুত্রের নাম রামভদ্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম জয়গোবিন্দ, তৎপুত্র হরগোবিন্দ, তাঁহার পুত্র হরচন্দ্র, ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী হইতে আমরা নন্দরামের সনন্দাদি প্রাপ্ত হইয়াছি।

বাৎস্য গোত্র

ডেওয়াদির নয়াগ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় ভট্টাচার্য্য বংশের বাস। ইঁহারা প্রসিদ্ধ "বিদ্যাবিনোদ" বংশ সম্ভুত। উক্ত বংশের লক্ষ্মীপুর শাখা হইতে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ মধুসূদনের পুত্র গোবিন্দরাম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তিনি নিজগুণে শ্রীহট্টের নবাব হইতে নিষ্কর ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি তত্রত্য রাধাপুরকায়স্থ গয়রহ হইতে ১১৫৯ সালে দুইকেদার ভূমি দানপ্রাপ্ত হন।[১৪]

এই সময়ে রামরুদ্র নামে এ বংশের এক মহাত্মা মৈনা গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী হাটখলা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। রামরুদ্রের পুত্র রামশঙ্কর, তৎপুত্র কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন; তৎসম্বন্ধেও অমাবস্যার চন্দ্রোদয়ের উপাখ্যানটি[১৫] কথিত হয়। এই বংশ শাখার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত নিষ্প্রভ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কালীশঙ্করের প্রপৌত্র জীবিত। তাঁহাদের খামারভূমি "ভট্টের চক" নামে খ্যাত।

মধুসূদনের বংশীয়গণ রফিনগর পরগণা এবং প্রতাপগড় ও জফরগড়ের রাজপণ্ডিতি বিদায়ের অর্দ্ধাংশের অধিকারী। গোবিন্দরামের এক পুত্রের নাম রাম নারায়ণ, তাঁহার পুত্রের নাম শিব নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, তিনি নিজগুণে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন; তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ যোগানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। তিনি কাষ্ঠ পাদুকা সহ নদীর উপর বিচরণ করিতে পারিতেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার ইচ্ছায় মৃত্তিকামুষ্টি সুমিষ্ট শর্করাতে পরিণত হইত; ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সিদ্ধান্তরত্ন জীবিত আছেন।

মৌদ্‌গুল্য গোত্র

পঞ্চখণ্ডের ঘুঙ্গাদিয়া হইতে ডৌয়াদিতে আগত মৌদ্‌গুল্য গোত্রীয় এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ আছে। এই বংশীয় শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ তর্করত্ন মহাময় লিখিয়াছেন যে, মৌদ্‌গুল্য গোত্রীয় মাণিক পণ্ডিত এবং বাৎস্য গোত্রীয় মধুসূদন এই অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করেন। এই দুই

---

১৪. কালেক্টরী হইতে সংগৃহীত দানপত্রের নকল (অবিকল) এইঃ–

"ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীগোবিন্দ রাম পণ্ডিত সদাশয়েসু লিখিতং শ্রীপরগণা ডৌয়াদিগর চৌধুরী ও পুরকাইস্থবর্গ স্বগীয় পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমার পরগণে মজকুর মহাল মর্কদুদ (?) মৌজা ব্রাহ্মণসাসন উরফে লালনগর রামলঙ্কর করব বাটীর পূব (পূর্ব্ব) গঙ্গারাম ধররজে জত (জোত?) তাহার নলমান মবলগ/২ দুই কোদর জমি তোমারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম +++তছরূপ করিয়া ভুগ (ভোগ) করহ এই জমি কেদারর উপর আমরার সত্ত (স্বত্ত্ব) নাই এতদর্থে পত্র দিলাম ইতি ১১৫৯ সন তাং ১ সাবান।

১৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়ে অনুরূপ উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

আদি বংশের বাস নিবন্ধন ও পরগণা দ্বৌয়াদি (অপভ্রংশে ডৌয়াদি) নাম প্রাপ্ত হয়।[১৬] এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত কিনা বিবেচ্য বটে। এ জিলায় এক নামে প্রায়শঃ একাধিক স্থান পাওয়া যায়, জয়ন্তীয়াতেও এক ডেওয়াদিগ আছে। প্রাচীন কাগজ পত্রে আলোচ্য পরগণার নামও তদ্রূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং ডৌয়াদি বলিয়াই লিখিত হইয়া থাকে। এ বংশীয় পূর্ব্বোক্ত মাণিক্য পণ্ডিত হইতে তর্করত্ন পর্য্যন্ত ১৬শ পুরুষ ১০ম পুরুষ রামনাথ ও তদীয় ভ্রাতুসম্পর্কিত দেবীচরণ, এবং ইঁহার পুত্র রামগোবিন্দের নামে যথাক্রমে ৯০ নং ১৮৮ নং ও ২০৩ নং তালুকের নাম হয়।

ডৌয়াদিতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর অন্তর্গত চক্রবর্ত্তী উপাধি-বিশিষ্ট আর একবংশীয় ব্রাহ্মণের বাস আছে।

পাথারিয়ার "দৈ-র গোষ্ঠি"

পরগণা পাথারিয়া বাসী বাৎস গোত্রীয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের প্রবর্ত্তকের নাম দৈবকীনন্দন ভট্টাচার্য্য। দৈবকীনন্দন নামের আদ্যক্ষর "দৈ" হইতে তদ্বংশীয়গণ "দৈ-র গোষ্ঠি" নামে খ্যাত। এই বংশে বহুতর গুণবান ও বিদ্বান ব্যক্তি উদ্ভব হইয়াছিল; তাঁহাদের গুণকীর্ত্তি এক্ষণে কালগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া পড়িলেও নবাবি প্রাচীন সনন্দ হইতে তাঁহাদের অনেকেরই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ কীর্ত্তিমান পুরুষের নাম কখনই বিলুপ্ত হয়না, কেননা কোনরূপে এক সময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ বংশীয় সনন্দ প্রাপক গণের নাম এইঃ—

(১)[১৭] অনন্তরাম জনাবদার, ইহার পুত্রেরনাম—সদাশিব ভট্টাচার্য্য।
(২) রাম রাম সার্ব্বভৌম, " রামকান্ত ভট্টাচার্য্য।
(৩) রুদ্ররাম ভট্টাচার্য্য, " রূপরাম ভট্টাচার্য্য।
(৪) কৃষ্ণচরণ তর্কপঞ্চানন, " শিবচরণ সিদ্ধান্ত।

এই বংশে আরও বহুতর প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়। বর্ত্তমানেও মৃত্যুঞ্জয় সিদ্ধান্তরত্ন ও কৃষ্ণমাহন বিদ্যারত্ন এ বংশের কৃতী সন্তান ছিলেন; অল্পকাল হইল ইঁহারা যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। এই বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

---

১৬. "দ্বৌবিপ্রৌ প্রাক সমায়াতৌ মাণিক্য মধুসুদনৌ।
তস্মাৎ দ্বৌ আদীতি খ্যাতৌ মৌদ্‌গুল্য বাৎস্য গোত্রিনৌ॥"

১৭. ইঁহাদের প্রাপ্ত সনন্দের সাবমর্ম্মঃ-
১. নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উল্‌মুল্‌ক বাহাদুরের মোহরাঙ্কিত সনন্দে (নং ৪৪৪) পাথাবিয়াতে জনাবদার = ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ১১৯৬ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর সদাশিব উহা "তছরূপ" কবেন।
২. রাম রাম ভট্টাচার্য্য উক্ত নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উল্‌মুলক্ বাহাদুব হইতে ২ জলুস সনে পাথারিয়া ও রাঙ্গাউটিতে ২১।১ ৪৷৻ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন।
দ্বিতীয় এক সনন্দে (নং ৪৩৭) ইনি নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর হইতে ১১৭৪ পবগণাতীত সনে পাথারিয়াতে আরও ১০৷৷১২০।০ ভূমি প্রাপ্ত হন; উহা তাঁহার পুত্র রামকান্তের "তছরূপ" থাকে।
৩. রুদ্ররাম ভট্টাচার্য্য নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উলমুল্‌ক বাহাদুরের মোহরাঙ্কিত সনন্দে (নং ৪৪২) পাথারিয়া হইতে ৵৹ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
৪. কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন নবাব নজীব আলী খাঁ বাহাদুর প্রদত্ত সনন্দে (নং ১০৯২) মৌজ' কাঠলতলি ও জুম হইতে ১১৷৷০<৬৪০ ভূমি ব্রহ্মত্র লাভ করেন।
দ্বিতীয় এক সনন্দে (নং ১০৯৩) তিনি নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর হইতে ১১৻১৷৷২১ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। এই উভয় সনন্দোল্লিখিত ভূমিই তাঁহার নিজের তছরূপে ছিল।
পাথারিয়াতে আরও অনেক সনন্দ প্রাপকের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বংশ সম্ভূত হইতেও পারেন। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ঐ নামাবলী উল্লেখিত হইবে।

ছোটলিখার ব্রাহ্মণ বংশ

ভরদ্বাজ গোত্র

ছোটলিখার ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশের আদিপুরুষ ঢাকাদক্ষিণ হইতে এই স্থানে আগমন করেন। এই স্থানের নাম পূর্ব্বে "লিখা" ছিল,[১৮] পরে বড়লিখা ও ছোটলিখা এই দুই অংশে বিভক্ত হয়। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভবদেব ভট্টাচার্য্য কৃতী পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, তজ্জন্য নিজ ভরণ পোষণের জন্য শ্রীহট্টের নবাব সরকারে আবেদন করিলে, তদানীন্তন নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উল্‌মুল্‌ক বাহাদুর এক সনন্দে (নং ৬৩৭) তাঁহাকে পাথারিয়া হইতে ৸১৪৸ ভূমি ব্রহ্মত্র দেন। নবাব নজীব আলী খাঁ বাহাদুর ও নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুর হইতে পরবর্ত্তী কালে দুই বিভিন্ন সনন্দে (নং যথাক্রমে ৫৩৯ এবং ৬৩৮) পঞ্চখণ্ড হইতে ১৸৹ এবং ছোটলিখা ও ইছামতী হইতে ৭।৶৬ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ১১৯৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা গিরিধর ভট্টাচার্য্য তাহা "তছরূপ" করেন। ভবদেবের পুত্রের নাম জয়রাম, তৎপুত্র বৈদ্যনাথ, তাঁহার পুত্র কুলচন্দ্র, তৎপুত্র কালীচন্দ্র, ইঁহার পুত্র শ্রীযুত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বংশের একশাখা পাথারিয়া বাসী।

ভট্টাচার্য্য গৌড় বংশ

ছোটলিখার নিশাপতি গৌড় বংশীয় ব্রাহ্মণেরাও সমাজে সম্মানিত। ইঁহারা "ভট্টাচার্য্য গৌড়" বংশ বলিয়া অভিহিত। বংশ প্রবর্ত্তকের নাম নিশাপতি ছিল। এই বংশে অনেক পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে হরিহর বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র রঘুনাথ তর্কবাগীশ, তাঁহার পুত্র গৌরীকান্ত বাচস্পতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কথিত আছে, গৌরীকান্ত প্রথমতঃ বিদ্যায় বঞ্চিত ছিলেন, লোকে তজ্জন্য তাঁহাকে অশ্রদ্ধা ও অনাদর করিত। একদা আত্ম-ধিকৃত হইয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যে গমন করেন। কিছুদূর গেলেই অরণ্যাশ্রয়ী এক সন্ন্যাসীর সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী নানা বিষয়ে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন। সন্ন্যাসীর শিক্ষা প্রভাবে অজ্ঞান বিদূরীত হইয়া তাঁহার জ্ঞানোদয় হয়; সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক গৃহ-প্রত্যাগমনের আদেশ করেন।

গৌরীকান্ত যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। লোকেও তাঁহার ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, অপ্রত্যাশিত রূপে মান্য ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তাঁহার জ্ঞান-গৌরবে অচিরেই তিনি বাচস্পতি উপাধি লাভ করিলেন। তাঁহার মুখবিগলিত জ্ঞানান্বিত বাক্য শ্রবণে শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, তত্রত্য রামেশ্বর চৌধুরী তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিলেন এবং তদীয় শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইঁহার পুত্র মধুসূদন পঞ্চানন দেশে বিশেষ সম্মান অর্জ্জন করেন। তাহার পর চারিপুরুষ মধ্যে এ বংশে আর কেহই উপাধি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাচস্পতি হইতে "সিদ্ধবংশ" বলিয়া সর্ব্বসাধারণ এ বংশীয়দিগকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

আগিয়ারামের চৌধুরী বংশ

করিমগঞ্জ সবডিভিশনের ভিন্ন ভিন্ন পরগণা ও গ্রামে আরও বহুতর প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের বাস আছে, সে সকল বংশ বিবরণ যে আমরা প্রাপ্ত হই নাই, তাহা বলা বাহুল্য। আগিয়ারাম পরগণার

১৮. মকুন্দরাম সিদ্ধান্ত নামক এক মহাত্মা কৃত এক প্রাচীন শ্লোকেও এই স্থানের নাম শুধু "লিখা" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

কাকুরা গ্রামে প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশীয়ের বাস; আমরা ইঁহাদের বংশকথা প্রাপ্ত হই নাই। এই বংশ তথাকার প্রাচীন বংশ বলিয়া খ্যাত; ইঁহারাই তত্রত্য ভূম্যধিকারী। এই বংশের কৃষ্ণজীবন রায় চৌধুরী একজন সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী মিরাশদার ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। দেবীপ্রসাদ পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন এবং ইন্দোর রাজ্যে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া তথায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন, শ্রীহট্ট জিলায় ইনি সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হন। ইন্দোর হইতে দেশে আসিয়া তিনি কাছাড়ে গবর্ণমেন্টের একটি কার্য্যে (হেডক্লার্ক পদে) নিযুক্ত হন (১৮৩৪ খৃঃ); কিছুদিন কার্য্য করিয়া পেনশন গ্রহণে বাড়ী আসেন। দেবীপ্রসাদ যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেও অপরিমিত ব্যয়ী ব্যক্তি ছিলেন; এজন্য তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তির বহুলাংশ বিক্রয় করিতে হয়; ইঁহার পুত্র শ্রীহট্টের সুসন্তান প্রথিতনামা রাধানাথ চৌধুরী। ৪র্থ ভাগে আমরা তাঁহার গৌরবময় জীবনচরিত প্রদান করিব।

ব্রাহ্মণন্দের বংশ-কথা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে ইটার পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মনন্দ ভট্টাচার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ বলা গিয়াছে। একখানা প্রাচীন "পাতুড়া" কাগজে দৃষ্ট হয় যে ইঁহার বাচস্পতি উপাধি ছিল এবং জয়তারা নাম্নী এক "গুণবতী সতী" তাঁহার সহধর্ম্মিনী ছিলেন। আরও জানা যায় যে, ইটারাজ কর্ত্তৃক তিনি স্ব "গোষ্ঠী" হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইটা পরগণার দাসের মহলবাসী, হুগলী হইতে আগত হালদার উপাধি বিশিষ্ট জনৈক প্রদান ব্যক্তিকে প্রথমেই যাজন করেন।[১৯] একদিন উক্ত হালদার তাঁহাকে স্বীয় দামোদর চক্রের অর্চ্চনা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদানান্তর পরিত্যাগ করেন।

ব্রহ্মনন্দের ঈশান, লম্বোদর, বুড়ঙ্গ ও দৈত্যারি নামে চারিপুত্র এবং ইন্দ্রবতী নামে এক কন্যা ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ইন্দ্রবতীকে হংসখলার গৌতম গোত্রীয় দিগম্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট বিবাহ দেন। ইঁহার শ্রীনিবাস বাচস্পতি নামে এক পুত্র হয়, হরিহর ও দুর্গাদাস নামে বংশ প্রবর্ত্তক ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহারই দুই পুত্রের নাম।

ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠ তনয় ঈশান, ইটার রাজকর্ম্মচারী নারায়ণ মণ্ডলের পৌরোহিত্য গ্রহণে ইন্দানগর বাসী হইয়াছিলেন।[২০] বুড়ঙ্গ দিনারপুর পরগণার আমুদপুরে এক ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়া সেইস্থানে গমন করেন।[২১] দৈত্যারি নিঃসন্তান ছিলেন।

লম্বোদরের ছয়পুত্র হয়, ইঁহাদের নাম রাম, নারায়ণ, সনাতন, বলরাম, নয়ন ও বংশী। সর্ব্বকনিষ্ঠ বংশীবদন ন্যায়রত্ন ব্যতীত ইঁহাদের সকলেরই বংশ আছে। নারায়ণ প্রথম হইতেই ঢাকাদক্ষিণ বাসী হন। তাঁহার বংশীয়গণ তথায় আছেন।[২২] রাম ও বলরাম পঞ্চখণ্ড বাসী হন, কিন্তু বলরাম বংশীয়গণ প্রায় শত বৎসর যাবৎ লাতুবাসী হইয়াছেন। নয়নের বংশধর বর্গ শাহবাজপুর পরগণা বাসী। এস্থলে পঞ্চখণ্ড ও শাহবাজপুরের বংশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কথিত হইতেছে।

১৯. এই বংশীয়গণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন।
২০. ঐ বংশীয়গণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন।
২১. ঐ বংশীয়গণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন।
২২. ইঁহার মহেশ ভট্টাচার্য্য, হরিনাথ চক্রবর্ত্তী ও কিশাইরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ছিলেন। হরিনাথের নামীয় নবাব প্রদত্ত ভূমি, পরে "২১১ নং হরিনাথ পং" নামীয় তালুকে বন্দোবস্ত হয়।

পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা বাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সোণারাম ও মথুরেশ নামে দুই পুত্র হয়। তন্মধ্যে সোণার পুত্র মদুসূদন, তৎপুত্র জয়চন্দ্র তর্কভূষণ ও প্রয়াগরাজ ভট্টাচার্য্য; প্রয়াগের পুত্র হীরালাল দশসনা বন্দোবস্ত কালে জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষ সোণা ও মথুরেশের যুক্ত নামে "২নং সোণা মথুরেশ" নামক তালুক বন্দোবস্ত করেন। হীরালালের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুত দ্বারকানাথ স্মৃতিভূষণ বর্ত্তমান বৃন্দারণ্যবাসী হইয়াছেন।[২৩]

ব্রহ্মানন্দের পৌত্রগণের মধ্যে নয়ন ভূসম্পত্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক মিরাসদার শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে অনেক শক্তিশালী ও প্রতাপশালী এবং ন্যায়বান ব্যক্তি উদ্ভব হয়; ঈদৃশ বংশের বর্ত্তমান অধঃপতন বড়ই শোচনীয়।

ইতিপূর্ব্বে ভট্টশ্রীর রথীতর গোত্রীয় ভট্টাচার্য্য বংশের "নবত" করার ১১৯০ সালের সম্পাদিত অনুমিত পত্রের উল্লেখ করিয়াছি, সেই দলিলে তদঞ্চলের মোসলমান জমিদার বর্গের নামের সহিত এই বংশীয় মুকুন্দরামও স্বীয় নাম দস্তখত করিয়াছিলেন।

নয়নের পুত্রের নাম বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র অভয়রাম, ইঁহার পুত্রের নামই মুকুন্দরাম ছিল। মুকুন্দের পুত্র রঘুরাম পণ্ডিত, তাঁহার পুত্র পয়লা রামের সময়ে দশসনা বন্দোবস্ত হয়। পয়লারাম নিজের পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ভূসম্পত্তি তাঁহাদেরই নামে ভিন্ন ভিন্ন তালুকে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন; তালুক গুলির নামঃ—"৩৭নং নয়ন বিশাই পং," "১০৭নং মুকুন্দরাম পং," "১০৬নং রঘুরাম পং।" এই তালুক গুলি ভিন্ন তাঁহার নিজ নামেও তিনি একটি তালুক বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, ইহা "১০২নং পয়লারাম পং" নামক তালুক। পয়লারামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বর্ত্তমান। এই বংশোদ্ভব শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই উভয় বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি।

জলডুবের জমিদার বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ১ম ভাগে "অধিবাসী" শীর্ষক অধ্যায়ে রাঢ় জাতির প্রসঙ্গে জলডুবের ব্রাহ্মণ জমিদার বর্গের উল্লেখ করা গিয়াছে; এই জমিদার ব্রাহ্মণবর্গ পরাশর গোত্রীয়, তাঁহারা রাঢ়জাতির পৌরোহিত্যও করিয়া থাকেন। বহুকাল যাবৎ ইঁহারা এদেশ বাসী হইলেও তাঁহাদের ষষ্ঠ পুরুষের উর্দ্ধতন ব্যক্তি বর্গের কোন সংবাদই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ছয়পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশে কামদেব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি দশসনা বন্দোবস্তের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং একটি তালুক নিজ নামে বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, ঐ তালুকের নাম "১০৭ নং কামদেব পণ্ডিত।"

কামদেবের তিন পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শঙ্কর ঠাকুরের নামটিই পরিজ্ঞাত আছে; ইনি নিজ বাড়ীতে এক শিব মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র তাঁহাদের নাম শান্তরাম, রতিরাম ও সুন্দররাম। তন্মধ্যে শান্তরাম বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। শান্তরাম কোন এক দেবতা প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্কল্প করিয়া এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন; ইহাতে কোন দেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা তাঁহার মনেই ছিল, কিন্তু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পরে এক সন্ন্যাসী আগমন করিয়া তদীয় পুত্রগণকে স্বর্গীয় মদনমোহন নামে এক বিগ্রহ প্রদান করিয়া যান অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পরে যাওয়া যায় নাই; তখন তদীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক সেই দালানে মদনমোহন স্থাপিত হন। এই বংশের কুলদেবতা রূপে এ যাবৎ মদনমোহন পূজিত হইতেছেন। শান্তরামের গুণে বিমুগ্ধা হইয়া

২৩. "পুরুষোত্তম তীর্থ-কৃত্য" নামক ইঁহার কৃত একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

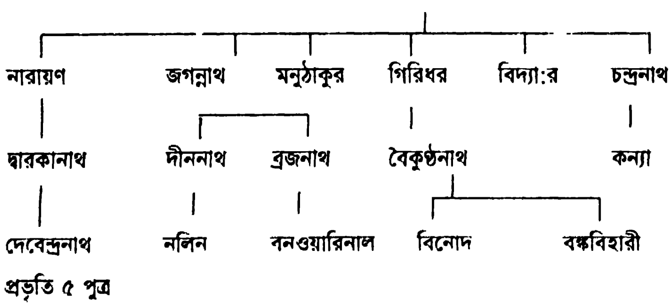
শ্রীহট্টের মজুমদার বংশীয়া জনৈকা রমণী তাঁহাকে কতক ভূমি ব্রহ্মত্র দান করিয়াছিলেন। ঐ ভূমি সেই রমণীর নিজ স্বতাংশ বা "জুলা" ভূমি হইতে প্রদত্ত বলিয়া "কিং জুলাই" নামে খ্যাত আছে। তদ্ব্যতীত পঞ্চখণ্ডের পালবংশীয় জমিদার পুরুষোত্তম তাঁহাকে আরও কতক ভূমি ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন, উক্ত ভূমি পরে "পুরুষোত্তম পাট্টা" বলিয়া বন্দোবস্ত হয়।

শান্তরামের সাত পুত্র,[২৪] তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ট চন্দ্রনাথ খ্যাতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। করিমগঞ্জ সবডিভিশন স্থাপিত হইলে, তথায় যখন লকেল বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইনি একজন মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার অত্যাগ্রহ সর্ব্বদা লক্ষিত হইত; ক্ষেত্র বৃন্দাবন প্রভৃতি বহুতীর্থে তিনি গমন করেন। শান্তরামের জ্যেষ্ঠ তনয় নারায়ণের পুত্র দ্বারকানাথ নবদ্বীপ গমন পূর্ব্বক ভ্রাতৃবর্গের সম্মতিতে অদ্বৈতবংশীয় শ্রীমৎ ক্ষেম্রনাথ গোস্বামীকে এক মূল্যবান বাটী দান করিয়াছিলেন। তিন গয়া, কাশী, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি অনেক তীর্থে গিয়া তত্তৎস্থানে বহুদান ধ্যান করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। শান্তরামের সকল পুত্রই তীর্থসেবী ছিলেন।

শান্তরামের তৃতীয় পুত্র মনুঠাকুরের বৈকুণ্ঠ নাথ নামে এক সুন্দর পুত্র হয়, বৈকুণ্ঠ নাথ বয়োবৃদ্ধির সহিত নানাগুণে বিভূষিত হইয়া উঠেন; তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চ ছিল। তাঁহার ন্যায় উদার চরিত, অমায়িক স্বভাব ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হয়। দীন দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত, তিনি মলিন মুখে তাহাদের দুঃখ কথা শুনিতেন ও তৎপ্রতিকারে যত্ন করিতেন। সাধারণের শিক্ষার প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল, একমাত্র তাঁহারই যত্নে জলডুবের উচ্চ প্রাথমিক বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহার অচির-মৃত পুত্র বিনোদ বিহারী ও পিতার ন্যায় উদার ছিলেন। বস্তুতঃ এই ব্রাহ্মণ বংশীয় জমিদারদের দ্বারাই রাঢ়জাতির গৌরব অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

---

২৪. ইঁহাদের ক্ষুদ্র বংশ তালিকা এইঃ-প্রথমতঃ কামদেব তৎপুত্র শঙ্কর, তৎপুত্র



সাধারণ বিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়
বৈদ্য ও কায়স্থাদি বংশ

পঞ্চখণ্ডের প্রাচীন সেনবংশ

করিমগঞ্জ সবডিভিশনে পঞ্চখণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান। এই স্থানের মিথিলাগত পঞ্চব্রাহ্মণই সাম্প্রদায়িক সমাজের আদি। ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত পঞ্চখণ্ডে উচ্চবংশীয় বৈদ্য কায়স্থাদি বহুকালাবধি বাস করিতেছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আমরা বহুযত্ন করিয়াও তাঁহাদের বংশ কাহিনী সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পঞ্চখণ্ডের বৈদ্যকুলোদ্ভব ধন্বন্তরি গোত্রীয় সেনবংশের আদি পুরুষ বহুপূর্ব্বে রাঢ়দেশ হইতে এদেশে আগমন করেন। প্রসিদ্ধ সেনরাজ বল্লাল সম্বন্ধে এক অন্ত্যজা নারী গ্রহণের প্রবাদমূলে, সমাজ বিপ্লবের এক আখ্যায়িকা শুনা যায়। কথিত আছে সেই সময় জাতিচ্যুতির ভয়ে অনেকেই দেশত্যাগী হন। বল্লাল তখন শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রবৃত হইয়া প্রাচীন সমাজকে যখন ওলট পালট করিতেছিলেন, যখন তাঁহার অত্যাচার অসহ্য বোধে বহুব্যক্তি দেশত্যাগী হন, তখন এই সেন বংশীয় একব্যক্তি দেশত্যাগে উদ্যোগী হন এবং নদীয়াতে আসিয়া অতিক্লেশে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে পরে, ইঁহারই বংশধর সুখময় সেন নামক একব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রলোভন ও অনুরোধ বাধ্য হইয়া এ দেশে আগমন করেন। সুখময় যে স্থানে বাস করেন তাহা সেনগ্রাম নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেনেরা তথায় স্থায়ী হইতে পারেন নাই; তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী সুপাতলা গ্রামে বাড়ী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথাকার স্থায়ী অধিবাসী হন। পূর্ব্বে ইঁহাদের সম্বন্ধাদি পশ্চিম বঙ্গীয় বৈদ্যদের সহিতই হইত, পরে অবস্থার অবনতির সহিত এ অঞ্চলেই সম্বন্ধাদি করিয়া আসিতেছেন।

মোসলমান আমলে ভূমির রাজস্বাদি নিয়মিত সময়ে প্রদান করিতে বিলম্ব ঘটিলে ভূম্যধিকারীকে কঠিন দণ্ডভোগ করিতে হইত, এইভয় প্রযুক্ত সেনবংশীয়গণ নিজ আবশ্যক ব্যতীত অতিরিক্ত ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন নাই, কাজেই ইঁহারা সমৃদ্ধিশালী নহেন। কিন্তু বংশ মর্য্যাদায় অদ্যাপি তাঁহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন আছে। আমরা সেনবংশীয় প্রায় ত্রিংশৎ ব্যক্তির নামের "লিষ্ট" পাইয়াছি, কিন্তু কে কাহার পিতা বা পুত্র, তাহার বিনির্ণয় না থাকায় আমরা তাহা হইতে কিছুই উপকার পাই না। জানা যায় যে, ইদানীং এ বংশে রামকেশব সেন এক ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম রামকান্ত ছিল. ইঁহার পুত্র গুরুপ্রসাদ, তৎপুত্র হরকিশোর, তাঁহার পুত্র শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র। শরচ্চন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কচন্দ্র সেন প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

বৈদ্য বংশীয় তত্রত্য বড়বাড়ী গ্রামের গৌরীনাথ গুপ্ত মুন্সেফ ছিলেন, তিনি প্রভৃত সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

পাল, দত্ত ও দাস বংশ

পাল বংশের কথা

পঞ্চখণ্ডের পাল ও দত্ত বংশ এ সবডিভিশনে অতি প্রাচীন। "পঞ্চখণ্ডে সতত বুধসভা পালদত্তৌ ক্ষিতীশে" ইতিবাক্যে দেশ প্রদীপের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার এই বিখ্যাত বংশদ্বয়ের অবস্থিতি হেতু পঞ্চখণ্ডের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। এই পাল বংশের প্রবর্ত্তকের নাম রাজা মহীপাল বলিয়া কথিত হয়। পাল রাজগণের নামের তালিকায় বহুসংখ্যক মহীপালের নাম পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চখণ্ডের পাল বংশের প্রবর্ত্তক তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চখণ্ডের পাল বংশের প্রবর্ত্তক তাঁহাদের কেহ কিনা বলা যায় না। হইলেও কোন সময়ে কি কারণে তিনি এদেশে আসিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পঞ্চখণ্ডের ভূস্বামী বলিয়াই হউক, কি অন্যকোন কারণেই হউক, তিনি "রাজা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

প্রায় পঞ্চবিংশতি পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশে কালিদাস পাল নামে এক ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, এ দেশে তিনি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিতেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। তৎকালে এ অঞ্চল অনেকাংশে অনাবাদ ছিল, কালিদাস স্বীয় লোকজন দ্বারা তাহা বহুলাংশে বাসোপযোগী করেন; এই আবাদ কারিগণ মাহিমাল জাতীয় ছিল; ইহাদের সর্দ্দার দ্বয়ের নাম রাঘাই ও বসাই, ইহাদের বংশধরবর্গ অদ্যাপি আছেন। ফলতঃ কালিদাস পাল হইতেই এবংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং এ বংশ-তালিকাও কালিদাস পাল হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে।[১]

কালিদাসের পৌত্রের নাম হরপ্রসাদ, ইঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে বারাণসী পাল জ্যেষ্ঠ; ইনি একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ছিলেন, উহা "বারপালের দীঘী" নামে খ্যাত হইয়াছে। এই দীর্ঘকা-তীরবর্ত্তী পালবংশীয়গণের বসতি গ্রাম "দীঘীর পার" নামে আখ্যাত হয়।

বারাণসীর ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরীচরণ জনৈক বৈষ্ণবকে ২২/০ হাল ভূমি দান করিয়াছিলেন, উহা "বৈরাগীর চক" বলিয়া খ্যাত হয়। গৌরীচরণের ভ্রাতা গৌরকিশোর, তাঁহার পৌত্র ছিলেন চারিজন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামজীবন পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে "রাজা রামজীবন পাল" এইরূপ নাম সাক্ষর করিতেন। এই সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা একরূপ স্বাধীনই ছিলেন, কাহাকেও রাজস্বাদি দিতেন না। ইহার পর হইতেই তাঁহারা নবাবের অধীনতা স্বীকার করেন।

রাজা রামজীবনের ভ্রাতা রাজ্যেশ্বরের পাঁচজন প্রপৌত্র ছিলেন, ইঁহারা সকলেই খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গদা পাল বা গদাধর পাল ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন দ্বারা কীর্ত্তিমান হইয়াছেন; উক্ত দীর্ঘিকা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নামানুসারে "গদাপালের দীঘী" নামে খ্যাত আছে, ঘুঙ্গাদিয়ার পালবংশীয়গণ তাঁহারই অধস্তন বংশ।[২]

গদাপালের কনিষ্ঠভ্রাতা শম্ভুপালও একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া যশস্বী হন, ঐ দীঘী তাঁহার নামেই খ্যাত হইয়াছে। ইঁহাদেরই সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনে প্রচণ্ড খাঁ নামে খ্যাত হন; তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন।

পরবর্ত্তীকালে পালবংশীয় বাণেশ্বর ও ভবানী নারায়ণ পাল দুইটি দীঘী খনন করিয়া যশস্ব হইয়া গিয়াছেন।

পাল বংশীয় চৌধুরীগণের অনেক দেবত্র ও ব্রহ্মত্র দানের জনশ্রুতি আছে, কিন্তু তত্তাবতের নিদর্শন এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে প্রাপকগণের উত্তরাধিকারিগণ নিজ নিজ নামে

১. পালবংশ তালিকা এ গ্রন্থ সংলগ্ন এঃ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে।

২. পরিবর্ত্তী ৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বন্দোবস্ত গ্রহণ করায় সেই প্রদত্ত ভূম্যাদির নির্দ্দেশ করা কঠিন। পঞ্চখণ্ডের প্রাচীন বিগ্রহ স্বর্গীয় বাসুদেবের রথ চিত্রিত করা, রথ টানিবার রজ্জু নির্ম্মাণ করা, রথের সময় বাদ্য করা এবং ভোগের দুগ্ধ যুগান ইত্যাদি নিয়মিত প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তাঁহাদের দত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমির উপস্বত্ব নির্দ্ধারিত ছিল, ঐ সকল ভূমিও পরে বিভিন্ন তালুকে পরিণত হয়। রথ চিত্রকরের তালুক "চান্দগঙ্গা" নামে খ্যাত হইয়াছে; দুগ্ধ যুগানিয়ার তালুকের নাম "দুধ বক্‌সি" ইত্যাদি।

পালবংশজ ননীপাল চৌধুরী ও তাঁহার পরবর্ত্তী গৌর নারায়ণ পাল, হর নারায়ণ পাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখ আবশ্যক, ইঁহারা কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মোনশী হরকৃষ্ণ পাল কালেক্টরীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা মোনশী কৃষ্ণকায় দেওয়ানজী কুমিল্লা শহরে স্বর্গীয় আনন্দময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তি অদ্যাপি তথায় পরিপূজিতা হইয়া পালবংশের সদনুষ্ঠানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোব পাল চৌধুরী যে শুধু ক্ষমতাবান জমীদার ছিলেন তাহা নহে, সর্ব্বসাধারণের হিতানুষ্ঠানে তাঁহার উদ্যম সদা লক্ষিত হইত। পঞ্চখণ্ডের মধ্য-ইংরেজী স্কুলটি তাঁহারই যত্নে ও ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চখণ্ডের "বৈরাগী বাজার" তিনিই স্থাপন করেন। তিনি সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতে অতি ভালবাসিতেন ও প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। স্কুলের ছাত্রদিগকে সময়ে কমলা ও আম্র প্রভৃতি ফল ভূরি পরিমাণে বিতরণ করিতেন। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত কালীকিশোর পাল চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন এবং পূর্ব্বোক্ত আনন্দময়ীর সেবা পরিচালনার্থে ছয়শত টাকা আয়ের একখণ্ড ভূমি অর্পণ করিয়াছেন। পঞ্চখণ্ডের ১নং হইতে ১৮নং পর্য্যন্ত তালুকগুলি এই এক বংশের ব্যক্তিগণের নামে আখ্যাত ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

দত্ত বংশ ও দাস বংশ

পাল বংশের ন্যায় দত্ত বংশও অতি প্রাচীন। পাল বংশের এক কি দুই পুরুষ পরে শ্রীমান দত্ত প্রথমে পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন বলিয়া কথিত। দত্ত বংশের খ্যাতি প্রতিপত্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা সুপাতলার কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় এই সুপ্রাচীন দত্ত বংশের এবং যাঁহাদের বসতিহেতু পঞ্চখণ্ডের দাসগ্রামের নাম হয়, সেই দাসবংশীয়ের কোন বিবরণই জ্ঞাত হইতে পারি নাই। রিচির দত্তগণ সুপাতলার দত্ত বংশের শাখাসম্ভুত। সুপাতলার এই সুবিখ্যাত দত্তবংশের জনৈক খ্যাতিমান পূর্ব্বপুরুষের নাম সরিদত্ত ছিল। ইঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি হেতু অনেকে ইঁহাকেই দত্ত বংশ প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানে। ইদানিং এই বংশে গোপীনাথ দত্ত চৌধুরী, যুগল কিশোর দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি এবং দাসবংশে চণ্ডীপ্রসাদ মোনশী প্রভৃতির উদ্ভব হয়। তত্রত্য গৌরচন্দ্র দাস মুন্সেফ ছিলেন। এবং রামরতন মোনশী একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। দত্ত বংশীয় বিষ্ণুদত্ত ব্রহ্মচারী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাঁহার আশা অতি উচ্চ ছিল কিন্তু অকালে প্লেগে মারা যান। দত্ত বংশে বর্ত্তমানে শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার দত্ত চৌধুরী এবং দাস বংশে শ্রীযুত পবিত্র নাথ দাস প্রভৃতি জীবিত আছেন। পঞ্চখণ্ডের ১৯নং হইতে ২৪নং তালুকগুলি দত্ত বংশীয় ব্যক্তিগণের নামে আখ্যাত ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

লাউতার অন্যান্য বংশ

পঞ্চখণ্ডের লাউতা গ্রামে ঘোষ, দেও ও দেব বংশের বাস; কথিত আছে, এই স্থানে পূর্ব্ব কুকিদেব বাসস্থান ছিল, কুকিসর্দ্দার লাউয়ার নামে পরে লাউতা গ্রামের নাম হয়। লাউতার ঘোষ ও দেও বংশ এক্ষণে নির্ব্বংশ। তথায় "জামাল ঘোষের টীলা" বলিয়া একটা স্থান আছে,

এই স্থানেই ঘোষদেব বাড়ী ছিল। দেও বংশ সম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে; এবংশে সারঙ্গ দেও ও খেচু দেও নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন, ইহারা অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। সারঙ্গ দেওয়ের সঙ্গে ১২০ সংখ্যক কোদালি থাকিত, ইহাদের দ্বারা সারঙ্গ বহু সংখ্যক পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তন্মধ্যে দেওদের বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী দীঘী বর্ত্তমানে দলদামে আবৃত হইলেও, ২০/২৫ হাত লম্বা বংশ দণ্ড দ্বারাও তাহার নিম্নের ভূমি পাওয়া যায় না, ইহা এতই গভীর।

সারঙ্গের একটা কীর্ত্তি অতুলনীয়। একজন ব্রাহ্মণ দৈন্য বশতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারিতেছেন না জানিয়া সারঙ্গ তাঁহাকে নিজ বাড়ী দান করেন ও স্বয়ং বর্ত্তমান বারুই গ্রামে চলিয়া যান। সদ্ব্যয়-বাহুল্যে সারঙ্গের অর্থ জলের ন্যায় বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। জন সাধারণে অদ্যাপি একটা জনশ্রুতির উল্লেখ করে যে, ধলাই বিল হইতে যে খাল বহির্গত হইয়াছে, সারঙ্গের টাকা ঐ খাল দিয়া বহির্গত হইয়া যায়; এজন্য ঐ খাল "টাকা খাল" নামে কথিত হইয়া থাকে। মাত্র ১০/১২ বৎসর হইল, দেও বংশের শেষ বংশধরের মৃত্যু হইয়াছে।

লাউতার দেব-গ্রামে দেব বংশীয়ের বাস। দেব বংশের বিশেষ বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। এবংশে ইদানীং শ্যামসুন্দর দেব সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ ভাজন ছিলেন। তিনি স্বীয় চরিত্রগুণে লেখ্যবৃত্তি দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দেব বংশের গৌরব স্বরূপ শ্রীযুক্ত রায় দুলাল চন্দ্র দেব বাহাদুর তাঁহারই পুত্র।

লাতুর বংশোল্লেখ

করিমগঞ্জ সবডিভিশনে লাতু এক প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল। ঐ কেন্দ্রগুলি জিলা বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্ব শ্রীহট্টের রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র বা জিলা লাতুতে স্থাপিত হওয়ায় লাতু এক বিশিষ্ট গ্রামে পরিণত হয়। বহু পূর্ব্বে যখন এঅঞ্চলে ভদ্র বসতি স্থাপিত হয় নাই, তখন জাতু, আতু, পাতু ও লাতু নামে কয়েকটি কুকি সর্দ্দার এ স্থানে বাস করিত, তাহাদের অধিকৃত স্থানই পরে তাহাদের নামে খ্যাত হয়। এই স্থানে কুকিদের বারটি পাড়া ছিল, এই পরগণা তাহাতেই বারপাড়া বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। লাতুর বাজারের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র টীলা "মালগড়ের টীলা" বলিয়া খ্যাত, এই টীলাতে তৎকালে গৃহাদি ছিল এবং সংগৃহীত রাজস্বাদি রক্ষিত হইত। "মাল" অর্থাৎ রাজস্ব এখানে থাকিত বলিয়া টীলাটী "মালগড়" নামেই খ্যাত হয়। তখন লাতুতে একটি মুন্সেফ কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পঞ্চখণ্ডের ন্যায় আমরা লাতুর কোন বংশেরই বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। লাতুর স্বামী বংশ কি দত্ত বংশ অথবা অষ্টপতি বংশের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। স্বামী বংশে পূর্ব্বে অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কথিত আছে অতি পূর্ব্বে ইঁহাদের কাহারও গৃহে অলক্ষ্যে দুইটা "বনমানুষ" প্রবেশ করিয়া অন্নাদি যাহা রন্ধন পাত্রে অবশিষ্ট থাকিত, তৎসমস্তই খাইয়া যাইত। প্রায় প্রত্যহই এইরূপ ঘটিত, ইহাতে উত্যক্ত হইয়া গৃহস্বামী একদিন গোপন ভাবে থাকিয়া চোরের প্রতীক্ষা করেন নিয়মিত সময়ে চোর আসিল, গৃহস্বামী দেখিলেন যে তাঁহার অন্নচোর মানুষ নহে—বনমানুষ; তখন তিনি লগুর দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক একটিকে প্রাণে বধ করিলেন, অন্যটি পলাইল। সেই হইতে না কি তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং ইহা না কি বনমানুষের অভিশাপের অথবা তাহার হত্যাপরাধের ফল। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল না থাকিলেও ইদানীন্তন কালে স্বামী বংশে গুরুপ্রসাদ ও তৎপুত্র গোকুল রাম স্বামী বড়ই উদার ও প্রশস্তমনা পুরুষ ছিলেন, গোকুলরামের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীচরণ স্বামী; ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বচেষ্টায় অবস্থার অনেকটা উন্নতি বিধান

করিয়াছেন। স্বামী বংশে স্বপ্রতিষ্ঠিত স্বর্গীয় রমণী মোহন স্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য; শুধু নিজ চেষ্টায় কিরূপে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সম্পত্তি উপার্জ্জিত হইতে পারে, রমণী বাবু তাহা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টপতি বংশ

অষ্টপতি বংশের আদিপুরুষ কাছাড়-পতির একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া "কুলাঞ্জলি" গ্রন্থে পাওয়া যায়; ইনি একজন কুলীন কায়স্থ সন্তান ছিলেন। ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণের রাজ্য বিলোপ-বার্ত্তা পূর্ব্বাংশে বর্ণিত হইয়াছে, ইনি রাজা সুবিদ নারায়ণের মন্ত্রী উমানন্দের অনুগত ছিলেন; এবং তাঁহারই সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া সা। সাউ-সমাজের অন্যতম অগ্রণীরূপে গণ্য হন।

এ বংশে ৬ষ্ঠ পুরুষ উর্দ্ধে লালা রূপচরণ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম ভোলানাথ; লালা ভোলানাথের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ লালা মহেশরাম ও ২য় পুত্র গণেশরামের বংশ আছে; অপর পুত্র সোণারাম ও গোপীরাম নিঃসন্তান পরলোকগামী হন। লাল মহেশরামের তিন পুত্র; তিনজনই প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের নাম গৌরীচরণ, শ্যামচরণ, ও যুগলচরণ। গৌরীচরণ মুন্সেফীর উকীল ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রভাবে তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহার তুল্য মনুষ্য ইদানীং দৃষ্ট হয় না, ৪র্থ ভাগে তাঁহার জীবন চরিত্র সম্বন্ধে ২/৪টি কথা বলা যাইবে। চৈতন্য চরণ, বৈষ্ণবচরণ ও গুরুচরণ নামে তাঁহার তিন পুত্র হয়, তিন পুত্রই তিন রত্ন স্বরূপ ছিলেন। চৈতন্যচরণ লস্করপুরের মুন্সেফ ছিলেন; বৈষ্ণবচরণ ঢাকা সবজজের পদে উন্নীত হন; গুরুচরণ কৃষ্ণনগরের সবজজ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্যামচরণ প্রাচীন "মীর মোনশী" পদে ছিলেন এবং যুগল চরণ মুন্সেফীর নাজির ছিলেন। শ্যামচরণ মোনশীর পুত্র কন্যার সংখ্যা দশজন; তন্মধ্যে স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাস একজন কবি ছিলেন। শ্রীহট্ট প্রকাশ পত্রিকা শ্রীহট্ট হইতে তিনিই প্রকাশ করিয়া স্বয়ং তাঁহার সম্পাদন করেন, ৪র্থ ভাগে ইঁহার জীবন-চরিত ঘটিত কথা উক্ত হইবে। ইঁহার ৪র্থ সহোদর শ্রীশ চন্দ্র কৃত "তত্ত্ববিলাস" নামক এক গ্রন্থ আছে। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর সবডিবপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত প্রদ্যুন্নচরণ দাস জীবিত আছেন।

নাজির যুগলচরণের পুত্র অচ্যুতচরণ দাসও নাজিরের পদে ছিলেন। ইঁহার অনুজভ্রাতা স্বর্গীয় বিশ্বম্ভচরণ কৃত "দলিলাবালী" ও "পত্রমালা" বহুকাল শ্রীহট্টের পাঠশালা সমূহের পাঠ্য ছিল। পূর্ব্বোক্ত গণেশ রামের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভবানীচরণ, ইঁহার পুত্র লাতুর অন্যতম মিরাশদার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচরণ দাস বর্ত্তমান আছেন।

রাউৎভাগের রাউৎবংশ

ঢাকা উত্তর পরগণার রাউৎভাগ নামে একটি স্থান আছে। লাউৎগণের বসতি জন্য এই গ্রাম উক্ত নামে খ্যাত হয়। এগারশতী বরমচালেও দুইটি রাউৎগ্রাম আছে; কিন্তু উভয়ত্রই বর্ত্তমানে রাউৎ বংশীয়ের বসতি নাই। তরফে এখনও রাউৎ বংশীয়ের বাস আছে।

যে বংশের বসতি জন্য ঢাকা উত্তরের রাউৎভাগের নাম হয়[৩], তাঁহারা গৌতম গোত্রীয়।

সোণারাম রাউৎ স্থানান্তর হইতে এইস্থানে আগমন করেন; সোণারাম রাউতের অধিকৃত স্থানই রাউৎভাগ নাম প্রাপ্ত হয়। সোণারামের পুত্রের নাম জোড়ারায় ইঁহার পুত্র ভগীরথ। কোন

৩ ঢাকা জিলার মোনশীগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম ও রাউৎভোগ।

কারণে ভগীরথ এইস্থান ত্যাগ করিয়া বাহাদুর পুরের টুকাগ্রামে চলিয়া যান। ভগীরথের নামে তথায় একটি তালুক আছে। ভগীরথের চতুর্থ পুত্রের নাম ব্রজমোহন, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত রূপচরণ রাউৎ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রাউৎ এই বিবরণটি প্রদান করিয়াছেন।

ছোটলিখার আদিত্য বংশ

শ্রীহট্টে আগমন

ছোটলিখার আদিত্যগণ কৌশিক গোত্রীয়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মিহির বংশীয় হররাম অযোধ্যা প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি ধনবান ব্যক্তি ছিলেন এবং কোন কারণে তত্রত্য নবাব কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া স্ববংশীয় কয়েকজন আত্মীয় এবং পুরোহিত নিশাপতি সহ তদ্দেশ ত্যাগ করতঃ তিনি এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি প্রথমতঃ নদীয়াতে উপস্থিত হন। এইস্থানে তাঁহার এক আত্মীয় পীড়িত হইয়া পড়িলে তত্রত্য সুখময় সেন নামক জনৈক বৈদ্য দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন। আত্মীয় আরোগ্য লাভ করিলে, সুখময় বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন। নদীয়াতে তিনি বিপদাপন্ন হইয়া পড়ায়, এ স্থানে অবস্থিতি করা সুবিধাজনক মনে করিলেন না এবং অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন। চিকিৎসক বলিয়া সুখময় সঙ্গে থাকিলে বিদেশে ব্যাধির ভয় বহুপরিমাণে বিদূরিত হইবে বলিয়া তিনি ইঁহাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন ও তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। সুখময়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, হররামের মনুরোধে ও তাঁহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তদীয় অনুষঙ্গী হইতে সম্মত হইলেন।

এই সময় তথায় আকবরশাহ নামক জনৈক ফকিরের সঙ্গে ইঁহাদের দেখা হইল; আগন্তুকগণের অবস্থা ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া আকবরশাহ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। আশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা সেই তেজস্বী ফকিরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ফকির তাঁহাদিগকে লইয়া কিছুদিন পর্য্যটনের পর শ্রীহট্ট জিলায় উপস্থিত হইলেন।

শ্রীহট্টের তরফ মোসলমানগণের কাছে "বার আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া খ্যাত। আকবর লইয়া তরফে আসিলেন; হররাম সদলে তরফের হাসারগাঁও নামক স্থানে অবস্থিতি। কিন্তু তথায় তিনি অধিক দিন থাকলেন না। ফকিরের নির্দ্দেশমতে নিজ পুরোহিতাদি সহ তথা হইতে "লিখা" নামক স্থানে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার অনুসঙ্গী আত্মীয়গণ এবার তাঁহার অনুসরণ করিলেন না, তাঁহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই হাসার গাঁয়ের আদিত্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং হররাম স্বয়ং ছোটলিখার আদিত্য বংশের আদিপুরুষ।

যখন হররাম পুরোহিত ও চিকিৎসক সহ ছোটলিখায় আগমন করেন, তখন এদেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; ভদ্রলোক মধ্যে দাম বংশীয়গণ তথায় বাস করিতেন। যে কিছু আবাদি ভূম্যাদি তাঁহাদেরই অধিকৃত ছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাণবধের ষড়যন্ত্র

হররামের অর্থবল অল্প ছিল না, ফকিরের পরামর্শে তিনি সেই অর্থে জঙ্গল আবাদ করাইয়া তাহা অধিকার করিয়া লইতে লাগিলেন। প্রথমে এই বিষয়ে কাহারও বিশেষ লক্ষ্য হয় নাই, পরে দামবংশীয়গণ দেখিতে পাইলেন যে, হররাম বিস্তীর্ণ ভূভাগ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। তখন তাঁহাদের ঈর্ষা উৎজাত হইল, কিন্তু ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ফকির-সংরক্ষিত হররামের কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারিয়া, উভয়কে বধ করিতে ষড়যন্ত্র

করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক ক্ষৌরিককে বাধ্য করিয়া এই পাপকার্য্যে প্রণোদিত করিলেন।

ক্ষৌরিক একদা ফকিরকে ক্ষৌর করিতে আসিয়া স্বীয় অভিসন্ধি সাধনের অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল—দেহ অবশ হইয়া গেল। তদবস্থায়ও সে ফকিরের গলদেশে ক্ষুর বসাইয়া দিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল—ফকিরের কিছুই হইল না। ক্ষৌরিক ভীত হইল, তাহার অক্ষমতা ফকিরের দৈবপ্রভাব-সঞ্জাত বলিয়া বোধ করিল এবং দামদের কুমন্ত্রণা প্রকাশ পূর্ব্বক সে ফকিরের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ফকির তখন স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "তোমার অপরাধ নাই; দামদিগকে বলিও, তাঁহাদের আর মঙ্গল নাই। এ দেশ আদিত্যেদেরই হইবে। দামেরা মঙ্গল কামনা করিলে ত্রিরাত্র মধ্যে এদেশ ত্যাগ করুক।"

ক্ষৌরিক কাঁপিতে কাঁপিতে তথা হইতে আসিল ও ফকিরের দৈবশক্তি ও মাহাত্ম্যের কথা অতিরঞ্জিত রূপে দামদের কাছে বর্ণন করিল। তারপর ফকিরের ক্ষমতা ও তাঁহার ভয় প্রদর্শক বাক্য বলিল। দামেরা নাপিতের কথা শুনিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং বাস্তবিকই সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

ফকিরের উপদেশে আদিত্য বন পরিষ্কৃত করিয়া প্রজা বসাইলেন ও সে দেশের মালিক হইয়া গেলেন।

ফকির আকবর তখন সেই নির্জ্জন স্থানে এক "মোকাম" প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইলেন। তাঁহার মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কথিত আছে, তাঁহার প্রভাবে বনের বাঘ পোষিত পশুর মত প্রায়শঃ তাঁহার মোকামে আসিত। তিনি সাধন বলে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, হররামের প্রপৌত্রকে দেখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎকাল পর্য্যন্ত আদিত্য বংশীয়গণ তাঁহার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার দেহান্তরের পর তদীয় মোকাম ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া, সমাধিস্থল সুন্দররূপে বাঁধাইয়া দেন। এই মোকামের প্রতি তদ্দেশীয় হিন্দু মোসলমান গণের তুল্যভাবে ভক্তি দেখা যায়।

পরবর্ত্তী কথা

হররামের পরবর্ত্তিগণ মধ্যে লক্ষ্মী ও রঘুবর বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা এদেশে ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম অদ্যাপি লোকের স্মৃতিপথারূঢ় রহিয়াছে। তাহার পর কাশীশ্বর আদিত্যের কথা শুনা যায়। কথিত আছে যে তিনি বড়ই মাংসপ্রিয় ছিলেন, তাদৃশ মাংসপ্রিয়তা কদাচ দৃষ্ট হয়; তাঁহার আহার্য্য মাংস নিত্য যোগাইতে বহুলোক নিযুক্ত ছিল।

কাশীশ্বরের পুত্রের নাম রামেশ্বর আদিত্য। ইনি তত্রত্য চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। চৌধুরাই জায়গীর ব্যতীত তিনি হাতী খেদার জন্য খালিসা ভূমিও প্রাপ্ত হন। খেদার কর স্বরূপ প্রতিবৎসর তাঁহাকে নবাব সরকারে একটি হাতী দিতে হইত। রামেশ্বর চৌধুরী ছোটলিখাতে বিভিন্ন জাতীয় লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম স্থাপন করেন। কিন্তু যে সেন বংশীয়গণ সহ একত্রে এতদিন ছিলেন, কোন কারণে তাঁহাদের সহিত রামেশ্বরের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা তথা হইতে পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা গমন করেন। ছোটলিখাতে সেনদের যে বাড়ী ছিল, তাহা এক্ষণে জঙ্গলের অন্তরালে লুক্কায়িত। আদিত্যদের পুরাতন বাড়িরও—অবস্থা তদ্রুপ।

সেনেরা ছোটলিখা ত্যাগ করিলে, দেশে ভদ্রলোক স্থাপনের বাসনা রামেশ্বরের মনে প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার এক বিবাহ যোগ্য কন্যা ছিল, চৈতন্যদাস নামক একজন কায়স্থ বৈষ্ণবের ভেখ্ ত্যাগ করাইয়া তৎকরে তিনি সেই দুহিতার বিবাহ দেন।

সর্ব্বেশ্বর নামে তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারও একটি বয়স্থা কন্যা ছিল; সাতগাঁয়ের দত্ত বংশীয় নারায়ণ দত্ত নামক এক ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ দেন। এই বংশীয়গণ এক্ষণে "দত্ত পুরকায়স্থ" বলিয়া খ্যাত।

পুরুষরামের প্রতিজ্ঞা

রামেশ্বরের পুরুষরাম, গোবিন্দরাম ও জয়দেব নামে তিন পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ পুরুষরাম পবিত্রচেতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লোক ছিলেন। এক বৎসর খেদা করিতে জঙ্গলে গিয়া খাদ্যের সহিত একটা জলৌকা চর্ব্বন করিয়া ছিলেন, পরে বাড়ীতে আসিয়া তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্য করেন ও মনে সঙ্কল্প করেন যে আর খেদা করিতে বনে যাইবেন না এবং নবাব সরকারে হাতী দিবেন না। কাজেই আর সে বৎসর হাতী দেওয়া হইল না। খেদা মহালের জন্য নিরূপিত হাতী প্রদান না করার অপরাধে তিনি তখন ঢাকায় নীত হইলেন। ঢাকার নবাব সমক্ষেও, হাতী দিতে পারিবেন না, এই উত্তর দেওয়ায় নবাব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হস্তীপদতলে তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করিবার আদেশ দিলেন।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পুরুষরামে অটল রহিলেন। সকলেই তাঁহাকে উপদেশ দিল—"এখনও অবসর আছে, এখনও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া হাতী দিতে স্বীকৃত হউন; বৃথা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন না।" পুরুষরামের সঙ্কল্প সুদৃঢ় রহিল, কিছুতেই তিনি বনে গিয়া খেদা করিয়া হাতী দিতে সম্মত হইলেন না।

দণ্ডাদেশ প্রতিপালিত হইল; পুরুষরামের দেহ হস্তীপদতলে নিষ্পিষ্ট হইল! হায় স্পর্দ্ধা, সর্ব্বত্র তোমার যোগ্য মূল্য নাই। পুরুষরামের স্পর্দ্ধা তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল; আর নবাব নিজ স্পর্দ্ধারক্ষার্থ পুরুষরামের স্পর্দ্ধাকে পদদলিত করিলেন।

রামেশ্বর আদিত্র তৎকালে জীবিত ছিলেন, পুত্রের ঈদৃশ মৃত্যু বার্ত্তা প্রাপ্তে অত্যন্ত শোকাকুলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পুরুষরামের গঙ্গাপ্রসাদ ও বৈদ্যনাথ নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ পিতার মৃত্যুকালে মাতৃগর্ভে ছিলেন। পুরুষরামের মধ্যম ভ্রাতা গোবিন্দ রামেরও দুই পুত্র কালিকা প্রসাদ ও আদিত্যরাম, এবং কনিষ্ঠ জয়দেবের জগন্নাথ নামে একপুত্র ছিল, ইঁহাদের কেহ কেহ দশসনা বন্দোবস্তের সময় জীবিত ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ ও বৈদ্যনাথের নামে পরে তত্রত্য ১নং ও ৩নং তালুক এবং কালিকা প্রসাদের নামে ২নং তালুকের বন্দোবস্ত হয়।

কালিকা প্রসাদের প্রতিজ্ঞা পালন

পুরুষরামের শোকে বৃদ্ধ রামেশ্বর যখন পরিতপ্ত হইতেন, তাঁহার শিশু পৌত্র কালিকা প্রসাদ কোলে বসিয়া অনুতপ্ত হইত। শিশু পিতামহকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিত এবং বৃদ্ধের মুখে পুরুষরামের প্রতিজ্ঞার কথা একাগ্রমনে অশ্রুপূর্ণ লোচনে শ্রবণ করিত। ইহাতে শিশু কালাবধিই নবাব নামের প্রতি তাঁহার ঘৃণার উদয় হয়। তিনি যখন প্রাপ্ত বয়স্ক, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, শাসনভার নবাবের হাতে রহিয়াছিল। সংসারের ভার যখন কালিকা প্রসাদের উপর পড়িল, তখন রীতিমত হাতী দিয়া সেই নবাবের তুষ্টি সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, তিনিও পুরুষরামের ন্যায় হাতী দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তরুণ বয়স্ক কালিকা প্রসাদও নবাবের আদেশে ঢাকায় নীত হইলেন। পরিবারবর্গ কান্দিয়া অস্থির হইল; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আদিত্যরাম প্রভৃতি সঙ্গে চলিলেন; কর্ম্মচারী ও হিতৈষী বন্ধুবান্ধবও সঙ্গ ত্যাগ করিল না।

ঢাকাতে উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ হইল, কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না;

তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল—হাতী দিতে স্বীকৃত হইলেন না; তাঁহার ঔদ্ধত্যে নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; আদেশ অমান্য ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন জন্য, তাহার পর তাঁহাকে রণ মাতঙ্গের পদতলে নিক্ষিপ্ত করার শেষ আদেশ প্রচারিত হইল।

ভীষণকায় রণমাতঙ্গ উপস্থিত হইল, দণ্ডাদিষ্ট কালিকাপ্রসাদকে এখনই নিষ্পিষ্ট করিবে; কালিকা প্রসাদের দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া ফেলিবে—এখনই প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর হইতে পলাইবে। দর্শকগণের সম্মুখে হাতী তাঁহাকে ধরিল, কিন্তু পদতলে বিক্ষিপ্ত করিল না, শুণ্ড দ্বারা পৃষ্ঠে তুলিয়া রাখিল; কিছুতেই প্রাণবধ করিল না। আমাত্যেরা নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন যে কালিকা প্রসাদ একজন সাধুব্যক্তি, তাই হাতী তাঁহাকে হত্যা করে নাই। ইঁহাকে নিহত করা উচিত নহে।

আমাত্যবর্গ এবং মাহুত কালিকাপ্রসাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। আদিত্যরাম এই উদ্দেশ্য লইয়াই সম্ভবত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যাহাহউক, নবাব বধদণ্ড হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া, পুরস্কার গ্রহণের অনুমতি দান করেন।

কালিকা প্রসাদ বলিলেন যে, ঢাকা হইতে তিনি নিজ ভূমির উপর দিয়া বাড়ী যাইবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি যে বৃহৎ আশায় এই বর চাহিলেন, তাহা পূর্ণ না হইলেও, ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পাদ-পরিমিত সঙ্কীর্ণকায় একটি পথের ভূমি মাত্র তাঁহার নামে মঞ্জুর হইল। ঐ জমির নাম "ঢাকায় লিখার চিরি" বলিয়া খ্যাত হয়।

কালিকা প্রসাদের পুত্রের নাম ভবানী প্রসাদ, ইঁহার পৌত্র হরগোবিন্দ একজন সঙ্গীতজ্ঞ সাধক ছিলেন, তিনি সুন্দর মালসী গীত রচনা করিতেন ও তাহাই গাইতেন।[৪]

পুরুষরামের জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গাপ্রসাদের দেবীপ্রসাদ ও গৌরীপ্রসাদ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে

---

৪. তদ্‌রচিত একটি গীত নমুনা স্বরূপ এস্থলে দেওয়া গেলঃ–
(একতালা)

"তারা জগত জননী,	হায় গো তারিণি,	বালক পারেন দয়া হইল না।
বড় রিপু বল,	হইয়ে প্রবল,	ভবানীর তরি করিতেছে তল, (মা)
ভয় পাইয়া মনে,	ডাকি নিশিদিনে,	কিঞ্চিত নয়নে হেরনা॥
শমন আসিয়ে,	শিওরে বসিয়ে,	ঘন ঘন ঘন ঘন্টারর করে, (মা)
কার কাছে যাব,	কিশে ত্রাণ পাব,	ঘুচিবে শমন তাড়না॥
প্রণতি করিয়া,	শ্রীপদারবিন্দে,	শ্রীহরগোবিন্দে বলিছে আনন্দে, (মা)
আমি যদি মরি,	ও হরসুন্দরি,	দুর্গানাম যে কেহ লবে না॥"

৫. উক্ত চৌধুরাই সনন্দের মর্ম্মানুবাদ এই–
সরকার শ্রীহট্টের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যকালের কর্ম্মচারিগণ ও পরগণা ছোট লিখার চৌধুরী ও কানুনগো বর্গ জ্ঞাত হইলেন যে উক্ত পরগণার কৃষ্ণচরণ চৌধুরী নিজ স্থলবর্ত্তী এক পুত্র বাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৃত ব্যক্তির পুত্র উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত দ্বারা চৌধুরী সনন্দ প্রাপ্তির প্রার্থনা করায় তাঁহার নামে চৌধুরাই বাহাল করা যায়। অতএব সে স্বেচ্ছানুরূপ চৌধুরাই "সরবরাহে" আবদ্ধ থাকিয়া প্রজা ও জোতদারানকে বাধ্য রাখিয়া সরকারের রাজস্ব পরিশোধে উদ্যত ও বাধ্য থাকে। কর্ত্তব্য যে উল্লিখিত ব্যক্তিকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে চৌধুরী জানিয়া তাহার সৎপরামর্শের কেহ অন্যথাচরণ না করে ও রাজকীয় কি অনাদীয় কি অন্যদীয় কাগজে তাহার সাক্ষর দেখিলে তাহা বিশ্বস্তজ্ঞান করে এবং নিয়োজিত "খানেবাড়ী", "নানকার" পূর্ব্ব বিভাগানুসারে তাহার দখলে ছাড়িয়া দেয়। সরকারী রাজস্ব নিয়মিত আদায় করিতে থাকে, "তাগিদ" জানিবা।
তপসিল–
নিষ্কর কানেবাড়ী-------------
নানকার--------------- -----
মোট মোরাজি--------------- মাত্র
সাল ৬ জলুস এবং ১১৬৭ সাল।

দেবীপ্রসাদ অত্যধিক স্থূলকলেবর ছিলেন; সাধারণ চৌকি কি খাটে বসিলে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইত। তাঁহার বসিবার জন্য স্থূলবৃক্ষ কাটিয়া বৃহৎ "গাছ-চৌকি" নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি তাঁহার বৃহৎ ভূড়ির মধ্যে একটা কুরিশ মৎস্যের পণা (ছানা) প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে নাই। তিনি মাটিতে থালা রাখিয়া খাইতে পারিতেন না; লৌহ নির্ম্মিত উচ্চ "ভোজন বেড়ি"তে থালা রাখিয়া আহার করিতেন।

এই বংশীয় মাণিক্য রাম আদিত্য জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিবাদ ক্রমে চৌধুরাই সনন্দের জন্য আবেদন করিয়া, শ্রীহট্টের নবাব এক্রামউল্লা খাঁ বাহাদুরের মোহরাঙ্কিত এক সনন্দ ১১৬৭ সালে প্রাপ্ত হন।[৫] বৈদ্যনাথ চৌধুরীর বংশজ্ভব শ্রীযুত রেবতী মোহন আদিত্য চৌধুরী হইতে আমরা এই বিবরণ ও তত্রত্য ভট্টাচার্য্য বংশ কথা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ডেওয়াদি-রফিনগরের পুরকায়স্থ বংশ

পূর্ব্বে যাঁহারা পাটওয়ারি পদে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা পুরকায়স্থ উপাধি ধারণের অধিকারী ছিলেন। কোন দলিল পত্রে ইঁহাদিগের "সহি" থাকিলে তাহা প্রামাণ্য দলিলরূপে গণ্য হইত।

কাশ্যপ গোত্রীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব হরিহরদের ও তাঁহার তিন ভ্রাতা নবাবি আমলে রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া শ্রীহট্টের অন্তর্গত পৈলে বাস করেন। কিছুদিন পৈল-বাসের পর সে স্থান তাঁহাদের মনোনীত না হওয়ায়, তথা হইতে ডেওয়াদির অন্তর্গত রামপাশাতে আসিয়া বাস করেন। হরিহর ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন, তিনি ডেওয়াদির (ডৌয়াদির) অনেক ভূমি নিজ অধিকারে আনয়ন করেন এবং পাটওয়ারি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য পুরকায়স্থ বলিয়া গণ্য হন। রামপাশা গ্রাম নিম্নভূমি বলিয়া বাসের অসুবিধা বশতঃ হরিহরের প্রপৌত্র যদুনন্দন ও মধুনন্দন এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাসগ্রামে গিয়া বাস করেন। এই বংশে বর্ত্তমানে ত্রয়োদশ পুরুষ চলিতেছে।

দশসনা বন্দোবস্তকালে এই বংশীয় লক্ষ্মীচরণ দেব বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ডেওয়াদি হইতে খারিজা রফিনগর পরগণায় কয়েকটি মহাল বন্দোবস্ত করিয়া লন। এই বংশীয় বৈদ্যনাথ দেব পুরকায়স্থ কাছাড়ের কাঠিগড়া নামক স্থানে মুন্সেফী পদে ছিলেন এবং নীলপ্রসাদ তত্রত্য তহশীলদার ছিলেন। এই বংশীয় ভোলানাথ দেব ও ভৈরব চরণ দেব কাছাড় সদরের খাজাঞ্চি ছিলেন। আরও দুই এক জন কাছাড়ে কর্ম্মোপলক্ষে থাকিতেন, কাছাড় জেলাই ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বংশীয় শ্রীযুক্ত লাবণ্য চন্দ্র দেব পুরকায়স্থ হইতে আমরা এতদ্বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এগারশতীর পুরকায়স্থগণ

এগারশতী পরগণাতে পুরকায়স্থ বংশীয়েরা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে পুরকায়স্থদের দুইটি অংশ আছে, একটি কায়স্থ এবং অপরটি সাহু সম্প্রদায় সম্ভূত। এই উভয় বংশীয়েরাই স্থানের পাটওয়ারি ছিলেন। কায়স্থ পুরকায়স্থগণ বলেন যে তাঁহারাই এ স্থানের আদি অধিবাসী; পক্ষান্তরে সাহু পুরকায়স্থগণ বলেন যে তাঁহারা আগন্তুক হইলেও অতি পুরাতন পুরকায়স্থ। কেননা তাঁহারা ইটার রাজা সুবিধ নারায়ণের কর্ম্মচারী গোবিন্দ পুরকায়স্থের বংশোদ্ভব;[৬] এবং ইন্দানগর হইতে আগত। এই উভয় বংশীয়গণই তত্রত্য কার্ত্তিক দাস আদি পুরুষের যে বংশধর এ স্থানে আগমন করেন,

৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২ ভাগ ২খণ্ড ৭ম অধ্যায় দেখ। এবংশের একশাখা ইন্দানগরে আছেন।

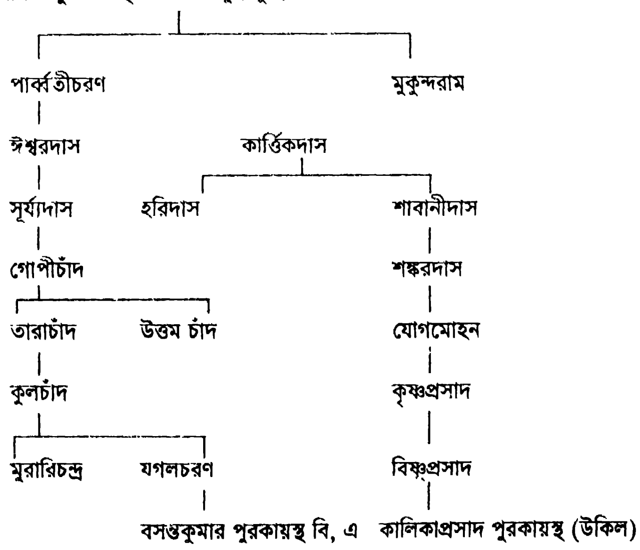
তাঁহার পৌত্রের পার্ব্বতী চরণ ও মুকুন্দরাম নামে দুই পুত্র হয়, মুকুন্দরামের পুত্র কার্ত্তিক দাস, ইঁহার নামেই তত্রত্য "কার্ত্তিকদাস" মৌজার নাম হয়। এই কার্ত্তিক দাসের পুত্র হরিদাস এ স্থানের ১নং পাটওয়ারি বা পুরকায়স্থ দস্তখত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পার্ব্বর্তী চরণের পুত্র ঈশ্বর দাস, তৎপুত্র সূর্য্যদাসের নামেও তত্রত্য "সূর্য্যদাস" মৌজার নাম হয়।[৭] যে বংশের দুইজন ব্যক্তির নামে দুইটি মৌজার নাম হইতে পারে, তাঁহারা নবাগত হইলেও ক্ষমতাবান ছিলেন সন্দেহ নাই।

পক্ষান্তরে কায়স্থ পুরকায়স্থ বংশীয় কালীচরণ পুরকায়স্থের নামে তত্রত্য প্রসিদ্ধ কালীগঞ্জের বাজারের নাম হইয়াছে। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ গণেশদাস পুরকায়স্থ। তৎপরবর্ত্তী রূপাদেব, শ্যামরাম ও মোহনরাম পুরকায়স্থের নামে দশসনা তালুক আছে। সাহু পুরকায়স্থ বংশীয় গোপীচাঁদের নামে তত্রত্য ৪নং তালুক বন্দোবস্ত হয়। (এগারশতী ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত তালুকের অধিকারী মোসলমান চৌধুরী বংশ।) ফলতঃ এই উভয় বংশই সম্মানিত। কাছাড়ের রেভিনিউ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বৈষ্ণব চরণ দে পুরকায়স্থ হইতে আমরা তদীয় বংশ বিবরণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়াছি। এবং শ্রীযুত বসন্ত কুমার পুরকায়স্থও আবশ্যক সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বড়লিখা–সেনাপতি বংশ

বড়লিখার দাসজাতীয় সেনাপতি বংশও একটি প্রাচীন বংশ। কথিত আছে যে এক সময় জয়ন্তীয়াপতি কাছাড় রাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া স্বপরিচিত রাঢ় দেশীয় জনৈক ভূমিপতির সাহায্য প্রার্থী হন। তিনি জয়ন্তীয়া পতির সাহায্যার্থ দাসজাতীয় লক্ষ্মণরায় সেনাপতির অধীনে তথায় লস্কর (সৈন্য) প্রেরণ করেন। ইঁহাদের আগমন বার্ত্তা প্রাপ্তে কাছাড়পতি জয়ন্তীয়ার সীমা ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। লক্ষ্মণরায় অতঃপর আর দেশে যান নাই; জয়ন্তীয়াপতির অনুরোধে তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার পুত্র রায়চাঁদের নাম জয়ন্তীয়াতে "রায় নগর" সমাজ স্থাপিত হয়। জয়ন্তীয়ায় নরহত্যাদি অত্যাচার দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া তিনি অনেক লোকজন সহ শ্রীহট্টের নবাবাধিকৃত আমুড়া নামক স্থানে চলিয়া আসেন, এবং নবাবের অনুগ্রহে ঢাকা উত্তর,

৭. ইন্দানগব হইতে এদেশাগত পুরকায়স্থের পৌত্রের দুই পুত্র, যথা–



চুড়খাই, চাপঘাট, বড়লিখা, ইয়াকুব নগর, পাথারিয়া প্রভৃতি চারিটি পরগণার নিষ্কর মিরাস শাসন করিতে থাকেন।

ইঁহার সুন্দর রায় নামে এক পুত্র ছিলেন; তাঁহার রামভদ্র, রাঘব, মদনরায় ও জোড়ারায় নামে বংশ প্রবর্ত্তক চারিপুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে মদনরায় ও জোড়ারায় বড়লিখার মিরাসদারিতে আগমন পূর্ব্বক এস্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

মদন রায়ের বিনন্দ, রাজেন্দ্র ও বিশ্বনাথ নামে তিনপুত্র হয়; জোড়ারায়ের একমাত্র পুত্রের নাম আনন্দরায়। বিনন্দ-আনন্দের যুক্ত নামাত্মক একটি তালুক আছে। রাজেন্দ্রের পুত্র যুগল কিশোর, তৎপুত্র নবকিশোর তাঁহার পুত্র নবীনচন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীযুত নরেন্দ্র কুমার রায় বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের বাসস্থান "সেনাপতিরচক" নামে খ্যাত। শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র দাস মহাশয় এই বংশ বিচরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়
বড়লিখার পুরকায়স্থ কথা এবং প্রতাপগড়ের বিবরণ

বড়লিখা

শ্রীহট্টে আগমন

বড়লিখার যে পুরকায়স্থ বংশ বিবরণ এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের আদিবাস অন্যত্র ছিল। যে বংশে শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ সদাগর জোড়ারায় ও দুর্ল্লভ দাস জন্মগ্রহণ করেন, যাহার পুত্র হুকমত রায়ের নামে শ্রীহট্টের ত্রয়োদশটি বৃহত্তম তালুকের উৎপত্তি হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদের এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ যাঁহার বদান্যতায় প্রশমিত হইয়াছিল এবং শ্রীহট্টের নবাবি প্রদত্ত হইলেও যিনি উদারতা গুণে[১] অন্যকে সে মহিমান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে আরও মহিমান্বিত হইয়া গিয়াছেন, তিনি এই বংশেই উদ্ভূত হন।[২]

দুল্লভদাসের পূর্ব্বপুরুষ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার নাম রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ দাস। তিনি কোন রাজবংশীয় ছিলেন, অথবা রাজবংশীয় না হইয়া থাকিলে, তাঁহার নামের সহিত "রাজা" শব্দ থাকার সার্থকতা কি ছিল, তাহা জানা যায় না। তাঁহার আদি বাস গৌড়দেশে ছিল, কোন কারণে তথা হইতে শ্রীহট্টের পলডহর পরগণায় আগমন করিয়া এই স্থানে অধিকার স্থাপন করেন। এই স্থান তৎকালে হেড়ম্ব রাজ্যে অন্তর্গত ছিল, হেড়ম্বেশ্বরের অনুমতি ব্যতীত তদীয় রাজ্যসীমা মধ্যে অধিকার স্থাপন করায়, তিনি হেড়ম্ব রাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন ও পলায়ন পূর্ব্বক জয়ন্তীয়াপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়ন্তীয়াপতি সমাদরের সহিত অতিথিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই স্থানেই কিছুদিনান্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার পুত্রের নাম মোহনরাম দাস। তিনি জয়ন্তীয়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্ট শহরে আগমন করেন, ও শ্রীহট্টীয় কোন সম্ভ্রমশীল সাহু তনয়ার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি পং ফুরকাবাদের অন্তর্গত আমুড়া গ্রামে আগমন করেন। ইঁহার দুই পুত্র, তাঁহাদের নাম জোড়ারায় ও দুর্ল্লভদাস।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে (২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়) নবাব হরকৃষ্ণ দাসের নবাবি প্রাপ্তি সম্বন্ধে কথা শ্রুত ছিলাম। আমাদের জনৈক সম্ভ্রান্ত বিবরণ প্রদাতাও তাহাই লিখিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত কোন শ্রদ্ধাষ্পদ বন্ধুর নোট হইতেও-'Hukmat Roy, Marchant of Sylhet, got Nawabship of Sylhet.' ইত্যাদি সংবাদ জানিতে পারি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের দৌহিত্র বংশীয়গণ প্রামাণ্য ও প্রাচীন কাগজ অবলম্বনে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জোড়ারায়েরই নবাবি প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে।

হুকমত রায়ের ক্ষমতা অসামান্য ছিল, তিনিই ইটার শ্যামরায়ের দেওয়ানী প্রাপ্তির মূল। তাঁহার এই কীর্ত্তিই বোধ হয় জোড়ারায়ের কীর্ত্তি আচ্ছাদিত করিবার কারণ হইয়াছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৯ম অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

জোড়ারায় ও দুর্ল্লভদাস

জোড়ারায় ও দুর্ল্লভদাস পিতৃ অর্জ্জিত সামান্য অর্থই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদ্যোগী পুরুষ কি না করিতে পারে? উদ্যোগী পুরুষের দ্বারে লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন, ইঁহারা তাহার উদাহরণ এ জিলায় সুন্দর রূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সামান্য অর্থ লইয়া সততার সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, জোড়ারায় ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বণিগ্বৃত্তি অবলম্বনে অচিরকাল মধ্যেই শ্রীহট্টের মধ্যে তিনি বিখ্যাত ধনী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি ধনের সদ্ব্যবহার করিতেন, তাঁহার দাতৃত্বে সর্ব্বসাধারণ যেমন উপকৃত হইত, রাজশক্তিও তেমনি নানা বিষয়ে তাঁহার সহায়তা গ্রহণ না করিয়া পারিতেন না। এমন কি, মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহার যোগ্যতাদৃষ্টে এবং তদত্ত দুষ্প্রাপ্য উপহার রাজি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে শ্রীহট্টের নবাবি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।[৩] বৃহত্তম পলওয়ার নৌকাযোগে দূরবর্ত্তী প্রদেশে বাণিজ্য ব্যপদেশে তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হইত, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্য সম্বন্ধে গ্রাম্যগীত এখনও এ অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়।[৪] ইঁহার পুত্র রাধাকৃষ্ণ রায় নিঃসন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হন; সুতরাং জোড়ারায়ের বংশ নাই।

দুর্ল্লভদাস অর্জ্জিত ধনের দ্বারা প্রভূত ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং শ্রীহট্টের অন্যতম প্রধান ভূম্যধিকারী রূপে গণ্য হন। একদা কোন মহালের রাজস্ব দান কালে, দেওয়ান মাণিক চাঁদের সুকৌশলে সেই মহাল তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে এক বৃহৎ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।[৫] পলডর, বড়লিখা, রাতাবাড়ী, ভাঙ্গা, গোলাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বহুতর কাছারী ছিল; তন্মধ্যে বড়লিখাতেই তিনি অধিক সময় বাস করিতেন বলিয়া ইহা তাঁহার আবাসস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এই বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘিকা অদ্যাপি দুর্ল্লভদাসের নাম ঘোষণা করিতেছে। তদ্ব্যতীত তাঁহার কৃত দুবাঘ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন দীঘীগুলি এখনও "দুলভ দাসী দীঘী" নামে খ্যাত আছে। ঢাকাদক্ষিণস্থ ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী কাকিছড়ার উপরিস্থিত জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত সেতুটিও তাঁহার কৃত এবং "দুলভ দাসী পুল" নামে খ্যাত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন কাছারীতে দেবতা স্থাপন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। একবার অতি আড়ম্বরের সহিত তিনি শ্রীহট্টের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত নৌকাপূজা সম্পাদন করেন। এই নৌকা পূজায় তিনি সুবর্ণ নির্ম্মিত দশ সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণ বি-দল ব্যতীত উপস্থিত বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের প্রত্যেককেই স্বর্ণ উপবীত প্রদান করা হয়।[৬] ঢাকাদক্ষিণের শ্রীমহাপ্রভু বিগ্রহকে তিনি প্রভুত উপহারের সহিত প্রতিবৎসর স্বর্ণ-উপবীত ও স্বর্ণ নির্ম্মিত মোহন মালা নিয়মিত রূপে প্রদান

৩. জোড়া রায় যে নবাবি পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে "A short History of the Purkaistha Family" নামক কাগজে লিখিত আছে– "He was noted for his public spirit and magnanimity and received the title of Nawab."

৪. "ধনি্য জোড়াবায়,
বৈঠার আগে ঘুঙ্গুর দিয়া,
পলওয়ার দৌড়ায়।" –ইতি সারিগণ।

৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায়ের এক ফুট নোটে উদ্ধৃত একখানা ইংরেজী রিপোর্টে এই মোকদ্দমার উল্লেখ আছে, তাহা এতদুপলক্ষে দ্রষ্টব্য।

৬. দুর্ল্লভদাসের এ সমস্ত পুণ্যজনক কার্য্যমূলে "কুলের প্রদীপদুলভদাস" ইতি বাক্যের উৎপত্তি হয়। এ অঞ্চলে কোন বংশের মধ্যে কেহ বিখ্যাত হইলে সে "কুলের প্রদীপ দুলভদাস" হইয়া বলিয়া এখনও গ্রাম্য লোকে বলিয়া থাকে। স্থল বিশেষে অন্য ভাবার্থেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে, কোন দোষীর দোষের প্রতিবাদ বা প্রতীকার না হইলেও বলা হয় যে, তিনি "কুলের প্রদীপ দুলভদস" না কি?

করিতেন।[৭]

দুর্ল্লভ দাসের আর একটি কার্য্য ভৃত্য বা ভাণ্ডারী সংগ্রহ। নৌকা পূজার প্রাক্কালে তিনি অনেক ভৃত্য একত্রিত করেন, এক রাত্র মধ্যে এই সংগৃহীত ভৃত্যদের মধ্যে ১০৮টি বিবাহ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই ভাণ্ডরিগণ "দুর্ল্লভ দাসী ভাণ্ডারী" নামে খ্যাত আছে।

শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে তাঁহার লবণের "একচেটিয়া" ব্যবসায় ছিল, তাঁহার কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ লবণের কারবার করিতে পারিত না। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন, অদ্যাপি "দুলভদাসী ধন" বলিয়া সেই ধনের প্রবাদ আছে।[৮] তাঁহার দাতৃত্বাদি গুণে মোহিত হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে "মোনশফদার" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার দুই পুত্র, ইঁহাদের নাম হুকমত রায় ও সাহেব রায়।

হুকমত রায় ও সাহেব রায়

হুকম রায়ের নামোল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে। হুকমত রায় অশেষ গুণসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতার মত দাতা ও জনহিতকারী ছিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে অকাল উপস্থিত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তখন তাঁহার দাতৃত্বে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার ভ্রাতা সাহেব রায়ের তত্ত্বাবধানে সেই বিতরণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। হুকমত রায়ের এই এই দেশ হিতকর পবিত্র কার্য্যের পুরষ্কার স্বরূপ রাজানুগ্রহে নিজ অধিকর মধ্যে তিনি একরূপ স্বাধীনতা লাভ করেন, তিনি নিজ প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বপ্রকার বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; বিচার প্রাপ্তির জন্য এবং অপরাধের দণ্ডভোগ জন্য তাহাদিগকে কাজি প্রভৃতি অপর বিচারকের আদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না।[৯] তাঁহার ভ্রাতা সাহেব রায়কে নবাব "রাজাজী" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

হুকমত রায় এইরূপে এক অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী শক্তিরূপে গণ্য হইলেও পৈতৃক ব্যবসায়ে তাঁহার অনুৎসাহ ছিল না; তবে মুর্শিদাবাদের নবাবের অনুগ্রহে এইরূপ "নবাবি" পাইলে, বাণিজ্যাপেক্ষা দেশে সুশাসন বিস্তারেই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

হুকমত রায়ের অর্থ সম্বন্ধে নানাবিধ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। তাঁহার মাতা, বাণিজ্যাপেক্ষা দেশ শাসনাদিতে পুত্রের আশক্তি দর্শনে পুত্র ধন সংরক্ষণে সক্ষম কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়ান্বিতা হইয়া, প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিবার ইচ্ছায়, তাঁহার "কত অর্থ আছে" তাহা দেখিতে চাহেন।

হুকমত রায় তখন ভিন্ন স্থানের কাছারীর কর্ম্মচারিদিগকে এবং বিভিন্ন গদীর তত্ত্বাবধায়ককে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে অর্থরাশি গৃহে আনিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে এক ত্রয়োদশী তিথিতে সমস্ত অর্থ আনীত হয়।

---

৭ ঢাকাদক্ষিণের মিশ্রবংশীয়গণ কর্ত্তৃক ১১৬৬ বাং ১১ই আষাঢ় তারিখের সম্পাদিত "সময় করার পত্র" নামক দলিলে ইহার উল্লেখ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে টীকায় এই দলিল উদ্ধৃত হইয়াছে।

৮. ধনের আধিক্য জ্ঞাপনার্থ যেমন "কুবেরের ধন", "যক্ষের ধন" ইত্যাদি কথা আছে। তদ্রুপ এ অঞ্চলে "দুলভদাসী ধন" কথাটিও কোন কোন স্থলে বলা হইয়া থাকে।

৯ "He rendered to Government granted him a Sanad vesting him with the powers of sole Governor of the people in his jurisdiction."
A short History of the Purkayashta Family.
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের ১ম পাদ টীকায় ইঁহার নবাবি প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আলোচ্য।

সন্ধ্যার পর অঙ্গনে এক বিস্তৃত চন্দ্রাতপ তলে লণ্ঠনাদির আলোতে অর্থ প্রদর্শিত হইল। তদীয় মাতা পরিবারের স্ত্রীলোক সহ গৃহের বারান্দায় যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইলেন। সুদীর্ঘকায় হুকমত রায় সেই রাশীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অপর পার্শ্বে দণ্ডয়মান হইয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন কিনা, জননীকে জিজ্ঞাসিলে। মা বলিলেন, "বাপ, আমার সাধ মিটিয়াছে, টাকা আর দেখিতে চাহি না, এদিকে আস, তোমার চাঁদমুখ দেখিব।"

হুকমত রায়ের জমিদারী বহু বিস্তৃত ছিল, অপর মহাল ব্যতীতই, (উত্তর শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্টের) ষোলটি পরগণায় নিজ নামীয় ১৩টি, পিতৃ নামীয় ৯টি এবং জ্যেষ্ঠতাত নামীয় ২টি, এই ২৪টি তালুক তাঁহাদের প্রভুত্বের নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি তাঁহাদের নামে আখ্যাত হইতেছে।[১০]

দশসনা বন্দোবস্তের বহুপূর্ব্বে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, বন্দোবস্তের সময় পরবর্ত্তী দ্বারা সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নামেও তালুকের নামকরণ হইয়াছিল, ইহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী কথা

হুকমত রায়ের একমাত্র পুত্রের নাম লবকৃষ্ণ রায়। সাহেব রায়ের পুত্র দুইজন ছিলেন, তাঁহাদের নাম শরৎচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র। এ সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে, প্রাণপাত পূর্ব্বক লোকে যে ধন অর্জ্জন করে, তাহারও ঐ অবস্থা। কিন্তু এই অস্থায়ী ধনের সদ্ব্যবহারে সৎকার্য্য সম্পাদিত হইলে, তাহাতে যে কেবল পরোপকার ও দাতার কীর্ত্তিমাত্র ঘোষিত হয় তাহা নহে, ঐ কার্য্যটি সুদূরকাল ব্যবধানে উদাহরণরূপে দণ্ডায়মান হইয়া পরবর্ত্তীকে প্রোৎসাহিত ও জনহিতে নিয়োজিত করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যের ক্ষণস্থায়িত্বের দৃষ্টান্ত হুকমত রায়ের মৃত্যুর পরেই তদ্বংশীয়গণ বিলক্ষণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন।

লবকৃষ্ণের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, সম্পত্তি সংরক্ষণের বুদ্ধিও ছিল না; এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটে, তাহাই হইল; বহু সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। হস্তচ্যুত এ সম্পত্তির উদ্ধারার্থ বৃথা বহু সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। হস্তচ্যুত ঐ সম্পত্তির উদ্ধারার্থ বৃথা বাহুল্য ব্যয়ে নগদ বিত্ত নষ্ট হইয়া গেল। ধনীর সন্তান এইরূপ দীনদশায় হঠাৎ পতিত হইয়া পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়লিখাস্থিত কাছারীতে আগমন পূর্ব্বক ইহাকেই বাসবাটিরূপে পরিগণিত করিলেন।

মনোভঙ্গে লবকিশোরের মৃত্যু হইল, গৌরচরণেরও মৃত্যু ঘটিল; শরচ্চন্দ্র ম্রিয়মাণ হইয়া ম্লানভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর মৃতাবশিষ্ট শরচ্চন্দ্রকে গবর্ণমেণ্ট পাটওয়ারি পদ প্রদান করেন; ইহাতে এই ধনী সন্তানের ভরণ-পোষণের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য হইত। পাটওয়ারিগণ পুরকায়স্থ পদবি ধারণের অধিকারী ছিলেন, পূর্ব্বেও বলা গিয়াছে।

---

১০. এই তালুকগুলির নাম, নম্বর এবং যে যে পরগণায় উহা অবস্থিত, তাহার কথা নিম্নে লিখিত হইলঃ–

১. জোড়ারায় নামীয় তালুক–পং ইটা, নং ৪২৯; পং ঢাকাউত্তর, নং ১৫৭।

২. দুর্ল্লভদাস নামীয় তালুক–পং ছোটলিখা, নং ১১৮; পং বড়লিখা, নং ৪৫; পং ফুরকাবাদ, নং ২৪২; পং ঢাকাদক্ষিণ, নং ৪২৭ এবং ৪৮৯; পং মোহাম্মদপুর, নং ২২; পং চাপঘাট, নং ১৮২; পং পঞ্চখণ্ড, নং ৫২৫; পং পলডর নং ১।

৩. হুকমতরায় নামীয় তালুক–পং বড়লিখা, নং ৩৩; পং ইয়াকুব নগর, নং ২১; পং দুবাগ, নং ১; পং চাপঘাট, নং ১৫৯১, ১৫৫৫, ১৫৫৯; পং-কুশিয়ার কুর, নং ৩০৯, পং এগারশতী, নং ২১১ এবং ২৩৫; পং ডেওয়াদি, নং ২০৯; পং ঢাকাদক্ষিণ, নং ৩৯৫ এবং ৪৭১; পং নারাপিং, নং ১০৯; মোট ২৪টি।

এতন্মধ্যে পং ফুরকাবাদের "তাং দুর্ল্লভদাস" নিষ্কর তালুক।

শরচ্চন্দ্রের পুত্রসন্তান হয় নাই; মনুদাসী নাম্নী একমাত্র তনয়াকে সদানন্দ রাহা নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দেন। এই সদানন্দই শ্বশুরের পুরকায়স্থি সনন্দ ও সম্পত্তির অধিকারী হন। সদানন্দের পুত্র স্বর্গীয় গোলকচন্দ্র রায় পুরকায়স্থ কয়েক বৎসর যাবৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নবকুমার রায় পুরকায়স্থ হইতে আমরা এই বংশবিবরণ সঙ্কলন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

প্রতাপগড়ের আধুনিক বিবরণ

প্রতাপগড়ের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে বলা গিয়াছে; ইংরেজ আমলের অনেক সংবাদও সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা প্রতাপগড়ের ভূসংক্রান্ত আরও কিছু বিবরণ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছি। এই বৃত্তান্তটি পূর্ব্বাংশে সংযোজন-যোগ্য হইলেও একটি বংশ বৃত্তান্তের সহিত জড়িত থাকায় এ খণ্ডেই প্রদত্ত হইল।

করিমগঞ্জ সবডিভিসনে পাথারকান্দি, তহশীল আফিস, সবরেজিস্টরী আফিস, থানা, কম্বাইণ্ড পোষ্ট আফিস, সরকারি ডাক্তারখানা, স্কুল, বাজার ইত্যাদি সহ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। প্রতাপগড়ে গবর্ণমেন্টের অনেক এলাম ভূমি আছে এবং তাহাতেই এস্থানে তহশীল আফিস স্থাপিত হয়।

প্রতাপগড়ে যেরূপে এলাম ভূমের উৎপত্তি হয়, তদ্বিবরণ সাধারণের সুখপাঠ্য নহে ইঁহার পরে (হস্তাবোধের) প্রাক্কালে এই সকল তালুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৭৩টি তালুকের ভূমি অধিকারিগণ চিহ্নিত করিয়া লন; এগুলি ভিন্ন অবশিষ্ট বৃহত্তম ৭টি তালুক হইতেও তদধিকারিরা অনেক ভূমি পরিমাপিত করিয়া চিহ্নিত করেন, উক্ত চতুঃসীমাবদ্ধ অংশ বাদে উক্ত ৭টি বৃহত্তম তালুকের অবশিষ্ট ভূমি পরস্পর মিশ্রিত থাকায় "বাবান" রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।[১১]

"এলাম" কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে[১২] তাহা বলিয়াছি। এলাম ভূমি নিরূপণার্থ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত পাটওয়ারিগণ তৎকালে প্রতাপগড়ে অনেক ভূমি বন্দোবস্তের বহির্ভূত আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; এই অতিরিক্ত ভূমিই প্রতাপগড়ের "এলাম"।

প্রতাপগড়ের জঙ্গলের প্রতিবন্ধকে পূর্ব্বোক্ত সাতটি দশসনা তালুকের অধিকাংশ ভূমি যেরূপ পরিমাপিত ও চিহ্নিত হইতে পারে নাই, নবনির্দ্দেশিত এই এলাম ভূমের দশাও তদ্রূপ হইল; পাটওয়ারিগণ ইহারও সীমাদি নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্বোক্ত দশসনা তালুক সহ উক্ত এলাম ভূমি মিশ্রিত ভাবে আছে বলিয়া মৌজাওয়ারি দাখিল করিলেন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দশসনা "ববান তালুক" আরও জটিল হইয়া উঠিল;—গবর্ণমেন্টের খাস ও মিরাসদারবর্গের দশসনাতে মিশামিশি হইয়া পড়িল। মিরাসদারবর্গের এজমালি তালুকগুলি ববান মহাল নামে খ্যাত ছিল, তৎসহ মিশ্রিত এই এলাম সংসৃষ্ট অংশই "রসদ ববান" নামে খ্যাত হইল।

পাটওয়ারিগণের প্রদত্ত মৌজাওয়ারিতে এবং হস্তবোধের কাগজে, ববান তালুকের ভূমি

---

১১. ৭৩টি ক্ষুদ্র তালুকের অচিহ্নিত ভূমির পরিমাণ ৩৪। ১ ৪ ছিল, তাহা চিহ্নিত করিয়া লইলে, বাকি বৃহত্তম ৭টি তালুকের চিহ্নিত ভূমি বাদে অচিহ্নিত ববান ভূমের পরিমাণ মোট ৩৫৩৬---হাল হয়। উক্ত ৭ তালুকের নামঃ-১নং কর মাং, ৯নং ছাচিয়া কাছিম, ১৬নং নজর মাং, ৩৩নং গোলাম আলী, ৩৪নং গোলাম রজা, ৫৩নং সাকির মাং, ৫৫নং মাং মুলাইম।

১২. শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।

নির্দ্দেশ উপলক্ষে "সোয়াই নীলাম ও খাস ও খারিজ দাখিল তালুকাত নজর আন্দা" এইরূপ বিশিষ্ট বাক্যাবলী (terms) হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রতাপগড়ের জমিদারবর্গ প্রথমে মোসলমান ছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ পূর্ব্বাংশে বলা গিয়াছে। কালক্রমে তাঁহাদের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে, তাঁহাদের তাবৎ সম্পত্তি জফরগড়ের অন্যতম ভূম্যধিকারী হিন্দু চৌধুরীদের হস্তগত হয়। প্রতাপগড়ের ভূমি কি সূত্রে তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল, ঐ বিশিষ্ট বাক্যাবলী তাহার ইতিহাস বহন করিতেছে।

বংশাখ্যান ও সংজ্ঞা সমূহের অর্থ

প্রতাপগড়ের বিবরণোপলক্ষে পূর্ব্বে[১৩] ঘিলাছড়াগত পাটওয়ারি বংশজ বিনন্দরাম দেবের কনিষ্ঠ পুত্র[১৪] হরিদাস ও তৎপুত্র কানুরামের কাহিনী কীর্ত্তন করা হইয়াছে, ইনিই স্বয়ং চৌধুরাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানুরামের তিন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কেশবরাম, মণিরাম ও শঙ্কররাম। কেশবরাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও কানুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

কেশবরামের পুত্র হুলাসরাম ও আকুতরাম; মণিরামের পুত্র মায়ারাম ও মাণিক্যরাম এবং শঙ্কররামের পুত্রের নাম ব্রজুরাম। কানুরামের পুত্র ফকিরচন্দ্র ও গৌরীচন্দ্র, ইঁহার নামোল্লেখ পূর্ব্বাংশে করিয়াছি।[১৫]

ইঁহারা প্রত্যেকেই ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন, ইঁহাদের কৃতিত্বে জফরগড় পরগণার কিয়দংশ এবং দস্তখতাদি সহ সমগ্র প্রতাপগড় পরগণা তাঁহাদের জমিদারী ভুক্ত হয়।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে যখন প্রতাপগড়ের মোসলমান জমিদারদের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন রাজস্ব বাকিতে তত্রত্য ১নং এবং ৫৩নং তালুকদ্বয় নীলাম হইয়া যায়, কেশবরামের পুত্র হুসালরাম এবং মণিরাম যথাক্রমে দুইটি তালুক ক্রয় করেন (১২০৬ বাংলা); নীলামে বিক্রয় হইয়াছিল বলিয়া তালুকদ্বয় কালেক্টরীর কাগজপত্রে তদবধি "নীলাম তাং" নামে খ্যাত হয়।

প্রতাপগড়ের ৯নং এবং ১৬নং তালকদ্বয়ও এইরূপই রাজস্ব বাকিতে নীলাম হয়, কিন্তু এই তালুকদ্বয়ের জন্য কোন ক্রেতা উপস্থিত না হওয়ায়, উহা গবর্ণমেন্টের খাস (স্বত্ব) গণ্য হয়। শ্রীহট্টের কালেক্টর এই সংবাদ রেভিনিউ বোর্ডে জ্ঞাপন করিলে, ঐ তালুকদ্বয় পূর্ব্ব জমাতে যে কোন প্রার্থীকে বন্দোবস্ত দিতে বোর্ড আদেশ দেন; তদনুসারে মণিরাম নিজপুত্র মায়ারাম ও মাণিক্য রামের নামে তাহা বন্দোবস্ত আনেন।[১৬] তদবধি এই তালুকদ্বয় "খাস তালুক" নামে খ্যাত হয়।

৩৩নং, ৩৪নং ও ৫৫নং তালুক ত্রয় অভাব বশতঃ পূর্ব্ব অধিকারিগণ বিক্রয় করেন। ৩৩নং ও ৩৪নং তালুকদ্বয় কানুরাম চৌধুরী ১৭৯৯/১৮০০ খৃষ্টাব্দে ক্রয় করেন এবং পরবর্ষেই "ইন্তিকালি" (নামজারি) করিয়া, কালেক্টরীতে পূর্ব্বমালিকের নাম "খারিজ" করতঃ নিজ নামে

১৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ১১শ অধ্যায় দেখ।

১৪. বিনন্দ রামের জ্যেষ্ঠপুত্র সোণা রামের বংশধরবর্গ এখনও ঘিলাছড়া বাসী।

১৫. কানু রামের সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি চিন্তিত থাকিতেন, তদ্দৃষ্টে জনৈক ফকির একটা কদলিফল তাঁহার স্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে দেন। এই ফল ভক্ষণে পুত্র হওয়ায় ফকিরের নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হয়।

১৬. ৯নং তালুকটি শ্রীহট্টের স্বনামধন্য "বাবু মুরারি চাঁদ", বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতেই মৈনার চৌধুরীবর্গ পরে আনয়ন করেন।

"দাখিল" করেন। ৫৫নং তালুকটিও এইরূপই শ্রীহট্টের "বাবু মুরারি চাঁদ" ক্রয় করতঃ খারিজ দাখিল করেন। কিন্তু ঐ তালুকটি পরে তাহা হইতে চৌধুরীরা ক্রয় করিয়া আনেন। তদবধি এই তালুকাত "খারিজ দাখিল" নামে খ্যাত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "মৌজাওয়ারি" কাগজে "সোয়াই নীলাম" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছিল। "সোয়াই" (বাদে) শব্দ থাকায় জানা যায় যে সেই কাগজে যে পরিমিত ভূমির উল্লেখ আছে, তাহা "নীলাম ও খাস ও খারিজ দাখিল" সংজ্ঞক উপরোক্ত ৭টি সুবৃহৎ তালুকের অন্তর্গত নহে। এবং "নজর আন্দাজ" অর্থাৎ দৃষ্টির সাহায্যে আনুমানিকরূপে উহার ভূ-পরিমাণ লিখিত হইয়াছে।

প্রতাপগড়ে এতদবশিষ্ট যে দশসনা ভূমি ছিল, ইহার পরে হালাবাদি জরিপান্তে তৎসমস্ত সম্পত্তিও চৌধুরীদের করায়ত্ত হয়।

প্রতাপগড়ের পূর্ব্ব ভূম্যধিকারিগণ দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী কুকি সর্দ্দারদিগকে বাৎসরিক একটা "নজর" দিতেন। এই সময়ে সেই প্রথামতে ইঁহাদিগকেও কুকি সর্দ্দারদের "নজর" যুগাইতে হইত। পরে ঘটনা ক্রমে এই বাৎসরিক নজর প্রেরণ বন্ধ হয়।

কুকিরাজের নজর গ্রহণ

একদা চৌধুরীরা তাঁহাদের জনৈক মোহরের দ্বারা নজর প্রেরণ করেন; নজরের দ্রব্যমধ্যে কয়েকটা কুক্কুর, কয়েক সের শুষ্ক মৎস্য ও চিনি, অর্দ্ধমণ পরিমিত লবণ এবং কয়েক সের সাদা তামাকই প্রধান ছিল। দ্বিভাষী সহ মোহরের নজর উপস্থিত করিলে, রাজা ও রাণী "পুঞ্জির" (পাড়ার) লোকদিগকে "ঘৃণ" বাদ্যে আহ্বান করিয়া, উভয়ে একাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উপহার গ্রহণ করিলেন। রাজা ও রাণী লবণ মাত্র রাখিয়া অপর দ্রব্য বিলাইয়া দিলেন। কুকিগণ উৎকট উল্লম্ফন নৃত্যে চিনি মুখে লইয়া ফুৎকার সহকারে তাহা একে অন্যের উপর ফেলিতে লাগিল! চিনির এই সদ্ব্যবহার দৃষ্টে মোহরেরটি বিস্মিত না হইলেও, তাহাদের উন্মত্ত উল্লম্ফন হুঙ্কারে আতঙ্কিত হইয়াছিল। তাহার পর ইন্দুর ও বৃহৎ ভেক ইত্যাদির বিচিত্র "সিধা" পাইলে, মোহরের রন্ধনের উপলক্ষে পলাইয়া আসিয়াছিল।

ইহা হইতে উলঙ্গ লুশাইদের বিচিত্র ব্যবহারের বর্ণনা শুনিয়া ও সিধার সংবাদ পাইয়া পরবর্ষে কেহই উপহার লইয়া যাইতে স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপে উপহার দেওয়া বন্ধ হইলে, কুকিগণ ক্ষেপিয়া তৎপ্রতিশোধ মানসে ১২৩৩ সালে প্রতাপগড়ের কয়েকটি কাঠুরিয়াকে পর্ব্বত মধ্যে নিহত করে। ইহাই কুকিদের শ্রীহট্ট জিলায় সর্ব্বপ্রথম উৎপাতের সংবাদ।[১৭]

ইহার পর হইতেই কুকিরা লোকের উপর উৎপাত করিতে আরম্ভ করে; যত বারই তাহারা প্রতাপগড় দিয়া আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতিকারার্থ যত্ন করিয়াছেন, ততবারই এই চৌধুরী বংশীয়গণ রসদাদি যুগাইয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছেন। (সে সকল আক্রমণ সংবাদ পূর্ব্বাংশে বলা গিয়াছে।)

---

১৭. সরকারী ইতিহাসে এই কাঠুরিয়া হত্যার সংবাদটি মাত্র আছে; কিন্তু কি কারণ বশতঃ কুকিরা ক্ষেপিয়াছিল, জমিদারদের উপহার প্রেরণ কেন বন্ধ হইয়াছিল, ইত্যাদি বিবরণ তাহাতে নাই। এই কাঠুরিয়া হত্যার অনুসন্ধান জন্য গবর্ণমেণ্ট লোক পাঠাইলে, কুকিরা ধরিয়া রাখে; গবর্ণমেণ্ট টাকা দিয়া সেই লোক মুক্ত করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশের ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ২য় অধ্যায় এই কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত বিবরণ

পূর্ব্বোক্ত কেশব রামের পুত্র হুলাস রাম অতিশয় শ্রীমান পুরুষ ছিলেন, দক্ষিণ পর্ব্বতে ত্রিপুরাধিপতির জনৈক কুটুম্ব-কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার দেখা হয়, তিনি ইঁহাকে অবিবাহিতা জনৈকা রাজকন্যার যোগ্য বর মনোনীত করিয়া রাজধানীতে লইয়া যান। কৃতদার হুলাসরাম বিবাহে অসম্মত হইলে তাঁহাকে তথায় বহুদিন আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; পরে যখন দুর্গোৎসবের আনন্দ কোলাহলে রাজধানী মুখরিত হইয়া উঠে, যখন তিনি মুক্তি কামনায় ও স্বগৃহে দেবীপূজার কথা স্মরণে ক্রন্দন করিতে থাকেন, দেবী-কৃপায় তখন তিনি মুক্ত হন; তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা আকুতরাম অতি বদান্য ছিলেন। পাণিশালীর আখড়াবাসী কোন বৈষ্ণব ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন, ইঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাঁহাতে চারিসহস্র টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি দান করেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। প্রতাপগড়ের ফরিদকোণা নিবাসী মুরাদ মোহাম্মদ নামক ব্যক্তি এ অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম হজব্রত উদযাপন করিয়া আসিলে, লোকের ধর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহাকে প্রায় এক হাল পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই সকল ভূমি ব্যতীত এই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মত্র এবং সন্নিকটবর্ত্তী কানাইলাল দেবতার দেবত্র অদ্যাপি তাঁহাকে দাতৃত্বের প্রমাণ দিতেছে। আকুতরাম বহু অর্থ ব্যয়ে ও ক্লেশে নৌকাযোগে একবার বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসেন; গমনাগমনে তাঁহার আট মাস কাল লাগিয়াছিল।

মায়ারাম ও মাণিক্যরাম ভ্রাতৃদ্বয় অতি প্রতাপান্বিত ছিলেন, ইঁহাদের শাসন ভয়ে দেশে কেহই কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারিত না। দেশে চোরের উপদ্রবের নামও ছিল না; রাত্রে ঘরে দোয়ার খোলা রাখিয়া নিরুদ্বেগে সকলে নিদ্রা যাইবে, এই কথা তাঁহার' প্রচার ও তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারাও প্রায় সহস্র মুদ্রা মূল্যের ব্রহ্মত্র দান করিয়াছিলেন। মাণিক্যরাম ঢাল, তলওয়ার ও বল্লম লইয়া বাড়ী হইতে প্রতাপগড়ের কাছারীতে যাইতেন, বীরবেশে সজ্জিত থাকিতে ভালবাসিতেন। সিঙ্গিছড়া নামক একটি ক্ষীণকায় পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর গতিপথ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া তিনি সাধারণের চাষী ভূমির উন্নতি বিধান করেন।

শঙ্কর রাম ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। যখন কানু রাম, ঠাকুর শান্ত রাম নামক বৈষ্ণবের ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগে মোহিত হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসেন,[১৮] যখন শান্ত রাম তথায় মধুর হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, ইনিই তখন আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবং তাহার পরেই স্বগৃহে বিশ্বম্ভর চন্দ্র স্থাপন করেন। বিশ্বম্ভরই এ বংশের কুলদেবতা।

মায়ারামের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুপ্রসাদ। চৌধুরী বংশে ইঁহারা অতি বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ কালেক্টরীর মহাফেজ ছিলেন। শহরে থাকার উপলক্ষে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। তিনি নানাগুণে এরূপ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যে; উক্ত পদটি তাঁহার দ্বারা অলংকৃত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল। তাঁহার দান-শৌণ্ডতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিনয়াদি গুণ-মুগ্ধ দুই একজন শহরবাসী প্রাচীনের মুখে বাল্যকালে আমরা তাঁহার কীর্ত্তিকথা গল্পের ন্যায় শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

একদা তিনি গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন, তথায় বিহারাধিপতির সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। তিনি বিহারাধিপতিকে শ্রীহট্টের নির্ম্মিত সুবর্ণ পুষ্প খচিত হস্তিদন্তের একটি বহুমূল্য পাটি উপহার প্রদান করেন। মহারাজও তাঁহাকে স্বর্ণনির্ম্মিত একটি কর্কট ও একটি পদ্মমুকুল এবং ঝালরযুক্ত এক বৃহৎ ছত্র[১৯] উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।

---

১৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ১১শ অধ্যায়ে এই বিষয় বলা হইয়াছে।

১৯. কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় ব্রজকিশোর চৌধুরী তাঁহার মৃত্যুর পর এই ছত্রসহ ৮০ টাকা মূল্যের একটা আতরদান জলডুবের ব্রাহ্মণ জমিদার তদীয়বন্ধু স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রদান করিয়াছিলেন।

গয়াতে তিনি একটা হস্তীদান করিয়াছিলেন, গয়ার পুরোহিতেরা অদ্যাপি একথা স্বরণ রাখিয়াছেন। ঢাকাদক্ষিণের ঠাকুরবাড়ীতে এবং মিশ্রবংশীয় কোন কোন ব্যক্তিকে নিয়মিতরূপে তিনি অর্থ দান করিতেন। এক ব্রাহ্মণ তনয় তাঁহার ব্যয়ে ন্যায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক "ন্যায়ভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

যখন এ অঞ্চলে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা কিছুমাত্র ছিল না, তখন তিনি নিজ গৃহে এক উচ্চ শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বৈষ্ণব লেখক "পদ্যপ্রসূণ" প্রণেতা স্বর্গীয় রাজীবলোচন দাস এবং "বিজয় মাধব নাটক" প্রণেতা, গীতচিন্তা মণির ব্যাখ্যাতা, করিমগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব স্বপ্রতিষ্ঠ মোক্তার শ্রীল কৃষ্ণচরণ দাস (কৃষ্ণপদ দাস) প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিদ্যালয়টি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, আমরাও শিশুকালে খেলা ছলে বিদ্যালয়ে গিয়া বসিতাম মনে আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী অপরিমিতি ব্যয়ী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পত্তির তদীয় অংশ নষ্ট হইয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট স্বত্বত্যাগে রসদ ববানের বৃদ্ধি

পূর্ব্বে রসদ ববানের উল্লেখ করা গিয়াছে, রসদ ববান গবর্ণমেণ্টেরই সংসৃষ্ট ভূমি। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর ভ্রাতার অভিপ্রায় ও তাঁহার উদ্দ্যোগে প্রতাপগড়ের ববান তালুকে তাঁহাদের যে অংশ ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হয়, ইহাতে প্রতাপগড়ে পূর্ব্বোক্ত রসদ ববানের প্রসার বৃদ্ধি পায় ও ইহা সাধারণের একটা আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠে।

এই কার্য্যটি তাঁহাদের স্বার্থমূলক এবং জ্ঞাতিগণের হানিকর ছিল সন্দেহ নাই। ববান তালুকে সকলেরই স্বত্ব থাকায়, কেহই তাহা ভোগ দখল করিতেন না। সেই বৃহৎ সম্পত্তি ইঁহারা একা হস্তগত করার এক পন্থা করিলেন। ঐ ভূমি গবর্ণমেণ্টের এলাম প্রচারে তাঁহারা উহার পাট্টা দিতে বিরত হন; তখন ইঁহারা এক এস্তেফানামা (ত্যাগ-পত্র) দাখিল ক্রমে ববান তালুকের নিজাংশ ছাড়িয়া স্বত্বত্যাগী হন। গবর্ণমেণ্ট ইহা গ্রাহ্য করিলে, তাহা "খাস" রূপে গণ্য হয় এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাই তাঁহারা বন্দোবস্ত আনিয়া উপস্বত্ব ভোগী হন। বলা বাহুল্য যে অন্যান্যেরা এইরূপ স্বত্বত্যাগী হন নাই। যাহা হউক, ববান তালুকের এক অধিকারী নিজ অধিকৃত ভূমির রসদ বা অংশ ত্যাগ করিলে এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের খাস গণ্য হইলে, দশসনা সহ এই সংমিশ্রিত অংশও "রসদ ববান" বলিয়া খ্যাত হয়।[২০] প্রতাপগড়ের ববান তালুকের জটিলতা ইহাতে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

এলাম পাট্টা গ্রহণে কিছুকাল ইঁহারা এলাম ভূমের উপস্বত্ব ভোগ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ রাজস্ব বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করায় তাঁহাদের মৃত্যুর পরে মাণিক্য রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব চরণ চৌধুরী পাট্টা ত্যাগ করেন। তখনই প্রতাপগড়ে তহশীল আফিস প্রতিষ্ঠার আবশ্যক হয় এবং মিঃ লটমন জনসনের সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়।[২১]

এখন এই তহশীল আফিসের আয় কত! বস্তুতঃ ইঁহারা আশু স্বার্থ মূলে স্থায়ী স্বার্থত্যাগ

২০. "Further interest attaches to this pargana from the fact that certain claims, known as baban and rasad baban and are put putforward by the owners of some of the permanently settled estates, etc."
Assam District Gazetteers Vol. II, p. 229.

২১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

করিয়া গবর্ণমেণ্টেরই সহায়তা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত লাতুর লড়াইর সময়ে[২২] এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লুশাইর "ধাওয়ার" সময়ে সর্ব্বদাই রসদ ও কুলি ইত্যাদি যোগাইয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছেন। লুশাইর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পাথারকান্দির দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট এক ঘাঁট (গারোদ) প্রস্তুত করিয়া কয়েকটি সিপাহীকে তথায় স্থায়ীভাবে রাখেন। এই চৌধুরী বংশীয়গণ তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন এবং প্রতিবৎসর তাহা মেরামত করিয়া দিতেন।

শেষ কথা

লুশাই সমন্তরালে যখন লুশাই প্রদেশ জরিপ হয়, তখন ইঁহারা সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তখন পূর্ব্বোক্ত মাধব চরণ চৌধুরীই এ বংশে ক্ষমতাবান ও প্রধান ছিলেন; এবং তিনিই সকলের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের যথাবিহিত সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হন।[২৩] গত মণিপুর যুদ্ধেও তিনি কুলি ও রসদাদি প্রদানে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন।[২৪] গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হন যে বিনা পাশে তাঁহাকে পাঁচটি বন্দুক ব্যবহারার্থ রাখিবার ক্ষমতা দিয়া সম্মানিত করেন।[২৫] এই সমস্ত বন্দুক প্রধানতঃ তিনি হাতী খেদার সময়ে ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণে অনুরোধ করা হয়,[২৬] তিনি এই পদ গ্রহণে ইচ্ছুক হন নাই। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থাকা কালে তিনি উহার এবং পরে লোকেল বোর্ডের সৃষ্টি কাল হইতে, করিমগঞ্জ লোকেল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। কিন্তু এ সকলেই তাঁহার মহত্ত্ব নহে, তিনি যখন সকলকে খাওয়াইতেন, স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া ভোজন পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক ইতর ভদ্র সকলকেই ঠিক সমান ভাবে খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইতেন, তখনই তাহা প্রকটিত হইত। তিনি দরিদ্র ইতর ব্যক্তিদিগকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া দিতেন ও তাহাদের সাধ মিটাইয়া নিজ সাধ মিটাইতেন। অর্থাভাবে ভাল খাইতে পান না, এই জন্য সম্বল বিহীন ব্রাহ্মণ, উদাসীন সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি করিতেন।

শঙ্কর রামের উল্লেখ করা গিয়াছে, ইঁহার পুত্রও পিতার ন্যায় পবিত্র চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। এবং পৌত্র রামগোবিন্দ সর্ব্বদা হরি নাম গ্রহণ করিতেন। দৈনিক দ্বি-লক্ষ নাম জপের তাঁহার নিয়ম ছিল; ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উকিল রত্নগোবিন্দ চৌধুরী প্রকৃতই রত্ন স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি অতুলনীয় ছিল এবং তিনি এক বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

---

২২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ ফুট নোট দ্রষ্টব্য।

২৩. "Madhabcharan Choudhuri is one of the most tractable and obliging Mirasdars in the district. During the Lushai expedition he was most useful. In the Lushai survey, when a stampede of the coolies, early in 1873, might have brought the whole of the survey opearation to an end, Madhabeharan Choudhuri was again useful. I started him off at a moment's notice to meet Assistant Collector who was out in the district, and who received great assistance from Madhabcharan Choudhuri, etc." Extract from a letter from: H.C. Sutherland, Collector of Sylhet to the Assistant Secretary to the Government of Bengal, No. 971, at Sylhet, the 30th August 1874.

২৪. Mr. J.L. Herald, Esq., c.s. Deputy Commissioner, Sylhet writes, (a letter No. 2503, dated Sylhet, the 29th June 1801);
'I think you much for your cordial and loyal assistance in procurign boats, coolies, and rations for Manipur expendition.'

২৫. Vide D.C. No. 1366A.P. Dated the 26th May 1881A.D

২৬. ১০ই আগষ্ট ১৮৯৪ ইং চিঠি।

শ্রীহট্ট শহরের কবি রাসবিহারী দত্তের কবিতা ও তাঁহার কবিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তুলনা চলিত। সরসতায়, সারল্যে, প্রাঞ্জলতায় প্রাচীন মহাজনী পদ হইতে তাঁহার পদ ভিন্ন বলিয়া বোধ করা যায় না। তাঁহার পদ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গৌরশিরোমণি ও বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনী পদের সহিত তদীয় পদাবলী গাইয়া আনন্দানুভব করিতেন।[২৭] "পদরত্ন মালা" নামে ঐ পদগুলি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সরল সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার রচিত কয়েকটি স্তোত্র ও অষ্টকাদি আছে।[২৮]

প্রতাপগড়ের সরকার বংশ

প্রতাপগড়ের বিবরণ সংসৃষ্ট বলিয়া জফরগড়ের মৈনা নিবাসী চৌধুরী বংশ বৃত্তান্ত এইমাত্র বর্ণন করিয়াছি। যে দুইটি বংশীয়, জমিদারবর্গ প্রতাপগড়ের প্রথমাধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গ পূর্ব্বাংশেই বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে বিবৃত করা গিয়াছে। সে দুইটি বংশের মধ্যে অন্যতম হিন্দু জমিদারদের কর্ম্মচারীরূপে বর্ণয়িতব্য সরকার বংশের প্রসিদ্ধি।

আটপুরুষ পূর্ব্বে পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা গ্রামে সাহু কুলোৎপন্ন জগন্নাথ দাস নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, ইঁহার পুত্রের নাম নবিরাম বা নবীন। নবিরামের বারাণসী ও সন্ধী নামে দুই পুত্র হয়। নবি ও বারাণসী উভয়ই ধনার্জ্জনে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন; ইঁহাদের নামে তাঁহাদের বংশীয়বর্গ অদ্যাপি পরিচিত হইয়া থাকেন।

কবি সত্যরাম

বারাণসীর পুত্র শোভারাম। শোভারামের পুত্র সত্যরাম পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার কবিত্ব শক্তিও ছিল। তিনি একদা কার্য্যান্বেষী হইয়া কাছাড়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের সভায় গমন করেন, মহারাজ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত করেন; সত্যরাম রাজানুগ্রহে প্রসিদ্ধ ও ধনী হইয়া উঠেন। রাজ-কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাছাড়ে থাকিতে হইত, বাড়ী যাইবার অবকাশ ছিল না। এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে থাকিয়াও তিনি বঙ্গভাষার সেবায় ক্রটি করেন নাই; তাঁহার কৃত অনেক "ধুয়া" বা "ধুরা" আছে। তদ্ব্যতীত তিনি "ঘাটু সঙ্গীত" রচনা করিয়া ছিলেন।[২৯]

সত্যরাম বহুদিন বাড়ীতে আসিতে কি, বাড়ীর বিশেষ তত্ত্বাবধান নিতে না পারায়,এদেশে

---

২৭. যদৃচ্ছাক্রমে তদ্রচিত একটি পদ এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ দিলামঃ-

"নীপমূলে সুন্দর শ্যামর চন্দ হেরইতে সহচরি ভৈ গেনু ধন্দ।
রোমাবলিগণ তৈখনে জাগি। বিহিপায়ে মাগল লোচন লাগি।
বিহি যব্ না পূরল তাকর আশ। স্বেদছলে রোদন করু পরকাশ।
প্রতিতনু ছাওল থরথরি কাঁপ। তৈখনে লোচন লোরহি ঝাপ।
মনসুখে না হেরিনু সো মুখ চন্দ বৃন্দাবন পহু শুনি রহু ধন্দ।"

চৌধুরী মহাশয় কোন কোন পদে বৃন্দাবন চন্দ্র প্রভুকে স্মরণ করিয়াছিলেন, এ পদেও তাঁহার নাম আছে।

২৮. করিমগঞ্জের সবডিভিশনেল অফিসার সাহেবের ১৯শ আগষ্ট ১৯১০ ইং লিখিত ১৩৪নং চিঠির উত্তরে যে বিবরণ প্রদত্ত হয়, তদৃষ্টে ইহার অনেকাংশ লিখিত হইয়াছে। কানুরাম চৌধুরীর কাহিনী পূর্ব্বাংশে প্রতাপগড়ের বিবরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হওয়ায়, তাঁহারও তদীয় পুত্র পৌত্রাদির কথা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

২৯. বৈষ্ণব মহোৎসবে ভোজনকালে যে সকল পদাবলী মধ্যে মধ্যে উচ্চারিত হয়, তাহা ধুয়া বা ধুরা নামে খ্যাত। "ঘাটুসঙ্গীত" রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক গান। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে কবি সত্যরামের যে ঘাটুসঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই কবিকৃত বলিয়াই বোধ হয়।

তিনি আসিবেন না বলিয়াই প্রতিবেশীবর্গের ধারণা জন্মে। এই ধারণা ক্রমে লোকের মনে দৃঢ়তর হইয়া যায়, তাহাতে দেশে তাঁহার যে জমি ভূমি ছিল, পঞ্চখণ্ডের জনৈক জমিদার বলে তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করেন। সত্যরামের পুত্র কুশলরাম তখন বালক মাত্র, তিনি স্বয়ং কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া কাছাড়ে গিয়া পিতার নিকট একথা বলিলেন।

বাড়ীতে সত্যরামের কয়েকটি বলবান পাইক থাকা সত্ত্বেও পুত্র কোন প্রতিকার না করাতে তেজস্বী সত্যরাম পুত্রকে অপদার্থ মনে করিয়া অত্যন্ত ভৎর্সনা করেন, তদ্রুপ অযোগ্য পুত্র থাকা না থাকা সমান, ইত্যাকার বাক্যে বালককে প্রপীড়িত করেন। বালক পিতৃবাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া, কাছাড় ত্যাগ করিল, কিন্তু আর বাড়ীতে গেল না, প্রতাপগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাপগড়ে তখন নবাব রাধারামের প্রচণ্ড প্রতাপ।[৩০] রাধারাম একজন দক্ষ কর্ম্মচারীর সন্ধান করিতেছিলেন, কাছাড়ের দেওয়ান বা মন্ত্রীপুত্রকে পাইয়া তিনি সাগ্রহে আশ্রয় দিলেন, জমিবাড়ী দান করিয়া আপন দফ্তর খানার "সরকার" বা প্রধান লেখক নিযুক্ত করিলেন। কাছাড়ের মন্ত্রীপুত্রকে আশ্রয় দান নবাব রাধারামের গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ছিল সন্দেহ নাই।

কুশলরাম এই স্থানেই বিবাহ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কুশলরামের জননী পুত্রের বিরহে অতি কাতর হইয়া নানাস্থানে সন্ধান করিতে জানিলেন যে, সে প্রতাপগড়ের "নবাবের" আশ্রয়ে আছে; তখন স্নেহ-কাতরা জননী পুত্রের কাছে আগমন করেন। সত্যরামও একমাত্র পুত্রের উপর চিরদিন ক্রোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইয়াছিল।

কুশলরামের সাহেবরাম ও হরেকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে সাহেবরাম পিতৃপদ প্রাপ্ত হন, দশসনা বন্দোবস্তের সময়ে ইঁহার নামে প্রতাপগড়ের একটি তালুকের নামকরণ হয়। হরেকৃষ্ণ জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনায় যশস্বী হন। ইঁহাদের উভয়েরই বংশধরবর্গ বর্ত্তমান আছেন। সাহেবরামের পুত্র কৃষ্ণ চরণ, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চরণ জীবিত আছেন।

দুইটি বংশ কথা

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, কোন কোন পরিবারে বলশালী লোকের সংখ্যা অধিক, কোন কোন পরিবার বা দীর্ঘজীবী পুরুষ-বহুল। এস্থলে যে দুটি বংশ কথা লিখিত হইতেছে, প্রায় একই সময়ে একই স্থানে সে বংশদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইলেও একটি বংশের পুরুষানুক্রমে প্রায় সকলেই অমিত বলশালী ছিল, অদ্যাপি তাহাদের বলের কথা গল্পের ন্যায় শ্রুত হওয়া যায়। উভয় বংশেরই মূল দুইজন বিদেশগত বিপদাপন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহারা জাতিচ্যুত হইয়া পড়েন। উভয় বংশেই বর্ত্তমান ৭/৮ পুরুষ চলিতেছে।

এই দুই বংশের একটির আদিপুরুষের নাম রঘুনাথ, ইনি অতিশয় বলবান ও উদ্ধত ব্যক্তি ছিলেন এবং হাঙ্গামার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। অসহ্য কারা-যন্ত্রণায় অধৈর্য্য হইয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থাতেই কারাগারের বেড়া ভগ্ন করতঃ পলায়ন করেন। সারারাত্রি হাঁটিয়া প্রভাতে এক নদী-তীরে তিনি উপনীত হন; তিনি তখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন বলিয়া সন্তরণে নদী উত্তরণের উপায় ছিল না। সে জঙ্গলময় স্থানে নৌকাদিও ছিল না, তাই তিনি চিন্তাকুলিত চিত্তে কিছুকাল অবস্থিতি করেন; এমন সময় পরপারে লোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থী হন। পরপারস্থিত যোগী[৩১] জাতীয় সেই ব্যক্তিবর্গ বনান্তরাল হইতে উত্তর করিল

৩০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ১১শ অধ্যায় দেখ।

৩১. আগম সংহিতাদি আলোচনা করিলে এই জাতির যোগী নামোৎপত্তির প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়। অতএব "যুগী" এই প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তে "যোগী" শব্দ ব্যবহৃত হইবে।

যে তাহারা শিবার্চ্চনায় আসিয়াছে, তথায় নৌকাদি নাই যে তাঁহাকে পার করিয়া লইবে।

রঘুনাথ ঠাকুরের জঠরানলও তখন ধকধকি জ্বলিতেছিল, শিবপূজার কথা শুনিয়া, ক্ষুধায় উন্মত্ত প্রায় রঘুনাথ, প্রসাদ প্রাপ্তির লিপ্সায় "জয় শিব শম্ভু" বলিয়া জলে ঝাপ দিলেন। তিনি জলে পতিত হইবা মাত্র কি জানি কি রকমে লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি তখন সহজেই সন্তরণ সহকারে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। শিবের অনুকম্পাতেই শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, তিনি পূজাস্থলে উপনীত হইয়া ভক্তিভরে প্রণত হইলেন ও পূজান্তে প্রসাদ পাইতে অভিপ্রায় করিলেন।

যাহারা পূজা দিতে আসিয়াছিল, তাহারা নিজেদের জাতির কথা জানাইয়া ব্রাহ্মণকে স্বপৃষ্টে প্রসাদ দিতে চাহিল না। একে প্রাণান্তকর জঠরানল, তাহাতে শৃঙ্খল মুক্তি হেতু প্রবল বিশ্বাস বল, রঘুনাথ কোন আপত্তিই শুনিলেন না, প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। জঠরানল কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্ত হইলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল, এবং তিনি কিছু দিনান্তে নিজগৃহে গোপনে গিয়া একদা আপন স্ত্রীকে লইয়া অপরিচিত ভাবে রাউৎভাগ নামক স্থানে আগমন পূর্ব্বক যোগী জাতি পরিচয়ে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু আচার ব্যবহারে অচিরেই প্রকৃত পরিচয় অনেকটা বিদিত হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, কালে তাঁহার মনের বৈরাগ্য বিদূরীত হইল এবং তথায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল, আত্মগোপনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ তিনি এই নবজাত পুত্রের নাম কাজলনাথ রাখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল, রাজপুরুষগণ জেল পলাতক রঘুনাথ শর্ম্মার কোন অনুসন্ধানই প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

কাজলনাথের পুত্র প্রাণনাথ, তৎপুত্র পদ্মনাথ, ইহার খরাই, হরাই, গোরাই ও উত্তম নামে চারি পুত্র হয়। কাজলনাথ, তাহার পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ সকলেই বিশাল দেহী, বলশালী ও সংযমী পুরুষ বলিয়া সকলের ভয়-ভক্তির পাত্র হইয়াছিল।

বৃদ্ধকালে পদ্মনাথ স্বীয় অধিকৃত ভূমির রাজস্ব আদায় করিতে অশক্ত হইয়া বিপন্ন ও পীড়িতাবস্থায় মৃত্যুকালে পুত্রগণকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলে এবং ভবিষ্যতে কখনও ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলে, তাহারা রাউৎভাগ ত্যাগ করিয়া, নরসিংহ পুরের জঙ্গল আবাদ ক্রমে সে স্থানবাসী হয়।

ইহাদের সময়ে দশসনা বন্দোবস্ত হয়। ইহাদিগকে আবাদীয় ভূমি, পিতৃবাক্য পালনার্থ নিজ নিজ নামে বন্দোবস্ত না করিয়া প্রতিবেশী মোসলমানদের দ্বারা বন্দোবস্ত লইতে হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সেই বন্দোবস্তকারিগণ কিছুদিন মধ্যে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া খাজানা প্রার্থী হয়। মোসলমানদের এই অন্যায়াচরণ অমিত বলশালী খরাইর অসহ্য হইয়া উঠিল, খরাই বিশ্বাসঘাতক দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তাহারা ভয়ে কোন উচ্চ বাক্য না করিয়া নিরস্ত রহিল; ফলে খাজানা দেওয়া হইল না। ভ্রাতৃবর্গও বিরক্ত হইয়া ইহদের সংস্রব ত্যাগে ভরণ ও কুশিয়ারকুল পরগণা সংক্রান্ত কতক ভূমি ক্রয় করিয়া লইলে, তাহাই তাহাদের অধিকৃত হয়।

পূর্ব্বকার লোকের শক্তির পরিমাণ এক্ষণে ধারণাতীত হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে যাহারা বিশেষ বলশালী ছিল, তাহাদের তো কথাই নাই। খরাইর বিশাল দেহ ও আহারের কথা গল্পবৎ বোধ হয়। একদা শ্রীহট্টের পথে খরাই সশস্ত্র দস্যুদল কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলে, সঙ্গের একশত টাকা গিলিয়া ফেলিয়া, দস্যুদিগকে বলপরীক্ষায় আহ্বান করিলে, তাহার কার্য্য ও আকৃতি দর্শনে

ভীত হইয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত লাঠি খেলায় তাহার দক্ষতা ও পটুতা দেশে তাহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। একদা একটা বটগাছের সমীপস্থ একখণ্ড ভূমি লইয়া মাহিডিহির মোসলমান চৌধুরীদের সহ বিবাদ উপস্থিত হইলে সভ্রাতৃক উত্তম লাঠিখেলার কৌশলে চৌধুরীদের পাঁচশত লাঠিয়ালকে পরাস্ত করায় উক্ত ভূমি তাহাদের দখলে আসিয়াছিল। এক ব্যক্তির শিক্ষা কৌশলে পাঁচশত ব্যক্তির সম্মিলিত শক্তি ব্যাহত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, কিন্তু ইহার বহু সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। তখনকার লোকের শক্তি ঈদৃশই ছিল। ইহার পুত্রের নাম মহেশ, তৎপুত্র সিদ্ধির পরপোকারী ও পরম ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি ছিল, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচরণ মোক্তার মহাশয় বর্ত্তমান। তিনিই এই বিবরণ প্রদাতা।

বলবান ভরত

পূর্ব্বোক্ত খরাই নাথের অনুজ ভ্রাতা হরাই বা হরিনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভরত। ইহার কথা বর্ণনযোগ্য। ইহার ন্যায় প্রকাণ্ডকার ও অসীম বলশালী ব্যক্তির কথা বড় শুনা যায় না।

গায়ে জোর থাকিলে কিছুই গ্রাহ্য করা যায় না; প্রায় ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই ভরতনাথকে অপ্রস্তুত হইতে হয় নাই; প্রতি কার্য্যেই সফলতা যেন তাহার করধৃত ছিল। একবার দুই শত লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই দুইশত ব্যক্তিকে ভরতের বাহুবলে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে হয়।

একটা বৃহৎ বৃক্ষ প্রায় পঁচিশ জন লোকে টানিয়া নিতে অসমর্থ হইয়া, ইহাকে সহায়তা করিতে বলে, ভরত সেই সকল ব্যক্তিকে সরাইয়া দিয়া একা স্বচ্ছন্দে সেই গাছটি যথা স্থানে স্থাপন করিলে, তাহারা সকলেই বিস্মিত হয়। ভরতের বলের কথা লোকমুখে শুনিতে পাইয়া কয়েকজন ভদ্রলোক তাহার বলের পরিচায়ক কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে কহিলে, প্রায় ৮০/০ মণ ওজনের দ্রব্য বহন করিতে পারে, সন্নিকটবর্ত্তী তাদৃশ একখানা নৌকা টানিয়া অক্লেশে নদীতে ফেলিয়া দিলে, সেই ভদ্রলোকগণ ভরতের বলের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন।

শেষ বয়সে ভরতনাথ একজন সাধকরূপে গণ্য হইয়াছিলেন ও উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুরুষানুক্রমে সকলেই বলশালী হয়, এইরূপ বংশ অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। ভরতনাথের বংশধর বর্গও বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় বংশ

বটরশী বাসী বৎসেন্দুনাথ বংশীয় বর্গ চৌধুরী খ্যাতি বিশিষ্ট। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ বৎসেন্দু ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। ঘটনা বৈচিত্রে গ্রহবৈগুণ্যে তিনি জাতিচ্যুত হন। কিন্তু তাহা হইলেও দেশে তাঁহার প্রতিপত্তির হ্রাস হয় নাই। দিন দোষে তাঁহার পদস্খলন হইলেও বুদ্ধির গুণে তিনি স্বীয় সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হন। তাঁহার পুত্রের নাম পুষ্পকেতু, তৎপুত্র দয়ানন্দ, ইহার আনন্দমোহন ও রামমোহন নামে দুই পুত্র হয়। আনন্দমোহন বিদ্যানুরাগী, ধার্ম্মিক ও কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, সুনামগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এই তিন স্থানে ইহার বৃহৎ কারবার ছিল। "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস"—আনন্দ মোহনের আর্থিক অবস্থা উজ্জ্বল ছিল, তদ্দৃষ্টে তদীয় জনৈক কপটমিত্রের ঈর্ষা উদ্দীপ্ত হয় এবং সে একদল দস্যু সহায়ে তাহার প্রায় দুইলক্ষ টাকার সম্পত্তি অপহরণ করিতে সমর্থ হয়। আনন্দমোহন সুকৌশলে সেই দস্যুদলকে ধরাইয়া দিতে পারিলেও, কপটাচারী উক্ত

বন্ধুর নামোল্লেখ করেন নাই। "করুণ তিনি মন্দ কিন্তু আমি তা তাঁহাকে মিত্র বলিয়া ডাকি, 'মিতা' ডাকের অগৌরব করিব না" তাহার এতদুত্তরে যাহারা সেই কপটচারীকে ধরাইতে প্রয়াসী ছিল, তাহারা নিরস্ত হয়।

এই দস্যুতার পরে তাহার মনে হয় যে দেবার্থে ব্যয় না করিলে ধনের স্বার্থকতা নাই; তখন মহা আড়ম্বরে তিনি সাতবার ক্রমান্বয়ে নৌকাপূজা করেন ও সমাগত দর্শক বৃন্দকে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। আনন্দমোহনের ভ্রাতা রামমোহন স্বীয় সমাজের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্ন করেন; তৎপুত্র পদ্মলোচন জমিদারী কার্য্যপরিচালনায় সুদক্ষ ছিলেন। ইনি নিজব্যয়ে স্বগ্রামে একটি গ্রাম্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, উহা অদ্যাপি আছে। তিনি কয়েকজন দীন ছাত্রের শিক্ষা ব্যয় বহন করিয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত করেন; তদ্ব্যতীত ব্রজনাথ দে নামক জনৈক দুস্থ ব্যক্তির ৯০০০ নয় হাজার টাকার ঋণ এককালীন দান করিয়া, তাহাকে দায় মুক্ত করেন; তাহার হৃদয় কিদৃশ পরদুঃখ-কাতর ছিল, ইহাতেই বুঝা যায়। ঈদৃশ এক একটি ঘটনাতেই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং চিরদিন তাঁহাদের নাম অমর করিয়া রাখে।[৩২] ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত দুলাল চন্দ্র চৌধুরী হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

---

৩২ আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট ঈদৃশ অন্য একটি বংশ রাজারগাও নামক স্থানে দৃষ্ট হয়; এই বংশের আদি পরুষ ডেঙ্গু চৌধুরী দশসনা বন্দোবস্তের সময় রাঢ় দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক তথায় ১৯৬ রাজস্বযুক্ত এক তালুক বন্দোবস্ত ক্রমে বাস করেন; ইহার পুত্র গুনাই নাথ, তৎপুত্র লালমোহন প্রভৃতির খ্যাতি পরিজ্ঞাত।

পঞ্চম অধ্যায়
মোসলমান বংশ বর্ণন

মাইরডিহি, চাপঘাট ও ডৌয়াদি

প্রতাপগড় ও জফরগড়ের মোসলমান চৌধুরী বংশের প্রাচীনত্ব ও তাঁহাদের বংশকথা পূর্ব্বাংশে কথিত হইয়াছে। কুশিয়ার কুল পরগণাস্থ মাইরডিহি এবং বটরশীর চৌধুরী বংশীয়গণও অপ্রাচীন নহেন এবং প্রসিদ্ধ মাইরডিহির মোহাম্মদ বাসির চৌধুরী অতি প্রতাপশালী লোক ছিলেন, তাঁহার জমিদারীর আয় অল্প ছিল না, পরে করিমগঞ্জের বাজারের স্বত্ব লইয়া বটরশীর চৌধুরীদের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয় এবং তাহাতে হাঙ্গামা ও মোকদ্দমাদিতে উভয় পক্ষেরই শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় এবং সম্পত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। করিমগঞ্জের মধ্যে বর্ত্তমানে চাপঘাটের মোসলমান ভূম্যধিকারীর জমিদারীই বৃহত্তম, ইদানীং তত্রত্য গোলাম রব্বানী চৌধুরী বংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ডেওয়াদির চৌধুরী বংশ

মজঃরদ শাহজলালের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে ডেওয়াদিতে মোসলমানগণেব আগমন ঘটে। একজন ভ্রমণকারীই প্রথমতঃ এস্থানে বাড়ী প্রস্তুত করেন; তখন ইহা জঙ্গলময় ও পঙ্কিলস্থান ছিল এবং লোকের বসতি অতি বিরল ছিল। এই ভ্রমণকারী (মুলুক সুয়াই) দরগা দর্শনে শ্রীহট্টে শহরে গমন করিলে, দরগার কেহ তাঁহার বাসস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করেন; তিনি উত্তর দেন, "যে স্থানে গাছে পিষ্টক ফলে এবং গোবাটে দল মিলে, সেই আমার বাসস্থান দেখিতে কেহ যাইবেন কি"?[১] একথা শুনিয়া শমিরউদ্দীন নামক দরগার এক পীর "গাছে পিঠা" দেখিতে তৎসহ ডেওয়াদি আসিলেন। মুলুক সুয়াইর স্ত্রী এই পবিত্রচেতা অতিথিকে পবিত্র ভাবে খাদ্য দিতেন না বলিয়া তিনি তাহা খাইতেন না, গোচারণ ক্ষেত্রে গিয়া রাখালদের দ্বারা আম্রাদি ফল সংগ্রহ করিয়া খাইতেন। মুলক সুয়াই তাঁহাকে পীরজ্ঞানে মান্য করিতে লাগিলেন। ও মৃত্যুর পর তদীয় কবর পার্শ্বে, তাঁহার শব যেন সমাহিত হয়, এই আশীর্ব্বাদ চাহিলেন। সেইদিন শমির উদ্দীন মাঠে গিয়া খেলাছলে রাখাল দিগকে তাঁহার উপর বালুকা দিতে বলিলেন, সেই বালুকা আচ্ছাদনেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল! মুলুক সুয়াইর মৃত্যুর পরে সেই স্থানে তাঁহারও কবর দেওয়া হয়। এই মুলুক সুয়াইর বংশ আছে কি না জানা যায় না; পরে চৌধুরী বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

মজলিস আলমের সময় হইতেই এ বংশের প্রসিদ্ধি। বর্ত্তমান বংশধর হইতে আলম অষ্টম পুরুষ উর্দ্ধবর্ত্তী ছিলেন।

আলমের ভগিণী রূপবতী ছিলেন, তিনি শ্রীহট্টের নবাব কর্ত্তৃক দিল্লীর বাদশাহের অন্দরের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আলম ডেওয়াদি (ডৌয়াদি) পরগণায় জায়গীর প্রাপ্ত

---

১. "গাছে পিঠা গোবাটে দই
মোর সঙ্গে নি যাইবায় কই?" পিঠা=পিঠাকরা নামক ফল।
গোবাট = গরু যাইবার পথ; দই=কাদা; কই কেহ।

হন। এই জায়গীর ভূমে একটি মসজিদ প্রস্তুতের জন্য দিল্লী হইতে তৎকর্তৃক কয়েকটি রাজমিস্ত্রি প্রেরিত হয়, তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া আলমের বৈভবের অল্পতা দৃষ্টে অবজ্ঞার ভাবে বলিয়া উঠে যে, "মজলিস মসজিদের মাল মসল্লাই মিলাইয়া উঠিতে পারিবেন না।" সামান্য লোকের মুখে এই অবজ্ঞাবাণী মজলিস আলম সহিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বধ করিলেন।

এ সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে অপরাধীকে ধৃত করিতে আদেশ হয় এবং তজ্জন্য "আসোয়ার" প্রেরিত হয়। মজলিস ভয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁহার পুত্রই ফারম পাশার চৌধুরীদের আদি পুরুষ।

ফারমপাশাতে এখনও কয়েকটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা মজলিসের কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে; ঐ স্থানটী "দীঘীরপার" নামে খ্যাত হইয়াছে। এই দীঘীগুলির মধ্যে "ধলিদীঘী" বৃহত্তম, ইহার পশ্চিম তীরে আলমের আবাস বাটী ছিল; দীঘীর সুবৃহৎ বাঁধাঘাটের চিহ্ন এখনও লক্ষিত হয়। আর একটি বৃহৎ দীঘীর নাম "বালিদীঘী।" ইহার উত্তর পারে হিন্দুপল্লী ছিল, ১৫/২০ বৎসর যাবৎ তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

আলমের দৌহিত্রের নাম শাহা মসউদ, তৎপুত্র মুজাফল খাঁ, ইনি ডৌয়াদির চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্রের নাম মহবৎ খাঁ। তৎপুত্র কর মোহাম্মদ ও দিনমোহাম্মদ। ১১২৬ সালের লিখিত বাটওয়ারা পত্রে দৃষ্ট হয় যে, এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্পত্তি বিভাগিত হয়। কর মোহাম্মদের পুত্র মোহাম্মদ ফৈজ প্রভৃতি, ফৈজ-তনয় মোহম্মদ হাদি; ইঁহার পুত্র গোলাম নজব, ইঁহার পৌত্রাদি জীবিত আছেন। এই বংশীয়গণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ফারমপাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগীরখলা নামক স্থান বাসী।

পঞ্চখণ্ড কালার চৌধুরী বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগে "নবাবি আমলে দেশের অবস্থা" প্রকরণে পঞ্চখণ্ডে সম্পাদিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক খানা দলিল মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে যে ১০৯২ সালে সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, যখন শ্রীহট্টে নবাব আব্দুর হেম খাঁ বাহাদুরের শাসন ছিল, পঞ্চখণ্ডে তখন শাহবাজ খাঁ নামে এক ব্যক্তি জমিদার ছিলেন। ইঁহার জমিদারী পঞ্চখণ্ড হইতে খারিজ হইয়া শাহবাজপুর নামে ভিন্ন পরগণায় পরিণত হয়; তৎপূর্ব্বে সে স্থান কাউয়াকোণা নামে খ্যাত (ও পঞ্চখণ্ডের এলাকাধীনে) ছিল।

এই শাহবাজ খাঁ "জাংদার" বংশীয় ছিলেন। একটি প্রবাদ বাক্য আছেঃ—

"পাল, প্রচণ্ড; জাংদার।

এই তিন মিরাশদার।"

অর্থাৎ পঞ্চখণ্ডে পালবংশীয়গণ, প্রচণ্ড খাঁর সন্তানবর্গ এবং জাংদার বংশের পরবর্ত্তী পুরুষ বর্গই প্রধান মিরাশদার, অন্য কেহ নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় অধ্যায়ে পাল বংশের কথা প্রসঙ্গে বলা গিয়াছে যে, উক্ত বংশে প্রায় চতুর্দ্দশ পুরুষ পূর্ব্বে যাদবানন্দ পালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রতাপ চন্দ্র কোন কারণে মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন; ইনি একটি বৃহৎ দীঘী খনন করাইয়া ছিলেন ও অতি প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি প্রচণ্ড খাঁ আখ্যায় খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থান তদীয় নামানুসারে "বাঘপ্রচণ্ড খাঁ মৌজা" বলিয়া আখ্যাত হয়।

তাঁহার বংশধর বর্গ মধ্যে পরবর্ত্তী কয়েজনেরই খাঁ উপাধি দৃষ্ট হয়; তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি ঐ স্থান বাসী।[২]

শাহবাজপুরের চৌধুরী বংশ

"জাংদার" কোন ব্যক্তির নাম কি উপাধি, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পঞ্চখণ্ডে পূর্ব্বে এক বিশিষ্ট হিন্দু জমিদার বংশ ছিল, এবং তাহা জাংদার বংশ বলিয়া কথিত হইত।

এইবংশে শ্যামরায় জাংদারের উদ্ভব হয়, তাঁহার পুত্রের নাম স্বরূপ রাম জাংদার; ইনি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। ইহার স্থাপিত বাসুদেব বিগ্রহ অদ্যাপি শাহবাজপুরের কুমার সাইদ মৌজায় আছেন, উক্ত দেবতার নামে তৎপ্রদত্ত ৬/০ হাল দেবত্র ভূমি আছে।

একদা রাজস্ব বাকির দায়ে স্বরূপরাম পড়িয়াছিলেন। তিনি বহু চেষ্টায় রাজস্বের কতকাংশ সংগ্রহক্রমে দিল্লীতে গমন করেন, তথায় তাঁহার জাতি-চ্যুতি ঘটে! স্বরূপ রামের মোসলমান অবস্থার নামই শাহবাজ খাঁ। মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি নিজ জমিদারী পঞ্চখণ্ড হইতে খারিজ ক্রমে পৃথক পরগণায় পরিণত করেন। তাহার পর তিনি দিল্লী হইতে মক্কায় গমন পূর্ব্বক হজব্রত সম্পাদনে "হাজি" নামে খ্যাত হন।

শাহবাজ হিন্দু থাকা কালে নিঃসন্তান ছিলেন। মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন কালে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু নির্ব্বন্ধানুসারে তাঁহাকে এই সময় বিবাহ করিতে হয়। সেই আশীতিপর বৃদ্ধের এই বিবাহে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে একটি পুত্র জাত হয়, ইঁহার নাম ফতেহ মোহাম্মদ। ইনিও পিতার ন্যায় সুদীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন ও দশসনা বন্দোবস্তের সময় পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় নবতি বৎসর হইয়াছিল। শাহবাজপুরের ১নং তালুক তাঁহার নামেই বন্দোবস্ত হয়। ফতেহ মোহাম্মদের পুত্রের নাম মোহাম্মদ ফাজিল, তৎপুত্র মোহাম্মদ আদিল, ইঁহার পুত্র না থাকায় একটি কন্যাই সম্পত্তির অধিকারিনী হন; তাঁহার পুত্র আব্দুল গফুর চৌধুরী, ইঁহার পুত্র নমানমোকিদ চৌধুরী সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি বটেন।

বাহাদুরপুর—পঞ্চখণ্ডের আর একটি খারিজা পরগণা বাহাদুরপুর। উহা শেখ্ বাহাদুর চৌধুরীর নামে খারিজা হয়। শেখ বাহাদুরের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। তাঁহার বংশে মোহাম্মদ সাদন নামে এক ব্যক্তি ১১৫০ সালে, ফতে মোহাম্মদ চৌধুরীর সমকালে জীবিত ছিলেন।[৩] এই বংশে বর্ত্তমানে বাহাদুরপুরের শ্রীযুত সরাফত আলী চৌধুরী জীবিত আছেন। মোহাম্মদ সাদনের উত্তরাধিকারী সূত্রে শ্রীহট্টের মজুমদার আলাদাদ খাঁ বাহাদুরপুরের সম্পত্তির অনেকাংশ প্রাপ্ত হন; দশসনা বন্দোবস্ত কালে উহা তাঁহার নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বাঘপ্রচণ্ড খাঁ বাসী চৌধুরী বর্গের একটি বংশ ধারা এস্থলে দেওয়া গেল, যথাঃ–প্রচণ্ড খাঁ, তৎপুত্র গৌহর খাঁ, তৎপুত্র মজলিস আগওয়ান, তাঁহার পুত্র মজলিস এফ্‌তিয়ার, তৎপুত্র মজলিস খাঁ, তৎপুত্র মবারিম খাঁ, ইঁহার পুত্রের নাম মাসুম খাঁ, ইঁহার পুত্র ফতেহ মোহাম্মদ, তৎপুত্র ফয়েজ মোহাম্মদ, তাঁহার পুত্র শফর মোহাম্মদ, ইঁহার পুত্র আব্দুল আলী, তাঁহার পুত্র আবদুল মজিদ, মজিদের পুত্র আবদুল ওয়াহেদ, ইঁহার পুত্র শ্রীযুত আবদুল খালেক চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন।

এই বিবরণী ভট্টশ্রীর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র কুমার ন্যায়রত্ন হইতে প্রাপ্ত।

পূর্ববর্ত্তী ২য় অধ্যায়ে ভট্টশ্রীর বংশ বিবরণ প্রসঙ্গে যে রাজপণ্ডিত দলিল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ইঁহার নামের স্বাক্ষর থাকা দৃষ্ট হয়।

রজাকপুরের জায়গীরদার বংশ

মোগল বাদশাহদের সময়ে শ্রীহট্ট হইতে দিল্লীতে খোজা প্রেরিত হইত; আইন-ই-আকবরি গ্রন্থেও ইহা লিখিত আছে।

পূর্ব্বে শ্রীহট্টের ঢাকা উত্তর পরগণায় লুৎফউল্লা খাঁ নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, সম্রাট আরঙ্গজেবের সময়ে তাঁহার বংশে এনায়েত খাঁ নামে এক নপুংসকের জন্ম হয়। শ্রীহট্টের নবাব এই সংবাদ পাইয়া এনায়েত খাঁকে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। দিল্লীতে তিনি সম্রাট মহলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

এনায়েতের শাহবাজ খাঁ ও জামিল খাঁ নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহাদের পুত্রের নাম যথাক্রমে নওয়া খাঁ ও মোহাম্মদ ইউনস। কিছুদিন পরে এই উভয় ভ্রাতা পিতৃব্য-দর্শনে দিল্লী উপস্থিত হইলে, এনায়েত খাঁ নওয়া খাঁকে রাজসরকার হইতে বহু অর্থ দেওয়াইলেন ও বাড়ীতে গিয়া একটি মসজিদ এবং একটি পুষ্করিণী দেওয়াইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল, নওয়া খাঁ বাড়ীতে গিয়া মসজিদ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট কাছাড় ট্রাঙ্ক রোডের (১৫ মাইলের) নিকট উক্ত প্রাচীন মসজিদ এখনও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ইউনস দিল্লীতে থাকিয়া কোরাণ অধ্যয়ন করেন ও তাহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। খুল্লতাতের যত্নে ইহা সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "হাফেজ" উপাধির সহিত ঢাকাউত্তর পরগণায় কতক জায়গীর ভূমি দান করেন। তদবধি তদ্বংশীয়গণ "জায়গীরদার বংশ" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইউনস মক্কায় গিয়া হাজি উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইঁহার পুত্রের নাম মোহাম্মদ শরিফ। তৎপুত্র মোহাম্মদ রজাক ও মোহাম্মদ ওমি। রজাকের নামে ঢাকাউত্তরের রজাকপুর মৌজার নামকরণ হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের সময় ওমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি তৎকালীন নিয়মানুসারে জায়গীরের সনন্দ রিজেষ্টরী করিয়া লইতে পারেন নাই; এই জন্য তাঁহাদের জায়গীর ভূমিতে কিয়দ্বংশে করধার্য্য হইয়া তাহা সাতটি পৃথক মহালে পরিণত হয়।

মোহাম্মদ রজার পুত্রের নাম মোহাম্মদ বাসির, তাঁহার মোহাম্মদ আসগর প্রভৃতি তিন পুত্র হয়। ইঁহাদের সময়ে লাখেরাজ ভূমির জরিপ হইয়া যখন বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়; তখন তাঁহারা আপনাদের জায়গীর ভূমের অবশিষ্ট অংশ "ইউনস জিম্বে মোহাম্মদ ওমি" নামে এক ছেগা তালুকে বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। মোহাম্মদ আসগরের পুত্র আরজদ আলী বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন, তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রজাকপুরে লোকাল বোর্ডের সাহায্যে একটি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুত মসজ্জিদ আলী জায়গীরদার এই বংশ বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

সমাপ্ত

করিমগঞ্জ সবডিভিশনের যে সামান্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই স্থলেই পরিসমাপ্ত হইল। প্রথমেই সবডিভিশনের অবস্থান ও নামাদি কীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রাচীন দেব বিগ্রহ বাসুদেব ও তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা পূজাধিকারী ব্রাহ্মণ বংশের কথা সংক্ষেপে বলা গিয়াছে। তৎপর পরাশর গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের কথা প্রসঙ্গে অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণাত্রেয় ও স্বর্ণকৌশিকের কথা;—তৎপ্রসঙ্গে

সিদ্ধপুরুষ মধুসূদনের আখ্যান বলা গিয়াছে। তাহার পর পঞ্চখণ্ডের মিশ্রবংশ বিবরণে প্রসঙ্গতঃ হাজঙ্গ জাতির বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রহণ বার্ত্তা, জ্ঞানবর ও কল্যাণবরের কথা ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেনগ্রামের পুরকায়স্থগণের কথার পরে লাউতার কাশ্যপ ও পরাশর বংশের কথা এবং ভট্টশ্রীর রথীতর বংশের বিবরণ ও তৎপরে চাপঘাটের দেশমুখ্য বংশ কথা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। তদন্তর ইছামতীর ও ডেওয়াদির ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ করা হইয়াছে; তাহার পর পাথারিয়ার দৈ-রগোষ্ঠি ও ছোটলিখার ভরদ্বাজ ও গৌড়বংশ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর আগিয়ারামের চৌধুরী বংশের নামোল্লেখ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ ও জলডুবের জমিদার বংশ কথার সহিত ব্রাহ্মণ বিভাগ সমাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চখণ্ডের সেন, পাল, দত্ত ও দাস বংশের নামোল্লেখ মাত্র করা গিয়াছে; এইরূপ লাউতা সম্বন্ধেও, লাতু সম্বন্ধেও তাহাই। তত্রত্য দত্ত ও স্বামী বংশের নামোল্লেখ করিয়া অষ্টপতি বংশের কথা সামান্যতঃ বলিয়াছি। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এসব স্থানের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশগুলির সম্যক বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। অতঃপর ঢাকাউত্তরের রাউৎ বংশের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা গিয়াছে। তাহার পর ছোটলিখার আদিত্যগণের বিবরণ এবং ডৌয়াদি ও এগারশতীর পুরকায়স্থ কথা বলা গিয়াছে। আমরা দত্ত গ্রামের দত্ত বংশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। এ অধ্যায়ে শেষে বড়লিখার সেনাপতি বংশের আগমন সম্বন্ধে ২/৪টি কথা বলা গিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বড়লিখার পুরকায়স্থ বংশের বিচিত্র বংশ কাহিনী এবং প্রতাপগড়ের আধুনিক বিবরণ প্রসঙ্গে জফরগড়ের হিন্দু চৌধুরী বংশের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়েই তত্রত্য সরকার বংশের উল্লেখে কবি সত্যরামের কথা আলোচিত হইয়াছে; তৎপর অপর স্থানের "দুটি বংশ কথা" বলিয়া এ অধ্যায়ে সমাপ্ত করা গিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মোসলমান বংশ বর্ণন। প্রথমেই ফারমপাশার চৌধুরী বংশ কথা দেওয়া গিয়াছে, তৎপর পঞ্চখণ্ড কালা ও শাহবাজপুরের চৌধুরী বংশ কথা এবং বাহাদুরপুরের বংশোল্লেখ আছে। তৎপর রজাকপুরের জায়গীরদার বংশ বিবরণের সহিত এ খণ্ড পরিসমাপ্ত হইয়াছে। করিমগঞ্জের নানাস্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বংশ কীর্ত্তিও কম নহে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা চেষ্টা করিয়াও তত্তাবৎ পাই নাই, পাইলে এই জঙ্গলাচ্ছাদিত গ্রামগুলির মধ্যে সুগন্ধি কত কুসুমের পরিচয় মিলিত; দেখিতে পাইতাম—জঙ্গলের অন্তরালেও মহামূল্য রত্ন জ্বলিয়া থাকে।

তৃতীয় খণ্ড

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

ব্রাহ্মণ-বিভাগ

প্রথম অধ্যায়
ছরচিরি ও বরমচালের বাৎস্য

গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ

নামতত্ত্ব

এই সবডিভিশনের নাম দক্ষিণ শ্রীহট্ট, ইহা উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশনের বা সদরের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। চৌয়ালিশ পরগণাবাসী মৌলবী শাহ মোস্তাফা এক অতি সম্মানীত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মৌলবী কুদরত উল্লা সাহেব মোন্সেফ নিযুক্ত হইয়া অনেক দিন কার্য্য করেন। তিনি একটি বাজার বসাইয়া ছিলেন, ঐ বাজারটী মৌলবী কুদরত উল্লার স্থাপিত বলিয়া মৌলবী-বাজার বলিয়া খ্যাত হয়। পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলে নূতন সবডিভিশন স্থাপিত হওয়া কালে উক্ত বাজারেই শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্য ইহা মৌলবী-বাজার সবডিভিশন নামেও কথিত হইয়া থাকে।

এই সবডিভিশনের উত্তরে উত্তর শ্রীহট্ট, পূর্ব্বে করিমগঞ্জ সবডিভিশন ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে হবিগঞ্জ সবডিভিশন। এই সবডিভিশনে ২৬টী পরগণা আছে, তাহার নাম ও জনসংখ্যাদি প্রথম ভাগে উক্ত হইয়াছে।

দক্ষিণ শ্রীহট্টের পূর্ব্বে ইটা রাজ্য ছিল, পরে ইহা এক বৃহৎ পরগণা রূপে গণ্য হয়; শমশের-নগর ও আলী-নগর ইটা পরগণা ভুক্ত ছিল এই দুই পরগণা ইটার খারিজ। অধিবাসিবর্গ মধ্যে যে যে বংশের কাহিনী দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হয় নাই, এস্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ হইবে।

পরগণা-ছয়চিরি

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রথম ভাগে আমরা সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের প্রসঙ্গে ইটার বর্ণনা করিয়াছি, ইটা প্রভৃতি স্থানেই সাম্প্রদায়িক গণের অধিকাংশের বাস, তাহার কারণ সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ-নৃপতি সুবিদনারায়ণ ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ইটাবাসী ছিলেন।[১] "সাম্প্রদায়িক শব্দটি তাঁহার সময় হইতে প্রধানতঃ (দশ) গৌত্রীয় ব্রাহ্মণের প্রতি"[২] প্রযোজিত হইয়া আসিতেছে।

রাজভ্রাতৃ বর্গের পলায়ন

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে বলা গিয়াছে যে বাৎস্য গোত্রীয় সুবিদ নারায়ণের রাজ্য বিজিত হইলে ধর্ম্মনারায়ণ, রামনারায়ণ ও বীরনারায়ণ নামক রাজ ভ্রাতৃত্রয় ও অন্যান্য রাজ বংশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পলায়ন করেন। তন্মধ্যে চয়চিরি পরগণার চৌধুরী বংশীয়গণ ধর্ম্মনারায়ণের বংশজাত। তত্রত্য দধিবামণ দেব-সংবাদ সহ প্রথমেই আমরা রাজ ভ্রাতৃবর্গের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"ইটার রাজা ভানু নারায়ণের পাঁচ পুত্র, যথা—সুবুদ্ধি নারায়ণ (সুবিদ নারায়ণ), রামচন্দ্র

১. সেই কাহিনী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে (২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৭/৮ম অধ্যায়ে) বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।
২. শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রেরিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

নারায়ণ (নামান্তর ব্রহ্মনারায়ণ), ধর্ম্মনারায়ণ, বীরচন্দ্র নারায়ণ ও রূপচন্দ্র নারায়ণ। রূপচন্দ্র ইঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।"[৩]

ইটাপতি সুবিদ নারায়ণের কাহিনী ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের কথা পূর্ব্বে[৪] বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সে স্থলে ধর্ম্ম নারায়ণের নাম প্রথমেই উল্লেখিত হইয়াছে, ইনি ভানু নারায়ণের তৃতীয় পুত্র। ইটা বিজিত হইলে যখন রাণী সতীর পরম ব্রত "সহমরণ" অবলম্বনে পতির সহগামী হইয়া সকল জ্বালা নিবাইয়া ছিলেন। যখন খোয়াজ কর্ত্তৃক রাজ কুমারগণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ পলায়ন পূর্ব্বক বর্ত্তমান ছয়চিরির অন্তর্গত একটি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় গুপ্তভাবে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তিনি রাজা বলিয়াই সাধারণ্যে খ্যাত হন।

ধর্ম্ম নারায়ণের গ্রাম স্থাপন

পাঠান উপদ্রব তিরোহিত হইলে প্রজাবর্গের কেহ কেহ ইঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। রাজা সুবিদ নারায়ণের পুত্রগণ জাত্যন্তরিত অবস্থায় পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাবা খুল্লতাতগণের অধিকৃত স্থান গ্রহণ না করায়, তাহা তাঁহাদিগেরই অধিকারে রহে। "সুবুদ্ধি নারায়ণের সন্তানগণ হইতে ধর্ম্ম নারায়ণ ভানুগাছ পরগণা প্রাপ্ত হইয়া নিজ বাসস্থানের জন্য উত্তর দিক ব্যাপিয়া একটি পরগণা স্থাপন করেন, উহাই ছয়চিরি নামে খ্যাত হয়। উক্ত ছয়চিরি পরগণাকে তিনি পনরটি গ্রামে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন।[৫]

বাটিকা নির্ম্মাণ

ধর্ম্ম নারায়ণ "প্রথমে যে স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়া ছিলেন, তাহার নাম ছত্রকূট রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঐ গ্রাম ছয়কূট বলিয়া পরিচিত। তিনি পর্ব্বতে এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কিছুদিন তথায় থাকেন। ঐ বাটী রাজবাটী বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।" ইহার পরে ঐ পার্ব্বত্য বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি পর্ব্বতের পূর্ব্বাদিকে অতি সুন্দর একটি স্থান নূতন বাটীর জন্য মনোনীত করেন; ঐ স্থানটি ছয়চিরি পরগণার ঠিক মধ্যস্থলে। তিনি রাজনগর হইতে বহু প্রজা আনাইয়া নিজ (নূতন) বাটীর চতুর্দ্দিকে বসাইয়া ছিলেন। এইরূপে সেই স্থান একটি গ্রামে পরিণত হইল; এবং তিনি "পৈত্রিক দেবতা শ্রীশ্রী বিষ্ণুচক্রের নামানুসারে সেই গ্রামের বিষ্ণুপুর আখ্যা প্রদান করিলেন।" তিনি বিষ্ণুপুরের চতুর্দ্দিকে "ষোলহাত প্রস্থ বিশিষ্ট চারিটি গড় প্রস্তুত করেন।" ইহা ধর্ম্মনারায়ণের গড় বলিয়া খ্যাত।

রাজনগরের সাগর দীঘীর অনুকরণে এই স্থানেও তিনি এক "সাগর দীঘী খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম দিকে (উক্ত নূতন) বাটীর স্থান কল্পনা করেন।" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকাটির জল এ পর্য্যন্ত সুপেয় রহিয়াছে, ফাল্গুণ চৈত্র মাসেও ৮/৯ হাত জল থাকে।

---

৩. শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রেরিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

৪. সেই কাহিনী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে (২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৭/৮ম অধ্যায়ে) বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৫ ছয়চিরির এই বংশ বিবরণটি প্রধানতঃ তত্রত্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রেরিত বিবরণ অবলম্বনে লিখিত, বিশেষতঃ উদ্ধৃত কোটেশন নিবদ্ধ কথাগুলি তৎপ্রেরিত বিবরণ হইতে গৃহীত। ছয়চিরি পরগণা নিম্নোক্ত পঞ্চদশটি গ্রামে বিভক্ত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ-বিষ্ণুপুর, ধর্ম্মপুর, শ্রীনাথপুর, লক্ষ্মীপুর, রামচন্দ্রপুর, গোবিন্দপুর, জগন্নাথপুর, চাঁদপুর, যজ্ঞশালা, প্রতাপী, কাঁঠালতলী, শ্রীগড়, ছয়কুট, চৈত্রঘাট ও চিলারবন্দ। বস্তুতঃ ধর্ম্মনারায়ণের বাটিকা নির্ম্মাণের পরেই গ্রামগুলির পত্তন হইয়াছিল। কালেক্টরীর কাগজে ছয়চিরি পরগণা ১৭টি গ্রামে বিভক্ত বলিয়া লিখিত আছে। দুইটি গ্রাম পরে খারিজ হইয়া থাকিবে।

দধি বামন ও মূর্ত্তি প্রাপ্তির গল্প

কথিত আছে যে, এই দীর্ঘিকা খনন করিতে করিতে ভূগর্ভে দিব্য জ্যোতি-বিশিষ্ট যোগপবিষ্ট এক ধ্যানাবিষ্ট মহাপুরুষ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের সম্মুখে এক দেব্যবিগ্রহ ও এক শালগ্রাম চক্র পরিদৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম নারায়ণের নিকট এই কথা জ্ঞাপিত হইলে "রহস্যোদ্ভেদ জন্য তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, মৃত্তিকা গর্ভে দেব বিগ্রহ দেখা যাইতেছেন এবং তাঁহাদের সাক্ষাতে জনৈক মহাপুরুষ উপবিষ্ট।"

ধর্ম্ম নারায়ণ "অতি ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি স্তুতি মিনতি করিলে সে সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত ২/১টি কথা" বলেন।

এই দুই দেবতার নাম স্বগীয় দধি বামন ও স্বগীয় ব্যসুদেব। কোদালের আঘাতে বাসুদেবের নাসিকার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী উভয় দেব বিগ্রকেই পূজার জন্য ধর্ম্ম নারায়ণের করে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করেন। দধি বামন এক শিলাচক্র। এই দুই বিগ্রহ তদবধি এই বংশীয় কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।

ভূগর্ভে ধ্যানাবিষ্ট যোগী পুরুষের অবস্থিতি বিষয়ক আখ্যানের সত্যতা সম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন নাই। কিন্তু দীঘী খনন কালে যে দুই বিগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহাতে সেই স্থানের বহু প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে "জঙ্গলাকীর্ণ সেই স্থানে" বিষ্ণুপুর গ্রাম স্থাপিত হয়, তাহার বহুপূর্ব্বে সেই স্থানে লোক বসতি ছিল. পরে সেই প্রাচীন জনবসতি পরিত্যক্ত হওয়ায় জঙ্গল পরিপূরিত হইয়া পড়িয়াছিল. অনুমান করা যাইতে পারে।

মন্দির ও গ্রাম স্থাপন

ধর্ম্মনারায়ণ "দধি বামন ও বাসুদেবের জন্য এক খানা সুন্দর দ্বিতল মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তদুপরি তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। তৎপর তিনি বিষ্ণুপুরের পূর্ব্বে শ্রীনাথপুর, পশ্চিমে রাম চন্দ্রপুর, উত্তরে লক্ষ্মীপুর, দক্ষিণে নিজ নামানুসারে ধর্ম্মপুর গ্রাম স্থাপন করেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে যে সকল জলাশয় তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।"

তিনি "ধলাই নদীর তীরে চৈত্র মাসের বারুণী ও অষ্টমীর একটি মেলা স্থাপন করিয়া সেই স্থানের চৈত্রঘাট নামকরণ করেন। স্থানীয় বহুলোক বারুণী উপলক্ষে এখানে আসিয়া থাকে।"

"চৈত্রঘাটের সন্নিকটে অতি পবিত্র একটি স্থানে ধর্ম্ম নারায়ণ বৈদিক কুলাচায্যানুসারে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিত্যহোম ও যজ্ঞ সম্পাদন করাইতেন. কালক্রমে এই স্থানই যজ্ঞশালা নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে যজ্ঞশালা একটি গ্রাম।"

কন্যাদানে প্রতিজ্ঞা

এই নূতন স্থানে যে তখন পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে ব্রাহ্মণ-বসতি স্থাপিত হয় নাই. তাহা একটি ঘটনা হইতেই জানা যায়। তখন বিষ্ণুপুরের পূর্ব্বদিকে শ্রীনাথপুরে ভরদ্বাজ গৌত্রীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি "ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া শ্রীনাথপুরে বাসস্থান দান করিয়াছিলেন।"

ধর্ম্ম নারায়ণের এক বিবাহ যোগ্যা কন্যা ছিল. ইঁহার বিবাহের জন্য তিনি নানা স্থানে পাত্রের সন্ধান করেন। কিন্তু গৃহ জামাতা রূপে সেই নূতন স্থানে কেহই আসিতে সম্মত হয় নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি "প্রতিজ্ঞা" করিয়া বলিলেন যে— "নিরূপিত দিনে যে কোন ব্রাহ্মণ প্রথম দৃষ্টি গোচর হইবে। তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন(১)"

এই প্রতিজ্ঞার সমীচীনতা বা সত্যতার বিচারের প্রয়োজন নাই; কথিত পূর্ব্বোক্তঃ ভরদ্বাজ

গোত্রীয় এক ব্যক্তি নিরূপিত দিনে প্রথম তাহার দৃষ্টিপথগামী হইয়া কন্যা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম নারায়ণ জামাতাকে "শ্রীনাথপুর যৌতুক স্বরূপ দান করিলেন এবং তাঁহাদের সামাজিক পদবী উন্নীত করিবার জন্য চৌধুরী উপাধি প্রদান করিলেন। কিন্তু দাতার কোনরূপ সনন্দ দানের অধিকার না থাকায় এই উপাধির মূল্য অধিক ছিল না।"

চৌধুরাই প্রাপ্তি ও তালুক বন্দোবস্ত

ধর্ম্ম নারায়ণের বংশে[৬] মাধব রায় এক জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি সম্রাট শাহজাহান হইতে ছয় ছিরি পরগণার চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই বংশে দশসনা বন্দোবস্ত কালে গোনাথের পুত্র রূপ রায়, বিপ্রহরি ও রামবল্লভ বর্ত্তমান ছিলেন; তন্মধ্যে বিপ্রহরি যোগসিদ্ধ উদাসীন পুরুষ ছিলেন, কথিত আছে যে বনের বাঘ তাঁহার কাছে কুক্কুরবৎ শান্ত ব্যবহার করিত। রাজ বংশীয় বলিয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকে তাঁহাকে "রাজা" বলিয়াই সম্বোধন করিত।

রূপ রায়ের ও রমা বল্লভের নামে তত্রত্য ১নং ও ২নং তালুকের বন্দোবস্ত হয়। রূপ রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায় নিজ নামে ৩নং তালুকের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।[৭] এই সময় শ্রীনাথপুরের চৌধুরী বর্গও নিজ নিজ নামে অন্যান্য তালুকের বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

পাঁচালী রচয়িতা ও পদ্মপুরাণ প্রণেতা

রূপ নারায়ণের ষষ্ঠ পুরুষে গুরু প্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেন। গুরু প্রসাদ ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে তিনি দধিবামনের দ্বিতল মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করেন। গুরু প্রসাদ চৌধুরী বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে "শনির পাঁচালী, সত্য নারায়ণের পাঁচালী ও ঘোর চণ্ডীর পাঁচালী নামে তিনখানা পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

ইঁহারই জ্ঞাতি ভ্রাতা কমল নারায়ণ রায় চৌধুরী একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ওকালতী ব্যবসায় করিতেন। পূর্ব্বোক্ত সাগরদীঘীর পারে তিনি চৌধুরী-বাজার নামে এক বাজার স্থাপন করিয়াছিলেন। আজ কাল ঐ বাজারের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি "একখানা পদ্মা পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন।"[৮]

ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী হইতে আমরা এই বিবরণ এবং তদনুষঙ্গে অন্যান্য অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

---

৬. এই ভাগে সন্নিবেশিত ট পরিশিষ্টে বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য। এই বংশ বিবরণ প্রদাতা শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে মাধব, ধর্ম্মনারায়ণের পুত্র। অপরের প্রদত্ত বংশ তালিকায় মাধব তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ছিলেন। এ স্থলে মনে হইতেছে যে, ১৩১৪ বাংলার ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় ইটাবাসী খ্যাত নামা উকীল শ্রীযুত হরকিঙ্কর দাস মহাশয়, রাজভ্রাতা ধর্ম্মনারায়ণকে ছয়চিরির চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে যে প্রস্তুত হন নাই, বোধ হয় ইহাই তাহার কারণ। কিন্তু সে কথা স্বীকৃত হয় নাই।

৭. তালুক বন্দোবস্তকালে রূপরায় জীবিত না থাকিলেও গোবিন্দরায় পিতৃনামে বন্দোবস্ত নিয়া থাকিতে পারেন। পিতৃ নামে তালুকের নাম রাখার বহুতর উদাহরণ আছে। তাহা হইলে গোবিন্দরায় ঐ সময় নিশ্চিত জীবিত ছিলেন। মাধব রায়ের সময় নিরূপণে এ কথা বিবেচ্য। ট পরিশিষ্টে মন্তব্যে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

৮. এসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। যে যে বংশে গ্রন্থকারগণের উদ্ভব, সমর্থ হইলে সেই বংশীয় ব্যক্তিবর্গেরই কর্ত্তব্য যে তাহা মুদ্রিত করিয়া বিলুপ্তির হস্ত হইতে রক্ষা করা। কমল নারায়ণের মৃত্যুর পর শ্রীযুত গিরীশ চন্দ্ররায় চৌধুরী "বিলাপলহরী" প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদি তদীয় গ্রন্থ খানা প্রকাশিত হইত, তাহাতে সাহিত্যের সেবা, তথা মৃতের নাম রক্ষা হইত না কি?

পরগণা-বরমচাল গং

রামনারায়ণ সংবাদ

ভানু নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাম নারায়ণ। বিষ্ণুপুর গ্রামের স্থাপয়িতা ধর্ম্ম নারায়ণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। রাম নারায়ণের নামান্তর ব্রহ্ম নারায়ণ।[৯] রাজনগরের রাজ বিপ্লব কালে ইনি পাগড়িয়া নামক পার্ব্বত্য দুর্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। খোয়াজ ওসমানের বাশিরখাঁ নামক সেনা নায়ক[১০] কয়েকটি সৈন্য সহ তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি পাগড়িয়া নামক পথ দিয়া তথা হইতে বরমচাল চলিয়া যান। তথায় কিছু দিন অবস্থিতির পর, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের উদ্যোগে সেইস্থানে এক প্রকাণ্ড বাটীকা হয়। রাজ ভ্রাতাকে জন সাধারণ "রাজা" বলিয়াই সম্বোধন করিত, তাঁহার এই নবনির্ম্মিত বাটিকা কাজেই "রাজবাড়ী" বলিয়া আখ্যাত হয়।

ভাটেরার তাম্রশাসনে "নবপঞ্চাল" সংজ্ঞক স্থানটি বরমচাল বলিয়া অনুমিত হয়, এইস্থানে ব্রহ্মনারায়ণ বাটিকা প্রস্তুত করায় তাঁহার নামে ইহা "ব্রহ্মচাল" বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। বরমচালের রাজবাটী বর্ত্তমানে ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। বাড়ীর চারিদিকে প্রায় ২৫টি পুষ্করিণী আছে। ঐ বাড়ীর কিয়দংশ বরমচাল চা বাগানের ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কুলাউড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীহট্ট শহরাভিমুখে যে শাখা লাইন গিয়াছে, তাহার বরমচাল (বা রাজবাড়ী) ষ্টেশন উক্ত রাজবাড়ীর একাংশেই অবস্থিত।

ভূমি বিভাগ

রাম নারায়ণের পুত্রদ্বয়ের নাম প্রভাকর ও বিভাকর ছিল। প্রভাকর ও বিভাকর পৈতৃক বাটিকাতেই বাস করেন ও সেই স্থানে কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন; এই সৎকীর্ত্তির জন্য প্রভাকর ও বিভাকর যথাক্রমে রামচন্দ্র খাঁ ও বিভাপতি খা এই দুই উপনাম বা উপাধিতে খ্যাত হন। তৎপর দুই ভাই বরমচাল পরগণাকে দুইভাগে বিভাগ ক্রমে ভোগ করেন; পার্ব্বত্য কোটি ছড়াকে মধ্যসীমা নির্দ্ধারণ করিয়া উত্তরভাগ রামচন্দ্র খাঁ এবং দক্ষিণাংশ বিভাপতি খাঁ গ্রহণ করেন।

ভাটেরার তাম্রশাসনে গুড়াবয়ী বলিয়া একটা স্থানের নাম পাওয়া যায়, গুড়াবয়ী বর্ত্তমান গুড়াবই হইতে অভিন্ন বোধ হয়। বিভাপতি খাঁ এই স্থানে এক বৃহৎ দীঘী খনন করাইয়া বাড়ী প্রস্তুত করেন। রামচন্দ্র খাঁও ভ্রাতার অনুকরণে টিকরা গ্রামে (নন্দ নগরে) এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন ও বাড়ী প্রস্তুত ক্রমে তথায় গমন করেন।

সন্তান সন্তুতি

রামচন্দ্র খাঁর হরিহর, রত্নাচার্য্য ও পুরন্দর নামে তিন পুত্র হয়। হরিহর খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া টিকরাতেই অবস্থিতি করেন, রত্ন সিঙ্গুর গ্রামে গমন করেন এবং পুরন্দর উত্তরভাগ বাসী হন। ইঁহাদের বংশধরবর্গ তওস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। বিভাপতি খাঁর পুত্র গৌরপতি খাঁ, তৎপুত্র হরিপতি খাঁ;[১১] হরিপতি নিজ নামে হরিনগর গ্রাম স্থাপন করেন। হরিপতির পুত্র

৯. "১২৩৪ বাংলা নহে ১৩ বৈশাখ" তাবিখের লিখিত বংশ তালিকায় এইরূপই লিখিত আছে। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী আমাদিগকে যে বংশ তালিকা দিয়াছেন, তৎসহ ইহার ঐক্য নাই ও তদনুসারে ধর্ম্ম নারায়ণ দ্বিতীয় এবং রাম নারায়ণ তৃতীয়। পরন্তু তিনি রাম নারায়ণের নামান্তর (ব্রহ্ম নারায়ণ) থাকা একবারে অস্বীকার করেন এবং ব্রহ্মচাল নামের সহিত ব্রহ্ম নারায়ণ নামেব সম্বন্ধ প্রসঙ্গের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১০. বাশির খাঁ সৈন্য সহ যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা একটি টীলা; ঐ টীলাটি "বাশির খাঁর টীলা" নামে খ্যাত হইয়াছে। বরমাচালের শ্রীপুর মৌজায় দিগাইছড়া চা-বাগানের নিকট একটা স্থান "খোয়াজ ওসমানের গড়" নামে কথিত হয়। এই স্থানে তাঁহার কোন সৈনিক বা স্বয়ং তিনি সৈন্য সমাবেশ ও গড় ন, সন্দেহ নাই।

শ্রীপতিখাঁ শ্রীপুরের স্থপয়িতা। শ্রীপতির পুত্র চন্দ্রপতিখাঁ চাঁদরায় নামে পরিচিত ছিলেন; তিনি নিজ জনক জননীর মুক্তি কামনায় বাড়ীর সম্মুখে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ শিব অদ্যাপি "চাঁদরায়ের মার শিব" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"সতীকুণ্ড"—চাঁদ রায়ের তিনপুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামনাথ রায়ের পত্নী, পতির মৃত্যুর পর তাঁহার চিতাগ্নিতে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করেন; সেই পবিত্র চিতা "সতীকুণ্ড" নামে কথিত হইয়া থাকে। এই বংশের আরও দুইটি সতীর সহমরণ গমনের চিহ্ন স্বরূপ সতীকুণ্ড বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে রাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামগোপালের পৌত্র হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী একজন; অপরা রাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দ রায়ের পৌত্র রাজীব রায়ের স্ত্রী। রামগোপালের নামে একটা দীর্ঘিকা আছে।

রাম রায়ের পৌত্র রামেশ্বর "জনাবদার" খ্যাতি বিশিষ্ট ছিলেন। এ বংশীয় রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর নামে তত্রত্য ৪নং তালুকের এবং শ্যামরায় বংশীয় রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর নামে ১নং তালুকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রামনাথের অধস্তন ৭ম পুরুষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিশোর রায় চৌধুরী হইতে আমরা এই বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

টিকরার শাখা বংশ

রাম নারায়ণের পুত্র প্রভাকর বা রামচন্দ্র খাঁ টিকরা গ্রামে গমন করিয়া ছিলেন বলা গিয়াছে, রামচন্দ্র খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিহর খাঁর পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ খাঁ।[১২] তৎপুত্র জিতামিত্র (ওরফে বসন্তরায়), তাঁহার পুত্র জানকী নাথ (অনন্ত রায়), তৎপুত্র রামেশ্বর (খ্যাত কামদেব); ইঁহার ছয়পুত্র, তন্মধ্যে ২য় ও ৪র্থ পুত্র বংশ রক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মাধব রায়ের এক মাত্র পুত্র জয়রাম রায় চৌধুরীর নামে খ্যাত তত্রত্য ১নং তালুকের বন্দোবস্ত হয়, ইঁহার একমাত্র পুত্র সদানন্দের পুত্রাদি হয় নাই।

কামদেবের ৩য় পুত্র রঘুরামের (খ্যাত রাঘব রাম) চারিজন পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজীবরাম খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি নবাব হরকিযুণ মনসুর উল মুলক হইতে জনাবদার উপাধি সহ উক্ত পরগণার (সনন্দ নং ১৮৫) কতক ভূমি (পরিমাণ—১৩॥০ ।৫॥০) দেবত্র প্রাপ্ত হন। ১১৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে উক্তভূমি তৎপুত্র গোবিন্দরাম জনাবদারের তছরূপ থাকে। এই গোবিন্দ রামও যে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার জনাবদার উপাধি হইতেই তাহা বুঝা যায়।

রাজীব রায়ের তৃতীয় সহোদয় রামকান্ত এবং উক্ত গোবিন্দ রায়ের যুক্ত নামে দশসনা বন্দোবস্ত করেন। তত্রত্য ২নং "কান্ত গোবিন্দ" তালুকের উৎপত্তি হইয়াছিল।

রাজীব রায়ের পাঁচ পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দরাম জনাবদার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এবং "জগমোহন" ৪র্থ ছিলেন। জগমোহনের মাধ্যমে পুত্রের নাম বৈদনাথ (কামদেব), তৎপুত্র কবি রাধা নাথ।

পদ্মাপুরাণ প্রণেতা রাধানাথ

রাধানাথ শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর সীমা অতিক্রম করে নাই। তিনি চরিত্রবান পুরুষ ও গ্রামের অগ্রণী স্বরূপ ছিলেন। তিনি একখানা "পদ্মাপুরাণ" সুলিখিত

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ঠ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। বিভাপতি খাঁর পরবর্ত্তীদেরও খাঁ উপাধি ধারণ বোধ হয় আত্মকৃত। যেমন চৌধুরীর পুত্র চৌধুরী, মজুমদারের পুত্র মজুমদার উপাধি গ্রহণ করেন, তদ্রূপ।

১২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাগ ঠ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
পরবর্ত্তী বংশীয়গণের খাঁ উপাধি ধারণ বোধ হয় আত্মকৃত। যেমন সাধারণতঃ চৌধুরীর পুত্র চৌধুরী, মজুমদারের পুত্র মজুমদার উপাধি গ্রহণ করেন, তদ্রূপ।

পয়ারাদি ছন্দে রচনা করেন, তিন "শ্রীরাম চন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ" ও "মহিরাবণের পালা" নামে দুই খানা যাত্রার পালা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সঙ্গীত করিতেও সমর্থ ছিলেন; এই দুই পালা নিজবাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময় তিনি অভিনীত করেন। তদ্ব্যতীত এজেলার রমণীগণের উপযোগী বহুতর সঙ্গীত রচনা করেন। এই স্ত্রী-গেয় গীতাবলী "রাধানাথ সঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গীত দেবদেবীর লীলাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীত সমষ্টি-১৪৯টি। গ্রাম্য রমণীগণের বিরচিত হইলেও গীত গুলি সুন্দর। কবি রাধানাথের নানাবিধ গুণ ছিল, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল, তদ্ব্যতীত তিনি ভূতাবেশের চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। বিগত ১২৮৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ চৌধুরী হইতে আমরা এই বিবরণ সহ নিধিপতি বংশীয়গণের প্রামাণ্য অনেকগুলি বংশ তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি পূর্ব্বোক্ত পদ্মাপুরাণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

অন্য শাখা

প্রভাকর তনয় রত্নাচার্য্য সিঙ্গুর গ্রামে গমন করিয়া বাস করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইঁহার বংশধরবৃন্দ শিকদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। উত্তরভাগ বাসী পুরন্দর বংশধরবর্গ ভট্টাচার্য্য উপাধি ধারী। এই দুই বংশেব বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। ইহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত। নিধিপতি বংশীয় অনেকেই অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলই যে সাম্প্রদায়িক সমাজ ভুক্ত, সাম্প্রদায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। উচ্চ বা হীনবংশে বিবাহাদিই প্রধানতঃ সামাজিক উন্নতি অবনতির হেতু।

বীরনারায়ণ সংবাদ

রাজা ভানুনারায়ণের চতুর্থ পুত্রের নাম বীর নারায়ণ। সন ১২৩৪ বাংলার ১৩ই বৈশাখ তারিখের লিখিত "রাজ বংশাবলী তালিকা"তে লিখা আছে যে "চতুর্থ পুত্র বিদনারায়ণ। লংলা দেশের অধিপতি তাহার দৌহিত্র সন্ততি যবন।" বীরনারায়ণই এই বংশ তালিকাতে বিদনারায়ণ নামে উক্ত হইয়াছেন।

সকি সালামত নামক জনৈক পারশ্যাগত মোসলমান "৯০৬ বঙ্গাব্দে" দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বহুস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক "দিল্লীতে লোদী বংশীয় সম্রাটের সময় আগমন" করেন, তিনি শ্রীহট্টে কতক জায়গীর প্রাপ্ত হন ও এথায় আগমন করেন।[১৩]

এই সময় বীরনারায়ণ পলায়িত অবস্থায় লংলাতে ছিলেন, তাঁহার বিবাহযোগ্য পরমাসুন্দরী একটি তনয়া সঙ্গে ছিল, সকি সালামত ইঁহাকে বিবাহ করেন, বীর নারায়ণের দৌহিত্র বংশেই পৃথিমপাশার মোসলমান জমিদারদের উদ্ভব, পরবর্ত্তী ৯ম অধ্যায়ে এই বংশের কথা বর্ণিত হইবে।

রূপনারায়ণ

রূপনারায়ণ রাজা ভানু নারায়ণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র; ইনি তাঁহার দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভ সম্ভূত এক মাত্র পুত্র। রাজনগরের যুদ্ধে রাজ্যে সুবিদনারায়ণ পরাজিত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, অপর ভ্রাতৃবর্গের ন্যায় ইনিও প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন।

এই সময়ে বর্ত্তমান বনভাগ পরগণা ব্যাপিয়া এক বিস্তীর্ণ বনভূমি ছিল; বিজয় উপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তখন ইটা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বনভাগের বনে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলা গিয়াছে,[১৪] রূপনারায়ণও সেই বিপৎকালে বনভাগের বনে গিয়া লুক্কাইত হন।

১৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায় দেখ।

তিনি বনভাগেই বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ৬ষ্ঠ পুরুষে গৌরীনাথ শিকদার জন্ম গ্রহণ করেন। গৌরীনাথ কোন কারণে বনভাগ ত্যাগ করিয়া ভগবতীপুরে আগমন করেন, কিছুদিন তথায় অবস্থিতির পর এস্থান ত্যাগ করতঃ ইটার একামৌ গ্রামে আসিয়া বসত বাটী নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার বংশধরবর্গ অদ্যাপি তথায় আছেন।[১৫]

হৃষীকেশ বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে সপ্তম অধ্যায়ে বলা গিয়াছে যে, নিধিপতির পৌত্র কনর্প কন্দর্পের প্রপৌত্র দেবচন্দ্র, ইঁহার প্রপৌত্র কামদেবের মহাদেব নামে একপুত্র স্থানান্তর গমন করেন; তাঁহার বাসস্থান "মহাদেবী বড়কাপন" নামে খ্যাত হয়। ইঁহার বংশধরগণ সসম্মানে বাস করিতেছেন। কামদেবের কয়েক পুত্রের মধ্যে একজনের নাম হৃষীকেশ, ইঁহার পুত্র রামনাথ, রামনাথের প্রপৌত্রের নাম শ্রীরাম, শ্রীরামের পুত্রের নামও হৃষীকেশ ছিল; ইটার হাড়িয়াবা ঐ গ্রামে হৃষীকেশের বংশীয়গণ বাস করিতেছেন।

এই গ্রামে স্বর্গীয় রণচণ্ডীদেবীর ধাতুনির্ম্মিত এক মূর্ত্তি আছেন। শঙ্খ-চক্র অসি-ত্রিশূল-ধারিণী সিংহবাহিনী এই ত্রিনয়না দেবীমূর্ত্তী প্রায় তিনপোয়া হস্ত উচ্চ। হৃষীকেশ বংশীয়গণ বলেন যে ঐ দেবী রাজা সুবিদ নারায়ণের পূজিতা; যবন বিপ্লব কালে ঐ মূর্ত্তি তাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন।[১৬]

হৃষীকেশের রামনাথ ও শিবনাথ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে রামনাথের শ্রীকৃষ্ণ ও হরিরাম নামে দুই পুত্র ছিলেন, ইঁহাদের বংশ বহুবিস্তৃত। হরিরামের পুত্র শুকদেব, তাঁহার তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র রাজ বল্লভ, তৎপুত্র সর্ব্বানন্দ, তাঁহার পুত্র শিবানন্দ, ইঁহার পুত্র শ্রীযুত সদানন্দ চক্রবর্ত্তী রাজ-পূজিত পূর্ব্বোক্ত রণচণ্ডীর মূর্ত্তির সংবাদ সহ এই বিবরণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

ইন্দ্রনারায়ণ বংশ

পূর্ব্বে হইয়াছে যে, ভানুনারায়ণ রাজোপাধি প্রাপ্তে বাটী প্রস্তুত ক্রমে তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৈত্রিক ভদ্রাসনেই অবস্থিতি করেন; ইঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ। ইঁহার পুত্র ভব নারায়ণ (শিভ নারায়ণ) যবন বিপ্লব কালে ভাটেরায় গমন করিয়াছিলেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহার পুত্র দীপ নারায়ণ ইটার পৈত্রিক বাসভবনে প্রত্যাগমন করেন; দীপ নারায়ণের পুত্র দেবানন্দ সুরানন্দ, দেবানন্দের বংশের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই সংবাদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারা এওলাতলী বাসী; তাঁহাদের ব্যবসায় মিরাসদারী।

১৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম অধ্যায় দেখ।

১৫. গৌরীনাথের গঙ্গানারায়ণ ও দুর্গাদাস নামে দুই পুত্র ছিলেন, উভয়েরই পরবর্ত্তী বংশধর তথায় আছেন; ইদানীং উভয় শাখা হইতে এক একজন কাণিহাটী গিয়াছেন, অপরেরা একামৌবাসী, এস্থলে একটি একটি বংশধারামাত্র দেওয়া গেল; যথাঃ-গৌরীনাথ; তৎপুত্র গঙ্গানারায়ণ, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তাঁহার পুত্র রাম দেব, তাঁহার পুত্র রাজ কৃষ্ণ, ইঁহার পুত্রের নাম হরকৃষ্ণ, তৎপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ, ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ বিশারদ হইতে আমরা এই বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৬. সিদ্ধকালী-মহাদেবী বড়কাপনেও এক প্রস্তরময়ী প্রাচীন কালী মূর্ত্তি আছেন, ইনি যে তত্রত্য প্রাচীন বংশীয়গণের পরিপূজিত, তাহা সহজেই বোধ হয়। জনাবদারের পুষ্করিণী খনন কালে এই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির "কাঠাম" প্রাপ্ত হওয়া যায়। দীপরাম কালী মূর্ত্তিকে তত্রত্য রমাকান্ত ন্যায় বাগীশের করে সমর্পণ করায়, তদ্বংশীয়গণ কর্ত্তৃক তদবধি ঐ কালী যথারীতি অর্চ্চিত হইতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইটা, বরমচাল প্রভৃতি স্থানের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ

শ্রীহট্টের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা সামান্য নহে, এবং জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই সেই বংশীয়গণ সসম্মানে বাস করিতেছেন। এ অধ্যায়ে তাঁহাদের সকলের বংশকথা বলিতেছি না, যাঁহাদের কাহিনী এ অধ্যায়ে কথিত হইতেছে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক শ্রেণী ভুক্ত।

পরগণা-ইটা

"ডলার কাশ্যপ কুলের নন্দন" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। ডলার ক্যাশপগণ কুলে শীলে সাম্প্রদায়িক সমাজে যে বিশেষ গৌরবান্বিত ছিলেন, এই কথাটিতে কি তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে?

মহারাজ আদিধর্ম্মপার সময়ে যখন কাশ্যপাদি অপর[১] পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন, কথিত আছে গদাধর মিশ্র (নামান্তর রামকৃষ্ণ) তখন মিথিলা হইতে এদেশে আসিয়া এক মঠ স্থাপন করেন ও সেই মঠ রক্ষার ভার অন্য এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া নিজ দেশে কিয়ৎকালের জন্য চলিয়া যান। তাঁহার পুত্র দামোদরের পুত্রাদি অধ্যয়নানুরোধে তখনও মিথিলায় ছিলেন। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় শ্রীহট্টাগত শ্রীপতির পুত্র প্রভাকর তথায় অধ্যয়ন ব্যাপদেশে থাকিতেন। পিতার অভিপ্রায়ে দামোদর ইঁহার করে আপন দুহিতাকে অর্পণ করেন। গদাধরের সে দেশেই মৃত্যু হয়।

দমোদরের দুই পুত্র; হলধর মিশ্র অর্জ্জুন মিশ্র। শিক্ষা সমাপনান্তে ইঁহারা মিথিলা হইতে শ্রীহট্টে আগমন করেন।

ইঁহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হলধরের বংশে পরবর্ত্তীকালে সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়, ইনি মনু নদীর তীরদেশে একগ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক সেই স্থানে বসতি করেন, এবং পূর্ব্ব পুরুষের বসতি স্থানের নামানুসারে সেই গ্রামকে ডলা নামে সংজ্ঞিত করেন। ইঁহার পঞ্চম পুরুষে তাঁহারই নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল, এই হলধরের পুত্রের নাম জগদানন্দ, ইঁহার তর্কবাগীশ উপাধি ছিল।

কোন এক সামাজিক বিবাদমূলে এই সময়ে কাশ্যপ গোত্রীয়গণ বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কেহ সপ্তগ্রামের পাত্রীকুল, কেহ বা গোবিন্দবাটী গমন করেন; জগদানন্দ স্বয়ং চেঙ্গুর গ্রামে চলিয়া যান।

সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত বিবরণ মতে তাঁহাদেব মধ্যে প্রথমে বৎস্যাদি পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন, ইঁহারা দেশে গিয়া কাশ্যপাদি অপর পঞ্চগোত্রীয়কে আনয়ন করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে (এবং এই ভাগের উপক্রমণিকায়) তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

জগদানন্দের বংশাখ্যান

জগদানন্দ সেই স্থানেই জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন, নানা বিষয়ে অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি ডলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু জগদানন্দ[২] পরলোক গমন করিলে পর তাঁহার পুত্র রঘুনাথ বিশারদ ডলায় চলিয়া আসেন। রঘুনাথ বিশারদ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। নবাব লুৎফউল্লা খাঁ বাহাদুর হইতে ১০৭০ বাংঙ্গলায় তিনি কতক ভূমি দান প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ বিশারদ নবাব মহাফতা খাঁ বাহাদুর হইতে ১০৭৭ বাংঙ্গলায় আরও সার্দ্ধ ত্রিহল ভূমি (মদতমাস স্বরূপ) দান প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।[৩]

রঘুনাথের পুত্রের নাম রতিকান্ত তর্কালঙ্কার, তর্কালঙ্কার একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন, নবাব লুৎফউল্লা খাঁ প্রদত্ত সনন্দে (নং ৬৮) আলীনগর হইতে তিনি ৫৷৷২।৪ ভূমি (মদতমাস স্বরূপ) প্রাপ্ত হন।

এই সনন্দে প্রাপকের বাসস্থান আলীনগর লিখিত থাকায় অনুমিত হয় যে তিনি কিয়ৎ কালের জন্য তথায় গমন করিয়া থাকতে পারেন। তর্কলঙ্কারের মৃত্যুর পর উক্তভূমি তৎপুত্র কৃষ্ণরাম ন্যায়ালঙ্কারের "তছরূপ" থাকে।[৪]

কৃষ্ণরাম ন্যায়লঙ্কার এক সময়ে কামরূপ সিদ্ধপীঠে গমন করিয়াছিলেন, তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তিনি একাধিক্রমে অষ্টোত্তরশত পুরশ্চরণ করেন, কিন্তু তাহাতে সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই।[৫] কৃষ্ণরামের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম আপন গুরুর নিকটে একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া সেই মন্ত্রে বালক ঘনশ্যামকে দীক্ষিত করতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, উপনয়ন উপলক্ষে উপস্থিতি হইয়া গুরুদেব সেই মন্ত্রেই ঘনশ্যামকে দীক্ষিত করেন। ঘনশ্যাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার ন্যায় কামরূপ গমন করিয়া সাধনে প্রভৃত্ত হন ও অচিরেই সিদ্ধিলাভ করেন।

---

২. বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক এক কুল গ্রন্থের কল্পিতত্ত্বের বিষয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে আলোচনা করা গিয়াছে; বলা গিয়াছে যে ঐ নামে কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব সাম্প্রদায়িকদের মধ্যে অনেকেই অস্বীকার করেন; তবে শ্রীহট্টে বৈদিক ব্রাহ্মণাগমন সম্বন্ধে কয়েকটা শ্লোক আমরা ডলা হইতে কাশ্যপ গোত্রীয়ের যে বিবরণ পাইয়াছি তাহাতেও উহা জগদানন্দের রচিত বলিয়া উল্লেখিত হয় নাই। জগদানন্দকে রাজা সুবিদ নারায়ণের সমসাময়িক বলা হইয়াছে; ইঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে নানারূপ বিভিন্ন বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহা একে অন্যের বিসংবাদি, সে জন্য সে সকল সংশয়াত্মক কথা ত্যাগ করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ১য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে উদাহরণ স্থলে রঘুনাথ বিশারদ নামীয় উক্ত দুখানা সনন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। নবাব মহাফতা খাঁ প্রদত্ত সনন্দ (নং ৪০) ইঁহারই প্রাপ্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু নবাব লুৎউল্লা খাঁ প্রদত্ত সনন্দে প্রাপকের ঠিকানা স্থলে "শমশের নগর" লিখিত আছে। সনন্দ দাতা উভয় নবাবই সম্রাট আরঙ্গজেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

৪. শ্রীহট্টের কলেক্টরীতে সনন্দের যে সকল নকল বহি আছে, তাহাতে উক্ত সনন্দের মন্তব্যে কৃষ্ণরামের মৃত্যুরপর ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য ঐ ভূমি "তছরূপ" করেন বলিয়া লিখিত আছে এবং তাহাতে জন আমুটি সাহেবের দস্তখত আছে। আমরা যে বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে কৃষ্ণরামের উপাধি ন্যায় বাগীশ লিখিত হইয়াছে, সনন্দে "ন্যায়ালঙ্কার" উপাধি লিখিত।

৫. কথিত আছে কৃষ্ণরাম সিদ্ধি লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া নায়িকা সাধনে প্রবৃত্ত হন ঐ নায়িকা একদা ভাবান্তরিত হইয়া বলিয়াছিল যে কৃষ্ণরাম পূর্ব্বজন্মে বুরুঙ্গায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে যে কুশময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করা হয়, "ক্রিয়ান্তে" তিনি তাহা মুক্ত না করিয়া বিসর্জ্জন করাতে শত ব্রহ্মহত্যার পাতক তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তৎকৃত শত পুরশ্চরণে সেই পাতক সক্ষালিত হইয়া অবশিষ্ট আটটি পুরশ্চরণ মাত্র পুণ্যজনক হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা এ জন্মে আর কিছু হইবে না, তবে তাঁহার পুত্র অনায়াসে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে। এই প্রত্যাদেশ কাহিনী কৃষ্ণরাম মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় গুরুর নিকটে মাত্র ব্যক্তি করিয়াছিলেন। ডলার কাশ্যপ গোত্রীয়গণ ইঁহাকেই "বৈদিক পুরাবৃত্ত" সংজ্ঞিত বিবরণ রচয়িতা করেন।

ঘনশ্যাম দেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি নিদর্শন দর্শনে অনেকেই তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; গয়ঘর নিবাসী শ্রীচন্দ্ররায় তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন।

ঘনশ্যামের পুত্র রাধাকান্ত ও শ্যামানন্দ। শ্যামানন্দ তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাধাকান্তের পুত্র ভবানন্দ সিদ্ধান্ত একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ভবানন্দের বংশীয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ ভট্টাচার্য্য হইতেই এই বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

পরগণা-শমশের নগর

মহামহশ্রের কাশ্যপ কথা

পূর্ব্বে অর্জ্জুন মিশ্রের নামোল্লেখ করিয়াছি, অর্জ্জুন মিশ্রের পরে তদ্বংশে কয়েক পুরুষের নামগুণ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। এই বংশে প্রায় একাদশ পুরুষ উর্দ্ধে হরিশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্রের নাম রামচন্দ্র। এই রামচন্দ্র মহাসহস্র বা মালা গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। রামচন্দ্রের পুত্রের নাম কমলাকান্ত, এক নাগপঞ্চমী দিনে সর্পাঘাতে কমলাকান্তের মৃত্যু হয়। রামদেব বিদ্যারত্ন, মহাদেব সার্ব্বভৌম ও কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য নামে তাঁহার তিন বংশ প্রবর্ত্তক পুত্র ছিলেন।

সার্ব্বভৌম ও বিদ্যারত্ন পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করিয়া পৃথক দুই বাটীকা নির্ম্মাণ ক্রমে বাস করেন, কনিষ্ঠ কৃষ্ণদেব পূর্ব্ববাটিকাতেই বাস করিতে থাকেন। রামদেব, মহাদেব ও কৃষ্ণদেবের বাসস্থান যথাক্রমে পূর্ব্বপাড়া, মধ্যপাড়া ও পশ্চিম পাড়া নামে খ্যাত হয়। গয়ঘরের সোনারাম দত্ত নামক এক ব্যক্তি ইঁহাদের সময় এইস্থানে আসিয়া বাস করেন।

রামদেবের পুত্র রতিরাম তর্কালঙ্কার পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের নবাব হইতে অনেক ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। আমরা তাহার কোন নিদর্শন না পাইলেও রাজা সুবিদ নারায়ণের পুত্র ঈশা খাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্র দেওয়ান ইসমাইল খাঁর প্রদত্ত তন্নামীর একখানা দানপত্র কালেক্টরীতে পাইয়াছি, ইহাতে রতিরামকে একখানা খানেবাড়ী প্রদত্ত হইয়াছে।[৬]

রতিরামের গৌরবল্লভ ও হরবল্লভ নামে দুই পুত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মিথিলা গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হরবল্লভ উপাধি পরীক্ষায় "তর্কভূষণ" খ্যাতি লাভ করেন। উপাধি প্রাপ্তির পর তিনি মুর্শিদাবাদ রাজধানীর সন্নিকটে গঙ্গাতীরে তপস্যাতে রত হইয়াছিলেন।

সিদ্ধমালা

অমাবস্যাতে চন্দ্রোদয়ের বিচিত্র কথা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থানে বলা গিয়াছে; মুর্শিদাবাদের নবাব সভায় এক অমাবস্যা তিথিতে এই নৈয়ায়িক পণ্ডিত নাকি ভ্রমতঃ সেদিন পূর্ণিমা বলিয়া ফেলেন ও পরে নিজ বাক্যের সত্যতা পালনার্থে তপোবনে চন্দ্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নবাবগণ পণ্ডিত

---

৬. উক্ত দানপত্র (নং ৭৫) এইঃ–

"ইআদিকির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীরতিরাম ভট্টাচার্য্য সদাসএসু পত্র মিদং কার্জ্যাঞ্চ আগে তুমার মিরাস মৌজে রামেশ্বর মহল্লা মহাসহস্র সুনারাম কানুনগবই দিগির (দীঘীর) দক্ষিণ পব (পাবেতে) জে ভূমি খানেবাটী রহিয়াছে এই বাটী লাখিরাজ করিয়া দিলাম এর (ঐ জমি) আমল তছরূপ কবিয়া ভোগ করিয়া দও। করহ। ইতি ১১০৭ সন তারিখ ১০ জেলহজ্জ।

তপছিল–খানেবাড়ী–মোয়াজি।'

(একদিকে দেওয়ান ইসমাইলের পারস্য দস্তখত আছে।)

পাইলেই কেবল তিথি জিজ্ঞাসিতেন, আর জিজ্ঞাসার তারিখটাও অমাবস্যাতেই পড়িত, অবস্থা বিবেচনায় ইহা বলিতে হয়!

হরবল্লভ একজন তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, একথার প্রমাণ দিতে তদীয় ব্যবহৃত "মহাশঙ্খময়ী সিদ্ধমালা" বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার অধস্তন তিন পুরুষে ক্রমানুসারে এই সিদ্ধমালা জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তর্কভূষণ মুর্শিদাবাদ হইতে দেশে আসিলে অচিরেই তাঁহার গুণগ্রাম প্রচারিত হইয়া পড়ে; শ্রীহট্টের নবাব মোহাম্মদ জান বাহাদুর ২১ জলুস ১৫ই রমজান তারিখের সনন্দে (নং ৭১) তাঁহাকে ইটা ও আলীনগর হইতে ৬।১॥৬ ॥৬ ভূমি ব্রহ্মত্র দান করেন;[৭] হরবল্লভ ১১৭৫ বাংলা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তৎপর বর্ষে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয়পুত্র রামবল্লভ ভট্টাচার্য্য উক্তভূমি "তছরূপ" করেন। পিতার মৃত্যুর পরে রামবল্লভ মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন এবং তপঃস্থলে অবস্থিতি পূর্ব্বক মহাশঙ্খময়ী মালা জপ করতঃ সিদ্ধি লাভ করেন।

হরবল্লভের পুত্রের নাম রাধাবল্লভ ও রত্নবল্লভ। রত্নবল্লভ পিতামহের আশ্রমে গিয়া কয়েক বৎসর মালা জপ করিয়াছিলেন, তথা হইতে দেশে আসিয়া শিবমন্দির ও দুর্গামন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অতুল যশঃ ও পুণ্যভাগী হইয়াছিলেন।

সতী কমলাবতী

রত্নবল্লভের পত্নী এক আদর্শ সতী ছিলেন, তাঁহার নাম কমলাবতী দেবী। পতির মৃত্যুর পর তিনি স্বামী দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া তনুত্যাগ করিতে উদ্যতা হন; আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বিরত করিতে কত চেষ্টা করিলেন. কিন্তু তিনি কোন নিষেধ বাধা না মানিয়া জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে দেহ সমর্পণ পূর্ব্বক হিন্দু রমণীর সতীত্বের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আখালিয়া তীরে সেই "সতীকুণ্ড" অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

অভিশাপ

রত্নবল্লভের চারিপুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠপুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রঘুদেব পরম সাধক ছিলেন. এবং স্থানীয় জমিদারের নিকট হইতে অনেক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন; তাঁহারা সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মত্র দান করিয়াছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র. ইঁহাদের নাম কৃষ্ণনাথ তর্কালঙ্কার ও গোলক নাথ ভট্টাচার্য্য।

তর্কালঙ্কার ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাশীবাসী বেদান্ত সরস্বতী খ্যাতি বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী এক পণ্ডিতকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করায় সেই পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহার কিছু কাল পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২৮৯ বাংলার ১লা চৈত্র তারিখে ইঁহাদের গৃহদাহ হয়। পূর্ব্বোক্ত "মহাশঙ্খ মালা" ইদানীং কিংখাপ বস্ত্র-বেষ্টনী মধ্যে সিন্দুকে রক্ষিত হইত; সকলই ভাবিল যে সিদ্ধমালা এতদিনে নষ্ট হইল; কিন্তু পরে দেখা গেল যে মালা নষ্ট হয় নাই— সে মহামালা জ্বলে নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গোলক নাথের সুযোগ্য পুত্র "মহাশক্তি বা পরমেশ্বর" গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ কাব্য সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের অধিকারে উক্ত মালা এক্ষণে আছে।

৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে "অনির্দ্দিষ্ট কালীয় আমিলদের নাম" তালিকায় নবাব মোহাম্মদ জান বাহাদুরের নাম লিখা হইয়াছে। এই সনন্দে "২৩ জলুস" তারিখ প্রাপ্ত হওয়ায়, উহা সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজ্যারোহণের কাল ধরিয়া অবধারিত হইল। কাজেই এই সনন্দ প্রাপ্তির কাল ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ। এই সময়েই নবাব মোহাম্মদ জানের শ্রীহট্ট শাসন কাল। ইনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের নায়েব ফৌজদার ছিলেন।

সতী লক্ষ্মী

কমলাকান্তের বংশে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র-তনয় রতিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরবল্লভ কামরূপ গমন করিয়াছিলেন ও বহুদিন তথায় ধর্ম্মসাধন করেন। তিনি দেশে আসিলে বহুব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ধন্য হইয়াছিল। ইঁহার পুত্রে নাম হরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য। হরগোবিন্দের পুত্র রামগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশের পত্নী লক্ষ্মীদেবী পতির মৃত্যুর পর পতিদেহ-কোলে সহমরণ শয্যায় শায়িতা হন, সেদিন দোল পূর্ণিমা তিথি ছিল। ইঁহাদের পুত্রের নাম গঙ্গা গোবিন্দ ন্যাপঞ্চানন. তিনি পরম পণ্ডিত ও অধ্যয়ন-নিরত ব্যক্তি ছিলেন, সদা পুস্তক লইয়া বিব্রত থাকিতেন।

কমলাকান্তের মধ্যম পুত্র মহাদেব সর্ব্বভৌমের নাম করিয়াছি, তাঁহার পুত্র রাম জীবন বিদ্যালঙ্কার কৃত বিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, নবাব মোহাম্মদ জান বাহাদুর ৫ জলুসে (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) ইঁহাকে এক সনন্দে (নং ৬৭) আলীনগর হইতে ভূ-পরিমাণের খানেবাড়ী দান করেন। তাঁহার পুত্র রামকান্ত ভট্টাচার্য্য উহা "তছরূপ" করেন, তৎপর ইহা রতিকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র শিরোমণি প্রাপ্ত হন। পিতা পুত্র উভয়েই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পত্নীও স্বামীব অনুরূপা ছিলেন।

সতী শাশুড়ী বধু

এবংশে অনেকেই পবিত্র নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। রামকান্তের মৃত্যুর পর যখন চিতাভগ্নিতে তদীয় নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়, তদীয় পত্নী মনোরমা তখন "সহমরণ" গমনে পাতিব্রাত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শনে প্রতিবেশিবর্গের চিত্ত পবিত্র করেন। একটি জীবিতা অবলা বালা অবহেলে জ্বলন্ত অনলে আত্মপ্রাণ আহুতি দিতে দেখিলে লোকে বিস্মিত হইত, গ্রামে বহুদিন সে আন্দোলন চলিত, আর তাহার আলোচনায় লোকের চিত্ত পবিত্র হইত। সতীর পতিভক্তির ঈদৃশ জীবন্ত উদাহরণে সমাজের যাদৃশ নৈতিক উপকার হইত, বহু গ্রন্থপাঠে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মনোরমা দেবীর জ্যেষ্ঠা বধূ—রামচন্দ্র শিরোমণির পত্নী গঙ্গাদেবী ও শাশুড়ীর ন্যায় যথাকালে সহমরণ গমনে সতীর পবিত্রব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বরণীয়া হইয়াছেন।

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামানন্দের পুত্র গৌরীকান্ত আগমবাগীশ তন্ত্র শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পরম সাধক ছিলেন. ইনি শশ্মান সাধন করিতেন, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া উন্মাদবৎ শেষজীবন যাপন করেন। রামচন্দ্রের পুত্র রামকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র শ্রীযুত কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় জীবিত আছেন।[৮]

গোবিন্দবাটীর শাখাবংশ

কাশ্যপ গোত্রীয়ের প্রথমাগমন

নিধিপতি-বংশোদ্ভব বাৎস্য গোত্রীয় গোবিন্দরায় চৌধুরীর নামেই সম্ভবতঃ এস্থান "গোবিন্দবাটী" নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে। গোবিন্দ রামের বৃহৎ বাটী এই স্থানেই ছিল। গোবিন্দরাম অপুত্রক ছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র কন্যাকে তিনি ডলার কাশ্যপ গোত্রীয় শুকদেব শিরোমণির করে সমর্পণ করিয়া জামাতাকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করেন। গোবিন্দরামের

৮. এই বিবরণ ডলাবাসী শ্রীযুক্ত তরণী কুমার ভট্টাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত।

বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্তে শুকদেব ডলা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্বশুরালয়ে বাস করেন। ইঁহার বংশীয়গণই গোবিন্দবাটীর অধিবাসী।

শুকদেবের পুত্র রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তাঁহার রামচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র নামে তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে রামচন্দ্র ও শ্রীচন্দের বংশ বর্ত্তমান আছেন।

পতিব্রতা অহল্যা

হরিশ্চন্দ্রের পত্নী অহল্যাদেবী অতুলনীয় পতিভক্তিসম্পন্না রমণী ছিলেন; তিনি প্রতিদিন পবিত্র ভাবে পুষ্পচয়ন করিতেন, স্নানান্তে সেই চয়িত কুসুমে পতিদেবতার পাদপদ্ম আর্চ্চনা করিতেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। একদা হরিশ্চন্দ্রের স্থানান্তরে গমনের আবশ্যক হয়; সতীর নিত্যকর্ম্ম তখন চলিবে কিরূপে? হরিশ্চন্দ্র পত্নিকে বলিলেন যে পতির প্রতিনিধি রূপে পশুপতির আর্চ্চনা করিয়া অন্ন গ্রহণ করিও। তদনুসারে পতির অনুপস্থিতে তিনি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পতির উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন।

হরিশ্চন্দ্রের জীবনান্ত হইলে পতিব্রতা অহল্যা তিলার্দ্ধ বিলম্ব ব্যতিরেকে পতির চিতাশয্যায় সাগ্রহে শয়ন করেন। সতীর সহমরণে শত শত ব্যক্তি সমবেত হইল, শশ্মানে কুসুম রাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেকিতে লোকের ভক্তিপুত চিত্তে পবিত্র ভাব উদ্রেক করিয়া, তাহাদের জয়ধ্বনির মধ্যে সতীদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী কথা

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকান্ত পরম ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি স্বগৃহে ধাতুময়ী এক দুর্গা মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূর্ণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। একদা তাঁহার গৃহদাহ হয়, তাহাতে সমস্তই দগ্ধীভূত হইয়া যায়; শ্রীকান্ত নশ্বর সম্পত্তির জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া স্বগীয় দুর্গামূর্ত্তির জন্য হাহুতাশ করিতে লাগিলেন। যখন ছাইভস্ম খুঁজিয়া স্বগীয় দুর্গামূর্ত্তি পাওয়া গেল না, ঈদৃশ দুর্ঘটনা মূলে দেবীর এই অন্তর্দ্ধান ব্যাপার নিজের পাপেরই ফল স্বরূপ মনে করিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মপ্রাণ পরিত্যাগে প্রস্তুত হন। কথিত আছে তখন এক নারিকেল বৃক্ষে ঐ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ইহা দেবলীলা কি ভক্তের নিষ্ঠা পরিক্ষার্থী কোন চতুরের কার্য্য, কে বলিবে?

শ্রীকান্তের ছয়পুত্রের একতমের নাম জগন্নাথ, তৎপুত্র সারদা, তাঁহার পুত্র শ্রীযুত শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত শ্রীমূর্ত্তির সেবাধিকারী।

রাঘবেন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীচন্দ্রের উমাকান্ত ও রামকান্ত নামে দুই পুত্র হয়। উমাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিকান্ত তন্ত্রোক্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দবাটীর দীঘীর পশ্চিম তীরে এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া, এস্থানে থাকিয়া সাধন করিতেন। কথিত আছে, দূর হইতে লোকে এই স্থানে নানাবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইত; কেহ কখন বা সন্ন্যাসীকে শত-পথিক পরিবৃত দেখিত, শূন্যস্থানে কেহ বা হোমাগ্নি শিখা প্রত্যক্ষ করিত। সন্ন্যাসী লোক-সঙ্গ-ত্যাগী ও ধ্যান ধারণাপরায়ণ ছিলেন। এসকল দৃশ্য দ্রষ্টাদের দৃষ্টি-বিভ্রম-জনিত কি না কে বলিবে? ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কালীকান্ত টেঙ্গরার ভরদ্বাজ গোত্রীয় নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া রেঙ্গাতে গমন করেন, এক্ষণে তদীয় প্রপৌত্র তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। কালীকান্তের অগ্রজভ্রাতা রামকান্তের প্রপৌত্রও জীবিত আছেন।

পূর্ব্বোক্ত রামকান্তের দুই পুত্রের নাম সর্ব্বানন্দ চূড়ামণি ও গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। সর্ব্বানন্দ

একটোল স্থাপন করিয়া শত শত ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন। গৌরীকান্তের তিন পুত্রই নিঃসন্তান ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোপী কান্ত একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তরফে একবার এক ব্যাপার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া, প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্রিত হন, গোপীকান্ত সেই ব্যাপারের সদস্য পদে নিয়োজিত হইয়া সুচারু রূপে তাহা সম্পাদন পূর্ব্বক যুগ্ম পট্ট-বস্ত্র "বরণ" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৯]

হংস খলা

ইটার হংসখলা (হাঁস খলা) গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় আর এক বংশ আছেন; ইঁহারাও পাশ্চাত্য বৈদিক। ইঁহারা পরবর্ত্তী কালে এ অঞ্চলে আগমন করেন। এ বংশে রামদেব বিদ্যাভূষণ তান্ত্রিক সাধনা-নিরত ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী।

আমাদিগকে কেহ লিখিয়াছেন যে, হংসখলাব অনন্তরাম পণ্ডিত স্বীয় কন্যাকে বৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-নৃপতি ভানুরামের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহা হইলে অনন্তরামের বংশধরগণ রাজা সুবিদনারায়ণের মাতুলবংশীয়। উক্ত বিবরণ প্রদাতার মতে অনন্তরামের পুত্রের নাম রামগোবিন্দ, ইঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী. গঙ্গারামের পৌত্র কামদেব বাচস্পতি. তাঁহার পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ. ইঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র তত্রত্য শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান আছেন।

পরগণা-বরমচাল

প্রবাদ বাক্য

একটা প্রবাদ আছে,— "সেনধর চক্রবর্ত্তী, বরমচালের উৎপত্তি।" এই প্রবাদমূলে বুঝা যায় যে, উক্ত তিন বংশীয়গণ বরমচালের আদিবসতকার ও প্রধান ছিলেন। বর্ত্তমানে এই তিন বংশীয়গণের কেহ বরমচালে নাই; এক রমণীর অভিশাপই বংশ বিনাশের হেতু।

বরমচাল পরগণার আলীনগর গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় রতিরাম তর্কালঙ্কার স্বীয় শিষ্য সেন বংশীয়ের আগ্রহে বাস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম জয়রাম, তৎপর রাম দেব এবং তাঁহার পুত্রের নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য।[১০]

নারী বর্জ্জন

জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য জীবিত থাকা কালে তদীয় শিষ্য কর্ত্তৃক একটা অতি নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার শিষ্য তত্রত্য জমিদার "সেন"[১১] বাড়ুয়া পাহাড়ে শিকারে গমন করিয়াছিলেন। দুর্ভেদ্য বনে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ কালে তিনি অপূর্ব্ব রূপবতী এক বনদেবীর দর্শন পাইয়া বিমোহিত হন। বনদেবী রূপিনী সেই কানন বাসিনী রমণীকে তিনি সাদরে গৃহে আনিলেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই কামিনীর প্রতি তাঁহার আশক্তি কমিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এই কামিনী মানবী নহেন—মায়াবিনী; নতুবা দর্শন মাত্রেই তৎপ্রতি

৯ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইটা) হইতে প্রাপ্ত।

১০ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে "সনন্দ প্রাপক জয়রাম" কথা দ্রষ্টব্য; উভয় বংশে তিন পুরুষে নামের আশ্চর্য্য ঐক্য, উভয় বংশই বরমচাল বাসী

১১ তত্রত্য "সেনের বাড়ী" রাজবাড়ীর ন্যায় প্রকাণ্ড; তদ্ব্যতীত "সেনের গোঘাট" প্রভৃতি সেন বংশের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

তাঁহার এত আশক্তি জন্মিবে কেন? তিনি এই কথা নিজ গ্রামস্থ কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় জনৈক চক্রবর্ত্তীকে ও ধর বংশীয় এক ব্যক্তিকে জানাইলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শে তিনজনে একত্রে উক্ত রমণীকে হাকালুকির মধ্যস্থ কাচলিয়া টীলায় লইয়া গেলেন ও সেই স্থানে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন।

সেই কামিনী জলবেষ্টিত নির্জ্জন স্থানে পরিবর্জ্জিতা হইয়া কি করিয়াছিলেন, জানা যায় না। কিন্তু কিছুকাল মধ্যে সেন ও চক্রবর্ত্তীর বংশ বিলুপ্তি ঘটিল। ব্যাপার দেখিয়া "ধর" ভয়ে দেশত্যাগী হইলেন। ইহা যে আশ্রয়বিহীনা অবলার উপর অন্যায় অত্যাচারের ফল নহে—ইহা যে বিনাদোষে পরিবর্জ্জিতা সেই কামিনীর অভিশাপের পরিণাম নহে, তাহা কে বলিবে?

অভিশাপের ভয়ে ধর দেশত্যাগী হইলে তত্রত্য ভট্টাচার্য্য বংশীয় জগন্নাথ একাই সেই স্থানে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা অনেকটা হীন হইয়া পড়িল, তাঁহার পুত্র গঙ্গারামও তদবস্থায় সেই স্থান বাসী ছিলেন। তৎপুত্র নন্দরামেরও সেই দশা।

সতী রুক্মিনী

নন্দরামের এক কন্যা সন্তান ও এক পুত্র হয়, ইঁহাদের নাম রুক্মিনী ও ভবানন্দ। রুক্মিনীকে তত্রত্য রাউৎ গ্রামবাসী বাৎস্যগোত্রীয় দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী বিবাহ করিয়া সেই স্থানে আগমন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রুক্মিনী স্বামীর সহিত "সহমরণ" গমন করিয়া ছিলেন। ভবানন্দের শিবানন্দাদি চারি পুত্র হয়, কনিষ্ঠ দুর্গাসদয় খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দুর্গাসদয়ের জন্ম হয়, আট বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন ও ভাটেরা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল বলিয়া সেই সময়েই তাঁহাকে শিক্ষায় বিরত হইয়া অর্থ চিন্তায় বিব্রত হইতে হয়; অনন্যোপায় হইয়া তিনি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তাহা ত্যাগ করিয়া বরমচাল চা বাগানে সামান্য বেতনে একটী কর্ম্ম স্বীকার করেন ও নিজেদের কতটুকু জমি ১২০ টাকা বাৎসরিক জমায় বাগানের মেনেজার সাহেবকে পত্তনি প্রদান করেন।

তাঁহার দক্ষতায় সাহেব তৎপ্রতি তুষ্ট ছিলেন এবং অচিরেই তাঁহাকে ৬০ মাসিক বেতনে বড়বাবুর পদে উন্নীত করেন এবং বাসা খরচের জন্য আরও মাসিক ২০ টাকা দেওয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। দুর্গাসদয় ১৫ বৎসর এই বাগানে কাজ করেন। অতঃপর তিনি কার্য্যত্যাগ করিয়া গ্রামের দুইজন বৃদ্ধ মোসলমান সহ পরামর্শ ক্রমে গ্রামে একটি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। দুষ্ট ব্যক্তি মিত্র হইলেও সর্পদষ্ট আঙ্গুলীর ন্যায় ত্যজ্য এবং শিষ্ট লোক শত্রু হইলেও তিক্ত ঔষধের ন্যায় গ্রহণীয়, ইহাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্গা সদয়ের চেষ্টায় এইরূপে গ্রামের সকল উৎপাতই দূর হইয়া শান্তির আবির্ভাব হয় এবং অচিরেই তিনি লোভের ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। সেই গ্রামে হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্দ্য বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ৫১ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। শিবানন্দের পুত্র শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত বৃত্তান্ত হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়
ইটার কাত্যায়ন, পরাশর ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ

কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের কথা

আদি ধৰ্ম্মপার সময়ে কাত্যায়ন গোত্রীয় শ্রীধরাচার্য্য শ্রীহট্ট দেশে আগমন করেন, এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে তাহা বলা গিয়াছে এবং ঝ পরিশিষ্টে বংশ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।[১] শ্রীধরাচার্য্য হইতে অষ্টাবিংশতি পর্য্যায়ে প্রসিদ্ধ তার্কিক শিরোমণির ভ্রাতা রঘুপতির উদ্ভব হয়, রঘুপতি রাজা সুবিদ নারায়ণের কন্যা বিবাহ করিয়া ইটাবাসী হন, ইঁহার বংশাবলী অতি বিস্তৃত।

গ্রন্থকার রঘুদেব

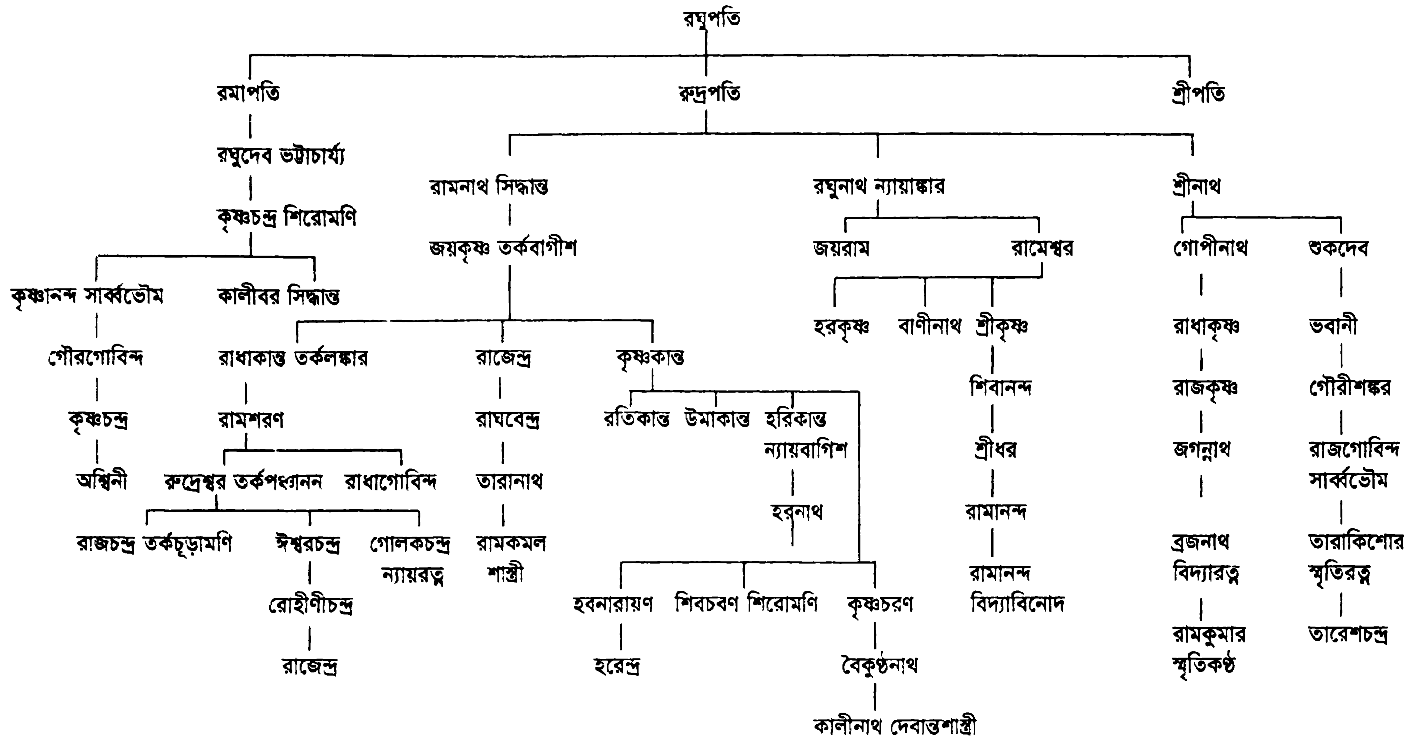
রঘুপতির তিনপুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রমাপতি, ইঁহার পুত্র রঘুদেব একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, ইঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া জননী অরুন্ধতী রত্নগর্ভা হন। রঘুদেব গঙ্গাতীরে গমন করিয়া অষ্টোত্তর শত সংখ্যক পুরশ্চরণ করেন, কিন্তু তাহাতে তিনি মনে কোন পরিবর্ত্তন অনুভব করিলেন না,–ইষ্টদেবীর কৃপা প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই বোধ করিলেন। অতঃপর তিনি তন্ত্রোক্ত যোগিনী সাধনে বৃত হইয়া অচির-কাল মধ্যেই সিদ্ধ-মনোরথ হন এবং সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। দেশের বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করতঃ তৎপ্রদর্শিত পথানুসরণে সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ সিদ্ধির পথে প্রধাবিত হইয়াছিল। তিনি সাধক গণের সুবিধার জন্য সেই বিশেষ উপসেনা প্রণালী বিবৃত ক্রমে "গদাবেগ" নামে[২] এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহার উপসনাস্থান "কালীবাড়ী" বলিয়া খ্যাত, তথায় তৎপ্রতিষ্ঠিত কালী বিদ্যমান আছেন।

গ্রন্থকার কালীচরণ

ইঁহার পৌত্র কালীচরণ সিদ্ধান্ত একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, কথিত আছে, একদা মহাসহস্র গ্রামে "ধ্বজারোপণ" ব্যাপারে কাত্যায়ন গোত্রজ কোন ব্যক্তি ব্যবস্থা দান করেন, এই উপলক্ষে তাঁহাকে অপমানিত করিতে ইটার অন্যান্য পণ্ডিতগণ সমবেত হন। একথা রাষ্ট্র হইলে ব্যবস্থা দাতা ইঁহার শরণাপন্ন হন; কালীচরণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে প্রায় শতাধিক পত্র সমন্বিত "ধ্বজারোপণ বিবেক" নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক সাহায্যে তিনি পূর্ব্বব্যবস্থা প্রবল রাখিয়া স্ববংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। "বিবেক" অস্ত্র

১. ৩য় ভাগ ২য় খণ্ডে সংযোজিত ঝ পরিশিষ্টের লিখিত বংশাবলীর অনুল্লেখিত একদেশেঃ–(১নং ফুটনোটের বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় দেখুন।) -প্রকাশক

২. গদাবেগের আদি শ্লোকটি এইঃ–
"কালীং সচ্চিন্ময়ীমম্বাং শিবযুক্তাং সনাতনীং।
গুরুঞ্চ জ্ঞানদং সাক্ষাৎ স্তৌমি স্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে॥
তন্ত্র শাস্ত্রান সমালোচ্য সারমাহৃত্য যত্নতঃ।
শ্রীরঘুদেব দীবেণ গদাবেগঃ প্রতন্যতে॥"


রঘুপতি
রমাপতি
রুদ্রপতি
শ্রীপতি
রঘুদেব ভট্টাচার্য্য
কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি
কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম
কালীবর সিদ্ধান্ত
গৌরগোবিন্দ
কৃষ্ণচন্দ্র
অশ্বিনী
রামনাথ সিদ্ধান্ত
জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ
রাধাকান্ত তর্কলঙ্কার
রামশরণ
রুদ্রেশ্বর তর্কপঞ্চানন
রাধাগোবিন্দ
রাজচন্দ্র তর্কচূড়ামণি
ঈশ্বরচন্দ্র
গোলকচন্দ্র
ন্যায়রত্ন
রোহীণীচন্দ্র
রাজেন্দ্র
রাজেন্দ্র
রাঘবেন্দ্র
তারানাথ
রামকমল
শাস্ত্রী
কৃষ্ণকান্ত
রতিকান্ত
উমাকান্ত
হরিকান্ত
ন্যায়বাগিশ
হরনাথ
হবনারায়ণ
শিবচবণ শিরোমণি
কৃষ্ণচরণ
হরেন্দ্র
বৈকুণ্ঠনাথ
কালীনাথ দেবান্তশাস্ত্রী
রঘুনাথ ন্যায়াঙ্কার
জয়রাম
রামেশ্বর
হরকৃষ্ণ
বাণীনাথ
শ্রীকৃষ্ণ
শিবানন্দ
শ্রীধর
রামানন্দ
রামানন্দ
বিদ্যাবিনোদ
শ্রীনাথ
গোপীনাথ
শুকদেব
রাধাকৃষ্ণ
রাজকৃষ্ণ
জগন্নাথ
ব্রজনাথ
বিদ্যারত্ন
রামকুমার
স্মৃতিকণ্ঠ
ভবানী
গৌরীশঙ্কর
রাজগোবিন্দ
সার্ব্বভৌম
তারাকিশোর
স্মৃতিরত্ন
তারেশচন্দ্র

সহায়ে আশু সমরে বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করিলেও ইহা তাঁহার মনঃপুত ছিল না, পাছে এই গ্রন্থের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, এই ভয়ে মরণের পূর্ব্বে তিনি উহা অগ্নিসাৎ করেন।

গ্রন্থকার জয়কৃষ্ণ

রঘুপতির দ্বিতীয় পুত্র রুদ্রপতির অন্যতম পৌত্রের নাম জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ। ইনি জ্যেষ্ঠতাত রঘুদেবের ন্যায় গঙ্গাতীরে গিয়া অষ্টোত্তর শত সংখ্যক পুরশ্চরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। অনেক লোক তাঁহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তদীয় শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। তিনি ন্যায় শাস্ত্রের সামান্য লক্ষণার "টীকা" ও "কাত্যায়ন কুলদীপিকা" গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থকার হরিকান্ত

ইঁহার অন্যতম পৌত্রের নাম হরিকান্ত ন্যায় বাগীশ। ইনিও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন; তিনি ন্যায় শাস্ত্রীয় "হেত্বাভাসের টীকা" "দুর্গোৎসব পদ্ধতি", ও (সের্ব্বদেবদেবী সমন্বিত স্বগীয় বিষহরী দেবীর) "নৌকাপূজা পদ্ধতি" প্রণয়ন করেন। এ সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই এবং তদীয় পৌত্রের নিকট এখনও আছে। হরিকান্ত হেড়ম্বাধিপতি ও তৎপরে বেহারাধিপতির সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যোগী ভ্রাতৃযুগল

ইঁহাদের সহোদর ভ্রাতা রতিকান্ত যোগী পুরুষ ছিলেন। শেষ জীবন তিনি বারাণসী ধামে অতিবাহিত করেন। রাজঘাটের পূর্ব্বদিকে তাঁহার ইষ্টকময় সাধনাশ্রমটি পুঠিয়ার জনৈক রাণী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর উমাকান্ত অতিশয় বলশালী ও অসীম সাহসী পুরুষ ছিলেন, তিনি একদা একটি বন্য মহিষ ধৃত করিয়া আনিয়া একহস্তে শৃঙ্গধারণ পূর্ব্বক কালীর পদে বলি দিয়াছিলেন।

সতী ভবানী

উমাকান্তের স্ত্রীর নাম ভবানী দেবী। ভবানী পতি-ব্রত-রতা তপস্বিনী ছিলেন। তাঁহার করতলে কয়েকটি সুলক্ষণ যুক্ত চিহ্ন ছিল। তিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষা ও "বার-ব্রত" পালনে অনুরক্তা ছিলেন। তাঁহার স্বামী যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তিনি মনে মনে স্বামীর রোগের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া নিরুদ্বেগে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে ছিলেন।

উমাকান্ত একজন গুপ্ত সাধক ছিলেন। এক একাদশী তিথি উদ্‌যাপনের পর তিনি ব্রতাঙ্গ ব্রাহ্মণ ভোজন ও কুটুম্ব ভোজনাদি করাইয়া চির বিদায় জন্য প্রস্তুত হইলেন। "গঙ্গা-গীতা-গায়ত্রী" বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিল। পত্নী পদ-প্রান্তে উপবিষ্টা, একবার তৎপ্রতি দৃষ্টি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক যেন কি উপদেশ দিলেন, সতীর চক্ষে অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল, আরও একবার যেমন "গুরু-গঙ্গা-কাশী" বলিলেন, অমনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উমাকান্তের প্রাণবায়ু উৎক্রান্ত হইল।

ভবানী দেবী সীমান্তে সিন্দুর বিন্দু দিয়া শেষ সাজে সজ্জিত হইয়া আসিলেন এবং জনে জনে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার দার্ঢ্য ও আর্ত্তি দর্শনে কেহই "না" বলিতে পারিল না, সকলেরই চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল, সতী হাসিতে হাসিতে পরিতর চিতা-শয্যায় আরোহণ করিয়া পাতিব্রাত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিলেন।

পঞ্চসতী

এ বংশে আরও পাঁচজন সতীর সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রামেশ্বরের স্ত্রী মালতী দেবী পতির মৃত্যুর পর তদীয় চিতাগ্নিতে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করেন। ইঁহার তিন পুত্র-হরকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং বাণীনাথ। এই তিন জনের স্ত্রীর নাম যথাক্রমে অপূর্ণ দেবী, সুশীলা দেবী ও সুদক্ষিণা দেবী, ইঁহারা তিনজনেই শাশুড়ীর ন্যায় পতির অনুগামিনী হইয়া অতুল্য যশকীর্ত্তি ও পুণ্যার্জ্জনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আর একজন সতী রাধাকৃষ্ণের পত্নী,-নাম বিজয়া দেবী, ইঁহাদেরই প্রায় একসময়ে পতিদেহ বক্ষে লইয়া অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বহু গ্রন্থকার মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম

শ্রীনাথের প্রপৌত্রের নাম গৌরীশরণ, ইঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজ গোবিন্দ সার্ব্বভৌম বহু শাস্ত্রদর্শী ছিলেন, তাঁহার জীবিত থাকা কালে তত্তুল্য পণ্ডিত এঅঞ্চলে ছিল না; ইনি শ্রীহট্টে প্রতিদ্বন্ধী-রহিত প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; শ্রীহট্টের বহু প্রধান অধ্যাপকই ইঁহার ছাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে এখনও দুই একজন জীবিত আছেন। নবদ্বীপ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, তিনি বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থ ও সংস্কৃত বাঙ্গালায় মিশ্রিত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী তাঁহার অপরিসীম বিদ্যবত্তা ও প্রতিভার পরিচায়ক। তদীয় গ্রন্থ সমূহের নামঃ-

(১) সারদোদয় (নাটকচ্ছলে দর্শন শাস্ত্রের শেষ মীমাংসা),
(২) বেদবাদ নিবারিকা,
(৩) পুরুষ সূক্ত-টীকা,
(৪) বৈদিক গায়ত্রী ব্যাখ্যা,
(৫) যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা,
(৬) তান্ত্রিক গায়ত্রী ব্যাখ্যা,
(৭) স্মৃতিদ্বাপর বারিণী,
(৮) দৈনিক আচার পদ্ধতি,
(৯) দশ মহাবিদ্যা পূজাপদ্ধতি,
(১০) ব্রহ্মপদার্থ নিরূপণ,
(১১) সুবোধ বিবৃতি,
(১২) দত্তক ব্যবস্থা সংগ্রহ,
(১৩) সটীক বাহনাদি স্তব,
(১৪) সূর্যঙ্কদূত,
(১৫) ত্রিপুরেশ দর্পণ,
(১৬) গুরু স্তুতি,
(১৭) গঙ্গাস্তর,
(১৮) ভট্টি টীকা
(১৯) কাশীখণ্ড টীকা
(২০) তারাষ্টক টীকা

সংস্কৃত বাঙ্গালায় মিশ্রিত গ্রন্থঃ-

(২১) তরনী নির্ব্বাণ নাটক, (২২) বিলাত রঞ্জনী নাটক, (২৩) দ্রৌপদী সন্তোষ নাটক। এই ২৩ খানা গ্রন্থের মধ্যে এক খানাও মুদ্রিত হয় নাই; এরূপ অবস্থায় কালে গ্রন্থগুলি সে বিলুপ্ত হইয়া না যাইবে, এমন বলা যায় না; গ্রন্থকারের বংশধর বর্গের কি এ কীর্ত্তি রক্ষা কল্পে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে?

সার্ব্বভৌমের পরে এবংশে আর একজন গ্রন্থকারের নাম সুপরিজ্ঞাত, ইনি তাঁহারই ছাত্র ও জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র, ইঁহার নাম ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। বিদ্যারত্নের কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ত্রয়ের নাম এইঃ-

(১) বৈদিক বার্ত্তা, (২) গায়ত্রী বর্ণোচ্চারণ বিধি এবং (৩) কৃত্য চিন্তামণি টীকা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, "ধর্ম্মচন্দ্রিকা" নাম দিয়া রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বের ন্যায় ২৮ খানা গ্রন্থ্ প্রকাশিত করেন। কিন্তু কঠোর কাল তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে দেয় নাই। দেশের দুর্ভাগ্য এই সকল গ্রন্থ্ প্রকাশিত হইতে পারিল না।

কাত্যায়ন গোত্রের অনেকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইটায় ছিলেন, বর্ত্তমানেও আছেন, তন্মধ্যে পঞ্চগ্রাম বাসী শ্রীযুত রাম কমল শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা নানা বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বংশ বিবরণ তৎপ্রদত্ত।

কাছাড়ী ও দেবীপুরের পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ

আদি কথা

পরাশর গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ ইটার কাছাড়ী ও দেবীপুর গ্রামবাসী। আদি ধর্ম্মার যজ্ঞাগত পুরুষোত্তম পঞ্চখণ্ডে বাস করেন। পঞ্চখণ্ড হইতে একশাখা পরে ইটায় বিস্তৃত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ২য় খণ্ডে পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের কথা কথঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ্য পর্য্যায়ে[৩] রমাপতির উদ্ভব হয়, ইনি সুপণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; ইহার পুত্র রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কাছাড়ী গ্রামবাসী এবং কনিষ্ঠ রামনাথ বংশীয়গণ দেবীপুর গ্রামবাসী হন।

জাতক প্রদীপ প্রণেতা

রাম গোবিন্দ তর্কালঙ্কার অসাধারণ তার্কিক ছিলেন। ইনি শ্রীহট্টের নবাব হইতে ব্রহ্মত্র ভূমি প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দ বিশারদ জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানা সুন্দর গ্রন্থ্ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ্ অদ্যাপি শ্রীহট্টের চতুষ্পাঠী সমূহে আনীত হইয়া থাকে, ইহার নাম "জাতক প্রদীপ।"

শ্যামানন্দ নামে এই বংশে পরবর্ত্তী কালে আর এক ব্যক্তি শাস্ত্রলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

দেবীপুর শাখায় রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবচরণ বিদ্যানিবাসের খ্যাতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই; ইঁহার পৌত্র কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তাঁহার "বৈদিক নির্ণয়" গ্রন্থ্ প্রেরণে আমাদের সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে নানা অযথাবাদ পরিদৃষ্ট হয়।

টেংরার ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ

আদি কথা

মহারাজ আদি ধর্ম্মপার যজ্ঞে ভরদ্বাজ গোত্রীয় গোবিন্দচার্য্য মিথিলা হইতে আগমন করেন বলিয়া কথিত আছে। গোবিন্দাচার্য্য বংশের আদি কথা অতি অল্পই জ্ঞাত হওয়া যায়। কোনও মতে গোবিন্দ বংশীয় চন্দ্রকান্ত শিরোমণির তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সাধুহাটীবাসী হন; মধ্যম জয়ানন্দ শিকদারের বংশধর বর্গ বালিশিরার রাজপুর গ্রামের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হন; বলভদ্র সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন, বলভদ্র বিশারদের বংশীয়গণ লংলার বিশারদবংশ্য বলিয়া খ্যাত। এই বংশীয় জগন্নাথ শিরোমণি নামক অপর একব্যক্তি লংলার ভটেরপাড়া গ্রাম বাসী হন বলিয়া

৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ডে ঢ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কথিত আছে। ইটার টেংরা গ্রামে যঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা লংলার ভরদ্বাজ বংশেরই একটি শাখা বলিয়া কথিত; এই শাখার আদি পুরুষের নাম রমাপতি।

রমাপতির পরবর্ত্তীগণ

রমাপতি[৪] তপোনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, জেলা শহরের সন্নিকটে মনুনদীর তীরে তিনি বাস করতঃ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত ছিলেন। বর্ত্তমান পর্ব্বতপুর চা-বাগানের নিকট নিধিপতি বংশজ রামনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন, ঐ স্থানে ইঁহাদের নামীয় "রামলক্ষণের দীঘী" অদ্যাপি দৃষ্ট হয়; ইঁহারাই রমাপতিকে টেংরাতে আনিয়া স্থাপন করেন। এই বংশের ব্যবসায় মিরাসদারি।

যাদবচন্দ্র ও মহেশ্বর নামে রমাপতির দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে মহেশ্বরের পুত্রের নাম রামচন্দ্র, তাঁহার পুত্র রামভদ্র। রামভদ্র তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব-সভায় ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের পদে বরিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে রামভদ্র এক দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে কূট কৌশলে পরাস্ত করিলে, উক্ত দিগ্বিজয়ী অভিশাপ দেন যে তাঁহার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত যেন তদ্বংশে সভাপণ্ডিতের গৌরব কেহ ভোগ করিতে না পারে।

সতী,-রামভদ্রের পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হইয়াছিলেন। রামভদ্রের কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ ন্যায়বাগীশ জয়ন্তীয়াপতির সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইহা সেই দিগ্বিজয়ী বিপ্রের অভিশাপের ফল কি না কে জানে?

রামভদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীধর, তৎপুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ একবার বিশেষ আড়ম্বর সহকারে এক নৌকাপূজা করেন। ইঁহার পুত্র জীবিত আছেন।

রামভদ্রের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম রঘুনন্দন। ইঁহার অনুরোধে পঞ্চখণ্ড (নোয়াগ্রাম) হইতে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশ টেংরায় আসিয়া বাস করেন। রঘুনন্দনের পুত্রের নাম রামনাথ, ইঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণ একবার মহা আড়ম্বরে মহাভারত পাঠ করাইয়া ছিলেন, তদ্রূপ আড়ম্বর সে অঞ্চলে বড় হয় নাই, এই ব্যাপারে উপলক্ষে ভাটগণ বিজয়ের গুণকথা রচনা করিয়াছেন; কোন সমারোহ ব্যাপারে এযাবৎ তদঞ্চল বাসিগণ "বিজয়ের মহাভারত" বলিয়া উপমা দিয়া থাকে। বিজয়ের পুত্র যুগলকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্রগণ জীবিত আছেন।

পঞ্চগ্রামী ভরদ্বাজ গোত্রীয়

ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের সামাজিক বিবাদ মূলে ভরদ্বাজ গোত্রীয় কেহ বালিশিরা পরগণায় গমন করেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় তত্রত্য বাণিনাথ পণ্ডিতের দুইপুত্র, ইঁহাদের নাম রাঘবেন্দ্র (বলভদ্র) ও বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র রমাপতি পঞ্চানন লংলা নর্ত্তন গ্রামে গমন করেন, এবং বৈদ্যনাথ স্বয়ং পঞ্চগ্রামে আগমন করেন। ইঁহার বংশীয় ঈশ্বরচন্দ্র শিকদারের মথুরেশ ও শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যানিধি নামে দুইপুত্র ছিলেন। মথুরেশের নামে একটি তালুক পাঁচগাঁয়ে আছে। বিদ্যানিধির পুত্র রমাকান্ত পঞ্চানন, ইঁহার প্রপৌত্রের নাম গঙ্গাচরণ; তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণ তর্কবাগীশ ১৮ বৎসর বয়সে ন্যায়, ও স্মৃতি এবং জ্যোতিষ ও তন্ত্রে বিজ্ঞতা লাভ করেন; তিনি বর্দ্ধনকুঠী রাজবাটীর পণ্ডিত নিযুক্ত হন; অবশেষে হবিষ্যাশী হইয়া তিনি কাশীতে শিবসাযুজ্য লাভ করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীতেই আছেন এবং অপরেরা পঞ্চগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন।

৪. শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী (বিষ্ণুপুর) ইঁহার বংশ তালিকাদি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত টেংরা হইতে শ্রীযুত রাধানাথ ভট্টাচার্য্য ঐ বংশ এবং তত্রত্য কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

টেংরার কৃষ্ণাত্রের গোত্রীয়গণ

ভরদ্বাজ গৌত্রীয় রঘুনন্দনের অনুরোধে পঞ্চখণ্ড হইতে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশ টেংরায় আগমন করেন বলা গিয়াছে, তিনি কিছুদিন তথায় বাস করার পর তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মে, ইঁহার নাম গদাধর ভট্টাচার্য্য। গদাধর কৃতী ব্যক্তি ছিলেন, নবাব আলিওর খাঁ এক সনন্দে (নং ১০৬) ইটা ও আলীনগর হইতে ইঁহাকে ৪/।১ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করেন; তাঁহার পুত্র গঙ্গাধর উহা "তছরূপ" করেন। গঙ্গাধরের প্রপৌত্র জীবিত আছেন।

গ্রন্থকার লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি

কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে ইটার মহাদেবী বড়কাপন গ্রামে রামভদ্র বাচস্পতি নামে একজন খ্যাত নামা পণ্ডিত ছিলেন, সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে রাজপণ্ডিত পদে থাকিয়া হিন্দুদের দায়বাগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা দিতেন। এই বংশীয় লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কারের সঙ্কলিত "তন্ত্রকৌমুদী" ও "তন্ত্ররত্ন" নামক দুই খানা গ্রন্থ আছে। এ বংশীয় পণ্ডিত শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য আগরতলা রাজধানীতে থাকিতেন; শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক বিপ্রাগমন সম্পর্কীয় "বৈদিক সংবাদিনী" নামক গ্রন্থ ইঁহারই কৃত। ইটার পঞ্চগ্রামে এই কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে প্রসিদ্ধ "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্করের জন্ম হয়, তাঁহার পিতৃপরিচয়াদি ৪র্থ ভাগে জীবনচরিত প্রসঙ্গে কথিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
লংলা, সাতগাও বালিশিরা প্রভৃতি
স্থানের ব্রাহ্মণ বিবরণ

লংলা পরগণার ভরদ্বাজ গোত্রীয়গণ

সাম্প্রদায়িক ভরদ্বাজ গোত্রীয়দের আদি স্থান লংলা। মহারাজ স্বধর্ম্মপা প্রদত্ত তাম্রপত্রোল্লিখিত "লংলাই কুকিস্থান"ই লংলা পরগণা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।[১] এই স্থানে প্রথমে ভরদ্বাজগোত্রোৎপন্ন যিনি বাস করেন, তাঁহার নাম বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্রের নাম হরিহরাচার্য্য। লংলায় ভরদ্বাজ গোত্রীয়গণ ইঁহাকেই প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।[২]

হরিহরের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ। ইঁহার বহুপুত্র ছিল, তন্মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম প্রভাকর; তাঁহার পুত্রের নাম চন্দ্রশেখর।

সন্ন্যাসীর নামে গ্রাম পত্তন

পুণ্ডরীকাক্ষ তখনও জীবিত আছেন, একদা নরোত্তম গিরি নামক জনৈক প্রভাবান্বিত সন্ন্যাসী, সুবিদরায় নামে এক অনুগত কায়স্থ সহ তথায় উপস্থিত হন। নরোত্তম সুবিদরায়কে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে আদেশ দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। সেই নির্জ্জন স্থানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কি প্রকারে কায়স্থ-সন্তান বাস করিবে? করযোড়ে সুবিদরায় ইহা জানাইলেন।

কিছুই সর্ব্বদর্শী সন্ন্যাসীর অগোচর থাকিবার নহে, তিনি পুণ্ডরীকাক্ষের সে স্থানে অবস্থিতির বিষয় জ্ঞাত হইলেন ও তৎসকাশে সমুপস্থিত হইয়া, তদীয় পুত্রগণের একজনকে সুবিদরায়ের "বিষয়" গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। পুত্রগণের সকলেই অস্বীকৃত হইলেন, পৌত্র চন্দ্রশেখর কোন উত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বনে রহিল। সন্ন্যাসী বড়ই বিরক্ত হইলেন। কথিত আছে যে, সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতে তাঁহার সকল পুত্রই দিবসত্রয় মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

---

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায় দেখ।

২. "জ্যোতিঃ প্রদীপ" নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতা হরিহরাচার্য্য শ্রীহট্টের এক প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। ইনি কোন বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি না। নওনবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয়গণ আমাদিগকে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তল্লিখিত মত উপায়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইটার কাত্যায়ন গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকগণ ইঁহাকে সেই গোত্রোপৎন্ন ভারত বিখ্যাত শিরোমণির বৃদ্ধপ্রপিতামহ বলিয়া উল্লেখ করেন। বিষ্ণুপুর-বাসী বাৎস্য গোত্রীয়গণ একথার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া "জ্যোতিঃ প্রদীপ" প্রণেতা জ্যোতিষী হরিরাচার্য্যকে তদ্দেশীয় "গণক" জাতীয় লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এসকল মতবাদ হইতে সত্য নিষ্কাশন সহজ নহে।

পুণ্ডরীকাক্ষ পুত্র-বিয়োগে ব্যথিত হইলেন এবং বাক্‌সিদ্ধ সন্ন্যাসীর অভিপ্রায়ানুসারে চন্দ্রশেখরকে সুবিদরায়ের একত্রবাস ও তাঁহার শাস্ত্রীয় ব্যাপার সম্পাদনার্থে ব্যবস্থাদি দান করিতে দিলেন। সন্ন্যাসী নরোত্তম গিরির নামানুসারে সেই স্থান "নরতম্", তৎপরে "নরতন্" নামে খ্যাত হয়।

চন্দ্রশেখরের পুত্র মথুরানাথ এবং রামভদ্র প্রভৃতি। মধুরানাথের পুত্রের নাম রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার। ইঁহার পুত্র "দুলাভট" ও "জগন্নাথ শিরোমণি"। দুলাভট বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, ইঁহার নামে এক সিদ্ধ নিষ্কর তালুক আছে। নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁর প্রদত্ত সনন্দে দৈনিক চারিপণ কৌড়ি তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে "দুইপণ সদর কাছারীতে ও দুইপণ দক্ষিণ ভাগের কর্ম্মচারিয়ানের বেতন হইতে" দিবার ব্যবস্থা হয়। ইঁহার পুত্র গঙ্গাধরের নামেও ব্রহ্মত্র ভূমি আছে।

পূর্ব্বোক্ত রামভদ্রের পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ, ইঁহার রামজীবন, রামচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র নামে তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে রামজীবনের নামীয় একখানা সনন্দে চারিহাল মদতমাস ভূমি প্রাপ্তির কথা জ্ঞাত হওয়া যায়।[৩] এই সনন্দোল্লিখিত ভূমি দাতা নবাব নুরউল্লা খাঁ বাহাদুর। রামজীবনের পুত্র রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী ও হরিকৃষ্ণ খাঁ। রাধাকান্তের নামে চারিখানা সনন্দ আছে।[৪]

রাধাকান্তের পুত্র হরিদাস ও ঘনশ্যাম, হরিদাসের নামে দুই খানা সনন্দ আছে জানা যায়। রাধাকান্তের মধ্যম ভ্রাতা রামচন্দ্রের পুত্রের নাম রাজেন্দ্র, ইঁহার নামে দশসনা তালুক আছে। তাঁহার অপর ভ্রাতার নাম শ্রীচন্দ্র, ইঁহার দুই পুত্র, তাঁহাদের নাম সানন্দরাম ও রামানন্দ। সানন্দরাম এই বংশে অতি প্রধান ও কৃতী পুরুষ ছিলেন, শ্রীহট্টের নবাবগণ হইতে তিনি অনেক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। তত্রত্য টোলের অধ্যাপক তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত রোহিনী চন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় সানন্দরামের নামীয় নয়খানা সনন্দের নকল সহ তদ্বংশবিবরণ প্রেরণে আমাদের সহায়তা করিয়াছিলেন।[৫]

বিশারদ বংশ

এই বংশের অন্যশাখা বংশ বলিয়া খ্যাত। বলভদ্র বিশারদ হইতেই এ শাখার এই খ্যাতির উৎপত্তি। বলভদ্রের দুইপুত্র, তন্মধ্যে একের নাম রঘুপতি, অপরের নাম রমাপতি পঞ্চানন। রঘুপতির পুত্র মহাদেব, তৎপুত্র উমাকান্ত, বিশারদ উপাধি ভূষিত বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বিশারদ বংশে অনেক পণ্ডিতের উদ্ভব হয়। উমাকান্তের মধ্যম পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণ; ইঁহার চারি পুত্রই উপাধি ভূষিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামশরণ

৩. আমাদের সংগৃহীত উক্ত সনন্দের নং ৯৪। এই বংশীয়গণ যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, এসকল সনন্দেব উল্লেখিত কালালোচনায় তাহা বুঝা যায়।

৪. (১) সনন্দ নং ৯২নং দ্বারা ১১ জলুসে নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলী খাঁ হইতে তিনি লংলাব নর্ত্তন গ্রামে ৬।।২৴ ভূমি মদত মাস প্রাপ্ত হন। (২) ৯৩নং সনন্দে নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উলমুলক হইতে ২ জলুসে তিনি ঐ এক স্থানেই ২॥ ১। ২॥২১৴ ভূমি ব্রহ্মত্র লাভ করেন, ১২০০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়; অতএব স্পষ্টতঃ ইঁহাকে সুদীর্ঘজীবী দেখা যাইতেছে। অপর সনন্দ সমূহের বিবরণ দেওয়া বাহুল্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

৫. এই সকল সনন্দ যথাযথোভাবে উদ্ধৃত করা বাহুল্য বোধে এস্থলে মাত্র চারিখানি সনন্দের মর্ম্ম দেওয়া গেলঃ–

(১) নবাব নজীব আলী খাঁর মোহরাঙ্কিত সনন্দে তিনি দৈনিক ৵০ পণ কৌড়ি পাইতেন।

(২) নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁর মোহরাঙ্কিত সনদে তিনি "বারকাহন কৌড়ি সরকারী নজর ছলামী হইতে ব্রহ্ম উত্তরের নিয়মে" বাৎসরিক পাইতেন।

(৩) নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁর মোহরাঙ্কিত সনদে তিনি বার্ষিক ২৫ কাহন কৌড়ি পাইতেন।

(৪) উক্ত নবাব প্রদত্ত অন্য এক সনন্দে তিনি আরও কতক ব্রহ্মত্র পাইয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার, গিরিধর বাচস্পতি এবং কৃষ্ণচরণ শিরোমণি। ইঁহার পুত্র শ্রীযুত কমলাকান্ত ন্যায়ভূষণ জীবিত আছেন।

লংলার গৌতম গোত্রীয়গণ

কৃষ্ণপুর ও দেওগাঁর নামোৎপত্তি

মহারাজ আদি ধর্ম্মপার সময়ে সমাগত গৌতম গোত্রীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পরবর্ত্তী কালে জিলার বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। লংলায় সর্ব্বপ্রথমে গৌতম গোত্রীয় যিনি আগমন করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ, তাঁহার নামানুসারে তদীয় বসতি স্থান কৃষ্ণপুর বলিয়া খ্যাত হয়। কৃষ্ণপ্রসাদের প্রপৌত্র হরিপ্রসাদ এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি অনেক ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ইঁহার প্রপৌত্রের নাম বিষ্ণুবল্লভ ও দেববল্লভ। দেববল্লভ শিকদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও কৃষ্ণপুরের দক্ষিণ পার্শ্বে একগ্রাম বসাইয়া তথায় দীর্ঘিকা সমন্বিত একবাড়ী প্রস্তুত করেন, তাঁহার নামে ঐ দীঘী "দেওদীঘী" এবং গ্রামটি "দেওগাও" নামে আখ্যাত হয়।

মোসলমানকে কন্যাদান

দেববল্লভ একদা তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন, ঐ সময় সকি সালামত নামে এক ধনবান মোসলমান শ্রীহট্টে আসিতেছিলেন। অর্থাভাব হওয়ায় ইঁহার নিকট হইতে তিনি পঞ্চদশটি স্বর্ণমুদ্রা ধার করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে (পূর্ব্বাংশ) বলা গিয়াছে যে উক্ত সকি সালামত রাজভ্রাতা বীরচন্দ্র নারায়ণের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

সকি সালামত এদেশে কিছুদিন অবস্থিতির পর একদা দেববল্লভের গৃহে আগমন করেন। কথিত আছে যে তখন তাঁহার কন্যা কৌতূহল বশে বেড়ায় অন্তরাল হইতে এই সম্ভ্রান্ত মোসলমানকে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ সকি সালামত যদৃচ্ছা ক্রমে সেদিকে নিষ্টীবন ত্যাগ করিলে, ছিদ্র পথে তাঁহার এক কণিকা উক্ত ব্রাহ্মণ তনয়ার অঙ্গে পতিত হয়। ইহাতে উহার জাতি গিয়াছে মনে করিয়া শিকদার সকি সালামতের করেই কন্যা সমর্পণ পূর্ব্বক কাশীধামে চিরতরে চলিয়া যান। শিকদার তনয়া সকি সালামতের দ্বিতীয়া পত্নী হন।[৬]

পালগাঁ নামোৎপত্তি

বিষ্ণুবল্লভ ঈশ্বর চিন্তাতেই রত থাকিতেন, তিনি একমাত্র পুত্র কৃষ্ণানন্দকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাখিয়াই জীবলীলা সংবরণ করেন। ঐ সময় এস্থানে সৈন্য সংরক্ষণার্থ শ্রীহট্টের নবাবের নির্দেশত মতে এক ক্ষুদ্র ঘাঁটি (গারদ) প্রস্তুত হইয়াছিল; সৈন্যগণের অধ্যক্ষ সাধারণতঃ "সেনাপাল" নামে কথিত হইতেন। কৃষ্ণানন্দ অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকালে উক্ত গারদের তৎকালীন

---

৬. সাকি সালামতের বংশ কথা ৯ম অধ্যায়ে উক্ত হইবে। ইনি লোদী বংশীয় সম্রাটগণের সময়ে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া পরে এদেশে আগমন করেন। রাজবংশ, রাজভ্রাতৃবংশ এবং তাঁহার বংশে ঐক্য থাকা বিধেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বংশে বর্ত্তমানে ১২/১৩ পুরুষ চলিতেছে। রাজকর্ম্মচারী ইন্দানগরস্থ মণ্ডল বংশেও পুরুষ সংখ্যা তদ্রুপই। শিকদার বংশ ও সকি সালামত বংশের পুরুষ সংখ্যার সহিত তাহা সর্ব্বাংশে ঐক্য হয় না; ইহার কারণ কি? হয় এই বংশের পুরুষগণ দীর্ঘজীবী, নয় মধ্যে ২/১ পুরুষের নাম বাদ পড়িয়া থাকিবে। আর একটি কথা বিবেচ্য; রাজভ্রাতৃবংশ ও শ্রীচৈতন্য পার্ষদ বংশে ক্রমানুযায়ী পুরুষ সংখ্যার সমতা থাকা আবশ্যক। এই খণ্ডেই শিবানন্দ ও বাসুঘোষ বংশের যে বিবরণ পাওয়া যাইবে, এই গৌতম গোত্রের বংশাবলীর সহিত তাহার বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। ফলতঃ সমসাময়িক বংশ সমূহের পুরুষ সংখ্যার যে ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাকে কোন বংশে স্বল্পজীবী, কোন বংশে বা দীর্ঘজীবী জন বাহুল্যই এই বৈষম্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

অধ্যক্ষ কৃষ্ণপুর মৌজার অনেকাংশ হস্তগত করিয়া লন। তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, এবং ঐ সময় হইতে কৃষ্ণপুর সেনাপালের খ্যাতি অনুসারে "পালাগাও" নামে আখ্যাত হয়। সেনাপালের প্রভাবের চিহ্নস্বরূপ তন্নাময়ী দীঘী ও তাঁহার বাড়ী আজও লোকে দেখাইয়া থাকে।

সনন্দ প্রাপক শুকদেব প্রভৃতি

কৃষ্ণানন্দের পুত্র হরিণাথ চক্রবর্ত্তী, ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীনাথ বিদ্যালঙ্কার। বিদ্যালঙ্কারের চারি পুত্র হয়, ইঁহারা সকলেই বিখ্যাত ব্যক্তি, সকলেই নবাবি সনন্দ প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শুরুদেব চক্রবর্ত্তী "পণ্ডিত" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন; শুকদেবের নামীয় পাঁচখানা সনন্দের অনুবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।[৭]

শুকদেবের ভ্রাতা হরিদেব চক্রবর্ত্তী নামীয় সনন্দে দৃষ্ট হয় যে তিনি "উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণ, তাঁহার জীবীকার উপায় নাই" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নবাব তানিব ইয়ার খাঁ "তপ্পে ইজ্জদাবাদ (?) ও উত্তরভাগের তহবিল হইতে রোজিয়ানা চারিপণ কৌড়ি" তাঁহার জন্য "মক্করর" (মঞ্জুর) করেন।

ইঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব চক্রবর্ত্তী "চিরদিন আশির্ব্বাদ করিতে থাকেন" এই সাধারণ পাঠ যুক্ত সনন্দে, নবাব আবুহুসেন খাঁ বাহাদুর তপ্পে দক্ষিণ ভাগের কর্ম্মচারিবর্গকে জানাইয়াছেন যে উক্ত স্থানের "মহালে শালিয়ানা ১০ কাহন কৌড়ির জন্য ব্রহ্মউত্তর" সহদেব চক্রবর্ত্তীর নামে বাহাল করা গিয়াছে।

শুকদেবের পুত্রগণও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দরাম দক্ষিণভাগের "সরবরকার" ছিলেন বলিয়া নবাব আবহুসেন (১৮ জলুসে) তাঁহাকে জনাবদার খ্যাতির সহিত "পরগণা মজকুরের বাণেশ্বর মৌজায় তদখানেবাড়ী স্বরূপ এক কিত্তা জমি" ১১৪০ সনে "মক্করর" করেন।

ইঁহার ভ্রাতা জীবনেশ্বরকে "পড়ার খরচ বাবত" ঐ নবাব তৎপর বর্ষে দৈনিক দুইপণ কৌড়ি মক্কবর করেন।

---

৭. ১ম ও ২য় সনন্দ। নবাব আবু তানিব প্রদত্ত,-ইহাতে নবাব লংলা ও দক্ষিণ ভাগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্য কালেব চৌধুরী, কানুনগো ও পাটওয়ারী প্রভৃতিকে এই হুকুম দিয়াছেন যে, "শুকদেব চক্রবর্ত্তী সংস্কৃতে পাকা বিদ্বান্ বটেন" ; রামদেব পুরের জঙ্গল হইতে ১১৩৫ বাংলায় তাঁহাকে "দুইদ্রোণ জমি মদত মাস মক্করর করা গেল, উচিত যে তথাকার জমিদারগণের ডৌলচরাবন্দি মত মদতছরূপে রূপে ছাড়িয়া দেয়।" দ্বিতীয় সনন্দ দ্বারা দক্ষিণ ভাগের তালুকাত হইতে তাঁহাকে ১৪ পণ কৌড়ি দেওয়া বরাদ্দ হয়। তারিখ ১১৩৯ বাংলা।

২য় সনন্দ। নবাব বসারত খাঁ প্রদত্ত,-ইহাতে লংলা সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণকে জ্ঞাত করা হইয়াছে যে শুকদেব "দয়ার পাত্র," তদীয় জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু "ভবানীপুর মৌজার শালিয়ানা হইতে ১১ কাহন কৌড়ি ব্রহ্মউত্তর নিয়মে ১১৩৮ বাংলা অবধি মক্করর করা গেল।"

৪র্থ সনন্দ। নবাব আবুহুসেন খাঁ প্রদত্ত,-এ সনন্দ নবাব আবুতানিবের প্রদত্ত পূর্ব্ব সনন্দের পরিবর্ত্তে-সনন্দ মাত্র; তারিখ ১৭ জলুস।

৫ম সনন্দ। মোহর অস্পষ্ট-কোনরূপে এতেসাম পাঠ করা যায়, সুতরাং ইহা নবাব এতেসাম খাঁ প্রদত্ত বলা যাইতে পারে। এই নবাব ইংরেজ আমলেই নিযুক্ত হন, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের দ্বিতীয়ভাগে তাহা বলা গিয়াছে। এ সনদও পূর্ব্বোক্ত ১৫ পণ কৌড়ি মঞ্জুরীযুক্ত সনদের শেষ সংস্করণ বা পরিবর্ত্তন-সনদ। ইহাতে লিখিত আছে যে উক্ত কৌড়ি "বর্ত্তমান কালে কলিকাতা সদরের হুকুমানুসারে পরগণা মজকুরের সামীল তালুকাতে বন্দোবস্ত হইয়াছে। উচিত যে বর্ণিত মহালাভের শাসন হইতে বর্ণিত ব্যক্তিকে পৌছাইতে থাকে।"

তারিখ ১১৯৯ বাংলা। প্রথম সনন্দ হইতে ৫ম সনন্দের তারিখের ব্যবধান ৪৪ বৎসর; শুকদেব যে দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। নিতান্ত ছেলে বয়সে যে তিনি প্রথম সনন্দ পান নাই, তাহা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে এ বংশীয় ব্যক্তিগণ দীর্ঘজীবী ছিলেন।

নবাব আবুল হুসেনের তারিখ যুক্ত কোন সনন্দ পূর্ব্বে কালেক্টরী হইতে না পাওয়াতে ইঁহার সময় স্থির ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। অতএব ইনি জনৈক নায়েব ফৌজদার ছিলেন, বলা যাইতে পারে।

ইঁহাদের ভ্রাতা হীরারাম ও বাণীনাথের যুক্ত নামে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ের একাধিক সনন্দ আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনন্দ নূতন কল্পে ইঁহারা মঞ্জুর করাইয়া ছিলেন মাত্র; তন্মধ্যে একখানি ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। এই সময় সহদেবের পুত্র ভারতরাম জীবিকার জন্য দরখাস্ত করায় একখানা নূতন সনন্দে কতক ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই বংশীয় অনেকেরই নামে দশসনা তালুক আছে, উদাহরণ স্থলে ৬২নং হীরারাম তালুকের নাম করা যাইতে পারে। লংলার অনেকে মৌজাতেই হীরারামের ভূসম্পত্তি ছিল। হীরারাম শিবালয় প্রতিষ্ঠা ও দেশে ব্রাহ্মণ স্থাপনাদি সৎকার্য্যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহার পুত্র কৃষ্ণানন্দ এক মন্দির প্রস্তুত ক্রমে মদন মোহন ও লক্ষ্মীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম রাম লোচন; ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বাড়ীতে টোল সংস্থাপন করিয়া বহুছাত্রকে বিদ্যাদান করেন। পূর্ব্বোক্ত বাণীনাথ পণ্ডিতের প্রপৌত্র ভৈরবচন্দ্র তর্কভূষণ তর্কতীর্থ পরম পণ্ডিত ছিলেন, ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তিনিও চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক বহুদিন বহুছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র মধ্যে অনেক উপাধিধারী পণ্ডিত আছেন, মাত্র বিগত ১৩০৪ বাংলায় সন্ন্যাস রোগে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। এ বংশীয় শ্রীযুত তারাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে আমরা এই বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সাতগাঁর বাৎস্য গোত্রীয়গণ

জগদানন্দ বংশ

সাতগাঁও পরগণার পাত্রিকুলে যে ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ আছেন, তাঁহারা নিধিপতি বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহারাও ইটার রাজবিপ্লবে স্থানচ্যুত হইয়া এই স্থান বাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু কে কখন পাত্রিকুলে বসতি নির্ণয় করেন, বলা যায় না। জগদানন্দ হইতেই ইঁহাদের বংশাবলী পাওয়া যায়।

জগদানন্দের তিনপুত্র; তন্মধ্যে কনিষ্ঠপুত্র জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী নবাব হরকিষুণ মনসুর উলমুল্‌ক হইতে ৩ জলুস ৭ রমজান তারিখ যুক্ত এক সনন্দে (নং ১০৩৩) সাতগাঁও হইতেই ২৷৷০৷৷৫। ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ঐ ভূমি পরে তাঁহার পৌত্র যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তীর "তছরূপে" ছিল।

এ বংশে অনেক পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাধাকান্ত বাচস্পতি সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার ধ্যান ধারণা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহাকে তপস্বিতুল্য জ্ঞান হইত, তিনি হবিষ্যান্ন ভোজী ছিলেন।

ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভুবনেশ্বর বিদ্যামণি পিতৃব্যের ন্যায় ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। একটি অলৌকিক আখ্যান তাঁহার ভক্তির প্রমাণ রূপে কথিত হইয়া থাকে।[৮] বাচস্পতির সহোদর রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রাজ্যেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর নামে দুই পুত্র ছিলেন, ইঁহারা উভয়েই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, ১২২২ সালে তাঁহারা এক বিষ্ণুমণ্ডপ, অত্যুচ্চ শিবমন্দির ও দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরের পৌত্র শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্যই আমাদিগকে এই বংশ বিবরণ[৯] পাঠাইয়াছেন।

৮. গোপালের অতিথি সৎকারঃ–

পরমভক্ত ভুবনেশ্বর গোপাল বিগ্রহের অর্চ্চনা করিতেন, যখন ভুবনেশ্বরের কোন সন্তান হয় নাই, বাড়ীতে কেবল তাঁহার স্ত্রী মাত্র ছিলেন, তখন একদা তাঁহার অনুপস্থিত কালে বাড়ীতে কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন। ভুবনেশ্বরের পত্নী অতি শুদ্ধমতি রমণী ছিলেন। গৃহে সে দিন কোন সামগ্রী ছিল না, কি দিয়া অতিথি সৎকার করিবেন ভাবিয়া বড়ই বিষাদিতা হইলেন ও কাতরপ্রাণে অনন্য-শরণ গোপালের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

পরগণা-বালিশিরা

কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ

সাম্প্রদায়িক কাশ্যপ গোত্রীয়ের এক শাখা সাতগাঁও পরগণাবাসী; আমরা তাঁহাদের কোন বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারি নাই। বালিশিরার রাজাপুর কাশ্যপ গোত্রীয় আর এক বংশের বাস আছে।

ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণ সমাজ বন্ধন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনেকের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইয়াছিল, ঐ সময় যে সকল ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার মতে ঐক্য হয় নাই, তাঁহাদের অনেকেই স্বস্থানত্যাগী হইয়াছিলেন, কাশ্যপ গোত্রীয় রাম রাম ভট্টাচার্য্য তন্মধ্যে একজন। রাম রাম বালিশিরা গমন পূর্ব্বক ত্রিপুরাধিপতি হইতে এ স্থানে ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হয়। তৎকালে বালিশিরা স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অধস্তন বংশ কথা

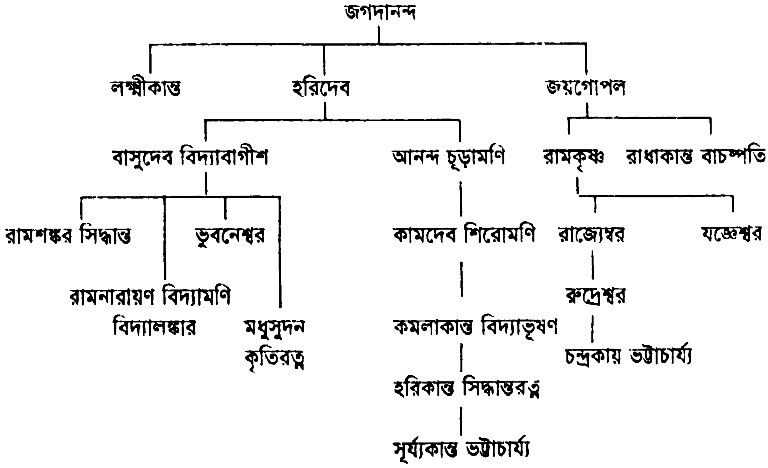
রাম রামের প্রপৌত্র চক্রপাণি ভট্টাচার্য্যের সময় হইতে এই বংশীয়গণ পৌরোহিত্য বৃত্তি অবলম্বন করেন। চক্রপাণির পুত্র পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নাম জগন্নাথ শিরোমণি। ইঁহার প্রপৌত্র রূপেশ্বর বিদ্যাবাগীশ; তাঁহার পুত্রের নাম দুর্গাচরণ বিশারদ। ইঁহার পুত্র রামশঙ্কর, তৎপুত্র কৃষ্ণচরণ বিদ্যালঙ্কার, গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্য, শিবচরণ ন্যায়বাগীশ ও নীলকণ্ঠ। তন্মধ্যে কৃষ্ণচরণের প্রপৌত্র হইতেই আমরা এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

গঙ্গাচরণের পৌত্র ঈশ্বর চন্দ্রে সাহসিকতার একটা কাহিনী এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

নিকটেই মুদির দোকান ছিল। এক বালক দুগাছি ক্ষুদ্র স্বর্ণবলয় লইয়া মুদির সেই দোকানে উপস্থিত হইল ও তাহা গচ্ছিত রাখিয়া দ্রব্যাদি আনিয়া ভৃত্যদ্বারা বাড়ীর মধ্যে পাঠাইল। অতিথি সেবা হইয়া গেল, ব্রাহ্মণপত্নী দ্রব্যেব অনুসন্ধান লইলেন না, তিনি মনে করিলেন যে, ভৃত্যই ইহা যোগাড় করিয়া দিয়াছে।

পরদিন বিদ্যামণি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মুদির গৃহে দেবতার হাতের বলয় দেখিতে পাইয়া চমকিত হইলেন ও মুদিকে বলয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসিয়া, তাহার নিকট বলয় প্রাপ্তির কথা শুনিলেন. পণ্ডিতের বড়ই সন্দেহ জন্মিল, তিনি গৃহে গিয়া গৃহিনীকে গোপালের বলযেব কথা বলিলেন। তখন উভয়ে একত্রে দেবগৃহে গিয়া দেখিলেন যে বিগ্রহের হাত শূন্য। বিদ্যামণি তখন প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার নেত্রে ভক্তির মুক্তাবিন্দু ঝরিতে লাগিল। তাহার পর কথিত আছে যে সন্ন্যাসী বেশে তিনি শেষ জীবন রংপুরে যাপন করেন।

৯ ইঁহাদের ক্ষুদ্র বংশাবলীর একাংশ এইঃ-



ঈশ্বর চন্দ্রের পিতা চন্দ্রকান্ত সজ্ঞানে স্বগীয় কাশীপ্রাপ্ত হন। মাতা দেড় বৎসরের শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। একদা তথা হইতে তিনি বাড়ী আসিতেছেন; পদ্মাপারে উপস্থিত হইলে, খাবার ক্রয়ের জন্য বস্ত্রের পুটলী খুলিয়া কয়েকটি পয়সা বাহির করিলেন; এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, পরপারে যাওয়ার জন্য খেওয়া-নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে; ঈশ্বরচন্দ্র আর খাবার ক্রয়ের অবকাশ পাইলেন না, তাঁহার আর খাওয়া হইল না। পুটলীটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলিয়া লইয়া নৌকায় উঠিলেন–বাঁধিতেও পারিলেন না। নৌকা যখন "মাঝ গাঙ্গে" গিয়াছে, ঐ পুটলী বান্ধিতে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন,–সর্ব্বনাশ! টাকার গ্রন্থিটা আনেন নাই, ভ্রমতঃ তীরে ফেলিয়া আসিয়াছেন! মাঝিকে নৌকা ফিরাইতে তিনি কত অনুনয় করিলেন, মাঝি কর্ণপাতও করিল না। দরিদ্র যুবক তখন সেই ভীমা বেগবতী পদ্মায় ঝাঁপদিয়া পড়িলেন! নৌকার লোকেরা তাঁহার এই দুঃসাহসিকতার পরিণাম দেখিতে সেদিকে চাহিয়া রহিল। নৌকা চলিতেছে, ঈশ্বরচন্দ্রকে কখন দেখা যায়, কখন বা তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে কিছু দৃষ্টি হয় না। অনেকেই ভাবিল-ব্রাহ্মণের ছেলে প্রাণে মরিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মরেন নাই, জগদীশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিয়া ছিলেন।

মনে হইতেছে–এই ঈশ্বরচন্দ্রই প্রায় সময়ে আর এক ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপই তরঙ্গময়ী বেগবতী ভরা নদীতে ঝাঁপদিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃচরণ দর্শনে গিয়াছিলেন; তিনি অন্য কেহ নহেন–প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণ

দত্তদের দাতৃত্ব

বালিশিরায় আরও অনেক ব্রাহ্মণ বংশের বাস। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রঘুনাথ পুরের ভট্টাচার্য্য গণের পূর্ব্বপুরুষ মধুসূদন উপাধ্যায় জামশীর দত্ত বংশীয় নিজ শিষ্য ভানুরাম দত্ত সহ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। ভানুরামের পুত্র স্বরূপ রাম, তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম, নবাবের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া দেশে খুব প্রতিপত্তি ছিল। গুরুবংশে তখন রঘুনাথ তর্কবাগীশ বর্ত্তমান দেওয়ান ইঁহাকেই এক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল তাই নহে, তাঁহাকে তিনি ভরণপোষণোপযোগী ব্রহ্মত্র ভূমি দান করতঃ সেই স্থানকে "রঘুপুর" নামে সংজ্ঞিত করেন। তিনিই শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দিগকে তত্রত্য রাজপণ্ডিতি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মধুসূদনের বংশ্যাখ্যান

রঘুনাথ নিজপুত্র বিষ্ণুদাসকে তিনবৎসরের রাখিয়া পরলোকবাসী হন। আশ্রয়হীনা জননী তখন আপন পুত্রকে লইয়া পিত্রালয় মাধব পাশায় গমন করেন। মাতামহ তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার্থ মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছিলেন; তথায় তিনি তর্কপঞ্চানন উপাধি লাভ করেন। বিষ্ণুদাস মিথিলা হইতে দেশে আসিয়া ত্রিপুরেশ্বরের সভায় গমন করেন ও তত্রত্য রাজপণ্ডিতকে বিচারে পরাভূত করেন। ইহার পরে তিনিই তথাকার সভাপণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজ এই নূতন সভাপণ্ডিতকে দেশে এক বৃহৎ পুষ্করিণী সহ বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিষ্ণুদাসের চারিপুত্র, তন্মধ্যে তিনজন উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন, ইঁহাদের নাম–রামজীবন (ইনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন), রামকান্ত শিরোমণি, রূপরাম বিদ্যারত্ন ও দেবীচরণ "বিদ্যাবাগীশ।"

রাম কান্তের পুত্রের নাম জানকীনাথ বিদ্যালঙ্কার, ইনি সন্তানাদি বিহীন। বিদ্যালত্নের পুত্রের নাম বলদেব বাচস্পতি; ইনিও পুত্রাদি বিরহিত।

বিদ্যাবাগীশের দুই পুত্র–রামচরণ তর্কবাগীশ এবং কালিকা প্রসাদ বিদ্যাভূষণ। তর্কবাগীশের পৌত্র শ্রীযুক্ত রামজয় ভট্টাচার্য্য হইতে আমরা এই ক্ষুদ্র বংশ্যাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছি।

পঞ্চম অধ্যায়

আরও কতিপয় বংশ বিবরণ

পরগণা-ইটা

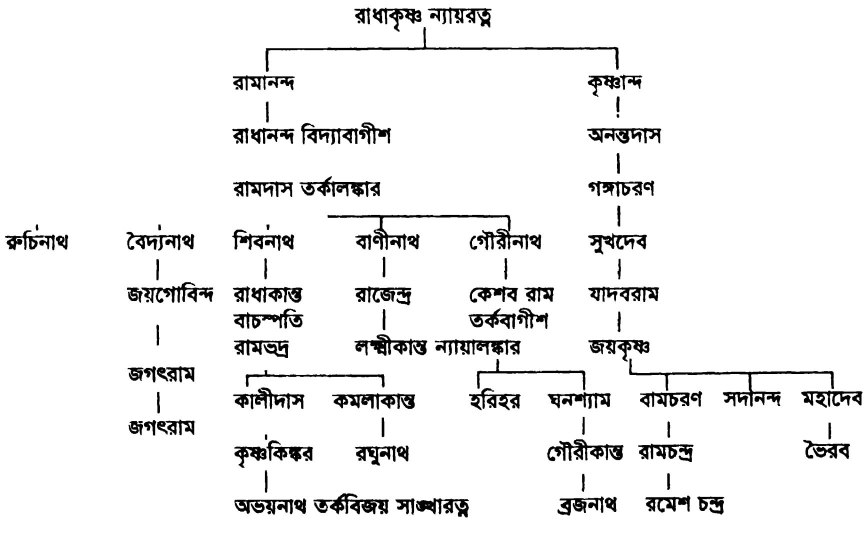
বংশ কথা সঙ্কর্ষণ গোত্র

সঙ্কর্ষণ গৌত্রীয় সামবেদী কৃষ্ণদাস চূড়ামণি কান্যকুব্জ হইতে স্বীয় পুত্র কাশীনাথ বিদ্যামণি সহ অবশেষে শ্রীহট্ট জিলায় উপস্থিত হন ও নন্দীউড়া গ্রামে বসতি করেন। তাঁহার অষ্টম পুরুষে[১] উমাকান্ত শিরোমণির জন্ম হয়, ইনি তপস্বীর ন্যায় জঙ্গলে বাস করিতেন; তাঁহার বদনে সদা হাস্য স্ফুরিত হইত, এজন্য তিনি "আনন্দী মহাশয়" নামে কথিত হইতেন। ইঁহার দশম পুরুষে স্বরূপচন্দ্রের উদ্ভব, স্বরূপ চন্দ্র তর্কপঞ্চাননের পুত্র শিবরাম ও রামকান্ত; ইঁহাদের সকলের কীর্ত্তিকাহিনী অতীতের গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। সঙ্কর্ষণ গোত্রীয় কাশীনাথের পরে নন্দীউড়ায় আগত অন্যান্য ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ ইঁহাদিগকে গুরু ও পুরোহিত স্বীকার করায় বুঝিতে পারা যায় যে এই বংশীয় ব্যক্তিগণ নানা গুনে ভূষিত ছিলেন। রামকান্তের ৬ষ্ঠ পুরুষে রাম বল্লভ বিদ্যারত্নের উদ্ভব, ইঁহার পৌত্রের নাম রাধাকৃষ্ণ ন্যায়রত্ন। রাধাকৃষ্ণের পৌত্র পণ্ডিত রাধানন্দ বিদ্যাবাগীশ। ইঁহার পুত্র রামদাস তর্কালঙ্কার অত্রত্য অর্জ্জুন বংশীয়গণের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন।

---

১. এই বংশের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা এইঃ–

কৃষ্ণ চূড়ামণি, তৎপুত্র কাশীনাথ বিদ্যামণি, তৎপুত্র রত্নেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র কমল নারায়ণ, তাঁহার পুত্র কন্দর্প নারায়ণ, তৎপুত্র কৃষ্ণরাম, তৎপুত্র কৃপা রাম, ইঁহার পুত্র রতিকান্ত ও উমাকান্ত শিরোমণি। উমাকান্তের পুত্র সূর্য্য নারায়ণ, তাঁহার পুত্র সম্পদ রাম বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র শ্রীনাথ বিদ্যাবত্ন, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তাঁহার পুত্র সুখদেব, তাঁহার পুত্র সানন্দ রাম তৎপুত্র স্বরূপ চন্দ্র তর্ক পঞ্চানন, স্বরূপ চন্দ্রের পুত্র শিবরাম ও রামকান্ত, রামকান্তের পুত্র রূপগোবিন্দ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্র রাম গোবিন্দ, তৎপুত্র রাজ গোবিন্দ, তাঁহার পুত্র রাম বল্লভ বিদ্যারত্ন, ইঁহার পুত্র রাজারাম, তাঁহার পুত্র রাধাকৃষ্ণ ন্যায়রত্ন ইঁহার দুই পুত্র, যথাঃ–



অৰ্জ্জুন বংশীয় রতিরাম এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন;[২] তাঁহার চেষ্টাতেই তর্কালঙ্কার তদীয় পুরৌহিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। রতিরাম তাঁহাকে স্বীয় অধীন গ্রাম সমূহের "রাজপণ্ডিতি" বিদায় পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

রামদাস তর্কলঙ্কারের এক পৌত্রের নাম রাধাকান্ত বাচস্পতি; ইঁহার এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল, অনেক শিষ্য তাহাতে অধ্যয়ন করিত। তাঁহার পুত্রের নাম রাম রামভদ্র। ইটার প্রসিদ্ধ দেওয়ানের দীঘী খনন কালে রামভদ্র বালক মাত্র ছিলেন, রামভদ্র বালক হইলেও সমাগত পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় সমর্থ হইয়াছিলেন। দেওয়ান শ্যামরায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তখন ১/২ কেদার ভূমি দান করেন। রামভদ্রের প্রণীত সাববেদীয় রুদ্রাধ্যায়ের এক টীকা আছে।[৩] ইঁহার পত্নী সর্ব্বানী দেবী উত্তম লেখাপড়া জানিতেন, তিনি স্বীয় শিষ্য যাদব রাম অৰ্জ্জুনকে একদিন একটি কবিতা প্রেরণ করেন, তাহা এইঃ-

"জিতধূম প্রসেকায় জিত ব্যজন বায়বে।
মশকায় ময়াকায় সায়মারভ্য দীয়তে॥"

এই শ্লোক প্রাপ্তে শিষ্য পরদিন একটি মশারি আনিয়া সর্ব্বানী দেবীকে প্রদান করেন। রামভদ্র ও তদ্বংশীয় হরিহরের যুক্ত নামে ১১৪নং রাম-হরি সংজ্ঞক একটি তালুক আছে, হরিহরের পিতামহ রাজেন্দ্রের নামে তত্রত্য ৬৪৩নং তালুকের নামোৎপত্তি হয়। এই বংশীয় রাজ বল্লভ একটি দীঘী খনন করাইয়া ছিলেন, "রাজ পুকুর" নামে উহা খ্যাত আছে। এ বংশীয় কৃষ্ণ কিঙ্কর ও কামদেব প্রভৃতি তত্রত্য কালভৈরব দেবতার নামে তথায় "ভৈরবগঞ্জ" নামক বাজার স্থাপন করেন। এ বংশে যাহারা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শুনা যায় যে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই টোল ছিল। এ বংশীয় শ্রীযুত রজনী কুমার কাব্যতীর্থ বিদ্যারঞ্জন হইতে আমরা এই বংশবিবরণ ও বংশ তালিকা এবং অৰ্জ্জুন বংশের তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ঘৃত কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ

ইটার ক্ষেম সহস্র গ্রামে ঘৃত কৌশিক গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ বংশের বাস। ইঁহাদের শুধু নামের তালিকা মাত্র আমরা পাইয়াছি।

এই গোত্রীয় রামভদ্র কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া কাশীতে বাস করেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার পুত্র বলরাম কামরূপস্থ পীঠস্থান দর্শন পূর্ব্বক শ্রীহট্টের অন্তর্গত ক্ষেম সহস্রে আসিয়া বাস করেন; ইঁহার প্রপৌত্রের নাম বলগোবিন্দ। বলগোবিন্দের প্রপৌত্র হলধর, হলধরের পুত্র গদাধর তর্কালঙ্কার। ইঁহার প্রপৌত্রের নাম গোপীরাম। গোপীরামের চারিজন প্রপৌত্র ছিলেন, তন্মধ্যে রতিরাম জ্যেষ্ঠ; এবং "সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্ববিৎ" আত্মরাম বাচস্পতি তৃতীয়। রতিরাম চক্রবর্ত্তী প্রকৃতই কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। জনৈক নবাব হইতে ইটায় তিনি কতক ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ঐ ভূমি অদ্যাপি তদ্বংশীয়গণের অধিকারে আছে। এই বংশীয় শ্রীযুত কালী চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকবন্দে আমাদিগকে ইহা লিখিয়া জানাইয়াছেন।

আর একটি বংশ কথা

ইটার বালিসহস্র গ্রামে ত্রিপ্রবরান্বিত ঘৃত কৌশিক গোত্রীয় আর এক বংশ ব্রাহ্মণ আছেন; ইহারাও আপনাদিগকে কান্য কুব্জাগত বলিয়া পরিচয় দেন। এই বংশীয় শিবজী ঠাকুর

২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৯ম অধ্যায়ে রতিরামের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তদ্বংশের অবশিষ্ট কথা কীর্ত্তিত হইবে।

৩. উক্ত টীকার ১ম শ্লোকঃ-"রুদ্রং প্রণম্য সাষ্টাঙ্গং শ্রীরামরুদ্র শর্ম্মণা।"

যবনোৎপীড়নে সপরিবারে দেশত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে আসিয়া অবস্থিতি করেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা রমাপতি সেই স্থানেই বাস করেন। শিবজীর পুত্র শ্রীকান্ত, তৎপুত্র পুরুষোত্তম, ইঁহার পুত্রের নাম হরিহর ছিল। হরিহর নিজ পুত্র সহ জ্ঞাতি বর্গের উদ্দেশে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ক্রমে পরিচিত হন। হরিহরের পুত্র দয়াকুল সেই স্থানেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া "ত্রিবেদী" খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে পিতাপুত্রে দেশে আসার মানসে যাত্রা করেন। পথে হরিহরের মৃত্যু হয়। দয়াকুলের পুত্রের নাম রামেশ্বর, তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর, তাঁহার পুত্র পিতাম্বর, পিতাম্বর বিদ্যাবিশারদ ছিলেন এবং তিনি "পণ্ডিত" নামে খ্যাত হন। ইঁহার পুত্র দিগম্বর পণ্ডিতের নামে ত্রিপুরাধিপতি, মাণিক্য ভাণ্ডার নামক স্থানের উপস্বত্ব হইতে একটি বৃত্তি অবধারিত করিয়া দেন। দিগম্বরের বাসস্থান "দিগম্বরপুর" বলিয়া খ্যাত হয়। দিগম্বরের পুত্র লক্ষীকান্ত পণ্ডিত দিগম্বরপুরের একক্রোশ দূরে বালি সহস্র গ্রামে আগমন করেন ও সেই স্থানবাসী হন। ইঁহার জয়দেব, দেবচন্দ্র ও মণিরাম নামে তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে জয় দেবের পুত্র রমাকান্ত বিশারদ প্রভৃতি, মণিরামের কনিষ্ঠ পুত্র রাম নাথ ভ্রমণোপলক্ষে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তিনি "শিরোমণি" উপাধি লাভ করেন, কিন্তু অচিরেই সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনে গজরাজ গিরে নাম ধারণে এদেশে আগমন করেন ও শিব মন্দিরাদি প্রস্তুত ক্রমে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন-নিবিষ্ট হন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ রাম ভট্টাচার্য্য স্বাধীন ত্রিপুরার পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি লাভ করেন; তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও আজীবন উক্ত বৃত্তিভোগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র, ইঁহাদের নাম অনন্ত রাম, রাজকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ ন্যায় ভূষণ। অনন্ত রামের সময় স্বাধীন ত্রিপুরার বৃত্তি উঠিয়া গিয়াছিল, তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হন।[৪] ত্রিপুরার "শ্রীগুরু আজ্ঞা" মোহরাঙ্কিত হইয়া ১২৬৫ ত্রিং (১২৬২ বাং) সনে ১৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই আজ্ঞাপত্র প্রদত্ত হয়। উক্ত রাজ কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ ন্যায় ভূষণের পুত্র শ্রীযুত কালী কুমার ভট্টাচার্য্য এই বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

পূতিমাস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ

ত্রিপপ্রবরান্বিত সামবেদীয় পূতিমাস গোত্রের ব্রাহ্মণ গণের বংশ সংখ্যা এতদঞ্চলে অধিক নহে। ইটার পূতিমাস গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কোথা হইতে কি কারণে শ্রীহট্টে আগমন করেন, জানা যায় না; ইঁহারাও বালিসহস্র বাসী। এ বংশীয় প্রথমাগত ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত হইতে এ বংশে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ২৪/২৫ পুরুষ চলিতেছে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে মোসলমান বিপ্লব কালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত এদেশে আসিয়া থাকিবেন। ধনুর্দ্ধরের পুত্রের নাম বিদ্যাধর, তৎপুত্র-শ্রীধর; এই তিন জনের পণ্ডিত পদবি ছিল।

শ্রীধরের পুত্রের নাম ব্যাস দেব, তৎপুত্র বশিষ্ঠ দেব, ইঁহার দ্বাদশ পর্য্যায় শুকদেব বিদ্যানিবাস নামক একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পৌত্র মহেশ রাম পঞ্চাননের নামে এই বংশ "মহেশ পঞ্চাননের বংশ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মহেশ রামের ৫ম পর্য্যায়ে তিলক বাচস্পতির উদ্ভব, ইঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা রত্নবল্লভের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র তর্কভূষণ জীবিত আছেন।[৫]

---

৪. আজ্ঞাপত্রঃ–"রাজগী মোতাবেক মোকাম কমলপুর মাণিক্য ভাণ্ডারের কার্পাস ও বনকর মহারে বেপারিয়ান ও দোকারদারান ও বন কামলাগয়রহকে সমাজ্ঞেয়ং কার্যঞ্চ পরং পরগণে ইটা সাং বালিসহস্রবাসী শ্রীরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এক কিত্তা দরখাস্থ দাখিল করিয়াছে যে তুমারগ পাশ তুলামুটীবাঞ্চ ফি টাকাতে <১০ আদ আনা হিসাবে উহার পিতামহের আমল পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইয়া আসিছে এহাতে ২/৩ বৎসর যাবৎ তুমরা সবাবর্তি করিয়া দেও না অতএব লিখা জায় চিটি দর্শনে পূর্ব্ব রিতি মতে ভট্টাচার্য্য মজকুরের বৃত্তি আদায় করিবা। ইতি ১২৬৫ ত্রিং তাং ১৫ জ্যৈষ্ঠ। মরকমা শ্রীযুগল কিশোর দত্ত।"

পরগণা-ভাটেরা

বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কথা

ভাটেরার বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ গণের পদবি চক্রবর্ত্তী এবং ব্যবসায় পৌরোহিত্য। এই বংশের আদি পুরুষের নাম শিবানন্দ। শিবানন্দ-বংশের বিবরণ সম্যক পাওয়া যায় না, ১১৬ বাংলার গৃহদাহে তাঁহাদের অনেক কাগজ পত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাজা রাম সিংহ নামক এক ব্যক্তি গৃহে অগ্নিদান করিয়াছিল। গৃহদাহে সনন্দাদি বিনষ্ট হওয়াতে ইহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য দরখাস্থ দেওয়া হইলে, ১১১৭ বাংলার ১৬ই ফাল্গুণ তারিখে রাজ পণ্ডিতি সনন্দ এবং ১১২২ বাংলার ১০ রমজান তারিখে৷৷২ কেদার ভূমির ব্রহ্মত্রের সনন্দ পুনঃ প্রদত্ত হয়। শিবানন্দ হতে বর্ত্তমানে পঞ্চদশ পুরুষ চলিতেছে। শিবানন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম বাণীনাথ শিরোমণি। শিরোমণির বৃদ্ধ প্রপৌত্র রমাপতি বাচস্পতি; ইঁহার বলভদ্র বাচস্পতি ও রাম নাথ বিশারদ নামে দুই পুত্র ছিলেন। রাম নাথের পুত্রের নাম রতিকান্ত বিদ্যাভূষণ। বলভদ্রের পৌত্র গিরিধর চক্রবর্ত্তী। ইনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, প্রতিভা বলে তিনি দ্বারবঙ্গের মহারাজের "দ্বারপণ্ডিত" নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা শ্যামা নন্দের পৌত্রগণ জীবিত আছেন।

চক্রবর্ত্তী বংশের কথা

ভাটেরার চক্রবর্ত্তী বংশ তত্রত্য পুরকায়স্থ বংশের পুরোহিত। চৌধুরী বংশের পৌরোহিত্য, ভট্টাচার্য্য পদবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য বংশে এক সময় অনেক পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছিল। ভাটেরার চৌধুরী বংশীয়গণ একেবারে জোড়ে নৌকাপূজা করেন, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ভট্টাচার্য্য বংশীয়া এক বিদূষী বালিকা পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিয়া যশস্বিনা হইয়াছিলেন। এই বালিকা লিখিতে কি পড়িতে পারিতেন না। তাঁহার পিতার টোল ছিল, অধ্যাপনা কালে তিনি কাছে থাকিয়া পিতার উক্তি শুনিতেন। তাঁহার স্মৃতি শক্তি অতি প্রবলা ছিল, শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া সেই শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়াছিল।

ভাটেরায় গোস্বামী উপাধি বিশিষ্ট আর এক বংশীয় ব্রাহ্মণ আছেন, ইঁহারা তত্রত্য বহুবংশের কুলগুরু ছিলেন।

ভাটেরার গোতম গোত্রীয়

ভাটেরার গোতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য বহুকাল যাবৎ। প্রায় দ্বাদশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী কেশবাচার্য্য হইতে বংশ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেশবাচার্য্যের পুত্র দৈবকীনন্দন সিদ্ধান্ত; ইঁহার প্রপৌত্র রামনাথের কেশব রাম বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে কেশবরাম বিদ্বান্ ও গুণবান্ ছিলেন বলিয়া মোগল সম্রাট হইতে এক সনন্দে ৫০ দ্রোণ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের জনার্দ্দন ও পুরুষোত্তম নামে দুইপুত্র হয়, জনার্দ্দনের পুত্র গোবিন্দরাম সরস্বতী ও শিবরাম। ইঁহাদের উভয়ের বংশ অনেকটা বিস্তৃত। পুরুষোত্তম ও শিবরামের যুক্ত নামে এক সনন্দ আছে, ইঁহারা নবাব হরকিষূণ দাস মনসুর উল মুল্‌ক হইতে

৫. বালি সহস্র বাসী শ্রীযুত কালী কুমার ভট্টাচার্য্য এই বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন। বশিষ্টদেব হইতে ইহাদের নামাবলী যথাক্রমেঃ–অনন্ত, রামকৃষ্ণ, হৃদয়ানন্দ, রামশঙ্কর, শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ, রামভদ্র, রামজীবন, রঘুনন্দন, হরিকান্ত, শুকদেব, রাঘব, মহেশরাম, কামদেব, জগন্নাথ, জয়কৃষ্ণ, রত্নবল্লভ, রাজকৃষ্ণ, অভয়াচরণ, জয়চন্দ্র তর্কভূষণ। এই বিস্তৃত ও প্রাচীন বংশের একটি ধারার ক্রমানুযায়ী নাম এস্থলে লিখিত হইল।

ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবরামের জ্যেষ্ঠপুত্র শুভঙ্কর বিদ্যালঙ্কার, ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি, ইঁহার চারিপুত্রের মধ্যে রুদ্রকিঙ্কর পরম সাধক ছিলেন; কথিত হইয়া থাকে যে তদীয় স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবতী সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন। তিনি বর্দ্ধনকুটী রাজের পণ্ডিতসভা জয় করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি সঞ্চয় করেন। দ্বাবিংশতি বর্ষবয়সে কাশীধামে তিনি নশ্বর জীবন ত্যাগ করেন। রুদ্রকিঙ্করের পুত্রাদি হয় নাই, তাঁহার ভ্রাতা রাসকিঙ্কর তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার ভট্টাচার্য্য হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পরগণা-চৌয়ালিশ

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কথা

চৌয়ালিশ বাসী সামবেদীয় শাণ্ডিল্য গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণের এক বৃহৎ বংশ তালিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এ বংশের বীজী পুরুষ ধরাধর মিথিলাবাসী ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন, একদা তিনি স্বীয় "জাতপত্র" আলোচনায় জানিলেন যে বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ইহা জানিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করতঃ কাশীধামে গমন করেন ও জনৈক দণ্ডী-স্বামীর নিকট প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ শিক্ষা করিয়া, সাধনা প্রভাবে মৃত্যুর করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

মৃত্যুর অবধারিত দিন অতিক্রান্ত হইলে দণ্ডীস্বামী তাঁহাকে "বজ্রধর" নাম প্রদান করেন। বজ্রধর আর দেশে না গিয়া কালে এদেশে আগমন করেন। তাঁহার সহিত মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা চৌয়ালিশ আসিয়া বন্য ত্রিপুরা জাতীয় লোকের সাহায্যে সেই স্থান পরিষ্কার ক্রমে বাস করেন। কিছুদিন পরে তিনি আবশ্যকানুসারে এক স্থানে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটা স্বর্ণ মুকুট ও অর্থাদি প্রাপ্ত হইলেন। মুকুট প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সেই স্থানকে "মুকুটপুর" নামে অভিহিত করিলেন। কথিত আছে, জঙ্গলাদি আবাদ করায় শ্রীহট্টের নবাব তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেইস্থানে ব্রহ্মত্র দান করেন।

বজ্রধরের পৌত্র চূড়ামণি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, ইনি এক দীর্ঘিকা খনন করেন; অদ্যাপি উহা "চূড়ামণির দীঘী" নামে কথিত হইয়া থাকে। চূড়ামণি নিকটবর্ত্তী বিনশনা গ্রামে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন; তাঁহার বংশ তথায় আছেন। এই বংশে জয়কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। চূড়ামণির কনিষ্ঠভ্রাতা মধুসূদনের, বিদ্যানন্দ, বিদ্যাবল্লভ ও বিদ্যাভূষণের বংশ ফুলতৈল গ্রামে, এবং বিদ্যাবল্লভের বংশ দীপীয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বংশে বর্ত্তমান ৯/১০/১১ পুরুষ চলিতেছে।

বিদ্যাবল্লভের দুইপৌত্র ছিলেন, তাঁহাদের নাম রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন; কথিত আছে বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ হইতে সমাগত বহু পণ্ডিতকে তিনি শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী "সহমরণ" প্রথামত দেহত্যাগ করিয়া অক্ষয় পূণ্য-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই শ্যামল ক্ষেত্র "সতীর সহগমন তলা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্রের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র গুণেশ্বরের তিন পুত্র, ইঁহারা তিনজনই উপাধিধারী পণ্ডিত, তিনজনই জীবিত আছেন। বিদ্যাভূষণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দুইজন ছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হরবল্লভ, ইঁহার দুই বৃদ্ধপ্রপৌত্রও উপাধিধারী, তন্মধ্যে, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে।[৬]

৬. মোনসী বাজার হইতে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য এই বিবরণ প্রেরণ করিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন।

ভুজবলের গোস্বামী-বংশ

এক্ষণে আমরা যে বংশের একটি শাখার উল্লেখ করিতেছি, তাহা একটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধবংশ। এই বংশের বহুশিষ্য শ্রীহট্ট জিলার ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় আছেন। এই বংশ বাণীবংশ বলিয়া খ্যাত। ঠাকুর বাণী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত আমরা ৪র্থ ভাগে বলিব; বাণীবংশের অন্যান্য সংবাদ পরবর্ত্তী ৪র্থ খণ্ডে উক্ত হইবে, এ স্থলে বাণী বংশের একটি শাখার মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

ঠাকুর বাণীর তিন পুত্রের মধ্যে শুকদেব মধ্যম ছিলেন, তিনি চৌয়ালিশ পরগণার ভুজবলে গ্রামে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র চৌতলীতে চলিয়া যান।

ভক্তিতে সম্পদ প্রাপ্তি

শুকদেবের দুইপুত্র, ইঁহাদের নাম রাম গোবিন্দ ও কৃষ্ণ গোবিন্দ। রাম গোবিন্দের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, একদা তিনি গঙ্গাস্নানোদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ গমন করেন। দূর হইতে গঙ্গাদর্শনে তাঁহার প্রাণ পুলকে নৃত্য করিতে লাগিল। সেদিন সপ্তমী তিথি ছিল, তিনি ত্রিলোক তারিণী ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে পতিত হইয়া নিমীলিত-নেত্রে ভগবতী জাহ্নবীর ধ্যানে নিমগ্ন-চিত্ত হইলেন; তৎপ্রতি ভাগীরথীর করুণা হইর, তিনি তাঁহার কৃপাতেই তদীয় সাংসারিক দারিদ্র ক্লেশ ও দূরীভূত হয়; তিনি প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন।

তিনি তথা হইতে দেশে আসিলে জয়ন্তীয়াপতি দ্বিতীয় বড় গোসাই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া রাজধানীতে লইয়া যান ও তাঁহার নিকট হইতে যোগাঙ্গ শিক্ষা করিয়া প্রচুর অর্থাদি দ্বারা গুরুদক্ষিণা করেন। গঙ্গাভক্তির পুণ্য–প্রভাবে অক্ষয় ফলপ্রাপ্তির কথা তো আছেই, তদ্ব্যতীত আনুষঙ্গিকরূপে দারিদ্র দুঃখ বিমোচন রূপ ঐহিক ফল তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল এবং ইহা তিনি আপ্তবর্গ সদনে ব্যক্ত করিতেন। ইঁহার দুই পুত্রের নাম জয়গোপাল ও রঘুগোপাল। রঘুগোপালের পুত্রের নাম ত্রিলোক চন্দ্র, ইঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমান আছেন।

কৃষ্ণগোবিন্দের পুত্রগণের মধ্যে পাগল শঙ্কর জ্যেষ্ঠ; সিদ্ধপুরুষ পাগল শঙ্করের নাম স্মরণে ইঁহার নাম রাখা হইয়াছিল। কৃষ্ণগোবিন্দের বংশধরবর্গই বর্ত্তমানে ভুজবল বাসী, এই শাখায় বর্ত্তমানে পঞ্চম পুরুষ চলিতেছে।[৭]

---

৭. এই বংশের একটি বংশধারা এস্থলে প্রদত্ত হইলঃ–



পরগণা-কৈলাশহর

চৌধুরী বংশের কথা

প্রাচীন ও নবস্থাপিত কৈলাশহরের বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে কথিত হইয়াছে। কৈলাশহর ত্রিপুরাধিপতির স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহা শ্রীহট্টেরই প্রকৃতি বিশিষ্ট; ইহাকে যে শ্রীহট্টেরই অংশ বলা যাইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই[৮] বলা গিয়াছে। বর্ত্তমান কৈলাশহর নগর নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই এখানে শ্রীহট্টের কেহ কেহ বাস করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ চৌধুরী ও মজুমদারগণ প্রধান।

পরগণা দুলালীতে গৌতম গোত্রীয় একটি ব্রাহ্মণ বংশে ছয়পুরুষ পূর্ব্বে অনন্ত নারায়ন নামে একব্যক্তির জন্ম হয়, কোন কারণে উক্ত অনন্ত নারায়ণ দুলালীর পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাচীন জনশূন্য কৈলাশহরে গিয়া বাটিকা নির্ম্মাণ করেন। মোসলমান চৌধুরী ও মজুমদারেরাও তৎকালেই তথায় গমন করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্মমাণিক্য[৯] অনন্তকে অনেক দেবত্র ও ব্রহ্মত্র দান করিয়া ছিলেন। আমরা অনন্ত নারায়ণের একাধিক সনন্দ দেখিয়াছি; কিন্তু তাহা অতি জীর্ণ ও অপাঠ্য।

অনন্ত নারায়ণের পুত্রের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার নামীয় সনন্দও (রাজদত্ত) দেখিয়াছি, তাহাও জীর্ণ ও অপাঠ্য। ইনি ধর্ম্মমাণিক্য হইতে সন ১১৩০ সালের ১৫ই বৈশাখে কতক ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, ভূমির পরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। ভূমির পাট্টায় লিখিত আছে যে, জঙ্গল আবাদ হইলে প্রতি দ্রোণের খাজানা "দুই রুপায়া" দিতে হইবে। ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীয় ভূমি।

ইঁহার তিন পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। মধ্যম কীর্ত্তি নারায়ণ এবং কনিষ্ঠ রঘুদেব। রঘুদেব নিঃসন্তান ছিলেন। ইঁহাদের তিন জনের যুক্ত নামে দেবত্রাদির সনন্দ আছে। মহারাজ জয়মাণিক্য[১০] প্রদত্ত একখানা সনন্দপত্রে দৃষ্ট হয় যে, এইভ্রাতৃদ্বয়কে তিনি ৫/১ পাঁচদ্রোণ এককানি ভূমি দেবত্র প্রদান করিয়াছিলেন।[১১] মহোরাজ জয় মাণিক্যের পদ্ম মোহরাঙ্কিত আর একখানা সনন্দে রাম নারায়ণ কৈলাশহর, ধর্ম্মনগর ও ইন্দ্রনগরে "শ্রীকর্ণী" নিযুক্ত হন এবং এইস্থান ত্রয়ের হিন্দু প্রজাগণকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দান পূর্ব্বক "বিদায়" পাইবার

৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ১ম ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম অধ্যায়ে কৈলাশহরের কথা দ্রষ্টব্য।

৯-১০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগের ক পরিশিষ্টে ত্রিপুরায় রাজবংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

১১. পদ্ম মোহরের মধ্যে "শ্রীশ্রীযুত জয় মাণিক্য দেব" এবং তৎচতুষ্পার্শে "গোবিন্দ মাণিক্য দেব, রত্ন মাণিক্য দেব" নাম যুক্ত মোহরাঙ্কিত সনন্দের অবিকল নকল এইঃ-

স্বস্তি-শ্রীশ্রীযুত জয়মাণিক্য দেব বিশম শমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজ নামা দেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতেহন্যতপরং-রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে কৈলাশহর শ্রীরাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তি ও শ্রীয়ঘুদেব চক্রবর্ত্তী ও শ্রীকির্ত্তি নারায়ণ চক্রবর্ত্তিকে অজ হাশীহালে পৃতে মহাফিক জায়মতে ৫/১ পাঁচ দ্রোণ এক কানী জমি ব্রহ্মউত্তর দিলাম। ঐ জমির খাজানা ও ভেট বেগার পাচা পঞ্চক বৃসিংহ (?) সমস্ত অঙ্ক নিশেদ ঐ জমি ভূগ করিয় পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে আশির্ব্বাদ করিতে রহুক ইতি ১১৫০ সন তারিখ ১ আশ্বিন।

"জায় জমি-

রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তি-৩/০

রঘুদেব-১/১

কির্ত্তি নারায়ণ চক্রবর্ত্তি-১/০ ৫/১

মং পাঁচ দ্রোন এক কাণী।

সনন্দের নকল অবিকল উদ্ধৃত হইল, ইহাতে বহুতর বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে।

অধিকার প্রাপ্ত হন।[১২]

ত্রিপুরার মোহর

ত্রৈপুর-নৃপতিবর্গের সনন্দাদিতে দুইপ্রকার মোহর ব্যবহৃত হয়; প্রথম পদ্ম মোহর; এই মোহরের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান নরপতির নাম ক্ষোদিত থাকে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন কি পাঁচজন নৃপতির নাম উৎকীর্ণ থাকে। এই মোহর সনন্দাদিতে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় দেবাজ্ঞা মোহর। ক্ষুদ্রাকার একটি পদ্মের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ খালি স্থানে "রামাজ্ঞা" প্রভৃতি দেবাজ্ঞা অঙ্কিত। এই মোহর কর্ম্মচারী বা প্রজা বর্গের নামীয় রাজস্বাদি সংক্রান্ত চিঠি পত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন সামান্য সনন্দেও ইহা মুদ্রিত করা হইয়া থাকে।

চৌধুরাই প্রাপ্তি

রাম নারায়ণের পুত্রের নাম কৃষ্ণ নারায়ণ ও জয় নারায়ণ। জয় নারায়ণ ত্রিপুরাধিপতি হইতে তত্রত্য চৌধুরাই এবং কৃষ্ণ নারায়ণ মজুমদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয় নারায়ণের পুত্র সন্তান ছিল না, এক কন্যা মাত্র ছিল। জয় নারায়ণ ও কৃষ্ণ নারায়ণের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ নারায়ণের পুত্র শ্যাম নারায়ণ, জয় নারায়ণের স্থলে তত্রত্য চৌধুরাই প্রাপ্ত হন এবং জয় নারায়ণের দৌহিত্র ভবানী চরণের নামে মজুমদারি বাহাল হয়। ইহাতে মহারাজ দুর্গামাণিক্যের দেবাজ্ঞা মোহর ব্যবহৃত হইয়াছে; "রামাজ্ঞা" স্থলে উক্ত মোহরে "কালীভজ" অঙ্কিত।[১৩] এই আদেশ পত্র ১২২০ ত্রিং সনে প্রদত্ত। ইহাতে বোধ হয় যে, ভবানী চরণকে শ্যাম নারায়ণ নিরাপত্যে নানকার ছাড়িয়া দেন নাই।

ভবানী চরণের মজুমদারি প্রাপ্তির সনন্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ইহা দুর্গা মাণিক্যের পদ্ম মোহরাঙ্কিত ১২২৯ ত্রিং সনে প্রদত্ত সনন্দ।[১৪]

১২. তারিখঃ– "৩০ আশ্বিন সন ১১৫০ সাল।"

১৩. "কালীভজ" মোহর যুক্ত উক্ত দলিলের অবিকল নকল এইঃ–"চিটি রূজু–শ্রীপরগণে কৈলাসহরের চৌধুরিআন ও মজুমদারান ও ইজারাদারানকে সমাজ্ঞেয়ং কার্জ্জঞ্চ পরং পরগণা মজুকরের মজুমদারি ও চৌধুরাই জয়নারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ণ শর্ম্মার নামে ছিল জয়নারায়ণ ও কৃষ্ণরাম মজকুর মৃত্তু হইয়াছে জয়নারায়ণ মজকুরের চৌধুরাই সনদ ওহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামনারায়ণকে দেওয়া গিয়াছে এ জৈন্যে কৃষ্ণনারায়ণ সর্ম্মার মজমদারির সনদ জয় নারায়ণ মজকুরের দাহিত্র (দৌহিত্র) ভবানী চরণ শর্ম্মাকে দেওয়া গেল চৌধুরাই নানকার দুই দ্রোন জমি শ্যামনারায়ণ মজকুরকে দিবা মজুমদারির নানকার ১৷০ দেড় দ্রোন জমি ভবানী চরণ মজুমদারের দিবা এ সেওয়াই জয়নারায়ণ মজকুর নায়ের তালুক ও ব্রহ্ম উত্তর জমি আছে তাহা শ্যামনারায়ণ ও ভবানী চরণ মজকুরানকে অর্দ্ধার্দ্ধ করিয়া দিয়া দুই বনামে সিরিস্তাতে প্রিথক দুই তালুক বসাইবা খাজানা লইবা দস্তুর সবক্তামি মহাফিক জাবিদ (?) পাইবেক ইতি সন ১২২০ সাল ত্রিপুরা তারিখ ৪ আষাঢ়।"

প্রাচীন দলিল পত্রে পূর্ব্বে প্রায়শঃ ঈদৃশ বর্ণাশুদ্ধি পরিলক্ষিত হইত, এমন কি সনন্দাদিতেও তাহা লক্ষিত হইত।

১৪. "স্বস্তি–শ্রীশ্রীযুত মহারাজ দুর্গামণিক্য বিসম-শমর-বিজয়ি মহামোহদয়ি রাজনামদেসোয়ং শ্রীকার কোন বর্গে বিরাজতেহন্যতপরং রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর মোতালেকে চাকলে রোসনাবাদ ত্রিপুরা পরগণে নিজ কৈলা শহরের জয় নারায়ণ মজমদারের মজুমদারি খেদমতে ভবানী চরণ শর্ম্মাকে বদস্তুর সাবেক মকরর করা গেল পরগণা মজকুরে মনে ও জুম ও সায়কে (?) দস্তর বসাইবার মৎস দধি খেদমত কবিবা জয়নারায়ণ মজুমদারের সাবেক নানকার জাহা আছে তুমি পাইবা এহা পরম সুখে ভোগ করিবা মজমদারি খেদমত করিতে রহ ইতি সন ১২১৯ ত্রিং তারিখ ২৬ অগ্রোহায়ণ।"

শ্যাম নারায়ণের পুত্র শিব নারায়ণ। ১২৪০ ত্রিং সনের একখানা "রামাজ্ঞা" মোহরাঙ্কিত বাজে সনন্দে তদীয় পূর্ব্বপুরুষের প্রাপ্ত বার্ষিক ১২ বার টাকা বৃত্তি তাঁহাকে সমজাইয়া দেওয়ার জন্য, ইজারাদারকে আদেশ দেওয়া হয় বলিয়া জানা যায়।[১৫]

১২৮৯ ত্রিং সনে গবর্ণমেন্টসহ "গোড়কাটি" মহাল লইয়া মহারাজের রাজ্য সংক্রান্ত এক তর্ক উপস্থিত হইলে, উক্ত শিবনারায়ণের প্রদত্ত প্রমাণ বলে তাহা নিষ্পত্তি হয়। উক্ত বিবাদীয় ভূমি এখন "খালাসি" জমি নামে রাজকির অধীন আছে,[১৬] ফলতঃ এই বংশীয়গণ ত্রিপুরেশ্বরের বিবিধ প্রকারে হিত করিয়াছেন।[১৭]

রামাজ্ঞা মোহরাঙ্কিত আর একখানা পরওয়ানাতে শিব নারায়ণকে সনন্দাদি সমস্ত কাগজাত সহ হাজির হইয়া তৎসমস্ত প্রদর্শনার্থ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; সনন্দ প্রাপকগণকে মধ্যে মধ্যে দলিলাদি দর্শাইয়া বৃত্তি ও জমি প্রভৃতির হিসাব ঠিক রাখিতে হইত।

শিব নারায়ণের পুত্র শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী জীবিত আছেন। বর্ত্তমান মহারাজের বিবাহ ও অভিষেকোৎসবে তিনি যোগ দেওয়ার জন্য যে নির্দেশ পত্র প্রাপ্ত হন, তাহাতে দেখা যায় যে, "রামাজ্ঞা"র পরিবর্ত্তে ইদানীং "শ্রীহরি আজ্ঞা" মোহর ব্যবহৃত হইতেছে। শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর জনৈক পুত্র হইতেই এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১৫ "শ্রীরামাজ্ঞ" মোহর। "লক্ষীদামোদর"।

"শ্রীচাকলে কৈলাশহরের মাহালে জোম ও বনকর মাহালের ইজারাদারকে সমাজ্ঞেয়ং কার্য্যঞ্চ পরং স্বর্গীয় দেবতার দেবোত্তর চাকলে তথায় জোম ও বনকরে দরমাহা ১ এক টাকা হিসেবে বৎসর ১২ টাকা হাপ্ত মিরার (?) পাইয়াছে অতয়ব লিখা যায় হাপ্ত মিরার দস্তুর মতে দেবোত্তরের সনদ দৃষ্টে ঐ বার টাকা চাকলে তথায় শ্রীসিব নারায়ণ সর্ম্মাকে বুঝাইয়া দিয়া ওজব থাকে হুজুর এতেলা করিবা ইতি ১২৪০ ত্রিং ২ মাঘ।

১৬. উক্ত জমির পট্টার নং ১০৯/১১০।

১৭. "শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ" নামক পুস্তিকায় ৫০ পৃষ্ঠায় ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

সাধারণ বিভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রাচীন দত্ত-বংশ বিবরণ

পরগণা–সাতগাও

চক্রদত্তের কথা

চক্রদত্ত প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের কথা কে না জানেন? চক্রপাণি ও তাঁহার পুত্র মহীপতি দত্তের কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।[১] মহীপতি-বংশ অতি বিস্তৃত, পরিশিষ্টে এ বংশের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা প্রদত্ত হইবে।[২]

চক্রপাণি দত্ত শ্রীহট্টের রাজা গৌড়- গোবিন্দে'র চিকিৎসার্থ যেরূপে এদেশে আগমন করেন, পাঠক পূর্ব্বাংশেই তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। রাজানুরোধে তিনি মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দকে এদেশে রাখিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র সহ চলিয়া যান।

মুকুন্দদত্তের কথা

রাজা মহীপতি ও মুকুন্দকে দুইখানি তাম্রপত্র প্রদান করেন, বর্ত্তমানে তাহা অপ্রাপ্য। শ্রীহট্টের পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বে গোয়ার নামে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছিল, উহার "একদিকে জৈন্তা হেড়ম্ব একদিকে" ছিল। উহার উৎপন্ন বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত ছিল। রাজা মুকুন্দকে ঐ একলাখি গোয়ার দেশ প্রদান করেন। বর্ত্তমানে গোয়ার নামে একটি ক্ষুদ্র পরগণা শ্রীহট্ট শহর হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত গোয়ারের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। গোয়ারে অবস্থিতি কালে মুকুন্দের তিনপুত্র জাত হয়। ইঁহারা খাসিয়াদের দৌরাত্ম্যে ব্যস্ত হইয়া গোয়ার পরিত্যাগে বাধ্য হন। তন্মধ্যে গঙ্গাহরি ও স্বরূপ দত্ত ইচ্ছামতী গিয়া বাস করেন; কনিষ্ঠ সুন্দর রাম পঞ্চখণ্ড বাসী হন।[৩]

সাতগাও স্থাপন

দক্ষিণশূর তৎকালে একটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। ইহার উত্তর সীমায় বরবক্র নদ প্রবাহিত, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বত ছিল, এবং দক্ষিণ সীমা ত্রিপুরার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। রাজা মহীপতিকে এই দক্ষিণশূর প্রদান করিলে, তিনি তদন্তর্গত "হাসিলের" (হাইল হাওরের) পশ্চিমে গমন করিয়া দীর্ঘিকাদি শোভিত সুন্দর এক বাটিকা নির্ম্মাণ করেন; এবং পূর্ব্ব বাসস্থানের নামানুসারে সেই নব বসতি স্থলের নাম সপ্তগ্রাম রক্ষা করেন। সপ্তগ্রামই সাতগাও নামে খ্যাত হইয়াছে।

মহীপতি দত্তের দুইজন পৌত্র ছিলেন, একজন চৌয়ালিশ পরগণায় গমন করেন, ইঁহার নাম জানা যায় নাই। অপরের নাম কল্যাণ দত্ত, ইঁহার আঠারটি পুত্র সন্তান জাত হয়, তন্মধ্যে তের জনেরই বংশে বর্ত্তমানে কেহ নাই।

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত–পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. পরবর্ত্তী চ পরিশিষ্টে বিস্তৃত দত্তবংশ তালিকার একদেশ দ্রষ্টব্য। বংশ তালিকা দৃষ্টে 'ববরণোল্লেখিত ব্যক্তিগণের নাম ও সম্বন্ধাদি নির্ণীত হইবে।

৩. পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা বাসী দত্তবংশীয়গণ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয়। চক্রদত্ত বংশীয় দত্তেরা গৌতম গোত্রীয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বোধ হয় পঞ্চখণ্ডের গৌতম গোত্রীয় দত্তেরা বিস্মৃতির অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

কল্যাণ ও তৎপুত্রের কথা

কল্যাণ দত্তের সময়ে ত্রিপুররাজ দক্ষিণশূর অধিকার করেন, তাহাতে গৌড়-গোবিন্দ প্রদত্ত অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, কল্যাণ দত্ত উপায়ান্তর বিহীন হইয়া ত্রিপুররাজের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক রাজস্ব প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া নিজ অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন।

কল্যাণ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দিবাকর, তিনি একদা ত্রিপুরায় গমন করেন, তিনি চক্রপূজা উপলক্ষে মদ্যপান করিয়াছিলেন বলিয়া পিতাকর্তৃক পিণ্ড দানাধিকারে বঞ্চিত হন। অন্য একদিন পক্ষিশিকার কালে দৈবাৎ খুল্লতাত পত্নীকে বাণাহত করায় পিতা কর্তৃক বর্জ্জিত হন। পিতৃ পরিবর্জ্জিত দিবাকর রোষ ও ক্ষোভে মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও হাসান খাঁ নামে খ্যাত হন। তিনি পিতৃগৃহ ছাড়িয়া হুগলী নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই বংশে পরবর্ত্তী কালে চান্দ খাঁ প্রভৃতি বহু ভাগ্যবান ব্যক্তির জন্ম হয়।

শ্রীবৎস দত্তের ব্যবহার

কল্যাণ দত্তের পুত্রগণের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা ছিলেন, অনেকেরই নামে দার্ঘিকাদি এযাবৎ বর্ত্তমান আছে; ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই খাঁ উপাধি ছিল। বংশ তালিকায় কল্যাণ দত্তের ২য় ও ৬ষ্ঠ পুত্রের খাঁ উপাধি লিখিত হইয়াছে। কল্যাণ দত্তের তৃতীয় পুত্র বঙ্গদত্তের বংশ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার ৪র্থ পুত্রের নাম ভরত দত্ত;[৪] আমাদিগকে জনৈক বিবরণ প্রদাতা জানাইয়াছেন যে ইঁহার দত্ত খাঁ উপাধি ছিল। কল্যাণ দত্তের পঞ্চম পুত্র শ্রীবৎস দত্ত, ইনি দত্তকুলের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং প্রধান বংশ-প্রবর্ত্তক। তাঁহার জীবদ্দশায় "গৌড়ের বাদশাহ" দক্ষিণশূর হইতে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। শ্রীবৎস তখন ত্রিপুরার করপ্রদ সামন্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই অভিযানে গৌড়ের বাদশাহকেই বিশেষ সহায় করেন ও পরে পুরস্কার স্বরূপ, ভানুগাছ, আমদপুর, ছয়চিরি, ইটা-পাঁচগাও এবং পুটিজুরী প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হন। বাদশাহ তাঁহাকে খাঁ উপাধি দান করেন; তদবধি তিনি দত্ত খাঁ নামে খ্যাত হন।[৫]

কয়েক বৎসর পরে ত্রিপুরাধিপতি এই দত্ত খাঁর সহিত সদ্ভাব রাখা সঙ্গত বোধে প্রধান উজিরকে দ্বিসহস্র হস্তীর সহিত প্রেরণ করেন। তিনি বিজয়পুরে[৬] আগমন করিয়া দত্তখাঁর নিকট আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। দত্ত খাঁ পূর্ব্বকথা স্মরণে উজির সহ সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কোচিত হইলেন। না গেলেও চলিবে না, বহু ভাবিয়া চিন্তায় তিনি ভ্রাতা বঙ্গদত্তের পুত্র হরিদত্তকে "সায়বানী দোলায়"[৭] চড়াইয়া উজির সকাশে প্রেরণ করিলেন।

৪ লাখাই দত্ত বংশীয়গণ ইঁহারই বংশসম্ভূত বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা "বড়দত্ত খানের" সন্তান বলিয়া ভবানী দত্তের লিপিতে লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্র দত্ত মহাশয় হইতে আমরা যে বংশ তালিকা পাইয়াছি, এই প্রাচীন তালিকাতে কল্যাণ দত্তের ১৮ পুত্রের মধ্যে ১২ জনের নাম লিখিত হইয়াছে, বাহুল্য বর্জ্জনের জন্য ৬ জনের নাম লিখিত হয় নাই; কিন্তু স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দত্ত খাঁ কি বড়দত্ত খাঁ বলিয়া কোন নাম পাওয়া যায় নাই; গন্ধর্ব্বখাঁ ও মহেন্দ্র খাঁ বলিয়া দুইটি নাম আছে মাত্র। জ্ঞাত হওয়া যায় যে উক্ত তালিকাতে লিখিত ভর দত্ত বা ভরত দত্তের উপাধি দত্ত খাঁ। দত্ত খাঁ অতি ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ট শ্রীবৎস দত্তও অতিশয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। এবং তাঁহার উপাধিও দত্ত খাঁ ছিল বলিয়া জানা যায়। এই দুই দত্ত খাঁ মধ্যে জ্যেষ্ঠই বড়দত্ত খাঁ নামে খ্যাত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সাতগার বংশ তালিকাতে তাহার উল্লেখ নাই। তাহাতে উল্লেখ না থাকাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে লাখাই, আতুয়াজান প্রভৃতি স্থানের দত্ত বংশীয়গণ মুকুন্দের সন্তান এবং ইছামতী হইতে আগত। কিন্তু লাখাইর দত্ত বংশীয়গণ কল্যাণ দত্তেরই সন্তান বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা মুকুন্দের সন্তান নহেন। লাখাইর দত্তবংশের সংক্ষিপ্ত কথা ৩য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডে উক্ত হইবে।

৫. শ্রীবৎসের পরবর্ত্তী কালে বংশের প্রধান ব্যক্তি এই উপাধি স্বয়ং গ্রহণ করিতেন।

৬. বালিশিরার সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র পল্লী।

উজির হরিদত্তকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহাকে ত্রিপুর রাজের সামন্ত নিযুক্ত করিয়া "নারায়ণ" উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং উদনার দক্ষিণ; হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত অষ্টক্রোশ পরিমিত স্থানের অধিকার প্রদান করিলেন। এই স্থানটি বালুকা-বহুল ছিল, কিন্তু সে বালুকাতে বহু শস্য জন্মিত, তাই উজির সে স্থানকে "বালি হীরা" নামে খ্যাত করেন।[৮]

হরিদত্ত হরিনারায়ণ নামে খ্যাত হইয়া ইহার উপস্বত্ব-ভোগী হন। পরবর্ত্তী কালে হরিনারায়ণের অতি বৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রনারায়ণের সময় এই ভূমি শ্রীহট্টের নবাবের অধিকারে আসে, চন্দ্রনারায়ণ তত্রত্য চৌধুরাই প্রাপ্ত হন।

দত্ত খাঁ ব্রাহ্মণগণকে গান্ধিজুরি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, ঐ গ্রাম তদবধি ব্রাহ্মণ-শাসন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বাহাদুরপুরের বিস্তীর্ণ খেওয়ার জন্য লোকেরা সতর শত কৌড়ি দিয়া দত্ত খানের নিকট উহা ক্রয় করিয়াছিল। এই সতর শত কৌড়ির সংসৃষ্ট বলিয়া পরগণার নাম সতর শতী হয়।

দত্ত খানের কঠোরতা

দত্ত খানের দুই ভগিনী ছিলেন, রাঢ়দেশ হইতে দুইজন বৈদ্য-সন্তান আনাইয়া ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ দেন। ভগিনীদ্বয়ের গর্ভোৎপন্ন পুত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে বিনোদ ও হরিশ্চন্দ্র। বিনোদ কালক্রমে মাতুলের দপ্তরের অধিকার পাইয়া ছিলেন। কিন্তু একটি সামান্য কারণে শেষে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হন।

কোন এক গুপ্তস্থানে খড়িদ্বারা বিনোদ কি অঙ্কপাত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে দত্ত খানের মনে সন্দেহ জাত হয়; তিনি ভাবিলেন যে, একান্ত অন্তরালে এই অঙ্কপাতের কারণান্তর নাই; ইহা তাঁহারই অর্থহরণের হিসাব মাত্র। এইরূপ মনে হওয়াতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধোদয় হয়, এবং তাহাতে সানুজ নিজ ভাগিনেয়কে অনায়াসে হাইল-হাওরে ডুবাইয়া মারিতে অনুমতি দিলেন।

বিনাদোষে দুইজনের জীবন নষ্ট করা আজ্ঞাবাহকের প্রাণে সহিল না, সেই হাইল-হাওরে এক নৌকায় উভয় ভ্রাতাকে তুলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল। নৌকা বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইতে লাগিল।

শ্রীবৎসর জ্যেষ্ঠ ভর দত্ত হাইল হাওরের পার্শ্বে আটঘর মৌজায় নিজ খামার জমি দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি বায়ুবেগে বিঘূর্ণিত এক নৌকা দেখিয়া উহা কাছে আনাইলেন ও তাহাতে ভাগিনেয়দ্বয়কে দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিলেন। ইঁহার অনুরোধে শ্রীবৎস ভাগিনেয়দ্বয়কে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু একত্রে রাখা অনুচিত বোধে "চৌয়ালিশ পত্তনে" পাঠাইয়া দিলেন।

কাহারও দিন সমান যায় না; মাতুল কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইলেও ইঁহাদের দিন ফিরিল; কিছুদিন পরে গৌড়-বাদসাহের উজির চৌয়ালিশ আগমন করেন। তিনি দুই ভ্রাতার সহিত আপন

---

৭. বড়লোকের উপযোগী দোলা। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বারের বিবাহ কালে সায়বানী দোলায় তাঁহাকে আরোহিত করিয়া, সাড়ম্বরে বরযাত্রীর দল কন্যাগৃহে গিয়াছিলেন।

৮. "এই দেশে বারি বহু দেখি কি কারণ।
তাতে উঠি একজন কহিলা তখন।
বালি নহে হীরা এই শুন মহাশয়।
বালির কারণে দেশে শস্য বহু হয়॥
তখনে উজির আসি সভাতে কহিল।
হীরা যদি হয় বালিহীরা নাম থৈল॥"-দত্ত বংশাবলী (অমুদ্রিত)।
এই বালিহীরাই পরে বালিশিরা পরগণা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

তনয়া দ্বয়ের বিবাহ দেন ও চৌয়ালিশ দত্তখাঁর অধিকারচ্যুত করিয়া ইঁহাদিগকেই অর্পণ করেন।

দত্তখাঁ "ললাট পূরিয়া উর্দ্ধ তিলক" দিতেন। একদা একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণবোধে নমস্কার করেন, তদবধি (তাঁহার নির্দ্দেশে) দত্তবংশে তিলক ধারণ রহিত হইয়াছে।

দত্তখাঁ তিন বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, তাহাতে তাঁহার ছয় পুত্রের উদ্ভব হয়। তিনি নিজেই স্বীয় পুত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বিবাদের মূলচ্ছেদ করিয়া যান।

দত্তখাঁর পরিবর্ত্তিগণ

দত্তখাঁ শাসন গ্রামে একবাড়ী প্রস্তুত করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র সতানন্দকে তথায় স্থাপিত করেন, তাঁহার বংশধরেরা শাসনবাসী। তিনি দ্বিতীয় পুত্রকে ভুনবীর গ্রামে এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীমন্তকে ভীমশী গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে দিয়াছিলেন। সুয়াই দত্ত প্রমুখ ইঁহাদের অপর ভ্রাতৃদ্বয় নিঃসন্তান ছিলেন এবং পিতার জীবিতাবস্থাতেই সম্ভবতঃ মৃত্যু মুখে পতিত হন।[৯]

সুয়াই দত্তের জাতি ও বৃত্তিত্যাগ

ইঁহাদের সময় পর্য্যন্ত জাতিবৃত্তি চিকিৎসা পরিত্যাগ করা হয় নাই। সুয়াই দত্তের পর হইতে এবংশে বৈদ্যক বিদ্যার আলোচনা রহিত হয়। কথিত আছে, চৌয়ালিশের জনৈকা ব্রাহ্মণী প্রসবের প্রাক্কালে কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে ছিলেন, সুয়াইদত্ত ইহার চিকিৎসায় বৃত হইয়া বিশেষ বুদ্ধি কৌশলে প্রসূতি ও সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার মনে এই ভয় হইয়াছিল যে একটুক ব্যত্যন্ত হইলে তাঁহাকে নারীবধের (ব্রাহ্মণী হত্যার) পাতকী হইতে হইত। তিনি এ বৃত্তি ত্যাগ করিলেন ও স্ববংশীয়গণকেও এই বৃত্তি গ্রহণে নিষেধ করিয়া গেলেন; যথাঃ–

"----আজিহনে ত্যাগ করিল ইহারে।
আমার গোত্রে যেন কেহ বৈদ্যক না করে॥
অস্ত্র সব যতছিল জলেতে ফালাইলা।
সেই হনে এই গোত্রে বৈদ্যক ছাড়িলা॥"–দত্ত বংশাবলী (অমুদ্রিত)

চিকিৎসা ব্যপদেশে সুয়াই সর্ব্বত্র যাইতেন। কামার গ্রামে জনৈক শূদ্রের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। সুয়াই তজ্জন্য পিতা কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইলেন।[১০]

---

৯. শ্রীবৎসের অপর ভ্রাতা লক্ষণ দত্তের পৌত্র মাণিক্যদত্ত দিনারপুরের জমিদারের চাকুরী স্বীকার করিয়া সেই স্থানে গমন করেন; এবং অন্য ভ্রাতা প্রাণ দত্ত পৈলে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র হরিনাথ, হরিনাথের পুত্র রামেশ্বর দত্ত একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

১০. "সুখাইয়ে দেখিলে কন্যা বড়ই সুন্দর।
মুখ চন্দ্রিকার খাটে বসিলা উঠিয়া॥
রূপবতী দেখি হেন করিলেন বিয়া।
তখনে ঠাকুরে এই কথন শুনিয়া॥
করিলেন তানে ত্যাগ কুপুত্র জানিয়া॥
কামার গ্রামেতে বিয়া কৈল কিলা গিয়া।
জেই নাহি জানে বলে কুখ্যাতি করিয়া॥
এই হেতু সুয়াই গোত্রের বার হৈল।
সংসারেতে কেহ তান বংশ না রহিল॥"– দত্ত বংশাবলী (অমুদ্রিত)

আত্মকলহে ফল

শতানন্দের ছয় পুত্র; হরিদাসের এক পুত্র এবং সীমন্তের পাঁচপুত্র হয়। সতানন্দ ত্রিপুরেশ্বরের "ঠাকুর" ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাধবদত্ত "ঠাকুর" বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু তখন হরিদাস জীবিত ছিলেন, ভ্রাতৃষ্পুত্রকে "ঠাকুর" বলিলে তাঁহার সম্মানের হানি হইবে বলিয়া তিনি রাজদরবারে আবেদন করেন; তাঁহার ফলে মাধবের পরিবর্তে তিনি ঠাকুর গণ্য হন। মাধব ইঁহার প্রতিবাদ করেন। দেশের কৈবর্ত্তগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা অর্থদানে তদীয় সহায়তা করিতে লাগিল। মাধব ইহাদিগকে বশে রাখিবার জন্য তাহাদের প্রধান রঙ্গকৈবর্ত্তের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হইলেন। ঠাকুর পদবি প্রাপ্তিও আর ঘটিল না। এই মাধবের পুত্রের নাম গোবিন্দ দাস, তৎপুত্র কন্দর্প খাঁ তদ্বংশে বিশেষ খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন।

মিশারীয় দত্ত

মাধব এত চেষ্টা করিয়াও ঠাকুর রহিতে পারিলেন না দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতা যাদব দত্তগ্রাম হইতে বালিহীরা চলিয়া আসিলেন। যাদবের পৌত্র পার্ব্বতী দাস তথা হইতে তরফে গমন করেন, মিরাশী গ্রামের দত্তেরা এই পার্ব্বতী দাসের সন্তুতি। ইঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ শ্রীযুত প্রমোদ চন্দ্র দত্ত মহাশয় "দত্ত বংশ বিবরণ" প্রেরণে আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তদবলম্বনেই এই বৃত্তান্ত লিখিত।

নায়ক দত্ত

যাদব দেশত্যাগী হইলে তাঁহার অপর ভ্রাতা নায়ককে লইয়া তদীয় জননী বাণিয়াচুঙ্গের জমিদারের শরণাপন্ন হন। বৃদ্ধ হরিহাস দেখিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে যশস্কর নহে, সেই জন্য বিশেষ আড়ম্বর সহকারে বাণিয়াচঙ্গ হইতে ভ্রাতৃবধু সহ ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনাইয়া তিনি "ঠাকুর" পদবি গ্রহণ জন্য তাঁহাকে বলিলেন। কিন্তু নায়ক দুই খুল্লতাত বিদ্যমানে "ঠাকুর" পদবি গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

হরিদাস নিজ জামাতাকে শাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারই হস্তে নায়কের শিক্ষাভার প্রদত্ত হয়। এই জামাতা পরে শ্রীহট্টের উজিরের অপবাদ করিয়া গৌড়াধিপতির কাছে এক পত্র লিখেন। তখন নায়কের সাক্ষ্যে উজির অপবাদ মুক্ত হন। বলা বাহুল্য যে, তখন জামাতা দাস মহাশয়ের শাস্তির আদেশ হয়, পাইক গণ তাঁহাকে–

"অশেষ বীভৎস করি মারয়ে অনেক।"

গ্রন্থকর্ত্তা গোপীনাথ

কাজেই তখন নায়ক সহস্র মুদ্রা প্রদানে ইঁহাকে শাস্তি হইতে মুক্ত করেন। নায়কের পুত্রের নাম শুভরত্ন খাঁ, তৎপুত্র হৃদয়ানন্দ, ইনি পুরন্দর খাঁ পদবিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নায়কের দ্বিতীয় পুত্রের নাম রামানন্দ, ইঁহার মধ্যম পুত্রের নাম রামনাথ, রামনাথের পুত্র ধনরাম, তাঁহার তৃতীয় পুত্রের নাম গোপীনাথ।

এই গোপীনাথ দত্তই "দত্ত বংশাবলী" রচয়িতা। কেবল তাহাই নহে, গোপীনাথ মহাভারতের "দ্রোণপর্ব্ব" "নারীপর্ব্ব" প্রভৃতি পয়ারে রচনা করেন। এতদ্দেশীয় মণিপুরীগণ উত্থান একাদশীর মাসে, গোপীনাথের নারীপর্ব্ব পাঠ করিয়া থাকে। গোপীনাথ দত্তের চারিপুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্টের নাম সোণারাম দত্ত, ইঁহার স্বহস্ত লিখিত প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথির অনুসরণে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সোণারামের অগ্রজ রাম জীবন বৈষ্ণব হন।

তাঁহার অগ্রজ রামনারায়ণ, তদগ্রজ (অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই) রাধা বল্লভ দত্ত।

হরিদাসের কথা বলা হয়েছে, হরিদাসই ভুনবীর দত্ত বংশের আদি। হরিদাসের কনিষ্ট পৌত্র বসন্তদত্তের পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে শ্রীনাথ তলাপাত্র সহ বিবাহ দেন।[১১] বসন্তদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধিমন্তের প্রথম পুত্রের নাম মহেশ দত্ত। ইঁহার এক পৌত্র "স্ত্রী হেতু" লংলায় গমন করেন। বুদ্ধিমন্তের ২য় পুত্রের নাম শ্রীরাম; রতন রাম নামে ইঁহার এক পৌত্র দৌলতপুর গমন করেন। এবং অপর পৌত্র দয়রাম আগনাতে চলিয়া যান। বুদ্ধিমন্তের অপর পুত্রের নাম শ্রীনাথ। ইহার দুই পৌত্র রতন ও রঘুদত্তের শাখা (পরিশিষ্টে) বংশ-তালিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে; ইঁহার অপর পৌত্র ধনরাম "চৌধুরাই লাগি উজাড়িল দেশ" বলিয়া বর্ণিত আছে।

ভীমশীর দত্ত

ভীমশীর দত্ত পরিবারের আদি শ্রীমন্ত রায়ের প্রপৌত্র তিলক রাম যে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা গোপীনাথ দত্তের লিখিত–

"তা সবের তিলকরাম হইলা সর্ব্ব জৈষ্ঠ।
বাঙ্গলার মধ্যে যার নাম হইল শ্রেষ্ঠ॥"

শ্রীমন্তরায়ের পুত্র চন্দ্র রায়ের বংশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়; এই বংশে প্রায় ছয়জন গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হন, তন্মধ্যে বড় মোহন্ত পর্ব্বত প্রধান ব্যক্তি। এই বংশে হরিশ্চন্দ্র রায়ের পুত্র রমানাথ "দীঘল ঠাকুর" বলিয়া আখ্যাত হইতেন।

চন্দ্ররায়ের অপর পুত্র কালীদত্ত বালিহীরা খারিজা হওয়ার কালে বিজয়পুরের শিকদার নিযুক্ত হন। বিজয়পুরের উল্লেখ পূর্ব্বে একবার করা গিয়াছে।[১২] কালীদত্তের শেষ বংশধর গোবিন্দ গৃহত্যাগী হওয়ায় পাহাড় সন্নিকটবর্ত্তী বিজয়পুর উজাড় হইয়া যায়।

পরগণা-ইটা

কানুনগো বংশ-কথা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে একটি কানুনগো বংশের কীর্ত্তিকথা বর্ণিত হইয়াছে।[১৩] সেই কানুনগো বংশ হইতে ইহা ভিন্ন। এই বংশীয় দত্তগণ রাঢ়দেশের পশ্চিম-বট গ্রাম হইতে ইটায়

১১. পৈলে বর্ত্তমানে তলাপাত্র-বংশ বলিয়া কোন বংশ নাই। ঢ পরিশিষ্টেব লিখিত বংশ তালিকায় নামাবলী ও একে অন্যের সম্বন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২. "দত্ত বংশাবলীতে ইহার সীমা এইরূপ লিখিত আছে, যথা–
উত্তরে লালপুর, পূর্ব্বে উদয়পুরের পাহাড়, দক্ষিণে ডালাউড়া ও শঙ্কর সেনা। পশ্চিম সীমা লিখিত হয় নাই।"

১৩. বিভিন্ন কানুনগো বংশ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৯ম অধ্যায় ইটার নন্দী উড়াস্থ অর্জ্জুন বংশের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। নন্দীরাম অর্জ্জুন সেই বংশের আদিপুরুষ; ইঁহার নামেই নন্দীউড়া গ্রামের নাম হয়। সেই বংশ হইতে এই বংশ ভিন্ন। উক্ত অর্জ্জুন বংশের কথা এই অধ্যায়ে কথিত হইতেছে।
তদ্ভিন্ন হরবল্লভ দত্ত কানুনগোইর বংশ বিবরণও পূর্ব্বোক্ত ৯ম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। হববল্লভের পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ শ্যামরায় দেওয়ান। ইঁহার বংশ কাহিনী পাঠক পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন। হরবল্লভ দত্ত কানুনগোও মেদিনীধরের বংশ সম্ভূত, সুতরাং আমরা যে বংশ সম্বন্ধে এস্থলে ২।৪টি কথা বলিতে উদ্যত হইতেছি, সে বংশ ও হরবল্লভের বংশ একই মূলোৎপন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। এস্থলে হরবল্লভের বংশের একটি ধারা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা– হরবল্লভ, তৎপুত্র শ্যামরায় দেওয়ান (ইঁহার কথা ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৯ম অধ্যায়ে দেখ), তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র দেবীপ্রসাদ, তৎপুত্র গুরুপ্রসাদ, তৎপুত্র গোলক চন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত জীবিত আছেন।

আগমন করেন বলিয়া কথিত আছে। যখন বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা প্রচারিত হয়, তখন যাঁহারা তদীয় প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এই বংশের আদিপুরুষ তাহার একতম; ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মৌলিক কুলীন সন্তান। মেদিনীধর নামে এক ব্যক্তি সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

মেদিনীধর হইতে এ বংশের কথা জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনি বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন; ইটা-ভূমি-পতি নিধিপতির জনৈক সন্ততি হইতে তিনি গয়ঘড় মৌজায় কতকভূমি প্রাপ্ত হন ও তথায় গিয়া বাস করেন। ইঁহারা পূর্ব্বে উপবীত-ধারী ছিলেন, পরে কায়স্থ সমাজের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে সম্মিলিত ও উপবীত ত্যাগী হন বলিয়া কথিত হয়। মেদিনীধরের পুত্রের নাম পদ্মনাথ, ইঁহার পুত্র বংশীদাস, তৎপুত্র বিজয়রাম, বিজয়রামের পুত্র শ্রীনাথদত্ত, শ্রীনাথের পুত্র পুরুষোত্তম। ইঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্গাভর হংসখলা গ্রামে একদীঘী খনন করেন, উহা দুর্গাভরের দীঘী বলিয়া খ্যাত আছে। মধ্যম পুত্রের নাম হরিনাথ দত্ত, হরিনাথের পুত্র ভুবনানন্দ, ইঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ হৃদয়ানন্দ দত্ত কানুনগো একদা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করেন। কথিত আছে, তদনুসারে পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ ও বহুব্যক্তি সহ স্বীয় পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া ব্রাহ্মণকে জলে নামাইলেন। ব্রাহ্মণ জলে অন্বেষণ করিতে করিতে গৌরীপাট সহ উমামহেশ্বর শিবের এক পাষাণ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎসহ গায়কের ব্যবহারোপযোগী "তালচর" প্রভৃতি আরও কয়েকটি দ্রব্য ও তাম্রপত্রে লিখিত উমামহেশ্বরের ধ্যানাদি প্রাপ্ত হন।

হৃদয়ানন্দ নিজ ভ্রাতা ষষ্ঠীবর দত্ত সহ পরামর্শ ক্রমে বহির্ব্বাটিকায় এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাকে সংস্থাপিত করেন। চৈত্র-সংক্রান্তি যোগে এই দেবতার সম্মুখে চরক পূজা হইত।

হৃদয়ানন্দ অতি সুগায়ক ছিলেন, কথিত আছে যে তিনি যখন মেঘমল্লার রাগিনীতে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, তখন মেঘাড়ম্বর হইত। এই হৃদয়ানন্দের ভনিতিযুক্ত পদ্মা-পুরাণের অনেকটি লাচাড়ী ও কবিতা পাওয়া যায়।

কবিষষ্ঠীবর সংবাদ

ষষ্ঠীবর একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন; তৎকর্ত্তৃক এতদঞ্চলে "ডরাই" পূজার গানের নিয়ম প্রচলিত হয়। তিনি বিস্তারিত রূপে "পদ্মাপুরাণ" রচনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার রচিত "পদ্মাপুরাণ" কেবল শ্রীহট্টের ঘরে ঘরেই প্রচলিত নহে, পূর্ব্ব বঙ্গের বহুস্থানে ষষ্ঠীবরে এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণের অনেক রচয়িতা আছেন, শ্রীহট্ট জেলাতেই দ্বাবিংশতাধিক পদ্মাপুরাণ রচয়িতার সংবাদ প্রাপ্ত হই, ইঁহাদের মধ্যে ষষ্ঠীবর ও নারায়ণ দেবই অধিক ভাগ্যবান; রচনা, ভাব ও লালিত্যে ইঁহাদের পদ্মাপুরাণই সর্ব্বাদৃত। ষষ্ঠীবর নিজ কৃতিত্ব জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে এই ভনিতি পাওয়া যায়ঃ–

"কহে ষষ্ঠীবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
জয়দেবী মনসার চরণ।"

কথিত আছে স্বর্গীয় বিষহরির বরে ষষ্ঠীবরের বংশীয় কাহাকেই সর্প দংশন করেনা; এই বংশীয় কোন ব্যক্তিও সর্প বধ করেন না। ডরাই গানের স্রষ্টা কবি ষষ্ঠীবর তালচর হাতে লইয়া পদ্মাপুরাণ গান করিতেন। ভক্তকবির মুখে সে গান বড়ই সুন্দর শুনাইত। প্রতিবেশী জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা হৃদয়ানন্দ ও ষষ্ঠীবর পূজা করাইতেন; এই ব্রাহ্মণ সেই তালচর ও ধ্যান প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে পদ্মাপুরাণ গান শিক্ষা করেন।

এই ব্রাহ্মণের বংশর লংলা পরগণায় রায়ের গাও গমন করিয়া স্বগীয় বিষহরি স্থাপন করেন। তদ্বংশীয়গণ অদ্যাপি তথায় আছেন এবং বিষহরির গান করিয়া থাকেন। সেই প্রাচীন তালচর অদ্যাপি তাঁহাদে গৃহে আছে বলিয়া শুনা যায়।

হৃদয়ানন্দ দত্ত কানুনগোহের পুত্র চতুষ্ঠয়ের মধ্যে প্রথম পুত্র শতানন্দ কানুনগো পিতৃ প্রতিষ্ঠিত উমামহেশ্বরের একত্রে বাস করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, অপরাপর ভ্রাতৃগণকে গয়ঘড়ে পৃথক বাড়ী করিয়া দেন। তিনি সেই বাড়ী ও তৎচতুষ্পার্শ্বের ভূমি উমা মহেশ্বরের পূজক রাম জীবন ঠাকুরকে অর্পণ পূর্ব্বক মহাসহস্র গ্রামে গিয়া বাস করেন।

তাঁহার পৌত্র সোণারাম দত্ত বাটীর সম্মুখে এক দীঘী খোদাইয়া ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করেন। সোণারামের বংশধর সম্পদ´রাম দত্ত, শিবরাম দত্ত ও জীবন রাম দত্তের সময় পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায়, শিবরাম দাস পাড়া গ্রামে গিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এই দাসপাড়াস্থ তদ্বংশীয় শ্রীযুত সূর্য্য কুমার দত্ত কানুনগো হইতে আমরা এতদ্বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।[১৪]

অর্জ্জুন বংশের সংক্ষিপ্ত কথা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৯ম অধ্যায়ে ইটার "দেওয়ান ও কানুনগো" গণের বিবরণ প্রসঙ্গে অর্জ্জুন বংশের কথা সামান্য ভাবে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইটার অর্জ্জুন বংশ একটি প্রাচীন বংশ। কথিত আছে যে কান্যকুব্জ হইতে জটাধর অর্জ্জুন নামে জনৈক কায়স্থ এতদ্দেশে প্রথমে আগমন করেন; তাঁহার ৫ পুরুষে নন্দীশ্বর অর্জ্জুন নামে[১৫] এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়। নন্দীশ্বর ইটার রাজা নিধিপতির কর্ম্মচারী ছিলেন এবং নিধিপতি হইতে উত্তরে বেড়াহুঞ্জার হাওর; পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে আখালিয়া নদী, এই চতুঃসীমান্তর্গত কতক ভূমি প্রাপ্ত হন। তথায় তিনি একটি গ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক নিজ নামে তাহা নন্দাউঢ়া বলিয়া খ্যাপিত করেন।

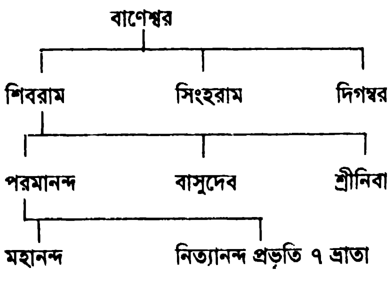
---

১৪. হৃদয়ানন্দের বংশের অপর শাখায় ক্রমানুযায়ী নামাবলী দেওয়া গেল, যথাঃ–হৃদয়ানন্দ, ইঁহার চতুর্থ পুত্রের নাম বিশ্বেশ্বর, ইঁহার ৫ পুত্র, দ্বিতীয়ের নাম রঘুপতি. ইঁহার পুত্র গোবিন্দ রাম. তৎপুত্র যোড়ারাম. তৎপুত্র বল্লভ, তৎপুত্র সাহেব রাম, ইঁহার পুত্র শিব প্রসাদের পুত্র শ্রীযুত তারিণী চরণ দত্ত মহাশয়ও আমাদিগকে এক বিবরণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৫. শ্রীহট্টের ইতবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৯ম অধ্যায় দেখ।

এই প্রাচীন বংশের সুবিস্তৃত বংশ তালিকার একাংশ মাত্র এইঃ–

জটাধর অর্জ্জুন, তৎপুত্র জানকীবল্লভ. তৎপুত্র জীবন রাম, তৎপুত্র রামদাস, তৎপুত্র নন্দীশ্বর. তৎপুত্র কাশীশ্বর, তৎপুত্র মহেশ্বর, তৎপুত্র গঙ্গাধর, ইঁহার পুত্র গণপতি, শ্রীপতি ও রমাপতি। রমাপতির পুত্র রঘুপতি, ইঁহার পুত্র হরিবল্লভ, রামবল্লভ ও গৌরীবল্লভ। রামবল্লভের পুত্র হরবল্লভ, তৎপুত্র মহীধব; মহীধরের পুত্র বংশীধর ও মুরলীধর, মুরলীধরের পুত্র গদাধর, তৎপুত রাঘবরাম, তৎপুত্র–



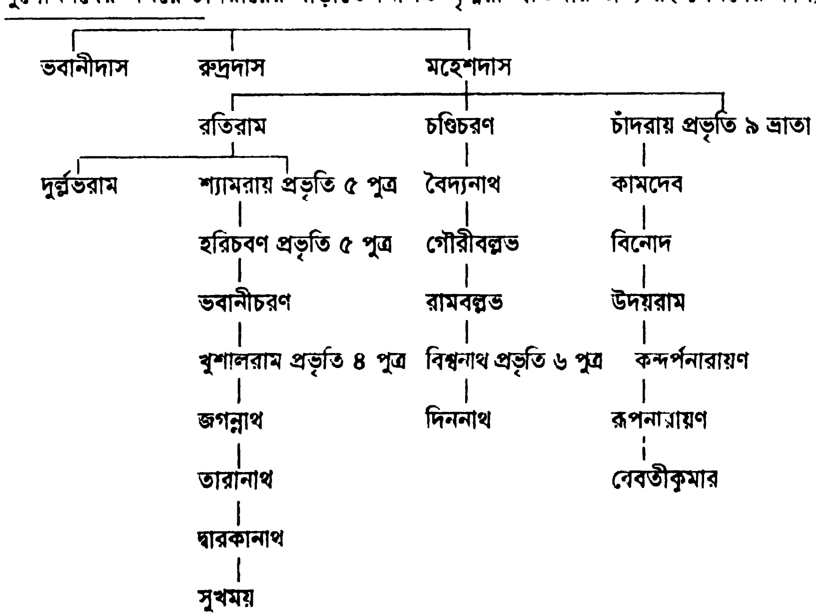
নন্দীশ্বরের পরবর্ত্তী বংশে ইটায় সর্ব্ব প্রথম যিনি কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার নাম বাণেশ্বর। বাণেশ্বরের নাম সহ তদীয় অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রতিরামের নাম ও কীর্ত্তিকথা পূর্ব্বাংশে কথিত হইয়াছে।

রতিরাম অতি খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অতি বৃহৎ একটি দীঘী খননের জন্য ভ্রাতৃবর্গের নিকট কতক অর্থ প্রদান করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে প্রদত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হয় নাই এবং দীঘীটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর আকার বিশিষ্ট হইয়া পড়ায় ভ্রাতৃবর্গের উপর তিনি বিতুষ্ট হন; এই কারণেই তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে পরে পৃথক বাটিকা করিতে হইয়াছিল। রতিরামের নামে তাঁহার বাসগ্রাম "রতিপুর" বলিয়া খ্যাত হয়। রতিরামের ভ্রাতা চণ্ডীচরণ "চণ্ডীপুর" গ্রাম স্থাপন করেন, তৎপুত্র শ্যামরায় "শ্যামপুর" নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা।

রতিরাম সংকর্ষণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ রামদাসকে নিজ পৌরোহিত্যে বৃত করেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। রামদাসের পুষ্করিণীতে একদা একটি বালকের মৃত্যু হওয়ায় উহার জল অব্যবহার্য্য হইয়া যায়; রতিরাম তখন হাজার মজুর নিযুক্ত করিয়া তিনদিনে পুরোহিতের ব্যবহারের জন্য একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেন; উক্ত দীঘী "হাজার দীঘী" নামে খ্যাত হইয়াছে। রতিরাম নিজ বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী জঙ্গলস্থিত কালীবাড়ীতে মধ্যে মধ্যে কালী দর্শনে যাইতেন, যাতায়াতের জন্য তিনি যে শড়ক প্রস্তুত করেন, তাহা "রতিরামের জাঙ্গাল" নামে অদ্যাপি খ্যাত আছে।

রতিরামের ভ্রাতা চণ্ডীচরণ "মজিদ" নামক জনৈক মোসলমান ফকিরকে কতক ভূমি দান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে উহাতে একটি গ্রাম স্থাপিত হয়, উক্ত গ্রাম "মজিদপুর" নামে খ্যাত হইয়াছে। মজিদপুরকে কেহ কেহ মহৎপুরও বলিয়া থাকে .

রতিরামের অন্যতর ভ্রাতা চাঁদরায় মনোহর নট নামক এক ব্যক্তিকে বাসের জন্য কতক জঙ্গল আবাদ করিতে দিয়াছিলেন, উহা "মনোহরাবাদ" নামে খ্যাত হয়। নট বংশীয়গণ দুর্গোৎসবের সময়ে চাঁদরায়ের বাড়ীতে নির্ম্মিত মৃন্ময়ী প্রতিমার জন্য রং পেষণের কার্য্য করিত।



চাঁদরায় অতি বলবান ব্যক্তি ছিলেন, রুদ্রপাল জাতীয় কয়েকটি বলশালী ব্যক্তিকে তিনি একাকী ভুজবলে পরাভূত হয়, ঐ স্থান "ভুজবল" বলিয়া খ্যাত হয়।

অর্জ্জুন বংশ-সম্ভূত গৌরীবল্লভ, ইটার দেওয়ান শ্যামরায়ের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; দেওয়ান দীঘীর মজুরদের রসিদ সমূহে ইঁহারই নাম "গৌরীবল্লভ পোদ্দার" বলিয়া লিখিত আছে। গৌরীবল্লভ লংলা হইতে জনৈক চন্দ্রবৈদ্যকে আনয়ন করিয়াছিলেন, উক্ত চন্দ্রবৈদ্যের বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বদা মশারির ভিতর থাকিত, কদাপি বাহির হইত না, এই জন্য তাহার বাসস্থানের নাম "মশারিয়া" হইয়াছে।

অন্তেহরির তরফদার-কথা

নাম

ত্রিপুরা বাসী অনন্তদাস ও হরিদাস নামে দুই ভ্রাতা কোন অপরাধ করায় রাজদণ্ডের ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেন। ইঁহারা স্বীয় পুরোহিত ও নাপিতাদি সহ কাউয়াদীঘী নামক হাওরের পশ্চিম ভাগে নির্জ্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের কতকাংশ পরিষ্কার ক্রমে বাড়ী প্রস্তুত করেন। এই দুই ব্যক্তির নামে ঐ স্থান অনন্ত হরি বা অন্তেহরি বলিয়া খ্যাত হয়।

অনন্ত ও হরিদাসের সময়ে (কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী) আখাইল কুরা রাজারটি ব্যতীত নিকটে অন্য কোন লোক সমাগম স্থল বা লোকালয় ছিল না। ইঁহাদের একজনের ৫ম পুরুষ অন্তে তদ্বংশে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হয় ও তিনি অনেক বিত্ত অর্জ্জন করেন, ইঁহার বংশ এখনও তথায় আছেন।[১৬]

এই বংশীয়গণ ব্যতীত তথায় তরফদার খ্যাতি বিশিষ্ট অন্য একবংশ বিদ্যামান। পূর্ব্বে এই গ্রামে সাতগাও হইতে শিবচন্দ্র দত্ত নামক একব্যক্তি মোসলমান রাজত্বের শেষকালে আগমন করেন বলিয়া কথিত আছে। অন্তেহরির তরফদারগণ বলেন যে, তিনি কিছুদিন এস্থানে অবস্থিতির পর তথাকার দাস জাতীয় একব্যক্তির এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে শিবরামের মণিরাম ও শোভারাম নামে দুই পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে মণিরাম পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন ও তিনি রাজকীয় কোন কর্ম্মে দক্ষতা প্রকাশ করেন। তিনি সেই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অন্তেহরির পশ্চিম তরফ (অংশ) প্রাপ্ত হন ও তরফদার উপাধিতে খ্যাত হন। মণিরামের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভবানী প্রসাদ। অরঙ্গপুরের জনৈক জমিদার সদলবলে একদা অন্তেহরি লুণ্ঠন করিতে গিয়া এই ভবানী প্রসাদের পরাক্রমে পরাভূত ও বন্দী হন ও অর্থপ্রদানে নিষ্কৃতি লাভ করেন বলিয়া কথিত আছে। ভবানী প্রসাদের পৌত্রের নাম অভয়া চরণ। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র তরফদার বর্ত্তমান আছেন।

অন্তেহরি গ্রামে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ কুলে অজ্ঞান ঠাকুর নামক জনৈক মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছিল; ইঁহার কথা ৪র্থ ভাগে উক্ত হইবে।

১৬. মৌলভীবাজারের মোক্তার শ্রীযুত কুলচন্দ্র দাস হইতে প্রাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়
চৌয়ালিশ ও ইটার সিদ্ধ বংশ

দত্তবংশ

চৌয়ালিশের দত্ত বংশীয়গণ সাতগায়ের বৈদ্য জাতীয় দত্তের এক শাখা। ইঁহাদের চৌধুরী পদবী। এই বংশীয়গণ ঘড়ুয়া, চাড়িয়া, নলদড়িয়া ও খিদুর গ্রামবাসী। এই বংশীয় মহেশ্বর দত্ত বাণিয়াচঙ্গের জমিদারের অধীনে "কুরশা" পরগণার দফ্‌তরের অধিকারী হইয়া, সেইদেশে গমন করিয়াছিলেন। ইহাদের বংশকথা ও তত্রত্য গুপ্তদের কথা বিশেষ ভাবে সংগৃহীত হইতে পারে নাই বলিয়া অতি সংক্ষেপে ২/৪টি কথা কথিত হইল।

ত্রিপুর গুপ্ত

চৌয়ালিশ পরগণায় ৫২টি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে অলহা, মুকুটপুর, নওয়া পাড়া নামক স্থানে ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয়ের বাস। বৈদ্য জাতীয় এই গুপ্ত বংশে ভরত রায় চৌয়ালিশের চৌধুরাই প্রাপ্ত হন; তাঁহার নামে তত্রত্য ১নং তালুক বন্দোবস্ত হয়। এই বংশীয় রঘুনাথ গুপ্ত চৌধুরী আটগাওতে স্বগীয় কালী স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। আটগাঁয়ের গুপ্তবংশীয়গণ তাঁহারই বংশোদ্ভব।

কাউ গুপ্ত

এই বংশীয়গণ রাঢ়দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক চৌয়ালিশের মাসকান্দি গ্রামে অবস্থিতি করেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহারা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠেন ও তত্রত্য স্বগীয় রাজরাজ্যেশ্বরীকে ৫২/হাল ভূমি দেবত্র দান করেন। এই বংশে শ্যামরায় ও মাধব রায় চৌধুরীর নামে শায়েস্তা নগরে তালুক আছে, তাঁহারা তথাকার মিরাশদার। এই বংশীয়গণ চৌয়ালিশের মাসকান্দি, সন কাপন, দলিয়া ও আব্দা গ্রামে বাস করিতেছেন।

শিবানন্দ সেনের বংশ কথা

সেন শিবানন্দ

চৌয়ালিশের আদাপাশার সেনগণ, এক মহাবংশ সম্ভূত। এই বংশের পরিচয় স্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ ছিলেন, যাঁহার পুত্র কবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্য লীলার প্রধান গ্রন্থ রচয়িতা; এই বংশীয়গণ সেই গৌরবান্বিত সেন-বংশের সুযোগ্য সন্তান।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছেঃ-"সেন শিবানন্দ প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।" সেন শিবানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন, ইঁহার জন্মস্থান কুলীন গ্রাম (বর্দ্ধমান জিলায়)। শিবানন্দ ধনী ব্যক্তি ছিলেন; শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি গৌড়ীর শত শত ভক্ত সঙ্গে লইয়া নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মিলনে যাইতেন। তাঁহাদের অনেকের পাথেয় দিতেন, সবারই পারাপারের পয়সা দিতেন, চরিতামৃতে একথা লিখিত আছে।[১]

---

১. "শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করে, দিয়া বাসাস্থান।"-শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কাঞ্চন পল্লী বা বর্ত্তমান কাঁচড়া-পাড়ায় তাঁহার শ্বশুরালয় ছিল; শিবানন্দ পরে কাঁচড়াপাড়া বাসী হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার পুত্র ত্রয়ের জন্ম; ইঁহাদের নামঃ–

"চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।

তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভূর ভক্ত শূর॥"–শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ইঁহাদের চরিত্র বর্ণন করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক; কাঁচড়া পাড়াতে ইঁহাদের বংশীয়গণ সসম্মানে বাস করিতেছেন।

সেন বংশের শ্রীহট্টে আগমন

শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্য দাসের পাঁচ পুত্র ছিলেন। চৈতন্য দাসের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার পুত্র নয়নানন্দ প্রভৃতি জনৈক যবন প্রতিবেশী কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া গঙ্গাতীরে (পরবর্ত্তী কলিকাতার সন্নিকটে) এক জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামে আসিয়া বাস করেন, এবং চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনে তথায় অবস্থিতি করেন। কিছুদিন অবস্থতির পর নয়নানন্দের পুত্র রামচন্দ্র আত্মীয়গণ সহ বিরোধ ক্রমে তথা হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃ ভূমি শ্রীহট্টে চলিয়া আসেন ও চৌয়ালিশ পরগণায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৈদ্যবংশে বিবাহক্রমে এখানকার অধিবাসী রূপে গণ্য হন।

রামচন্দ্র শিবানন্দ বংশীয় বলিয়া এদেশে পরিচিত হইলে, অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন; এবং তিনি "অধিবাসী" বলিয়া পরিচিত হন। কালক্রমে রমাবল্লভ নামে তাঁহার এক পুত্র জাত হয়, ইঁহার পুত্রের নাম গোবিন্দ রাম। গোবিন্দ রামের ধর্ম্মনিষ্ঠা এরূপ ছিল যে, এ বংশে এ পর্য্যন্ত তত্তুল্য কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। প্রসিদ্ধ রামকান্ত সেন অধিকারী ইঁহারই ভ্রাতা। শ্রীহট্টের নবাব শমশের খাঁ বাহাদুর ইঁহার গুণে বিমুগ্ধ ছিলেন। ইনি চিকিৎসাবৃত্তি করিতেন, তাঁহার চিকিৎসা অব্যর্থ ছিল, এই জন্য নবাব, তাঁহাকে আহ্বান করিতেন। নবাব শমশের খাঁ ইঁহার কার্যে অতীব তুষ্ট হইয়াছিলেন; ইহার পুরস্কার স্বরূপ নবাব তদীয় পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবা পরিচালনের জন্য এক সনন্দে (নং ২৪০) ২২ জলুস ৯ সাবান তারিখে চৌয়ালিশ হইতে ইঁহার নামে ১১/॥৫॥ ভূমি দেবত্র দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ রামের পুত্রের নাম রমাবল্লভ সেন।

বৈষ্ণব-গদীয়ান

শ্রীহট্ট জিলার চারিটি বৈষ্ণব বংশ বিশেষ বিখ্যাত। নাম যথা–ঠাকুররাণী,[২] ঠাকুর জীবন,[৩] বৈষ্ণবরায়,[৪] এবং বঞ্চি ঘোষ।[৫] এই বংশ চতুষ্টয়ের শিষ্য-সম্পদ সামান্য নহে এবং তাঁহাদের বংশধরগণ গদীয়ান নামে খ্যাত। গদীয়ান রূপে শ্রীহট্টীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কখন হইতে কি রূপে ইহারা আদৃত হন, পরে কথিত হইবে। যখন পূর্ব্বোক্ত বংশচতুষ্টয় এই সম্মানে সম্মানিত হন, তৎকালে সেনবংশ নবাগত মাত্র, তখনও এদেশে তাঁহাদের প্রতিপত্তি হয় নাই; তাই তৎকালে এই বংশের বংশধর "গদীয়ান" খ্যাতির অধিকারী হইতে পারেন নাই।

রমাবল্লভ প্রথম এই অধিকারের জন্য আন্দোলন উত্থাপন করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত গদীয়ান

২-৫. বাণীবংশের সামান্য প্রসঙ্গ পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়ে আছে, পরবর্ত্তী ৪র্থ খণ্ডে বাণী বংশকথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইবে। বৈষ্ণব রায়ের বংশ কাহিনী ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুর জীবনের বংশীয়গণ সতরশতী পরগণার চাঁদপুর নিবাসী। বঞ্চিত ঘোষের বিবরণ ইঁহার পরই কথিত হইতেছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে পূর্ব্বাংশে (২য় ভাগ ২য় খণ্ড) ৪র্থ অধ্যায়ে ইঁহাদের নামোল্লেখ আছে।

দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক গদীভুক্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন। রমাবল্লভ গৌরপার্ষদ শিবানন্দ বংশীয়, ইহা সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণে সেই বৈষ্ণব সভায়ও ইহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইল ও সর্ব্বস্বীকৃত রূপে গৃহীত হইল। তাঁহারা সুতরাং ইহাকেও "গদীয়ান" গণ্য করিলেন, তদবধি সেন বংশীয়গণও "গদীয়ান" রূপে খ্যাত হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, শিবানন্দ সেন শ্রীক্ষেত্র যাত্রী ভক্ত বর্গের তত্ত্বাবধান করিয়া লইয়া যাইতেন;[৬] সেই সূত্রে সকলে তখন ইঁহাকে গদী সমূহের "পাটয়ারী" করিলেন; কোন মহোৎসব উপলক্ষে কে কোন স্থানে বসিবেন, এ বংশীয়গণ তাঁহার লেখা ও নির্ণয় করিয়া যথা স্থানে যোগ্য ব্যক্তিকে বসাইবেন এবং তত্ত্বাবধান রাখবেন, এই ভার প্রাপ্ত হইলেন। রাম বল্লভের চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম আত্মা রাম সেন। আত্মা রাম দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, তাহার বৃদ্ধ বয়সে এদেশে ইংরেজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট তদীয় পিতৃ-প্রাপ্ত দেবত্র বাজেয়াপ্ত করিতে উদ্যত হইলে, তিনি আপত্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহাতে উপরোক্ত সনন্দোল্লেখিত ভূমি সিদ্ধ নিষ্কর রূপে পরিগণিত হইয়া মুক্ত হয় এবং ৩২৭ নং তালুক গণ্যে বন্দোবস্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ রামের ভ্রাতার নাম রমাকান্ত সেন ছিল, এই রমাকান্তের গোপাল রাম ও গোবিন্দ রামের পুত্র রমাবল্লভের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাহাতে রমাবল্লভ জগৎসী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়হর গ্রামে গিয়া বাস করেন। রমাবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুলসী রাম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ও সাধ্বী ও বিদূষী রমণী ছিলেন; মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। সিদ্ধ পুরুষ তুলসী রামের সম্বন্ধে কথিত হয় যে একদা তরফ পরগণায় তিনি এক শিষ্যালয়ে উপস্থিত হইলে শিষ্যের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্দৃষ্টে তিনি মৃতুকে "হরিবল" বলিয়া পা ধাক্কা দিলে ঐ মৃত পুত্র জীবন প্রাপ্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

রমা বল্লভের তিন পুত্র অপুত্রক ছিলেন, সর্ব্ব কনিষ্ঠ আত্মা রামের দুই পুত্র, তন্মধ্যে গঙ্গারাম সেন একজন সাধক ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামবল্লভের গৌরকিশোর, ব্রজকিশোর, ও নন্দকিশোর নামে তিন পুত্র হয়, ইঁহাদের পৌত্রাদি জীবিত আছেন। নন্দ কিশোর সেনের পুত্র কুঞ্জ কিশোর, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কেশব সেন মহাশয় হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বাসুঘোষের বংশ কথা

আদিকথা

আমরা আর একটি মহাবংশের কাহিনী বর্ণন করিতে উপস্থিত হইয়াছি, এটি বাসু ঘোষের বংশ। বাসুদেব ঘোষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও একজন প্রসিদ্ধ পদ কর্ত্তা ছিলেন।

উত্তরাবাটীয় সৌকালীন গোত্রজ সোমেশ্বর ঘোষবংশাবতংশ শুকদেব ঘোষের নয়টি পুত্র হয়, ইঁহাদের নাম কংশারি, দনুজারি, মীনকেতন, গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব, জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তিনজন বংশ প্রবর্ত্তক, দ্বিতীয় তিনজন শ্রীমহা প্রভুর পার্ষদ ভক্ত এবং শেষোক্ত তিনজন নিঃসন্তান ছিলেন।

প্রথম তিনজনের বংশোল্লেখ শেষে করিব। দ্বিতীয় তিনজনের কথা বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠক সকলেই অবগত আছেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসু এই তিনজন শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ও

৬. "প্রতিবর্ষে প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে যান পথে পালন করিয়া॥"
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

তাঁহার প্রধান গায়ক ছিলেন। ইঁহারা তিনজনই শ্রীমহাপ্রভুর অনুষঙ্গী এবং তাঁহার প্রেমামৃত সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছিলেন; কাজেই ইঁহাদিগকে সংসারত্যাগী বলাই সঙ্গত। সংসার ত্যাগী হইলেও গোবিন্দ ঘোষকে শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় বিবাহ করিতে হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই[৭] করা গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার বংশধর কেহ নাই। বাসুঘোষ ও মাধব ঘোষ বিবাহ করেন নাই। তবে শ্রীহট্টে অন্যত্র "বাসুদেব বংশ" বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তদ্রূপ পরিচয় দিবার তাঁহাদের ভিত্তি কোথায়?

শঙ্কর ঘোষের কথা

রাঢ়দেশের কুলাই গ্রামবাসী শুকদেব ঘোষ ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দনুজারির নাম করিয়াছি, দনুজারির পুত্রের নাম শঙ্কর ঘোষ, শঙ্কর বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া মাতুল কর্ত্তৃক বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুলীন গ্রামে তদীয় গৃহে নীত হন ও সেই স্থানেই প্রতিপালিত হন।

কুলীন গ্রামের গুণরাজ খাঁ ও রামানন্দ বসুর নাম বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে ও সাহিত্যিক গণের নিকট অপরিচিত নহে; এই বর্দ্ধিষ্ণু বসুবংশীয় ভক্ত বাণীনাথ বসু, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। শঙ্কর কিছু বড় হইলে বাণীনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। বাণীনাথেরই চেষ্টায় শঙ্কর স্বীয় পিতৃব্য বাসুদেব ঘোষের সহিত সম্মিলিত হন এবং তদবধি তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন।

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া নীলাচল গমন করিয়াছিলেন, তথা হইতে বৃন্দাবন গমন ব্যাপদেশে গৌড়ে আগমন করিলে শঙ্কর তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হন ও কৃপালাভে কৃতার্থ হন। এই সময় শ্রীমহাপ্রভু বাসুদেবকে বলেন, "শঙ্কর তোমার পালিত পুত্র রূপে খ্যাত হইবে; এবং তোমার অপর ভ্রাতৃবংশও তোমারই বংশ বলিয়া কথিত হইবে।" শ্রীমহাপ্রভুর এই বাক্য মূলে কংসারি দনুজারি ও এবং মীনকেতনের বংশীয়গণ "বাসুঘোষ-বংশ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

কংসারি এবং মীন কেতনের বংশীয়গণ কুলাই গ্রামে, তন্নিকটবর্ত্তী জগদা নন্দপুরে ও বৈষ্ণবতলা গ্রামে এবং মুর্শিদাবাদের রসোড়া, যশোহরের রামনগর ও দিনাজপুরে বাস করিতেছেন। দিনাজপুরের রাজ বংশ ও রায় সাহেব বংশ বাসুঘোষ বংশেরই শাখা।

যাহা হউক, শঙ্কর ঘোষ পিতৃব্য বাসুদেবের উপদেশ অনুসারে ভক্তি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন, এবং পিতৃব্য ত্রয়ের ন্যায়ই সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রাপ্ত হন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত "ডম্প" বাদ্য করিতেন এবং তদ্দারাই শ্রীমহাপ্রভুকে প্রীতিদান করিয়াছিলেন।

"ডম্প" বাদ্য সহকারে সঙ্গীত করিয়া শঙ্কর যে শ্রীমহাপ্রভুর করুনা অর্জ্জন করেন, ইহা ভক্ত সমাজে একটা স্মরণীয় কথা রূপে খ্যাত হইয়াছিল। শঙ্কর ঘোষের পরিচয় প্রসঙ্গে এইজন্য এই কথাই "বৈষ্ণব বন্দনা" গ্রন্থে উল্লেখিত হয়, যথা–

"বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি।
ডম্পের বাদ্যেতে যেবা প্রভুর কৈল প্রীতি॥"

শ্রীমহাপ্রভু যখন নীলাচলে, শঙ্কর ঘোষ তখন সেস্থানেও যাইতেন। যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়া বাঙ্গালা কীর্ত্তন গানের তরঙ্গ তুলিতেন; তখন পিতৃব্যগণ সহ শঙ্করও সেই সঙ্গীতে তান ধরিতেন। ইনিও একজন উল্লেখযোগ্য গায়ক ছিলেন, তাই গোবিন্দ কবিরাজ কৃত পদে ইঁহার নামও, নীলাচলে গৌরাঙ্গ-সঙ্গীত প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে, যথা–

৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশে ৩য় ভাগ ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায়ে দেখ।

"গায়ে রায় রমানন্দ, গোবিন্দ মাধবানন্দ,
বাসুঘোষ, গোবিন্দ, শঙ্কর।" ইত্যাদি।

এমন কি, কখন-কখন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাকে ডাকিয়া কীর্ত্তনে নিয়া যাইতেন, যথা উদ্ধব দাসের পদে–

* * * * *

পহুক সঙ্গীত বুঝিয়া স্বরূপ
যবহুঁ ধরই গান।
তবুহুঁ গৌর গোসাঞি শঙ্কর
ডাকই করিয়া সম্মান॥"

* * * * *

শঙ্কর ঘোষ স্বয়ং একজন পদরচয়িতা ছিলেন, পদকল্পতরু গ্রন্থে ইঁহার ভণিতা যুক্ত কয়েকটি পদ সংগৃহীত আছে।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের মহোৎসব একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই উৎসবের পরে বাসুদেব ঘোষ ভ্রাতুষ্পুত্র শঙ্করের বিবাহ দেন। শঙ্করের স্ত্রীর নাম লবঙ্গ লতা। বিবাহের পর শঙ্কর পুনর্ব্বার মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর সপ্ত বর্ষ অতিক্রম করিলে লবঙ্গ লতার গর্ভোৎপত্তি হয়, এই গর্ভে যাদব নামে শঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন; দুই বৎসর পরেই তাঁহার আর একটি পুত্র হয়, ইহার নাম মাধব। এই মাধব এবং যাদব ঘোষ হইতে দনুজারি বংশের বিস্তৃতি ঘটে।

শঙ্কর গৌর প্রেমরসে বিভোর থাকিতেন, মাতুলালয়ে থাকিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহা কোন কোন দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তির অসহ্য হইল, তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের নিলিমাবাদ পরগণার ডিহিদার মামুদ শরিফ প্রধান ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি নানারূপ অত্যাচার করায় শঙ্কর স্ত্রীপুত্রাদি সহ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর স্বীয় শ্বশুর আনন্দমিত্রের গৃহে গমন করেন।

যাদব ও মাধব

শঙ্করের পুত্র যাদব ও মাধব বাল্য কালেই পিতৃ মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ ও পিতামহের গুণগান শ্রবণে মোহিত হইতেন, পিতা যখন তাঁহাদের কাছে গদগদ বাক্যে গৌরগুণ গান করিতেন, তন্ময়চিত্তে তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিতেন। ফলে বাল্যাবধিই তাঁহারা গৌরানুরাগী ভক্ত; (পূর্ব্বোদ্ধৃত পদের অন্যাংশ) যথা–

"–ডাকহু করিয়া সম্মান।
তাহার নন্দন, পহুঁ দুই জন
যাদব মাধব ঘোষে।
পিতামহ গুণ, শুনিয়া নিপুণ,
মজয়ে গৌরাঙ্গ রসে॥"
\+ + + ইত্যাদি উদ্ধব দাস।

যাদব ও মাধবের শিক্ষা এই স্থানেই আরম্ভ হয়। ইঁহারা পারস্য ভাষায় অল্পদিনেই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন এবং অচিরেই নবাব দরবারে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহাদের

পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, রাজ কার্য্য গ্রহণের কিছুদিন পরেই তাঁহাদের মাতৃবিয়োগ ঘটে।

একদা ঢাকায় হিসাব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর আবশ্যক হওয়ায় মুর্শিদাবাদে তাহা জ্ঞাপিত হইলে, নবাবের অভিপ্রায়নুসারে যাদব ঢাকায় যাইতে আবিষ্ট হন। জ্যেষ্ঠকে দূরদেশে যাইতে হইল; কনিষ্ঠ মাধব একাকী তথায় যাইতে তাহাকে দিলেন না; অনেক যোগাড় যন্ত্র করিয়া তাঁহার সাহায্যকারী রূপে স্বয়ং সঙ্গে চলিলেন।

রাজ কার্য্য ব্যপদেশে ঢাকায় তাঁহারা বহুদিন বাস করেন। স্বীয় কার্য্যে দক্ষতা ও চরিত্রগুণে তাঁহারা সত্ত্বরেই ঢাকা-নবাবের বিশ্বাস ভাজন হইয়া উঠেন ও ইঁহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার আদেশে শ্রীহট্টের রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্যে উন্নীত হইয়া অনতিবিলম্বে শ্রীহট্টে প্রেরিত হন।

শ্রীহট্টে আগমন

শ্রীহট্ট তখন সাক্ষাৎ ভাবে ঢাকা নবাবের অধীন ছিল, ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, শ্রীহট্টের তরফ, লাউড়, ইটা প্রভৃতি স্থানে এক সময় স্বাধীন খণ্ড রাজ্য সমূহ ছিল। এই জন্য মোসলমান আমলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সকল স্থানে এক এক কার্যালয় ছিল। যাদব ও মাধব ইটার কাছারীতে আগমন করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহাদের বাসস্থান অদ্যাপি "হাওলি" নামে কথিত হয়।

কয়েক বৎসর তাঁহারা সুখ্যতির সহিত সরকারী কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তৎপর একদা দেশে অজন্মা হওয়াতে এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের শৈথিল্যে বাৎসরিক "মাল" (সংগৃহীত রাজস্ব) নিয়মিত রূপে ঢাকায় প্রেরিত হইতে পারিল না। ইহারা নবাবকে স্থানীয় অবস্থা জানাইলেন, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইল।

তৎকালে দূরদেশের উচ্চ কর্ম্মচারিবর্গ প্রায়শ স্বাধীনভাবে চলিতেন। রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা সুবিধা পাইলেই সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, এই জন্য কর্তৃপক্ষও তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না, কাজেই যাদব মাধবের আপত্তি গৃহীত হইল না, এবং তাঁহাদিগকে ঢাকায় নেওয়ার জন্য "সোয়ার" (অশ্বারোহী) প্রেরিত হইল।

"সোয়ার" আসিতেছে শুনিয়াই হাওলির আমলাবর্গ যে যথায় পারে পলাইল; কারণ "সোয়ার" আসিলে প্রায় অত্যাচার হইত। যাদব তখন পীড়িত ছিলেন, তিনি দূরবর্ত্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে না পারিয়া, সন্নিকটবর্ত্তী গয়ঘড় গ্রামে গিয়া গোপনে অবস্থিতি করিলেন; মাধব যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহা জানা গেল না।[৮]

যাদব ঘোষ গয়ঘড়ে

গয়ঘড়ে তখন দত্তবংশীয় গণই প্রধান ছিলেন। তত্রত্য বিজয় দত্তের জয়মঙ্গলা নাম্নী বিবাহ যোগ্যা এক কন্যা ছিল; বিজয় যাদবকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। যাদব দৈবতঃ নবাব সরকারে দোষী হইয়া পড়িয়াছেন; এক্ষণে এই নির্জ্জন জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমে মুর্শিদাবাদে বা তদ্রূপ কোন স্থানে যাওয়া সুবিধাজনক নহে বলিয়া বোধ করিলেন এবং সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বিবাহ হইয়া গেল, যাদব যৌতুকে জীবন ধারণোপযোগী বহু ধন সম্পত্তি, দাস-দাসী এবং

৮. জনশ্রুতি আছে যে, মাধব ত্রিপুরাদের আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন, তথা হইতে পরে তিনি উত্তরাঞ্চলে গমন করেন। শ্রীহট্টের বেতাল পরগণায় যে কয়েক ঘর ঘোষ বাস করেন ইঁহারা মাধব সন্তান-বলিয়া উক্ত হন।

ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। গয়ঘড়ের দক্ষিণ সংলগ্ন সেই যৌতুক প্রাপ্ত ভূমিতে বাসের জন্য যাদব এক বৃহৎ বাটিকা নির্ম্মাণ করিলেন, তাঁহার বাসহেতু উক্ত স্থানে ঘোষউড়া গ্রাম নামে খ্যাত।

যাদব অতঃপর ইটার রাজ বংশীয় দেওয়ানগণ সহ পরিচিত হইলেন। তাঁহারা সদ্বংশীয় বিদ্বান্ যাদবের গুণের আদর করিতে ভুলিলেন না, যাদবের বাড়ীর সংলগ্নই তাঁহাদের অধীকৃত বুরঙ্গী নামক গ্রাম ছিল।[৯] দেওয়ান যাদবকে উক্ত বুরঙ্গী গ্রাম দান করেন। দানপ্রাপ্ত বুরঙ্গীর সামিলে ঘোষ উড়ার পরিসর অনেকটা বর্দ্ধিত হয়।

সন্তান-সন্তুতি

কিছুকাল পরে যাদব ঘোষের একপুত্র জন্মিল, যাদব তাঁহার নাম বিষ্ণুঘোষ রাখিলেন, ইঁহার জন্মের কয়েক বৎসর পরেই যাদবের মৃত্যু হয়। বিষ্ণুঘোষ পিতার মুখে শুনিতে পারিলেন না যে, তিনি কোন মহাবংশে জাত হইয়াছেন। যাহাহউক, তিনি সংস্কৃত শিক্ষার মনোযোগ দিলেন এবং অনতিবিলম্বেই বিদ্যা-বিনয়ে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন, ধর্ম্মে তাঁহার স্বাভাবিকী রতি উপজাত হইল; তাঁহার বংশেরই গুণ বলিয়া সকলে বলিতে লাগিল। বিষ্ণুঘোষ প্রবিষ্ট হইয়া একটা দীর্ঘিকা খনন করাইলেন, এবং উহার সন্নিকটবর্ত্তী একটি বাটিকাও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কাল গ্রাসে পতিত হয়ে সেই বাড়ীতে যাইতে পারে নাই।

বিষ্ণুঘোষের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নামে দুই পুত্র হয়। ইঁহারা উভয়েই পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় কনিষ্ঠ শ্রীচৈতন্য ঘোষ ইটার দেওয়ান বংশের অধীনে একটি কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন।

তিনি চতুর্দ্দিকেই শাক্ত মতের বিজয়-পতাকা উড়িতে দেখিতেন, তদঞ্চলে তৎকালে বৈষ্ণব মতের কিছুই আদর ছিল না; শিশুদিগকে পৈতৃক গুরু শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যাইতেন। তদবস্থায় এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে শিশুকালাবধি বিষ্ণু ভক্তির উদয় হওয়াই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কৃষ্ণ ঘোষ কাহাকেও কোন কথা বলিতেন না, কিন্তু আপন মনে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করিতেন যেন দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের শান্ত প্রবাহ বহিতে আরম্ভ হয়, মদ্য মাংসের প্রসার কমিয়া যায়, লোক যেন উগ্রতা ত্যাগে যথার্থ সাত্বিক ভাবাপন্ন হয়।

মনু নদীর মাহাত্ম্যের কথা তিনি অবগত ছিলেন। সত্যযুগে এই মনু তীরেই ভগবান মনু শিবার্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়; এই মনু মাহাত্ম্যে মোহিত মহারাজ অমর মাণিক্য মনুতে তনুত্যাগ করেন। কৃষ্ণ ঘোষ এই মনুতীরে কখন কখন একাকী পরিভ্রমণ করিতেন, নানা ভাবে অভিভাবিত হইতেন।

কৃষ্ণঘোষের জাগ্রত স্বপ্ন

একদা এইরূপ পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেদিন মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। মনু নদীর মাহাত্ম্য স্মরণে ইহাকে তিনি পূত সলিলা সুর তরঙ্গিনী বলিয়াই বোধ করিতেছেন; তাঁহার মনে তখন নদীয়ার সুরধনী তীরের কথা–গৌর অবতারের বিচিত্র পুণ্যগাথা জাগিয়া উঠিয়াছে; তিনি তন্ময় হইয়া–যেন বাহ্য জ্ঞান বিরহিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন।

একি? হঠাৎ সম্মুখে শত শশধর উদিত হইল, সিদ্ধ জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে লীলা লহরী বিস্তার করিল; কৃষ্ণ ঘোষ বিস্মিত-নেত্রে সুব তরঙ্গিনী-তীর-বিহারী নদীয়ার

৯. কথিত আছে যে পূর্ব্বে ঐ স্থানে বুরঙ্গা নামে এক কুকি সর্দ্দার বাস করিত বলিয়া তাহার নামেই উহা খ্যাত হয়।

গৌরকান্তি নবীন নাগরকে দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণ ঘোষ সে অপরূপ রূপপ্রভা বিলোকনে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। একি জাগ্রত স্বপ্ন? ঘোষ ঠাকুর দেখিলেন, যেন এ জগত গৌর কান্ত দয়ারামের প্রেম-হিল্লোলে আপ্লাবিত রহিয়াছে। তিনি কে এবং কোথায়, এ জ্ঞান তাঁহার তিরোহিত হইল;। তঁহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা যেন বিলোপ পাইল; তখন যেন শুনিতে পাইলেন,–যেন শত বাঁশরী বাজিয়া উঠিল; সেই গৌর-কান্ত পুরুষ করুণার স্বরে আশ্বাস দিয়া বলিলেন–"চিন্তা কি কৃষ্ণচন্দ্র! তোমার গৃহে আমার প্রিয় ভক্তের উদ্ভব হইবে, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; তাঁহাকে পবিত্র ভাবে প্রতিপালন করিও।" আর কিছু নাই, নিমেষ মধ্যে সে রূপরাশি যেন বাতাসে মিশিয়া গেল; ঘোষ ঠাকুরের অপূর্ব্ব জাগ্রৎ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরেই কৃষ্ণ ঘোষের পত্নী রেবতী গর্ভধারণ করিলেন; এই গর্ভে মহাত্মা গঙ্গারামের উদ্ভব হয়। গঙ্গারামের জন্মের কিছু পরে কৃষ্ণ ঘোষ কালগ্রাসে পতিত হন।

রেবতীর মনে ধারণা ছিল যে পুত্র এক অনন্য সাধারণ পুরুষ হইবে, পুত্রকে তিনি অতিযত্নে প্রতিপালন করেন; কিন্তু পুত্রের বাল্যচরিত্র বিপরীত দৃষ্ট হইতে লাগিল। লেখা পড়ায় মন নাই, কেবল চাঞ্চল্য; দুষ্ট বালক বর্গ সহ ঘনিষ্ঠতা। একদা মাতা তাহাকে তীব্র তিরস্কার করেন, বালকের মনে ইহাতে বড়ই ধিক্কার জন্মে, এবং বালস্বভাববশতঃ সে সন্নিকটবর্ত্তী বনে গমন করে। কিন্তু সেই স্থানে গেলে হঠাৎ তাহার মনে এক ভাবোদয় হইল, তিনি আর গৃহে আসিলেন না; একাদশ বর্ষীয় বালক,–সরস্বতী-পতির আরাধনায় বৃত হইল।

তপস্বী গঙ্গারাম

ধ্রুবের ন্যায় গভীর অরণ্যে বৃক্ষমূলে ঐ কে বালক বসিয়া? এটি কি সেই চঞ্চল গঙ্গারাম? গঙ্গারামই বটে; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সেই চাঞ্চল্য নাই; এখন গঙ্গারাম পরম সাধক। গঙ্গারাম অনতিবিলম্বে দেব কৃপায় সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত হইলেন, তাঁহার জীবনে অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিতে লাগিল, দেখিয়া সাধারণ লোক স্তম্ভিত হইল। সে অদ্ভুত কাহিনী–তাঁহার জীবেদয়া, জীবোদ্ধার বার্ত্তা, বৃন্দাবন গমন ব্যপদেশে দিল্লী নগরে তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তি, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণ প্রকাশ ইত্যাদি সংবাদ আমরা ৪র্থ ভাগে জীবন চরিত প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিব। এই গঙ্গারামেরই নামান্তর বঞ্চিত ঘোষ।

ইটার রাজবংশীয় বৃদ্ধ দেওয়ান ইস্রাইল খাঁ তখনও জীবিত ছিলেন, তিনি এই বালক-তপস্বীর সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, তৎপ্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন, ও তাঁহার তপঃক্ষেত্র পরিষ্কৃত করাইয়া তাঁহাকে দান করেন। সেই স্থানই "মোহন্তালয়" (অপভ্রংশ) মহলাল নামে খ্যাত হয়। এই স্থানই তদ্বংশীয়ের বাস গ্রাম রূপে পরিণত হইয়াছে।

মোসলমান জমিদার কর্ত্তৃক এইরূপে তিনি সৎকৃত হইলে, হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইলেন; অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজেও অনেকে এই সিদ্ধ মহাত্মার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা বিপ্রহরির নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য।

রাজা বিপ্রহরির বাটী ইহাতে ছিল, তিনি ইটার এক ধনী জমিদার ছিলেন সন্দেহ নাই; তৎসম্বন্ধে গ্রন্থপত্রে অধিক বিবরণ নাই।[১০]

---

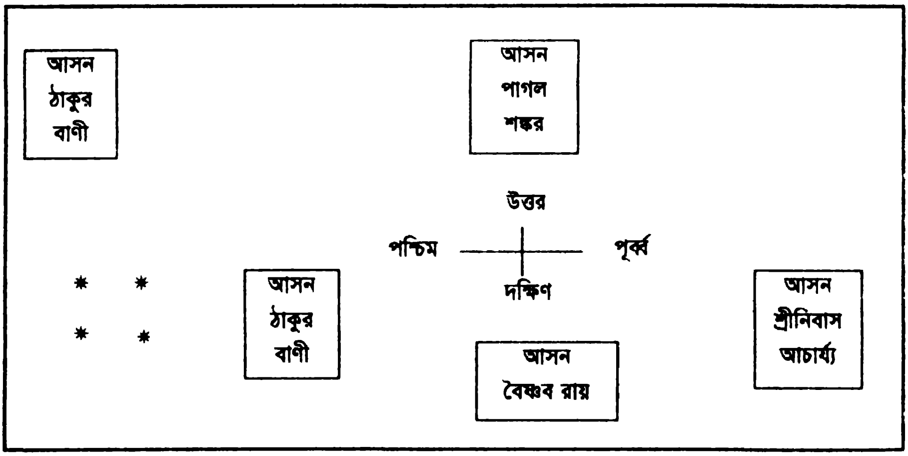
১০. পূর্ব্ববর্ত্তী ১ম অধ্যায়ে "রাজা" ধর্ম্মনারায়ণের বংশে রাজা বিপ্রহরির নামে আছে, তিনি সিদ্ধ মহাত্মা। উভয়ে অভিন্ন কিনা সহজেই বুঝা যায়। উভয়ের অবস্থিতি কালও একই।

বিপ্রহরির মহোৎসবে শ্রীনীবাসাচার্য্যের পৌত্রে আগমন ও পঞ্চগদী কথা

বিপ্রহরির বহু অর্থব্যয়ে এক মহোৎসব আরম্ভ করেন, এতাদৃশ মহোৎসবের কথা এদেশে শুনা যায় নাই; এই মহোৎসবে কেবল শ্রীহট্টের নহে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের খ্যাত নামা বহুতর বৈষ্ণব ভক্ত নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্যের নাম বৈষ্ণব জগতে বিখ্যাত। শ্রীমহাপ্রভুর পরে ইনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা ছিলেন; ইঁহার জনৈক পৌত্র এই মহোৎসবে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের, বৈষ্ণব সমাজে তৎকালে বঞ্চিত ঘোষ, ঠাকুরাণী, বৈষ্ণব রায় ও পাগল শঙ্কর প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাগণ ছিলেন।[১১]

বৈষ্ণব সমাজে কোন মহোৎসবে প্রসাদ ভোজন কালে গুণানুসারে অগ্র পশ্চাৎ বসিবার রীতি আছে, শ্রীনিবাস-পৌত্র এই মহোৎসবের কর্ণধার রূপেই গুণানুসারে সকলকে বসাইয়া ছিলেন; উৎসব সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। বলা আবশ্যক যে বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ গুণ মধ্যে গণ্য হয়।

এই সময়ে রাজা বিপ্রহরি একটা প্রস্তাব করেন। শ্রীহট্টের ভবিষ্যতে যে সকল বৈষ্ণবোৎসব হইবে, শ্রীহট্টীয় সিদ্ধ বংশীয়দিগকে সেই সব মহোৎসবে কি রীতি অনুসারে কাহাকে কোন স্থানে আসন দেওয়া হইবে, তাঁহার শৃঙ্খলা করিয়া দিতে আচার্য্য–পৌত্রকে অনুরোধ করেন। তখন নিম্নাদর্শে আচার্য্য-পৌত্রের ইচ্ছামতে সর্ব্ব-বৈষ্ণব সম্মতে একখানা তাম্রপত্রে 'সিদ্ধবংশীয়গণের আসন স্থান নিরূপিত হয়ঃ–



এই চিহ্নিত স্থানে কোন আসন-স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না, পরে আদা পাশার সেন বংশীয় অধিকারীদের জন্য এই স্থান নিরূপিত হয়। (পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে।)

বর্ত্তমানে মহোৎসবাদিতে এই তাম্র পত্রের নির্দ্দেশানুসারেই সিদ্ধ বংশীয় বর্গের বসিবার আসন প্রদত্ত হইয়া থাকে। শ্রীনিবাসাচার্য্যে বংশ এদেশে নাই, শুধু মান্যার্থে তাঁহাদের আসনের স্থান কল্পিত হইয়াছে।

১১. "শ্রীহট্ট দেশেতে আর্য্য সিদ্ধা চারিজন।

বঞ্চিৎ, বাণী, বৈষ্ণব রায়, শঙ্কর এই চারি।
ধর্ম্ম আচরণে কৈলা দেশে অধিকারী॥" –বঞ্চিত চরিত্র গ্রন্থ।

পাঁচ পুত্রের কথা

বঞ্চিত ঘোষ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র পাঁচজন, পাঁচজনই দৈবশক্তি বিশিষ্ট এবং সকলেই সুদীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহেশ্বর। শিশু কালাবধিই ইনি পিতৃ পদবি অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন, তাহার ফলে তিনি যোগানুষ্ঠানে অসীম শক্তি লাভ করেন। তিনি বৃন্দাবন গমন করিয়া ছিলেন, প্রত্যাগমন কালে বহুতর সন্ন্যাসী সহ তাঁহার সম্মিলন ঘটে। ময়মনসিংহে সমাগত হইলে রজনী যোগে তিনি এক কুলীন কায়স্থ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ ভদ্রলোকের রত্নাবতী নাম্নী একটি বিবাহ যোগ্যা তনয়া বহুকাল পীড়া ভোগ করিয়া মৃত্যু কবলে পতিত হইতেছিল, যখন মহেশ্বর তথায় উপস্থিত হন, তখন সেই বালিকার পিতা মাতা কন্যাকে মৃত বোধে ক্রন্দন করিতে ছিলেন, তদবস্থায় মহেশ্বরের কৃপায় অনতিবিলম্বে সেই মৃত কল্প কন্যা জীবন প্রাপ্ত হন। তখন গৃহ স্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারই করে সেই কন্যা সম্প্রদান করেন। কথিত আছে, মহেশ্বরের করস্পর্শে কুষ্ঠব্যাধি বিদূরীত হইয়া যাইত। অনেকেই এই যোগসিদ্ধ মহাত্মার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সংখ্যাও ছিল বলিয়া জানা যায়। ইনি ১৩০ শ্লোকাত্মক "বঞ্চিত চরিত" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।[১২] ইনি ১০৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া পরলোক গামী হন।

বঞ্চিত ঘোষের দ্বিতীয় পুত্রের নাম কৃষ্ণদাস। ইনি ভক্তি পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইঁহার জীবন এতই পবিত্র ছিল যে, তদীয় স্পর্শ মাত্রে লোকের চিত্ত পবিত্র হইত, মনের হিংসাদ্বেষাদি জঞ্জাল বিদূরিত হইয়া যাইত। ইনি একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন; এবং ১০২ বৎসর কাল জীবন ধারণ করেন।

বঞ্চিতের তৃতীয় পুত্রের নাম জগন্নাথ, ইনি পিতার অতি প্রিয় ছিলেন; পিতৃ আশীর্ব্বাদে তাঁহার জীবন পবিত্র পথে প্রধাবিত হইয়াছিল। ইনি বহুতর শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং ৯৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

বঞ্চিতের চতুর্থ পুত্র অকৃতদার ছিলেন এবং যৌবনেই বৃন্দাবন ধামে গমন করেন; তিনি আর দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই।

সর্ব্ব কনিষ্ট পুত্র অজ্ঞানের অবস্থাও অনেকটা বলরামের ন্যায়। ইঁহার রচিত সঙ্গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১৩] ১৬৯২ শকাব্দের লিখিত একখানা বংশ-পত্রে এ বংশের আদিপুরুষের নাম ও গোত্র এবং মূল বাসস্থান ইত্যাদির উল্লেখ সহ বঞ্চিত ঘোষের নাম পর্য্যন্ত লিখিত আছে। এই কাগজ খণ্ড ইঁহারই লিখিত বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছি।[১৪]

পরবর্ত্তী বংশীয়বর্গ

বঞ্চিতের জ্যেষ্ঠপুত্র মহেশ্বর ঘোষের একমাত্র পুত্রের নাম রাধাবল্লভ।[১৫] ইনি প্রথমতঃ যোগানুষ্ঠান করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল, তদীয় সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই বিমুগ্ধ, এমন কি স্তম্ভিত হইয়া যাইত। তাঁহার বৈষ্ণবতা, ভক্তি, বিনয়, সদ্ব্যবহার এত মধুর ও সুন্দর

১২. "বঞ্চিত চরিত" গ্রন্থ অবলম্বনে রাধাচরণ দাস ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে "বঞ্চিত চরিত্র" নামক গ্রন্থ রচনা করেন, ইহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং তদবলম্বনেই প্রধানতঃ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৩. আমাদের প্রাপ্ত সঙ্গীতটি তদীয় পিতার জীবন-কথা বিষয়ক।

১৪. এই প্রাচীন জীর্ণ কাগজ খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

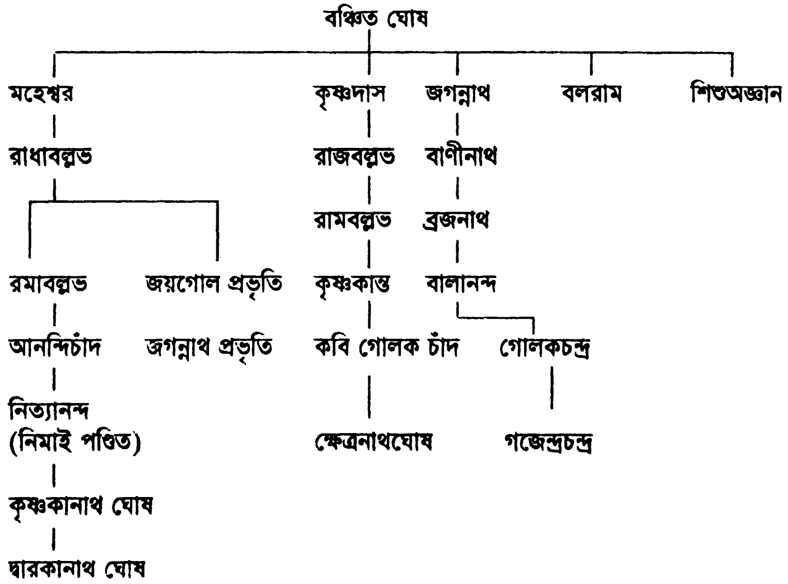
১৫. বাসুঘোষের পালিত পুত্র শঙ্কর, তৎপুত্র যাদব, তৎপুত্র বিষ্ণুঘোষ, তৎপুত্র কৃষ্ণঘোষ, ইঁহার পুত্র

ছিল যে অনেকই আকৃষ্ট হইয়া তদীয় শিষ্যত্ব স্বীকার করেন; এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে "বঞ্চিতের দ্বিতীয় অবতার" বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইনি ১১০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখিত আছে। ইঁহার পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে তিন জন বংশ প্রবর্ত্তক, তাঁহাদের নাম রমাবল্লভ, জয়গোপাল ও দুর্ল্লভ ঘোষ। দুর্ল্লভের বৃদ্ধাবস্থায় দশসনা বন্দোবস্ত হয়। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রাপ্ত নবাবি আমলের দানপ্রাপ্ত ভূমি ইহারই নামে একটি তালুকে এই সময় বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

রাধাবল্লভের অনেক গুণের কথা শুনা যায়। তাঁহার ভক্তি, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সঙ্গীতজ্ঞতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাঁহার বিবিধ গুণে সর্ব্বসাধারণ তৎপ্রতি বিশেষে অনুরক্ত ছিল; এবং তদীয় শিষ্যত্ব স্বীকারে সেই অনুরাগের প্রমাণ দিয়াছিল। ইনি ৯৬ বৎসর জীবিত ছিলেন।

রাধাবল্লভের পুত্র আনন্দিচান্দের বাল্যকাল হইতেই দেবদ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সেই সময় হইতেই তিনি খেলাছলে দেবতাস্থাপন, দেবতা অর্চ্চন ও তাঁহাদের বিসর্জ্জনাদি করিতেন। সেই ভক্তির অঙ্কুর কালে বিবর্দ্ধিত হইয়া ফল ফুল ভারাক্রান্ত মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল; সমাজের বহুতর শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ইঁহার শিষ্য সংখ্যা ইয়ত্তা রহিত; ইনিও একশতের উর্দ্ধকাল জীবিত ছিলেন।

আনন্দিচান্দের চতুর্থ পুত্রের নাম নিত্যনন্দ। সমগ্র গীতা ও ভাগবতের দশম স্কন্ধ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, ইনি এবংশের অত্যুপ্রল্য নক্ষত্র, চতুর্থ ভাগে তাঁর জীবনী কীর্ত্তিত হইবে। বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা কবি গোলক চাদ তাঁহারই জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভ্রাতা। নিত্যানন্দের পুত্রের নাম কৃষ্ণ কিশোব, তাঁহার পুত্র হইতে আমরা শিবানন্দ বংশকথা ও এই বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।[১৬]



১৬. ১৩১৬ বাং ২৩শে অগ্রাহায়ণের আনন্দ বাজার পত্রিকায় আমাদের লিখিত প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ স্থানের বিভিন্ন বংশ

পরগণা-ইটা

বর্ম্মণের ঘোষ বংশ

ইটা পরগণার অন্তর্গত বর্ম্মাণের ঘোষ বংশের সহজধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক কবি শ্যাম কিশোর ঘোষের জন্ম হয়, তাঁহার কৃত "উজ্জল চিন্তামণি" গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন; তাহাতে বাসুঘোষ নামক এক ব্যক্তিকেই তিনি স্বীয় বংশের আদি পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; যথাঃ–

"রাঢ় দেশে সুপ্রকাশে, সেই বাসু ঘোষ বংশে
ঠাকুর শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ;
বসতি কুলীন গ্রামে।" ইত্যাদি।
অন্যত্র একটি ক্ষুদ্র পদে লিখিয়াছেনঃ–
মধুগুল্য গোত্রজ
পঞ্চম প্রবর

* * * * * * * *

ভাষে শ্যামকিশোর ঘোষ।"

এই বাসুঘোষ ভিন্নব্যক্তি

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুঘোষের বংশ বিবরণ বর্ণন করিয়াছি, তাঁহাদের আদি বাসস্থান কুলাই গ্রাম, গোত্র সৌকালীন এবং তাহারা উত্তর রাঢ়ীয়। উত্তর রাঢ়ীয় ঘোষদের মধ্যে "পঞ্চম প্রবর" ইত্যাকার বাক্যে পরিচয় দিবার রীতি নাই। এ রীতি দক্ষিণ রাঢ়ীদের মধ্যে নিবদ্ধ। কুলীন গ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের বাস আছে; সুতরাং শ্যাম কিশোর ঘোষের পূর্ব্ব পুরুষ কুলীন গ্রামী "মধুগল্য গোত্রজ" বাসুঘোষ, সৌকালীন গোত্রীয় গৌরপার্ষদ প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।[১]

শ্যাম কিশোর ঘোষ যদি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ বাসুঘোষকে গৌর পার্ষদ বাসু হইতে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার ভ্রম বিজৃম্ভিত অনুমান মাত্র বলা যাইতে পারে।

বংশ উপাখ্যান

শ্যাম কিশোর লিখিয়াছেন, কুলীন গ্রামে বাসুঘোষ বংশে "শান্ত দয়াল দান্ত চরিত্র" লক্ষ্মী

১. ১৩১২ বাং (৪১৯ গৌরাব্দ) ১২ই শ্রাবণের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "শ্রীবাসুঘোষবংশ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা উক্ত বংশাখ্যান-পদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। ঐ সনের ২৯ শে ভাদ্রের পত্রিকায় দিনাজপুর বাসী বাসুঘোষ বংশীয় রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ভক্তি ভূষণ কর্ত্তৃক একটি প্রবন্ধ প্রতিপাদিত হয় যে, এই উভয় বাসুঘোষ একব্যক্তি হইতে পারেন না, সমকালবর্ত্তী হইলেও উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি।

নারায়ণের উদ্ভব হয়। লক্ষ্মী নারায়ণের "জমি ভূমি" ছিল, কিন্তু যথা সময়ে রাজস্ব শোধ করিতে পারিতেন না, তাই এক সময়ে তাহা "এস্তেফা" দেন। এই সময় সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে উত্ত্যক্ত হইয়া বিষাদ ভরে তিনি অন্নজল ত্যাগ করিয়া সাত দিন ছিলেন। তদবস্থায় শেষ রাত্রে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন।

যখন লক্ষ্মী নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাঁহার মনের অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; স্বপ্ন তাঁহার চিত্তে এক তরঙ্গ তুলিয়া দিল, সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইল, তিনি "বিকল হইয়া খেদে পূর্ব্বমুখী" চলিলেন ও নানাস্থান অতিক্রম পূর্ব্বক "এক রাত্রে" শ্রীহট্টের সতরশতীর হাওরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে তিনি ইটায় আসিলেন ও তথায় নিজ "দরবেশী জারি" করিয়া কোন এক ব্যক্তিকে শিষ্য করিলেন।

ইটার বর্ম্মাণ গ্রামে বাসুদেব দত্ত নামক এক ব্যক্তির এক বিবাহ যোগ্যা কন্যা ছিল, কন্যার নাম রত্নাবতী। বাসুদেব আগন্তুকের "ফকিরী" দেখিয়া মুগ্ধ হন ও ইঁহারই করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সেই গ্রামে তাঁহাকে স্থাপন করেন ধর্ম্মানুরাগী জামাতা নিজ বাটিকাতে শ্যাম সুন্দরের সেবা স্থাপন করিয়া গৃহী হইলেন।

লক্ষ্মী নারায়ণের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সুবল নারায়ণ। পিতা অল্প বয়সেই ইঁহাকে সাতগাঁর দত্ত বংশীয় লীলাবতী নাম্নী এক সুন্দরী বালিকার সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহে সুবলের রামজীবন নামে এক পুত্র জাত হয়। রামজীবনের পুত্রের নাম জগন্নাথ। জগন্নাথ একজন ইষ্ট নিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। একদা যখন তিনি "সন্ধ্যাহ্নিক" করিতেছিলেন, তখন এক বিষধর কৃষ্ণ সর্প তাঁহাকে "নাগপাশে" বন্ধ করে। তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে আহ্নিক সমাধা করিলেন, এদিকে সাপটাও ধীরে ধীরে বন্ধন মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল।

জগন্নাথের দুই বিবাহ, উভয় স্ত্রীর নামই রেণুকা ছিল। প্রথম পত্নী, রেণুকা যদুনন্দন প্রভৃতি তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগতা হন, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী রেণুকার গর্ভজাত সন্তানের নাম গৌরকিশোর; ইনি বর্ম্মাণ গ্রামে শ্যামরায় বিগ্রহ স্থাপন করেন। প্রথম রেণুকাপুত্র যদুনন্দের পুত্রের নাম ধনঞ্জয়, ইঁহার পুত্রের নামই শ্যামকিশোর ঘোষ।

শ্যাম কিশোরের জন্ম-প্রসঙ্গ

ধনঞ্জয়ের পত্নীর নাম সুখময়ী। ধনঞ্জয় চৌয়ালিশের সেন বংশে বিবাহ করেন; সুখময়ীর স্বভাব অতি সুন্দর ছিল, দেবতার প্রতি ভক্তি এবং পতির প্রতি অনুরক্তি তাঁহাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামী স্ত্রীতে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। ধনঞ্জয় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু পত্নীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিতেন না; তাঁহার বৃন্দাবন দর্শনের সাধ মনেই বিলীন হইত। পারিবারিক অবস্থাও তাহার অনেকটা অন্তরায় ছিল, কিন্তু অবশেষে তিনি আর রহিতে পারিলেন না। এক রাত্রে স্ত্রীকে জীবনের অনিত্যতা ইত্যাদি বহু বিষয়ে উপদেশ দিলেন, স্বধর্ম্মে থাকিয়া শ্যাম রায়ের প্রতি ভক্তি রাখিয়া দুর্ব্বার মনকে স্থির রাখিতে পরামর্শ দিলেন এবং শেষ রাত্রে উঠিয়া পলায়ন পূর্ব্বক বৃন্দাবন চলিলেন।

পরদিনই সুখময়ী পতির উপদেশের মর্ম্ম বুঝিলেন, এবং শ্যামরায়ের প্রতি চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক জগৎপতিকেই পতিজ্ঞানে ভজনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেবতার প্রতি এতাদৃশী আশক্তি দর্শনে লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

লোকের মত মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুখময়ী যেমন প্রশংসিতা হইয়াছিলেন, ৩/৪ মাস যাইতে না যাইতেই ততোধিক নিন্দিতা হইলেন। ধনঞ্জয়ের বৃন্দাবন যাত্রার ৩/৪ মাস

পরেই সুখময়ীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে আত্মীয় স্বজন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া নানারূপে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

গর্ভের দশম মাসে ধনঞ্জয় দেশে আসিলেন এবং পত্নীর গর্ভের কথা শুনিয়া তিনি লজ্জা ও ক্ষোভে একবারে অভিভূত হইলেন; তিনি আর পত্নীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন না। এই কি তাঁহার বিমল-চিত্তা বিশ্বস্থা বনিতা? ইহাই কি নারীজাতির সারল্য? সদ্য তীর্থাগত ধনঞ্জয়ের চিত্ত অনেকটা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি বাড়ীতে না গিয়া অন্যত্র নিশি যাপন করিলেন। সে রাত্রে তাঁহার সহজে নিদ্রা আসিল না, অবসন্নদেহে শ্যামরায়কে সম্বোধন করিয়া তিনি অনেক ক্রন্দন করিলেন।

শেষ রাত্রে একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল, তখন স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে শ্যামরায় তাঁহাকে বলিতেছেন–"ধনঞ্জয়, মনে সংশয় কেন? তোমার অনুরক্তা পত্নীকে ঘৃণা করিও না, এ গর্ভ অপবিত্র নহে, এ গর্ভে তোমার এক ধার্ম্মিক পুত্র জাত হইবে।"[২]

শ্যাম রায়ের ভক্ত ধনঞ্জয় আর স্ত্রীর প্রতি সংশয় পোষণ করিতে পারিলেন না, গৃহে গেলেন। সেই গর্ভে যে শিশু জাত হইল (১১৭৫ বঙ্গাব্দ), শ্যামরায়ের নামে ধনঞ্জয় তাহার নাম শ্যামকিশোর রাখিলেন।

গ্রন্থকার ও প্রচারক

শ্যাম কিশোর রায়ের বাল্যাবধিই শ্যামরায়ের প্রতি আসক্তচিত্ত ছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল, তদবস্থায় দুলালীস্থ তিলকরাম শিরোমণির নিকট তিনি "কিশোরী ভজন" তত্ত্ব শিক্ষা করেন এবং এই মত গ্রহণ করিয়া ইহাই যাজনও প্রচার করেন। তাঁহার সম্বন্ধে রঘুনাথ লীলামৃত নামক মুদ্রিত গ্রন্থে লিখিত আছেঃ–

"পিরীতি মালা চিকণ কালা শোভেছিল গলে।
সেই মালা কৃপা করি দিয়াছে সকলে॥"

কিশোরীভজন বা সহজধর্ম্ম প্রচারার্থ তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "সহজ উজ্জল চিন্তামণি" "হরিভক্তি তরঙ্গিনী" "জয়দেব চরিত্র;" তদ্ব্যতী তৎকৃত "উপদেশ নিধি বিধিমালা" নামক একখানা গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, উহার পদসংখ্যা ১৬৭টি।[৩] এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত তৎকৃত বহুতর বিচ্ছিন্ন পদ ও হাস্যরসাত্মক দোঁহা আছে।

শ্যামকিশোর ঘোষ মণিপুর রাজবাটীতে গিয়া একদা কীর্ত্তন করিয়া মহারাজকে আনন্দিত করেন এবং রাজকর্ত্তৃক তখন "গোসাঞি" উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্যামকিশোর ঘোষের শিষ্যসম্পদ অল্প ছিল না, কিন্তু তাহার অধিকাংশই হীনবংশ সম্ভূত। ১২৬০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে তাঁহার পরলোক গমন ঘটে; ইহার পুত্রের নাম কুঞ্জকিশোর অধিকারী। কুঞ্জকিশোর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার কৃত ২/৪টি ধর্ম্মসঙ্গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

২. এ বিষয়ে বিবিধ আখ্যান এযাবৎ শুনিতে পাওয়া যায়, এস্থলে রঘুনাথলীলামৃতের প্রকাশিত বৃত্তান্তেরই অনুসরণ করা গিয়াছে, তাহাতে একথাও লিখিত আছে, যথা–

"শ্যামকিশোর গোসাঞির জন্ম বিবরণ।
বিগ্রহ শ্রীশ্যামরায় হইতে জন্ম হইল।

যে রূপেতে শ্যাম কিশোর প্রকাশ পাইল॥" ইত্যাদি।

৩. "সহজ উজ্জল চিন্তামনি" গ্রন্থ ১৬ মালায় পূর্ণ; "উপদেশ নিধি বিধি মালা" উহারই এক অংশ বা মালা কিনা বলিতে পারি না। আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি লাতু নিবাসী যুগল কিশোর রায় ১২৭৪ বাং ২৪ শে আষাঢ় লিপিবদ্ধ করেন।

ধনঞ্জয়ের জয় নারায়ণ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, জয়নারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ "জিজ্ঞাসাতত্ত্ব" ও "গোপাল ভোগমালা" নামে দুই খানা গ্রন্থ ও অনেক ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ অধিকারীর নিকট "সহজ উজ্জ্বল চিন্তামণি" গ্রন্থ খানা আছে।[৪]

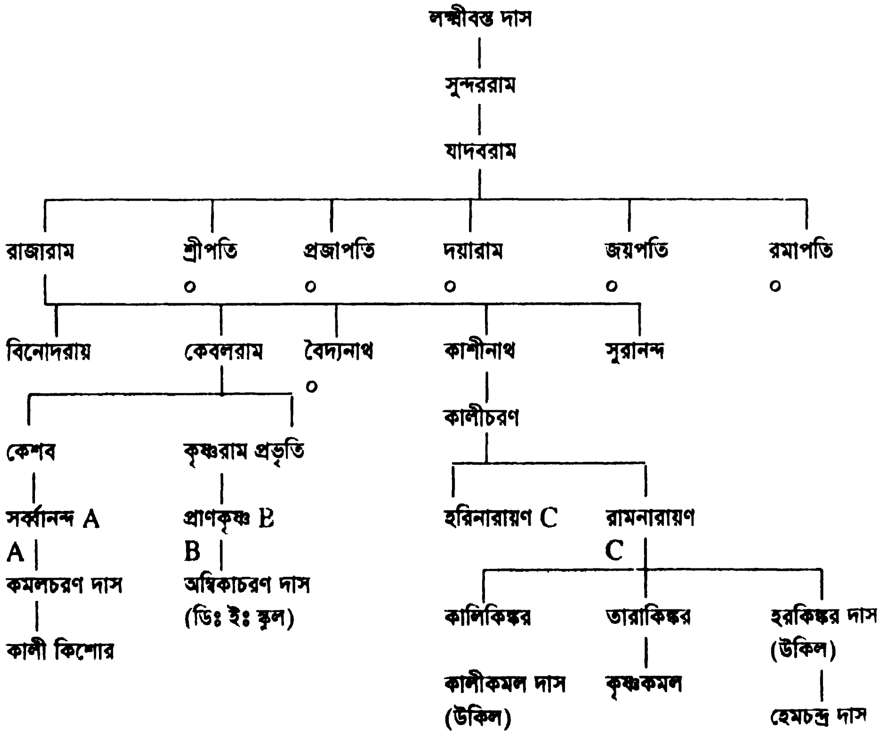
পাঁচগাঁর দাসবংশ বিবরণ

পঞ্চগ্রামী দাসবংশের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত দাস চিকিৎসাজীবী ও ত্রিপুরার কেন্দাইগ্রামবাসী ছিলেন। চিকিৎসার অনুরোধে তিনি ইটায় আগমন করিয়া পঞ্চগ্রামবাসী হন। ইহার পৌত্র প্রসিদ্ধ রাজারামের পরিচয় ও সনন্দ প্রাপ্তির কথা এবং "শ্রীধর" দেবতা স্থাপন-প্রসঙ্গ পূর্ব্বাংশে[৫] বলা গিয়াছে। রাজারামের বংশে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনা চলিয়া আসিতেছে। রাজারামের ভ্রাতা প্রজাপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার কৃত চণ্ডীটীকার উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে। রাজারামের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে ২য় ও ৩য় পুত্রের বংশ আছে;[৬] রাজারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদ রায় কবি ছিলেন, তাঁহার কৃত একখানা "পদ্মা পুরাণ" তদগৃহে আছে, শ্রীহট্টে বহুতর পদ্মাপুরাণ থাকিতে তিনি কেন আর একখানা পদ্মাপুরাণ রচনা করেন, তাহার একটা কারণ তিনি

৪. অন্তেহরি স্কুল প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র করের প্রেরিত বিবরণী অবলম্বনে লিখিত।

৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬. বংশ তালিকা এইঃ–



নিজগ্রন্থে উল্লখ করিয়া রাখিয়াছেন।[৭]

পদ্মাপুরাণ রচয়িতা কবি বিনোদ রায়ের ভ্রাতা কাশীনাথ একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি রাজনগর "মালকাছারী"র প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র হরিনারায়ণ জয়ন্তীয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কালীকিঙ্কর পারস্য নীলকমল সংস্কৃত অধ্যয়নপূর্ব্বক "কাব্যতীর্থ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অন্য শাখায় কেশবরামের পৌত্র সর্ব্বানন্দ আসামের রেভিনিউ কমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন, তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কামরূপাধিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয় কামাখ্যা দেবীর নাট মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।[৮]

পরগণা-শমশের নগর

সেনবংশের কথা

ইটার রাজবংশীয়বর্গের ক্ষমতা যখন হীনপ্রভ হয় নাই, ধন্বন্তরী গোত্র-সম্ভূত বিক্রমপুরবাসী রামানন্দ সেন তখন এ দেশে আসিয়া ইটার রাজবংশীয়বর্গের কার্য্যে নিযুক্ত হন ও অচিরেই স্বীয় কার্য্যতৎপরতায় মনীবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া ছিলেন; তাঁহাকে আর দেশে যাইতে দেওয়া হয় নাই। তিনি মহাসহস্রে কিয়ৎপরিমাণে ভূমি প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন।

রামানন্দের পৌত্রের নাম মহেশ দাস। মহেশ দাসের সময়ে ইটার রাজবংশে দেওয়ান আব্দুল হুসেন জীবিত ছিলেন।[৯] মহেশদাস ইহার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন; দত্তগ্রামের হরবল্লভ

---

৭ "স্বপ্ন দেখি বিনোদরামের দূরে গেল নিদে।
হরি হরি নারায়ণ স্মরিয়া গোবিন্দে॥
প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা।
স্নানকরি গোবিন্দরাম পূজিলা মনসা॥
হরিনারায়ণ স্মরি নির্ম্মল কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥
যেইমত পদ্মাবতী করিল সম্বিধান।
সেইমতে কবি সব গীতের নির্ম্মাণ॥
পশ্চিমেতে ক্ষুদ্র নদী পূর্ব্বেতে পর্ব্বত।
এরমধ্যে পাঁচগাও আকারে বৃহৎ॥
চারিবেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
অতি সুপণ্ডিত তারা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থজাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ কাজেতে চতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন পাঁচগাও গ্রামে বিনোদ নিবসয়॥"
এই কীটদংষ্ট পদ্মাপুরাণ এককপ অপাঠ্য; এখনও চেষ্টা করিলে পাঠোদ্ধার হইতে পারে, শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস মহাশয়কে এ বিষয় বলা বাহুল্য।

৮. শ্রীযুত হরকিঙ্কর দাস উকীল মহাশয় হইতে ইটার বহুতর জ্ঞাতব্য বিবরণ সহ এই বংশ বিবরণও প্রাপ্ত হইয়াছি।

৯. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খন্ড ৬/৭ অধ্যায়ে উল্লেখিত ঘ পরিশিষ্টের লিখিত আবদুল মনজুরের অন্যতম সহোদর ভ্রাতা।

দত্ত ইঁহার কন্যা অপরাজিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহেশ দাসের শেষ বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র নয়াগাঙ্গ পুলিশ আফিসের ক্লার্ক ছিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহেশ দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাসের বংশ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। ইঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রের নাম গৌরীবল্লভ; গৌরীবল্লভের পৌত্র কালী নাথ গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন, ইঁহার প্রণীত একখানা "পদ্মপুরাণ" আছে। তদ্ব্যতীত তদ্রচিত "লঙ্কাকাণ্ড" নামে আর একখানা গ্রন্থের কথা শ্রুত হওয়া যায়। উভয় গ্রন্থই মুদ্রিত হয় নাই।

গৌরীবল্লভের ভ্রাতা রত্নবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ; ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরনারায়ণ সুরসংযোগে পদ্মাপুরাণ পাঠ করিতেন, তিনি দেবমূর্ত্তি গঠন কাজে সুনিপণ ছিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র রামনারায়ণ আমীন ছিলেন, তাঁহার পুত্র হরনারায়ণ কাণাইঘাটে তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় প্রেরিত বংশ তালিকা অবলম্বনে ইহা লিখিত হইতে পারিয়াছে।[১০]

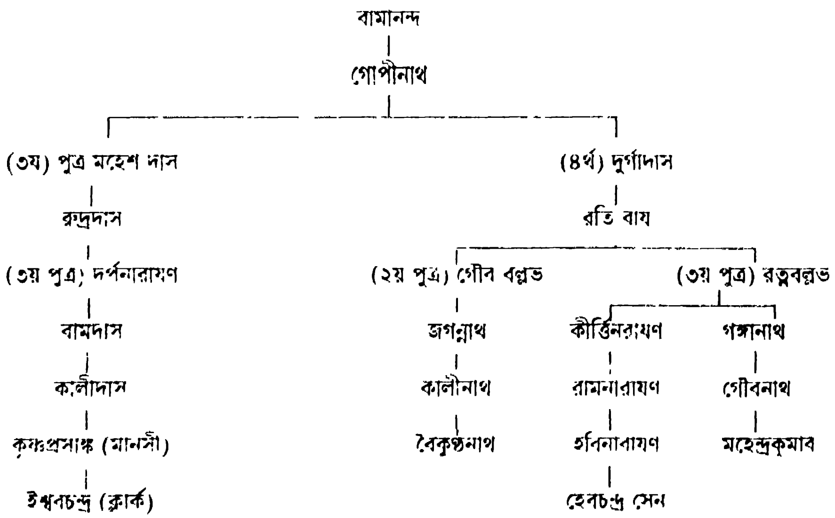
পরগণা-সতরশতী

নাগবংশের কথা

ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে ঢাকার বিক্রমপুর হইতে নাগবংশীয় একব্যক্তি শ্রীহট্টের বাণিয়াচঙ্গে আসিয়া বাস করেন। পরে তথা হইতে ইটায় আগমনপূর্ব্বক ইটা-রাজের কাজে নিয়োজিত হন ও বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; নাগবংশীয় এই কর্ম্মচারীর বাস হেতু সেই স্থান "নাগের গাও" নামে খ্যাত হয়।

খোয়াজ ওসমান খাঁ নামক আফগান কর্ত্তৃক ইটা আক্রান্ত হইয়া বিজিত হইলে, নাগ বংশীয়গণ নাগের গাও ত্যাগ করিয়া ইটার পঞ্চগ্রামবাসী হন। নাগ বংশজ সৌপায়ন গোত্রীয় কৃষ্ণরাম নাগের পুত্রের নাম গোপীরাম, তাঁহার পুত্রের নাম দুর্ল্লভরাম, ইঁহার অধস্তন বংশ বহুবিস্তৃত। তাঁহার ৪র্থ পুত্রের নাম তোলারাম। তোলারাম নাগ ভ্রাতৃবিরোধ প্রযুক্ত বাড়ী হইতে

১০. বিস্তৃত বংশতালিকা হইতে একটী বংশধারা এস্থলে প্রদত্ত হইলঃ-



ক্রোধে চলিয়া যান ও সতরশতী পরগণাধীন বাউরভাগের ধর বংশে বিবাহ করিয়া সাধুহাটী গ্রামে বাটী প্রস্তুতক্রমে তথায় বসতি করেন।

তোলারামের পুত্রের নাম বসুরাম, তৎপুত্র রঘুরাম, তাঁহার পুত্র কৃপারাম। কৃপারামের প্রথম পুত্রের নাম কৃষ্ণকান্ত, ইনি শ্রীহট্ট জজ আদালতের পেস্কার নিযুক্ত হন। উন্নতির সহিত সেরেস্তাদারের পদ পাওয়ার তাঁহার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মীর মোনশী কৌশলে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, এই অন্যায় কার্য্য দর্শনে তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন, জজ সাহেব তাঁহাকে একাধিকবার নিষেধ করিলেও তিনি তাহা শুনেন নাই। অতঃপর তিনি জয়ন্তীয়া রাজসরকারে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জয়ন্তীয়া-পতির ঋণ হওয়ায় কয়েকটি হাতী বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করিতে ইনি পরামর্শ দেন ও তদনুরূপ কার্য্যের উদ্যোগ করেন। পরে অপরের পরামর্শে হস্তী বিক্রয়ে ঋণ শোধকরা মহারাজ অপমানজনক জ্ঞান করায়, তিনি বিরক্ত হইয়া কার্য্যত্যাগে তথা হইতে আসাম চলিয়া যান। এই সকল ঘটনাতে তাঁহার মানসিক তেজস্বিতর পরিচয় পাওয়া যায়। আসাম গমন করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থিতির পর কোন সদাশয় ইংরেজের সমবিভ্যাহারে তিনি কলিকাতায় গিয়া তত্রত্য ফৌজদারী আফিসে মহাফেজ নিযুক্ত হন। ইনি স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থে মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরে গয়াধামে গমন করিয়া শ্রাদ্ধে প্রভূত ব্যয় বিধান করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোণারাম নাগের পুত্র স্বরূপচন্দ্রের বিবাহ তিনিই অতি সমরোহের সহিত দিয়াছিলেন; ৭৬ বৎসর বয়সে ১২৫১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বরূপচন্দ্র শ্রীহট্ট জজ আদালতের সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে বাড়ীতে দালান কোঠা ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীহট্ট মিশনস্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করিয়া জজ আদালতে মোহরের নিযুক্ত হন ও মহাফেজের কাজ কবিয়া শেষ কালে কাশী গমন করেন; ইহাব পুত্র ও পৌত্রাদি জীবিত আছেন।

পরগণা-সাতগাও
ওম্ বংশ কথা

খোয়াজ ওসমানের কর্ম্মচারী

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে প্রসঙ্গক্রমে লিখিত হয় যে, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের খোয়াজ খাঁ শ্রীহট্টের ইটাবিজেতা খোয়াজ ওসমান খাঁ হইতে অভিন্ন বলিয়া অনুমিত। এই অনুমান যে অমূলক নহে, খোয়াজ কাঁর অধিকৃত মুয়াজ্জমাবাদ রাজ্যের নামের অর্থবিচারেই তাহা বুঝা যায়। ইহার অর্থ পবিত্র স্থান; পূর্ব্ব হইতে হযরত শাহ জলালের সাধন ও সমাধি ক্ষেত্র শ্রীহট্টই মোসলমানদের একমাত্র তীর্থস্থান। মুয়াজ্জমাবাদের সীমা লাউড়রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শ্রীযুক্ত কালীকিশোর ওম মহাশয়ের লিখিত যে বংশ বিবরণ শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার ওম্ মহাশয় আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে বঙ্গীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে খোয়াজ ওসমান খাঁ পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করেন।[১১] ময়মনসিংহের খালিজুরী নিবাসী সাতানাথ ওমের পুত্রের নাম রঘুনাথ; কামাখ্যা ও মহেশনাথ; ইঁহারা খোয়াজ ওসমান খাঁর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রকুমার বাবু লিখিয়াছেন যে এই খোয়াজ ওসমান ৯৬৩ হিঃ অব্দে (১৫৪৪

১১. এই সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে হুসেন শাহ ছিলেন। শেব শাহেব সময়ে ইটা বিজিত হয়।

খৃষ্টাব্দ[১২]) ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তথায় গড় ও বাড়ী প্রস্তুত করেন।

এই যুদ্ধে সীতানাথের পুত্রগণ সহায়তা করায় সাতগাও উপত্যকা প্রদেশে তাঁহারা জায়গীর প্রাপ্ত হন, এবং ময়মনসিংহ পরিত্যাগপূর্ব্বক জায়গীরপ্রাপ্ত ভূমে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া এথায় আসিয়া বাস করেন। সীতানাথের পুত্রত্রয় পরে নবাব হইতে যথাক্রমে চৌধুরী, রায় ও লালা উপাধি প্রাপ্ত হন। সেইই স্থানে কামাখ্যা ও মহেশের কৃত দীর্ঘিকাদ্বয় "কামুরদীঘী" ও "মহেশনাথের দীঘী" নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দত্ত খাঁ খণিত একটি দীর্ঘিকাও সেই স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

সাধক নন্দকিশোর

ওম বংশে ভাড়াউড়ার নন্দকিশোর রায় একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, ইনি শৈব ছিলেন, এবং কামাখ্যাক্ষেত্রের সিদ্ধ মহাত্মা স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে তদানীন্তন কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ড্রমণ্ড তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অতি শীঘ্রই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। তিনি অনেকের নিকট একথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ড্রমণ্ড্ সাহেবকে বলিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে চাকুরী দেওয়াইয়া ছিলেন।

তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই ফলিয়া যাইত, তিনি বাক্যসিদ্ধ ছিলেন। নির্ম্মাইশিবের পূজারী "সিদ্ধা কাশীনাথ" তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।[১৩]

পরগণা–বালিশিরা

তরফদার বংশ কথা

বালিশিরা ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত থাকা কালে, তরফদার বংশীয় উমানন্দ সোম স্বীয় পুরোহিত সহ এদেশে আসিয়া ত্রিপুরাধীপতির আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, তিনি ত্রিপুরাধিপতি হইতে বালিশিরার একাংশ প্রাপ্ত হন। "উত্তর শূর" গ্রাম ঐ অংশে স্থাপিত; উমানন্দ এই স্থানেই বাটী প্রস্তুত করেন। উমানন্দের পুত্র রামানন্দ, তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্র দেবী দশভূজার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, সর্ব্বদা দেবীর পাদপদ্ম তাঁহার চিন্তনীয় ছিল এবং তাহাতেই বিভোর থাকিতেন। ইঁহার কৃত স্বর্গীয় দুর্গাবিষয়ক সঙ্গীত পাওয়া যায়।[১৪] ইঁহার সময়ে উত্তর শূর মোসলমান রাজ্যভুক্ত হয়।

শ্রীচন্দের হরবল্লভ ও শ্যামরায় নামে দুই বংশ প্রবর্ত্তক পুত্র হয়। শ্যামরায়ের পুত্রের নাম রামবল্লভ ও রামভদ্র। বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; বিদ্যাবিনোদ বংশীয় বাণী ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে ইঁহারা বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন। ইঁহারা স্বীয় গুরুদেবকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে গুরুবংশীয় রঘুনন্দন ব্রহ্মচারীর নামে তাহা বন্দোবস্ত হয়।

---

১২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭/৮ অধ্যায়ে টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৪র্থ ভাগে ইঁহার কথা উক্ত হইবে।

১৪. শ্রীচন্দ্র রায়ের কৃত একটি আরতি গান নমুনা স্বরূপ দেওয়া গেল–

"আরতি করি মাগো মুরতি তেরা। রাজ রাজ্যেশ্বরী মন্দিরে মেবা।
ভৃঙ্গারের জলে মায়ের চরণ পাখালে। রত্ন সিংহাসনে বসে চামর দুলাওয়ে॥
কটোরা ভরিয়া মধুভোগ লাগাওয়ে। কর্পূর সহিতে থিলি তাম্বুল যোগাওয়ে।
ভকতি করিয়া কহে শ্রীচন্দ্র রায় হে। কৃপাকরি বৈস মাগো ভজি রাঙ্গা পায়ছে॥"

রামভদ্রের প্রপৌত্র কমলাকান্তও একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, ইনি স্বীয় গুরু জয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারীকে এক জগন্নাথ বিগ্রহ সহ অনেক ভূমি দান করেন; উহা "জয় গোবিন্দের পাট্টা" নামে অদ্যাপি পরিচিত আছে। কমলাকান্তের প্রপৌত্র জীবিত আছেন।

রামভদ্রের ভ্রাতা রামবল্লভের এক মাত্র পুত্রের নাম রমাবল্লভ, ইঁহার রত্নবল্লভ ও সুন্দর রায় নামে দুই পুত্র হয়, সুন্দর রায়ের পুত্রের নাম সুবলচাঁদ। ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষাও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, এই ত্রিবিধ ভাষায় লিখিত অনেক হস্তলিখিত পুঁথি তিনি সংগ্রহ করেন। তিনি "গারুড়ী বিদ্যায়" বিশেষ দক্ষ ছিলেন, সর্পদংষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্রপ্রভাবে বিষধর ভুজঙ্গ তাঁহার সম্মুখে নিস্তেজ ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িত, মন্ত্রবলে তিনি সর্প-ধৃত করিতে সমর্থ ছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠাও অসামান্য ছিল। নির্ম্মাইশিবের পূজক সিদ্ধ মহাত্মা কাশীনাথ ঠাকুর[১৫] "শব সাধনা" কালে ইঁহাকে "উত্তর সাধক" করিয়াছিলেন।

সুবল চাঁদের পুত্রের নাম প্রকাশচন্দ্র, তাঁহার পুত্র শ্রীযুত শৈলজা চরণ সোম তরফদার হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্ররায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হরবল্লভের বংশীয়গণও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

পরগণা-ভাটেরা

চৌধুরী বংশ কথা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে আমরা ভাটেরার তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছি, তত্রত্য দেবচৌধুরী বংশীয়গণ ভাটেরার "হোমেরটীলা" ইত্যাদি স্থানেব অধিকারী। এই স্থানে "রাজবাড়ীর টীলা", "ইটের টীলা" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে যে সকল শৈল খণ্ড আছে, তন্মধ্যে ইটের টীলাতেই সেই তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল;[১৬] হোমেরটীলা তাহার প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। তাম্রফলক প্রথমতঃ তত্রত্য দেববংশীয় কাশীচন্দ্র চৌধুরীর হস্তগত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগচ্চন্দ্র দেব চৌধুরীই কাশীচন্দ্র চৌধুরীর হস্তগত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগচ্চন্দ্র দেব চৌধুরীই উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। এই অতি প্রাচীন তাম্রফলকদ্বয় উক্ত কাশী চন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দেব চৌধুরীর নিকট আছে।

যাহা হউক, ভাটেরায় "রাজবাড়ী" "সাতপারি পুষ্করিণী" "বড় পুকুর" "দববারি গোল" ইত্যাদি নামে পরিচিত কয়েকটি স্থান আছে। সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত স্থানীয় প্রবাদমূলে এই স্থানে গৌড়গোবিন্দ রাজার বাড়ী ছিল।[১৭]

বিভিন্ন স্থানে গৌড় গোবিন্দের সম্বন্ধ

এক স্থানের কোন একটা প্রধান ঘটনাকে স্থানান্তরের অপর প্রধান ঘটনা সহ জুড়িয়া দেওয়ার উদাহরণ আমরা বহুস্থানে পাইয়াছি, এই ইতিবৃত্তেই পাঠক তাহা স্থানে স্থানে পাইবেন।

---

১৫. ইঁহার কথা পরবর্ত্তী ৪র্থ ভাগে কথিত হইবে।

১৬. ইটের টীলায় পূর্ব্বাবধি ইষ্টক দৃষ্ট হইত, অথবা খননে ইষ্টক বহির্গত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ইহার এই নাম হইয়া থাকিবে। হোমের টীলায় তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বে অযথা লিখিত হয়।

১৭. আসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে ভাটেরার তাম্রফলক সহ গৌড় গোবিন্দের সম্বন্ধ থাকার বিষয় ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র বর্ণন করিয়া যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন, জনসাধারণে প্রচলিত ভাটেরায় গৌড় গোবিন্দ সম্বন্ধীয় এই জনশ্রুতিই সম্ভবতঃ তাহাব মূল।

ভাটেরায়ও যে গৌড়গোবিন্দের সম্বন্ধ তদ্রূপেই সূচিত না হইয়াছে এমন বলা যায় না। পরন্তু গৌড়গোবিন্দের সময়ে এস্থানেও শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, হয়তঃ তখন এই স্থানে তাঁহার রাজকীয় কোন কার্য্যালয়াদি অবস্থিত ছিল, এস্থানেও হয়ত তিনি আসিয়া "দরবারি গোল" ইত্যাদি বিশিষ্ট নামে কোন কোন স্থান খ্যাত হইয়াছে।

গৌড় গ্রাম ও সাতপারি দীঘী

গৌড়গোবিন্দের রাজকীর্ত্তি শ্রীহট্ট শহর ব্যতীত অন্যত্র যে ছিল না, তাহা নহে। বিশ্বনাথ থানার এক মাইল উত্তরে "গৌড়গ্রাম" নামে এক পল্লী আছে, এই স্থানে গৌড়গোবিন্দের এক বাটিকা ছিল, তাহাতেই সে স্থান গৌড়গ্রাম নামে খ্যাত হইয়াছে। রাজবাটির ভগ্নাবশেষের পরিচিহ্ন গৌড়গ্রামের অতীত কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সে স্থানেও রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকে এক "সাতপারি দীঘী" আছে। দীঘীর মধ্যস্থলে মাস্তুলের মত বৃহৎ একটা স্তম্ভ (জলের ৩/৪ হাত উপরে উত্থিত ভাবে) দেখিতে পাওয়া যায়। ২/৩ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিলে উহা কিঞ্চিৎ উত্থিত হয়, ছাড়িয়া দিলে আবার ঝনঝনারবে পড়িয়া যায়। এই স্তম্ভ সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত। কোনও মতে ইহা জলের পরিমাপক দণ্ড, কোন মতে বা মোসলমান আক্রমণ কালে গৌড়গোবিন্দ তত্রত্য রাজবাটীস্থ তৈজসপত্র ও ধনাদি নৌকাপূর্ণ করিয়া এই দীর্ঘিকায় ডুবাইয়া রাখেন, এ স্তম্ভ নৌকারই মাস্তুল। বস্তুত এ স্তম্ভ সম্বন্ধে ভিত্তিবিহীন অলীক নানা কাহিনী কথিত হয়।

জনশ্রুতি যে, গৌড়গোবিন্দ কখন কখন গৌড়গ্রাম রাজবাটিকাতে আসিয়া বাস করিতেন, তাঁহার এক কন্যা একদা এদেশ প্রচলিত "মাঘব্রত" করিয়া "দেউল" বিসর্জ্জন কালে একটি নূতন পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন; ঐ পুষ্করিণী-পারে যে গ্রাম বসিয়াছে, তাহার নাম দেউলগ্রাম। তথায় আরও ৪/৫টি পুষ্করিণী থাকায় সে স্থানে যে একদা সমৃদ্ধিশালী লোকের বাস ছিল, তাহা বুঝা যায়। বিশ্বনাথের পূর্ব্বদক্ষিণে দেড় মাইল দূরে "রাজবাড়ী" বলিয়া আর একটা স্থানও আছে।

ভাটেরার সাতপারি দীঘী ও বিশ্বনাথের সাতপারি দীঘী একই গৌড়গোবিন্দের কীর্ত্তি বলিয়া প্রচারিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহার মূলে সত্য থাকিতেও পারে, অথবা অপরের কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ গৌড়গোবিন্দের নামে প্রখ্যাপিত হইতেও পারে। দীঘী প্রভৃতির অবস্থা পর্য্যালোচনায় তাহা শাহ জলালের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় না।

এক প্রাচীনের উক্তি

যাহা হউক, যখন ভাটেরার তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তৎকালে যোগী জাতীয় বৃদ্ধ শম্ভুনাথ প্রকাশ করে, সে তাহার পিতামহের মুখে শুনিয়াছিল যে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে যে এক রাজ বংশ ছিল, ত্রিপুররাজের আশ্রিত কুকিগণ রাত্রিতে আসিয়া রাজবাটী আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার অধিকাংশ লোককে নিহত করে, রাজপুত্র পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। ভাটেরার দেব-চৌধুরীবর্গ সেই বংশীয়।

যদি শম্ভুনাথের উক্তি সত্য হয়, তবে দেববংশীয়গণই তখন "রাজা" বলিয়া উক্ত হইতেন। "দরবারি গোল" ইত্যাদি জনশ্রুতির[১৮] বিবরণ হইতে যে রাজৈশ্বর্য্যের পরিচয় মিলে, তাহাতেও

---

১৮. কথিত আছে যে এই স্থানে রাজগণ দরবার করিতেন। পরবর্ত্তী অধ্যায় কথিত ইসমাইল পুরের উত্তরাংশে গাজীপুরে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে কয়েকটি বিদ্রোহী তথাকার এক তেতুলতলে অবস্থিতি করায় উহার নাম "দরবারী তেতই গাছ" হইয়াছিল। এখন গাছ নাই কিন্তু সেই স্থানটি "দরবারী তেতইয় তল" বলিয়া খ্যাত আছে। মামলা মোকদ্দমা হইতেও স্থানাদি "দরবারী" নামে খ্যাত হইবার বহু উদাহরণ আছে।

এই পরবর্ত্তী "রাজগণ" যে বিশেষ প্রতাপান্বিত ছিলেন এমন বোধ হয় না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাম্রফলকের খরবাণ দেব বংশ সহ (শম্ভুনাথ কথিত) এই রাজগণের সম্বন্ধ ছিল কি না?

তাম্রফলকের দেবোপাধি কি জাতি বাচক?

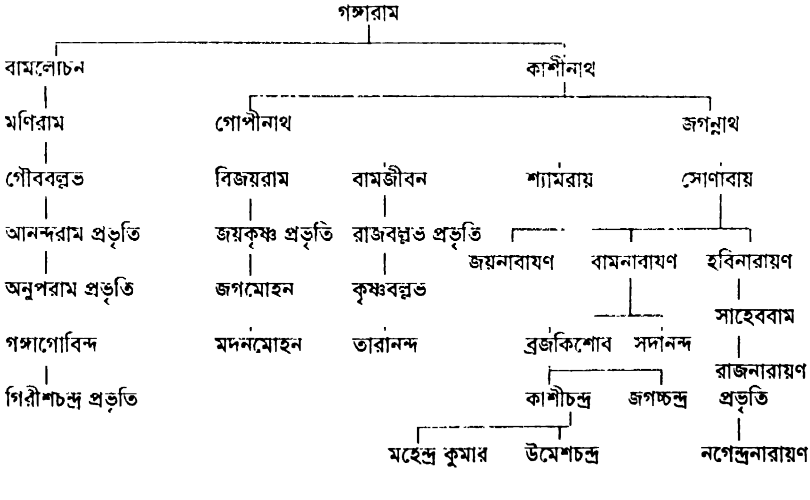
তাম্রফলকের খরবাণ দেব-বংশজদের ভূদান বৃত্তান্ত পূর্ব্বাংশে যথাস্থানে বলা গিয়াছে। যে কোন স্থানের যে কোন বংশীয় রাজগণ যথায় তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন, তৎস্থলেই তাম্রশাসনে তাঁহাদের নামে দেবোপাধি থাকা দৃষ্ট হয়, সে দেবোপাধি জাতিবাচক বোধ হয় না। এইরূপ গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনেও দেবোপাধি গৃহীত হইয়াছে। (যথা–"ধর্ম্মপাল দেবঃ" (খৃঃ ৮ম শতাব্দীর) "মহীপাল দেবস্য" (খৃঃ ১০ম শতাব্দী)। এমন কি, ত্রৈপুর নৃপতিগণের প্রদত্ত সনন্দাদিতেও তাঁহাদের নামে দেবোপাধি গৃহীত হইতে দেখা যায়। তদবস্থায় খরবাণ বংশীয় কেশব বা ঈশান দেবের তাম্রশাসনের দেবোপাধি তদ্রূপ, না জাতিবাচক?–পাঠক ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেন।

আমরা ভাটেরার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব চৌধুরীর লিখিত তত্রত্য দেবচৌধুরীদের যে বংশ তালিকা ও বিবরণ পাইয়াছি, তাহাতে ৮ম পুরুষ উর্দ্ধকালবর্ত্তী গঙ্গারাম দেব চৌধুরী হইতেই নামাবলী লিখিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই এই চৌধুরীদের বংশ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই চৌধুরী বংশীয়গণ খরবাণ বংশ সহ ইদানীং আপনাদের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতেছেন। আমাদের প্রাপ্ত ভাটেরার চৌধুরীবংশের বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে, ভাটেরায় একসময় ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়, তাহাতে চৌধুরী বংশীয় একটি শিশু ব্যতীত ঐ বংশীয় অপর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, এজন্য তাঁহাদের গোত্রাদি পূর্ব্বে কি ছিল এবং পূর্ব্ব বিবরণেই বা কি, তাহা বিস্মৃতির অন্ধকারময় গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে। ঐ বিবরণে আরও লিখিত হইয়াছে–"তাম্রফলকে লিখিত রাজবংশ অতিপুরাকালবর্ত্তী হইলেও, দুই এক শতাব্দী নহে, বহু শতাব্দী ধরিয়া তিষ্ঠিয়াছিলেন।" এমতে কাজেই সেই "পুরাকালবর্ত্তী" বংশ সহ বর্ত্তমান দেববংশের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে; ইহারা সেই খরবাণ বংশীয় বলিয়াই দেবপদবি বিশিষ্ট।

বংশাখ্যান–পূর্ব্বোক্ত গঙ্গারামের[১৯] কাশীনাথ ও রামমোহন নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে

১৯. বংশ তালিকার একাংশ এইঃ–



কাশীনাথের গোপীনাথ ও জগন্নাথ নামে দুই পুত্র হয়। গোপীনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার এক স্ত্রী শ্রীহট্টের নবাব হইতে জীবিকানির্ব্বাহার্থ তিন হাল জমি ও বার্ষিক ১২ কারণ কৌড়ির বৃত্তি প্রাপ্ত হন।[২০]

গোপীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামরায়ের বিধবা স্ত্রীর নাম সংসৃষ্ট একখানা সনন্দও পাওয়া গিয়াছে। গোপীনাথের স্ত্রী ও শ্যামরায়ের স্ত্রী, এই উভয়ে নবাব নজীব আলী খাঁ বাহাদুর হইতে ভরণপোষণের জন্য ৪/।০ ভূমি প্রাপ্ত হন।[২১]

দশসনা বন্দোবস্তকালেও শ্যামরায়ের ভ্রাতা সোণারায়ের নামে ভাটেরার ১নং তালুকের নামকরণ হয়। সোণারায় বহুদিন পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। ভাটেরা হইতে আমরা দেববংশের যে বিবরণ পাইয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে একদা জনৈক সন্ন্যাসী সোণারায়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; সন্ন্যাসী যাওয়াকালে সোণারায় উক্ত সন্ন্যাসীর অনুসরণ করেন। কিছু দূর গেলে সন্ন্যাসী পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তাঁহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলেন—"তোমার পাঁচটি পুত্র জন্মিবে।" কালক্রমে প্রকৃতই তাঁহার পাঁচটি পুত্র জাত হয়।[২২] সোণারায় ভাটেরার পূর্ব্ব প্রান্তে একটা ফলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন; ইহার চারিদিকে

"খোদ" ছিল, জলনিঃসারণ জন্য তাহা হইতে একটা নালা কানাই নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছিল।

সোণারামের পৌত্রের নাম সদানন্দ; ইনি শহরে থাকিয়া মোক্তারি করিতেন। শ্রীহট্টের সুবিখ্যাত "বাবু" মুরারি চাঁদ রায়ের আম-মোক্তার ছিলেন। স্বীয় ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক নৌকা পূজা করিয়াছিলেন। বাবু মুরারি চাঁদের মৃত্যু হইলে ইহারই মন্ত্রণা ও পরিচালনায় মাত্র তিন দিন সময় মধ্যে বহুল দ্রব্য সম্ভারে আয়োজিত হইয়া মহাড়ম্বরে বহুব্যয়সাধ্য দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল।

ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজনারায়ণ জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই শ্রীহট্টের পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু বিষয়কার্য্যের অনুরোধে পরে তাহা ত্যাগ করিতে হয়।

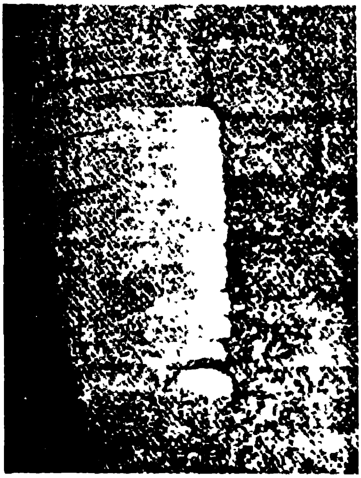
ঘিলাছড়া পরগণায় যে মোসলমান চৌধুরী বংশ আছেন, ভাটেরার চৌধুরীদের সহিত তাঁহাদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। এই উভয় স্থানের চৌধুরীরা পূর্ব্বে এক বংশসম্ভূত ছিলেন; ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন।

২০. সনন্দের মর্ম্মঃ— ভাটেরার মৎসোদ্দিয়ান, চৌধুরীয়ান ও কানুনগোয়ানকে জানান যায় যে গোপীনাথ চৌধুরীর যে বিধবা নিঃসন্তান বটেন, তাঁহার জীবিকার উপায় না থাকায় তাঁহাকে তিন হাল জমি ও ১২ কাহন কৌড়ির বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া গেল। তিনি দখল পাইয়া প্রতিবৎসর সনন্দ গ্রহণ করেন ও খোদার নিকট বাদশাহী চিরস্থায়ী হইয়া রহিতে প্রার্থনা করিতে রহেন। তারিখ ২৬ জলুস।

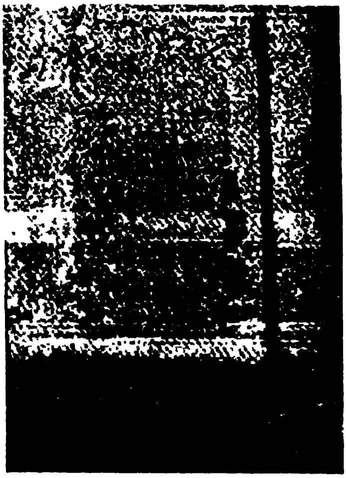
২১. এই সনন্দে ভাটেরার মৎসোদ্দিয়ান, চৌধুরীয়ানকে জানান হইয়াছে যে মৃত গোপীনাথ ও শ্যামরায় চৌধুরী নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহাদের বিধবা রাখিয়া মারা যান; এই দুই বিধবার জীবিকার উপায় না থাকায়, "পরগণা মজকুর হইতে চাইব কুবলা দুফস্‌লা জমিন খুরাকীর" জন্য দেওয়া যায়। উচিত যে তাহাদিগকে উক্ত ভূমে দখল দেওয়া হয়। রাজস্ব ও জরিপ গয়রহের কর মাপ করা যায়। তাহারা প্রতিবৎসর নূতন সনন্দ লইবেন। উচিত যে খোদার নিকট বাদশাহী চিরস্থায়ী থাকার প্রার্থনা করিতে রহেন।

এতদ্ভিন্ন "মাইজ গ্রাম পাটকস্থ শ্রীধনঞ্জয় সকাসাৎ সপ্ত সপ্ততি পণান গৃহীত্বা দাস গুপ্ত কেন তালুক বিক্রিতেতি" পাঠ ও বিবরণ যুক্ত সন ১০৭০ তারিখ যুক্ত একখানা কেবালা পাওয়া গিয়াছে। এই কেবালা দেববংশের অধিকৃত ভূসম্পর্কীত না কি?

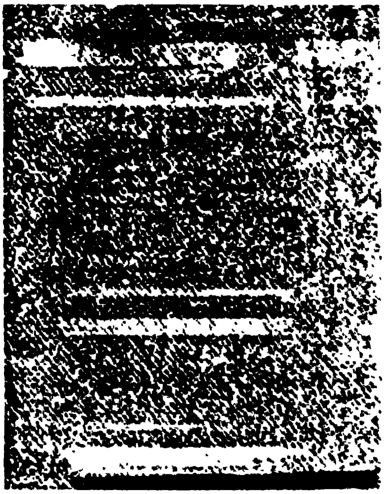
২২. এই পঞ্চমুদ্রা কোন বাদশাহের সময়ের অথবা কোন রাজার মুদ্রিত, তাহা জানিতে পারি নাই।



(১) ভাটেরার চৌধুরী বংশীয়া মহিলার প্রাপ্ত সনন্দের সম্মুখ লিপি



(২) ভাটেরার চৌধুরী বংশীয়া মহিলার প্রাপ্ত সনন্দের পৃষ্ঠ লিপি



শম্ভুদাসের ভূ-বিক্রয় পত্র

পরগণা-লংলা

কানুনগো বংশকথা

পরগণা লংলার অন্তর্গত হিঙ্গাজিয়ার কানুনগোদের বংশাবলিতে লিখিত আছে যে রাঢ়দেশে ঢাকা নামে এক পল্লী আছে, সেই পল্লী হইতে রঘুনাথ মিত্র, নিজপুত্র সুরানন্দকে লইয়া শ্রীহট্ট জেলায় আগমন করেন। সেই সময়ে এতদঞ্চলে ত্রৈপুর নৃপতি যশোধর মাণিক্য ও গোবিন্দ মাণিক্যের বিশেষ প্রভাব ছিল।[২৩]

রঘুনাথ ও সুরানন্দ উভয়েই কৃতীপুরুষ ছিলেন, জীবিকানির্ব্বাহের উদ্দেশ্যই তাঁহারা এদেশে আগমন করেন। ইঁহারা শ্রীহট্টে আসিলে "বিষয় পাইয়া" লংলার হিঙ্গাজিয়া গ্রামে বাস করেন। এই "বিষয়" যে কি তাহা স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহা রাজকীয় কোন ধর্ম্ম ও তৎসংসৃষ্ট জায়গীর হইবে।

সুরানন্দের পুত্র বাসুদেব, তৎপুত্র যদুনন্দন। ইঁহার মহেশ ও হরিনামে দুই পুত্র হয়। তন্মধ্যে মহেশ কন্দর্প রায়ের নামে খ্যাত হন। হরির রাজদত্ত উপাধি "রূপসখাঁ"। কন্দর্প রায়ের পুত্র রামভদ্র, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র, ইঁহার পুত্রের নাম রামচন্দ্র; ইনি এইবংশে এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

রামচন্দ্র শ্রীহট্টের নবাব ফরহাদ খাঁ বাহাদুরের অধীনে একটি কাজে ছিলেন। একখানা সনন্দে তাঁহার কানুনগো খ্যাতির উল্লেখ আছে।[২৪] তিনিই বোধ হয় এই বংশে কানুনগো দস্তখত প্রাপ্ত হন। একখানা ভূমি বিক্রয় পত্রে দেখা যায় যে তিনি ১০৮৪ সালে "চতুর্থ কার্যাপন" মূল্যে নিজ গ্রাম হইতে সাত কেদার ভূমি বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই দলিল খানা ২৪৩ বৎসরের প্রাচীন।[২৫]

---

২৩. আমাদের প্রাপ্ত বিবরণী যশোমাণিক ও গোবিন্দ মাণিককে "হেড়ম্বেশ্বর" বলিয়া লেখা হইয়াছে। আমরা ইহাদিগকে ত্রৈপুর নৃপতি বলিয়াই অবধারণ করিয়াছি। প্রথমতঃ হেড়ম্বেশ্বগণের "মাণিক্য" উপাধি নহে, তাঁহাদের উপাধি "নারায়ণ"। এবং ঐ নামে হেড়ম্বে কেহ রাজা ছিলেন না। পক্ষান্তরে ত্রৈপুর রাজবংশ তালিকাতে (ঐ তালিকা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়োল্লিখিত ক পরিশিষ্টে) দৃষ্ট হইবে যে অমর মাণিক্যের পৌত্রের নাম যশোধর মাণিক্য; এবং ইঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম গোবিন্দ মাণিক্য ছিল। ইঁহাদের সময়ে বর্ত্তমান কাছাড়ের হেড়ম্বের দক্ষিণাংশ ত্রিপুরার অন্তর্গত থাকা অসম্ভব নহে

২৪. রামচন্দ্রের পৌত্র জগৎবল্লভ ও প্রপৌত্র রামপ্রসাদের যুক্ত নামীয় কানুনগো পদের সনন্দে রামচন্দ্রের কানুনগো পদের উল্লেখ আছে।

২৫. "শ্রীশ্রীমতাং সুলতান আরঙ্গসাহা বাদশাহা স্বস্তি চতুবাশীত্যুত্তর সহস্রাব্দে ফাল্গুনস্য অষ্টাবিংশতি দিবসে স্বগীয় পাদপদ্মনামভ্যুদয়িনি বাজ্যে গৌড়াঙ্গাধিপতী শ্রীযুক্ত সাইস্থা খান মহোগ্রপতাপেসু শ্রীহট্টাবৃতে সুবেশ্বর শ্রীযুত ফহ্রাদ খাঁন মহাশয় নিজ জায়গিরি মধ্যে ওজির শ্রীযুত আতিক উল্লাজউ বিষয়িনী মিক লঙ্গলা চত্তরকান্তর্গত হিঙ্গাজিয়া গ্রাম পাটকস্থ শ্রীরণজিন খাঁ সকাশাত চতুর্থ কার্য্যপনান গৃহিত্বা শ্রীরামচন্দ্র রায়সা নিজ মিরাস মৌজে হিঙ্গাজিয়া গ্রাম সম্বন্ধি সপ্তকেদার পরিমিতা বাটিকা সহ ভূমি বিক্রিতেতি। অজমাল ৪ চাইর কাহন ভূমি বাড়ী-সাত কেদার ইনি সত ১০৮৪ সাল ২৮ ফাল্গুন ৯ জিনহেজ।

অত্র চতুসীমরা-

পশ্চিমে মুকুনির খাঁ পুকরির পূর পারের খাল-দক্ষিণে নিজ বাড়ীর খাল-পূর্ব্বে জাঙ্গাল উত্তরে হাড়িপার খাউরির পুকুরির উত্তরপার উত্তর নালে।"

এই দলিলের উপরে একটি পারস্য মোহর আছে; তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পারস্য দস্তখত দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে-"শ্রীরামচন্দ্র রায়স্য" ইতি দস্তখত। এবং বাম পার্শ্বে "উভয়ানুমতা শ্রীগোবিন্দদাসকেন লিপি" এই কথাগুলি লিখিত, অর্থাৎ ইহাই লেখকের দস্তখত। দলিলের পৃষ্ঠদেশে "উগাহি" "ধনঞ্জয় মিত্র, গঙ্গা হরিদাস" প্রভৃতি ১০ ব্যক্তির নাম এবং "হস্যাদি" উল্লেখে "পুরুষোত্তম শর্ম্মা" নামটি এবং "সাক্ষি" উল্লেখে "বামদেব শর্ম্মা"র নাম আছে। তদ্ব্যতীত পৃষ্ঠদেশেও দুইটি পারস্য দস্তখত আছে।

দলিল খানা যেমন লিখিত, বর্ণাশুদ্ধি সহ অবিকল তদ্রূপই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রামচন্দ্রমিত্র কানুনগো ছিলেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ নামে তিন পুত্র হয়। রামচন্দ্রের অবর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণবল্লভ কানুনগো নিযুক্ত হন। প্রাণবল্লভের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জগদ্বল্লভ "সরবরাহির" অনুপযুক্ত ছিলেন।

হরিবল্লভের পুত্র রাজবল্লভ (জগদ্বল্লভের খুল্লতাত ভ্রাতা) তখন নিজ পুত্রের নামেই সরবরাহি প্রার্থনা করেন এবং তাহাতে তৎপুত্র রামপ্রসাদ কানুনগোই সনন্দ প্রাপ্ত হন। এ সনন্দ যে ইংরেজ আমলের নিযুক্ত নবাব প্রদত্ত, সনন্দেই তাহার নিদর্শন আছে।[২৬] রাম প্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ তৎপুত্র শ্রীযুত কুঞ্জগোবিন্দ মিত্র কানুনগো বর্ত্তমান আছেন।

এ বংশের ইষ্টদেবতা স্বর্গীয় বাসুদেবের "সেবায় ব্যয় বাবত" পূজক গঙ্গারামের নামে দুইখানা (নং ১১০/১১১) সনন্দে যথাক্রমে ১৮ টাকা ও ১০ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর ছিল। গঙ্গারামের পুত্র ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা আদায় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা রহিত হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত জগদ্বল্লভের পুত্র খুশাল রায় এবং তৎপুত্র রাধাগোবিন্দের যুক্ত নামে তালুক আছে। রমা প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাপ্রসাদের প্রপৌত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরু প্রসাদ মিত্র হইতে আমরা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রাপ্ত দলিলাদির নকল ও বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

---

২৬. সনন্দের মর্ম্মানুসারে ইহা লিখিত হইল, বাহুল্যবোধে বৃহৎ পারস্য সনন্দের বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল না; সানন্দে "তপ্পে ইজ্জতাবাদ ও তপ্পে উত্তরভাগ মোতালিকে পরগণে লংলা'র কানুনগো পদের লিখিত আছে; ৩৩ জলুসে উক্ত সনন্দ প্রদত্ত হয়।

নবম অধ্যায়
মোসলমান বংশ বিবরণ

পরগণা-লংলা

আদি কথা

বর্ত্তমানে শ্রীহট্টের জমিদারবর্গ পৃথিমপাশার জমিদারের সম্পত্তিই আয়-বহুল ও বৃহৎ। "সন ৯০৬ বঙ্গাব্দের শেষভাগে পারস্যদেশীয় রাজপরিবারস্থ্ জনৈক মহাত্মা সংসারধর্ম্মে বীতস্পৃহা হইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষের অন্তর্গত দিল্লী মহানগরীতে উপস্থিত হইলে তৎকালীন লোদিবংশীয় সম্রাট উপরোক্ত মহাত্মার আদিবৃত্তান্ত এবং সংসারধর্ম্মে অনস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে এবং যাহাতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সুখ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদুপযোগী জায়গীর প্রদান করিলেন। সম্রাটের অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া এই মহাত্মা সকিসালামত শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত লংলা পরগণার পৃথিমপাশা মৌজাতে (সম্রাটপ্রদত্ত জায়গীর ভূমে) বাস করিতে থাকেন। উক্ত মৌজার অনতি দূরবর্ত্তী রাজনগর মৌজার রাজকন্যার ভুবনমোহন রূপলাবণ্যে মাহাত্মা সকিসালামত বিমোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তাব করে ।

তদনুসারে যথা সময়ে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়াতে অতিসুখে মনের আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।"[১]

সন্তান সন্তুতি

এই কন্যা ইটার রাজভ্রাতা, পলায়িত বীরচন্দ্র নারায়ণের দুহিতা, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।[২] এই কন্যার গর্ভে এক পুত্র জাত হয়, তাঁহার নাম খাঞ্জা খাঁ। পিতার মৃত্যুর পর খাঞ্জা খাঁ দক্ষতার সহিত জায়গীর শাসন করেন ও সম্পত্তির উন্নতি সাধন করেন। খাঞ্জা খাঁর পুত্রের নাম শামস্ উদ্দীন।

"ঐ শামস উদ্দীন ১০৩০ বঙ্গাব্দ হইতে প্রশংসার সহিত সুখে কাল যাপন করেন। শামস্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র[৩] মোহাম্মদ রবি পিতৃসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া সুকৌশলে রাজ্যশাসন করিতে ছিলেন।" মোহাম্মদ রবি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি মৌলবী উপাধি লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন।

---

১. উদ্ধৃত অংশে সব শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত "আলী আমজদ খাঁর জীবন চরিত" পুস্তক হইতে গৃহীত।

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায় এবং ৩য় ভাগ ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায় "বীর নারায়ণ সংবাদ" দ্রষ্টব্য। ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে এতদ্ব্যতীত সকি সালামত অন্য এক বিবাহ করিয়াছিলেন।

৩. শামস উদ্দীন ১০৩০ সালের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান দৃষ্ট হইবে যে, মোহাম্মদ রবি ১১৪১ সালে প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন, এ উভয় সময়ের (১১৪২-১০৩০=) মধ্যে ১১১ বৎসর ব্যবধান। পিতাপুত্রে এ ব্যবধান হইতে পারে। কিন্তু ১০৩০ সালেই শামস উদ্দীন "প্রশংসিত" হন, তখন তিনি তরুণ বয়স্ক; এবং তাঁহার পুত্র রবি বৃদ্ধ বয়সেই (১১৪১ সালে) সনন্দ পাইয়া থাকিবেন। ফলে এই দীর্ঘজীবী (পীর) বংশে পিতাপুত্রের মধ্যে তাহাতেই সময়ের এরূপ তফাৎ থাকা অসম্ভব না হইতে পারে।

'একদা মোহাম্মদ রবি নবাব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নবাব বাহাদুর মোহাম্মদ রবি খাঁর সৌজন্যে পরিতুষ্ট হইয়া ++ ++ ++ তাঁহাকে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের শিক্ষকতাকার্য্যে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তিনি নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র নিবাইস মোহাম্মদ ও জৈন উদ্দীনের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি নবাবকর্তৃক "দানীশমন্দ" নামে খ্যাত ও "খাঁনবাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

দানীশমন্দের অদ্ভুত ধৈর্য্য

দানীশমন্দ অভিধা প্রাপ্তির বিষয়ে এক জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে, একদা তাঁহার জামার ভিতরে একটা বৃশ্চিক, কোনরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি ইহা বুঝিতে না পারিয়া সেই জামা পরিধান পূর্ব্বক নবাব-দরবারে গমন করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করে, জ্বালায় তিনি যত অঙ্গ-সঞ্চালন করেন, বৃশ্চিক ক্রোধে ততই দংশন করিতে থাকে। তীব্র দংশন জ্বালা অসহ্য হওয়ায়, তাঁহার মুখমণ্ডল জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইল, কিন্তু দরবারের কায়দা-ভঙ্গ ভয়ে তিনি দরবার ভঙ্গের পূর্ব্বে উঠিতে ইচ্ছা করিলেন না; বিনানুমতিতে এরূপ চলিয়া যাওয়া রীতি বিরুদ্ধও বটে।

রবির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িল, তিনি কিছু না বলিলেও স্বয়ং নবাবও ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং তাঁহার বর্ণ বৈলক্ষণ্যের কারণ কি, জিজ্ঞাসিলেন। নবাবের প্রশ্নে রবি বিনম্রভাবে বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

নবাব রবির ধৈর্য্যের ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিদায় দিলেন ও হেকিমকে ঔষধ প্রয়োগের অনুমতি দিলেন। এই অতুলনীয় ধৈর্য্যের জন্য রবি যে শুধু দানীশমন্দ নামে সম্মানিত হইলেন তাহা নহে, তাঁহার এতাদৃশ ধৈর্য্য কেবল মহৎ ব্যক্তিতেই সম্ভবে ভাবিয়া নবাব তাঁহাকে বহুতর জায়গীর দানে পুরস্কৃত করেন বলিয়া কথিত আছে। বৃশ্চিক দংশন-জনশ্রুতি কতদূর সত্যমূলক জানিনা, কিন্তু দানীশমন্দ খাঁর প্রাপ্ত এই সকল জায়গীর ভূমিতে কোনরূপ কর নির্দ্দিষ্ট ছিল না জানা যায়। পরে ইংরেজ আমলে কর অবধারিত হইয়াছে। এই সকল জায়গীরের জন্য দানীশমন্দ প্রথমে "১১৪১ সালে" সনন্দ প্রাপ্ত হন। তৎপরে অবশিষ্ট ভূমি নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর মোহরাঙ্কিত সনন্দে "১১৫৬। ১১৫৮ বাং অব্দে" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলীবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পরে তিনি দেশে আগমন করেন।

দানীশমন্দ খাঁ স্বদেশে সৎকীর্ত্তি সংস্থাপনে সমুৎসুক ছিলেন, তিনি দেশে মসজিদ, মদরসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মীর জাফরের জামাতা মীর কাশেম খাঁ এই সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকে যে বৃহৎ জায়গীর দান করেন, তাহার নিদর্শন শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে রহিয়াছে।[৪] তদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের ফৌজদার নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ বাহাদুর হইতেও তিনি অনেক ভূমি "মদতমাস" স্বরূপ প্রাপ্ত হন।[৫]

---

৪. ২ জলুস ১০ রমজান তারিখযুক্ত এক সনন্দে নং (৬০৬) "খরচ মসজিদ খানা মুদবসা" বাবদে মীবকাশেম খাঁ বাহাদুর তাঁহাকে লংলা পবগণা হইতে ৩৮৫ ভূমি পাথারিয়া হইতে ৪৬০/ ভূমি ও কাণিহাটী হইতে ২০০/০ হাল, মোট ১০৪৫/১২৪ ভূমি দান করেন। উক্ত নবাব বাহাদুর ঐ সনেই অন্য এক সনন্দে (নং ৬০৯) তাঁহাকে ইটা, শমশের নগর, চাপঘাট ও ইছাকলস পরগণা হইতে আরও ১৩৪/ ভূমি প্রদান করেন।

৫. শ্রীহট্টেব উক্ত নবাব এক সনন্দে (নং ৬০৭) ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বাজনগর, কর্ম্মধা; মুকুন্দপুব হইতে তাহাকে ৮৭৫/০ হাল ভূমি মদতমাস স্বরূপ দান করেন; ঐ সনেই অন্য এক সনন্দে (নং ৬০৮) তিনি লংলা ও কর্ম্মধা হইতে আও ১০০/০ হাল ভূমি মদতমাস প্রাপ্ত হন।

উদ্ধৃত চারি সনন্দেব মর্ম্ম শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে রক্ষিত সনন্দের নকল হইতে গৃহীত।

দানীশমন্দ দেশে নিজ নামে একটি বাজার বসাইয়াছিলেন, "রবির বাজার" নামে খ্যাত উক্ত বাজার এখনও আছে। ১১৮১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

"এইরূপ নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান রাখিয়া সুখ্যাতির সহিত নবাব প্রদত্ত জায়গীর ভোগ করতঃ মোহাম্মদ আলী খাঁ নামে একটি সুযোগ্য পুত্র রাখিয়া দানীশমন্দ পরলোক গমন করিলে" উক্ত মোহাম্মদ আলীই সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হন। মোহাম্মদ আলী পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই (১১৭৯ বাংলায়) শ্রীহট্টের সদরে নায়েব কাজির পদ প্রাপ্ত হন এবং ৩/৪ বৎসর সদরে কার্য্য করিয়া তরফের কাজির পদে অধিষ্ঠিত হন।

"১১৯৯ বাংলার মৌলবী মোহাম্মদ আলী খান নাগা ও কুকিদের বিদ্রোহ" দমনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। "ইহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও তৎকালীন সম্রাট (২য়) শাহআলম বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিনা পাশে বন্দুক ব্যবহার করিতে ও কতক সৈন্য রাখিতে অনুমতি দেন এবং আরও কতক জায়গীর পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। ১২২৫ বাং অব্দে ঐ জায়গীর মধ্যে কতক বাজেয়াপ্ত হইয়া কর ধার্য্য হয়।"

গৌস্ আলী ও তৎপরবর্ত্তিগণ

ইঁহার পুত্র মৌলবী গৌস্ আলী খাঁ। ইনি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট হইতে হাল ভূমি নিষ্কর বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের বিদ্রোহিগণ লংলায় উপস্থিত হইয়া ইঁহার নিকট হইতে রসদ আদায় করিয়া লইয়াছিল।[৬] এইজন্য গৌস্ খাঁকে পশ্চাৎ নির্দ্দোষিত প্রমাণ দিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

মৌলবী গৌস্ আলী খাঁ অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন দুরভিসন্ধিজনিত দোষ-সংসৃষ্ট ছিলেন না। বিচারের দিন সহস্র সহস্র প্রজা শ্রীহট্ট শহরে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহারা উৎকণ্ঠার সহিত আদেশ শুনিতে অপেক্ষা করিতেছিল। পরে তিনি নির্দোষ প্রতিপন্ন হইলে তাহারা উৎফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিয়াছিল।

ইঁহার পুত্রের নাম আলী আহম্মদ খাঁ। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের লুশাই সময়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীহট্ট শহরে তাঁহার নির্ম্মিত চারিটি পাকা কুঠি ছিল, বিগত ভূকম্পে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

একদা ত্রিপুরার মহারাজ সহ সাক্ষাৎক্রমে তিনি মহারাজকে বহুমূল্য এক ছুরিকা উপহার দিয়াছিলেন। মহারাজও তাঁহাকে আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিনি হস্তীখেদা করিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন; এতদুপলক্ষে প্রতাপগড় গমনকালে তিনি জফরগড়ের স্বগীয় মোহাম্মদ আরশদ চৌধুরী ও মৈনার স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া প্রতাপগড়ের পাহাড়ে গমন করেন। ঐ সময়ে আকস্মিক কারণে উক্ত গৌরচন্দ্র চৌধুরী হইতে তিনি পঞ্চশত মুদ্রা উপস্থিত ব্যায়ার্থ আনয়ন করেন, পরে তাহা পরিশোধিত হয়। এই সময়েই তৎকর্ত্তৃক জফর গড়ের ভূসম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়াছিল। ১২৮১ বঙ্গাব্দে বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার একমাত্র পুত্রের নাম মৌলবী আলী আমজদ খাঁ। পিতার মৃত্যুর সময় ইনি পাঁচ

---

৬. Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL'II (Sylhet) p. 130 এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইবে।

বৎসরের বালক মাত্র ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট তদীয় পিতামহী তালেব উন্নেসা খাতুন সাহেবানীকে অলী সাব্যস্ত করেন এবং শ্রীহট্টের জজ সাহেব একজিকিউটারস্বরূপ থাকেন।

আলী আমজদ কিঞ্চিৎ বড় হইলে জজসাহেব তাঁহাকে শ্রীহট্টে নিয়া সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন; প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরী তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি অধিক দিন শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে পারেন নাই। শীঘ্র বিস্তৃত জমিদারির গুরুভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। জমিদারি শাসনে তাঁহার দক্ষতা অল্প ছিল না, তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে পরাংমুখ ছিলেন না। ভানুগাছ নামক স্থানের অদম্য বিদ্রোহী মণিপুরী প্রজাদিগকে তিনি দমন করিতে সমর্থ হন। মৃগয়া ব্যাপারে তিনি যেরূপ সুদক্ষ ছিলেন, শ্রীহট্ট অঞ্চলে তদ্রূপ ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হয়; আমরা এ সকল কথা ৪র্থ ভাগে তদীয় জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। ১৩১২ বাংলা কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীযুক্ত আলী হায়দর ও শ্রীযুক্ত আলী আসগর নামে তাঁহার দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র এখন বর্ত্তমান আছেন; সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আছে।

পরগণা-কাণিহাটী

চৌধুরী বংশের কথা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে[৭] কাণিহাটীর বিবরণ প্রসঙ্গে হজরত শাহজলালের অনুষঙ্গী শাহ্ হেলিম উদ্দীনের কাণিহাটী গমন কথা কথিত হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার পুত্র দৌলত মালিক কাণিহাটী বাস করতঃ ধর্ম্মপ্রচার করেন। কাণিহাটীর অধিশ্বরী কনক রাণীর কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, কনকের রাজরাণী নামে এক তনয়া ছিলেন, রাজরাণী দৌলত মালিকের প্রচারিত ধর্ম্মে আকৃষ্ট হন; দৌলত মালিক তাঁহাকে বিবাহ করেন। রাজরাণী তখন হামিরাবিবি নামে আখ্যাতা হন। ইহার পুত্রের নাম সুলতান খাঁ; ইনিই সুলতানপুর গ্রামের স্থাপয়িতা, ইঁহার পুত্র দাউদখাঁ। দাউদ এক নূতন বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় গিয়া বাস করেন। সেইস্থান তাঁহার নামে দাউদপুর বলিয়া খ্যাতি হয়। দাউদের পুত্রের নাম মিঞা খাঁ। তাঁহার ডাকনাম ছিল ভুইয়া মিয়া। এই নামানুসারে "ভুইগা" বলিয়া তিনি এক গ্রাম স্থাপন করেন।

মিঞাখাঁর পুত্রের নাম নূর খাঁ ও কলবে খাঁ। এই দুই ভ্রাতা আপনাদের মধ্যে কাণিহাটী বিভাগ করিয়া নেওয়ায় উহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে বিভক্ত হয়। কলবে খাঁ শ্রীসূর্য্য মৌজায় বাড়ী প্রস্তুত করেন, তথায় তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, উহা কলবে খাঁর পুকুর নামে পরিচিত। উক্ত পুষ্করিণীর তীরে তাঁহার ও তৎপত্নীর ইষ্টক নির্ম্মিত কবর আছে। কলবে খাঁ ৮৩১ বঙ্গাব্দে মজলিস মারামত খাঁ নামে একপুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৮]

মারামত খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশস্ত পথ ও পরিখামণ্ডিত এক বাড়ী প্রস্তুতক্রমে তথায় গমন করেন ও আপন পত্নীর (রৌজন বিবি) নামে সেই স্থানের নাম

৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮. কাণিহাটীর মোসলমান চৌধুরী বংশের যে বিবরণ আমাদিগকে প্রদত্ত হইযাছে, তাহার লিখিত তারিখগুলি কতদূর ঠিক বলা যায় না। শাহ হেলিম উদ্দীন শাহজলালের সঙ্গে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আগমন করেন, তাঁহার ৬ষ্ঠ পুরুষে কলবে খাঁর উদ্ভব, ইঁহার মৃত্যু আমাদের প্রাপ্ত বিবরণী অনুসারে ৮৩১ বঙ্গাব্দে হইলে, শাহজলালের সময় এতত্তুলনায় অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। আবার ইঁহাব ৬ষ্ঠ পুরুষে নাসিরুদ্দীনের ৫মে সময় (১০১০ বাং) কথিত হইয়াছে, তাহাও উপরোক্ত হিসাবে আভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না।

"রৌজনপুর" রাখেন।

ইহার চারিপুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার অনুকরণে সিরাজ বিবি নাম্নী স্বীয় পত্নীর নামে "সিরাজপুর" গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় চলিয়া যান। তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র ইসমাইল খাঁ "ইসমাইলপুর" গ্রামের স্থাপয়িতা। চতুর্থ তনয় বদড় খাঁ, ইঁহার পুত্রের নাম আফজল। আফজলের পুত্রের নাম মিয়াউদ্দীন; ইঁহার নাসির উদ্দীন ও ইউসুফ উদ্দীন নামে দুই পুত্র হয়। কথিত আছে যে নাসির উদ্দীন শ্রীহট্টের কানুনগো লোদী খাঁর সহিত বিদ্রোহী খোয়াজ ওসমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহায়তা করেন। ইনিই চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্র হাজি মোহাম্মদ "হাজিপুরের" স্থাপয়িতা। তাঁহার পুত্রের নাম শেখ বাহাদুর। ইনি মালগুজারি কার্য্যের জন্য ৬০ কাহন কৌড়ি বেতন পাইতেন। ইহার পুত্র সোণাঠাকুর পালপুর গ্রামে গিয়া বাড়ী প্রস্তুতক্রমে বাস করেন। ইঁহার দুই পুত্র, তাঁহাদের নাম মোহাম্মদ মনসুর, মোহাম্মদ মনিওর। মনিওর হাজিপুরে গিয়া বাস করেন। তত্রত্য পালকী নদীর উপরিস্থ পাকা সেতু ও পুষ্করিণী ইঁহারই কীর্ত্তি। মনসুরের পুত্র মোহাম্মদ মজহর ও আব্দুল গফুর এবং মোহাম্মদ বক্‌স। ইঁহাদের প্রপৌত্রগণের অভিপ্রায়ে প্রেরিত যে বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদবলম্বনে ইহা লিখিত।[৯]

ইসমাইল পুরের ওলীবংশ

পূর্ব্ববর্ণিত বিবরণোল্লেখিত ইসমাইল খাঁর স্থাপিত ইসমাইলপুর গ্রামে সাকর ওলীর বংশ বলিয়া একটি বংশ আছে। এই বংশের আদি পুরুষের নাম অজ্ঞাত। গৃহদাহে প্রাচীন কাগজ পত্রের সহিত তাঁহার নামও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র জানা যায় যে তিনি স্থানান্তর হইতে শ্রীহট্ট জেলায় আসিয়া বেত্রীকুলের অন্তর্গত মধুরাই গ্রামে বাস করেন। তদ্বংশীয় সাকর ওলী হইতে বংশকথা পরিজ্ঞাত আছে।

সাকর ওলী প্রকৃত নাম নহে; ইনি একজন গৃহত্যাগী সাধু হইয়া ছিলেন; গৃহত্যাগ করার পরই এই নামে খ্যাত হন। ইঁহার একমাত্র পুত্রও পিতার ন্যায় শেষাবস্থায় গৃহত্যাগী দরবেশ হন, তাঁহার নামও জানা যায় না। মোহাম্মদ জাহির নামে এক পুত্র রাখিয়া এই ব্যক্তি পরলোক গমন করেন। মোহাম্মদ জাহির প্রভৃত বলশালী ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। মোহাম্মদ শের নামে তাঁহার শার্দ্দুল-বিক্রম এক পুত্র ছিলেন, ইঁহার দুই পুত্রের নাম মোহাম্মদ সাদির ও মোহাম্মদ গণী। তন্মধ্যে গণীর তিন কন্যা ও তিন পুত্র হয়, পুত্রত্রয়ের মধ্যে মহোম্মদ খয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; চিরকুমার শরফ উদ্দীন মধ্যম এবং বদর উদ্দীন সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। খয়ের অতিশয় সাহসী, বুদ্ধিমান ও বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। ৮/১০ জনে যাহা উত্তোলন করিতে পারিত না, তিনি অক্লেশে সচরাচর তাহাই ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময়ে একভীষণ প্লাবনে বেত্রীকুল ডুবিয়া যায়, তখন তিনি স্বীয় সম্পত্তির দাবি ত্যাগ করিয়া তথা হইতে ইসমাইলপুরে আগমন করেন।

---

৯. শাহ-হেলিম উদ্দীনের পুত্র দৌলত মালিক, তৎপুত্র সুলতান খাঁ, তৎপুত্র দাউদ খাঁ, তৎপুত্র মিঞা খাঁ, তৎপুত্র কলবে খাঁ, তৎপুত্র মজলিস মেরামত খাঁ, তৎপুত্র বড় খাঁ গং, বড়খাঁর পুত্র আফজল খাঁ, তৎপুত্র মিয়াউদ্দীন, তৎপুত্র নাসির উদ্দীন চৌধুরী ও ইউসুফ, ইহার পুত্র হাজি মাং, তৎপুত্র শেখ বাহাদুর, তৎপুত্র মাং মনসুর, তৎপুত্র মাং মজহর ও আব্দুল গফুর। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মজহরের পুত্র জলাল বকস তৎপুত্র মশুদবখত, তৎপুত্র মাহমুদ বখত চৌধুরী।

মাং মনসুরের ১ম পত্র আব্দুল গফুর সিপাহীযুদ্ধের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার পুত্র আলী গওহর, তাহার আলী হায়দর প্রভৃতি ৫ পুত্র, তাঁহাদের পুত্রগণ বর্ত্তমান।

তদীয় জ্যেষ্ঠ তাত মোহাম্মদ সাদিরের বংশধরগণ তাহার পূর্ব্বেই এই স্থানবাসী হইয়াছিলেন। খয়ের এইস্থানে আসিয়া অল্পকাল মধ্যে লোকের অনুরাগভাজন হন, হিন্দু মোসলমান সকলেই তাঁহার কাছে অর্থাদি গচ্ছিত রাখিতে ও কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে মীমাংসার জন্য আসিত। মোহাম্মদ আফজল ও মোহাম্মদ ফজল নামে ইঁহার দুই পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ ফজল এখনও জীবিত আছেন, ইঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীযুত মোহাম্মদ শরাফৎ আলী হইতেই এই বিবরণী সংগৃহীত হইয়াছে।

এ বংশে অনেক ব্যক্তিই খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন, তন্মধ্যে মোহাম্মদ দানীশের অর্থ-প্রবাদ এইরূপ শুনা যায় যে, তিনি তাঁহার অপরিমিত অর্থের পরিমাণ জন্য ধান্য মাপিবার "পুরা" (দশ সেরে তথাকার এক পুরা হয়) ব্যবহার করিতেন। এ বংশীয় মৌলবী মোহাম্মদ আসির বিদ্যাধনে বিভূষিত ছিলেন, তাহার গৃহে সংরক্ষিত পারস্য, আরব্য, উর্দ্দুগ্রন্থসমূহ দর্শনীয় বটে। তিনি মোসলমান ধর্ম্ম ব্যবহার সম্বন্ধে যে যে বিষয় মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিদ্বৎসম্মত ও সুযুক্তিসিদ্ধ।

কৌলার চৌধুরীবংশ

কৌলার মোসলমান চৌধুরী বংশীয়গণ পূর্ব্বোক্ত শাহ হেলিম উদ্দীনের এক বংশোদ্ভব। হস্ত বোধ জরিপের সময় এই বংশীয়গণ চৌধুরাই প্রাপ্ত হন এবং তদ্বংশীয় মোহাম্মদ উলকত, মোহাম্মদ নজাত, মোহাম্মদ আরশদ ও মোহাম্মদ আসগর চৌধুরীর নামে যথাক্রমে লংলার ১৬/১৭/১৮/১৯ তালুকের নামকরণ ও বন্দোবস্ত হয়। এই চৌধুরী বংশীয়গণ সসম্মানে অদ্যাপি কৌলাতে বাস করিতেছেন।

তরফ-নরপতির কুতুব উল আউলিয়ার পাঁচপুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে এক জনের বংশধরগণ পং লংলার আমানিপুর ও কৌলাবাসী হন। ঐ বংশে সৈয়দ বাসিরুল হাসন, শাহ বুরহান উদ্দীন ও আব্দুল নূর প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ছিলেন। আব্দুল নুর সাহেবের পুত্র সৈয়দ মাফিজুন্নর বর্ত্তমান আছেন।

পরগণা- চৌতলী

মোসলমান চৌধুরীবংশ

হজরত শাহজলালের অনুষঙ্গী শাহতাজ উদ্দীন চৌকি পরগণাতে গিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশীয়গণ কেহ কেহ তথায়, কেহ দিনারপুর পরগণায় এবং অপরেরা চৌতলী ও লংলা পরগণায় বাস করিতেছেন। তাজউদ্দীন বংশীয় এনায়েত মোহাম্মদ চৌতলীর চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ রহিম প্রভৃতি চৌধুরাই সরবরাহকার নিযুক্ত হন। থাক বন্দোবস্তের সময় এই বংশে মোহাম্মদ বাগন চৌধুরী বিদ্যমান ছিলেন, ইঁহার এক বংশধর–মোহাম্মদ মুরাদ চৌধুরী মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অপর ব্যক্তি সব ইনিস্পেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। উক্ত মুন্সেফ সাহেবের পৌত্র বর্ত্তমান আছেন। এই বংশীয় মোহাম্মদ মাজুম চৌধুরী নামক একব্যক্তি কৌলার চৌধুরীবংশে বিবাহ করেন ও তাঁহার পৌত্রগণ কৌলাতেই অবস্থিতি করিতেছেন।

সমাপ্তি

দক্ষিণ শ্রীহট্ট সবডিভিসনের যে সকল বংশের বৃত্তান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, এতক্ষণ তাহা বলা হইল। উক্ত সবডিভিসনের বহু প্রসিদ্ধ বংশের মধ্যে এখণ্ডে যৎসামান্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমেই বাৎস্য গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বিবরণ উপলক্ষে ইটা রাজ্যের ভ্রাতৃবংশ বর্ণন করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইটা ও বরমচালের কাশ্যপ গোত্রীয়গণের বিবরণ কথিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে ঐ অধ্যায়েই মহাসহস্র ও গোবিন্দবাটীর কাশ্যপ গোত্রীয়ের বিবরণও প্রদান করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইটার কাত্যায়ন, পরাশর ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণবর্গের কথা বলিয়াছি। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই লংলার ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও তৎপর গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের কাহিনী উক্ত হইয়াছে; তাহার পর সাতগাওস্থিত বাৎস্য গোত্রীয় এবং বালিশিরার কাশ্যপ ও মাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণের বংশ পরিচয়ের সহিত এ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে, পঞ্চম অধ্যায়ে ইটা, ভাটেরা ও চৌয়ালিশ পরগণার কয়েকটি বংশের উল্লেখ আছে, তৎপরে কৈলাসহরের ব্রাহ্মণ বংশের বিবরণ সহ ব্রাহ্মণবিভাগ সমাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ বিভাগে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আরম্ভ হইয়াছে, ঐ অধ্যায়ে সপ্তগ্রামের দত্তবংশ বিবরণ ও ইটার কানুনগো বংশকথা এবং অন্তেহরির তরফদারদের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী অধ্যায় দুইটি গুপ্তবংশের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ বাসুঘোষের বংশ কথা বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। ৮ম অধ্যায়ে ইটা, শমশের নগর, সতরশতী, সাতগাও বালিশিরা, ভাটেরা ও লংলা প্রভৃতি স্থানের ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়গণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ৯ম অধ্যায়ে মোসলমান বংশ বর্ণন। ইহাতে ৫টি বংশকথা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই নয়টি অধ্যায়ে ৩য় খণ্ড পরিসমাপ্ত করা গিয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

হবিগঞ্জ

ব্রাহ্মণ বিভাগ

প্রথম অধ্যায়
তরফের ব্রাহ্মণ বিবরণ

নামতত্ত্ব

হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট জেলার জনবহুল উন্নত সবডিভিশন।ইহা দক্ষিণ শ্রীহট্ট সবডিভিশনের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে সুনামগঞ্জ, পূর্ব্বে দক্ষিণ শ্রীহট্ট, দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা ও মৈয়মনসিংহ জেলা।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হবিগঞ্জ সবডিভিশন স্থাপিত হয়; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে (২য় ভাঃ ২য় খণ্ড ৫ অঃ) তরফের জমিদার-বংশ-শাখায় তরফদারের আদিপুরুষ হেদায়েত উল্লার বিবরণ কথিত হইয়াছে, ইঁহার হবিবউল্লা ও আতাউল্লা নামে দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে হবিবউল্লা[১] নিজ নামে এক বাজার বসাইয়া ছিলেন, উহার নাম হবিগঞ্জ। এই হবিগঞ্জে সবডিভিশনেল শহর স্থাপিত হওয়ায় মহকুমাটি উক্ত নামেই খ্যাত হয়।[২] শহরটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা; বরাক উত্তর সীমায় থাকিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে ক্ষীণ স্রোতে বহিয়া যাইতেছে; পূর্ব্বে খোয়াই নদী প্রবাহিত হইয়া বরবক্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সংযোগস্থলেই চিড়াকান্দি নামক স্থান। এখানকার অধিবাসী শৌণ্ডিক জাতীয় ব্যক্তিবর্গ অতি উৎকৃষ্ট চিপিটক (চিড়া) প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত; উৎকৃষ্ট চিড়ার জন্য এস্থান চিড়াকান্দি নামে খ্যাত হয়। চিড়াকান্দির অধিবাসিগণ অবস্থাপন্ন। চিড়াকান্দি ব্যতীত সুলতান মাহমুদপুর, রাজনগর কীর্ত্তনপুর প্রভৃতি পল্লীও শহরভুক্ত হইয়াছে।

হবিগঞ্জ শহরে কয়েকটি দেবালয় আছে,-নরসিংহের আখড়া, মহাপ্রভুর আখড়া, মদনমোহনের আখড়া, বগলারবাড়ী ও কালীবাড়ী।

শহরের আখড়া আদি কথা

মোসলমান আমলে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বালুচরের মদনমোহনের আখড়া হইতে জয়রাম দাস নামে এক ব্যক্তি আসিয়া এই আখড়া স্থাপন করেন। সুলতানশীর জমিদার ইহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া সোণারচর নামক স্থান দেবত্র দান করিয়াছিলেন, ঐ চর তখন "বাবাজির চর" বলিয়া খ্যাত হয়। তখন আখড়াটি বর্ত্তমান "পুরাণবাজার" নামক স্থানে ছিল, পরে স্থানান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান স্থানে আসে। পূর্ব্বোক্ত জয়রামের শিষ্য সারঙ্গদাস, তাঁহার শিষ্য নরসিংহ দাস, তৎশিষ্য গোপাল দাস শ্রীহট্টের প্রধান বাণিজ্যস্থান বালাগঞ্জে আর একটি শাখা আখাড়া স্থাপন করেন; উভয় আখড়াই নরসিংহের আখড়া নামে খ্যাত হয়। গোপাল দাসের শিষ্যের নাম গঙ্গাদাস, তাঁহার শিষ্য জীবিত আছেন। এই আখড়ার সেবাধিকারী বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ কুলজাত রামায়েত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

---

১. পরবর্ত্তী ৭ম অধ্যায়ে তরফদার বংশ-বিবরণে ইহাব কথা দ্রষ্টব্য।

২. লস্করপুরের প্রসিদ্ধ হামিদরজার পুত্র শায়েস্তামিয়া নিজনামে শায়েস্তাগঞ্জ বাজার বসাইয়া ছিলেন; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। এই বাজারটি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। সম্প্রতি (১৯১২ ইং) গুজব উঠে যে, মহকুমার শহর স্থানান্তরিত হইবে না।

শ্রীমহাপ্রভুর আখড়ার সেবাব্যয় বাজারের মহাজনগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। মদনমোহনের আখড়া প্রায় ষষ্ঠি বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে। স্থাপয়িতা বালি শিরবাবাসী শ্যামকিশোর ধরের পুত্র গোপীনাথ ধর শতাব্দীজীবি পুরুষ। ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন সংবাদ শুনিতে অনেকে তাঁহার কাছে যাইত।

কালী-ইংরেজ আমলের প্রথমে লস্করপুরে লালা রামসিংহ নামক জনৈক শিকদার ছিলেন, ইনি তরফেশ্বরী নামে হিন্দুদের জন্য এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোসলমানদের উপাসনার জন্যও এক মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে তরফের জমিদারগণ কালীর সেবার জন্য যে দেবত্র দান করেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তদুপলক্ষে ১১।/০ বৃত্তি প্রদানে স্বীকৃত হন; অনেকদিন বৃত্তিদানের পর প্রায় ত্রিশবৎসর যাবৎ বৃত্তি রহিত হয়। হবিগঞ্জে মোন্সেফী স্থাপিত হইলে, লালা রামসিংহ স্থাপিত তরফেশ্বরীই "কালী" নামে তথায় স্থানান্তরিত হন। স্বগীয় আদিনাথ দত্ত এবং অনেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উকীলের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট সেই বৃত্তিটি পুনর্ব্বার প্রদান করিতেছেন।

বগলামুখী সুঘরের হরিচরণ দেবের পত্নী হরসুন্দরী স্থাপন করেন এবং একটি বাজার সংস্থাপিত করিয়া ছয়শত টাকা আয়ের সম্পত্তি সেবা-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করেন। সেই বাজার বগলাবাজার নামে খ্যাত।

হবিগঞ্জ সবডিভিশনে ৩৫টি পরগণা আছে। সবডিভিশনের আয়তন (area) ও জনসংখ্যাদি এবং পরগণা সমূহের নাম ও তদধীন গ্রামাদি বিবরণ প্রথম ভাগে বিবৃত করা গিয়াছে।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের দ্বিতীয় ভাগে যে যে বংশের প্রসঙ্গ করা গিয়াছে, তাহার অবশিষ্ট কাহিনী সহ অপরাপর বংশবৃত্তান্ত এই খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

পরগণা-তরফ

জয়পুর নগর

পূর্ব্বে তরফ এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল; পরগণা তরফ অধুনা তাহার নাম রক্ষা করিতেছে। তরফের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পূর্ব্বাংশে কথিত হইয়াছে; তাহাতেই পাঠক তরফের প্রাচীনত্বের কথা জ্ঞাত হইয়াছেন। তরফের মধ্যে জয়পুর পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, এস্থলে বহু বিপ্রের বাস। জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে এই গ্রামের যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে উহা কুপতড়াগাদি শোভিত, মঠ-মন্দির মণ্ডিত ও উদ্যান উপবনে অলঙ্কৃত ছিল। এ নগরের চতুর্দ্দিকেই তৎকালে "চৌ-খণ্ডী" "চৌতারা" প্রভৃতি একে একে শোভা পাইত; পাঠশালা অনেকটিই ছিল, নাট্যশালারও অভাব ছিল না; এমন কি গ্রন্থাগারও (লাইব্রেরী) পরিলক্ষিত হইত। ফলতঃ জয়পুর শ্রীহট্টের মধ্যে এক উন্নত ও প্রধান নগর ছিল, সন্দেহ নাই। এই প্রাচীন নগরের চতুঃসীমার মধ্যে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল, ইঁহাদের অনেকেই ধনী, বিদ্বান ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন।[৩]

৩. "শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্ব্বসুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম॥
দীঘী দেহবা মঠ নানা পুষ্পোদ্যান।
সুতার সপ্তম ঘর নগর চত্বর
ইষ্টকারয়িত দ্বার প্রাচীর ভিতর॥

জয়পুরের সাম্প্রদায়িক ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশই প্রাচীন বলিয়া কথিত। মৈত্রেয় বংশীয়গণ ভরদ্বাজ গোত্রীয়দের এক সময় হইতেই জয়পুরবাসী। ভরদ্বাজ গোত্রীয়গণ বালিশিরা হইতে জয়পুরে আগমন করেন; মৈত্রেয় বংশীয়গণ কোথা হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া বসতি স্থাপন করেন, তাহা জানা যায় না। এই বংশে পূর্ব্বে খাঁ উপাধিবিশিষ্ট শ্রীমন্ত নামে একব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নামে একটা দীঘী আছে।

রথীতর নীলাম্বর

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে সমস্ত বাঙ্গালা দেশে যিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাতামহ রথীতর গোত্রীয় সেই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এই জয়পুরবাসী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বে[৪] আমরা ইহা বলিলেও এস্থলে পুনঃ তদুল্লেখ আবশ্যক। নীলাম্বরের সময়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীহট্টে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, আহারাভাবে লোকে চুরি ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছিল, ধনীমানীর সম্মান রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল; পাশ্চাত্যের বৈদিক-কুল-ভূষণ নীলাম্বর এবং তাঁহার খুল্লতাত জগন্নাথ তখন সপরিবারে জয়পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপবাসী হন।[৫]

শ্রীচৈতন্য দেবের মাতুলের নাম যোগেশ্বর (বিশ্বেশ্বর) এবং রত্নগর্ভ (বিষ্ণুদাস), তাঁহার জননী শচীদেবী যোগেশ্বরের অনুজা ছিলেন; শ্রীচৈতন্যদেবের মাসী সর্ব্বজয়া সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন।[৬] নীলাম্বরের দেহত্যাগ কালে ইঁহারা নিতান্ত শিশু ছিলেন না। নীলাম্বর স্বীয় কন্যা শচীদেবীকে নবদ্বীপে, ইহার পরে শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণবাসী জগন্নাথ মিশ্রের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা এবং মাতা উভয়ই শ্রীহট্টবাসী ছিলেন।

"পিতামাতা আদি করি যতেক তোমায়।
বলদেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই বাক্যে তাহা পরিষ্কার রূপেই কথিত; শ্রীমহাপ্রভুর মাতৃস্বসৃ-পতি চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী আত্মীয় স্বজনকেই "আদি" শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে।

নাটশাল পাঠশাল চৌখণ্ডী বাঙ্গালী।
ধ্বজ কলহংস পারাবত করে ফেলি॥
নারিকেল পনস গুবাগ আম বট।
বকুল চম্পক তাল কদম্ব নিকট॥
অশ্বথ তেঁতুল নিম্ব জাম্বু খর্জ্জুর।
নারেঙ্গ ছোলেঙ্গ বিল্ব লবঙ্গান্তপুরে॥
হিঙ্গুল হরিতাল স্তম্ভ চন্দ্রার্ক তিলকে
ময়ুর সাবস শুক রহি দ্বার মুখে॥
চৌখণ্ডী চৌতারা টঙ্গী কত শাস্ত্রশালা।
প্রাসাদ মন্দির প্রপা রক্ষজারমালা॥
পূর্ব্বে সরস্বতী উত্তর দিগেতে গোমতী।
পশ্চিমে ঢোল সমুদ্র দক্ষিণে করাতি॥
জয়পুরে জত জত ব্রাহ্মণের ঘর।
দিব্যমূর্ত্তি মহাবিদ্যা মহাধনেরশ্বর॥" ইত্যাদি।
কবি জয়নানন্দ কৃত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ।
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৩য় অধ্যায়।

৫. "শ্রীহট্টদেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছিন্ন হইল দেশ অবিষ্ট দেখিয়া।
নানাদেশে সবলোক গেল পলাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে॥"
কবি জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ।

৬. "দুই পুত্র দুই কন্যা হইল তাঁহাব
প্রথম যোগেশ্বব পণ্ডিত দ্বিতীয় শচী হয়।
তৃতীয় রত্নগর্ভাচার্য্য চতুর্থ সব্বজয়া কয়॥"
প্রেমবিলাস গ্রন্থ।
সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাময় কৃত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ২য় ভাগে নীলাম্বর ও জগন্নাথের বংশ পত্রিকা সংযোজিত হইয়াছে।

বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ কথা

জয়পুরে বাৎস্যগোত্রীয় এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের বাস, ইঁহারা মহাদেবী বড়কাপনের বাৎস্যগোত্রীয়গণের শাখা-বংশ। সার্দ্ধ ত্রিশত বৎসর হইল, তথাকার জয়রাম নামক একব্যক্তি তরফের জয়পুরে আসিয়া বাস করেন।[৭]

এই জয়রামের বংশধর শঙ্কর শিকদার "সুবোধিনী" নাম্নী চণ্ডী-টীকা প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার সময় হইতেই এ বংশ ভট্টাচার্য্য বংশ নামে খ্যাত হয়। শঙ্কর শিকদারের পৌত্র রামদেব বিদ্যানিবাস "শ্রাদ্ধদীপিকা" নামে এক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামদেবের প্রপৌত্র গোপীনাথ (শ্রীচন্দ্র) ও তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ সকলেই উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, গোপীনাথ পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যার্জ্জনোদ্দেশে কনিষ্ঠ সহোদর গৌরীকান্ত সহ নিরুদ্দিষ্ট হন; গৌরীকান্তের ন্যায়ালঙ্কার উপাধি এবং গোপীনাথের তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি ছিল। ভ্রাতৃযুগল নিরুদ্দিষ্ট হইলে, রামকান্ত বিশারদ ও রমাকান্ত বাচস্পতিনামক অপর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের অনুসন্ধানে নানা স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক কুচবিহারে উপস্থিত হন ও তত্রত্য গোবরাছড়া নিবাসী শচীনন্দন মোস্তফির বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শচীনন্দন ইহাদের পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া, তাঁহাদের অনুর্দ্দিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুসন্ধানের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু কয়েক দিন মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শচীনন্দনের শ্রাদ্ধে যে সকল নিমন্ত্রিত পণ্ডিত আগমন করেন, তন্মধ্যে নরেন্দ্র তর্কভূষণ নামক জনৈক পণ্ডিত সহ তাঁহার দুইটি ছাত্রও আগমন করিয়াছিল; শাস্ত্রবিচারে ইহারা সভাসীন পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করেন। আমাদের বিশারদ ও বাচস্পতি তখন আশ্রয়দাতার ক্রিয়া উপলক্ষে বৃত ছিলেন; একজন প্রাচীন পণ্ডিত সেই বিচারার্থী ছাত্র দুটির সম্মুখীন হইতে ইঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। উক্ত প্রাচীনের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ইহারা সভ্যাস্থ হইয়া দেখিলেন যে, বিচারার্থী ছাত্রদ্বয় তাঁহাদেরই নিরুদ্দিষ্টভ্রাতা! আর বিচার চলিল না, ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর সম্মিলনে সেই স্থানে এক আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল।

ভ্রাতৃদ্বয়ের গৌরবে রামকান্ত ও রমাকান্ত বিশেষ প্রীত হইলেন, ও তাঁহাদিগকে গৃহে আনিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু তথাকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে তথায় এক টোল সংস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তখন তথায় এক চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং দুইভ্রাতা পর্য্যায়ক্রমে তথায় থাকিয়া অধ্যাপনার সহিত স্থানীয় ব্যবস্থাদি প্রদান করিতে লাগিলেন।

রেঙ্গানিবাসী প্রসিদ্ধ রামরাম পণ্ডিতের কথা ৩য় ভাগ প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি, কথিত আছে একদা কোন এক মোকদ্দমার বিচার কার্য্যে, তাঁহার ব্যবস্থা বা অভিমতের অবৈধতা লক্ষিত হইয়াছিল, তখন গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়া, রাম রাম পণ্ডিতের পক্ষে তদীয় সিদ্ধান্তের বৈধতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

---

৭. "এবং মহাদেবো নাম্না শিকদারো মহামতিঃ।
নির্ম্মায় বাটিকাং রম্যাং গ্রামে শ্রীবড়কাপনে॥
উবাস স্বজনৈঃ সার্দ্ধং মহামান পুরঃসবং।
অতস্তদ্বংশীয়াঃ সর্ব্বে মান্যা ধর্ম্মপরাণাঃ॥
তদধস্তনসন্তানো জয়রাম মহাকবিঃ।
যযৌ জয়পুরগ্রামে লব্ধা মাতামহাস্পদং॥"
ইতি জনৈক প্রাচীন কৃত শ্লোক হইতে।

তুঙ্গেশ্বরের হরিশরণ মজুমদারের নাম ও গুণ বিদেশেও অনেকে জ্ঞাত ছিল, ইঁহার কথা পরবর্ত্তী ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা যাইবে। রাজা রাজবল্লভের জনৈক সভাপণ্ডিত এক কূটার্থ কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া দিতে তাঁহার কাছে কবিতা প্রেরণ করেন। মজুমদার পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করিয়া সেই কবিতার অর্থ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। সেই সভায় তর্কসিদ্ধান্ত ব্যতীত অপর ভ্রাতৃত্রয়ও উপস্থিত ছিলেন। প্রেরিত কবিতার অনেকরূপ অর্থই হইয়াছিল, কিন্তু কোনটি সদর্থ, তাহা অবধারিত না হওয়ায় কেহই তাহা প্রেরণ করিতে সাহস করেন নাই।

তর্কসিদ্ধান্ত হরিশরণ মজুমদারের কাছে নিজবাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঐ ভূমিখণ্ড আরও দুইজন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করায়, মজুমদার কাহাকেই উহা দেন নাই; এজন্য তর্কসিদ্ধান্ত তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হন নাই। ভাতকাটিয়া নিবাসী খ্যাতনামা নৈয়ায়িক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সেই পণ্ডিত মণ্ডলীতে প্রকাশ করিলেন যে, তর্কসিদ্ধান্ত ব্যতীত এ বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। তখন সকলের অনুরোধে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইল, তিনি কবিতার সপ্তপ্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাই প্রেরণ করিলেন। কবিতা পৌঁছিলে সেই কবিতা-প্রেরক পণ্ডিত কবিতার যথার্থ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া প্রশংসাসূচক এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। হরিশরণ মজুমদারও তৎপ্রতি বিশেষ তুষ্ট হইয়া, তখন সেই ভূমিখণ্ডে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া, তাঁহাকে দান করিলেন; সে পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। তর্কসিদ্ধান্তকৃত "বর্ষভাস্কর" নামক বর্ষকৃত্য বিষয়ক এক গ্রন্থ ও অনেক গ্রন্থের দুরধিগম্য স্থান সমূহের সরলার্থ আছে। তর্কসিদ্ধান্তের পুত্রের নাম রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গৌবীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার কৃত জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত "জাতকপ্রকাশ" নামক বৃহৎ গ্রন্থ এবং "জ্ঞানদীপ" নামক এক বেদান্তিক গ্রন্থ আছে। বিশ্বনাথের পুত্র হরিনাথ তর্কলঙ্কার একজন উৎকৃষ্ট নৈয়ায়িক ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারও "শুদ্ধিকারিকালি" নামক অশৌচ নির্ণায়ক এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া তত্রত্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জানাইয়াছেন।

কচুয়াদির ব্রাহ্মণগণ

কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ

জয়পুরে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণেরও বাস আছে। তথা হইতে এক শাখা কচুয়াদিবাসী হন। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ কোন স্থান হইতে জয়পুরে আগমন করেন, এতদনুসন্ধানে জানা যায় যে, পঞ্চখণ্ডের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশের কেহ তরফের মুড়াগ্রামে প্রথমতঃ আগমন করেন এবং তৎপর জয়পুর যান ও তথা হইতেই একজন কচুয়াদিবাসী হন।[৮]

এই বংশে শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে একব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইনি সুখরের বড়বাড়ীর অর্দ্ধ অংশের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। ইহার পুত্র কৃষ্ণানন্দ শিরোমণিও পিতার ন্যায় যোগ্যব্যক্তি ছিলেন, ইঁহার পত্নী মহামায়া দেবীর কীর্ত্তি আজও লোকে শতমুখে বর্ণনা করিয়া থাকে।

---

৮. কেহ কেহ বলেন– কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ, মজুমদার বংশের সহিত এদেশে সমাগত ব্রাহ্মণ হইতে অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশের মতেই তাহা ঠিক নহে।

সতী মহামায়া

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পরে শিরোমণির মৃত্যু হয়, তখন আইন প্রচারিত হইয়া সতীদাহ প্রথা বারিত হইয়াছে। দেবী মহামায়া পতির মৃত্যুর পর যখন তদনুগামিনী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কাজেই তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আইনের ভয়ে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখন সেই বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিবর্গের এককালে হঠাৎ এক বিষম বেদনা উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন যে উৎকণ্ঠিতা সতীর মানসিক ভাব-বিক্ষেপের প্রতিক্রিয়াই এই ব্যাধির কারণ; এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা বিরোধভাব পরিত্যাগ করিলেও, তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী থানায় এই সংবাদ জানাইলেন। সংবাদপ্রাপ্তে থানার প্রধান কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়া সতীকে এ উদ্যম ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহামায়া একটা কাঁচা কদলী হাতে লইলেন, কদলী তদীয় দেহের তাপে তপ্ত হইয়া পরিপক্কবৎ প্রতীয়মান হইল; সতী বলিলেন "আমাকে নিষেধ করিও না, আমার অন্তরে আগুণ জ্বলিতেছে, এই দৃশ্যমান অগ্নি তদপেক্ষা অধিক নহে, এই কদলী তাহার প্রমাণ; আমি সেই অগ্নিতেই ভষ্মীভূত হইয়া যাইব,-তোমরা আমার ধর্ম্মে বাদ সাধিও না।"

হিন্দুকর্ম্মচারীটিও ভীত হইলেন, "অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে", ভাবিয়া তিনি কিছুক্ষণ মৌনাবস্থায় রহিলেন, ইত্যবসরে সতী ত্রস্তভাবে চিতারোহণ করিয়া অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া গেলেন। দর্শকগণ হায় হায় করিয়া উঠিলেন, সতী তদবস্থায় আত্মীয় স্বজনকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দিব্য পতি-লোকে চলিয়া গেলেন!

জয়পুরবাসী তদীয় পুরোহিত লব্ধ প্রতিষ্ঠা রাধাচরণ ভট্টাচার্য্যকে সতী নাসিকা হইতে নিজ নাসাভরণ নথ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই নথ প্রাপ্তির পর হইতে ভট্টাচার্য্য ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া উঠেন এবং "মহাজন ঠাকুর" নামে খ্যাত হন। ২০/২২ বৎসর অতীত হইল, সতী-দত্ত এই নথ অপহৃত হইয়াছে; ইঁহাদের অবস্থাও অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছে। শিরোমণির পুত্র রামগতি তর্কালঙ্কার এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; ইহার পৌত্র তত্রত্য টোলের অধ্যাপক শ্রীযুত কৃষ্ণজয় স্মৃতিভূষণ হইতে আমরা এই বংশ বিবরণ সংগ্রহে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

স্বর্ণরেখা

ভরদ্বাজ ও গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কথা

স্বর্ণরেখার ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ জয়পুর হইতে সমাগত। জয়পুর হইতে রামজীবন তর্কালঙ্কারই সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণরেখার আগমন করেন। ইঁহার বংশে রামকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, তিনিই সুঘরের মজুমদার বংশের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন।

গৌতমগোত্রীয় গণেশ্বর ভট্টাচার্য্য ইটার পাঁচগাও হইতে স্বর্ণরেখায় গমন করেন; তাঁহার পুত্র রুদ্রেশ্বর বাচস্পতি অনেক যজমান-শিষ্য করিয়াছিলেন। কাশীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ও বাগীশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত নামে তাঁহার দুইপুত্র অতি বিখ্যাত হইয়া উঠেন, তন্মধ্যে ন্যায়ালঙ্কার, দেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তির দ্বারপণ্ডিত ছিলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দশসনা বন্দোবস্ত কালে ঐ সমস্ত ভূমি তাঁহার নিজ নামে বন্দোবস্ত করা হয়, অদ্যাপি তদ্বংশীয়গণ উহা ভোগ করিতেছেন। কাশীশ্বরের পুত্র শ্যামানন্দ বিদ্যাবাগীশ; ইঁহার প্রপৌত্র জীবিত আছেন।

জয়পুরের মৈত্রেয় বংশের উল্লেখ করিয়াছি, ইঁহারাও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ ইঁহাদিগকে রাঢ়ীর বিপ্র বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার সঙ্গত কারণ জানা যায় না। মৈত্রের বংশের পুরুষোত্তম ন্যায়ভূষণ স্বর্ণরেখাবাসী হন; ইঁহার পুত্র হরগোবিন্দ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিত ব্যক্তি

ছিলেন। গৌতমগোত্রীয় পূর্ব্বোক্ত শ্যামানন্দের প্রপৌত্র আমাদের বিবরণ প্রেরয়িতা শ্রীযুতকালীকুমার ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে লস্করপুরের সৈয়দ আহমদরজা একবার কৌতূহলবশে কালীপূজা করাইতে ইচ্ছা করেন, এবং হরগোবিন্দ তর্কপঞ্চানন তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কালীপূজা করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহা হইতে তজ্জন্য ১/০ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ

এই সকল ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত ষাটিয়াজুরী, মৌড়ী প্রভৃতি গ্রামে লাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আছেন বলিয়া জানা যায়। রাঢ়ীয় ভট্টানারায়ণ বংশসম্ভূত বাণীশ্বর আচার্য্য বাণাইত গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সর্ব্বেশ্বর আচার্য্য ও বংশী পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্বেশ্বর মৌড়ী গ্রামে গিয়া বাস করেন। বংশী পণ্ডিতের বংশ "শাণ্ডিল্য বংশ" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অধুনা ষাটিয়াজুরীর শাখা বংশীয়গণ আপনাদিগকে "বৈদিক" বলিয়া পরিচিত করেন, কিন্তু মিরাশীবাসী ভট্টাচার্য্যগণ আপনাদিগকে "রাঢ়ীয়" স্বীকার করেন।

তরফের ভাতকাটিয়া গ্রামবাসী মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার তাঁহার সময়ে শ্রীহট্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ইঁহার খ্যাত বিস্তৃত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত তরফের গৌরহরি চক্রবর্ত্তী বারাণসীতে উকীলের ব্যবসায় অবলম্বনে যশ ও সম্পত্তি অর্জ্জনপূর্ব্বক তথায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার কথা জীবন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাণিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণ বিবরণ

কাত্যায়ন গোত্রীয় কথা

বাণিয়াচঙ্গ পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যরূপে গণ্য হইয়াছিল, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে লাউড় রাজ্যের বিবরণ প্রসঙ্গে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাণিয়াচঙ্গ তিনটি পরগণাতে বিভাগিত; একটার নাম কসবা বাণিয়াচঙ্গ, ইহার মধ্যেই প্রাচীর-পরিখা-প্রবেষ্ঠিত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বাণিয়াচঙ্গ নগর অবস্থিত। পশ্চিমে ক্ষুদ্র জোয়ার বাণিয়াচঙ্গ নং ২, এবং উত্তরে জোয়ার বাণিয়াচঙ্গ নং ১ বিস্তৃত রহিয়াছে; শেষোক্তের সীমা সুনামগঞ্জ সবডিভিশনের অন্তর্গত। এ ছাড়া বহু পরগণা ইহা হইতে খারিজ হইয়াছে।

বাণিয়াচঙ্গের নামতত্ত্ব পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বাণিয়াচঙ্গের বিবরণ উল্লেখ করিতে গেলেই কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণবর্গের কথা আসিয়া পড়ে। ইহারা হিন্দু ও মোসলমান শাখায় বিভক্ত; মোসলমান শাখাতে বাণিয়াচঙ্গের অধিস্বামী দেওয়ানদের উদ্ভব; ইঁহাদের বিবরণ পূর্ব্বাংশে (২য় ভাগে) বিবর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ২য় ভাগের চ পরিশিষ্টে বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে জানা যায় যে এই মহাবংশ প্রবর্ত্তক বাণিয়াচঙ্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কেশব মিশ্রের পুত্রের নাম দক্ষ, তৎপুত্র নন্দনের গণপতি ও কল্যাণ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে কল্যাণের পুত্র রাজা কর্ণ খাঁ। কর্ণখাঁরই এক পুত্র গোবিন্দ খাঁ মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক হবিব খাঁ নামে খ্যাত হন।

গণপতির পুত্র সদাশিব, তাঁহার নৈ (নয়ী), লক্ষ্মীনাথ ও রূপরাজ খাঁ নামে তিন পুত্র ছিলেন। ইঁহারা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ইহাদের মধ্যে নৈ ও রূপরাজের নামে মহল্লা আছে। এই বংশীয় জগদীশ বিদ্যাভূষণ, চাঁদখাঁ, ভবানন্দখাঁ প্রভৃতির নামেও এক একটি পল্লী আছে। রাজা কর্ণখাঁই বাণিয়াচঙ্গে বিভিন্ন বংশীয় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া যান। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় আমাদিগকে এ সব কথা জানাইয়া উপকৃত করিয়াছেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় কথা

আদিকথা

বাণিয়াচঙ্গের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের উপাধি বিশ্বাস-চৌধুরী। বাণিয়াচঙ্গাধিপতি গোবিন্দ খাঁর বিবরণ পূর্ব্বাংশে কথিত হইয়াছে।[১] গোবিন্দ খাঁ দিল্লীতে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন ও দৈবানুগ্রহে অব্যাহতি লাভ করেন। এই সময় জাতূকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদ তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন এবং তজ্জন্য গোবিন্দ খাঁ তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে প্রতিশ্রুত হন।

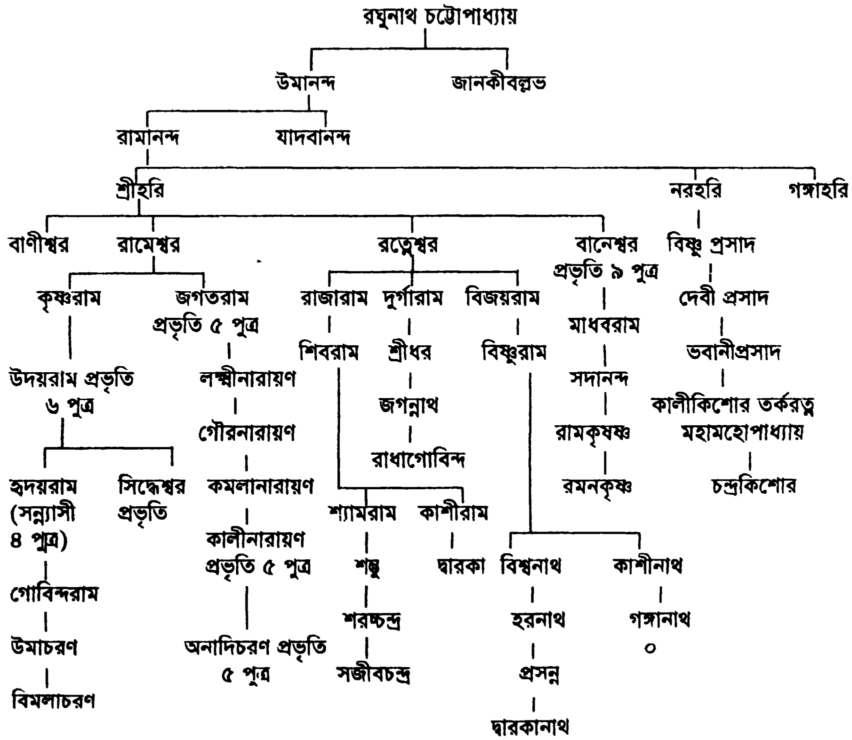
বিশারদের পুত্র সন্তান ছিলেন না, রমাদেবী নাম্নী এক মাত্র কন্যাকে তিনি হুগলী নিবাসী ভবানীদাস চট্টের পুত্র রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহ কাশীতে সম্পাদিত

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।

হয়। বিশারদ জামাতা ও কন্যা সহ দেশে আগমন করিলে গোবিন্দ (হবিব খাঁ) তাঁহাকে পূর্ব্বকথা মত বাণিয়াচঙ্গে কতক ভূমি প্রদান করেন; বিশারদ জামাতাকে উক্ত ভূমি প্রদান করতঃ তথায় বাস করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি দশপাড়া নামক পল্লীতে আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। মুরারি জামাতাকে সমস্ত ভূসম্পত্তিই দান করেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা চৌগড়ের মধ্যে তদনুগ্রহে কতকটুকু ভূমি প্রাপ্ত হন, অদ্যাপি তথায় মুরারির ভ্রাতৃবংশীয়গণ বাস করিতেছেন; তাঁহাদের বাস হেতু এই পল্লী জাতৃকর্ণপাড়া বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

মুরারির জামাতা রঘুনাথ কৃতী ব্যক্তি ছিলেন, অল্পকাল মধ্যেই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠেন, তাঁহার দুই পুত্র;[২] ইহাদের নাম উমানন্দ ও জানকী বল্লভ। উমানন্দের রামানন্দ ও যাদবানন্দ নামে দুইপুত্র হয়। যাদবানন্দ বংশবিহীন; রামানন্দের তিন পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীহরি বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান সাহেবের উকীল স্বরূপে মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া, দেওয়ানের একটি হিতজনক কার্য্যোদ্ধার করায়, দেওয়ান তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাণিয়াচঙ্গের চৌগড়ের মধ্যে কতক স্থান ও চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। এই স্থান প্রাপ্তে তিনি দশপাড়া ত্যাগ করিয়া তথায় আগমন করেন, তাঁহার বাসহেতু এস্থান "চৌধুরীপাড়া" বলিয়া খ্যাত হয়। এ পাড়ায় মোসলমানের বাস নাই। এই বংশীয়গণ পরে বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান হইতে স্বীয় কার্য্যের জন্য সম্মানসূচক "বিশ্বাস" পদবি প্রাপ্ত হন। এ বংশ অতি বিস্তৃত সংক্ষিপ্ত কথা নিম্নে লিখিত হইল।

২. সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইলঃ-



শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ বিশ্বাস প্রদত্ত এই বিস্তৃত বংশ তালিকার একাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল

ব্যক্তিগত সংবাদ

এই বংশীয় সিদ্ধেশ্বর বাল্যাবধি ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। পিতা তাঁহার উদাসীনতা দৃষ্টে সত্বর সাগ্রহে তাঁহাকে বিবাহ দেন, কিন্তু বিবাহের পরেই সিদ্ধেশ্বর নিরুদ্দিষ্ট হন ও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়াচরস্থ কালীবাড়ীতে অবস্থিতি করেন। সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধপুরুষ ছিলেন,–ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া তিনি লোকের হিতাহিত নিশ্চিতরূপে বলিয়া দিতেন। আপন মৃত্যুকাল আসন্ন অবগত হইয়া পূর্ব্বেই শিষ্যবর্গকে তাহা জ্ঞাপন করেন এবং একটি লবণপূরিত কাষ্ঠ-সিন্ধুকে বলিয়া যোগাসনে দেহত্যাগ করেন। পরে সেই সিন্ধুক সহ শব ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়।

সিদ্ধেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ তেজপুরের মুন্সেফ ও মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তাঁহার বাসায় অতিথির নিত্যভোজ হইত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, একটি "পঞ্চরত্ন" অপূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি উহা পূর্ণ করেন ও দুর্গামণ্ডপ প্রস্তুতাদি সদ্ব্যয় করেন।

ইহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কমলনারায়ণ একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, ১২৩৫ বাংলায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা অবগত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বাণিয়াচঙ্গে পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতে, পরে তথায় বালিকা বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তাহার শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হন। সঙ্গীতবিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি স্বয়ং একজন গায়ক ছিলেন এবং প্রায় সহস্র সংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।[৩] সখীসম্বাদ, টপ্পা, মালসী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়িনী উক্ত সঙ্গীত সমূহ ব্যতীত তৎকৃত "বৃষকেতু" নামে একখানা কাব্যগ্রন্থ আছে। চিকিৎসা বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান ছিল, রোগীর "নাড়ী" ধরিয়া তিনি রোগের রহস্যোদঘাটন করিতে সমর্থ ছিলেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পৌত্র শ্রীযুত অনাদিচরণ বিশ্বাস মহাশয় হইতেই আমরা এই বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিশ্বাস বংশে-বিশ্বনাথ ও কাশীনাথ নামক ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই উকীল ছিলেন। পরে শ্রীহট্টের বিশ্বনাথ থানায় মুন্সেফী থাকাকালে কাশীনাথ তথাকার মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

ইহাদের স্বগোষ্ঠি-ভ্রাতুষ্পত্র মোনসী রাধাগোবিন্দ নওয়াখালিতে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল, তিন দেশে আসিলেই ভোজের অনুষ্ঠান করিতেন, আজ পর্য্যন্ত "রাধাগেবিন্দের খাওয়ান" কথাটী তত্রত্য লোকের স্মৃতিপথে আছে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এ বংশে কালীকিশোর তর্করত্নের জন্ম হয়, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে অধ্যয়ন করিয়া ইনি পরে কলিকাতা শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীহট্টবাসী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নিকট আগমন করেন, ভাস্কর সম্পাদক[৪] তাঁহার জ্ঞানগৌরবে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "তর্করত্ন" উপাধি দান করেন। উপাধি লাভান্তে তিনি দেশে আসিয়া এক টোল সংস্থাপন করেন, এই টোল

৩. নমুনা ঃ – "মা কালি! দুঃখের কালি কেন মাখালি মা আমাকে।

লেগেছে যে কালি, বুঝি চিরকাল, ঘুচাও মনের কালি, কাল নিবারিকে॥
গায় মা মনের কালি, কালে দিলে কালি, যাবে অন্তকালি, দেশে মন-কালি।
মরণ আজি-কালি, তুমি মহাকালী, ব্রজে কৃষ্ণকালী, দক্ষিণা কালিকে॥
সেপদ কমল হর হৃদকমলে, সেপদকমলে বঞ্চিত কমলে, কমলে, নয়নকমলে হের মা
বদন কমল কোমল হাসিকে।

৪. ইহার বিষয় ৪র্থ ভাগে কথিত হবে।

বহুদিন স্থায়ী ছিল, তিনি এই টোলে ৪২ বৎসর কাল বহুতর ছাত্রকে বিদ্যাদান করেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক ১০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। অতি অল্পদিন হইল, পূর্ণ অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায়ের স্বজ্ঞাতি ও ভ্রাতৃসম্পর্কিত রমণকৃষ্ণ, বাণিয়াচঙ্গের সর্ব্ব প্রথম বি এ উপাধিধারী ছিলেন; তিনি সবডিপুটী কালেক্টার নিযুক্ত হইয়া আসাম-মঙ্গলদৈ গমন করেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গৌতম গোত্রীয় কথা

গৌতম গোত্রীয় লোহিতাক্ষ তর্কসিদ্ধান্তের বাস (বর্ত্তমান) ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া নামক স্থানে ছিল, ইহার পুত্রের নাম যাদবানন্দ তন্ত্রচূড়ামণি। উপাধি হইতেই জানা যায় যে, তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল; ইহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। গৌতমগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, তাঁহারাই বাণিয়াচঙ্গের রাজার গুরুবংশীয়; কেননা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ণখাঁর গুরু ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি রাজার বৈদিক ক্রিয়া কলাপের ঋত্বিক ছিলেন; তাই আজিও তদ্বংশীয়গণ শ্রাদ্ধকালে দর্ব্বী উপহার পান।[৫]

তর্কালঙ্কারের শ্রীহট্টে আগমন

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পিতামহের নিকট সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন; আট বৎসর বয়ঃক্রম কালেই ব্যাকরণ সমাপন করিয়া সকলকে তিনি চমকিত করেন। তাহার পর দুই বৎসর কাল মধ্যেই তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হন; বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তখন তর্কসিদ্ধান্ত অধ্যাপনা করিতে সক্ষম হইয়া চতুস্পাঠী উঠাইয়া দেন, কিন্তু পৌত্রের শিক্ষা ক্ষান্ত হইল না; ন্যায়াধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে মিথিলা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় লোহিতাক্ষ পুত্রকে বলিয়াছিলেন-"বৎস, মিথিলা হইতে আসিলে স্বয়ং ইহাকে তন্ত্র শিক্ষা দিবে ও টোল করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিবে না, দেখিবে-শ্রীকৃষ্ণ মহাপণ্ডিত রূপে দেশখ্যাত হইয়া উঠিবে।"

বৃদ্ধের বাক্যে অসত্য হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া, কাশী প্রভৃতি পণ্ডিত-প্রধান স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করতঃ বিচারযুদ্ধে জয়ী হন। তাহার পর দেশে আসিয়া পিতার নিকট তিনি তান্ত্রিক সাধনপ্রণালী শিক্ষা করেন।

অগ্নি অপ্রকাশিত থাকে না, দেশে আসিলে সকলেই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইতে থাকে; কিন্তু তৎকালে দেশে মোসলমান অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল শ্রীকৃষ্ণ যবনোপদ্রব শূন্য কোন দেশে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার শ্রীরাম নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়, এবং পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে কোন ব্যাপার উপলক্ষে বাণিয়াচঙ্গের অধিপতিকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি এথায় আগমন করেন। বাণিয়াচঙ্গে বহু পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতিতে তর্কালঙ্কার সকলের যশঃ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী নৃপতি ইহা অনুভব করেন; তর্কালঙ্কারের প্রতি তিনি এতাদৃশ আকৃষ্ট হন যে, তাঁহাকে বাণিয়াচঙ্গে স্থাপন করিতে একান্ত উৎসুক হইলেন। রাজা তাঁহাকে বিনয় সহকারে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে

৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৩য় খন্ড তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই বলা হইয়াছে। রাজা সন্ন্যাসীর-শিষ্য ছিলেন-ঐ সন্ন্যাসীর স্বর্গীয় কালীর তত্ত্বাবধায়ক পদে থাকিতেন।

প্রার্থনা করিলে, পণ্ডিতপ্রবর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। রাজা তখন তাঁহাকে বহুতর ব্রহ্মত্র প্রদান করিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

কর্ণখাঁ গুরুকে যে সমস্ত ভূমি দান করেন, তিনি তৎসমস্ত গ্রহণ না করিয়া একখানা বাড়ী ও অল্প কতক জমি মাত্র গ্রহণ করিলেন; জীবনধারণোপযোগী বিত্ত ব্যতীত গ্রহণ করিলেন না; কেননা বহু বিত্ত লোভ ও বিলাসিতার প্রসূতি। কর্ণখাঁ যাত্রাপাশা নামক পল্লীতে পুষ্করিণী সমন্বিত একটি বাটী প্রস্তুত ক্রমে গুরুকে তাহা সমর্পণ করিলেন।

কর্ণখাঁ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকে গুরু স্বীকার করিয়া বাণিয়াচঙ্গে সংস্থাপিত করিলে, বাণিয়াচঙ্গের অপরাপর ব্রাহ্মণবর্গও তাঁহার বিষ্যত্ব স্বীকার করেন।[৬] ইহার নিকট হইতে তত্রত্য সকলেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে লাগিল; রাজগুরু তখন তত্রত্য "সমাজপতি" হইয়া উঠিলেন।

রাজাও তাঁহার সম্মানার্থ এই নিয়ম প্রচারিত করিলেন যে, উৎসবোলক্ষে যথায় দধিচিড়া ভোজনের আয়োজন হইবে, এই বংশীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য সেস্থলে অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাকা মিষ্টান্নাদির আয়োজন হইলে, ইহাদিগকে পৃথক পাকে দেওয়া হইবে। গর্ভাধান ও জাতকর্ম্মাদি এবং শ্রাদ্ধাদিতে ইহাদিগকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে পারিবে না ইত্যাদি। রাজা এই সময় তর্কালঙ্কারকে ২৮ পরগণার রাজপণ্ডিতি প্রদান করেন। তাঁহার দুইপুত্র-শ্রীরাম ও হরিরাম।

শ্রীরাম ও শলাকা পরীক্ষা

শ্রীরাম পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ন্যায় শিক্ষার্থ মিথিলায় গমন করেন ও বিশারদ উপাধি লাভ করিয়া দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়সে কাশী হইয়া দেশে আগমন পূর্ব্বক তিনি তান্ত্রিক সাধনায় বৃত হন ও অচিরেই অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে সমর্থ হন। ইহার পর তিনি "শলাকা পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত রূপে গণ্য হন।

সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী অগাধ জ্ঞান-গর্ব্বিত বিজ্ঞ পণ্ডিতও ক্কচিৎ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের ২/১টী করিয়া পত্র সমষ্টি একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখা হইলে, পরীক্ষার্থীকে একটা লৌহ-শলাকা দ্বারা তাহাতে আঘাত করিতে হইত, তাহাতে যে যে গ্রন্থের পত্র শলাকা বিদ্ধ হইত, সেই সকল গ্রন্থের কঠিনাংশগুলি পরীক্ষার্থীদের অনর্গল বলিতে ও ব্যাখ্যা করিতে হইত। শলাকা পরীক্ষায় কত জটীল গ্রন্থের পত্র সংগৃহীত হইত, পরীক্ষা দর্শনের জন্য কত লোকের সমাগম ঘটিত, এবং কত ছাত্রেরই চেষ্টা বিফলীকৃত হইয়া যাইত তাহার সংখ্যা করা যায় না; সুতরাং শলাকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের বহুশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইত; বহু জটিল গ্রন্থে দৃষ্টি থাকা ও তাহা একরূপ কণ্ঠস্থ রাখা প্রয়োজন হইত।

বিশারদ এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; ইহাতে এই ফল হইল যে, অচিরেই তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; কেবল পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুর নহে, ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি বহুস্থানের লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। আজ পর্য্যন্ত ঐসকল স্থানে ইহাদের শিষ্য সম্পদ আছে।

বিশারদ এইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বিরহিত অখণ্ড যশোভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও অধিক দিন গৃহে অবস্থিতি করিলেন না, পণ্ডিতগণ এসকল সাংসারিক উন্নতিকে আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ বলিয়াই বোধ করেন; অতএব তিনি ভুক্তদধি–ভাণ্ডবৎ তৎপরিত্যাগপূর্ব্বক কামরূপে উপস্থিত

৬. ব্রাহ্মণ-বহুল বাণিয়াচঙ্গের যে সকল ব্রাহ্মণ মোসলমান রাজার অধীনে কার্য্য করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে না কি গৌতম বংশীয়গণের শিষ্য কেহ কোনও দিন ছিল না এবং এখনও অতি অল্পই আছে বলিয়া আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি। বলাবাহুল্য এই বিবরণী গৌতম বংশীয় ব্যক্তি প্রদত্ত এবং এস্থলে তদনুসারেই আমরা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

হইয়া পরতত্ত্বালোচনায় বিব্রত হইলেন ও সমাধি-যোগে জীবন-ত্যাগ করিলেন।[৭]

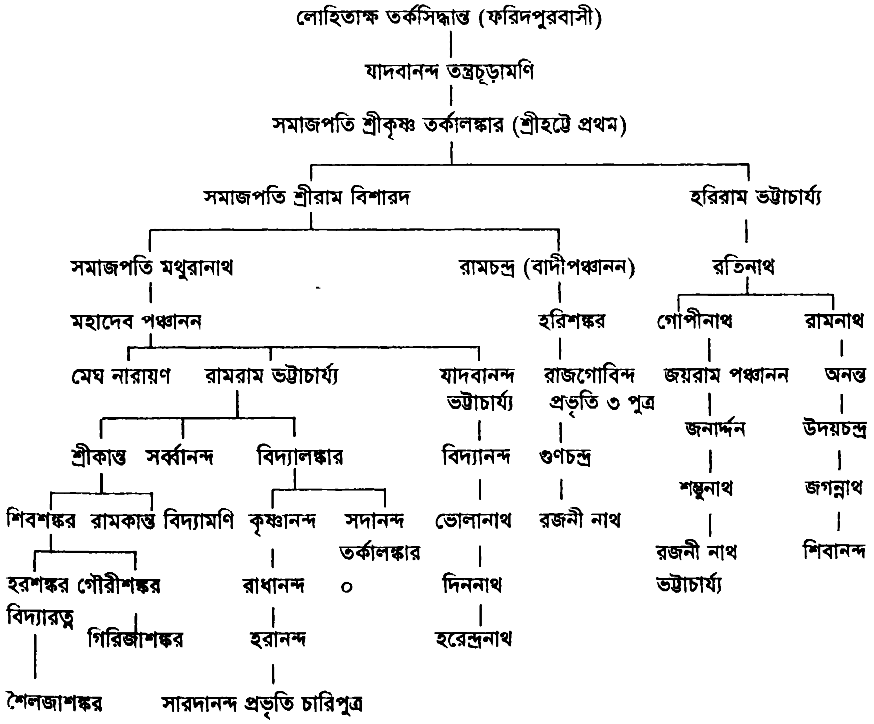
বিশারদের জ্যেষ্ঠপুত্র মথুরানাথ একজন সংসার-বিরাগী ব্যক্তি ছিলেন, পিতার মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া বাল্যাবধিই তাঁহার সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তিনি বাড়ীতে যোগচর্য্যাতেই বৃত থাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠের সংসার-বৈরাগী দর্শনে সানন্দে স্বার্থ-সংসাধনে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু মথুরানাথের স্ত্রীর ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি তদীয় স্বার্থ-সাধনের অন্তরায় স্বরূপ হইলেন।

ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লোহিতাক্ষের বংশ পরিচয়ে আরও কতক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া বাণিয়াচঙ্গবাসী হন ও কতক যজমান-শাসন পাইয়াই তৃপ্ত থাকেন। বিশারদ বর্ত্তমান থাকা কালে ইহাদিগকে বিদ্বিষ্ট ভাবাপন্ন দৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে অবসর পাইয়া তাহারা রামচন্দ্রকে লইয়া এক দলাবদ্ধ হইলেন। বিশারদ বংশের গৌরব এই দলাদলিতে অনেকটা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

মথুরানাথের বুদ্ধিমতী পত্নী ইহা লক্ষ্য করিলেন; তিনি দেবরকে ডাকিয়া আনিয়া এসকল কথা কখন কখন বুঝাইতেন, কিন্তু রামচন্দ্র একদিনও তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তখন বাধ্য হইয়া তিনি দেবর হইতে পৃথক থাকেন। বাদি বা বিপক্ষদের সহিত ঘনিষ্ঠতা বশতঃ রামচন্দ্র সাধারণের নিকট "বাদি" অভিধা প্রাপ্ত হন।[৮]

---

৭. বাণিয়াচঙ্গের গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বংশ তালিকার একাংশ এই ঃ–



৮. ইহার পরে এই বংশ যখন মথুরানাথের পুত্র মহাদেব পঞ্চননেব নামে খ্যাত হয, তখন রামচন্দ্রের বংশ শাখাও "বাদিপঞ্চানন" নামে পরিচিত হয়।

আশুতোষের দর্শন দান

যখন রামচন্দ্র এইরূপ স্বার্থ-সাধনে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, তৎকালে মথুরানাথের আহারাদির সহিত বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না; তিনি বাড়ীতে বড় আসিতেন না। একদিন ঐ সময়ে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে বাড়ীতে আসিলে, তাহার পত্নী গৃহত্যাগ করিয়া তদীয় অনুগামিনী হইতে ইচ্ছা করিলেন; পতি স্বীকৃত হইলেন না। পত্নী পতি-সদনে দেবরের অন্যায়াচার ও সংসারে নিজের অনাস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন। পতি বলিলেন–"তোমার এ সংসার-বিরাগ, আসক্তিরই রূপান্তর। ইহা বৈরক্ত্য নহে, ভোগ-স্পৃহা বাধা প্রাপ্ত হইলে ঈদৃশ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। যাহারা ইহাকে অনাসক্তিবোধে সংসার ত্যাগ করে, দুদিন পরেই দ্বিগুণ তেজে তাহাদের আসক্তি উপস্থিত হয় এবং তাহারা ভণ্ড বলিয়া পরিগণিত হয়। তুমি এ পথ পরিত্যাগ কর, অন্তর্য্যামি আশুতোষের আরাধনা কর–ভাবানুরূপ লাভ হইবে।"

সেদিন মথুরানাথ গৃহে রহিলেন। মথুরাথের স্ত্রী তখন প্রৌঢ়বয়স্কা। কিছুদিন পরে এই বয়সে তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। আর একদিন মথুরানাথ গৃহে আসিলে তাঁহার পত্নী স্বামীকে একটি স্বপ্নের কথা বলিলেন; তিনি যেরূপে মহাদেবকে নিজ পুত্ররূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে কোলে করিতে গিয়াছিলেন ও তৎকালেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল ইত্যাদি বলিলেন।

পত্নীমুখে স্বপ্ন-কথা শ্রবণে মথুরানাথ অতি বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কারণ এই যে, ঠিক সেই রাত্রে ধ্যানে বসিয়া মানস নেত্রে তিনি সমুজ্জল সুশুভ্র স্নিগ্ধ-কিরণ খণ্ডের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধৃত-ত্রিশূল পুরুষকে, তুষার-ধবল বৃষভারূঢ়রূপে স্বসদনে সমুপস্থিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। পত্নী-মুখ-শ্রুত বৃত্তান্তে তাই তিনি বিস্মিত হইলেন।

মথুরানাথের পত্নী, গর্ভের একাদশ মাসে একটি পুত্র প্রসব করিলেন; দৈবাৎ মথুরানাথ সেদিন গৃহে ছিলেন, তিনি শিশুদর্শনে গিয়া দেখিলেন যে, শিশুর গলদেশ বেষ্টন করিয়া একটি সর্পও জাত হইয়াছে! শিশুকে দেখিয়া মথুরানাথের মনে না-জানি কি ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইল, তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মথুরানাথের এই পুত্রের নাম মহাদেবপঞ্চানন। ইঁহার অভ্যুদয়ে এই বংশ পবিত্র হইয়াছে, ধন্য হইয়াছে, মহাদেব পঞ্চাননের কাহিনী আমরা ৪র্থ ভাগে যথা প্রাপ্ত বিবৃত করিব।

বালকের জয়ার্জ্জন

মহাদেবের তিন পুত্র, তন্মধ্যে মেঘনারায়ণ যখন নয়বৎসরের বালক, তখন নবদ্বীপাধিপতি এক ব্যাপারোপলক্ষে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলাদি বহুস্থানের পণ্ডিতবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতবর্গের তো কথাই নাই। এই ব্যাপারে মহাদেব পঞ্চাননও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি "শিষ্য শাসনে" পর্য্যটনে থাকায়, পুত্র মেঘনারায়ণকে প্রতিনিধিরূপে কয়েকজন শিষ্যসহ নবদ্বীপ যাইতে আদেশ দেন।

নয়বৎসরের বালক মেঘ নারায়ণ মাত্র ব্যাকরণ শেষ করিয়াছেন, কিন্তু শিষ্যবর্গের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বিদেশ গমনে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার জননী ভগবতী দেবীর মনে এক ভাবের উদয় হইল, ভাবিলেন এই শিশু সেই পণ্ডিত সভায় গিয়া কি করিবে? ইহার দ্বারা তাঁহার শ্বশুরের ভুবন বিজয়ী খ্যাতি, তাঁহার পতির অসীম প্রতিপত্তি কি রক্ষিত হইতে পারিবে? ভগবতী পতির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তন্ত্রে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি অনেক চিন্তা করিয়া, যাত্রাকালে তন্ত্রোক্ত সিদ্ধ "বিজয় মন্ত্র" পুত্রের জিহ্বায় লিখিয়া, "বৎস, বিজয়ী হও" এই আশীর্ব্বাদের সহিত বিদায় দিলেন।

মেঘ নারায়ণ যখন নবদ্বীপে পৌঁছিলেন, লোক পাঠাইয়া রাজা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সভায় আনয়ন করিলেন। কিন্তু মহাদেবের পরিবর্ত্তে এই বালকমূর্ত্তি দর্শনে সভাসদবর্গের প্রীতি জন্মিল না। সেই সভাসীন এক "দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত" বালক মেঘ নারায়ণকে দেখিয়া দর্পভরে বলিয়া উঠিলেন "ইচ্ছা ছিল মহাপণ্ডিত মহাদেবকে এই মহাসভায় পরাজয় করিব। ভয়েই বোধ হয় তিনি পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। আর স্বর্ণ-বলয়-ভূষিত বালক! তুমি কি সঙ্গীত শুনাইতে আসিয়াছ? আশ্চর্য্য মহাদেবের বুদ্ধি! এ তো গ্রাম্য নিমন্ত্রণ নহে যে, ছেলে পাঠাইয়া "সমাজত্ব" রক্ষা করিতে হইবে। ধিক্ তাহাকে, যে পরাজয় ভয়ে আত্মগোপনে ঘৃণা করে না।"

বালক মেঘ নারায়ণ পিতৃ-নিন্দা সহিতে পারিলেন না, ভুজঙ্গ-শিশুর ন্যায় উন্নত মস্তকে সদর্পে বলিয়া উঠিলেন,–"পণ্ডিত! তুমিই ধিক্কৃতি যোগ্য–পূজনীয় পিতা নহেন। যে পণ্ডিত হইয়া বৃথা দম্ভ করে, সে মূর্খ; সে দিগ্বিজয়ী নহে–সর্ব্বত্র পরাজিত। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি দম্ভকর্তৃক নির্জ্জিত–সে পরাজিত; দিগ্বজয়ী তাহাকে কে বলে? সঙ্গীত-কারক ছোকরার হাতে স্বর্ণবলয় থাকে, এই সাদৃশ্যে আমাকে উপহাস করিয়াছ; ইহাই কি তোমার পাণ্ডিত্য? পক্ককেশ পিতৃসাদৃশ্যে সুতরাং তুমি ঐ সম্মুখবর্ত্তী ভৃত্যকেও পিতৃসম্বোধন করিতে পারে; সাদৃশ্যেই তোমার প্রমাণ–বস্তু বিচার নহে।"

পিতৃ-নিন্দা-কাতর উত্তেজিত দ্বিজ-সুতের সঙ্গত কথা চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সভায় তাঁহার জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। বালকের বাক্যে দিগ্বিজয়ী লজ্জিত ও নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি পরাজিত হইলেন। সমাগত পণ্ডিতবর্গ সেই সভায় বালককে "তর্কভূষণ" উপাধি দিলেন।

তখন কখন কখন পরাজিত ব্যক্তির মাথার উপর বিজিত পণ্ডিত আপন উপবেশনাসন ঝাড়িয়া দিতেন; ইহাতে তাহার পরাজয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত। উত্তেজনা বশতঃ এবং কাহার কাহারও ইঙ্গিতে, মেঘ নারায়ণ সেই প্রথামত পরাজিতের মাথায় আসন ঝাড়িয়া দিলেন। দলিত-ফণ সর্পের ন্যায় তখন দিগ্বিজয়ী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন–"জেঠা ছেলে, তুমি যে অবৈধতা করিলে, তাহার ফলে তোমার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি অন্যকে জয় করিলে জীবিত থাকিবে না। পণ্ডিত হইলেই মৃত্যু হইবে।"

মাতৃ আশীর্ব্বাদে বালক মেঘ নারায়ণ বিজয় গৌরবের সহিত বাড়ী আসিলেন, মহাদেব শিষ্যগণের মুখে পণ্ডিত-পরাজয়ের কথা শুনিয়া সুখী হইলেন না। বিমর্ষভাবে তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, দৈবতঃ পুত্রকর্তৃক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরাজিত হইয়াছেন, ইহা দৈবখেলা মাত্র; কিন্তু পণ্ডিতকে অপদস্থ করা বালকের পক্ষে ভাল হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন–আশ্রিত দৈবশক্তি অযথা ক্ষয়িত হইলে, ইহা ইষ্টদায়ক হয় না এবং পুনঃ লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সতীর অদ্ভুত কীর্ত্তি কথা

যাহোক, মেঘ নারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় দেখিতে দেখিতে বিবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পিতৃনিষেধানুসারে তাঁহারা কেহই কোন উপাধি গ্রহণ করিলেন না। মেঘ নারায়ণের সন্তানসন্তুতি হয় নাই।

মহাদেবের মধ্যম পুত্র রামরামের স্ত্রী পরম সাধিকা ছিলেন, তাঁহার বারব্রত পালন ও ইষ্টনিষ্ঠা অদ্ভুত ছিল। তদ্ব্যতীত রমণীর সারধর্ম্ম–অনন্য সাধারণ পণ্ডিতভক্ত তাঁহার প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিল। পাতিব্রাত্য ফল প্রভাবে তাঁহার এরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, ভবিষ্য

ব্যাপারের চিত্র তদীয় চিত্ত-ফলকে প্রতিফলিত হইত। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে ফলিয়া যাইত, অনেকেই তাহা পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

একদিন তিনি আপনার ননদী ও দেবর-জায়াকে সহাস্য বদনে বলিলেন-"আমরা কাল তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, ছেলে দুটিকে তোমাদের হাতে সঁপিয়ে দিলাম।" রমণীদ্বয় তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইহা পরিহাস বলিয়াই মনে করিলেন।

সতীর স্বামী তখন সুস্থ শরীরে গৃহে ছিলেন, কিন্তু পরদিন হঠাৎ তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল-স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ দেখিতে দেখিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন সতীর পূর্ব্বদিনের উক্তি আলোচনায় আত্মীয়বর্গ ভীত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে সতী নিশ্চিন্তভাবে স্নানান্তে শিবার্চ্চনা করিয়া আসিলেন, রামরাম ততক্ষণ পরিজন পরিবৃত ভাবে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছেন। দেবগৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া সতী জনে জনে বিদায় লইলেন। স্ত্রী মহলে উচ্চ ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিয়াছে; সতী অবিকৃতচিত্তে পতিসদনে আসিলেন ও ভক্তিভাবে মুমূর্ষু স্বামীর চরণে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন; শূন্যপ্রাণ দেহ পতিপদে পড়িয়া রহিল! ক্ষণপূর্ব্বে বদনে যে হাস্যরেখা দেখা গিয়াছিল, তাহা আরও যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, ক্রন্দন কোলাহল মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। পতিভক্তির এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত কেহ কখন দেখে নাই, শুনেও নাই। কি শক্তিবলে সতী স্বেচ্ছায় পতির অগ্রে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কেহ বুঝিল না; তাঁহারা কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পরে সকলে সমস্বরে সতীর জয়ধ্বনী দিয়া উঠিল।

রামরামের শেষ শ্বাস তখনও মহাকাশে মিলে নাই। অবশেষে প্রতিবেশী দর্শকের নিরাশ আহ্বানে, তাহাদের ভক্তিপূত জয়ধ্বনিতে যখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, সতীর মহাপ্রস্থানের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারও গমনোন্মুখ প্রাণ দেহ ছাড়িয়া পত্নীর পথানুসরণ করিল। সতীর বাক্য সফল হইল, পতিপত্নী একসঙ্গে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

সর্ব্বানন্দের কথা

রামরামের দুই পুত্র, শ্রীকান্ত ও সর্ব্বানন্দ। উভয়েই কালক্রমে পরম পণ্ডিত হইয়া উঠেন। সর্ব্বানন্দ উপাধি গ্রহণে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া পড়েন। আত্মীয়বর্গ নিষেধ করিলে বলিতেন-"স্বয়ং মহাদেবের পৌত্রকে দাম্ভিক দিগ্বিজয়ীর অভিশাপে কি করিবে?" আত্মীয়গণ তখন অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ দেন, সেই স্ত্রীর গর্ভে উপাধি গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার কৃষ্ণানন্দ নামে এক পুত্র জাত হয়; সর্ব্বানন্দ তৎপরে "বিদ্যালঙ্কার" উপাধি গ্রহণে পণ্ডিত-সমাজে সুপরিচিত হন।

এই সময়ে তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা বিদ্যানন্দ কৌলিক শিষ্যাদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দস্যুভয়ে বরদাখাত প্রভৃতি দূরবর্ত্তী অঞ্চলে শিষ্যশাসনে যাইতেন না; তাহাতে যে সব অঞ্চলের বহু শিষ্য দেশে অপর গুরু স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

সর্ব্বান্দের প্রকৃতি ভিন্নরূপ ছিল, তিনি দূরদেশে যাইতেই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। একদা বিক্রমপুরে একস্থানে গিয়াছেন, তথায় মহেশ্বরদিবাসী কয়েক ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিল যে, তিনি তাঁহাদের কৌলিক গুরুপুত্র; তাঁহারা বহুদিন গুরুবংশীয় কেহকে না পাইয়া অন্যত্র দীক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের বিশেষ অনুরোধে সর্ব্বানন্দকে মহেশ্বরদি যাইতে হইল, পথে তাঁহার নৌকা দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কথিত আছে যে, তিনি তখন মাঝি মাল্লাকে নৌকার ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া এক অদ্ভুত স্বরে তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন আর সকলে দেখিয়া চমকিত হইল যে, আক্রমণকারী সাতটি দস্যু তাঁহার নৌকায় উঠিয়াই মৃগীগ্রস্ত রোগীর

ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল! অপর দস্যুগণ তদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া পলাইল।

এই গল্প মহেশ্বরদিতে প্রচারিত হইয়াছিল। সর্ব্বানন্দের যোগ্যতাদৃষ্টে মহেশ্বরদির অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য হয়। এথা হইতে তিনি ভাওয়াল পরগণায় গমন করেন, সেখানেও তাঁহার বহু শিষ্য হয়। অতঃপর তিনি দেশে আগমন করেন। বাড়ী আসিয়া দেখিতে পান যে, তাঁহার আর একটি পুত্র জন্মিয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তেজস্বিনী শিবশঙ্করী

সর্ব্বানন্দের পত্নী শিবশঙ্করী পতি পরায়ণা, পরমা সুন্দরী ও প্রভাবশালিনী তেজস্বিনী রমণী ছিলেন; তিনি শিশু পুত্র রাখিয়া পতির অনুগামিনী হইতে পারেন নাই। তেজস্বিতার জন্য লোকে তাঁহাকে শ্মশানকালী বলিয়া ডাকিত। একদা তিনি নৌকা যোগে বরিশালে "শিষ্যশাসনে" গিয়া, স্বামীর শিষ্য জনৈক জমিদারকে দোলা পাঠাইতে সংবাদ দিলেন। জমিদার দোলা লইয়া তাঁহাকে লইতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটু তাচ্ছিল্য জন্মিল। তাঁহার আকার ইঙ্গিতে বুদ্ধিমতী শিবশঙ্করী তাহা বুঝিতে পারিয়া, জমিদার নৌকায় উঠিতে না উঠিতে বলিয়া উঠিয়া উঠিলেন—"অবজ্ঞা! মাঝি, নৌকা ছাড়িয়া দে, উহার বাড়ীতে আর যাওয়া হইবে না; স্ত্রীলোক বলিয়া তাচ্ছল্য!"

জমিদার লজ্জিত হইলেন; তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল; তিনি তখন কাকুতিমিনতি করিয়া গুরুপত্নী শিবশঙ্করীকে গৃহে লইয়া গেলেন। জমিদার তাঁহার প্রতি তখন বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু শিবশঙ্করী এই বর্দ্ধিষ্ণু শিষ্য তাঁহার পিসী শাশুড়ীকে অর্পণ করিলেন। পিসী শাশুড়ী-বেজোড়ার রমানাথ বিশারদের পুত্রবধূ একসময় ঐ জমিদার শিষ্যপ্রাপ্তির অভিপ্রায় তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শিবশঙ্করী এরূপ দৃঢ় হৃদয়া রমণী ছিলেন যে, অভিশাপের ভয় সত্বেও আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে উপাধি গ্রহণের আদেশ দেন, তদনুসারে সদানন্দ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক "তর্কালঙ্কার" উপাধি ধারণ করেন। ইহাতে অপরেরাও সাহসী হয় এবং শ্রীকান্তের পুত্রগণের মধ্যে রামকান্ত সাহস করিয়া "বিদ্যামণি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। উপাধি গ্রহণের পূর্ব্বে রামকান্তের একটি পুত্র জাত হয়, সদানন্দের পুত্রাদি হয় নাই।

এ বংশে তন্ত্রশাস্ত্রে সকলেই শিক্ষিত এবং সকলেই তান্ত্রিক সাধক ও ক্রিয়াপর ছিলেন। সদানন্দের অগ্রজ কৃষ্ণানন্দের যোগাভ্যাসে বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। তিনি অন্তিমকালে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

শেষ কথা

কৃষ্ণানন্দের পুত্রের নাম রাধানন্দ, তিনি শুধু বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এমন নহে, তাঁহার ন্যায় পরোপকারী ও দয়ালু ব্যক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; নিজের অভাব অসুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অন্যের অভাব অপ্রতুল বিদূরিত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার এতাদৃশ দক্ষতা ছিল যে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কয়েক দিন আগেই রোগীর মৃত্যুর দিন বলিতে পারিতেন। ইঁহারই পৌত্র শ্রীযুত সারদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে আমরা তাঁহাদের এই বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীকান্তের পুত্রের নাম শিবশঙ্কর, তৎপুত্র হরমঙ্করও "বিদ্যারত্ন" উপাধি ধারন করেন। ইনিও দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা উপাধির উপযুক্ত বিদ্যার্জ্জন করিয়াও

শাপভয়ে উপাধি গ্রহণ করেন নাই। ইনি অতি তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন।

এই বংশীয়গণের গৌরব, প্রতিপত্তি যে অত্যধিক ছিল, দূরবর্ত্তী ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও শিষ্য সম্বন্ধ থাকাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীহট্টের নবাব সরকারেও তাঁহাদের বৃত্তি অবধারিত ছিল; প্রত্যহ এক কাহন কৌড়ি তাঁহারা প্রাপ্ত হইতেন। শিবশঙ্করের সময় পর্য্যন্তএই বৃত্তি রীতিমত আদায়ের নিদর্শন পাওয়া যায়; তাহার পর এই বৃত্তি বাহাল ছিল কি না, জানা যায় না।

বাণিয়াচঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশই বিদ্যমান; তন্মধ্যে সামবেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয়েরা কাত্যায়নের দৌহিত্র বংশ; জাতুকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদ একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, ইঁহার কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে নানাস্থানে বলা হইয়াছে।[৯] পণ্ডিত-কুল-পর্ব্বত মুরারি বিশারদ বাণিয়াচঙ্গের শেষ হিন্দু নৃপতি গোবিন্দের ভগিনীপতি ছিলেন। তাঁহাদের দৌহিত্র বংশ বলিয়া উক্ত হন। তদ্ব্যতীত সাবর্ণগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ বংশের কতক যজমান শাসন বাণিয়াচঙ্গে ছিল বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত চতুরঙ্গ রায়ের পাড়ার যজুর্ব্বেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং অপর বহু ব্রাহ্মণ বংশ বাণিয়াচঙ্গে বিদ্যমান। কিন্তু কাত্যায়ন, কাশ্যপ ও গৌতম ব্যতীত অপর কোনও বংশে বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই।[১০]

৯. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. আমরা ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৩য় খণ্ডে এই সকল বংশ বিবরণ বর্ণন করিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম কিন্তু আমরা তদ্বংশীয় হইতে কোনও বিবরণী না পাওয়াতে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিলাম না।

তৃতীয় অধ্যায়
বিবিধ বংশীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ

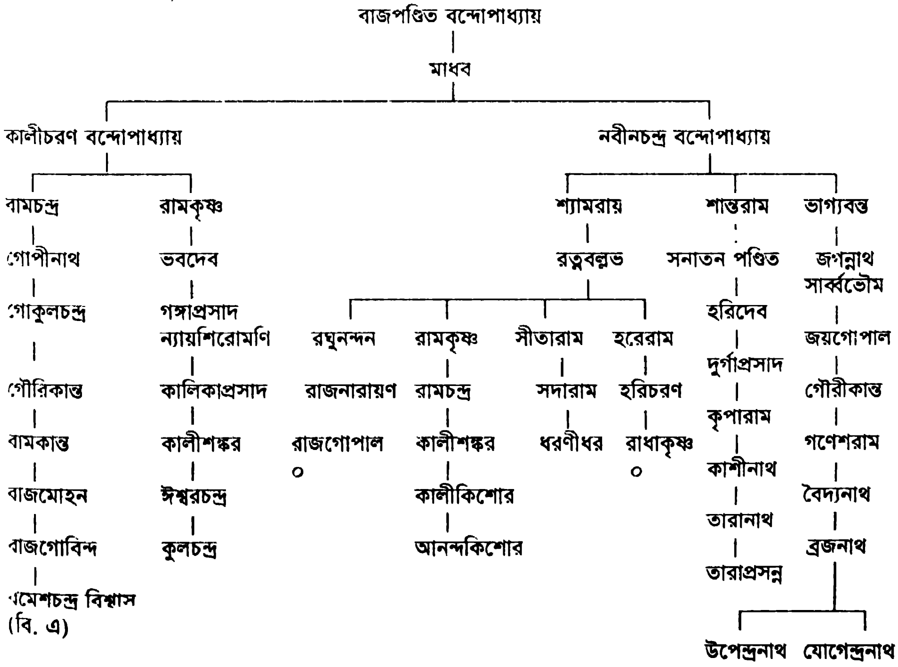
পরগণা-রঘুনন্দন

নামতত্ত্ব ও বন্দ্যোবংশ

খৃষ্টীয় সপ্তাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তরফ পরগণার মধ্যাংশে নরপতিদের নামে এক ভূস্বামী ছিলেন, তিনি নিজ অধিকৃত জঙ্গল আবাদ ক্রমে আপনার নামে নরপতি গ্রাম স্থাপন করেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাঠাদিয়া গ্রামের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিবিশিষ্ট জনৈক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে উক্ত নরপতি নিজসভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। রাজা নরপতির সভাপণ্ডিত হওয়ায় তিনি "রাজপণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়" নামেই পরিচিত হইয়া নাপিতাদি ভৃত্যবর্গ সহ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম কি ছিল, ঠিক জানা যায় না; তবে তাঁহার পরবর্ত্তী এক ব্যক্তি মাধব দাস নামে সংজ্ঞিত হইতেন। তাহার পর কালীচরণ ও নবীন চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের উদ্ভব হয়।[১] নবীনচন্দ্রের পুত্র শ্যামরায়, তৎপুত্র রত্নবল্লভ। রত্নবল্লভের চারিপুত্র, ইঁহাদের নাম রঘুনন্দন, রামকৃষ্ণ, সীতারাম ও হরেকৃষ্ণ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনন্দন দিল্লী গমন করিয়া বাদশাহ দরবারে কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত হন ও কিছুকাল মধ্যেই অনেকের

---

১ ইহাদের বংশাবলী, যথা ঃ–



পরিচিত হইয়া উঠেন। ইনি স্বীয় ক্ষমতায়, নরপতি করেন, তাঁহার নামেই সেই ভূখণ্ড "রঘুনন্দন" পরগণা বলিয়া খ্যাত হয়।

দশসনা বন্দোবস্তের সময় এই পরগণার দুইটি মাত্র তালুকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১নং তাং রঘুনন্দন বন্দোপাধ্যায়ের নামেই বন্দোবস্ত হয়। ঠিক এই সময় বৃদ্ধ রঘুনন্দনের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেরাম ও ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র এবং সদারায়ের মনান্তর হওয়ায় ভূসম্পত্তি বিভাগিত হইয়া চিহ্নিত "বাটুয়ারা" হয়।

রঘুনন্দনের পুত্র রাজনারায়ণ ত্রিপুরার মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মন্ত্রণা সভার পরিষদ ছিলেন। মহারাজপ্রদত্ত একটি তালুক মনতলায় এখনও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। পরবর্ত্তী বংশীয়গণ মধ্যে রামচন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎপুত্র কালীশঙ্কর একজন মল্ল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার আহারও তদনুরূপ ছিল। মোনশী গৌরীকান্ত আরবি ভাষায় সুবিজ্ঞ ছিলেন।

আমাদের বিবরণ প্রদাতা শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস লিখিয়াছেন যে, এই বন্দ্যোবংশীয় ব্রাহ্মণবর্গ বর্ত্তমানে বিশ্বাস উপাধি ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই মোসলমান জমিদারের অধীনে কার্য্য করিয়া এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা জমিদার গৃহে কার্য্য করেন নাই, তাঁহারা বন্দোপাধ্যায় বলিয়াই পরিচিত ছিলেন; বর্ত্তমানে একজন মাত্র–তিনিও অপুত্রক–সেই উপাধি ধারণ করিতেছেন।

এই বংশীয়গণ এখনও রঘুনন্দন পরগণায় বাস করিতেছেন। নরপতিনামে যে ভূস্বামী রাজপণ্ডিত বন্দোপাধ্যায়কে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশ নাই।

পরগণা–বেজোড়া

বেজোড়ার বিশারদ বংশ

পরগণা বেজোড়ার নামকরণ সম্বন্ধে তরফের বিবরণে একটি শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে।[২] বেজোড়া পরগণার নিজ বেজোড়াবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষের নাম অচ্যুতানন্দ। এ বংশে ইনিই প্রথম শ্রীহট্টে আগমন করেন ও বেজোড়াবাসী হন। ইঁহার পুত্রের নাম কংসারি, তৎপুত্র রামচন্দ্রের বাসুদেব, রতিদেব ও রঘুদেব নামে তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে রতিদেবের বংশই সুবিস্তৃত।

রতিদেবের দুই পুত্র, লক্ষ্মীকান্ত ও রমানাথ বিশারদ। রমানাথ এই বংশের এক অত্যুজ্জল রত্ন। রমানাথ একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁহার জীবনের সহিত জড়িত, তাঁহার অলোক-সামান্য মহিমাদর্শনে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশ তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল শ্রীহট্ট জেলা নহে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, এমন কি পরম্পরা সম্পর্কে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত তদীয় শিষ্যশাখা বিস্তৃত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিশারদ উপাধি প্রাপ্ত হন, তদবধি এই বংশ "বিশারদ বংশ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বাণিয়াচঙ্গের সিদ্ধ মহাত্মা মহাদেব পঞ্চাননের সহিত ইঁহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, উভয়ে প্রায়শঃ একত্র থাকিতেন, উভয়ে যেন "হরিহর আত্মা"–এতই একাত্মতা ছিল। বিশারদের কাহিনী আমরা ৪র্থ ভাগে যথাপ্রাপ্ত বলিব।

বিশারদেব পুত্রগণ মধ্যে-মহাদেব পঞ্চাননের জামাতা বাণেশ্বরও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। পুরাকালে শিষ্যগণ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে লক্ষ্য করিতেন। বাণেশ্বরের

২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায় দেখ।

আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য দর্শনে শিষ্যগণের অধিকাংশ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

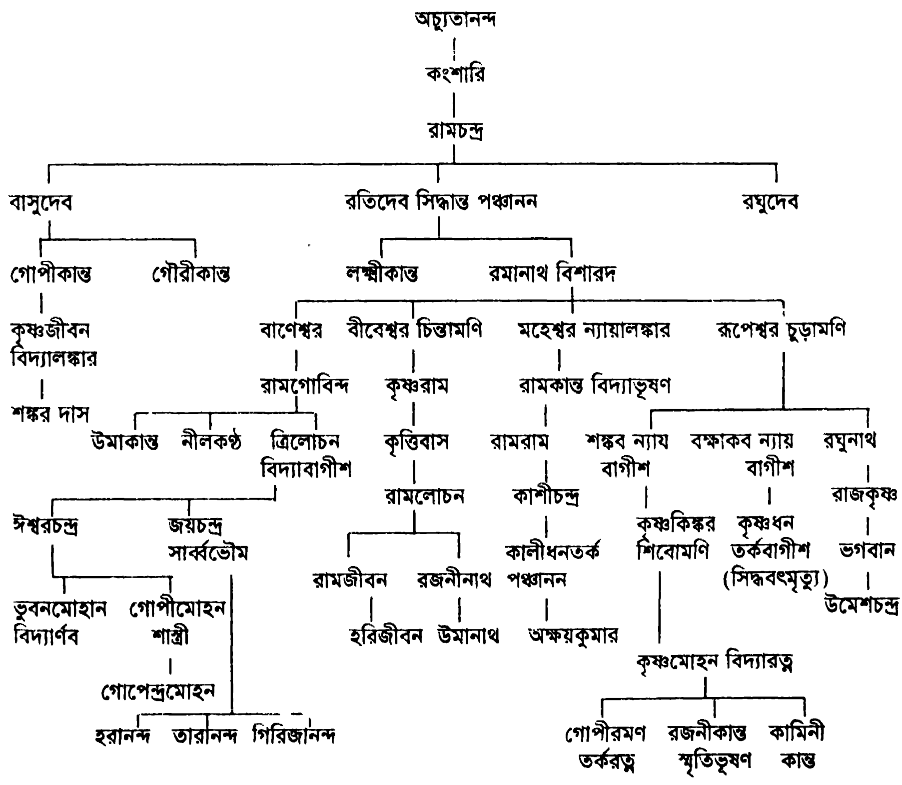
বাণেশ্বরের পুত্র রামগোবিন্দ এবং তাঁহার পুত্র উমাকান্ত ও নীলকণ্ঠ প্রত্যেকেই এক এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। বিশারদ বংশে অনেক মহিমান্বিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩] ভূতপূর্ব্ব দেশবার্ত্তা সম্পাদক এবং বর্ত্তমান সুরমা সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব মহাশয়ও এতদুপলক্ষে একখানা পত্রে লিখিয়াছেন "এই বংশে পুরুষ পরম্পরা শুধু পণ্ডিত নহেন, বাক্‌সিদ্ধ তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ বিস্তর ছিলেন।"

পরগণা-আগনা

চৌধুরী বংশের কথা

আগনা পরগণা নবিগঞ্জ থানার অধীনে অবস্থিত। এই পরগণাতে ২৮টি মৌজা বা গ্রাম আছে, তন্মধ্যে মধ্যসমত (মধ্যসমস্ত) গ্রামই প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রামবাস চৌধুরী, পুরকায়স্থ, তালুকদার ও বড়াল বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ সম্মানিত। সামবেদীয় ভরদ্বাজ গোত্র সম্ভূত হৃষীকেশ নামক একব্যক্তি মোসলমান ভয়ে রাঢ়দেশ হইতে বড়াল বংশীয় স্বীয় পুরোহিত ও পরিকর সহ মধ্যসমত গ্রামে আগমন করেন। ইহার পুত্রের নাম মথুরেশ, তৎপুত্র মহাবিরাট, তাঁহার পুত্রের নাম মহানন্দ, মহানন্দের পুত্র গোপীনাথ হইতে এই বংশ তিন শাখায় বিভক্ত

৩. বেজোড়ার বিশারদ বংশ তালিকার একাংশ–



হয়।[৪] গোপীনাথের তিন স্ত্রী ছিলেন, যথাক্রমে ইঁহাদের গর্ভে শ্রীমন্ত, শ্রীবল্লভ ও শ্রীবৎস নামে তিন পুত্র হয়, ইহাদের বংশ বর্ত্তমান।

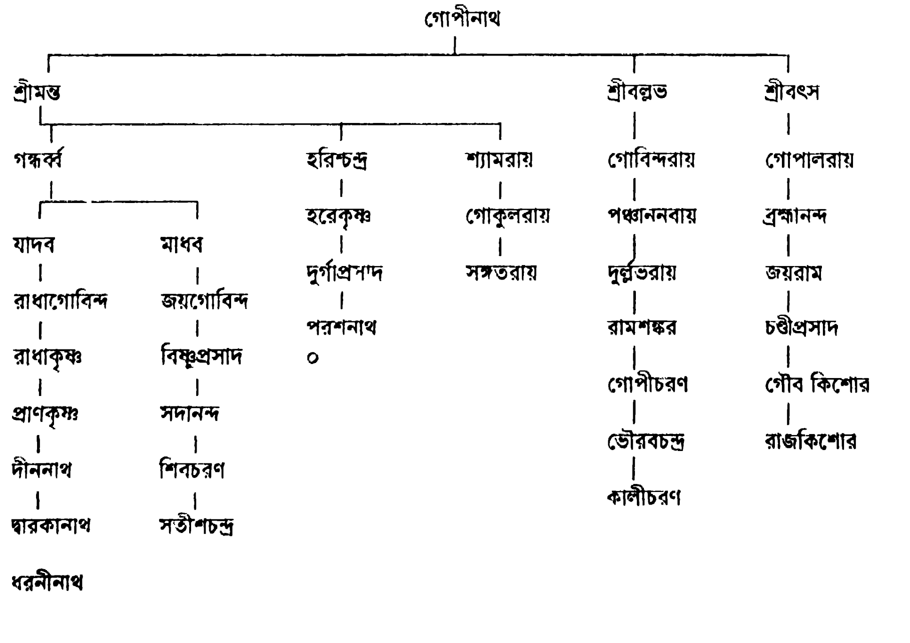
কথিত আছে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এ অঞ্চলে কার্য্যবশতঃ আগমন কালে পথিমধ্যে অনুযাত্রিবর্গের সঙ্গচ্যুত ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন, পথভ্রষ্ট এই কর্ম্মচারীকে গোপীনাথ আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি সময়ে সেই প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া গোপীনাথকে আগনা পরগণার চৌধুরাই সনন্দ দেওয়াইয়াছিলেন। "সুবাদার মানসিংহের সময়ে গোপীনাথ আগনা পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত চৌধুরাই সনন্দ গ্রহণ করেন।"

ঠাকুর পরশ ও জয়ন্তী দেবী

গোপীনাথের ষষ্টপুরুষে ঠাকুর পরশ নামে জনৈক মহাত্মার উদ্ভব হয়, তিনি একজন ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার একটি গানের এক ছত্রে লিখিত আছেঃ–"হরিনামে আকুল হইয়া কান্দে পরশ ব্রাহ্মণ"। পরশের পত্নীর নাম জয়ন্তী দেবী, জয়ন্তীও পরম সাধিকা ছিলেন, অধিকন্তু তিনি শাকুনিক বিদ্যা জানিতেন। সময় বিশেষে কাকের বিশিষ্ট শব্দে বিশেষ ভাব ব্যঞ্জিত হয় বলিয়া কথিত। এই সঙ্কেত "কাক চরিত্র" নামে খ্যাত। জয়ন্তী একদা কাকধ্বনি বিশ্লেষণে তাঁহার স্বামীর সন্নিকট-মৃত্যু সমাচার অবগত হইতে পারিয়া অতি বিচলিতা ও চিন্তাকুলিতা হইয়া পড়েন। তবে কি স্বামীর অগ্রে সতীর দেহত্যাগ ঘটিবে না? যাহাতে স্বামীর অগ্রে স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন, তজ্জন্য স্বামীর নিকটে তিনি কাতরভাবে "বর" প্রার্থনা করিলে, সিদ্ধপুরুষ পরশ পত্নীর অভিপ্রায় মত তাঁহাকে মৃত্যুবর প্রদান করিলেন। তাঁহার পর জয়ন্তী সংসারের সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়া, স্বামীর পদমূলে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে মৃত্যু কামনাপূর্ব্বক তীব্রভাবে মৃত্যুচিন্তা করিতে করিতে ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করিলেন। এই

---

৪. চৌধুবীবংশের বিস্তৃত তালিকা হইতে এক একটি ধাবা এস্থলে প্রদর্শিত হইল–



কলিযুগে সতীর স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগের ঈদৃশ উদাহরণ দৃষ্টে লোক স্তম্ভিত হইয়া তদীয় মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। আজ পর্য্যন্ত সতীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকথা বিলুপ্ত হয় নাই, আজ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া লোকে এই কথা পরিকীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া থাকে। যথাপ্রাপ্ত এ অদ্ভূত বৃত্তান্তটি এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম।

ঠাকুর পরশের খুল্লতাত সঙ্গতরায় বানপ্রস্থ আশ্রমাবলম্বনে "সঙ্গতরায় ব্রহ্মচারী" নামে অভিহিত হইতেন।

গোপীনাথের ৬ষ্ঠ পুরুষে শ্রীবল্লভ শাখায় রামশঙ্কর রায় নিজ পিতার শ্মশান ভূমিতে পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ এক ইষ্টক মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। ইনি একজন জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত ছিরেন; গণনা দ্বারা নিজ মৃত্যুকাল অবধারণে, যথাকালে কলিকাতায় গিয়া কালীগঙ্গা লাভ করেন।

এ বংশীয় কাশীনাথ চৌধুরী কাশীতে কাশীনাথ শিব স্থাপন করিয়া কাশী প্রাপ্ত হন বলিয়া আমাদের প্রাপ্ত বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু (উক্ত বংশীয় জনৈক ব্যক্তি প্রেরিত) আগনার মুদ্রিত চৌধুরী বংশের তালিকাতে ইহার নাম দৃষ্ট হইল না।

পরবর্ত্তী কালে এ বংশে যাঁহারা আর্থিক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠ শ্যামানন্দ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য; ইনি প্রায় ২৫ বৎসর কাল মোক্তারী ব্যবসায় করেন; ইঁহার মাসিক আয় সহস্র মুদ্রার ন্যূন ছিল না; নিজ চেষ্টাতেই ইনি প্রায় পঞ্চসহস্র মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

পুরকায়স্থ বংশ কথা

এই বংশের আদিপুরুষ সুবিদরায়, রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া প্রথমে দুলালীতে কিছুকাল বাস করেন বলিয়া আমাদের বিবরণ প্রদাতা লিখিয়াছেন। পরে তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আগনা পরগণার মধ্যসমত মৌজায় গিয়া বাড়ী প্রস্তুত করেন। পরে ইহার বংশধরগণ রাজকীয় পাটওয়ারি পদে নিযুক্ত হইয়া পুরকায়স্থ পদবি প্রাপ্ত হন।

এই বংশের হরেকৃষ্ণ পুরকায়স্থ ত্রিপুরার মহারাজের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া মহারাজের অনুগ্রহে অনেক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ইহার পরে রাধাকৃষ্ণও স্বীয় চেষ্টায় অনেক ধন অর্জ্জন করেন; ইনি রসুলগঞ্জের মুন্সেফীর উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ বংশে সুবিদরাম হইতে বর্ত্তমানে ৯/১০ পুরুষ চলিতেছে।[৫]

তালুকদার বংশ

এই বংশের আদিপুরুষের নাম যাদব। এই বংশের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই বংশীয় গৌরচরণ কৃত একটি অত্যুচ্চ মন্দির আছে, উহার উচ্চতা ১০০ হস্ত এবং পরিধি প্রায় ৪০ হস্ত। এই মন্দিরটি তিনি তাঁহার পিতার শ্মশান ক্ষেত্রে নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। গৌরীচরণ কাশীযাত্রা করিয়া সুদীর্ঘকাল কাশীবাসপূর্ব্বক কাশীপ্রাপ্ত হন।

৫. পুরকায়স্থ বংশের একটী বংশধারা এস্থলে প্রদত্ত হইল যথা ঃ–সুবিদবায়, ইহার তিন পুত্রের একজনের নাম জগৎবল্লভ, ইঁহার ২য় পুত্র ভবানন্দ, তৎপুত্র কাশীনাথ, তৎপুত্র বামগোপাল, তৎপুত্র পঞ্চানন, ইহার নন্দকিশোরও রঘুনাথ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে রঘুনাথের পুত্রই দেওয়ান হরেকৃষ্ণ, ইহার পুত্রের নাম প্রাণকৃষ্ণ। নন্দরামের পুত্রের নাম কেবলরাম, তৎপুত্র কীর্ত্তিরায়, তৎপুত্র রাম নারায়ণ। পূর্ব্বোক্ত জগৎবল্লভের অন্যপুত্র শিবানন্দের বংশে রাধাকৃষ্ণের উদ্ভব হইয়াছিল।

বড়াল বংশ

বড়াল বংশের আদিপুরুষের নাম বিজয় কেশব। হৃদয়ানন্দ ও হৃষীকেশ নামে ইঁহার দুই পুত্র ছিলেন। এই বংশেরও বিশেষ কোন কথা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। আমাদের বিবরণ প্রদাতা এবংশীয় জগৎবল্লভের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। জগৎবল্লভ দশসনা বন্দোবস্তের সময় জীবিত ছিলেন, তাঁহার নামে একটি তালুক আছে। কথিত আছে যে, একদা জগৎবল্লভ জনৈক চৌধুরীর গৃহে কালীপূজা সমাধা করিয়া, নিশীথ রাত্রে বাড়ী আগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে এক বিকট ও বিরাট মূর্ত্তি তাঁহার পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইল। জগৎবল্লভের দক্ষিণ হস্তে পূজার তৈজসপত্র ছিল। তদবস্থায় সাধক ভীত না হইয়া বামহস্তে ঐ বিকট মূর্ত্তির কেশাকর্ষণ করিলেন ও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ ও বশীভূত করিলেন। তিনি ইহার রামদাস নাম রাখিলেন। রামদাস ভৃত্যবৎ তাঁহার সঙ্গে চলিল। রামদাস বার বৎসর কাল তাঁহার গৃহে চাকর স্বরূপ অবস্থিতি করিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

এই রামদাসকে কোন অপরিচিত পথিক মনুষ্য মাত্র বলাও যাইতে পারিত কিন্তু ইহার সম্বন্ধে যে গল্প চলিত আছে, তাহাতে মনুষ্য বলা যাইতে পারে না, তাহা শুনিলে ভয় বিস্ময়েরই উদ্রেক হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, জগৎবল্লভের স্ত্রী এক মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে রামদাসকে কদলী-পত্র দিতে বলিলে, সে একস্থানে থাকিয়াই হস্ত প্রসারণ ক্রমে প্রায় ত্রিশত হস্ত দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পত্র আনয়ন করে। এই ব্যাপারে বিলোকনে বল্লভবনিতা ভীতা হইয়া স্বামী সদনে রামদাসের কাণ্ড বর্ণন করেন ও ইহাকে তাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। সেই স্বীকৃতি অনুসারে আজ পর্য্যন্ত তদ্বংশীয়গণ যজ্ঞশেষে "রামদাস ভৃতায় স্বাহা" ইতিমন্ত্রে ইহার উদ্দেশ্যে আহুতি দান করিয়া থাকেন বলিয়া শুনা যায়।[৬]

পরগণা-জন্‌তরি

পরগণার নামতত্ত্ব ও মঘবন-সংবাদ

স্বর্ণকৌশিক গোত্রীয় মঘবন মিশ্র সাবর্ণগোত্রীয় নিজ পুরোহিত সহ কান্যকুব্জ হইতে তীর্থভ্রমণোপলক্ষে পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করেন। তিনি কামরূপ পিঠ দর্শনার্থে গমন কালীন শ্রীহট্টের গুমগুমিয়া গ্রামে আগমন করিয়া, সত্যব্রত নামক তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তৎকালে এতদঞ্চল এক দ্বীপাকার ধারণ করিল, গ্রাম ছাড়িয়া এক পদ যাইবার যো নাই।

মঘবনের কামরূপ গমনে আপাততঃ ব্যাঘাত জন্মিল, তিনি সেই স্থানেই রহিলেন ও "যন্ত্রে" কামাখ্যা দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। মঘবনের অর্চ্চনা নিষ্ফল হইল না, যন্ত্রে দেবীর আবির্ভাব ঘটিল; মঘবন সেই স্থানে থাকিয়াই কেবল ঐকান্তিক ভক্তিবলে কামরূপ গমনের ফল লাভ করিলেন। যন্ত্রে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া,–কথিত আছে– সেই স্থান তদবধি যন্ত্রী, অপভ্রংশ যনতরি বা জন্‌তরি নামে খ্যাত হয়।

মঘবনের ঈদৃশ প্রভাব অবগত হইয়া সত্যব্রত নিজ বিবাহ-যোগ্যা তনয়া তাঁহার করে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, মঘবন ইহাতে সম্মত হইলে বিবাহ হইয়া গেল, সেই বিবাহে

---

৬. আহুতিদানের শেষে এ বংশীয়গণের রামদাসের নামেও একটি আহুতি দেওয়ার কথা সত্য হইলে এই বৃত্তান্তটি ভিত্তি বিহীন গল্প মাত্র বলা চলে না। "অলৌকিক রহস্য" নামক পত্রিকায় এইরূপ অনেক ঘটনাই বিবৃত আছে, সেসব বৃত্তান্তের সত্যতার প্রমাণও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচরণ দে মহাশয় হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

তাঁহার ছয়টি পুত্রের[৭] জন্ম হয়, ইঁহাদের মধ্যে তিন জনের বংশীয়গণই জন্‌ ।র ভূম্যাধিকারী ও প্রধান অধিবাসী; কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই জ্ঞাত হওয়া যায় নাই।

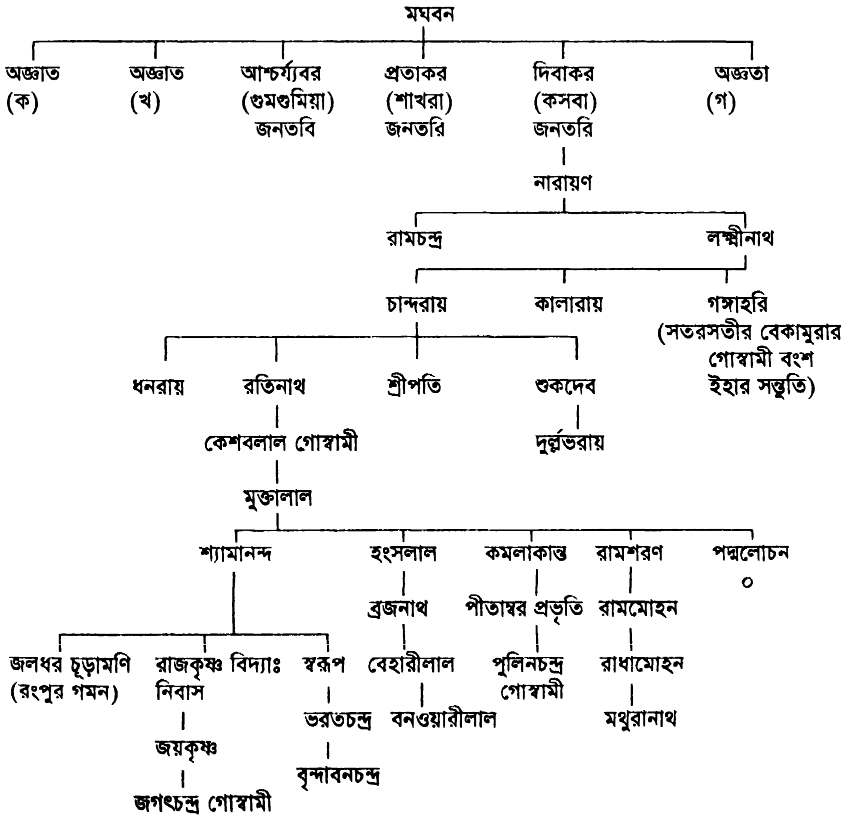
মঘবনের ৫ম পুত্র দিবাকরের পুত্রের নাম নারায়ণ; ইঁহার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মীনাথ নামে দুইপুত্র হয়; লক্ষ্মীনাথের তিন পুত্র, তন্মধ্যে চান্দ রায়ের বংশধরগণই বিশেষ বিখ্যাত। চান্দ রায়ের চারিপুত্রের মধ্যে রতিনাথ অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও নির্ম্মল চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন।

রতিনাথ এবং তাঁহার পুত্রের কথা

সংসার-স্পৃহা-রহিত রতিনাথ শ্রীধরচক্রের অর্চ্চনা করিতেন, নির্ব্বিঘ্নে দেবার্চ্চনার জন্য তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক, সুবেদার পদারূঢ় শেখ মোহাম্মদ নামক জনৈক সৈনিকের পুষ্করিণী দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী জঙ্গলে স্ত্রীর সহিত গমন করেন। জঙ্গলে গিয়া তিনি একখানা ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া, স্ত্রীপুরুষ শ্রীচক্রের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তথায় এক ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

---

৭. মঘবনের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা এই–



(ক) ইহার বংশ ইন্দেশ্বরবাসী বলিয়া কথিত।

(খ) ইহার বংশ ঢাকাদক্ষিণবাসী বলিয়া কথিত।

(গ) ইনি এক দৈবজ্ঞ কন্যা বিবাহ করিয়া তরফবাসী হন।

প্রাচীন ঋষিপত্নীর ন্যায় রতিনাথের স্ত্রী বন্য পুষ্পাদি আহরণ করিয়া দিতেন, সেবার আয়োজন করিতে, রতিনাথ শ্রীধরের অর্চ্চনাতেই কালাতিবাহিত করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রতিনাথের পত্নী গর্ভবতী হইলেন; সেই বনশ্রমে এই সাধুদম্পত্তি হইতে সুবিখ্যাত কেশব লালের উদ্ভব।

কেশবলাল এক আশ্চর্য্য শিশু। কেশবলালের চারুচরিত্র অচিরকাল মধ্যে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনসমূহ চমকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার অলৌকিক লীলা-বিলোকনে সকল লোকেই পুলকিত-চিত্তে তাঁহার গুণ গান করিত এবং তাঁহাকে তাহারা "গোস্বামী" নামে আখ্যাত করিত; তদবধিই এই শাখার বংশধরগণ গোস্বামী উপাধিধারী। এই মহাত্মার চরিত্র কথা আমরা ৪র্থ ভাগে উল্লেখ করিব। কেশবলালের নামে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ধনরায়ের নামে যথাক্রমে জন্তরির ৭নং এবং ১৩নং তালুকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

কেশবলালের পুত্রের নাম মুক্তালাল গোস্বামী। ইঁহার জন্ম হইলেই কেশবলাল হঠাৎ কোথায় চলিয়া যান। কেশবলালের অভাবে গ্রামবাসী সকলেই ক্লিষ্ট হয়, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। পিতৃহীন মুক্তালাল তখন সকলেরই সহানুভূতি প্রাপ্ত হন, কালক্রমে বহুলোক কেশব-তনয়ের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল, তিনি স্বগুণে সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া যশস্বী হন। মুক্তালাল কানাইলাল বিগ্রহ স্থাপন করেন ও গোস্বামী খ্যাতিতে পরিচিত হন।

সিদ্ধ-কমলাকান্ত

মুক্তালালের তৃতীয় পুত্রের নাম কমলাকান্ত। ইনি সর্ব্বদা দেবগৃহে কাল অতিবাহিত করিতেন, গ্রামের লোক সহ তজ্জন্য তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না, কাজেই তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতেন না। সময়গ্রাম নিবাসী পরাণ রায় চৌধুরী নামক এক কায়স্থ-তনয়কে তিনি চিনিতেন ও ভালবাসিতেন। পরাণ রায় তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। কখন কদাচিৎ তিনি ইঁহার বাড়ীতে যাইতেন। হাওলী সতরশতী পরগণার আমলপুরবাসী দাস জাতীয় দুর্ল্লভ মেস্তরি নামক আর একব্যক্তি তাঁহার পরিচিত ও প্রিয়পাত্র ছিল, ইহাকেও লোকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞান করিত; ইঁহার বাড়ীতেও কখন কদাচিৎ যাইতেন; এই দুইজন ব্যতীত তিনি অপর লোক-সঙ্গ-বিরহিত ছিলেন।

কথিত আছে, একদা পরাণ রায়ের গৃহে গমন কালে পথিমধ্যে একটা মেছো আলদসাপ তাঁহাকে দংশন করিলে, তিনি "কানাই! কি অপরাধ হইয়াছে" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সাপটাকে ধরেন, সাপও তাঁহার হস্তে "নাগপাশ" বন্ধন করে, তদবস্থায় তিনি শিষ্যগৃহে উপনীত হইলে সকলেই ভীত হইল, তিনি তখন সাপটাকে ছাড়িয়া দিলেন; সাপ চলিয়া গেল, কমলাকান্তের দংশনজনিত কোন ক্লেশই ঘটিল না। এই সময় হইতেই ইঁহার মাহাত্ম্য দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কমলাকান্তের বংশধরগণও গোস্বামী খ্যাতিবিশিষ্ট। ইঁহার পৌত্র শ্রীযুত পুলিনচন্দ্র গোস্বামী হইতে আমরা এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

পরগণা–জলসুখা

নামতত্ত্ব

জলসুখা পরগণার নামটি জল সংক্রান্ত কোন বিষয় বিশেষ হইতে হইয়া থাকিবে। এ পরগণাটি হবিগঞ্জ সবডিভিশনের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে; প্রসন্তবক্ষা ধলেশ্বরী নদী ইহার পশ্চিম সীমায় প্রবাহিতা; জলসুখাতে জলের লীলা খেলা বর্ষাকালে কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? পূর্ব্বকালে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বঋতুতে সমভাবে যে জল থাকিত, এবং ইহা দ্বীপের ন্যায় শোভা পাইত, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ স্থানে পূর্ব্বকালে ঝাল প্রভৃতি জাতীয়

লোকেরই অধিক বাস ছিল এবং জলেই তাহাদের সুখ ছিল, তাই বোধ হয় ইহার নাম জলসুখা। কেহ কেহ বলেন যে, জলমধ্যস্থ সেই সামান্য ভূখণ্ডে ঝালজাতীয় লোকগণ তাহাদের জাল শুকাইত বলিয়া জালশুকা নাম হয়। কেহ বা বলেন যে, ইহা পূর্ব্বে একটা বৃহৎ জলকর মহাল ছিল এবং শিক্কাতে বন্দোবস্ত হইয়াছিল; জল ও শিক্কা শব্দযোগে জলশিকা হইতে জলসুখা নাম হইয়াছে। নামতত্ত্বে এই ত্রিমতের মূলেই জলে সুখ, এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

জলসুখা ভট্টাচার্য্যেবংশ

এই জলসুখাতে স্বর্ণ কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস; ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগবান মিশ্র; পূর্ব্বে তিনি এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে তদীয় বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদাই যে জলকল্লোল শ্রুত হইত, জলতরঙ্গ খেলা করিত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বরাকের পলিদ্বারা ক্রমশই তাহা ধীরে ধীরে উচ্চ হইতেছে।

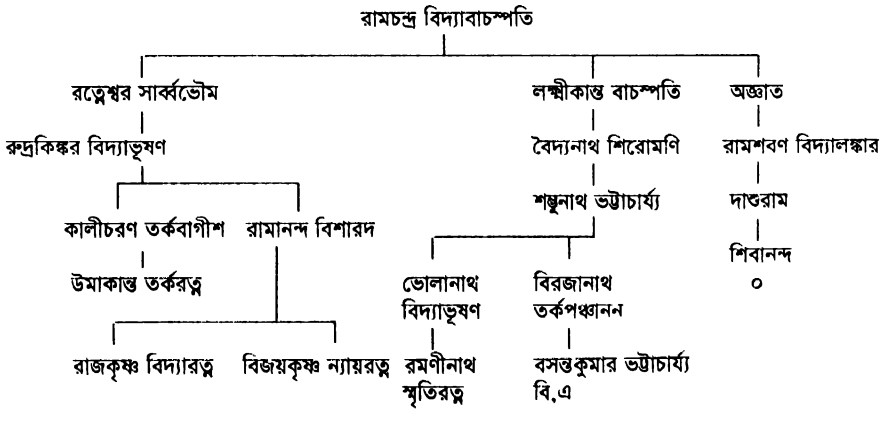
ভগবান মিশ্রের বংশে রামচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়, তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। কথিত আছে যে, সরস্বতী দেবী একদা স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর গ্রহণে আদেশ করিলে, বাচস্পতি বিদ্যাধনেরই প্রার্থী হন এবং দেবীও "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া যান। এই বংশে প্রায় সকলকেই বিদ্যার অর্চ্চনা করিতে দেখা যায়, অধিকাংশই উপাধিধারী পণ্ডিত,[৮] যাঁহারা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও মূর্খ ছিলেন না। উপাধিধারী সকলেরই টোল ছিল; এ জেলার বহু ছাত্রই এ বংশের নিকট ঋণী।

ইতি বীরেশ্বর

রামচন্দ্রের পৌত্র বৈদ্যনাথ শিরোমণির টোলে বীরেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণতনয় অধ্যয়ন করিতেন; একদা গীতা পাঠকালে তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি কাশী গমন করেন এবং দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক কাশীতেই থাকেন; তথায় তিনি এক মঠাধিকারী হইয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর দণ্ডী পাঠ্যাবস্থায় ব্যাকরণের আখ্যাত পঞ্জীর উপর কোন কোন স্থানে আপত্তি করিয়া গিয়াছেন। সেই আপত্তিগুলি একরূপ অমীমাংশ্য, "ইতি বীরেশ্বরঃ" বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে তাহার আলোচনা হইয়া থাকে।

বৈদ্যনাথ শিরোমণি নিজ গ্রামে এক শিবমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন; এই শিবের এক বৃত্তি অবধারিত ছিল, বৈদ্যনাথ শেষকালে কাশী বাস করেন।

৮. এই বংশতালিকার পরবর্ত্তী শাখা ঃ–



একদা কাশীতে বাঙ্গালী টোলায় এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল; ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামীয় সম্মত না হওয়ায় শিরোমণি আপত্য করিয়া, স্বয়ং শ্রীধরানুমত ব্যাখ্যা করেন, সেই পাঠসভায় বিমলাসুন্দরী দেবী নাম্নী ময়মনসিংহের জনৈকা জমিদার-পত্নী ছিলেন, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যাশ্রবণে বিমোহিতা হইয়া তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা হারে এক বৃত্তি প্রদান করেন; শিরোমণির কাশী প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত এই বৃত্তি তিনি ভোগ করেন।

শিরোমণির খুল্লতাত-ভ্রাতা রামশরণ বিদ্যালঙ্কার বাদার্থের শব্দকাণ্ড সম্বন্ধীয় "শব্দরত্ন" নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

শিরোমণির জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র কালীচরণ তর্কবাগীশ ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন "স্বচিন্তান্তঃ" নামক ভগবতীর স্তোত্র-গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থের একটি টীকাও তিনি স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন। শিরোমণির পৌত্র শ্রীযুক্ত বিরজানাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় জলসুখার বহুবিধ বৃত্তান্ত সহ স্বংশের বিবরণ প্রদানে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন।

পরগণা-দিনারপুর

বাণী বংশাখ্যান

ইতিপূর্ব্বে আমরা ভুজবলের গোস্বামী বংশের উল্লেখ করিয়াছি, ভুজবলের গোস্বামী বংশ দিনারপুরের বাণী বংশের একটি শাখা।[৯] রাঢ়দেশবাসী কাশ্যপগোত্রীয় শুভঙ্কর সিদ্ধান্ত রত্ন কোন কারণে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টের অন্তর্গত দিনারপুরের শতকগ্রামে আগমন করতঃ বাস করেন, তথায় তাঁহার হরিশ্চন্দ্র নামে এক পুত্রের জন্ম হয়, ইঁহার পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ

মহাত্মা ঠাকুরবাণী। ঠাকুরবাণীর অলৌকিক গুণগ্রামে বিমোহিত হইয়া শ্রীহট্ট জেলার বহুব্যক্তি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তদীয় শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। শ্রীহট্টে যে সকল সিদ্ধ গুরুকুলের বাস, বাণীবংশ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সিদ্ধমহাত্মা ঠাকুরবাণীর প্রভাবই ইহার একমাত্র কারণ; ৪র্থ ভাগে আমরা উক্ত মহাপুরুষের চরিত কথা বর্ণন করিব।

অনন্ত বংশ

ঠাকুর বাণীর দুইটি বিবাহ ছিল, প্রথমা পত্নীর গর্ভে প্রথমে যে পুত্র জাত হয়, একটি সর্প তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া জাত হইয়াছিল, এই জন্য অনন্তনাগের নামে উক্ত সন্তানের নাম অনন্ত রাখা হয়। মাতা সর্পটির প্রতিও স্নেহশীলা ছিলেন, দুগ্ধদানে তাহাকে পালন করিতেন। একদা নিদ্রিতাবস্থায় অনন্ত-জননী স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার গর্ভজ-সর্প যেন মনুষ্য ভাষায় তাঁহাকে বলিতেছে যে, এবংশে কদাপি সর্প ভয় থাকিবে না। ইহা বলিয়া সর্পটি মাতা হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে জননী সর্পকে পূর্ব্ববৎ দুগ্ধহার দান করিলে, সর্প দুগ্ধ পান করিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সর্পটি তৎপর চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া জননী সর্পকে দুগ্ধ খাওয়াইতেন, তাহা এখনও দিনারপুরের জনৈক গোস্বামী-গৃহে[১০] আছে।

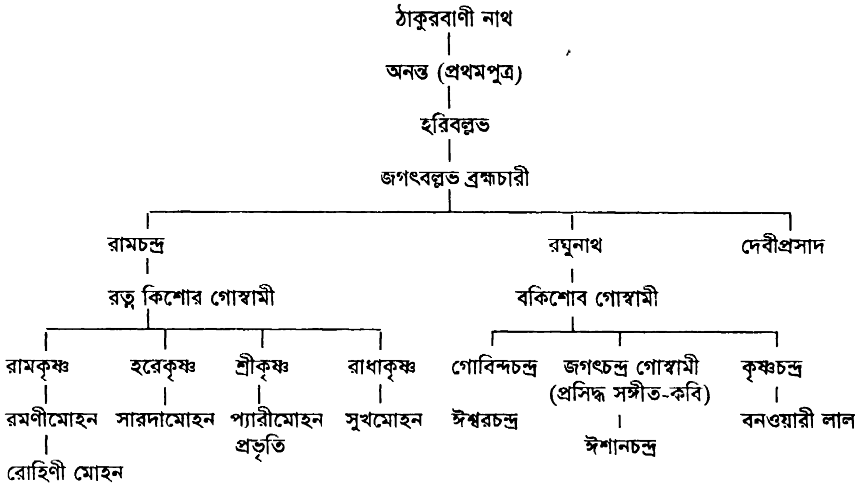
৯. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (উত্তরাংশ) ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনন্তের পুত্র হরিবল্লভ[১১] তৎপুত্র জগৎবল্লভ নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ হইতে ৮ জলুস তারিখযুক্ত সনন্দে (নং ১৭) দিনারপুর ও আথানগিরি হইতে ১১/২২ ভূমি প্রাপ্ত হন। ১১৮৫ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র রামচন্দ্র উহা "তছরূপ" করেন। সনন্দে পিতাপুত্র উভয়েরই "ব্রহ্মচারী" উপাধি থাকা দৃষ্ট হয়।

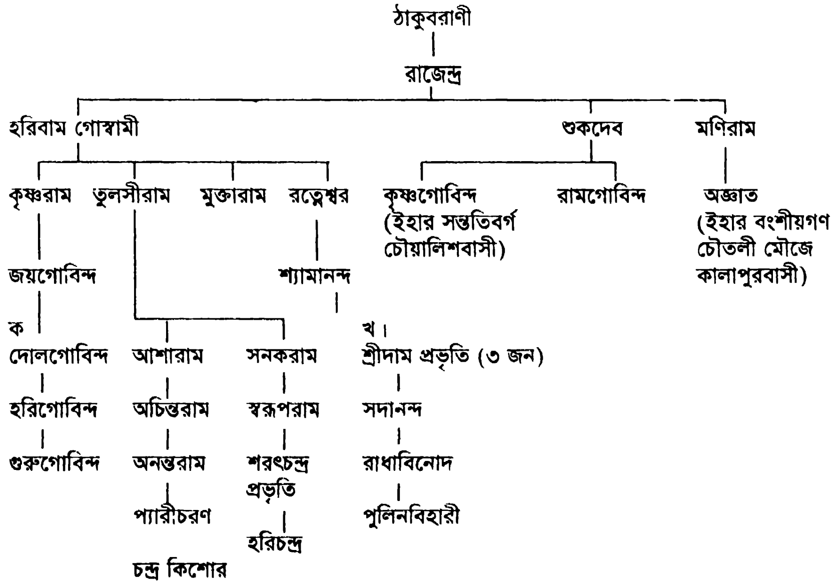
---

১০. আথানগিরীবাসী জনৈক গোস্বামীগৃহে উহা আছে বলিয়া শুনা যায়।

১১. আথানগিরির অনন্ত-সন্তান গোস্বামী বংশের সংক্ষিপ্ত বংশশাখা ঃ-



১২. শতকের রাজেন্দ্র সন্তান গোস্বামী বংশেব সংক্ষিপ্ত বংশশাখা–



রাজেন্দ্রের বংশ কথা

ঠাকুরবাণী তাঁহার জনৈক শিষ্য কন্যাকে তাহার পর বিবাহ করেন, ইহার গর্ভে রাজেন্দ্র নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। দিনারপুর চৌয়ালিশ ও চৌতলীয় গোস্বামী বংশ ইঁহার সন্তুতি। রাজেন্দ্রের[১২] তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিরামের বংশধরগণ পৈতৃক বাসভূমি শতকবাসী; মধ্যম পুত্র শুকদেবের সন্ততিবর্গ চৌয়ালিশবাসী এবং কনিষ্ঠ মণিরামের বংশধরগণ চৌতলীতে বাস করিতেছেন।

ঠাকুররাণী কখন যে গৃহ ত্যাগ করেন, সাধন প্রভাবে তিনি যে কত দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার পৌত্রগণের সময়ে তৎসংসৃষ্ট বহুঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়; ঠাকুর বাণীর কাহিনীর প্রসঙ্গে ৪র্থ ভাগের তাহা উল্লেখিত হইবে বলিয়া এস্থলে কথিত হইল না।

হরিরামের পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ, তাঁহার পুত্রের নাম জয়গোবিন্দ, ইঁহার পুত্র দোল গোবিন্দ। ইঁহারা সকলই সাধক মহাত্মা ছিলেন। একদা জয়গোবিন্দ স্বীয় বালকপুত্র দোলগোবিন্দকে স্নেহবশতঃ স্নানের পূর্ব্বে তৈল মাখাইতে মাখাইতে বলিয়াছিলেন–"বাপ, তোমার গৃহে আমি জন্মিব।" এতচ্ছ্রবণে বালক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–"বাবা, ইহা কি সত্য কথা? তবে তোমাকে কিরূপে বাবা বলিয়া চিনিব?" হাসিয়া পিতা বলিলেন–"দক্ষিণ পায়ের তলাতে একটি লাল চিহ্ন থাকিবে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে আমি জন্মিয়াছি। এ কথা ভুলিয়া যাইও না।" পিতা পুত্রের এই কথা উপস্থিত সকলেই শুনিয়াছিল, ও তৈল মাখিতে অনিচ্ছুক বালককে ভুলাইয়া স্থির রাখিবার গল্প বলিয়াই মনে করিয়াছিল।

দোল গোবিন্দ একদা শ্রীক্ষেত্র যাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহাকে তথায় যাইতে হয় নাই। ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য যখন তিনি উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন একদা রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন যেন এক জগন্নাথ মূর্ত্তি জীবন্তভাবে তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি শ্রীক্ষেত্রে যাইবে কেন? তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আমিই তোমার কাছে যাইব। বালশিরাস্থ উত্তরশূরের দত্তদের পুষ্করিণীতে আমি আছি–উঠাইয়া লইয়া আসিবে।"

এই স্বপ্নে যাথার্থ্য পরীক্ষার্থ পরদিনই তিনি উত্তর শূর গমন করেন, ও দামদলাবৃত শ্বেতপদ্মবনাচ্ছাদিত জলাশয়ে লোকদ্বারা অনেক চেষ্টা করিয়াও মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন না; নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সেই রাত্রেও পুনঃ তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, সেই জগন্নাথ মূর্ত্তিই যেন পুনঃ বলিলেন, "তুমিই স্বয়ং উঠাইবার কথা আমি বলিয়াছি, ভিন্ন লোকের দ্বারা আমি যাইতে চাহি না।" এইরূপ একই বিষয়ে ক্রমশঃ স্বপ্ন দেখিলে বিশ্বাস না হইবে কেন? দোল গোবিন্দ পুনশ্চ সেই পুষ্করিণী অভিমুখে চলিলেন এবং উপস্থিত হইয়া স্বয়ং জলে নামিয়া জগন্নাথ বিগ্রহ উত্তোলন করিলেন ও সেই বিগ্রহ লইয়া আসিলেন।

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ গঙ্গাধর মাণিক্যের মহিষী দোল গোবিন্দের শিষ্যা ছিলেন। রাজমহিষী গুরুদেবের স্থাপিত জগন্নাথ বিগ্রহের সেবা পরিচালনের জন্য বার্ষিক ৩৬০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম হরি গোবিন্দ।

যাঁহারা আত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে আত্মিকগণ জীবিতাবস্থায় কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ থাকিলে, তাহা পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ পরলোকের প্রমাণ পক্ষে তাঁহারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকিলে, তাহা পালন করিতে যত্নের ক্রুটী করেন না; ইহার না কি বহু উদাহরণ আছে।

গোলগোবিন্দের পিতা, পুত্রকে তৈল মাখাইতে মাখাইতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালনে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না কি? স্বেচ্ছায় কোথাও জন্মগ্রহণ করাও কি মানুষের (হউন তিনি সিদ্ধ পুরুষ) সাধ্যায়ত্ত? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার স্থল ইহা নহে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে তৎপুত্র হরগোবিন্দের পদতলে রক্তবর্ণ একটা চিহ্ন ছিল। আমরা যাঁহার নিকট হইতে এই বংশবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তিনিই (শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ গোস্বামী) হরিগোবিন্দের পুত্র। পিতৃপদতলে লাল রঙ্গের একটা পদ্ম তিনি বহুবার দর্শন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

দোলগোবিন্দ পুত্রের পদতলে লালরঙ্গের চিহ্ন দর্শনে পিতৃবাক্য স্মরণে "বাবা, বাবা" বলিয়া পুলকিত হন। তিনি পুত্রকে কদাপি তাড়না ভর্ৎর্সনা করেন নাই, মনে পুত্রের প্রতি পিতৃজ্ঞান পোষণ করিতেন। তিনি তাড়নাদি না করিলেও শিশুকালাবধি হরিগোবিন্দ মার্জ্জিত-চরিত্র ছিলেন, তাঁহাকে কাহারই কোন কথা শিখাইয়া দিতে হইত না।

তুলসী রাম

হরিরামের ২য় পুত্রের নাম তুলসীরাম। ইনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, প্রায়শঃ উলঙ্গ থাকিতেন। তিনি রাত্রে নিকটবর্ত্তী মালিটীলা-শ্মশানভূমে গমন করিয়া নিশ্চিন্তে দুর্গার ধ্যান করিতেন। একদা এইরূপ ধ্যান করিতেছেন, কথিত আছে যে তখন হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সে অমৃতমাখা ধ্বনি শ্রবণে বুঝিলেন যে ইহা নরকণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি নহে, তাঁহারই ধ্যেয় দুর্গা তৎপ্রতি কৃপাপরতন্ত্রা হইয়া যেন বলিতেছেন–"এবার পূজাকালে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তুলসী এ শূন্যবাণী শ্রবণে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া পড়িলেন।

আশ্বিন মাস আগত প্রায়; বাড়ীতে আসিয়াই তুলসী পূজার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন। কপর্দ্দক বিহীন উদাসীন-প্রায় তুলসীরামের এই কাণ্ড দর্শনে স্ত্রীপুত্রাদির হাস্য উদ্রিক্ত হইল; কিন্তু ভক্তের সঙ্কল্প পূর্ণ রহে না, বেজোড়াবাসী তাঁহার জনৈক শিষ্য পূজার দ্রব্য সম্ভার লইয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন! তাঁহার মনে এইভাব জন্মিয়াছিল যে, এবার গুরুর দ্বারা দেবীর পূজা করাইবেন।

তিনদিন পূজা হইল; প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া তুলসী স্ত্রীলোকের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে ত্রিলোকতারিণী তখন আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের হৃদয়ে শান্তিদান করেন এবং তাঁহাকে একছড়া রুদ্রাক্ষমালা প্রদান করেন; একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা এখনও তদ্বংশীয়গণ পূজা করিয়া থাকেন, এবং তাহাই দেবীদত্ত মালা বলিয়া প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বলেন, এই মালা সেই শ্মশানভূমে নিশীথরাত্রে দেবী তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

বাগ্‌চি বংশের কথা

হরিহরের বংশ বৃত্তান্ত

বাগ্‌চি উপাধি হইতেই জানা যাইতেছে যে, এই বংশীয়গণ বঙ্গীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। হরিহর অগ্নিহোত্রী নামে বাগ্‌চি বংশীয় এক উগ্রতপা মহাত্মা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর বঙ্গ হইতে আসিয়া দিনারপুরে বাস করেন; দিনারপুরের পাণিউন্দা নামক স্থানে ইহার প্রাচীন বাসবাটী এখনও আছে; হরিহর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। হরিহরের যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্নও সেই স্থানে দৃষ্ট হয়।

হরিহর এদেশে আগমন করিলে রাজদত্ত বহু পরিমিত ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়া, একজন

প্রধান ভূস্বামীরূপে গণ্য হন ও প্রজাগণকর্ত্তৃক "রাজা" বলিয়া আখ্যাত হইতে থাকেন। কুরশা মৌজায় "রাজবাড়ী" নামে খ্যাত ইঁহার প্রাচীন ভগ্ন বাটিকা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। হরিহরের সহিত উর্দ্ধনদেব ও বর্দ্ধনদেব নামে দুই ভ্রাতা এদেশে আসিয়াছিলেন, দিনারপুরের পুরকায়স্থগণ ইঁহাদের বংশ জাত।

হরিহরের পুত্র শ্রীবৎস আচার্য্য তত্রাঞ্চলের বহুব্যক্তিকে শিষ্য করিয়াছিলেন। এই বংশে পরে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির উদ্ভব হয়; নিম্নে কয়েক জনের নামোল্লেখ করা হইল।

গৌরীকান্ত বিদ্যানিবাস–গৌরীকান্ত অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি দিনারপুর, আথানগিরি, পাচাউন প্রভৃতির "রাজপণ্ডিতি" প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময় হইতে এই বংশীয়গণ ভট্টাচার্য্য আখ্যা ধারণ করিতেছেন।

কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার–বিদ্যালঙ্কার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। নবাব শমশের খাঁ বাহাদুর ইঁহাকে এক সনন্দে (নং ৬২২) দিনারপুর হইতে ২২/২।১।০ জমি ব্রহ্মত্র দান করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহা তছরূপ করেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রও একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রের নাম সদাশিব বলিয়া সনন্দের প্রতিলিপির মন্তব্যে লিখিত আছে। সদাশিব একজন বাক্‌সিদ্ধ ও মিতবাক্ পুরুষ ছিলেন এবং যখন যাহা বলিতেন, তাহা অব্যর্থ হইত। ইঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া মিরাশী ও রিচির বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ–বিদ্যাবাগীশ একজন উৎকৃষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীহট্টের জনৈক নবাব হইতে তিনি ১০/০ দশহাল ভূমি নিষ্কর প্রাপ্ত হন। নবাব নজীবালী খাঁ বাহাদুরের ৩০ জলুস ২৬ সাবান তারিখযুক্ত সনন্দে (নং ৯৯) তিনি দিনারপুর, আগনা ও জনতরি হইতেও মোট ৮।২ৎ৪ ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মাধবচন্দ্র তর্কবাগীশ ও চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন–ইদানীং এই দুই-ব্যক্তি এই বংশে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মাধবচন্দ্র বহুদিন দেশে অধ্যাপনা করেন ও শেষ জীবনে রংপুর গমন করিয়া বামণডাঙ্গায় রাজবাড়ীতে "দ্বারপণ্ডিত" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত কোন কবিতা পাওয়া যায় নাই। মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত মাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যসাংখ্যতীর্থ হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সাধারণ বিভাগ

চতুর্থ অধ্যায়
তরফের মজুমদারদের কাহিনী

তুঙ্গেশ্বর ও জয়পুর

তরফের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রসঙ্গতঃ তত্রত্য মজুমদার বংশের উল্লেখ করা হইয়াছে। তরফের মোসলমান সম্প্রদায়ে লস্করপুর, সুলতানশী ও ফরিদপুরাদি যেমন সর্ব্বমান্য, হিন্দুসমাজে তেমনই তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর, আঠালিয়া ও সুঘর প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তুঙ্গেশ্বর একটি প্রাচীন গ্রাম, প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে শম্ভুনাথ বাচস্পতি কর্তৃক যেরূপে তুঙ্গনাথ ভৈরব প্রকাশিত হন, যেরূপে নবরত্ন পীঠ আবিষ্কৃত হয়, এবং তুঙ্গনাথের নামানুক্রমে যে সেস্থান তুঙ্গেশ্বর বলিয়া খ্যাত হয়, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগে ৯ম অধ্যায়ে তাহা কথিত হইয়াছে। তুঙ্গেশ্বরের ন্যায় জয়পুরও একটি প্রাচীন স্থান। জয়পুরের কথা এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে পাঠক পাইয়াছেন।

খুলনা জেলার অন্তর্গত কঙ্কগ্রামে বৈদ্য বংশীয় এক মহাত্মা ছিলেন, তাঁহার নাম কি ছিল, জ্ঞাত হওয়া যায় না; আদিসেন নামেই তিনি কথিত হন; তাঁহার ভাস্কর ও পুষ্কর নামে দুই পুত্র জাত হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুষ্কর সেন তরফের কানুনগো নিযুক্ত হইয়া সভ্রাতৃক এদেশে আগমন করেন, তিনি আসিয়া যে স্থানে অবস্থান করেন, সে স্থান "সেনের কান্দি" নামে খ্যাত হয়। ভাস্কর সেন হইতেই সেন-মজুমদার বংশের বিস্তৃতি ঘটে।[১]

ভাস্করের পুত্রের নাম শ্রীবৎস, তৎপুত্র শ্রীপতি, তাঁহার পুত্র অর্জ্জুন; অর্জ্জুন সেনের পুত্রের নাম দেবীবর সেন; ইঁহাদের জীবন-সম্বন্ধে কোনরূপ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ অপ্রসিদ্ধ "সেনের কান্দি" পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ জয়পুরে গিয়া বাস করেন; তৎকালে জয়পুর সরকার শ্রীহট্টে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল; পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

দেবীবর সেনের চারিপুত্র হয়, ইঁহাদের নাম নরহরি, কংসারি, কৃষ্ণানন্দ ও কাশীনাথ। ইঁহারা সকলেই পারস্য ভাষাবিদ্ ছিলেন, এবং দিল্লী হইতে প্রত্যেকেই এক একটি পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণানন্দ "বিশ্বাস" এবং কাশীনাথের "নিয়োগী" খ্যাতি হয়। এই ভ্রাতুচতুষ্টয় হইতেই যে সেনবংশের খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে কংসারি ও কৃষ্ণানন্দ বংশ বিরহিত; কাশীনাথের দুই পুত্র হয়, ইহাদের নাম পূর্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ। নরহরির পুত্রের নাম রাঘবানন্দ।

রাঘবানন্দের কথা

রাঘবানন্দ যখন যুবক, তখন দিল্লী হইতে কোন এক সম্ভ্রান্ত মোসলমান শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি শিকার উপলক্ষে এক সময়ে তরফে গমন করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ও রাত্রিযোগে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া রাঘবানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত

১. সেন মজুমদারদের বংশ তালিকার একাংশ ণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্র।

হইলে, রাঘবানন্দ তাঁহাকে পরম যত্নে আশ্রয়দান করেন ও আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেন। রাঘবের আতিথ্য সৎকারে প্রীত হইয়া সেই আগন্তুক, গমনকালে বলিয়া যান যে কখনও যদি দিল্লী নগরে বাদশাহ দরবারে রাঘব গমন করেন, তবে আগন্তুক রাঘবকৃত এই সৎকারের প্রত্যুপকার করিতে ভুলিবেন না।

রাঘব সস্মিত-বদনে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাক্যে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি ইহার অব্যবহিত পরেই দিল্লী যাইতে পারেন নাই, বহুকাল পরে তিনি দিল্লীতে গিয়া, অনুসন্ধানে সেই সম্ভ্রান্ত মোসলমান ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই মোসলমান ভদ্রলোকের চেষ্টায় রাঘবানন্দ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর বাদশাহের আদেশে তরফের কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, দিল্লী গমনকালে পথে জনৈক সন্ন্যাসী সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সন্ন্যাসী তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রপূত মদ্যপান করিতে দেন ও সফলতার জন্য আশীর্ব্বাদ করেন। সন্ন্যাসীর কৃপায় রাঘবানন্দের অনেক দৈবশক্তি জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার কানুনগো পদ ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্তি-বিষয়ে তাহা কার্য্যকরী হইয়াছিল। রাঘবানন্দ দিল্লী হইতে কানুনগো পদ ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্তির পর দেশে আসিলে এক নূতন বাটী প্রস্তুত করিলেন। এই নবনির্ম্মিত বাটী তাঁহার মনোনীত না হওয়ায় তিনি জয়পুর হইতে তুঙ্গেশ্বর গ্রামে গিয়া গৃহ প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তথায় পুন্যস্রোতা ক্ষমা নদী (খোয়াই) প্রবাহিতা ও তুঙ্গেশ্বর ভৈরব বিরাজিত, ঐ স্থান ধর্ম্মনিষ্ঠ রাঘবের বাসযোগ্যই ছিল এবং অচিরেই তিনি তথায় গমন করেন।

রাঘবানন্দের খুল্লতাত-পুত্র পূর্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ জয়পুরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বহুপরে হৃদয়ানন্দের সন্তানগণ জয়পুর ত্যাগে তুঙ্গেশ্বরবাসী হন।[২]

রাঘবানন্দের পাঁচ পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ পিতার মৃত্যুর পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে পৈতৃক কানুনগো পদ প্রাপ্তির সনন্দ লাভ করেন। এই সময় তিনি অনেক ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হন; তাঁহার নামানুসারে তরফের তালুক শ্রীনাথ মৌজার নাম হয়।

রাঘবানন্দের পঞ্চম পুত্র রঘুনাথ সেনের সহিত অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের সৌহৃদ্য না থাকায়, তিনি তুঙ্গেশ্বর ত্যাগ করতঃ আঠালিয়া গ্রামে গমন করেন; তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন।

রামেশ্বর সনন্দ

শ্রীনাথের পুত্রের নাম কাশীনাথ, তাঁহার পুত্রের নাম হরগোবিন্দ। হরগোবিন্দ দিল্লী গমন করিয়াছিলেন ও বাদশাহ দরবার হইতে কানুনগো পদের সনন্দ প্রাপ্ত হন।[৩] ইঁহার পুত্রের নাম রামেশ্বর, সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময়ে তিনি দিল্লী গমন করিয়া ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তরফের কানুনগো নিযুক্ত হইয়া তথা হইতে সগৌরবে আগমন করেন। কানুনগো পদের জন্য তরফে তিনি যে ভূমি প্রাপ্ত হন, দশসনা বন্দোবস্তের কালে ঐ ভূমিই তাঁহার পুত্রগণকর্ত্তৃক তদীয় নামে "৪নং তাং

২. ণ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩. হরগোবিন্দ প্রপিতামহের ন্যায় মহৎ কৃপায় অদ্ভুত ক্ষমতালাভ করেন। কথিত আছে, তিনি যখন দিল্লী গিয়াছিলেন, তখন অবিবাহিত ছিলেন এবং নিজ ভাবিপুত্রের জন্য সনন্দপ্রার্থী হন; কিন্তু যখন জানা গেল যে তিনি বিবাহিত নহেন, তখন বাতুল বলিতে নির্দেশিত হন; পরে সম্রাট তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার কথা জ্ঞাত হইয়া, তদীয় প্রার্থনা বাতুলের প্রলাপ বাক্যবৎ ভাবেন নাই। হরগোবিন্দের মহিমায় তদীয় প্রার্থনা সম্রাটনিকটে অগ্রাহ্য হয় নাই, ইহার বহু পরে যখন রামেশ্বর দিল্লী গিয়া সনন্দপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কোন কোন প্রাচীন সভাসদ তখন সেই বিষয় উত্থাপন করেন এবং তাহাতেই রামেশ্বর অতি সহজে সনন্দ লাভ করেন।

রামেশ্বর সেন” বলিয়া খ্যাত হয়।[৪] রামেশ্বর সনন্দবলে তরফ, গদাহাসন নগর, নুরুল হাসন নগর, দাউদ নগর, গিয়াস নগর ও লস্করপুরের “শ্রীকর্ণী” নিযুক্ত ও কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।[৫]

হরিশরণ সেন ও পরবর্ত্তী কথা

রামেশ্বরের ছয়জন পুত্র ছিলেন; ছয়পুত্র রাখিয়া ১৬৯৫ শকাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ছয়পুত্রের মধ্যে হরিশরণ সেন চতুর্থ। ইনি যে শুধু বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যোগানুষ্ঠানে অতি উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হরিশরণ হইতেই তুঙ্গেশ্বর বংশের মহাত্ম্য শতগুণে বিবর্দ্ধিত হইয়া পড়ে; তিনি তদীয় সুমহৎ কার্য্যের জন্য সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক “মহাশয়” আখ্যায় খ্যাত হন। তদবধি তদ্বংশীয়গণ আজ পর্য্যন্ত সে গৌরব প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহারা “তুঙ্গেশ্বরেরমহাশয়” বলিয়া আখ্যাত হন। মহাত্মা হরিশরণের কথা আমরা ৪র্থ ভাগে ব্যক্ত করিব।

হরিশরণ মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্র স্বধর্ম্ম নিরত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার অতুলনীয় শারীরিক সৌন্দর্য্যে সকলেই মোহিত হইত, তদ্রূপ শ্রী মানুষে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি একদা নিজ জমিদারির অন্তর্গত কোন একটি স্থানে পদব্রজে গিয়াছিলেন, কথিত আছে আগমন কালে পথিমধ্যে শুয়াইয়া নামক গ্রামে এক বৃক্ষতলে তাঁহার দেবদর্শন ঘটে। হঠাৎ এক জ্যোতিস্তরঙ্গের মধ্যবর্ত্তী দেবরূপ বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ক্ষণমাত্র তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

তথা হইতে তিনি যখন বাড়ী আসিলেন, তখন সম্পূর্ণ ভাবান্তরিত অবস্থায় চিরযাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভাবদর্শনে আত্মীয়গণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন যে অচিরকাল মধ্যেই তদীয় মৃত্যু ঘটবে। এই কথায় সকলেই ভীত হইলেন, গম্ভীরাশয় ভৈরবচন্দ্রের কথা কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; দেখিতে দেখিতে সেই ভয়ঙ্কর দিন সমাগত হইল, তিনিও পূর্ব্ব কথিতানুসারে পরলোক যাত্রা করিলেন।

ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শিবচন্দ্র সেন মহাশয় নানা গুণের আধার ছিলেন, তাঁহার দেবদ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। একদা শারদীয় পূজার পরে তিনি স্বগীয় কামাখ্যা পাঠ দর্শনে গমন করেন, তথায় একটি কুমারী দেবীভাবাপন্না হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন–“অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠে করাইয়া কিরূপে শুভ কামনা কর? অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠে সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল। এবার পূজাকালে আমি তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, নিবেদিত কমলালেবুতে তোমার ভৃত্য লোভ করিযাছিল, ইহা আর গ্রহণ করিতে পারি নাই।”

ব্যথিত চিত্তে বাড়ীতে আসিয়া শিবচন্দ্র, দেবগৃহে নিয়োজিত ভৃত্য “দেওঘরি”কে ইহা

৪. এই তালুকের ভূ-পরিমাণ ৯৮৫।০ হাল এবং রাজস্ব ১০২৩/৵৹ আনা। “৫ নং তালুক হরকৃষ্ণ” জয়পুরের হরকৃষ্ণের নামে বন্দোবস্ত হয়। ইহার ভূ-পরিমাণ ১৫৯/০ হাল; রাজস্ব ৪১৷৭৵পাই মাত্র।

৫. রামেশ্বরের প্রাপ্ত পারস্য সনন্দের মর্ম্ম এই ঃ–
সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত সরকার শ্রীহট্টের অধীন পরগণা তরফের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যকালের কর্ম্মচারী, চৌধুরী ও রায়তানকে জানান যায় যে পরগণা মজকুবের হিন্দুবর্গের শ্রীকর্ণী (সরদার) হরগোবিন্দ সেনেব পুত্র রামেশ্বর সেনকে পূর্ব্বরীতি মতে পৈত্রিক সূত্রে নিযুক্ত করা গেল। উচিত যে তিনি বিধিসকল বাহাল রাখিয়া তাহার সতর্কতার সহিত পালন করিতে থাকেন, এবং পরগণা মজকুরের চৌধুরী–আমলা রায়তানের উচিত যে, ইহা জ্ঞাত হইয়া উক্ত রামেশ্বর সেনের লভ্য ও পাওনার যে রীতি আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া উক্ত রামেশ্বর সেনের আদায় করে ও ওজর না করে, ইহা তাদিগ (অত্যাবশ্যক) জানিব।
অন্য তিন খানা সনন্দ গভর্ণর জেনেরেল বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, ইহাতে এইরূপ মন্তব্য লিখিত আছেঃ–“Authenticated by the order of Governor General in council 11th April. 1788.”

বলিলে, সে অকপট চিত্তে তাহা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি পরবৎসর পূজাকালে চণ্ডীপাঠের নূতন ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশান চন্দ্র হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ভীত হইয়া তৎপর বৎসর পূর্ব্ব নিয়মেই, অধিকতর সতর্কতার সহিত চণ্ডীপাঠ করাইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, যেদিন শিবচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিবে, সেদিনও তাঁহার দেহ রোগশূণ্য ও সুস্থ ছিল। তাহার পূর্ব্বরাত্রে তিনি কিছুই আহার না করায়, শ্রীশ বাবুর পিশী তাঁহাকে শিবচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন; শ্রীশ বাবু তখন ৮/৯ বর্ষীয় বালক মাত্র। পৌত্র আসিয়া খাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করিলে, শিবচন্দ্র তাঁহাকে বলেন, "দাদা, আজই যে আমার মৃত্যুর দিন, এ সময় কি খায়?" বাল্যচাপল্য বশতঃ শ্রীশ বাবু তখন একথা কাহাকেও বলেন নাই, কিন্তু তাহার কিছুকাল পরেই হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে শিবচন্দ্রের দেহ অবশ হইয়া পড়িল এবং সেই অভুক্ত অবস্থায় শুদ্ধদেহে কিয়ংক্ষণ মধ্যেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন।

ভৈরবচন্দ্রের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গিরীশ চন্দ্র সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সাংসারিক কোন কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া ধ্যান ধারণায় সময় কর্ত্তন করিতেন। সর্ব্বজীবে তাঁহার দয়া ছিল, পাছে পদতলে দলিত হইয়া কোন প্রাণী বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি পথ চলিতে সদা সতর্ক থাকিতেন। সর্ব্বদা তিনি শুচি ভাবে থাকিতেন; একদা শৌচাদি সমাধা করিয়া গৃহে আসিতে আসিতে হঠাৎ তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতেই তিনি সজ্ঞানে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৫৯ শকাব্দ); মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণভোজন সমাপ্ত হইয়াছিল। ইঁহারই সুযোগ্য পুত্র পূর্ব্বোক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন মজুমদার মহাশয় হইতে এই বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সুঘরের মজুমদারদের কথা

হেরম্বরায় ও তদ্বংশ কথা

প্রায় চারিশত বৎসর হইল, রাঢ়দেশ হইতে বৈদ্যবংশীয় কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রোদ্ভব হেরম্ব রায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ দেশে আগমন করিয়া তরফের সুকরিপাড়া গ্রামে বাস করেন; তাঁহার অনুষঙ্গে ব্রাহ্মণ, নাপিত, নট, ধোপা, ও মালী প্রভৃতি বহুলোক আসিয়াছিল। সুঘরের আচার্য্য বংশীয়ঘণের পূর্ব্বপুরুষ মুরারি আচার্য্য হেরম্বরায়ের সহিত এ দেশে আসিয়াছিলেন।

হেরম্বরায় কয়েক বৎসর সুকরিপাড়ায় বাস করিয়া, পরে ইহার অল্প দূরে সুঘর গ্রামে নূতন বাটী প্রস্তুতক্রমে তথায় উঠিয়া যান। ইঁহার পুত্র নারায়ণ দাস তরফের কানুগো পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যাদবান্দ।[৬] ইঁহাদের কৌলিক খ্যাতি "রায়"। যাদবানন্দ পৈতৃক কানুগো উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র রায় খ্যাতিতে খ্যাত হইয়াছিলেন।

যাদবানন্দের তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে রাঘবানন্দ জ্যেষ্ঠ ছিলেন, ইঁহার পুত্রের নাম ভবানী দাস। ভবানী দাসের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রঘুনাথ অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। রঘুনাথ স্বগুণে তরফের কানুনগো পদের সনন্দ লাভ করেন ও দিল্লীর বাদশাহের অভিমতে "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ হইতেই এই বংশের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল বলিতে হইবে। রঘুনাথের সময় হইতেই এই বংশের ব্যক্তিবর্গ "মজুমদার" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

রঘুনাথ অতি দক্ষতা সহকারে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি কানুনগো পদের জায়গীর স্বরূপ এক বৃহৎ ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাবল্লভ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন ও একাকী পৈতৃক জায়গীর ভাগ করেন। তদীয় অপর সহোদরবর্গ জায়গীর ভূমির অংশ

প্রাপ্তির জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। জায়গীর ব্যতীত স্থাবরাস্থাবর অন্যান্য বিত্ত অপর ভ্রাতৃবর্গের অধিকারে ছিল ও তাহা তাঁহারা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। রঘুনাথের পুত্র রমাবল্লভ সুধীর, ন্যায়নিষ্ঠ ও স্বধর্ম্মতৎপর ব্যক্তি ছিলেন।

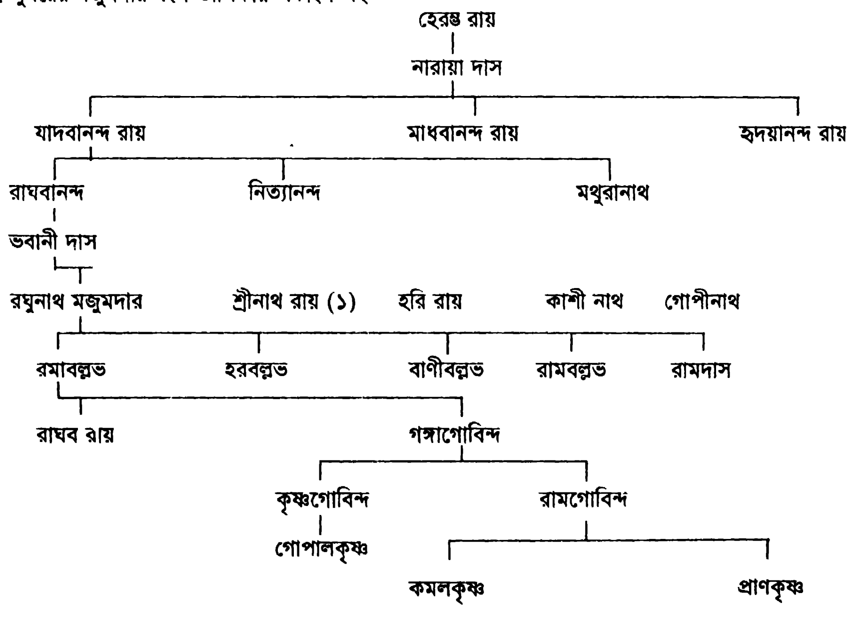
রমাবল্লভ ও তদীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বংশধরবর্গ সুঘরের "পাঁচঘরিয়া" বলিয়া উক্ত হন; ইঁহাদের খুল্লতাত শ্রীনাথ রায়ের পুত্রদ্বয়ের বংশধরগণ সহ সকলে "সাতঘরিয়া" মজুমদার নামে খ্যাত হইয়াছেন।

রমাবল্লভের মনসামূর্ত্তি

একদা এক ধীবর জালে এক মনসা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্ত মূর্ত্তিটি গৃহপ্রাঙ্গনে রাখিয়া ধীবর নিদ্রা যাইতেছিল। কথিত আছে, তখন সে স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাইল যে, কে যেন বলিতেছে "ঐ মূর্ত্তিটি রমাবল্লভের বাড়ীতে রাখিয়া আস।" কিন্তু ধীবর তাহা গ্রাহ্য করিল না, সে এক প্রতিবেশী বিপ্রকে জালে প্রাপ্ত মনসা মূর্ত্তি প্রদান করিল। দৈববশতঃ মূর্ত্তি গ্রহণের পরক্ষণেই হঠাৎ উক্ত ব্রাহ্মণের এক পুত্র গতাসু হইল এবং অন্য পুত্রটিও মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া মূর্ত্তিটি মজুমদার-গৃহে দিয়া আসিলেন; অতঃপর তাঁহার পুত্রটিও আরোগ্য লাভ করিল। এই মনসা-মূর্ত্তি অদ্যাপিও আছেন।

রমাবল্লভের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবরায়, কানুনগো পদবি প্রাপ্ত হন, কিন্তু কোন কারণে ইহা কনিষ্ঠ গঙ্গাগোবিন্দের উপরে ন্যস্ত হয়।[৭] মহাত্মা গঙ্গাগোবিন্দই তখন জায়গীর ভোগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুঙ্গেশ্বরের মহাত্মা হরিশরণ সেন মহাশয়ের ন্যায় ইনিও স্বগুণে "সুঘরের মহাশয়" বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জুনের অধিকারী হন।

৬. সুঘরের মজুমদার বংশ তালিকায় একাংশ এই–



(১) ইঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন।

রামসিংহ শিকদার ও সুঘরের রামপ্রিয়া

গঙ্গাগোবিন্দ অতি শিষ্ট ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। রামশ্রী নিবাসী খোন্দকার, গঙ্গাগোবিন্দ হইতে কানুনগোই-সনন্দ ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া এক দলিল উপস্থিত করেন।[৮] এবং তাহার বলে গঙ্গাগোবিন্দকে নিজ জায়গীর ভূমি হইতে "বেদখল" করিয়া দেন। এই কার্য্যে তাঁহার বন্ধু রামসিংহ শিকদারেরও যোগ ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ নিরুপায় হইয়া তৎপ্রতিকারার্থে মুর্শিদাবাদে গমন করেন, এবং খোন্দকার ও রামসিংহ শিকদারের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন।[৯]

তরফ কাছারীর লালারাম সিংহ শিকদারের সহিত খোন্দকারের এরূপ আত্মীয়তা ছিল যে, তিনি তরফে হিন্দুদের অর্চ্চনার জন্য যেমন কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনই মোসলমানদের উপাসনার জন্য এক মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কালীই তরফেশ্বরী নামে খ্যাত হন, ইঁহার কথা এ খণ্ডের সর্ব্বপ্রথমেই কথিত হইয়াছে। শিকদারের কৃত মসজিদটি বিগত ভূকম্পে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গাগোবিন্দের পত্নী রামপ্রিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাগোবিন্দের অনুপস্থিত কালে খোন্দকার গঙ্গাগোবিন্দের বাসগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থান আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হন। তখন এই তেজস্বনী বুদ্ধিমতী রমণীর বুদ্ধির কাছে খোন্দকারের কূট কৌশল ও জনবল বিফল হইয়া যায়, তিনি অকৃতকার্য্য হন।

দৈব-কৃপা

গঙ্গাগোবিন্দ বহুকাল মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিয়া সম্পত্তির উদ্ধার সাধনের সুবিধা করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন। দৈবাৎ এই দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন। দৈবাৎ এই সময়ে একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি সন্ন্যাসীকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া দৈবকৃপা প্রাপ্তির জন্য কিছু করিতে অনুরোধ করেন; উক্ত সন্ন্যাসী তাঁহার অভিপ্রায় মত এক কালী মূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন। পূজায় কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হওয়ায় সন্ন্যাসী অষ্টচিত্তে তাঁহাকে বলেন যে, অচিরাৎ তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল, সত্বরেই তিনি অভীষ্ট ফললাভে সেই কালীমূর্ত্তি লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময়ে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) তহশীলদার মোহাম্মদ আলী খাঁর প্রেরিত "সোয়ার" (অশ্বারোহী) আসিয়া তাঁহার জমিতে দখল দিয়া যায়। ইহার অল্প পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত

---

৭. ইহা একখানা তারিখও মোহরাদি ক্ষয়িত জীর্ণ সনন্দ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কালীকুমার দেব মজুমদার মহাশয় সুঘরের মজুমদার বংশ বিবরণের সহিত উক্ত সনন্দের মর্ম্ম যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই ঃ সরকার শ্রীহট্টের অধীন মহলে তরফের কর্ম্মচারীয়ান, চৌধুরীয়ান ও রায়তানকে আলা জনাব সমস্ উদ্দৌলার হুকুম মতে জানান যে উক্ত পরগণার কানুনগোই রঘুনাথ রায়ের হস্ত হইতে তাহার ছোট ভাই গঙ্গা গোবিন্দের হস্তে দেওয়া যায়। উচিত যে তাহাকে পরগণার কানুনগো জ্ঞানে তাহার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করে, ও কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

৮. পূর্ব্বে চৌধুরাই কানুনগোই ইত্যাদি পদের সনন্দ ক্রয় বিক্রয় হইত। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে "নবাবি আমলে দেশের অবস্থা" প্রকরণে তাহা বলা গিয়াছে, এবং ঐ খণ্ডের ১১শ অধ্যায়ে "দস্তখত" বিক্রয়ের একটা উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার আরও বহুতর উদাহরণ বিষয় প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে উক্ত হইয়াছে।

৯. এস্থলে তোতিওর রহমানের নাম উল্লেখিত আছে। তোতিওর রহমানের সময়ের তরফে কৃষ্ণ শিকদার বর্ত্তমান ছিলেন; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পাঠক ইহার উল্লেখ পাইযাছেন। রাম শিকদার উক্ত কৃষ্ণ শিকদারের পরবর্ত্তী। তরফের প্রসিদ্ধ হাঙ্গামার পরে রাম শিকদার "চাকলাদার" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় রামশ্রীতে রিয়াজুর রহমান ছিলেন। (পরবর্ত্তী ৭ম অধ্যায় দেখ।)

হন। পতির পরলোক গমনের পর রামপ্রিয়া প্রণষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার করেন।

গঙ্গাগোবিন্দের পুরুষানুক্রমিক প্রাপ্ত জায়গীর-ভূমি দশসনা বন্দোবস্ত কালে "৬নং তাং গঙ্গাগোবিন্দ" নামে আখ্যাত হইয়াছে।[১০] গঙ্গাগোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ পিতৃক্ষমতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু কানুনগোদের প্রাপ্য দাবি হইতে বঞ্চিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে "রসুম" উল্লেখে নিরূপিত কতক মুদ্রা পাইতেন ও "সরঞ্জামীখরচ" বলিয়া সরকার হইতে আরও ৫৮।/০ আনা পাওয়া যাইত। কৃষ্ণগোবিন্দের পুত্র গোপালকৃষ্ণ অল্প কয়েকদিন ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহাত্মার মৃত্যুর পর হইতেই এ বংশের অবস্থা অনেকটা মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

সুঘরের "পাঁচঘরিয়া" মজুমদারের জ্যেষ্ঠতনয়-বংশে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মজুমদারের উদ্ভব হয়; ঈশানচন্দ্র এ বংশের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন; তিনি স্বধর্ম্মনিরত, সদনুষ্ঠান পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। এই মহাত্মা যুব-জনোচিত উৎসাহে আমাদিগকে তরফের এ সব বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বিগত ১৩১৫ বঙ্গাব্দে স্বগীয় পুরীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঈশানচন্দ্রের পিতৃ-পিতামহী, নীলকণ্ঠ মজুমদারের পত্নী, পতির মৃত্যুর পর "সহমরণ" গমন করিয়াছিলেন।

সুঘরের মজুমদার, তুঙ্গেশ্বর ও জয়পুরের মজুমদারের ন্যায় অতি সম্মানীয়। বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ও তদনুষঙ্গী ব্রাহ্মণগণ এ দেশ বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই। সামাজিক বিষয় মীমাংসায় তুঙ্গেশ্বরাদির ন্যায় সুঘরেরও অধিকার আছে।

আদিত্য বংশ

অন্যান্য বংশের কথা

তরফের হাঁসারগাওবাসী আদিত্য বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত; ইহাদের প্রভাব এক সময়ে তরফে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহারাই তত্রত্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। ছোটলিখার আদিত্যগণ এবং ইঁহারা পরস্পর জ্ঞাতি সম্পর্কিত এক বংশোদ্ভব বলিয়া কথিত, ২য় খণ্ডে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আদিত্য বংশে রামচন্দ্র খাঁ নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ইনি তরফের মুলক্-উল উলামা সৈয়দ ইস্রাইলের সমসাময়িক ব্যক্তি, ইনি উপবেশনের জন্য এক রৌপ্য সিংহাসন ব্যবহার করিতেন এবং ইনি স্বীয় অধিকার মধ্যে স্থানে স্থানে বহুতর দীঘী এখনও আছে।

এই বংশীয়গণ প্রথমতঃ তরফের বালিয়াড়ি গ্রামে বাস করিতেন; বালিয়াড়ি গ্রামের বাড়ী জামাতাকে দান করিয়া হাঁসারগাও আগমন করেন। শঙ্করদাস আদিত্য, মুক্তারাম আদিত্য প্রভৃতি নামীয় মহালগুলি, আদিত্যদের পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচায়ক।

দস্তিদার বংশ

দাস পাড়ার দস্তির বংশও অতি সম্মানিত। এই বংশে সুবিখ্যাত সুবিদরায়ের উদ্ভব হইয়াছিল; ইনি শ্রীহট্টের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা গহর খাঁর প্রধান সাহায্যকারী কর্ম্মচারী ছিলেন।[১১] শ্রীহট্টের দস্তিদার বংশ ও এই বংশ একই মূলোৎপন্ন বলিয়া কথিত আছে।

দত্ত বংশ

দত্ত পাড়ার দত্তবংশের আদি পুরুষ রাঢ়দেশ হইতে আগমন করতঃ প্রথমতঃ তরফের

১০. এই তালুকের ভূ-পরিমাণ ৭৩৬/০ হাল এবং রাজস্ব ৫৭৯/২ পাই।

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে গহরখাঁর কথা উক্ত হইয়াছে। দস্তিদার ও আদিত্য বংশ কথা তরফেব জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত।

উত্তরভাগে বাস করেন; তৎপর দত্তপাড়ায় বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত ষাটিয়াজুরীর বংশও একটি সুসম্মানিত বংশ। মজুমদারগণ এবং এ সব বংশীয়বর্গের প্রতিপত্তি তরফে অতি প্রবল।

তরফের হিন্দু সম্প্রদায়ে তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর, দত্তপাড়া, দাসপাড়া, হাঁসারগাও, ও ষাটিয়াজুরী, এই পাঁচ গ্রামের ভদ্র পরিবারে "পঞ্চগ্রামী" নামে এক সমাজ আছে। সুঘর ইহার মধ্যে নহে, সুঘরের মজুমদারের সামাজিকতা তাঁহাদের স্বগ্রামে নিবদ্ধ।

কর বংশের কথা

তরফের সাত কাপনের কর বংশের আদি নিবাস হুগলী জেলা। ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব বৈদ্যজাতীয় এই কর বংশ ও আদিত্য বংশ প্রায় সমসাময়িক। কর বংশের আদি পুরুষ, পরস্পর জ্ঞাতি সম্পর্কিত দুই ব্যক্তি চিকিৎসা উপলক্ষে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইঁহাদের সহিত ষাটিয়াজুরীর ভট্টাচার্য্যগণের আদি পুরুষও আসিয়াছিলেন; তাঁহারাই করদের কুলপুরোহিত।

চিকিৎসা ব্যবসায়ী সেই আদি করেরা প্রথমে "স্নানঘাটে" উপস্থিত হইয়া ছিলেন; তথা হইতে একজন পুটিজুরীতে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সাতকাপনে গমন করেন। পুটিজুরীর চৌধুরী, পুরকায়স্থ এবং রায় উপাধিবিশিষ্ট করবংশীয়গণের সহিত এক্ষণে সাতকাপনের কর বংশের অশৌচ নাই। সাতকাপন হইতে পরে আর একজন দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভীমশী গমন করিয়া বাস করেন; সে বংশীয়গণ অদ্যাপি তথায় আছেন।

দুর্য্যোধন কর

করবংশীয়ের কীর্ত্তিকথা সামান্যই সংগৃহীত হইয়াছে। সাতকাপনের কর বংশে পূর্ব্বে দুর্য্যোধন নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়; দুর্য্যোধন অশেষ প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন; তিনিই তাঁহার সময়ে তদঞ্চলে সমাজপতি ছিলেন। কোন সামাজিক সভায় যখন সকলে একত্রিত হইত, তথায় দুর্য্যোধন সকলের সমাসনে বসিতেন না বলিয়া, কথিত আছে যে তাঁহার জন্য পৃথক এক ক্ষুদ্র চৌকি প্রদত্ত হইত; তাহাতে দুর্য্যোধন বসিতেন। তিনি উপবেশন করিলে সসম্মান করিয়া সকলেই তাঁহার গলে পুষ্পমালা প্রদান করিত, এই জন্য তাঁহার বংশ "মালাধারী কর" বলিয়া খ্যাত, ইহাদের এ গৌরব বহুকাল ছিল।

দুর্যোধনের সম্ভ্রমজ্ঞান কিরূপ প্রবল ছিল, একটা ঘটনা হইতে তাহা সম্যক জানা যায়। তাঁহার বাড়ীর বহির্ভাগে তিনি এক দীর্ঘিকা দেন, উহা "করের দীঘী" বলিয়া আজও কথিত হয়। এই দীঘিকা-তীরে তিনি এক ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নানাবিধ কুসুম সর্ব্বদা ঐ বাগানের বাহার বিস্তার করিয়া বিলাসী ব্যক্তিবর্গের চিত্তে বিমল আনন্দ বিধান করিত।

একদা কার্য্যানুরোধে দুর্য্যোধন শিবিকারোহনে লস্করপুর গমন করেন, এই অবসরে তদীয় দ্বিতীয়া পত্নী উক্ত উদ্যান দর্শন জন্য কৌতুহলান্বিতা হইয়া জনৈকা পরিচারিকা সহ বাটী হইতে বহির্গতা হন; দৈববশতঃ পথ হইতে তৎকালে দুর্য্যোধন প্রত্যাগম হইয়া তদবস্থায় পত্নীকে প্রাপ্ত হন। অভিমানী দুর্য্যোধন এই সামান্য অপরাধে অল্পবয়স্কা গর্ভবতী পত্নীকে পরিবর্জ্জন করেন। মুড়াগাও নামক স্থানটি তিনি পরিবর্জ্জিতা পত্নীকে প্রদানপূর্ব্বক এক বাটিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই স্থানে এই রমণীর একটি পুত্র সন্তান জাত হয়; তাঁহার বংশধরগণ এখন আদিত্যপুরাবাসী। সাতকাপনের করবংশীয় শ্রীযুত নবকিশোর কর মহাশয় হইতে তরফের অন্যান্য বিবরণ সহ ইহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মীপুরের দত্ত পুরকায়স্থ

দত্তবংশীয়ের স্বস্থান ত্যাগ ও দেবানুগ্রহ

মোসলমান রাজত্বকালে–যখন পশ্চিমবঙ্গের কেহ কেহ নানা কারণে স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া স্বীয় সুখসম্পদের সন্ধানে সচেষ্ট হন, তৎকালে রাঢ়দেশ বাসী জনৈক কায়স্থ সন্তান, একজন ব্রাহ্মণ অনুসঙ্গী ও একজন আচার্য্য ও শূদ্র সহ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমতঃ ঢাকায় ও তৎপরে তথা হইতে আরও পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করেন।

একরাত্রে যখন পথশ্রান্ত কায়স্থটি গভীর নিদ্রাবিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন কে যেন তত্রত্য নিম্ববৃক্ষ মূল হইতে তাঁহাকে বলিতে লাগিল–"পথিক! আমায় এস্থান হইতে উদ্ধার কর, তোমার শুভ হইবে"। নিদ্রাভঙ্গে কায়স্থ সন্তান স্বর্গীয় সঙ্গিগণকে একথা বলিলে, কৌতূহলাক্রান্ত সকলেই সে বৃক্ষমূল খনন করিয়া এক সুন্দর শালগ্রাম চক্র প্রাপ্ত হইলেন।

"আমার নাম শ্রীধর চক্র; তোমরা এখানে থাকিয়া আমার নামানুক্রমে নিজেদেরও এ স্থানের পরিচয় দিবে; তোমাদের শুভ সন্নিকট।" পরের রাত্রে কায়স্থ সন্তান পুনঃ ঈদৃশ স্বপ্ন দৃষ্টে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিয়া সে স্থানকে শ্রীধরের নামানুসারে 'শ্রীধরপুর' বলিয়া সংজ্ঞিত করিলেন। এ শ্রীধরপুর সতরশতী পরগণার অন্তর্গত। সুতরাং শ্রীধর চক্রের উদ্ধার ঘটনাদি সতরশতী পরগণায় অন্তর্গত। সুতরাং শ্রীধর চক্রের উদ্ধার ঘটনাদি সতরশতী পরগণায় সংঘটিত হয়। বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বোক্ত পথিক সকলেই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া আপনাদের নাম শ্রীধরপূর্ব্ব করিয়া লইলেন। তদনুসারে কায়স্থের নাম শ্রীধর দত্ত, ব্রাহ্মণের নাম শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, আচার্যের নাম শ্রীধরাচার্য্য এবং শূদ্রের নাম শ্রীধর দাস হইল।

শ্রীধরপুর বংশ শাখা

সতরশতীর শ্রীধরপুরে নূতন বসতি স্থাপিত হইলে, যখন নবাব সরকার হইতে তহশীলদার সেই স্থানে আসিয়া করধার্য্য করিতে প্রয়াসী হইলেন, শ্রীধরের সহিত তখন তাহার ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল; এবং শ্রীধর তাহাকে অপমানিত করিতেও ক্রুটী করিলেন না; ফলে সেই কর্ম্মচারী চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জলা জঙ্গলা অকর্ম্মণ্য অনাবাদী ভূমি শ্রীধরের অজ্ঞাতে তাঁহার নামে তৌজিভুক্ত করতঃ পাঁচশত কাহন জমা ধার্য্য করিয়া, শ্রীধরকৃত অপমানের ইহাই প্রতিশোধ কল্পনায়, আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তৎকৃত অপমানের ইহাই প্রতিশোধ কল্পনায়, আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তৎকৃত এই অনিষ্টাচরণই কালে শ্রীধরের ইষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন রাজস্ব সংগ্রাহক ব্যক্তিবর্গের মারফত সরকারী রাজস্ব সংগৃহীত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইহাদের পদ "চৌধুরী" সংজ্ঞায় আখ্যাত হয়, তখন শ্রীধরের অধ্যুষিত স্থানের সোম, নাগ ও কাজি বংশীয়গণ উক্ত পদ ও অভিধা গ্রহণেচ্ছু হইলেও তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, নবাব যোগ্যতর শ্রীধরকে তত্রত্য "চৌধুরাই" সনন্দ দান করেন। পূর্ব্বকথিত তহশীলদার ঈর্ষাবশে শ্রীধরের নামে তথাকার জমাজমি তৌজিভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, চৌধুরাই সনন্দলাভে শ্রীধরের তাহাই ন্যায্য অধিকারের কারণ হইয়াছিল এবং সনন্দ লাভের সহায় স্বরূপ হইয়াছিল। বস্তুতঃ দৈব অনুকূল থাকিলে অশুভেও শুভ হয়। এইরূপে, শ্রীধর নবাগত হইলেও তত্রত্য প্রাচীন ও সম্মাননীয় সোম, রাগ ও কাজি বংশীয় ব্যক্তিবর্গকে অতিক্রম করিয়া "চৌধুরাই" প্রাপ্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে বিদ্বেষ ভাজন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় অতুল্য বুদ্ধি ও অজেয় পরাক্রমে সকল বিপদই অনায়াসে বিদূরীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১২]

পঁচাউনের দত্ত বংশ শাখা

পুরকায়স্থ "পদবিবি"র কথা পূর্ব্বে নানাস্থানে কথিত হইয়াছে। পঁচাউন পরগণার পুরকায়স্থ "দস্তখত" শ্রীধরের পরবর্ত্তী জনৈক বংশধর স্বীয়গুণে লাভ করেন। তাঁহার বংশধরবর্গ অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।[১৩]

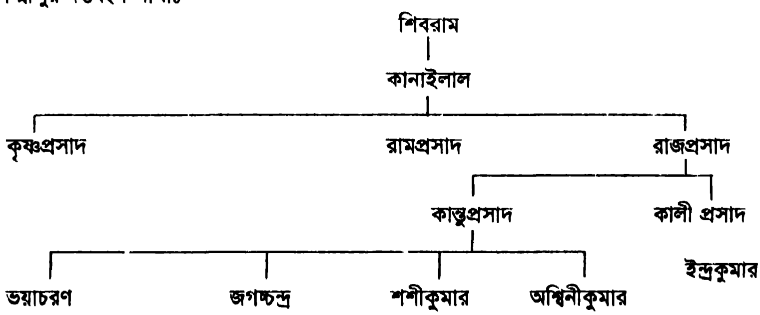
লক্ষ্মীপুরের দত্ত বংশ শাখা

পঁচাউনের দত্ত পুরকায়স্থ বংশ হইতে পরে শিবরাম দত্ত নামক এক ব্যক্তি প্রৌঢ় বয়সে নানা তীর্থ পর্য্যটনান্তর স্বস্থানে গমন সময়ে পথিমধ্যে তরফে রাত্রিযাপন করেন। তরফের সুলতানশীর জমিদার গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় সদাশয় জমিদার সাহেব তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। অতিথির বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে জমিদার সাহেব বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তথায় রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং তদীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জায়গীর দিতে প্রতিশ্রুত হন।

শিবরাম এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং সায়েস্থাগঞ্জ বাজারের পূর্ব্বদক্ষিণে প্রায় এক মাইল দূরে স্থান মনোনীতপূর্ব্বক উহা লক্ষ্মীপুর নামে সংজ্ঞিত করিয়া তথায় বসতি করিলেন। সাহেব সেই স্থানে তাঁহাকে যে ভূমি দান করেন, তাঁহার নামে (১নং শিবরাম তালুক বলিয়া তাহা) চিহ্নিত হয়।

সতরশতীর দত্ত চৌধুরী বংশের একশাখা এইরূপে পঁচাউন বাসী হন এবং তথা হইতে তরফবাসী হইয়া তথায় সসম্মানে অবস্থিতি করিতেছেন। এই শাখার[১৪] শিবরাম দত্ত পুরকায়স্থের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত পুরকায়স্থ ও শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার দত্ত পুরকায়স্থ হইতে এই বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১২. সতরশতী শাখায় এ বংশে শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন।
১৩. এ শাখায় তত্রত্য শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ দত্ত পুরকায়স্থ ও শরচ্চন্দ্র দত্ত পুরকায়স্থ প্রভৃতি বর্ত্তমান।
১৪. লক্ষ্মীপুর দত্তবংশ শাখাঃ–



পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ বংশ বিবরণ

পরগণা-লাখাই

দত্ত বংশ কথা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগে প্রসঙ্গক্রমে আমরা চক্রদত্তের কথা বলিয়াছি। সাতগাও, লাখাই প্রভৃতি স্থানের দত্তবংশীয়গণ সেই মহাবংশ সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে। ২য় ভাগ ২য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সাতগাও দত্তবংশের বিবরণ বিস্তারিতরূপে কথিত হইয়াছে।

লাখাই দত্তবংশের বিবরণে লিখিত আছে যে, চক্রপাণি দত্ত রাজা গৌড়গোবিন্দের ব্যাধি আরোগ্য করিলে, তিনি তাহাকে সেই স্থানে বাস করিতে অনুরোধ করেন; রাজানুরোধে বাধ্য হইয়া চক্রপাণি নিজপুত্র মহীপতি দত্তকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্তকে এদেশে রাখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ স্বদেশে গমন করেন। মহারাজ মহীপতিকে দক্ষিণশূর নামক বিস্তৃত ভূভাগ দান করেন, উহাই পরে সপ্তগ্রাম নাম প্রাপ্ত হয়।[১] অতএব সপ্তগ্রামই দত্তবংশের আদিস্থান।

লাখাইর দত্তবংশীয়গণ বলেন, মহীপতির পুত্র কল্যাণ দত্তের বহুপত্রের মধ্যে দত্তখান বড়দত্ত খান[২] বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহারা বড়দত্ত খানের বংশধর। বড়দত্ত খানের সন্তানবর্গ মধ্যে একজনের নাম চন্দ্রশেখর ছিল. ইঁহার সানন্দরাম নামক এক পুত্র সপ্তগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক লাখাই গমন করেন,[৩] উক্ত সানন্দ রামই লাখাই দত্তবংশের আদি।[৪]

সানন্দরাম দত্ত সেই স্থানে একটি বিস্তৃত ভূভাগ লাভ করিয়াছিলেন, ইহার আয়তন দ্বিসহস্র বিঘা ছিল বলিয়া কথিত হয়। সানন্দরাম দত্তের পুত্র শিবানন্দ ও বিপুলানন্দ। শিবানন্দ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। বামৈ পরগণার নওয়াগাওতে পুরকায়েতান্দি নামে একটা স্থান আছে, শিবানন্দ ঐ স্থানে ইষ্টদেবীর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, ঐ স্থানে এখনও লোকে (সিদ্ধ স্থান জ্ঞানে) পূজাদি দিয়া থাকে। শিবানন্দ নিঃসন্তান ছিলেন, লাখাইর দত্ত বংশীয়গণ সকলেই বিপুলানন্দের সন্তান।

---

১. "মহীপতি নামে পুত্র এ দেশে রাখিলা।
জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গে করি নিজদেশে গেলা॥
সেই মহীপতি দত্ত অতি গুণবান।
মহারাজ তাকে বহু করিলা সম্মান॥
দিলেন তিনি গ্রামাদি জমিদারী করি।
সপ্তগ্রাম স্থানেতে করিলা নিজ বাড়ী॥" ইত্যাদি-ভবানী দত্তের লিপি।
এই লিপিতে মুকুন্দদত্তের নাম নাই, কিন্তু দত্তবংশাবলীতে আছে।

২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪র্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. "লাখ" পরিমিত মুদ্রা যে স্থানের আয় ছিল, সে স্থান বা পরগণা উক্ত নামে খ্যাত হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। "শ্রীহট্টের ভূগোল" প্রণেতার মতে খাসিয়া ভাষায় "লা" অর্থে সীমা। একসময় এই স্থান পর্য্যন্ত "খা" বা খাসিয়াদের অর্থাৎ জয়ন্তীরাজ্যের সীমা ছিল বলিয়া উহার এই নাম; কিন্তু একথার কোন প্রমাণ নাই। আবার অন্যমতে "লাখাই" শব্দে এ অঞ্চলে পূর্ব্বে বৃহৎ ও দীর্ঘতর "দাও" বুঝাইত। লাখাই অস্ত্রের ব্যবহার সংসৃষ্ট কোনও ঘটনা বিশেষ হইতে পরগণার নাম প্রাপ্তি তম্মতে অনুমিত হইয়াছে। ইহারও ভিত্তি নাই।

৪. ত পরিশিষ্ট লাখাইর দত্ত বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

বিপুলানন্দের ছয় পুত্রের মধ্যে তিন জনই নিঃসন্তান, ষষ্ঠ বা সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র গোপীনাথ এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; ইঁহার নামে লাখাইর গোপীনাথপুর মৌজার নাম হয়। গোপীনাথেরও ছয়পুত্র হয়, তাঁহাদের পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ দশসনা বন্দোবস্তের সময় জীবিত ছিলেন; উহাদের নামে তালুক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। পং লাখাইর ১৩/১৪/১৫/ ১৬/১৭ নং তালুক দত্তদের নামেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

গোপীনাথের পৌত্রদের মধ্যে অনন্তরাম পূর্ব্বোক্ত ১৪ নং তালুকের অধিকারী ছিলেন, ইঁহার পুত্র চণ্ডীপ্রসাদ, ইনি বলভদ্রপুর গ্রাম স্থাপন করেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীপ্রসাদ দত্ত, ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময় পরগণার পাটওয়ারি নিযুক্ত হন।[৫] ইনিই লাখাই দত্তবংশের বিবরণ (স্বর্গীয় ভবানী দত্তের লিপি) লিখিয়া গিয়াছেন।

বিপুলানন্দের ৪র্থ পুত্র গঙ্গারাম। গঙ্গারামের তিনপুত্রের মধ্যে ২য় ও ৩য় পুত্রের নাম সন্তোষ ও বাসুদেব। ইহারা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন ও নিজ নামে দুইটি গ্রাম স্থাপন করেন। বাসুদেবপুরের স্থাপয়িতা বাসুদেবের পুত্রের নাম কৃষ্ণজীবন দত্ত; ইনি কৃষ্ণপুর নামক গ্রাম স্থাপন করিয়া যশস্বী হন। পূর্ব্বোক্ত সন্তোষ ও বাসুদেবের দুই পৌত্রের যুগ্মনামে ("আত্মাঅনুপ") নামে তত্রত্য ৪নং হালাবাদি তালুকের বন্দোবস্ত হয়। অনুপ দত্ত অতি শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। লাখাইর দত্ত বংশের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বন্ধে তদ্বংশীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দত্ত উকীল মহাশয় সহায়তা করিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

পরগণা-রিচি

দত্ত বংশ কথা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগ ২য় খণ্ডে উল্লেখিত হইয়াছে যে রিচির দত্তবংশীয়গণ পঞ্চখণ্ডের সুপাতলাবাসী দত্তবংশীয়গণেরই এক শাখা সম্ভূত। প্রায় ত্রিশথ বৎসর পূর্ব্বে রিচিতে হিন্দুভদ্রলোকের বড় বাস ছিল না। জনৈক মোসলমান জমিদার তখন রিচির মালীক ছিলেন। হিন্দুর মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্মণ, আশাদের নামে একজন কায়স্থ ও দাসবংশীয় সোণারাম তথায় বাস করিতেন। ইহাদের সামান্য জমিজমা ছিল। মোসলমান জমিদারটি বিলাস-পরতন্ত্র ও আলস্য-পরবশ ছিলেন। ঐ সময়ে কোন অজ্ঞাত কারণে পঞ্চখণ্ডের জনৈক দত্ত চৌধুরী এই স্থানে আসিয়া বাস করেন; ও বুদ্ধিবলে কতক ভূমির অধিকার লাভ করেন।

তরফবাসী কালাচান্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-যুবক তৎকালে পঞ্চখণ্ডের এক চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন, তিনিই সেই দত্ত চৌধুরীর পৌরহিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং রিচিতে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন দে মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন।

দত্ত চৌধুরীর পুত্র পৌত্রগণ অচিরকাল মধ্যেই রিচির প্রায় ছয়পণ অংশের অধিকারী হইয়া পড়েন। তাহার পরে জয়গোবিন্দ চৌধুরীর সময় সমস্ত পরগণা দত্তবংশের হস্তগত হয়। জয়গোবিন্দ ঢাকায় থাকিয়া কাজ করিতেন, তিনি একদা জানিতে পারিলেন যে, রিচির রাজস্ব অনাদায় রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহা নীলামে উঠিবে। তিনি এই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না, নীলাম ক্রয় করিয়া রিচির একাধিপতি হইয়া উঠিলেন।

জয়গোবিন্দের পুত্রের নাম জয় নারায়ণ। ইনি পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। জলা ও প্রান্তরভূমি বলিয়া তদঞ্চলে স্বভাবতঃই দস্যুভীতি ছিল;

৫. কালেক্টরীর প্রাচীন কাগজপত্রে ইঁহার স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। সন ১২০৯ বাংলার এলাম ও দশসনা সংক্রান্ত পং প্রতাপগড়েরর "মৌজা মিলান" "একওয়াল জমি" নামক, ইঁহার দস্তখত যুক্ত কাগজ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

জয়নারায়ণ দস্যুদমনে অত্যন্ত চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতাপে তৎকালে তদঞ্চলে দস্যুর নাম শুনা যাইত না। সেই সময় নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা রিচি আগমন করেন।

জয় নারায়ণ মৃত্যুঞ্জয় সিংহ নামক জনৈক উদাসীনকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি গ্রামের একাংশে একটি বৃক্ষ বাটিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বন্য হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কোন অনিষ্টই করিত না। আয়ুর্ব্বেদে মৃত্যুঞ্জয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি অনেকবার ত্রিপুরাধিপতিকর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজবাটিতে চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

জয় নারায়ণ চৌধুরী অল্প বয়সেই খ্যাতনামা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার গৌরবময় জীবন কালের পরিমাণ মাত্র ৩৮ বৎসর। ইঁহার বংশীয়গণ রিচিতে সসম্মানে বাস করিতেছেন।

পরগণা-মুড়াকড়ি

দত্ত বংশকথা

পরগণা মুড়াকড়ি লাখাই পরগণার খারিজ; পূর্ব্বে ইহা একবার শ্রীহট্ট হইতে ময়মনসিংহের এলাকাধীন হইয়া পড়িয়াছিল, পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পুঃ শ্রীহট্ট জেলা ভুক্ত হয়। মুড়াকড়ি ভেড়ামোহানা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। এই পরগণার পূর্ব্ব-উত্তর সীমায় বাণিয়াচঙ্গ, দক্ষিণ সীমায় বরাক এবং পশ্চিম সীমায় ভেড়ামোহানা নদী। সন্নিহিত বরাকের উভয় তীরেই ভট্টাচার্য্য বংশীয়ের অধ্যুষিত বাজুকা গ্রাম।

মুড়াকড়ি পরগণার জমিদারগণ বাজুকাবাসী চৌধুরীবংশীয় ছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ের বটগ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্তোপাধি একব্যক্তি (প্রায় পাঁচশত বৎসর হইল) এই অঞ্চলে আগমন করেন। দত্ত বংশ তালিকায় দৃষ্ট হয় যে ইঁহার সন্ততিবর্গ মধ্যে অনেকেই খাঁ উপাধি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।[৬] তদ্দৃষ্টে ইহাও জানা যায় যে জগদীশপুরের দত্তগণও একই দত্তবংশের বিভিন্ন শাখা মাত্র। উক্ত দত্ত মহাশয়ের দশম পুরুষে শ্যামরায় নামে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, শ্যামরায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিবর্গের বিবরণ অজ্ঞাত। শ্যামরায়ের দুইপুত্র হয়, ইহাদের নাম উদন রায় ও মদন রায়। জ্যেষ্ঠ উদন রায় "মর্কর রায়" নামে খ্যাত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা হইতেই মুড়াকড়ি পরগণার উৎপত্তি। ইহারা হিংস্র জন্তু-পূরিত জঙ্গলাচ্ছাদিত এই স্থানটিই আবাদ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা এই নূতন স্থানটি আপনাদের বাসের জন্য মনোনীত করিয়া লয়েন।

এই নব আবাদি স্থানে তাঁহারা বাসের জন্য বাটিকাদি প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের দেখাদেখি ক্রমে আরও অনেক লোক এই নূতন স্থানে আগমন করে ও তাহাতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পত্তন হয়। জ্যেষ্ঠ মর্কর রায়ের নামানুসারে ইহা মরকর বা মুড়াকর নামেই খ্যাত হয় এবং পশ্চাৎ মুড়াকড়ি পরগণায় পরিণত হয়। এই পরগণার নামোৎপত্তি সুতরাং বহুদিনের কথা নহে।

এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধরগণ মুড়াকড়িবাসী; মুড়াকড়িতে একটি প্রবাদ-বাক্য আছেঃ-

"মধু গৌর নিতাই।
এছাড়া আর কেহ নাই॥"

এই পরগণার মধু, গৌর ও নিতাই নামক ব্যক্তিত্রয় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। মধু দাসবংশীয় চৌধুরী। মুড়াকড়িতে এ বংশের অনেক কীর্ত্তি আছে। (তন্মধ্যে গোবিন্দ ও গোপালজির আখড়া ও বালির চরের কালীই প্রধান; এই কালী প্রায় ১৪ হাত উচ্চ।)

৬. এই বংশীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বীয় বংশ বিবরণ সহ যে বিস্তৃত বংশতালিকা আমাদের কাছে প্রেরণ করেন নিম্নে সংক্ষিপ্ত তালিকাটী তাহা হইতে গৃহীত। বটগ্রামাগত আদি পুরুষের, জীবরায়, নীলরায় ও কুমদরায় নামক তিন পুত্রের মধ্যে জীবরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম গুলালরায়, তৎপুত্র বশিষ্ট-

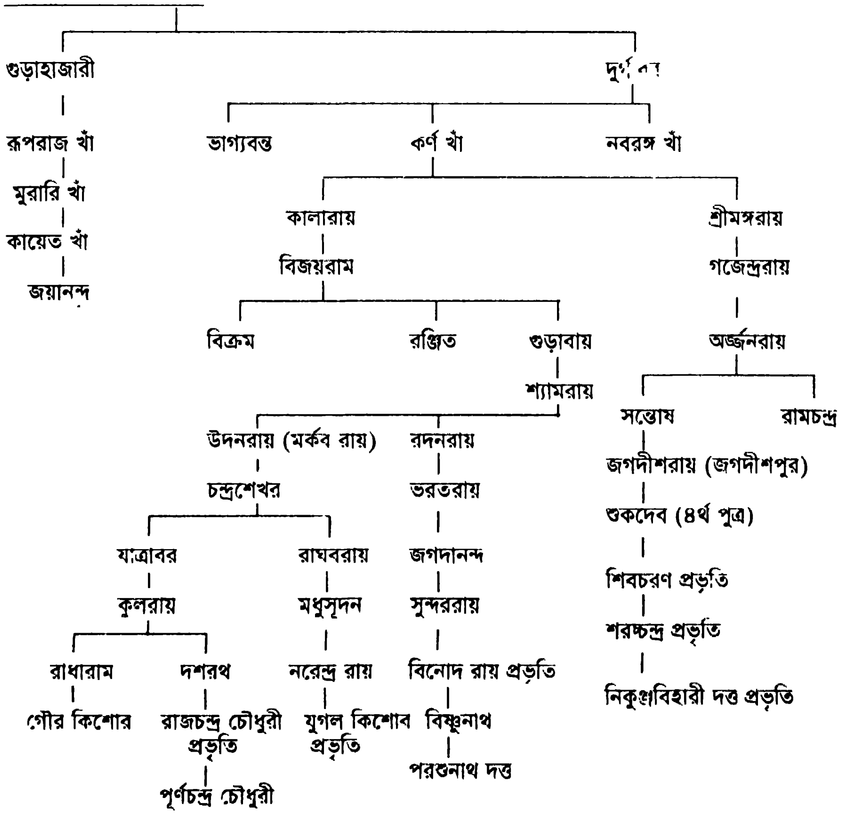
গৌরকিশোর চৌধুরী দত্ত বংশীয়। ইনি শিশুকালাবধি ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার ঔদার্য্যময় বিমল চেহারা দেখিলে মোহিত হইতে হইত; বংশ সম্ভূত এক কৃতীপুরুষ ছিলেন। ইহারা যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, দাস বংশীয় মধু চৌধুরীর প্রতাপ তখন মুড়াকড়ি পরগণাতে অতি প্রবল ছিল।

পরগণা-বেজোড়া

নন্দীবংশ কথা

প্রায় সার্দ্ধ ত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে বেজোড়ায় নন্দীবংশীয়গণ আগমন করেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজারদি বন-গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় নন্দীবংশে ভুবনেশ্বর নন্দীর লবণেশ্বর, শুক্লাম্বর ও মহেশ্বর নামে তিন পুত্র হয়। কবি রামেশ্বর নন্দীও এই বংশোদ্ভব বলিয়াই অনুমিত হন। মহেশ্বর নন্দী শেরপুর গমন করিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর নন্দীর পুত্রের নাম পীতাম্বর, তৎপুত্র লম্বোধর, তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন, ইনি বুড়ীশ্বর গ্রামে বাস করেন।

রামেশ্বর নন্দী মহাভারতের আদিপর্ব্ব প্রভৃতি রচনা করেন; ত্রিলোচনও আদিপর্ব্ব ও শান্তিপর্ব্ব প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি পর্ব্বই পাওয়া গিয়াছে; বোধহয় কবি সমগ্র মহাভারতই রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি ত্রিলোচনের পুত্র রামদাস, তাঁহার দুর্গাদাস, বিশ্বনাথ ও গোপাল নামে তিন পুত্র হয়। ইহাদের মধ্যে দুর্গাদাস আস্কিউড়া গমন করেন, বিশ্বনাথ বেজোড়াতেই থাকেন, গোপাল ইটাখলা বসতি করেন। এই তিন ভ্রাতার বংশধরবর্গ[৭] উক্ত তিন

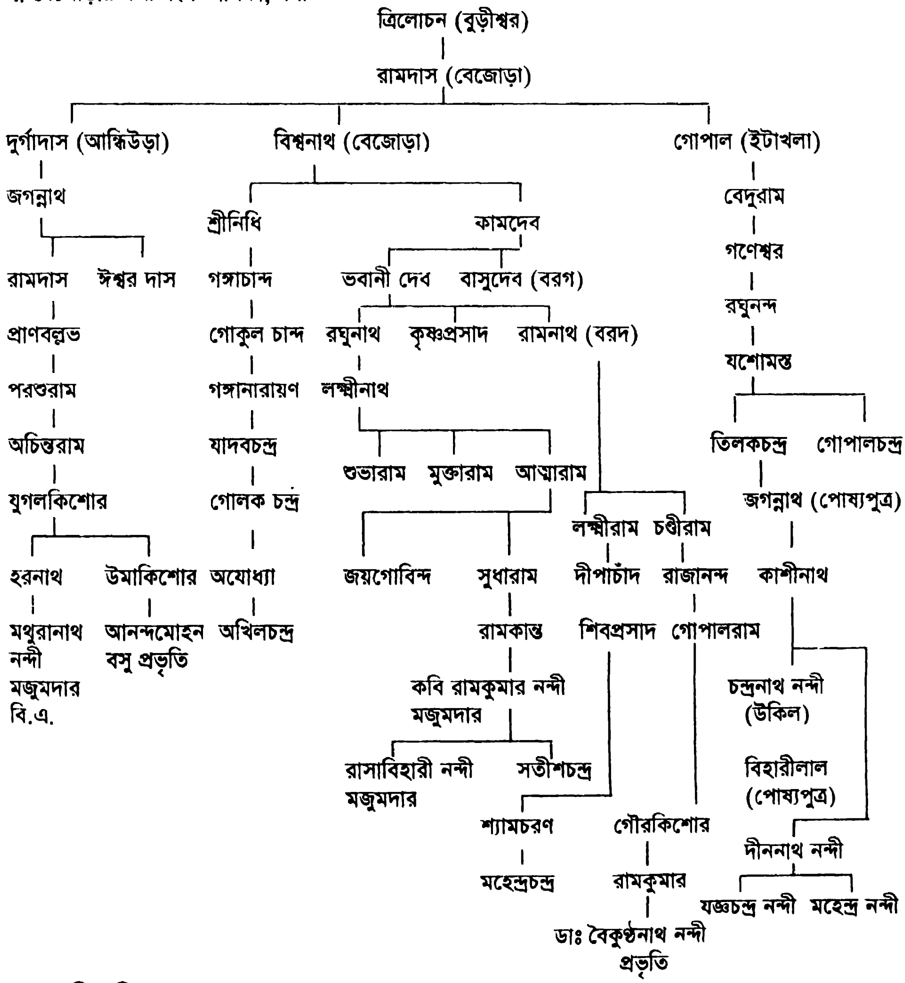


স্থানেই বাস করিতেছেন।

নন্দীবংশ-তিলক খ্যাতনামা কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার মহাশয় বলেন–"শেরপুরের জমিদার মহাশয়ের আমাদের এক বংশীয় বলিয়া পূর্ব্বাবধি জানি। তাঁহারা বড় লোক। কাউ নন্দী বলিয়াই, বৈদ্য বলিয়া শেরপুরের জমিদারগণ পরিচয় দেন। আমাদিগকেও এখানে কাউ না বলিয়া কি জন্য কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন জানি না। আমাদের বংশের একটী বালক ঢাকা কলেজে পড়িত। শেরপুর নিয়া তাহার নিকট নন্দী বংশের একটী কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হয়, পরে একই বংশে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করান হইয়াছিল।"[৮]

রামকুমার নন্দী মহাশয়ের ন্যায় সাহিত্যানুরাগী অতি অল্পই দেখা যায়; রাম কুমারের ন্যায় স্বভাব-কবি ও অশ্রান্ত লেখকও অতি অল্প পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়নকল্পে বিবরণী সংগ্রহের জন্য যখন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, বৃদ্ধ কবি তখন আনন্দ সহকারে তৎক্ষণাৎ

৭. বেজোড়ার নন্দী বংশ তালিকা, যথা–



৮. আরতি পত্রিকা;-আষাঢ় ১৩১৪ বাংলা।

বেজোড়ার বিশারদ বংশ ও নন্দী বংশ তালিকা আমাদিগকে প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রামকুমারের গ্রন্থাবলীর পরিচয়াদি তাঁহার চরিত–কথা উপলক্ষে বর্ণিত হইবে।

চন্দ বংশ-কথা

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের একটী ষ্টেশনের নাম ছাতি আইন। ছাতি আইন বেজোড়া পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। বংশ মর্য্যাদায় এস্থানে চন্দ্র বংশীয়গণ ও জগদীশপুরের দত্তবংশীয়গণ বিশেষ সম্মানভাজন। কিন্তু চন্দবংশীয়েরাই বেজোড়া পরগণার মৌলিক অধিবাসী। ইঁহারা রাঢ় দেশের বিষ্ণুপুর হইতে আগমন করিয়াছিলেন। সেই নবাগত আদি পুরুষের নাম রঘুনাথ চন্দ।

পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইতে বেহারা-ছাতি ব্যবহার করিতেন, পূর্ব্বাংশে একস্থানে ইহা বলা হইয়াছে। চন্দবংশীয়গণই তদঞ্চলে ছাতি ব্যবহারের "আইন" (রীতি) প্রচলন করেন, বলিয়া তাঁহাদের বাসস্থান "ছাতি-আইন" নাম প্রাপ্ত হয়।

চন্দ বংশীয়রা নবাবি আমলে তদঞ্চলের চৌধুরাই প্রাপ্ত হন। জন সংখ্যায় এই বংশ কখনই অতি বৃহৎ ছিল না। বর্ত্তমানে তিন পরিবার মাত্র ছাতি আইনে বাস করিতেছেন।

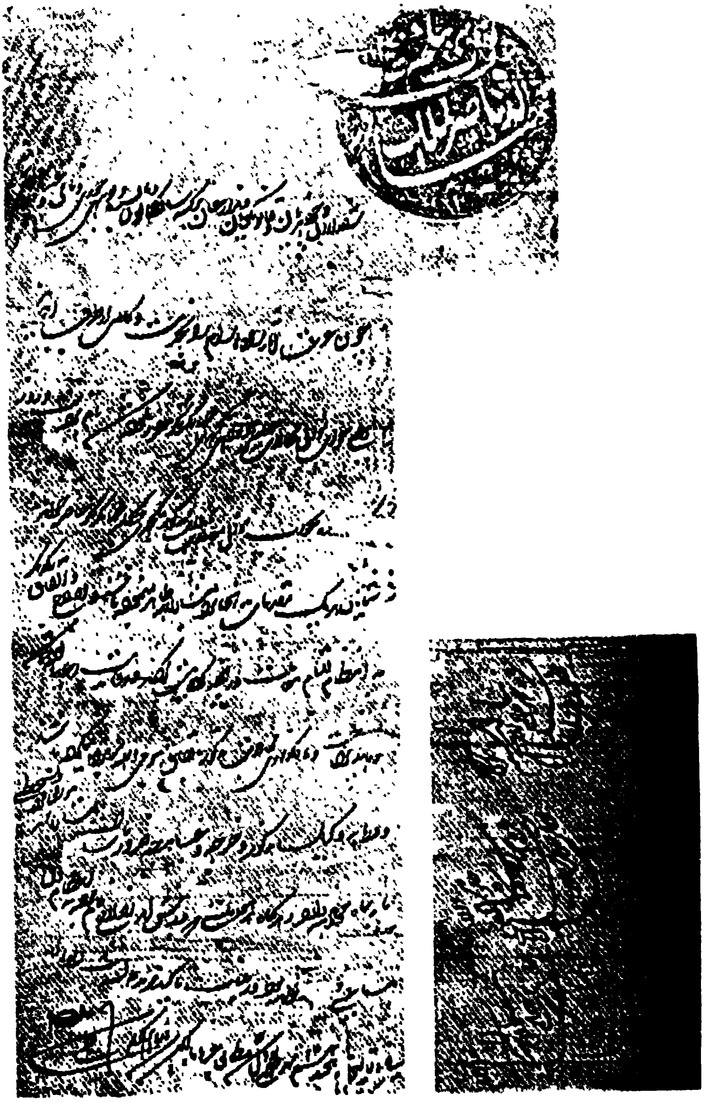
চন্দ বংশে পূর্ব্বে বুড়ন চৌধুরী নামে এক প্রভাবশালী খ্যাত নামা পুরুষের উদ্ভব হয়, ইনি একটা দীঘী খনন করাইয়াছিলেন, এই দীঘীর জলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ হস্ত পরিমিত, উহা এক্ষণে জীর্ণদশা প্রাপ্ত। শ্রীহট্টের জনৈক নবাব বুড়ন চৌধুরীকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। কার্য্য অবসানে উক্ত নবাব শ্রীহট্ট হইতে চলিয়া যাইবার কালে ইঁহাকে দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া, একটি আরদালি পাঠাইয়াছিলেন। আরদালি আসিয়া যখন তাঁহাকে এই সংবাদ দিল, বুড়ন চৌধুরী তখন পূর্ব্বোক্ত দীঘী কাটাইতেছিলেন ও একটী চেয়ারে বসিয়া তাম্রকুট সেবন করিতেছিলেন। তদবস্থায় বলিয়া উঠিলেন–"জোয়ারের জল আসিবার কালে মাথার উপর দিয়া আসে, যাওয়ার কালে কেহ গ্রাহ্যও করে না।" তিনি আর শ্রীহট্টে গেলেন না; আরদালি ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

আমাদের ছাতি আইনের প্রাপ্ত বিবরণীতে লিখিত আছে যে, এক বৎসর পরে উক্ত কর্ম্মচারী পুনঃ নবাবি প্রাপ্তে শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন এবং বুড়ন চৌধুরীর এবম্বিধ ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ ছাতি আইনের অদূরবর্ত্তী নওয়াগার নিকটবর্ত্তী একটি উচ্চ স্থানে উত্তপ্ত লৌহ শলাকাদ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন, ঐ হত্যাস্থান তদবধি "বুড়নটীলা" নামে অভিহিত হয়। স্বনামখ্যাত পরহিতকামী উকীল মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ এম,এ, বি,এল মহাশয় এই চন্দবংশে উদ্ভূত হইয়াছেন। বংশ প্রবর্ত্তক রঘুরাম চন্দ হইতে এখন পর্য্যন্ত এ বংশে ২৩ পুরুষ চলিতেছে।

ছাতি আইনের ভট্টাচার্য্য বংশ চন্দদের পুরোহিত। এ বংশে রুদ্রদেব মুনিগোসাই নামে এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, ৪র্থ ভাগে ইঁহার কথা বলা যাইবে।

দেব বংশ

বেজোড়ায় দেবোপাধি রতিরাম-বংশীয়দের বাস। এই বংশীয়েরা পূর্ব্বে সরাইলবাসী ছিলেন। বলা আবশ্যক যে সরাইল পূর্ব্বে শ্রীহট্টেরই অন্তর্গত ছিল। রতিরামের পিতামহ গোবিন্দ রাম রাঢ় দেশের লোক ছিলেন বলিয়া তদ্বংশে কথিত হয়। রতিরাম পারস্য ও সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের দেওয়ান হইয়া তিনি রায় উপাধিতে ভূষিত হন ও সরাইলে জায়গির লাভে তথায় গমন করেন। পূর্ব্বে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের গৃহ-সন্নিকটে দিয়া দোলারোহণে কেহই যাইতে পারিত না, সর্ব্বত্রই এ রীতি ছিল; রতিরামের বাড়ীব ধার দিয়াও কেহ ঐরূপে যাইত না। কিন্তু রতিরামের জামাতা, শ্বশুর বাড়ীতে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়াই ঐ



ভাদিগিরার রায় বর্ম্মণদের প্রাপ্ত সনন্দ নং-১

ভাবে আসিতেছিলেন। রতিরামের জনৈক নূতন কর্ম্মচারী তাঁহাকে নিষেধ করিলে তিনি গৌরববশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হন; ইহাতে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং জনৈক আক্রমণকারীর আঘাতে দৈবতঃ দোলারোহী প্রাণত্যাগ করেন। মৃতদেহ রতিরামের বাড়ীতে নীত হইলে হতব্যক্তি তাঁহারই জামাতা বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। রতিরামের তনয়া তখন পিতৃগৃহে ছিলেন, এই ঘটনায় তিনি শোকে ম্রিয়মান হইয়া অচিরেই স্বামীর শবদেহ বক্ষে করতঃ চিতায় প্রবেশপূর্ব্বক অনন্তপথের পথিক হন।

এই হৃদয় বিদারক ঘটনায় রতিরাম শোকাকুল হইয়া জনসঙ্গ ত্যাগ করিলেন এবং দীঘীর মধ্যস্থলে এক "জলটঙ্গী" (গৃহ) প্রস্তুত ক্রমে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক অচিরেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রতিরামের শুভারাম ও নন্দরাম নামে দুই পুত্র পিতার মৃত্যুর পর এ দুর্ঘটনার স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পং বেজোড়ার বরগ গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। শুভারামের রাধারাম ও কালারাম নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র রায় ব্রহ্মদেশে একটি কর্ম্মোপলক্ষে গমনকালে সমুদ্রে জাহাজ ডুবিয়া মারা যান। রাধারাম জ্যোতিষ সাহায্যে একথা বাড়ীতে থাকিয়াই অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র জয়চন্দ্রও ব্রহ্মদেশে খাজাঞ্চির কর্ম্ম করিতেন। তিনি অতি অতিথি-সেবাপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে একটা ঘণ্টা বাজিতে এবং নিরূপিত সময়ে যে আসিত, উদর পুরিয়া খাইত। গণনাদ্বারা রাধারাম বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজমোহনের স্ত্রী গর্ভবতী হইলেই পতিহীনা হইবেন; ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার ঐ পুত্রবধুও পূণ্যবতী রমণী ছিলেন; নিজ মৃত্যুর কথা তিনি পূর্ব্বেই অবগত হন ও সকলের কাছে প্রকাশপূর্ব্বক "বৈতরণী" করিয়া, রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বাড়ীতে বিলম্ববৃক্ষমূলে কিছু স্থান পরিষ্কার করিয়া তদুত্তরে একটি তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থানেই শব নীত হইয়াছিল। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত মথুরানাথ রায় এ বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

পরগণা-বাণিয়াচঙ্গ[৯]

সোম ও দত্ত বংশ কথা

বাণিয়াচঙ্গ পরগণার সাঙ্গর গ্রাম নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে, ইহা নিজ বাণিয়াচঙ্গ হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে; এই স্থানে বহুতর দীঘী দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, রাঢ়দেশ হইতে সোমবংশীয় একব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া বাটিকা নির্ম্মাণ করেন, তিনি "বুড়া অধিকারী" নামে খ্যাত ছিলেন। এ সমস্ত দীঘী তাঁহার কৃত বলিয়া কথিত আছে; এই সকল দীঘীর মধ্যে "মালের দীঘী" বৃহত্তর; ইহার দক্ষিণ তীরে দুইটি শিলা লক্ষিত হয়। সোমবংশীয় জনৈক মাল (বলশালী ব্যক্তি) উক্ত শিলাদ্বারা কন্দুক ক্রীড়া করিতেন বলিয়া প্রবাদ। যাহা হউক, বুড়া অধিকারী নিজ বাটিকা গড়বেষ্টিত করিয়াছিলেন; উহা সোমদের গড় এই শব্দদ্বয়ের যোগে সোমগড়=সাঙ্গর গ্রামের নামোৎপত্তি। কিন্তু বর্ত্তমানে এই স্থানে সোমবংশীয় কেহ নাই; কর, ধর, ও সেন প্রভৃতি কয়েক বংশীয়ের বাস আছে। কিন্তু সোমদের ন্যায় ইহাদেরও কোন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। বিবরণী প্রদাতা শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, দত্ত বংশে ইদানীং শিব প্রসাদ দত্ত ও তদীয় ভ্রাতা স্বয়মুত্থিত ব্যক্তি ছিলেন। শিব প্রসাদ ও তদীয় ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ এবং জানকী নাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। শিব প্রসাদ পদব্রজে কলিকাতায় গমন করিয়া বড়বাজারে এক

৯. বাণিয়াচঙ্গ নগরে নাগ-নন্দী-দত্ত-সেন এই মৌলিক বংশ এবং অভ্যাগত সেন-দত্ত-মজুমদার বংশ কায়স্থ-বৈদ্য মধ্যে প্রধান স্থানীয়। মৌলিক বংশ চতুষ্টয়ের নামে পল্লীর নাম আছে; যথা নাগ-জাতৃকর্ণ পাড়া, সেন পাড়া ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় যে, ইহাদের বংশবিবরণ আমরা পাইলাম না।

মহাজনের দোকানে অতি সামান্য বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। শিবপ্রসাদের কার্য্যে মহাজন এত তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দুই বৎসরের বেতন অগ্রিম দিয়া বিবাহ করিতে দেশে পাঠাইয়া দেন। শিবপ্রসাদ বাড়ী আসিয়া বিবাহ করেন এবং কলিকাতায় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানকীনাথকে পাঠাইয়া দেন। ইনিও কার্য্যতৎপরতায় মহাজনকে এরূপ তুষ্ট করেন যে, মহাজন তাঁহাকে পৃথক এক দোকান করিয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি কলিকাতায় একজন বড় মহাজন হইয়া উঠিলেন।

জানকীনাথ তাঁহার পিতার সময়ের এক দাসীকে মাতৃসম্বোধন করিতেন, তিনি একদা দেশে আসিলে সেই বৃদ্ধা কপিলা দান করিতে ইচ্ছা করে। জানকীনাথ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে সেই বৃদ্ধার আকাঙ্খা পূর্ণ করেন। ফলতঃ ব্যবসায়ে ইঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে অর্থনাশের কারণ ঘটে। এই দত্ত বংশে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি প্রণেতা ও উপনিষদের অনুবাদক শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের উদ্ভব।

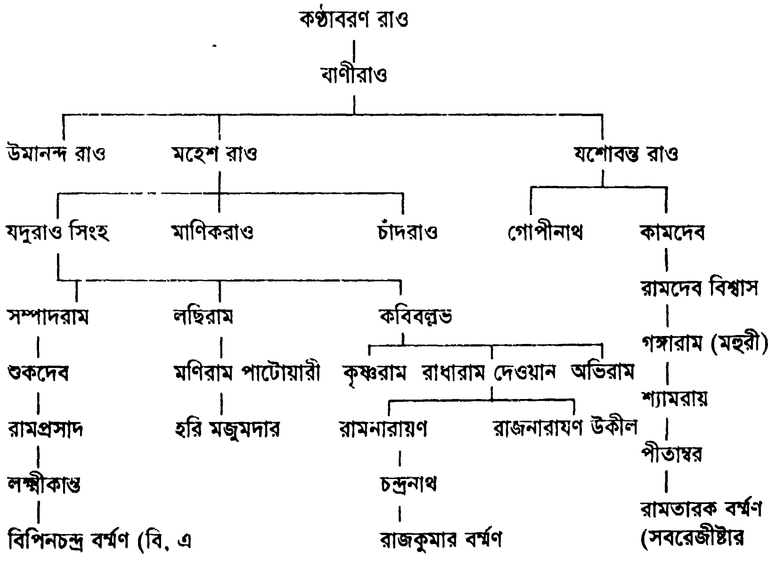
পরগণা-বামৈ

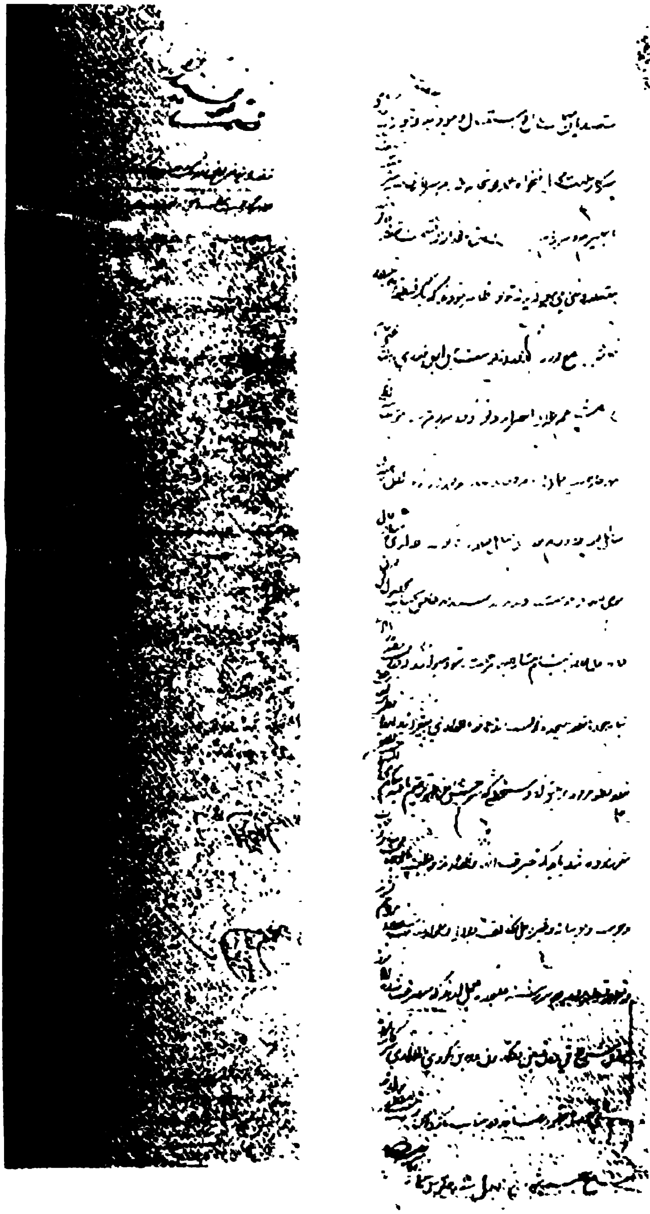
বর্ম্মণ-বংশের কথা

বামৈ পরগণার ভাদিগিরা (ভদ্র গৃহ) গ্রামবাসী রায় বর্ম্মণ বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বংশ। প্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নবাব ইসলাম খাঁ যখন মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদিগকে দমনার্থে চট্টগ্রামে অভিযান করেন, সেই সময়ে এই বংশের কোন প্রসিদ্ধ পুরুষ রাঢ়দেশ হইতে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তথায় প্রেরিত হন। কিছুকাল চট্টগ্রামের অবস্থিতির পর প্রত্যন্ত প্রদেশ শ্রীহট্টের তোপখানার কার্য্যগ্রহণ করতঃ কণ্ঠাভরণ, কি তৎপুত্র বাণীরাও বামৈ অঞ্চলে আইসেন এবং তথায় জায়গীর স্বরূপ প্রচুর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই বাস করিতে থাকেন।

এ বংশীয় অনেকেই মোগলরাজ সরকারে চাকুরী করিয়া সম্মান ও অর্থলাভ করেন। নবাবপ্রদত্ত সনন্দাদি দৃষ্টে জানা যায় যে এবংশে অনেক কৃতী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১০]

১০. ইহাদের ক্ষুদ্র বংশ তালিকা এইঃ–





ভাদিগিরায় রায় বর্ম্মণদের প্রাপ্ত সনন্দ নং ২

এ বংশীয় অভিরাম ও হরিরাম পরবর্ত্তী কালে শ্রীহট্টের তোপখানার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া মিরাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১১] এই অভিরামেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধারাম, নবাব নাসির উল মুলকের প্রদত্ত সনন্দানুসারে ঢাকার জমিদারীতে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১২] ইহাদের অনেকেরই নামে তালুক ছিল; "তাং অভিহরি" অভিরাম ও হরিরামের যুক্ত নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাং তিলক বর্ম্মণ, ও তাং গঙ্গারাম, বন্দোবস্তকারিগণের নিজ নামেরই পরিচয় দিতেছে। ইঁহাদের অধিকৃত দেবতার নামীয় "দুর্গা গোবিন্দ" বলিয়া একটি তালুক আছে। দেওয়ান রাধারামের পুত্র রাজনারায়ণ ১২০০ সালে জাহাঙ্গির নগরে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই বংশীয়গণের "বর্ম্মণ" এই কুলপরিচয় এবং "রাও" ও "সিংহ" প্রভৃতি কুলোপাধি এবং তোপখানার কার্য্যাদি ব্যবসায় গত পরিচয় হইতে ইহাদিগকে রণব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়। কথিত আছে, বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সময় শ্রীহট্ট প্রদেশে সিপাহীর আগমন সংবাদে ভীত হইয়া পরগণাবাসী অনেকেই রায় বর্ম্মণদের আশ্রয়ে আসিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াছিল। এ বংশীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বর্ম্মণ মহাশয় স্বীয় বংশ বিবরণ সহ, এতৎ সংলগ্ন সনন্দ-চিত্রদ্বয় প্রদানে আমাদিগকে সাহায্য কবিয়াছেন।

---

১১. নবাব নাসিরউলমুলক বাহাদুব সাদির বেগম মোহরযুক্ত ১১৭০ অব্দের সনন্দের মর্ম্ম এই যে, "পরগণার চৌধুরিয়ান, কানুনগোয়ান ও জিরাতানকে লিখা যায় যে সরকারী তোপখানার কার্য্যকারক অভিরাম ও হরিরাম তালুকদারান তাহাদের তালুকের সনদ আদালত হইতে পাইয়াছে। তাহারা মিরাসী সনদ পাইয়াছে; সেমতে তোমরা তাহাদের তালুকদারী সেরেস্তায় তোমাদের নামজারি ও কর দাখিল করিতে পারিবা। এই বিষয় তাগিদ তাগিদ জানিবা। ইতি চন্দ্রের ২৯ শে জমাদিয়াল আউয়াল।"

পুনশ্চ নবাব আসফ উদ্দৌলার অধীনে শ্রীহট্টের নবাব মীর আলীইয়াব খাঁর মোহরাঙ্কিত ১১ ঃ অব্দের প্রদত্ত সনদে এইরূপ লিখিত আছেঃ–

"জিলে শ্রীহট্ট পরগণে বামৈ সংক্রান্ত মোহরের ও তেওয়ারী মত খাঁ।

মহালের তোপখানার আমলা শ্রীহট্ট জিলার থানার এলাকার অভিরাম ও হরিরাম বর্ম্মণ মালগুজার দশ্বান তালুকা (?) দুর্গাগোবিন্দ মোতালকে ডিহি বামৈর সামীলে বটে। তাহারা প্রকাশ করিলেক ঐ পরগণার অন্তর্গত কতক ভূমি জঙ্গলা বটে। প্রস্তাবিত জঙ্গলা ভূমির অভিরামের খুল্লতাত ও হরিরামের পিতামহ লছিরাম বর্ম্মণ কথিত ভূমি জঙ্গলাবাদি পাট্টা গ্রহণ করিয়াছিল। চন্দ্রের তারিখ ৫ শওয়াল।"

১২. নবাব নাসিরউলমুলকের মোহরাঙ্কিত সনন্দের মর্ম্মঃ–"শিকদারান ও চৌধুরিয়ান ও কানুনগোয়ান পরগণে (মালকানুন) ও মাগুরা ও পরগণে পুটিজুরী গয়রহ জ্ঞাত হইবা যে ইজ্জতা হার রাধারাম বর্ম্মণকে এ পক্ষের পক্ষে জিলা জাহাঙ্গির নগর মোকামে এপক্ষের জমিদারী সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা উক্ত দেওয়ান দ্বারা রীতিমত উকীল নিযুক্ত ক্রমে সমাধা করিবা এবং এপক্ষের জমিদারী সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার করচ উক্ত দেওয়ান যোগে দেওয়া হইবে, এবিষয় তাগিত তাগিদ জানিবা। ইতি সন ১১৭১ বাংলা মাহে ফাল্গুণ।"

এই দুইখানা সনন্দের চিত্র প্রদত্ত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পুনঃ বিবিধ বংশ কথা

পরগণা-জলসুখা

বসু বংশ

"জলসুখা পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট নগর একটি ক্ষুদ্র (কিন্তু বহু প্রাচীন) পল্লী গ্রাম। আজ প্রায় দেড়শত বৎসর হইল, এই গ্রামে রাখাল বসু নামক একব্যক্তি অবস্থান করিতেন। ইহার গোত্র কৃষ্ণাত্রেয়। কিন্তু জানিনা কি প্রকারে ইনি বসু বলিয়া আপনার কৌলিক উপাধি গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টে ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্র এইরূপ খ্যাতি ছিল না। বর্ত্তমানে যে সকল পরিবারে ইহা দেখা যায়, উহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হয় ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সমাগত, নয় কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রাগুক্ত উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। রাখাল বসু শেষোক্ত শ্রেণীর ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কেননা বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ কায়স্থ মহাশয়দের গোত্র কৃষ্ণাত্রেয় নহে, গৌতম।"

"রাখাল বসুর দুইপুত্র ছিলেন, প্রথম শ্যাম বসু, দ্বিতীয় নেহাল বসু। শ্যাম বসু নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ ময়মনসিংহের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত অপর একটি ক্ষুদ্র পল্লী গ্রামে যাইয়া অবস্থান করেন, এই গ্রামের নাম জয়সিদ্ধি। নগর হইতে এই গ্রামটির দূরত্ব ৭/৮ মাইল আন্দাজ হইবে। রাখাল বসুর দ্বিতীয় পুত্র নেহাল বসু নগরেই থাকেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র নরহরি শ্রীহট্টের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বেজোড়া পরগণায় পাটলি গ্রামে গিয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করেন। তদীয় বংশধর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু অদ্যাপি সেই গ্রামেই বসতি করিতেছেন।"

জয়সিদ্ধি উপনিবিষ্ট শ্যামবসুর কথা এস্থলে প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা অন্যায় হইবে না। তাঁহার "তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ কমললোচন, মধ্য পদ্মলোচন এবং কনিষ্ঠ কালীচরণ। পদ্মলোচন বসু সময়োপযোগী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ময়মনসিংহ দেওয়ানী আদালতে একটি চাকরী লাভ করিলেন।"

ইতিপূর্ব্বে বেজোড়ার নন্দীবংশের কথা বলা গিয়াছে, "আহ্নিউড়া গ্রামে নন্দী মজুমদারের যে শাখা আছে, সেই শাখায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুগল কিশোর নন্দী মজুমদর একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। হরনাথ নামে তাঁহার একটি পুত্র এবং উমাকিশোরী নাম্নী তাঁহার একটি রূপলাবণ্য শালিনী সৌভাগ্যবতী কন্যা জন্মে।"

"জয় সিদ্ধির কমললোচন বসু তদীয় মধ্য ভ্রাতা পদ্মলোচনের বিবাহের জন্য যুগল কিশোর নন্দী মজুমদারের শরণাপন্ন হইলেন।"

"-যথাকালে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কথিত আছে কন্যাটিকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইবার সময়ে সাধু যুগলকিশোর সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন-মা পাত্র দেখিয়া দিলাম, নৃত্য করিয়া খাও।" "শুভক্ষণে সৌভাগ্যবতী উমাকিশোরী পতিগৃহে প্রবেশ করিলেন।" "কেবল যে ধনসম্পত্তিতেই পদ্মলোচনের সংসার শোভিত হইল, তাহা নহে। একে একে তিনটি পুত্র সন্তান হরমোহন, আনন্দমোহন ও মোহিনীমোহন-প্রত্যেকটি যেন মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কেবল যে পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিল এমন নহে, তাঁহারা কালে পণ্ডিত ও চরিত্রে যশস্বী হইয়া স্বীয় জন্মভূমির মুখও উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছে।" উমাকিশোরীর মধ্য পুত্রই "ভারত-নক্ষত্র" সুবিখ্যাত আনন্দমোহন বসু। তাহাতে মাতুল "হরনাথ মজুমদারের আকৃতির এত

সাদৃশ্য ছিল যে 'নরাণাং মাতুলাকৃতিঃ' এই বাক্য আনন্দমোহনে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল"।[১]

দাস বংশ

জলসুখাস্থ দাস বংশীয় গঙ্গারাম দাস চৌধুরীর কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে বাণিয়াচঙ্গাধিপতি গোবিন্দখাঁর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; গোবিন্দ খাঁর জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছিল; ইহার পরে তিনি যখন দেশে আগমন করেন, তখন তৎসহ গঙ্গারাম দাস নামক এক ব্যক্তি বাণিয়াচঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি রাজানুগ্রহে জলসুখাতে কতক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করেন। গোবিন্দ খাঁর অনুষঙ্গী এই গঙ্গারামের পুত্র পৌত্রাদির সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। এই দাসবংশে পরে ঐ নামেই এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই বংশ কথা জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহারই নামে জলসুখার ১নং তালুকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল; তত্রত্য ৩নং তালুক ইহার পুরোহিত রামগোপাল চৌধুরীর নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বন্দোবস্ত হইয়াছিল; তত্রত্য ৩নং তালুক ইহার পুরোহিত রামগোপাল চৌধুরীর নামে বন্দোবস্ত হয়। উক্ত গঙ্গানারায়ণের পুত্রের নাম রামনারায়ণ ইহার পুত্রের নাম কীর্ত্তি নারায়ণ।

রাম নারায়ণের জাতিচ্যুতি

পূর্ব্বে জলসুখার একটি নবাবি তহশীল কাছারী ছিল; সে স্থানে কাছারী ছিল, উহা অদ্যাপি "কাছারীঘাট" নামে খ্যাত আছে। একদা রামনারায়ণ চৌধুরী কাছারী ঘাটে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যেই কাছারী। কাছারীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে একটি দৃশ্যে তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন; দেখিলেন যে, খাজানা দিতে অসমর্থ একটি প্রজাকে হাত পা বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তহশীল কর্ম্মচারী নিকটেই দণ্ডায়মান, তাঁহার আদেশে ক্রূর পাইকবর্গ হতভাগ্য প্রজাকে ক্ষণে ক্ষণে যষ্টি প্রহার করিতেছে, আর সে যন্ত্রণায় "আহা হা" বলিয়া চিৎকার করিতেছে! এ দৃশ্যে রামনারায়ণ ধৈর্য্যহারা হইয়া সেই কর্ম্মচারীকে, ইহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কর্ম্মচারী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিল না, তখন "পর দিন আসিয়া" তিনি উক্ত প্রজার দেনা শোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হতভাগ্য প্রজা নিষ্কৃতি পাইল।

পরদিন যখন দেনা শোধ করিতে রামনারায়ণ কাছারীতে গমন করিলে, দেখিতে পাইলেন, তখন কাছারীতে একটা সভা সম্মিলিত; বহু মৌলবী ও পণ্ডিত তাঁহাতে সমাসীন। রামনারায়ণ আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে সেই তহশীল কর্ম্মচারিটী চৌধুরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনে গত কল্য প্রতিশ্রুত হন যে আজ 'দিন' আসিবেন, সেই জন্যই এই সভার উদ্যোগ করা হইয়াছে; সর্ব্বসমক্ষে আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করুন। পারশ্য 'দিন' শব্দ দিবা বাচক নহে, আপনে এই পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।" কর্ম্মচারীর কথাবসানে সমাগত সকলেই সেই বাক্যের পোষকতা করিল; রামনারায়ণও দিনের অর্থান্তই তাঁহার প্রতিশ্রুতি জ্ঞান করিয়া, অগত্যা অঙ্গীকার রক্ষার্থ সেই স্থলেই মোসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন; তাঁহার নাম রহমত উল্লা হইল।

এরূপ জনশ্রুতির কথাও কেহ কেহ বলেন যে, পরদিন কৌশলে প্রজার খাজানা প্রেরণে বাধা জন্মান হয় ও পরে সেই ছলে চৌধুরীকে জাতিচ্যুত করা হয়।

১. বসু বংশের উদ্ধৃত কথাগুলি ১৩১৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা "আরতি"তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম,এ মহাশয়ের "স্বর্গীয় অনীন্দ মোহন বসু" শীর্ষক নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

রামনারায়ণ জাতিচ্যুত হইয়া বাড়ী আসিয়া স্ত্রীপুত্রকে এই বিবরণ জ্ঞাপন করে এবং স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধভাগ, পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণকে প্রত্যর্পণ করিয়া পরদিন স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়া নূতন বাটিকা প্রস্তুত করেন; সেই স্থান "নওয়া" গ্রাম নামে কথিত হয়। তিনি তাহার পর আর একটি গ্রাম স্থাপন করেন, উহা তাঁহার নিজ নামে "রহমতপুর" বলিয়া খ্যাত।

মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি একটি বিবাহ করেন, সেই বিবাহে তাঁহার ইয়ার মোহাম্মদ ও আসান উল্লা নামে দুই পুত্র হয়।[২] ইয়ার মোহাম্মদ জলসুখার "ইয়ারাবাদ" গ্রামের স্থাপয়িতা। আসান উল্লার বংশীয়গণ এখন অতি দীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন।

রামনারায়ণের হিন্দুশাখায় ভূপতি রায়, তৎপুত্র ভৈরব রায় প্রভৃতি কীর্ত্তিমান ব্যক্তি ছিলেন; এই বংশ এক্ষণে বিলুপ্ত।

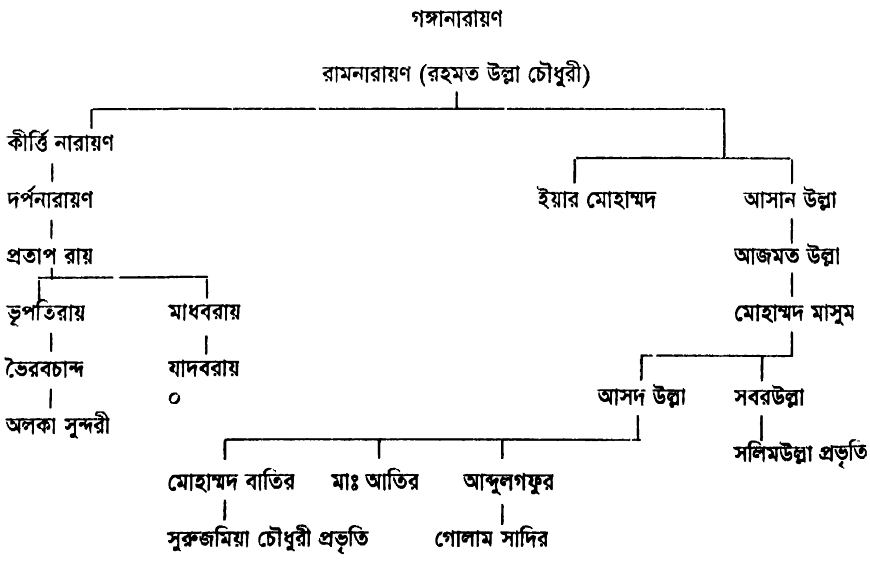
রায় বংশ

গঙ্গানারায়ণ, রামগোপাল এবং জলসুখার মোসলমান জমিদার বংশীয়গণ যখন বাদ বিসম্বাদে ব্যস্ত, তখন আর এক বংশীয় এক ব্যক্তি নীরবে নিজ ভাগ্য-বিচারে বিব্রত ছিলেন; এস্থলে বৈশ্য-সাহা জাতীয় খেলারাম রায়ের কথাই বলিতেছি। ধনৈশ্বর্য্যে খেলারাম অল্প সময় মধ্যে জলসুখাতে সর্ব্বাগ্র গণ্য হইয়া উঠেন।

খেলারামের অনুকরণে সাহাবণিক শ্রেণীর আরও দুই ব্যক্তি সংসার-সংগ্রামে বিজয়লাভ করেন, তাঁহাদের নাম লাখু রায় ও উছব রায়। লাখু রায়ও বুদ্ধিবলে অচিরকাল মধ্যে প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া উঠেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথম জলসুখায় কোঠাবাড়ী প্রস্তুত করেন; অদ্যাপি সে বাড়ী "দালানিয়া বাড়ী" নামে খ্যাত আছে। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যিনি জাপান গমন করিয়াছিলেন, সেই রমাকান্ত রায় এই বংশীয় ছিলেন; ৪র্থ ভাগে তাঁহার জীবনীর ২/১টি কথা বলা যাইবে।

---

২. বিবরণী প্রদাতা শ্রীযুক্ত বিরজানাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের প্রেরিত গঙ্গানারায়ণের বংশবৃক্ষ এইরূপঃ-



উদ্ধব রায় স্ব-অর্জ্জিত সমস্ত অর্থই ভূসম্পত্তিক্রয়ে ব্যয় করেন; ইহাতেই তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য বুঝিতে পারা যায়; ইঁহার পৌত্র গোবিন্দচান্দ রায় এক জন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। গোবিন্দচান্দ রায়ের সদ্ব্যয় অনেক ছিল; জলসুখার নরসিংহের আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। ঐ আখড়ার সেবাব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি বার্ষিক ৪০০ শত টাকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

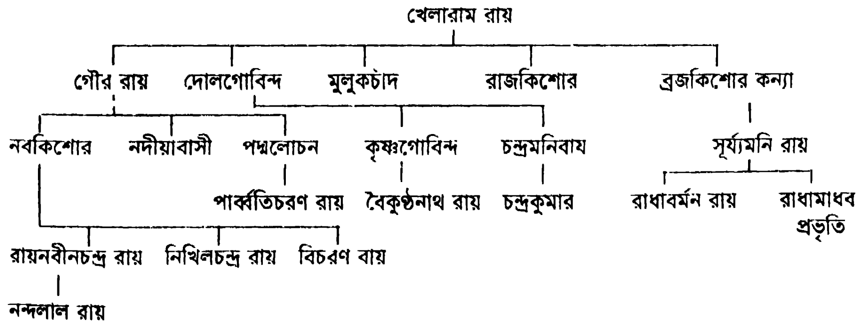
খেলারামের বংশকথা

খেলারাম রায় ঘৃতের ব্যবসায়ে ও অধমর্ণদিগকে ঋণদান করিয়া, তাহার আয় দ্বারা প্রভূত ধন অর্জ্জন করেন। তিনি সদ্ব্যয়ে মুক্ত হস্ত ছিলেন, এজন্য সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। তিনি কেবল পরের সাহায্য জন্য কতকগুলি চাকর নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহারা পীড়িত ও নিতান্ত দীন ব্যক্তিদিগকে নানাকার্য্যে সহায়তা করিত। তিনি সকলকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যে কেহ "দুগ্ধ, ঘৃত বা চিনি চাহিলে অকাতরে দান করিও, কিন্তু তরি তরকারি চাহিলে দিও না।" তাঁহাব এই বাক্যটি সদুদ্দেশ্য পূর্ণ। অলস ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসিতেন না; শাক শব্জি একটু পরিশ্রমে সকলেই উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ঘৃত, দুগ্ধ বা চিনি আহরণে সকলে সমর্থ হয় না; দরিদ্রকে তাহাদের দুষ্প্রাপ্য ঘৃত দুগ্ধাদি চাহিলে দেওয়া উচিত; কিন্তু শাক সব্জি দিয়া অলস করিয়া তুলা কর্ত্তব্য নহে।

তাঁহার পাঁচ পুত্র হয়, তন্মধ্যে রাজকিশোর রায় পিতার ন্যায় সদ্ব্যয়ী ছিলেন; তিনি বৃন্দাবনে এক কুঞ্জ, কাশীতে এক বাড়ী, ও নবদ্বীপে হরিসভার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ঢাকাদক্ষিণের শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতেও তাঁহার অনেক নিয়মিত ও নিরূপিত দান ছিল। মৃত্যুকালে সদ্বয়ের জন্য তিনি ২৫০০০ সহস্র টাকা উইল করিয়া রাখিয়া যান; এই টাকা মহাভারত পাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন, বৈষ্ণবসেবা ও দরিদ্রকে দানাদিতে ব্যয়িত হইয়াছিল।

দোলাগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ রায় প্রতাপশালী ব্যক্তি ও সদ্ব্যয়ী ছিলেন।[৩] তাঁহার উন্নত সুপুষ্ট দেহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিনি যেমন বলশালী ছিলেন, আহারও তদ্রূপ ছিল; পূর্ণকায় একটি অজ-মাংস স্বচ্ছন্দে একা আহার করিতে পারিতেন। দুর্ভিক্ষে দান, শিক্ষার্থ নিজ ব্যয়ে জলসুখা মধ্য ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দানাদি সৎকার্য্যে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। শ্রীহট্টে যখন লর্ড নর্থব্রুকের শুভাগমন ঘটিয়াছিল, তখন শ্রীহট্টের দরবার সভায় ইনি উপস্থিত হইয়াছিলেন ও চাঁদার খাতায় সর্ব্বোচ্চ দান স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। শুধু তাহা নহে, লাট মহোদয়ের সম্মানার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শহরের দীন দুঃখী ব্যক্তিবর্গকে নববস্ত্র দান করিয়াছিলেন; এই সদনুষ্ঠানের জন্য সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। আসামের চিফ্ কমিশনার বাহাদুর

৩. রায়দেব বংশ-তালিকা এইঃ–



ইহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে বিনা পাশে বন্দুক রাখিবার অধিকার দিয়া সম্মানিত করেন।

অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার লইত; জনৈক ভদ্রঘরের অধমর্ণকে তিনি এক সময় ১১০০০ একাদশ সহস্র মুদ্রা মাপ দিয়াছিলেন; ইহা সামান্য উদারতাজ্ঞাপক নহে। তদ্ব্যতীত তীর্থাদিতে তদীয় দানের সংখ্যাও অল্প ছিল না। বৃন্দাবনের কুঞ্জে সাধুসেবার জন্য তিনি এককালীন পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। একজন তৈর্থিক মোহান্তের ঋণশোধের জন্য তৎক্ষণাৎ এক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্যমণি রায় প্রকৃত সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি বিপদে সম্পদে সমভাবে অবস্থিতি করিতেন। মুখে সর্ব্বদাই হরিনাম বিরাজ করিত, ভোগসুখে বিরত ছিলেন, এমন কি দুঃসহ আত্মীয় বিয়োগেও তাঁহাকে অধৈর্য্য হইতে দেখা যাইত না; ইঁহার ন্যায় সংসার-যোগী পুরুষ ইদানীং দৃষ্ট হয় না।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস"-বাণিজ্যেই ইঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-সং প্রাপ্তি; যখন বাদবিসম্বাদে জলসুখার পূর্ব্বাধিকারিগণ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাণিজ্যলব্ধ অর্থে রায় বংশীয়গণ তখন তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিতে থাকেন; তদ্ব্যতীত বাণিয়াচঙ্গের অনেক মহাল তাঁহাদের হস্তগত হয়। এইরূপে রায় বংশীয়গণ তদঞ্চলে মহাশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইদানীং ইঁহারা অর্থকর বাণিজ্য পরিত্যাগ করায়, অবস্থা কিছুটা ম্লান হইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত সংখ্যার অভাব নাই, সুতরাং তাঁহারা নিজ ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন বলিয়া আশা করা যায়।[৪]

পুনঃ পরগণা-তরফ

মাছুলিয়ার চৌধুরী বংশ

তরফে মাছুলিয়াতে সাহা-বণিক বংশীয় চৌধুরীদের বাস। এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ নিত্যানন্দ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বদি (বৈদ্যনাথ), তৎপুত্র উদ্ধব, উদ্ধবের রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র জন্মে; ইহারাই তত্রত্য চৌধুরাই প্রাপ্ত হন। ইহাদের নামীয় একটি তালুক তথায় আছে।

এই বংশের সৎকীর্ত্তি অল্প নহে, লক্ষণ রায় ১১৯৩ সালে পঞ্চরত্ন সমন্বিত এক দোতালা বাড়ী প্রস্তুত করেন, ঐ বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় চৌধুরীগণ কর্ত্তৃকই মাছুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্মণ রায়ের, লাল চান্দ, কৃষ্ণরাম ও বিষ্ণুরাম নামে তিন পুত্র হয়। এই তিন ব্যক্তি হইতে মাছুলিয়ার চৌধুরী বংশে তিন পরিবারের উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি মধ্যে প্রায় সকলেই স্বধর্ম্মনিষ্ট ছিলেন, বাহুল্য বিধায় তদুল্লেখ করা গেল না।

লালচান্দের দুই পুত্র; তন্মধ্যে কণিষ্ঠের নাম রত্নবল্লভ, ইঁহার পুত্র "নীতিশতক," "কলঙ্কভঞ্জন," "বৈষ্ণব পদাবলী" ও "ঘাটু সঙ্গীত" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায় জীবিত আছেন।

বিষ্ণুরামের পুত্র বৈদ্যনাথ, তৎপুত্র বৈকুণ্ঠনাথ একজন প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন; তিনি অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সহজধর্ম্মের প্রতি পোষককে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় তিনি কয়েক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

---

৪. প্রেরক শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দেব ও শ্রীযুক্ত বিজানাথ তর্কপঞ্চানন।

কৃষ্ণরামের পুত্রের নাম নবকিশোর, তৎপুত্র নব নারায়ণ সূক্ষ্ম বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এম এ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র লাল দাস চৌধুরী প্রভৃতি ইঁহার পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকারীরূপে বর্ত্তমান আছেন।[৫]

গোপায়ার চৌধুরী বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায়ে পৈলের বিবরণে শাহ নুরির কথা লিখিত হইয়াছে। নুরি যখন দিল্লী হইতে নিজ নামে "নুরুল হাসন নগর" পরগনা খারিজ করিয়া আনয়ন করেন, সেই সময় কালারাম পাল নামক এক ব্যক্তি স্বগুণে ঢাকার নবাব হইতে "রায়" উপাধির সহিত শ্রীহট্টে কতক জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাহ নুরি সেই কালারামকে নিজ অনুষঙ্গীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালারাম নিজ জায়গীর ভূমের নাম "গোপায়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রাজানুগ্রহে তিনি এই ভূমি দান প্রাপ্ত হন বলিয়া এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। (গো অর্থে পৃথিবী, পায়া প্রাপ্ত হওয়া।) শাহনুরি কালারামকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এমন কি, তিনি এই স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কালারামের গৃহের "নিশান" স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

কালারাম নিজ ভ্রাতা কুলরাম প্রভৃতিকে পরে এই স্থানে আনয়ন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। কালারাম বেকিটেকা বাজারের নিকট একটা ঘাট বসান, ইহা "কালারামের ঘাট" নামে খ্যাত আছে; ঐ স্থান এক্ষণে মৎস্য বিক্রয়ের এক প্রধান আড্ডা। তিনি কয়েকটি হাট বসাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

কালারামের পুত্র রাম দাস, তৎপুত্র চান্দরাম, তাঁহার পুত্রের নাম জগৎরাম, তৎপুত্র আদিত্য রাম, তাঁহার পুত্রের নাম শ্যামরায়, শ্যামরায়ের পুত্র প্রসাদরাম, ইঁহার উৎসব রাম নামে এক পুত্র হয়; ইনি সাধারণতঃ উছব পাল নামে খ্যাত ছিলেন। ইঁহার সময় হইতেই এই পাল বংশীয়গণ "চৌধুরী" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। উছব পাল একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অকমর্ণবর্গকে ঋণদান করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং তাহাতে তরফ পরগণার অনেক তালুক ক্রয় করিয়া জমিদার শ্রেণীতে গণ্য হন। তাঁহার প্রতাপে অনেক দুষ্ট লোক দমিত হইয়াছিল। তিনি নিজগৃহে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীধর বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং খোয়াই নদীতীরে "গোবিন্দগঞ্জ" নামে একটি বাজার বসান। সেই স্থানে তিনি একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া যশস্বী হন। প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি রাখিয়া ১২৬৯ বাংলায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ অতি ধার্ম্মিক ও সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; হবিগঞ্জে তিনি "চৌধুরী বাজার" নামে একটি বাজার বসাইয়াছিলেন; উহা এক্ষণে একটি প্রধান বাজারে পরিণত হইয়াছে। গোপায়ার মধ্য ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা তাঁহার আর এক কীর্ত্তি। ৩৫ বৎসর মাত্র বয়সে পুত্র হরকুমার পাল চৌধুরীকে নাবালক অবস্থায় রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হরকুমারও একজন উপযুক্ত জমিদাররূপে গণ্য হন, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন। গোপায়া স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

৫. প্রেরক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত।

বহুলার বংশ বিবরণ

তরফ পরগণায় হবিগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী বহুলা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বৰ্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া অঞ্চলে পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "বহুলা"। কোনও সাধক দেবীর নামে গ্রামের নামকরণ, করিয়াছিলেন কিনা, অথবা গ্রামের বিস্তৃতি-সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া ইহার নাম "বহুলা" হয় কিনা, তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। তবে গ্রামের প্রসিদ্ধি বহুকাল হইতে। তরফের "আনন্দপুর" মহালের অধিকারী আনন্দরাম দত্তের নিবাস এই গ্রামে ছিল। পরে এই দত্তজবংশ মোসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোসলমান সমাজভুক্ত হইয়া যান। এই বংশের সুবিদ্বান মৌলবী সাহেব আব্দুল রহিম বীরভূমের তদানিন্তন পাঠান বংশীয় নবাবের শিক্ষকতা করিয়া যথেষ্ট যশঃ ও অর্থ অর্জ্জন করেন। পরে ইহারা "চৌধুরী" উপাধি ধারণ করিয়া এক ঘর বহুলা গ্রামেই স্থায়ী হইয়াছেন। অপর এক ঘর পুটিজুরীর অন্তর্গত ও ভাদেশ্বর দৌলতপুরে উঠিয়া যান। ইঁহারা বলিয়া থাকেন ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ও রিচির দত্তচৌধুরীগণ একই বংশীয়। বহুলার এই দত্তবংশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পুরোহিত বংশও মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্তও তাহারা মোসলমান হইয়াও "ঠাকুর" পদবীতে অভিহিত হইয়াছিলেন। "গোপাল রায়", "সুবল গৌরাঙ্গ", "লাখুউদ্ধব", ভঙ্গুবাঞ্ছী নামীয় তালুকের অধিকারীগণও সকলেই এ গ্রাম নিবাসী। গ্রামের অগ্রণী দত্তজগণ পুরোহিত সহ মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ভগ্নোৎসাহে অন্যান্য বিশিষ্ট হিন্দুগণ মধ্যে অনেকে এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর বসতি করেন।

বহুলা গ্রামবাসী অন্যতর বংশোদ্ভব পরলোকগত সদাময় রামদুলাল দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কলিকাতার টেরেটি বাজারে তাঁহার বিস্তৃত কারবার ছিল। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে মুক্তহস্তে দান করিয়া তিনি যশস্বী হন, তখন দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল, দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ দান-বহুল শ্রাদ্ধ ব্যাপার এতদঞ্চলে তাঁহার স্মৃতি চির জাগরূক রাখিয়াছে।

বহুলাবাসী আমাদের বিবরণ প্রদাতা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাস বি.এ সুদূর কাশ্মীর রাজ্যে যিনি রাজমন্ত্রীর আফিসে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন, বৃদ্ধ পিতামহ এস্থান বাসী হন, তাঁহার নাম তুলসী দত্ত। কবিরাজী ব্যবসায়ী তুলসী দত্ত নবাবী আমলে যশোর হইতে কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া উচাইল গ্রামে "ধানুপাবন" নামে পরিচিত গোষ্ঠিতে বিবাহ করিয়া এদেশে থাকিয়া যান। উক্ত গোষ্ঠির কোনও মহাজনের জেলা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত নলচিঠিতে কারবার ছিল, যশোর নিবাসী তুলসীদত্তও সেইখানে কবিরাজী করেন। মহাজন কোনও রোগীর চিকিৎসার্থ তাঁহাকে এদেশে লইয়া আসেন। এই বিবাহ লইয়া ঢাকার নবাব সেরেস্তায় অসবর্ণ বিবাহেব অভিযোগ হইয়াছিল, শ্রীহট্টের চিরাচরিত প্রথার সমর্থনে অভিযোগ পণ্ড হইয়া যায়। তুলসীদত্তে অনন্তর বংশীয়েরা উচাইল গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া কিছুকাল ভদ্রগৃহ বা ভাদিগিরা গ্রামে বাস করেন ও পরে বহুলায় আসিয়া বাসস্থাপন করেন। ভদিগিরায় (অধুনালুপ্ত) এক শাখা "উত্তম কৃপারামের" গোষ্ঠিনামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মাছুলিয়ার জগন্মোহিনী সম্প্রদায় কাহিনী

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ১ম ভাগের ৮ম অধ্যায়ে ধর্ম্ম "প্রকরণে" "জগন্মোহিনী" সম্প্রদায়ের উল্লেখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের প্রথম ভাগে বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত এই অভিনব সম্প্রদায়ের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। মাছুলিয়া এই সম্প্রদায়ের আদি স্থান, দ্বিতীয় স্থান জলসুখা, তৃতীয় ও প্রধান স্থান বিথঙ্গল। তদ্ব্যতীত ঢাকা জেলার ফরিদাবাদ চতুর্থ ও শেষ স্থান। আরও আটটি স্থানে এই সম্প্রদায়ের আখড়া স্থাপিত হয়, ইহার ময়মনসিংহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত।

ধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্রাহ্মবাদী; প্রতিমা পূজায় তাঁহাদের স্পৃহা নাই; "গুরু সত্য" বলিয়া গুরুকেই প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ স্বীকার করেন। ইঁহারা স্ত্রীত্যাগী, ধর্ম্মে তুলসী ও গোময়ের বিশেষত্ব স্বীকৃত হয় না।[৬]

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঘাসুরাবাসী জগন্মোহন নামক এক সিদ্ধপুরুষ এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।[৭] জগন্মোহনের গুরু মুরারি রামানন্দী সম্প্রদায়ী একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। জগন্মোহনের প্রচারিত মত অভিনব হইলেও কাজেই এই নূতন ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত বলিয়া প্রচারিত হয়।

জগন্মোহনের মনে যখন পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি হয়

---

৬. সম্প্রতি ইহার কতক ব্যবহার চলিত হইয়াছে।

৭. লবনীদাস কৃত জগন্মোহন ভাগবতে জগন্মোহনের জন্মস্থান চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু স্মরণাতীতকালে হইতে বাঘাসুরাতে তদ্বংশীয়ের বাস। বাঘাসুবার পূর্ব্বনাম চন্দ্রদ্বীপ ছির কি না বিচার্য্য। জগন্মোহন চরিত বর্ণনা করিয়াছে, ইহাই দৃষ্ট হয়। এস্থলে তিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অনুকরণে এইগ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপের অনুকরণে জগন্মোহনের জন্মস্থানকে চন্দ্রদ্বীপ লিখিয়াছেন। ইহার একটা কারণও ছিল। বাঘাসুবার অতি সন্নিকটে চন্দ্রপুর বা চান্দপুর নামক তৎকালপ্রসিদ্ধ পল্লীর নামেই তিনি চন্দ্রদ্বীপ নাম ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়।
আবার তিনি জগন্মোহনের পুত্র শ্যাম ও সুদামকে সরাইলবাসী বলিয়াছেন। অতএব তাহার বর্ণিত চন্দ্রদ্বীপ যদি সবাইলের মধ্যে হয়, তাহা হইলেও জগন্মোহনকে শ্রীহট্টবাসী বলা যায়। জগন্মোহনের সময় সরাইল শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল।

৮. মাছুলিয়া, বিথঙ্গল ও জলসুখা আখড়ার শিষ্য পর্য্যায়ঃ–

১. মাছুলিয়া,	২. বিথঙ্গল	৩. জলসুখা	৪. ঢাকা জিলা
জগন্মোহন গোসাই	রামকৃষ্ণ গোসাই	শান্ত গোসাই	কৃপালুমোহান্ত হইতে
|	|	|	
গোবিন্দ "	কৃপালু মোহান্ত	গোপীনাথ "	
|	|	|	
শান্ত "	চৈতন্য "	বিষ্ণু "	
|	|	|	
রামকৃষ্ণ "	নয়ানচন্দ্র "	আত্মারাম "	
|	|	|	
কৃপালু মোহান্ত	নরেন্দ্র মোহান্ত	মুক্তারাম "	
|	|	|	
মায়ারাম "	কুশাল "	নেহাল ঠাকুর	
|	|	|	
বাঞ্ছিতরাম "	রামহরি "	চরণ ঠাকুর	
|	|	|	
গোবিন্দরাম "	রাজচন্দ্র " (বর্ত্তমান)	কালিদাস বাবাজী	
|		|	
রামকৃষ্ণদাস "		রাধাচরণ দাস (শিষ্য নহে)	
|		|	
বৃন্দাবনদাস "		চন্দ্রনাথ দাস	
|			
মাণিকরামদাস মোহান্ত			

এবং তাহা প্রচার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, তখন তিনি মাছুলিয়ার বিজন বনে তপস্যায় নিরত হন। নির্জ্জন বনে বহুদিনের তপঃপ্রভাবে তাঁহার অলৌকিক শক্তি জন্মে; কথিত আছে যে ইহা শীঘ্রই দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল; সে সংবাদ শ্রবণে সুলতানশীর জনৈক দেশ-পতি তাঁহার গুণপনা (কেরামত) কতদূর, ইহা পরীক্ষার্থ হিন্দুর অস্পৃশ্য কতকটা গো মাংস, আহার্য্যরূপে তৎকাশে প্রেরণ করেন। ভেদাভেদবুদ্ধি বিরহিত সিদ্ধ মহাত্মা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আবরণ উন্মোচন করিলে দৃষ্ট হইল যে, পাত্রটিতে আতপ তণ্ডুল ও চিনি প্রভৃতি রহিয়াছে! অনুচর মুখে এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে জমিদার সাহেব স্বয়ং তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই বনভূমি সাধকে দান করিয়া যান।

এই সময়ে রাঢ়িশাল নিবাসী সাহা-বণিক বংশীয় গোবিন্দ দাস তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া এই স্থানে আগমন করেন ওতদীয় শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। গুরু শিষ্য উভয়ের লোকান্তর গমনের পর মাছুলিয়াতে উভয়ের সমাধি হয়।[৮] গোবিন্দের শিষ্য শান্ত গোসাই, ইনি জগন্মোহনের পুত্র ছিলেন। ৪র্থ ভাগে জগন্মোহন জীবনীতে ইঁহাদের প্রসঙ্গও থাকিবে। যে রামকৃষ্ণ গোসাঞি কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মমত সুপ্রচারিত হয়, যাঁর সাধন স্থলেই বিথঙ্গলের আখড়া সংস্থাপিত, তিনি শান্ত গোসাইর শিষ্য ছিলেন। ইঁহর জন্মস্থান রিচি; ৪র্থ ভাগে ইঁহার জীবন-কথাও কথিত হইবে। শান্ত গোসাইর শিষ্য গোপীনাথ জলসুখার আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা। ইনিও সাহা বণিক জাতীয় ও জলসুখা সমাজের লোক ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মোসলমান বংশ বিবরণ

পরগণা-তরফ

নরপতির সৈয়দ বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে তরফের কথা প্রসঙ্গে লস্করপুর, সুলতানশী ও পৈলের বংশ বিবরণ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নরপতি রামশ্রী, গিয়াস নগর, দাউদ নগর প্রভৃতি স্থানের যে সব কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই, এ অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগের ৫ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের বংশধরবর্গে নরপতিবাসী।[১] কুতুব সাহেবের দুই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচপুত্রের জন্ম হয়, ইঁহাদের মধ্যে শাহ তাহমস বা শাহ খোন্দকার, মুজলা খোন্দকার ও সালেহ মিয়া খোন্দকার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত। জ্যেষ্ঠ শাহ খোন্দকারের বংশধরবর্গই নরপতিবাসী।

শাহ খোন্দকারের তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে শাহ মুসা পৈলে গমন করেন। শাহ খোন্দকারের পুত্রের নাম শাহ মোহাম্মদ। ইঁহার পুত্র আটজন; তন্মধ্যে গদাহাসন ও গিয়াস খ্যাতনামা ব্যক্তি। গদাহাসনের কথা পূর্ব্বে[২] কতক কথিত হইয়াছে; ইঁহার পুত্রের নাম সরফ উদ্দীন হাসন। সরফের চারি পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম আব্দুল হাসন, সব্দর হাসন, বদরুদ্দীন হাসন, ও শাহ কবীর।

আব্দুল হাসন নিজ নামে ১নং তালুক বন্দোবস্ত করেন, ২য় ও ৩য় পুত্রের নামেও যথাক্রমে ২নং ও ৩নং তালুকের বন্দোবস্ত হয়। দ্বিতীয় পুত্র সব্দর হাসন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ শাহ কবীর সুতাং নদীর তীরে এক বাজার স্থাপন করেন, তাহাই "শাহাজীর বাজার" নামে খ্যাত হইয়াছে।

আব্দুল হাসনের দুইপুত্র ১নং তালুক তাঁহাদের উভয়ের নামে ১/২নং হিস্বাতে বিভক্ত হয়। ২নং তালুকটিও সব্দর হাসনের তনয়দ্বয় নিজেদের নামে দুইটি হিস্বায় ভাগ করেন। ১নং তালুকের একটি হিস্বার[৩] অধিকারী শাহ আজগরের পুত্র কাজি নজম উল-হাসন অতি পরোপকারী ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু এক আকস্মিক ব্যাপার। মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস দিবা অবসান হইলে যখন আকাশে দুই একটি নক্ষত্র ফুটিতে আরম্ভ হয়, তখন আকাশ পানে

১. এই বংশাবলী থ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে।

২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. নরপতির তালুক তৎসংক্রান্ত হিস্বাদির সংক্ষেপ নির্দ্দেশ যথাঃ–

১নং তাং আবুল হাসন; ইহার মধ্যে–

১ নং হিস্বা আজগর হাসন, ইহার রাজস্ব ১৭৮/১ পাই, স্থানীয় কর ১১৮৶আনা।

২নং হিস্বা আজগর হাসন, ইহার রাজস্ব ৬৫৬৫ টাকা, স্থানীয় কর ২৮২/৷আনা।

২নং তাং সবদর হাসন, ইহার মধ্যে–

১নং হিস্বা হায়দর হাসন, ইহার রাজস্ব ২০৯।৶৫ পাই, স্থানীয় কর ১৬৬ টাকা।

২নং হিস্বা জায়ফর হাসন, ইহার রাজস্ব ২৩৫৷৷৬ পাই, ১৮৮।০ আনা।

৩নং তাং বদরুদ্দীন হাসন, ইহার রাজস্ব ৭৩৩৶৷৩ পাই, স্থানীয় কর ৩৮৵আনা।

তাকাইয়া নক্ষত্রে কি একটা চিহ্ন দর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আগামী প্রাতে একটা বিষম ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবে।

পরদিন প্রাতে তাঁহাকে আর জীবিত পাওয়া গেল না। হঠাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন! ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল,—প্রাতেই এই বিষম ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। সেই সময় সুবেশধারী এক অপরিচিত ফকীর উপস্থিত হইয়া শবধৌত করিবার জন্য অনুমতি চাহিল। সে অনুমতি প্রাপ্তে শবটি সুন্দররূপে ধৌত ও আতরসিক্ত করিয়াই প্রস্থান করিয়াছিল। কাজিসাহেবের পুত্র জীবিত আছেন।

কাজি সাহেবের জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভ্রাতা সদর-উল-হাসন প্রথমে লস্করপুরের মুন্সেফী প্রাপ্ত হন। সদরুল হাসনের নামোল্লেখ পূর্ব্বাংশে[৪] করা গিয়াছে; এ বংশে তিনি এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমন হাসনকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সুলেমন হাসন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ভোগবিলাসশূন্য ছিলেন; সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন। বাড়ীতে দালান-কোঠা বিস্তর ছিল, কিন্তু স্বয়ং পর্ণকুটীরে বাস করিতেন।

রামশ্রীর সৈয়দ বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ষষ্ঠ অধ্যায়ে রামশ্রীর বিবরণ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মোতিওর রহমানের কীর্ত্তিকথা কথিত হইয়াছে; ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ তরফের প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশে সমুদ্ভূত হন। ২য় ভাগের খ পরিশিষ্টে সংযোজিত বংশ তালিকায় সৈয়দ সিরাজ উদ্দীনের নাম লিখিত হইয়াছে, মুসাফির ও ফকির নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন।

ফকিরাবাদ গ্রাম প্রতিষ্ঠাতা উক্ত সৈয়দ ফকির এই বংশের আদিপুরুষ। ফকিরের পুত্র পৌত্রাদির নাম পরিশিষ্টে লিখিত হইবে।[৫] ফকিরের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম সৈয়দ সালেহ বা সুলেমান শাহ। রঘুনন্দন পর্ব্বতের পার্শ্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের পূর্ব্বে "সুলেমান শাহের দরগা" নামক স্থানে ইঁহার কবর আছে; ইনি প্রসিদ্ধ কুতুব-উল-আউলিয়ার সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

সৈয়দ সালেহের পুত্রের নাম গৌহার, তাঁহার পুত্রের নাম সৈয়দ সিরাজ উদ্দীন (২য়), ইনি লালঠাকুর নামে খ্যাত হন। সিরাজ উদ্দীন (২য়) পরম সাধু পুরুষ ছিলেন, তিনি তরফ হইতে উচাইল চলিয়া যান, ও তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন; তিনি অলাবু (লাউ) নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রযোগে সদা পরমার্থ সঙ্গীত গান করিতেন বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে লাউয়া পীর নামে অভিহিত করিত; তাঁহার সমাধিস্থান "লাউয়া পীরের দরগা" নামে কথিত হইয়া থাকে।

এই মহাত্মার পুত্রের নাম আব্দুল রহমান, ইনি নরপতির শাহ আবুল হাসন প্রভৃতির ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন ও তথায় "আব্দুল রহমানপুর" নামক গ্রাম স্থাপন করেন; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে উহা গদাহাসন নগরের ৩০নং তালুকে পরিণত হয়। তিনি উচাইলের শঙ্করপাশা নামক স্থানে সাত হাল ভূমি ব্যাপিয়া (খানেবাড়ী সহ) এক বৃহৎ বাটিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এরূপ বৃহৎ বাটী বাণিয়াচঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বিখ্যাত মোতিওর রহমান ইঁহার পুত্র।

সেই সময়ে লস্করপুরে বাদশাহী তহশীল কাছারী ছিল, মোতিওর রহমান সেই কাছারীর কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও কাজের সুবিধার জন্য রামশ্রীতে এক বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া

৪. ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায়ে।
৫. দ পরিশিষ্টের সংযোজিত বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

উচাইল হইতে এথায় আগমন করেন। উচাইলের বাড়ীও একবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। মোতিওর রহমান হইতে রামশ্রীর সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা।[৬]

পরবর্ত্তিগণের কথা

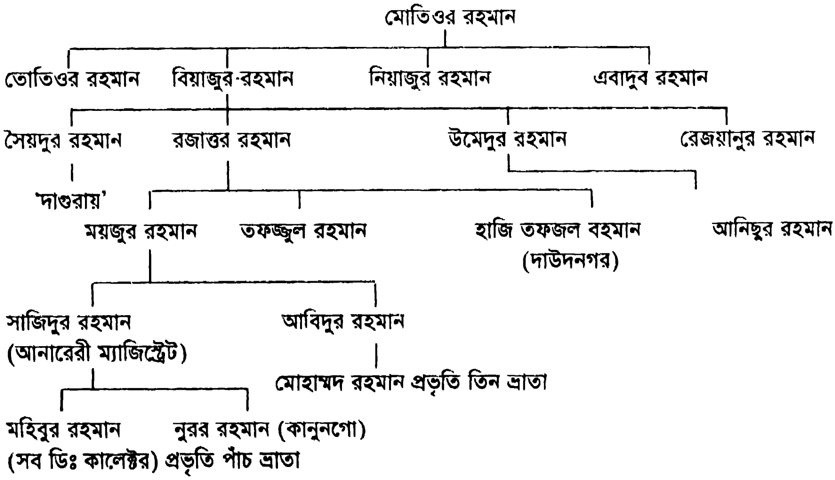
মোতিওর রহমানের পুত্র রিয়াজুর রহমান, সৈয়দ এনায়েত উল্লার কন্যা কালা বিবিকে বিবাহ করিয়া তরফের ৩নং ও ২১নং মহালের স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে রিয়াজুর রহমান ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথাক্রমে চৌধুরাই ও কানুনগোই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৭] রিয়াজুর রহমানের চারি পুত্র হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সৈয়দুর রহমান অতি ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি ধর্ম্মার্থে সর্ব্বদা উপবাস করিতেন। পিতৃ নামীয় রিয়াজ নগর পরগণায় তিনি নিজনামে সৈয়দপুর গ্রাম স্থাপন করেন। গদাহাসন নগর পরগণাও তাঁহার নামে সৈয়দপুর বলিয়া আর একটি গ্রাম স্থাপিত হয়।

রিয়াজুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র রজাওর রহমান একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন; পিতৃনামীয় রিয়াজপুর পরগণায় তিনিও নিজনামে রজাওরপুর গ্রাম স্থাপন করেন। তিনি শৈশবে কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন; তখন গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রী সভার সদস্য মহামতি মার্টিন সাহেবের সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার যত্নে তিনি নবিগঞ্জের মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া আসেন।

দেশে আগমনের পর কিছুদিন মধ্যেই লস্করপুরের গমন ধার্ম্মিক দাইম রজার কন্যাকে ও তৎপরে দাউদ নগরের শাহ ফজল উল্লার কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি উদার রচিত ও নানা গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ৮৫ বৎসর বয়সে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রজাওর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ময়জুর রহমান, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সাজিদুর রহমান সাহেব হইতে আমরা নরপতি, রামশ্রী, ফরিদপুর প্রভৃতির

৬. দ পরিশিষ্টের বংশ তালিকার (অনুক্ত) একদেশ-রামশ্রীর বংশাবলীঃ–



৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (উত্তরাংশে) পরবর্ত্তী ধ পরিশিষ্টে ইঁহাদের প্রাপ্ত সনন্দের ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইবে; চৌধুরী-কানুনগোদের ক্ষমতা ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা তাহাতে পাওয়া যাইবে।

বিবরণ এবং পাঠান বংশ, মধুপুর বংশ ইত্যাদি তরফের বহুতর সুপ্রামাণ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।[৮] (এই অধ্যায়টি প্রধানতঃ ঐ বিবরণী–সাহায্যেই লিখিত বলিয়া প্রত্যেক্ষ বিভিন্ন বংশে উক্ত প্রেরক মহোদয়ের নামোল্লেখ করা হইল না।) রজাওর রহমান দাউদ নগরে যে বিবাহ করেন, সেই স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র হাজি আফজলু রহমান মাতৃবিয়োগের পর দাউদ নগরের প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার লাভ করতঃ তথায় গমন করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুত আবদুর রহমান মূক হইলেও সদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত তাকিয়া বংশগৌরব রক্ষা করিতেছেন।

ফরিদপুরের সৈয়দ বংশ

ফরিদপুরের সৈয়দ বংশীয়গণও অতি সম্ভ্রান্ত, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগের খ পরিশিষ্টে লস্করপুরের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মুসার নাম লিখিত হইয়াছে, ইহার জ্যেষ্ঠ-বৃদ্ধ প্রপৌত্র সৈয়দ হাসন লস্করপুরের সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন; হাসনের ভ্রাতার নাম ফরিদ।[৯] ফরিদ লস্করপুরের অনতিদূরে এক বাটী প্রস্তুত করিয়া তথায় গমন করেন ও নিজ নামানুসারে সেই স্থান আখ্যাত করেন। তাঁহার বংশীয়গণ সেই স্থানবাসী। ফরিদের পৌত্র এনায়েত উল্লা তরফের ৩নং দস্তখতের অধিকারী। ৩নং তাং এনায়েত উল্লার রাজস্ব ৫৪০৷৷০ ১০ পাই ও ভূপরিমাণ ১৬০/০ হাল।

তরফদার বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগে ৫ম অধ্যায়ে তরফদার বংশের উল্লেখ করা হইয়াছে। ফরিদপুরের সৈয়দ বংশ যেমন লস্করপুরের একটি শাখা; তরফদার বংশীয়গণও তদ্রূপ সুলতানশীর একটি শাখা। সুলতানশীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মিনা ওরফে সুলতানের প্রথম পুত্র ফতা সুলতানশীর অধিকার প্রাপ্ত হন,. তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম জিক্রিয়া,[১০] তৎপুত্র আহমদ, তাঁহার পুত্র হেদায়েত উল্লা ও আতাউল্লা; হবিব উল্লাই হবিগঞ্জ বাজারের স্থাপয়িতা। হবিব উল্লা ও আতা উল্লার নামে তরফের ৭নং ও ৮নং তালুকের বন্দোবস্ত হয়। হবিব উল্লার পুত্রের নাম কুরবান উল্লা

৮। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে তরফের বিবরণে যে সামান্য ভ্রম হইয়াছে, এই প্রাপ্ত বিবরণী সাহায্যে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহাও সংশোধিত হইতে পারিবে।

৯। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড খ পরিশিষ্টে প্রকাশিত বংশ তালিকার একাংশঃ-

সৈয়দ আদম (লস্করপুর বংশ)
|
মোহাম্মদ কুদ্দস (ঐ)
|
মোহাম্মদ আলাউদ্দীন (ঐ)
- সৈয়দ হাসন (লস্করপুর)
  - মোহাম্মদ মুসিম (২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায় খ পরিশিষ্ট দেখ)
- সৈয়দ ফরিদ
  - রেহান উল্লা
    - এনায়েত উল্লা
      - কালা বিবি- (স্বামী) নিয়াজুর রহমান
  - সুলতান
    - করম মোহাম্মদ
  - মনুওর

১০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ খ পরিশিষ্টে (এই নামটি) জিক্রিয়া স্থলে ভ্রমতঃ ক্রিজ্রিয়া লিখিত হয়।

এবং আতা উল্লার পুত্র গোলাম আলী। কুরবান উল্লার ফরজন্দ আলী নামে এক পুত্র হয় এবং গোলাম আলীর পুত্রের নাম জুবের আলী, ইঁহাদের উভয়ের নামেই দুইটি হিস্বা আছে।[১১]

ফরজন্দ আলীর পুত্র আরজুমন্দ আলী, তৎপুত্র ইবনে আলী অতি সাধু ও বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন; ইহার সুযোগ্য পুত্র আবদুল সাত্তার, আবদুল জব্বার প্রভৃতি জীবিত আছেন। অন্যশাখায় জুবের আলীর পুত্র সহেবর আলী তৎপুত্র মৌলানা আওলাদ আলী অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন, ইঁহার পুত্রও একজন মৌলবী; তিনি জীবিত আছেন।

পাঠান বংশ

তরফে পাঠান বিজয়ের চিহ্ন কোন কোন স্থানে লক্ষিত হয়। মিরজা টোলা, পাঠান টোলা প্রভৃতি নামগুলি পাঠানবিজয়ের কথা সূচিত করিয়া থাকে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে খোয়াজ ওসমান খাঁর তরফ, ইটা প্রভৃতি বিজয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক জন জমিদার একতাসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইয়াছিলেন; প্রতাপগড়ের জমিদার বাজিদ তন্মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, খোয়াজের সহযোগী তরফাক্রমণকারী বাজিদের সহিত সৈয়্যদ বংশে সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। নরপতির প্রাচীন বংশ তালিকায় লিখিত আছে যে, সৈয়দ খোদাবন্দের কনিষ্ঠ পুত্র আরেজ বা জিবরাইলের[১২] পুত্র কলন্দর, বাজিদের কন্যা বিবাহ করিয়া ছিলেন; আবার ইহারই ভ্রাতা লস্করপুরের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মুসা, প্রতাপগড়ের রহমত খাঁর (?) কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

খোয়াজ ওসমান খাঁর জনৈক সেনাপতি-পুত্র ওসমান নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি তরফের পাঠান টোলাতে বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; তাঁহার পুত্রের নাম করিম খাঁ। তৎপুত্র রহিম খাঁ, তাঁহার পুত্র সাবির খাঁ, সাবিরের কবির খাঁ নামে এক পুত্র হয়; তাঁহার পুত্র সুলতান খাঁ, ইনি অতি তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন; ইনি পাঠান টোলা ত্যাগ করিয়া বালিয়ারি গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ডেঙ্গুখাঁর তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে এক পুত্রের নাম নুর মোহাম্মদ ইঁহার পুত্র মোনশী নজীব উল্লা খাঁ, তাঁহার পুত্রের নাম মোনশী আসিম উদ্দীন আহমদ। আসিম উদ্দীনের পুত্র মোনশী আবদুল সুবহান ও তদীয় পুত্র বর্ত্তমান আছেন। পাঠান বংশীয়গণের বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

পরগণা-গিয়াস নগর

সৈয়দ গদাহাসনের ভ্রাতা গিয়াসের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তরফ হইতে তাঁহার নিজ নামে গিয়াসনগর পরগণা খারিজ করিয়া নেওয়ার কথাও পূর্ব্বে[১৩] উল্লেখিত হইয়াছে। কাশিমনগর, বেজোড়া, লাখাই, তরফ প্রভৃতি পরগণা হইতে ভূমি গ্রহণপূর্ব্বক এই নূতন পরগণা সৃষ্টি করা হয়। মাধবপুরের অন্তর্গত চাড়াডাঙ্গায় গিয়াসের কবর আছে। গিয়াসের জ্যেষ্ঠপুত্র নিজামউদ্দীন মৌজপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন। গিয়াসের বংশধরগণ মৌজপুর, চাড়াডাঙ্গা এবং লাকুড়িপাড়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন।

১১. উক্ত উভয় তালুক ও তৎসংসৃষ্ট হিস্বার রাজস্বাদি এইঃ–
৭নং তাং হবিব উল্লার রাজস্ব ৬৪৭ ১০ পাই, ভূমি পরিমাণ ৯০২ একর।
১নং হিস্বা ফরজন্দ আলীর রাজস্ব ৪১৪=১০ পাই, ভূমি পরিমাণ ৫০৯ একর।
১০৫০নং তাং হইতে জুবের আলী নিজ নামে একটি হিস্বা পৃথক করেন।

১২. ইঁহার নাম শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড খ পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে।

১৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ) ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায়।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে রামশ্রীর আক্রমণ ব্যাপার উপলক্ষে শাহ লালের নাম[১৪] উল্লেখিত হইয়াছে, শাহ লাল গিয়াসের অন্যতম পৌত্র ছিলেন, ইনি উভয় পক্ষে মধ্যবর্ত্তীরূপে পরে লস্করপুর ও রামশ্রীর সেই ভীষণ বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই বংশে পুত্র সন্তান নাই।

পরগণা-দাউদনগর

দাউদ নগরের সৈয়দবংশ প্রসিদ্ধ সিরাজউদ্দীনের (১ম) বংশবৃক্ষের একটি শাখা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ২য় ভাগের খ পরিশিষ্টে সৈয়দ সিরাজউদ্দীনের পৌত্র সৈয়দ খোদাবন্দের পুত্র শাহ সরেফউদ্দীনের নাম লিখিত হইয়াছে, দাউদ নগরের সৈয়দগণ ইঁহারই বংশসম্ভূত।[১৫]

সরেফউদ্দীনের হাফেজউদ্দীন ও নাসিরউদ্দীন (২য়) নামে দুই বিখ্যাত পুত্র ছিলেন; ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ কুতুব-উল-আউলিয়ার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। হাফেজউদ্দীনের কনিষ্ঠ সহোদর নাসিরউদ্দীন (২য়) একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন; দাউদনগরে তাঁহার কবর আছে। হাফেজউদ্দীনের পুত্র নয় জন; তন্মধ্যে শাহ নুর আহমদের বংশই প্রধান। নুরের নামানুসারের তাঁহার বসতি গ্রামের নাম নুরচর আহমদ হইয়াছিল; একটি বিলের চর লইয়া ঐ গ্রামে গঠিত হয়।

নুর আহমদের প্রপৌত্রই প্রসিদ্ধ শাহ দাউদ, দাউদ হইতেই এই বংশের বিস্তৃতি ঘটে।[১৬] দাউদ পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি ছিলেন। যখন গদাহাসন নগর, গিয়াস নগর প্রভৃতি পরগণা তরফ হইতে খারিজ হইয়া পড়ে, সেই সময়ের অল্প পরেই দাউদ নিজ নামে দাউদ নগর পরগণা তরফ হইতে খারিজ করিয়া আনিয়া ছিলেন।

দাউদের উপাসনা স্থানেই দাউদনগরের দরগা হইয়াছে; ঐ দরগায় দাউদের উপসনাকালীন ব্যবহৃত চৌকী সংরক্ষিত হইতেছে। ঐ দরগার পুষ্করিণীতে বহুতর গজার মাছ সর্ব্বদাই ভাসিয়া ফিরে; ইহা শায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে অবস্থিত।

মহাত্মা দাউদের মহিবউল্লা ও হাসন আলী নামে দুই পুত্র হয়; ইঁহাদের মধ্যে দাউদনগর বিভক্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত গজার মৎস্য ইহাদেরই পোষিত বলিয়া কথিত হয়। হাসন আলীর বংশীয়গণ ঢাকা জেলা ও ময়মনসিংহের বৌলাইবাসী হইয়াছেন। দাউদ নগরের সৈয়দগণের সমাধি মুড়ারবন্দ দরগার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।[১৭]

মহিব উল্লার তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি তিন ভাগ হয়, বর্ত্তমানে তাহা বড় হিস্বা, মধ্যম হিস্বা, ও ছোট হিস্বা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

মধুপুর–বংশ (দাউদ নগর বংশের শাখা)

শাহ দাউদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হাফেজউদ্দীনের ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে আবুল মনসুর[১৮] নামে একব্যক্তি তরফের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে বাসস্থান নির্ণয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম শাহ বাজিদ; ইঁহার পৌত্র এনায়েত উল্লার নামে "এনায়েতপুর" গ্রাম স্থাপিত হয়: এনায়েত জ্যেষ্ঠ পুত্র

১৪. পরবর্ত্তী থ পরিশিষ্টে এই বংশীয় ব্যক্তিবর্গের নামাদি লিখিত হইবে।

১৫. তরফের প্রসিদ্ধ "বার আউলিয়ার" মধ্যে এক ব্যক্তির নাম শাহ সয়েফ মিন্নত উদ্দীন। সেই সয়েফ মিন্নত উদ্দীন ও এই সৈয়দ সয়েফ উদ্দীন দুই বিভিন্ন ব্যক্তি। ১৬. পরবর্ত্তী দ পরিশিষ্টে দাউদ নগরের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

১৬. পরবর্ত্তী দ্র পরিশিষ্টে দাউদ নগরের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

১৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ গ পরিশিষ্টের লিখিত ৩নং হইতে ১১নং পর্য্যন্ত এবং ২/২৩নং, ৩৪/৩৫নং প্রভৃতি সংখ্যার উল্লেখিত নামাবলী দ্রষ্টব্য।

১৮. পরবর্ত্তী দ পরিশিষ্টে এ বংশের নামাবলী লিখিত হইবে।

শাহফতের নামে ফতেপুর মৌজার নাম হয়। শাহফতের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শাহ শাদউল্লা, তৎপুত্র রহমত উল্লার, ইঁহার পুত্র ওয়াহেদ আলী ওরফে মধুমিয়া, নিজ নামে মধুপুর নামক গ্রাম স্থাপন করেন। মধুমিয়ার প্রপৌত্রগণ জীবিত আছেন।

পরগণা-নুরুল হাসন নগর

পৈলের সৈয়দ বংশে শাহ নুরি নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই "নুরুল হাসন নগর" পরগণা নিজ নামে খারিজ করেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে পৈল-বংশ বিবরণে তাহা বলা হয়। কিন্তু মতান্তরে নুরুল হাসন নামক অন্য এক ব্যক্তি আপন নামে এই নূতন পরগণা খারিজ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মতটিই অনেকের মতে বিশ্বাসযোগ্য।

পরগণা তরফের তিতারকোণা গ্রামবাসী শাহ বাদখাঁর পুত্র মুল্লা মুসা বিদ্যা ও প্রতিভাবলে সম্রাট আরঙ্গজেবের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র, তাঁহাদের নাম নুরুল হাসন, খলিলুর রহমান, ও হবিবুর রহমান। তন্মধ্য জ্যেষ্ঠ নুরুল হাসন পিতার চেষ্টায় নিজনামে একটি পৃথক পরগণা তরফ হইতে খারিজ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। উক্ত ক্ষুদ্রতম পরগণায় বর্ত্তমানে ৭৮৩/০ হাল মাত্র ভূমি আছে। ইহার অপর দুই ভ্রাতার নামে খলিলপুর ও হবিবপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

হবিবুর পুত্রের নাম গোলাম মোস্তফা, ইহার মিসির মিয়া নামে এক পুত্র হয়: মিসির অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার অন্দর মহলে একটি গভীর কূপ ছিল; মিসির ক্রোধের উত্তেজনায় সামান্য দোষে মনুষ্য হত্যা করিয়া সেই কূপে নিক্ষেপ করিতেন। এই নিষ্ঠুর কঠোর দণ্ড স্ত্রীলোকের উপরেই অধিক মাত্রায় পতিত হইত। কিন্তু তাঁহার পাপের শাস্তি অতি শীঘ্রই হইয়াছিলেন, বিবিধরোগে পীড়িত হইয়া যৌবনেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার সম্পত্তি সেই সময় ঢাকায় নীলাম হইয়া গিয়াছিল।

দৌলত পুরের চৌধুরীবর্গ আনন্দপুরের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ আনন্দ রায়ের এক বংশীয় বলিয়া কথিত আছে। কারণান্তরে তাঁহারা মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আনন্দরায়ের বংশধরবর্গ বর্ত্তমানে হবিগঞ্জের বৌলা গ্রামে বাস করিতেছেন।

পরগণা-বাণিয়াচঙ্গ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৩য় খণ্ডের উপসংহারে বাণিয়াচঙ্গের "মৌলবী বাড়ীর" প্রসঙ্গে মৌলবী ওবেদুল হোসেনের কথা বলা গিয়াছে। ওবেদুল হোসেন হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষক ছিলেন, ও তদীয় "তোষাখানা" বখ্‌শিশ পাইয়া তিনি বহু মণিমাণিক্যের অধিকারী হন ও সেই ধন রত্ন সহ দেশে আগমন করেন। ইহার পুত্রের নাম মৌলবী মাকিদুল হোসেন।

রামশ্রীর সৈয়দ বংশীয় রজাওর রহমানের প্রথমা কন্যা নাবেদা বাণুর সহিত মাকিদুল হোসেনের বিবাহ স্থির হয়। আড়ম্বরের হিসাবে এই বিবাহ একটি স্মর্ত্তব্য ঘটনা। পুত্রের বিবাহে ওবেদুল হোসেন বহু অর্থব্যয় ও মহা আড়ম্বর করিয়াছিলেন। ব্যয়ের পরিমাণ লক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে ব্যয় সংকুলান হয় নাই। কন্যা পক্ষেও ব্যয়ের মাত্রা এইরূপই ছিল এবং তাহা সংকুলানের জন্য রামশ্রীর কতক ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। যৌতুক

মধ্যে মূল্যবান বসনভূষণ পরিহিত বিংশতি ভৃত্য-দম্পতি দান করা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এ বংশের অবস্থা মধ্যযুগে হীন হইয়া, অর্থের অস্থায়ীত্বের উদাহরণ দিতেছিল। সম্প্রতি এই বাড়ীর একজন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি সবরেজিষ্টার পদে আসীন আছেন।

বাণিয়াচঙ্গের সৈয়দ বংশীয়গণ তরফের সৈয়দ বংশের একটি উপশাখা। সৈয়দ শাহ এনায়েত নামক একব্যক্তি ভ্রাতৃবর্গের সহিত বিবাদক্রমে বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান উমেদরজার[১৯] সময়ে বাণিয়াচঙ্গে আসিয়া বাস করেন। উমেদরজার পুত্র দেওয়ান আলমরজা, এনায়েত-পুত্র শাহ হোসেন উল্লাকে কতক নিষ্কর ভূমি "মদতমাস" স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। শাহ হোসেন উল্লার পুত্রের নাম শাহ মিয়াজান। ইঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই, মাসনী বিবি নাম্নী একটি কন্যা ছিল। পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত ও ময়মনসিংহে উপনিবিষ্ট মেহেদিজ্জমা নামে একব্যক্তি জলসুখা আগমন করিয়াছিলেন, তিনিই এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এনায়েতের বংশ নাই, দৌহিত্র বংশীয়েরা জলসুখায় বাস করিতেছেন ও বাণিয়াচঙ্গে মাতামহের সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাণিয়াচঙ্গেও সৈয়দবংশীয় মোসলমান আছেন

পরগণা-জলসুখা

ইতিপূর্ব্বে জলসুখার দাসবংশ-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে গঙ্গানারায়ণের অধিকৃত তত্রত্য ১নং তালুকের উল্লেখ করা হইয়াছে; জলসুখার ২নং তালুক যে বংশের অধীনে ছিল, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

২নং তালুকের অধিকারীর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে এইমাত্র জানা যায় যে, মদিনা হইতে পিতাপুত্র দুই ব্যক্তি নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ একদা হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন; সর্ব্বসাধারণে পিতা নিকড়ি আসোয়ারি এবং পুত্র দুকড়ি আসোয়ারি নামে কথিত হইতেন। জলসুখানে তৎকালে একটি নবাবি তহশীল কাছারী ছিল, দুকড়ি আসোয়ারির পুত্র পীর মোহাম্মদ মুর্শিদাবাদ হইতে উক্ত কাছারীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

জলসুখার তদানীন্তন অধিকারী গঙ্গানারায়ণ একদা রাজস্ব বাকীর দায়ে পড়িয়াছিলেন। যে সমস্ত ভূম্যধিকারী অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের জন্য ধৃত হইতেন, তাঁহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইত; নবাবের পক্ষে, কাছারীর কর্ম্মচারী পীর মোহাম্মদ, গঙ্গানারায়ণকে ধৃত করেন ও তাঁহাকে নবাবসদনে প্রেরণ করিতে উদ্যোগ করেন।

গঙ্গানারায়ণ উপায়ান্তর রহিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পীর মোহাম্মদকে দিতে চাহিলেন; পীর মোহাম্মদ অনেকটা নম্র ভাব ধারণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িলেন না; তখন অগত্যা গঙ্গানারায়ণ নিজ তালুক হইতে তাঁহাকে চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। পীর মোহাম্মদ বহু মূল্য সম্পত্তিপ্রাপ্তির লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

গঙ্গানারায়ণ বিমুক্ত হইয়া স্বীয় অঙ্গীকার পালনে ক্রটী করিলেন না। পীর মোহাম্মদের প্রাপ্ত সম্পত্তি পরে "২নং তাং পীর মোহাম্মদ নামে খ্যাত হইল।"[২০] এই বংশে পীর মোহাম্মদের পরেও অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর ভীষণ বিসূচিকা ব্যাধিতে বংশ বিলোপের উপক্রম হয়। তাহার পর হইতেই ইঁহারা দীন দশায় পতিত হইয়াছেন; এক্ষণে ক্ষয়াবিশিষ্ট সম্পত্তির আয় অতি সামান্যই রহিয়াছে।

---

১৯. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান বংশকথা বিবৃত হইয়াছে।

২০. পীর মোহাম্মদের ক্ষুদ্র বংশ তালিকা এইঃ-

পরগণা-দিনারপুর

হজরত শাহজলালের অনুষঙ্গী তাজউদ্দীনের কনিষ্ঠ সহোদর চৌকি পরগণাবাসী হইয়াছিলেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে (৩য় খণ্ডে) বলা গিয়াছে। তদ্বংশীয় কোন এক মহাত্মা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে একদা দিনারপুরের জঙ্গলে শিকারোপলক্ষে গমন করেন; ইঁহার নাম গুলবর খাঁ। যখন গুলবর খাঁ দিনারপুরের বিস্তৃত বনে প্রবিষ্ট হন, দৈবযোগে তখন প্রবল ঝড় উপস্থিত হয়, উপায়ান্তর বিরহিত হইয়া তিনি সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হন। হরিহর অগ্নিহোত্রী সেই গ্রামে বাস করিতেন। একটি গৃহে তাঁহার ভাগীরথী নাম্নী কিশোরী কন্যা অবস্থিতি করিতেছিলেন, গুলবর খাঁ ঝড়ের তাড়নায় হঠাৎ সেই গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কন্যাটি সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এককোণে বসিয়া রহিলেন; প্রবল ঝড় নিবন্ধন বাহির হইয়া চলিয়া যাইতে পারিলেন না। ঝড় থামিলে এই সংবাদ যখন ভাগীরথীর পিতা অবগত হইলেন, যখন জানিলেন যে ঝড়ের জন্য কন্যা অন্যত্র না গিয়া যবনের এক গৃহেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ করিলেন ও সেই কন্যাকে আর গ্রহণ না করিয়া গুলবরের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

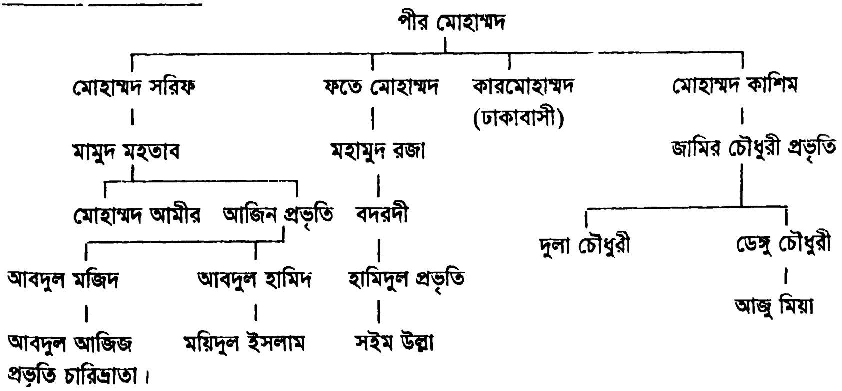
এই কন্যার গর্ভে গুলবরের এক পুত্র জন্মে; বাগ্‌চি বংশের বহু সম্পত্তি ঐ পুত্রের বংশধরের হস্তগত হয়। পরবর্ত্তীকালে গুলবরের বংশে দেওয়ান মজলিশ বাহাদুর বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহার বিরাট ভবন ও বিশাল দীর্ঘিকা বিজন বনের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান আছে। মজলিম বাহাদুরের ১২টী পুত্র হইয়াছিল, দিনারপুরের জমিদার বংশীয় গাজি ও চৌধুরী আখ্যাধারী ব্যক্তিবর্গ সেই ১২ পুত্রের কাহার কাহারও বংশধর।

পরবর্ত্তী দানে তত্রত্য দেওয়ান হয়দর গাজি বিদ্যায় মোহাম্মদ নাতির চৌধুরী ও শাচয়ীরিক সামর্থে পীর মোহাম্মদ চৌধুরী বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা আজও লোকে বলিয়া থাকে। এসব বংশও তদঞ্চলে সম্ভ্রান্ত ও মোসলমান সমাজে সম্মাননীয়।

পরগণা-কাশিম নগর

বঙ্গদেশ যখন পাঠানদের অধিকারে ছিল, তৎকালে ত্রিপুরা-রাজ্য সময় সময়ে পাঠান সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইত; ত্রিপুরার ইতিহাসে সে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক সময় দাউদ খাঁ ও কাশিম খাঁ নামক দুইজন পাঠান সেনানায়ক এ দেশের প্রাকৃতিক শ্যামল শোভায় বিমোহিত ও ভূমির উর্ব্বরতা দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া এদেশেই বাস করেন। তাঁহারা



নবাব হইতে পুরস্কার স্বরূপ এতদ্দেশে যে ভূমি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের নামে তাহা খ্যাত হয়। দাউদ খাঁর বাসভূমি দাউদপুর নাম প্রাপ্ত হয়। (পরগণা দাউদপুর, জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত) সেনা-নায়ক কাশিম খাঁ যে স্থানবাসী হইয়াছিলেন, উহা দিনা দহ কথিত হইত, খাঁ নিজ নামে উহাকে কাশিম নগর নামে খ্যাত করেন। পরগণা কাশিম নগর শ্রীহট্টের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী ও ত্রিপুরার সীমাসংলগ্ন। কাশিম নগর পরগণা পাঁচ মাইল মাত্র দীর্ঘ। কাশিম নগরের চৌধুরীবর্গ একসময় প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সেই বংশে মোহাম্মদ নাজির চৌধুরী ও মোহাম্মদ হামজা চৌধুরীর এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, ইঁহারা স্বীয় অধিকারে জনৈক অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া একটি তেঁতুল বৃক্ষের শাখায় ফাঁসী দিয়াছিলেন।

তরফ-লস্করপুরের অধিকারী সৈয়দ হাসনের ভ্রাতা ফরিদ হাসনের নাম ফরিদপুরের বংশ প্রসঙ্গে বলা গিয়াছে। উক্ত ফরিদ হাসনের তৃতীয় পুত্র সৈয়দ শাহ্ মনুওর হইতে একশাখা বাহির হইয়া কাশিম নগর পরগণার কাশিমপুর বাস করিতেছেন। ঐ বংশে কিছুকাল পূর্ব্বে সৈয়দ আমীর আলী নামে এক প্রসিদ্ধ হেকিম (ইউনানী চিকিৎসক) ছিলেন; তাঁহার এক মাত্র পুত্রও ঐ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

সমাপ্তি

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাগের ৪র্থ খণ্ড এই স্থলেই সমাপ্ত হইল। এই খণ্ডে প্রথমেই মহকুমা, তত্রত্য বাজার ও প্রাচীন নগর জয়পুরের প্রাধান্য; এবং বাৎস্য, কৃষ্ণাত্রেয়, ভরদ্বাজ ও গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বিবরণ বর্ণনা করা গিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাণিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশের বিষয় উল্লেখ করিয়া, তত্রত্য কাশ্যপ ও গৌতম গোত্রীয়গণের কাহিনী বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে জলসুখা, আগনা, রঘুনন্দন, বেজোড়া, জনতরি, দিনারপুর প্রভৃতি স্থানের বিবিধ ব্রাহ্মণবংশের কথা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; তাহাতেই ব্রাহ্মণবিভাগ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ বিভাগে ৪র্থ অধ্যায় আরম্ভ; এ অধ্যায়ে তরফের তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর ও সুঘর প্রভৃতি স্থানের মজুমদার প্রভৃতিও সাতকাপনের করদের কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে লাখাই, রিচি, ও মুকাড়কড়ির দত্ত বংশ, বেজোড়ার নন্দী ও চন্দ বংশ, দেব বংশ এবং বাণিয়াচঙ্গের সোম ও দত্ত বংশের কথা এবং বামৈর বর্ম্মণ বিবরণাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে জলসুখার বসুবংশের উল্লেখ মাত্র করা গিয়াছে, তাহার পর দাস বংশের এবং তত্রত্য রায়দের কীর্ত্তিকথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার পর মাছুলিয়ার চৌধুরী বংশের উল্লেখপূর্ব্বক গোপায়ার পাল বংশের কথা ও জগন্মোহিনী সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপর সপ্তম অধ্যায়ে মোসলমান বংশ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তরফের নরপতি, রামশ্রী প্রভৃতি স্থানের যে যে বংশ কথা ২য় ভাগে (পূর্ব্বাংশে) বিস্তারিত রূপে কথিত হইতে পারে নাই, এ অধ্যায়ে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দাউদ নগর, গিয়াস নগর, নুরুলহাসন নগর প্রভৃতি স্থানের জমিদারবর্গের বিবরণ কথিত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়েই তাহার পর জলসুখা, দিনারপুর, কাশিম নগর প্রভৃতি স্থানের বংশ বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়েই এই খণ্ড সমাপ্ত। বলা বাহুল্য যে আমরা যে যে বংশের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এ খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক সুখ্যাত বংশ এই সবডিভিশনে রহিয়াছে এবং আমরা এই খণ্ডে এই সকল বংশ কথা সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই; সেই অপ্রাপ্ত বংশকাহিনী সমূহের তুলনায় যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে অল্প সংখ্যক, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

পঞ্চম খণ্ড

সুনামগঞ্জ

ব্রাহ্মণ বিভাগ

প্রথম অধ্যায়
ব্রাহ্মণ বংশ বৃত্তান্ত

নামতত্ত্ব

সুনামগঞ্জ সবডিভিশন উত্তর শ্রীহট্টের ঠিক পশ্চিমে ও হবিগঞ্জ সবডিভিশনের উত্তরে অবস্থিত; ইহার উত্তরে জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা। সুনামগঞ্জ সবডিভিশনে জলাভূমি ও বিস্তৃত হাওরের বাহুল্য লক্ষিত হয়। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মৎস ধৃত ও হয় ও তাহা শুষ্ক করিয়া ব্যবসায়িগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। সুনামগঞ্জ হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত রপ্তানি হইয়া থাকে। সুনামগঞ্জ বাজারের নামটি এইরূপ জনৈক ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় বলিয়া শুনা যায়। এই বাজারের নামানুসারেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলায় সুনামগঞ্জ সাবডিভিশন স্থাপিত হয়। সুনামগঞ্জে প্রায় ৩২টি পরগণা আছে, তন্মধ্যে আতুয়াজান, জাতুয়া, বাণিয়াচঙ্গ (জোয়ার) প্রভৃতিই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, এবং এ গুলির নামও কোন কোন ব্যবসায়ী সংসৃষ্ট।

কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে এই জলময় স্থানে আতুয়া, জাতুয়া ও পাগল নামে চঙ্গ জাতীয় তিন ব্যক্তি মৎস্য শিকারের জন্য আসিয়া, মৎসের প্রাচুর্য্য দৃষ্টে এই স্থানেই বাস করে; সেই বিরল-বসতি স্থানে ইহারা মৎস্য ধৃত করার জন্য পরস্পরে এক এক সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিল; একের চিহ্নিত সীমার ভিতরে অন্যে মৎস্য ধৃত করিত না। এই স্থান গুলিই পরে তাহাদের নামে খ্যাত হয় ও পশ্চাৎ এক একটি পরগণায় পরিণত হয়। এই জনশ্রুতির মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে বলা যায় না।

আতুয়াজান পরগণার জগন্নাথপুর একটি প্রাচীন স্থান। যখন লাউড়রাজ্যের সিংহাসনে রাজা বিজয় সিংহ অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় হইতেই এই স্থানে রাঢ়অঞ্চল হইতে ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় ব্রাহ্মণবর্গের আগমন ঘটে। জগন্নাথ বিপ্রের নামানুসারে জগন্নাথপুরের নাম হয়, ইহা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে যথাস্থানে বলা গিয়াছে।

শিক সোণাইতার ভট্টাচার্য্য বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ২য় অধ্যায়ে আমরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় রাঘব ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। রাঘব ভট্টাচার্য্যের বংশোদ্ভব শ্রীযুত রাম কিশোর চৌধুরী ও শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চৌধুরী আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে রাঘব ভট্টাচার্য্য রাঢ় দেশ হইতে এদেশে আসেন; তিনি আগমন করিলে তদীয় গুণ গ্রামে মুগ্ধ হইয়া রাজা বিজয় সিংহ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করেন ও প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া জগন্নাথপুরের সংলগ্ন রায়পুর নামক স্থান তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়া তিনি শ্রীহট্টে বৈদিক বিপ্রবর্গের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করেন। তাহার পর কিছু দিনের জন্য তিনি কাশীধামে গমন করিয়া ছিলেন। কাশীতে অবস্থিতি কালে রাঢ়ীয় সম্প্রদায়ের রাঘব বেদোদ্ধার করিয়া সামবেদের স্থলে যজুর্ব্বেদীয় বলিয়া গণ্য হন। শ্রীহট্টের বৈদিক ব্রাহ্মণবর্গের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্যেই তিনি ইহা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য "বেদোদ্ধারী রাঘব" নামে খ্যাত হন।

রাঘবের দেহত্যাগ

রাঘব বা রাঘবানন্দের বেদান্তরত্ন উপাধি ছিল। তাঁহার পুত্র তিনজন; ইহাদের নাম বিষ্ণুদাস, রামনাথ ও বংশীবদন। ইঁহারা যখন শিশু, সেই সময় বাণিয়াচঙ্গাধিপতি গোবিন্দ বা হবিবখাঁর সহিত বিজয় সিংহের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং হবিবখাঁ কর্ত্তৃক বিজয় নিহত হন। এ বৃত্তান্তও পূর্ব্বাংশে বর্ণিত হইয়াছে। বিজয় সিংহ যে গুপ্ত ঘাতকের করে নিহত হন, তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"তোমার প্রভুকে আমার একটি অনুরোধ জানাইও, সে অনুরোধটি এই যে, আমার গুরুদেবকে তিনি যেন আমার সম্পত্তির কিয়দংশ প্রদান করেন।" ঘাতক স্বীকার করিল এবং কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক রাজগুরুকেও নিহত করার জন্য ধাবিত হইল।

রাঘবের নিকট যখন সে উপস্থিত হইল, তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া রাঘব তখন নিজ ইষ্টমন্ত্র জপের জন্য একটু সময় চহিলেন। ঘাতক স্বীকৃত হইল ও অস্ত্র হস্তে পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া রইল। রাঘব বদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাসা দৃষ্টি সহকারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া সমাধিযোগে তনুত্যাগ করিলেন; ঘাতকের অস্ত্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না। ঘাতক তথা হইতে আগমন করিয়া, রাজার অন্তিম অনুরোধ ও রাঘবের দেহত্যাগের কথা হবিবখাঁর গোচর করিল।

কিসমত আতুয়াজান ও শিক সোনাইতার নামকরণ

পিতৃহত্যার সংবাদ প্রাপ্তমাত্র রাজকুমারগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বর্গ রাজবাড়ী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহা পাঠক পূর্ব্বাংশে পাঠ করিয়াছেন। যখন রাঘবেরও মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন রাঘবের ভৃত্য সাচারাম দাস রাঘবের পত্নী ও পুত্রত্রয় সহ পলায়ন করিয়া রায়পুরের উত্তরে এক বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, ও পরে তথা হইতে তাঁহাদের মাতুলালয় পঞ্চখণ্ডে চলিয়া যায়।

এদিকে হবিব খাঁ, বিজয়ের অধিকৃত আতুয়াজান পরগণার দশপণ অংশ নিজ কর্ম্মচারী পালি গ্রামের চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে রাখিলেন; (সেই দশপণ অংশই কিসম আতুয়াজান নামে খ্যাত হয়), এবং বাকি ছয়পণের শিকি বা চতুর্থাংশ বিজয়সিংহের অন্তিম অনুরোধ অনুসারে, রাঘবের পুত্রত্রয়কে দিবার অভিপ্রায়ে ঘোষণা প্রচার করিলেন। রাঘবের পুত্রত্রয় তখন মাতুলালয়ে; এ সংবাদ তাঁহারা পাইলেন না।

রাঘবের পুত্রত্রয় এই সম্পত্তি গ্রহণের জন্য উপস্থিত না হওয়ায়, কৃষ্ণানন্দ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে রাঘবের ভ্রাতৃ-পরিচয়ে উক্ত শিকি অংশ (চতুর্থাংশ) গ্রহণ করিলেন; উহাই শিকি বা শিক সোণাইতা পরগণায় পরিণত হয়।

সাচারামের কার্য্য ও সাচায়নি গ্রাম

প্রভুভক্তি পরায়ণ সাচারাম দেশের অবস্থা অবগত হইবার জন্য পঞ্চখণ্ড হইতে এক সময় তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল যে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণানন্দ নামক এক ব্যক্তি চাতুর্য্যবলে প্রভুর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া নিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে সাচারাম পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাঘবের পুত্রত্রয়কে দেশে আনিতে সচেষ্ট হইলে, রামনাথ ও বংশীবদন যাইতে অস্বীকৃত হইলেন;[১] বিষ্ণু দাস সাচারামের সহিত দেশে আসিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বনিবাস রায়পুরে না গিয়া যে বনে প্রথমে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই জঙ্গল কাটিয়া বাড়ী প্রস্তুতপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুদাস পিতৃ-ভৃত্যের সৎপরামর্শ ও প্রভুপরায়ণতায় এতাদৃশ

১. রামনাথের বংশধরগণ পঞ্চখণ্ড নয়াগ্রামে বাস করিতেছেন। ইহার একশাখা তথা হইতে ইন্দেশ্বর গিয়াছেন। বংশীবদন পরে পঞ্চখণ্ড হইতে বোয়ালজুরে গমন করেন, তদ্বংশীয়গণ তথায় আছেন।

বিমোহিত হইলেন যে সাচারাম যে তাঁহাকে সেস্থানে আনিয়াছে, এইকথাটা স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি সেই নুতন স্থানকে সাচায়নি বলিয়া পরিচিত করিলেন।

সুচতুর কৃষ্ণানন্দ এই সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বনিবাস নন্দিগ্রাম ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিলেন ও বিষ্ণুদাসকে ভ্রাতুস্পুত্র বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিলেন।

সাচারাম পুনঃপুনঃ বিষ্ণুদাসকে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য উত্তেজিত করিতে থাকিলেও, তিনি মোকদ্দমা করিয়া কৃষ্ণানন্দের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা সেই নব বসতি স্থানটিতে নিরুদ্বেগে বসিয়া জীবন কর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ করিলেন।

যাহার যাহা প্রাপ্য, এক সময় না এক সময়, সে না পাইলে তাঁহার বংশের পরবর্ত্তী কেহও তাহা ভোগ করিয়া থাকে; অনেক সময় ইহা দেখা যায়। বিষ্ণুদাস কৃষ্ণানন্দের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হইলেও, তাঁহার পুত্রগণ সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রতিনাথের সম্পত্তি উদ্ধার

বিষ্ণুদাসের ছয়পুত্র; তন্মধ্যে রতিনাথ অতি মেধাবী ছিলেন। একদা বাড়ীর পার্শ্বে বালকবর্গ খেলা করিতেছিল, সেই পথে একটি প্রজা পাকা কলা লইয়া কৃষ্ণানন্দকে উপহার দিতে যাইতেছিল, বালস্বভাববশতঃ রতিনাথ সেই ব্যক্তিকে, কয়েকটি কলা দিয়া যাইতে বলিলে সে উত্তর দিল "এই কলা তোমারই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তোমার পিতা সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন; কৃষ্ণানন্দই এখন আমাদের মিরাশদার। তোমার প্রাপ্য পরে কাড়িয়া নিয়াছে, আমরা কি করিব?"

এই কথাগুলি বালকের মর্ম্মে প্রবেশ করিল ও তখনই তিনি সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। রতিনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তিনি কখনও সেই কথাটি ভুলিয়া রহিলেন না; সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নগর্বকে সঙ্গে লইয়া ও কয়েকজন অনুচর সহ বহুকষ্টে বঙ্গ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং অনেক চেষ্টায় আপনাদের অবস্থা নবাবের গোচর করিলেন। নবাব যুবকের বুদ্ধি ও সাহস দর্শনে প্রীত হইয়া শিক সোণাইতার প্রকৃত মালিক বলিয়া তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিলেন। রতিনাথ চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং রত্নগর্ভ পুরকায়স্থ পদবি লাভ করিলেন। ইঁহারা পরে দেশে আসিয়া সনন্দের বলে স্বীয় সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করেন।[২]

এই সময়ে রতিনাথ, শিউড়ী উপাধিবিশিষ্ট কোন ব্রাহ্মণকে নিজ কর্ম্মচারী নিযুক্তি করেন; এবং রাজপুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিতের বংশধর যাদব চক্রবর্ত্তীকে স্বীয় পৌরহিত্যে বরণ করিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্ববাস রতিয়ার পাড়া হইতে সাচায়ানিতে স্থাপন করেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি আরও কয়েক বংশীয় ব্রাহ্মণকে ভূদানাদি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

একদা রতিনাথ শ্রীহট্ট শহর হইতে বাড়ীতে আসিতে পথে রৌদ্র পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে জনৈক ঘোষ তাঁহাকে একভাণ্ড উত্তম দধি প্রদান করে, তিনি সেই দধি ভক্ষণে এত তুষ্টিলাভ করেন যে ঘোষকে সেই ক্ষেত্রটি তৎক্ষণাৎ দান করেন। ঘোষ চমকিত হইয়া রহিল। দধির "টুপী" বা পাত্রই তাহার সৌভাগ্য সূচক হইল, এই জন্য সে সেই স্থানটি "দধিটুপী" নামে আখ্যাত করে।

পরবর্ত্তী কথা

রতিনাথের পুত্রের নাম শ্রীরাম। একদা এক মোসলমান রাজকর্ম্মচারী গ্রামে আসিয়া নানা উৎপাত উপস্থিত করেন। শ্রীরাম ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই কর্ম্মচারীর নৌকা টানিয়া

২. পরবর্ত্তী ন পরিশিষ্টে ইঁহাদের বংশাবলী লিখিত হইবে।

ডাঙ্গায় উঠাইয়া ফেলেন। কর্ম্মচারীটি শ্রীরামের এই দুঃসাহস ও বীরত্বে অতিশয় সন্তুষ্ট হন; ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার জন্য তৎপ্রতি তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই।

শ্রীরামের তিন পুত্র, ইহারা দশসনা বন্দোবস্তের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিনোদরায় অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, তিনি পিতামহ ও পিতার নামে ১নং ও ২নং তালুকের বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া, ৩নং তালুকটি নিজের নামে বন্দোবস্ত লন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামগোপাল তখন অতি শিশু ছিলেন; এই শিশুর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইত, বিনোদ এই শিশুকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, ৪নং তালুকটি ইহারই নামে তিনি বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন; কিন্তু শিশুটি পিতা, জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লতাত প্রভৃতিকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অচিরেই চিরতরে চলিয়া যায়। ৪নং তালুকটি সেই শিশুর নাম চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

হালাবাদি বন্দোবস্তের সময়েও এ বংশীয় অনেক ব্যক্তি নিজ নামে তালুক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রতি বল্লভের পুত্র রামকৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ও দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গুণে বহুলোক আকৃষ্ট হয় ও তদীয় শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তাঁহার পুত্রগণ "গোস্বামী" খ্যাতি ধারণ করিয়াছিলেন। রাঘবানন্দের বংশে তারানাথ, সর্ব্বানন্দ, বিশ্বম্ভর প্রভৃতি আধুনিক অনেক ব্যক্তিই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; "গোবিন্দ কীর্ত্তন", "সংকীর্ত্তন", "শিবের আরতি" ও "মালসী গীত" প্রভৃতি তাঁহাদের রচিত অনেক সঙ্গীত আছে।

পূর্ব্বে যে সাচারামের উল্লেখ করা হইয়াছে, দাস জাতীয় সেই সাচারামের বংশধরবর্গও অদ্যাপি উক্ত গ্রামবাসী।

আচার্য্য বংশ

শিক সোণাইতাবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় আচার্য্য বংশের কথা এস্থলে আলোচ্য। এ বংশেরও আদিস্থান রাঢ় দেশ। আচার্য্য বংশীয় শ্রীযুত রামদুলাল আচার্য্যের উদ্যোগে আমরা যে বংশ তালিকা ও বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে,–জীবনকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তি কামরূপ গমন করিয়াছিলেন; সেই স্থানে বাৎস্য গোত্রীয় নটবর নামে কে দ্বিজতনয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ও প্রণয় জন্মে। কামরূপ হইতে উভয়ে একত্র প্রত্যাগমন কালে নটবরের অনুরোধে জীবনকৃষ্ণ নটবরের বাড়ীতে (জগন্নাথপুরে) আগমন করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই স্থানে কিছু দিন বাস করিলে, নটবরের বিবাহ-যোগ্যা সুন্দরী ভগিনীকে তিনি বিবাহ করেন; ও পার্শ্ববর্ত্তী রায়পুর গ্রামে গিয়া বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সস্ত্রীক বাস করেন। পূর্ব্বোক্ত বংশ তালিকা ও বিবরণী অনুসারে জীবনকৃষ্ণের লোকনাথ ও রঘুনাথ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে রঘু নাথের (দুই পুত্র[৩] এবং) এক কন্যা জন্মে। এই কন্যাকে রাজা বিজয় সিংহের পিতা রাজসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। শিক সোণাইতার আচার্য্য বংশীয়গণ[৪] লোকনাথের পুত্র কৃষ্ণদাস আচার্য্যরত্নের সন্তান। ইহারা শিবপুর (প্রকাশিত সাচায়ানী গ্রাম বাসী)।

৩. আচার্য্য বংশ তালিকা মতে ইহাদের নাম কৃষ্ণানন্দ ও রাঘবানন্দ (রাঘব ভট্টাচার্য্য) ; পাঠক ইতিপূর্ব্বে রাজগুরু রাঘবের বংশবিবরণে পাঠ করিয়াছেন যে তিনি রাঢ়দেশ হইতে আগমন করেন, রাঘবের বর্ত্তমান বংশীয়গণ ইহাই জানেন। তাঁহাদের মতে রাঘবের সহিত কৃষ্ণানন্দের সম্পৃক্ত সংস্থাপন স্বার্থপরতা মূলক সুতরাং কৃত্রিম। তবে আমাদের প্রাপ্ত আচার্য্য বংশ তালিকাতে যখন কৃষ্ণানন্দের রাঘবানন্দেব রাঘবানন্দ নামে এক ভ্রাতা থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন বলিতে হইবে যে কৃষ্ণানন্দের রাঘব নামে প্রকৃতই এক ভ্রাতা ছিলেন এবং তাহাতেই তিনি রাঘবের ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু এই রাঘব ও বিষ্ণু দাসাদির পিতা রাজগুরু রাঘব ভিন্ন ব্যক্তি। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত আখ্যানোক্ত কৃষ্ণান্দ ও আচার্য্য বংশীয় এই কৃষ্ণানন্দ বিভিন্ন ব্যক্তি কি না, তাহাও বিবেচ্য।

৪. পরবর্ত্তী পরিশিষ্টে আচার্য্যবংশ তালিকা প্রদত্ত হইবে।

কৃষ্ণ দাস, রাজ সিংহ হইতে আচার্য্যরত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তদীয় পুত্র রাজা বিজয় সিংহের আচায্য পদে বরিত হইয়াছিলেন। এই আচার্য্যরত্নের সম্বন্ধেও বেদ উদ্ধারপূর্ব্বক বেদ পরিবর্ত্তনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে রাঘবানন্দ ও এই কৃষ্ণদাস, উভয়ে একত্রে বেদোদ্ধার করিয়া বেদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আচার্য্যরত্নের পুত্রের নাম রামদাস, ইনি রাজগুরু রাঘবানন্দের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামদাসের দুই পুত্র–হরিদাস ও গোপাল। তন্মধ্যে হরিদাসের তিন পুত্র ও গোপালের দুই পুত্র হয়; ইহাদের নামে দশসনা বন্দোবস্তীয় তালুক আছে। গোপালের ষষ্ঠ পুরুষে রাম শঙ্করের উদ্ভব হয়, ইনি তদঞ্চলে সর্ব্ব প্রকারে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, গ্রাম্য বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁহাকে শিবিকারোহণে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইত। সর্ব্বপ্রথমে এ দেশে তিনি কম্পাসযন্ত্রযোগে জরিপ প্রণালী শিক্ষা করিয়া, তদঞ্চলের বহু ব্যক্তিকে জরিপ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

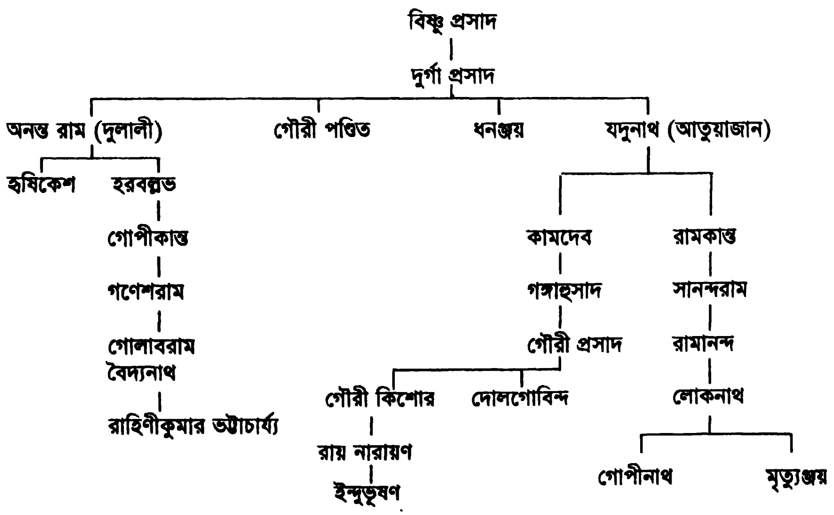
রাজ পুরোহিত বংশ

রাজা বিজয় সিংহের পুরোহিত বাৎস্য গোত্রীয় নারায়ণ পণ্ডিত এক অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ফরিদপুরের কোটালিপাড়াস্থিত কাঞ্জিলালপল্লী হইতে তিনি এদেশে আগমন করেন। তাঁহার বংশধরবর্গ আতুয়াজানের রতিয়ার পাড়া গ্রামে অদ্যাপি সসম্মানে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের উপাধি মহলানবীশ, চক্রবর্ত্তী এবং গোস্বামী। শ্রীহট্ট যখন নবাব এক্রাম উল্লাখাঁ বাহাদুরের শাসনাধীন ছিল, তখন এই বংশে জয়কৃষ্ণ মহলানবীশ নামে একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বিদ্যান ছিলেন।[৬] জলুসের লিখিত এক সনন্দে (নং ১৫৪০) উক্ত নবাব তাঁহাকে ৩/০ হাল পরিমিত খানেবাড়ী দান করিয়াছিলেন; ১১৯০ সালে জয়কৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ

আতুয়াজানের কাঁঠাল কাইড় গ্রামে সামবেদীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বাস। কাশ্যপগোত্রীয় এই ব্রাহ্মণ বংশের আদিপুরুষ বিষ্ণুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য[৫] দক্ষিণ রাঢ় হইতে শ্রীহট্টের দুলালীতে

৫. বিষ্ণু প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের বংশাবলী এইঃ–



আগমন করেন ও তত্রত্য দাসপাড়াবাসী আচার্য্য পদবি বিশিষ্ট শাণ্ডিল্য গোত্রজ জনৈক ব্রাহ্মণের একটি লাবণ্যবতী কন্যার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই স্থানবাসী হন, ইঁহার পুত্রের নাম দুর্গাপ্রসাদ; দুর্গাপ্রসাদের চারি পুত্র হয়, তন্মধ্যে অনন্তরাম ও যদুনাথ বংশপ্রবর্ত্তক ছিলেন। যদুনাথ আতুয়াজান পরগণার কাঁঠালকাইড় গ্রামে কতক ভূমি ক্রয় করিয়া আপন স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় সহ তথায় আগমন করেন। তদবধি যদুনাথের বংশীয়গণ সেই স্থানবাসী। তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ পূর্ব্বস্থানবাসী। সেই বংশজাত শ্রীযুত রোহিনীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পরগণা-হাউলি সোণাইতা

গর্গ গোত্রীয় নীলাম্বর ভট্টাচার্য্য রাঢ়দেশ হইতে হাউলি সোণাইতা পরগণার অন্তর্গত একটি স্থানে আসিয়া বাস করেন; তাঁহার বসতি জন্য উক্ত স্থান "রাঢ়ীগাও" নামে খ্যাত হয়। কিছুকাল তথায় বাস করার পর তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী ঝুলিয়া নামক বিলের ধারে একটি নূতন বাড়ী প্রস্তুত ক্রমে তথায় চলিয়া যান। ক্রমে সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পত্তন হয় ও উক্ত ব্রাহ্মণের বসতি জন্য সেই নূতন গ্রাম "ব্রাহ্মণ ঝুলিয়া" নাম প্রাপ্ত হয়।

নীলাম্বরের শ্রীপতি ও ভীম নামে দুই পুত্র ছিলেন। শ্রীপতির বংশধর মহেশ ভট্টাচার্য্য দশসনা বন্দোবস্তের সময় বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রাপ্ত ভূমি নিজ নামে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন এবং চৌধুরাই প্রাপ্ত হন। তিনি অতি দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন, কুরুয়ার জনৈক নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারকে তিনি নিজগৃহে আশ্রয় দান করেন ও বিবাহ দিয়া ভরণ পোষণের জন্য কতক ভূমি ও ভিন্ন বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন; ইঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি তথায় আছেন। জগদীশ ও রামরুদ্র নামে তাঁহার দুই প্রপৌত্র ছিলেন; তন্মধ্যে রামভদ্রের কিশোর নারায়ণ, রায়কৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ নামে তিন প্রপৌত্র ছিলেন; জ্যেষ্ঠ কিশোর নারায়ণের পুত্র গোপালকৃষ্ণ, ইঁহার পুত্র শ্রীযুত গোকুল চৌধুরী স্ববংশের একটি বিবরণ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

নীলাম্বরের দ্বিতীয় পুত্র ভীমের বংশধর মধুসূদন বাচস্পতি অতি সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীহট্টের নবাব আবুল হাসন খাঁ বাহাদুর এক সনন্দে (নং ৩৯৬) কৌড়িয়া হইতে তাঁহাকে পৌণে দশহাল ও হাউলি সোণাইতা হইতে পাঁচ হাল মোট ১৪৸৶৬৷ ভূমি মদতমাস স্বরূপ প্রদান করেন। ১১৮০ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উক্ত ভূমি তাঁহার পুত্র ভবানীপ্রসাদ ও কালিকা প্রসাদ "তছরূপ" করেন।

সতী প্রভাবতী

মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী পতির মৃত্যুর পর "সহমরণ" গমন করিতে ইচ্ছা করেন। পুত্রগণের ক্রন্দন ও প্রতিবেশিগণের নিষেধ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই; তখন উভয়ের জন্য চিতা প্রস্তুত হয়, বহুলোক এই "সহমরণ" দর্শনে আগমন করিয়াছিল, প্রভাবতী মৃতপতির পদধূলি লইয়া হাসিতে হাসিতে চিতারোহণ করিলে, সতীর জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়াছিল।

কালিকা প্রসাদের কুলচন্দ্র ও কৃষ্ণকিঙ্কর নামে দুই পুত্র হয়, কৃষ্ণকিঙ্কর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়বাগীশ উপাধি গ্রহণ করেন; কুলচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুত সূর্য্যকুমার ভট্টাচার্য্য হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পরগণা–দু-হালিয়া

দেওয়ান বংশ

ইটার বাৎস্য গোত্রীয় রাজা সুবিদ নারায়ণের বংশোদ্ভব বাসুদেব দু-হালিয়া নামক স্থানে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার মহেশ্বর নামে এক পুত্র হয়, মহেশ্বর অতি বুদ্ধিমান, সাহসী ও পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। মহেশ্বর ঢাকার নবাবের সহানুভূতিতে দুহালিয়া, চামতলা ও বড়আখিয়া নামক পরগণাত্রয়ের অবাধ্য অধিকারীকে দমন করিবার ভার গ্রহণ করেন। ঐ স্থান তখন ধনুরাজা নামক জনৈক খাসিয়া দলপতির অধিকৃত ছিল। মহেশ্বর অনেক সৈন্য সংগ্রহক্রমে উক্ত ধনুরাজকে পরাস্ত হইলে মহেশ্বর তাহাকে "মুখদেন" পাহাড়ে তাড়াইয়া দেন। পলায়ন কালে মুখদেন পর্ব্বত-নিঃসৃত একটি খরস্রোতা নদীতে ধনুরাজার বহুতর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এই ঘটনা হইতে উক্ত স্রোতস্বতী "খাসিয়ামারা" নদী নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

মহেশ্বরের চেষ্টায় এই পরগণাত্রয় অধিকৃত হইলে, তিনি দেওয়ান উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে থাকেন ও রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হন; এবং পুরস্কার স্বরূপ ঢাকার নবাব হইতে সেই স্থানে চারিশত হাল ভূমি নিষ্কর প্রাপ্ত হন। মহেশ্বর দীর্ঘকাল এই সম্মান ভোগ করিয়া, বৃদ্ধকালে একপুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের এবং তাঁহার পুত্রের নাম জানা যায় নাই। দেওয়ান ব্রজনাথ, দুর্গাচরণ ও তিলক চাঁদ নামে মহেশ্বরের তিন প্রপৌত্র ছিলেন; ইংরেজ আমলের প্রথম সময়ে ইঁহারা জীবিত ছিলেন। ব্রজনাথের নামে ১নং তালুক বন্দোবস্ত হয়, দুর্গাচরণ ও তিলক চাঁদের নামে তত্রত্য "৭নং দুর্গাতিলাই তালুক" বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

এই বংশে পরবর্ত্তী সময়েও অনেক ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তন্মধ্যে একজন, ইনি বিনয়ী, বিদ্বান এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের হিতসাধনে তদীয় শক্তি সতত নিয়োজিত হইত; অদ্যাপি লোকে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। দু-হালিয়ার শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইতে এই বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পরগণা-নৈগাঙ্গ

যে সময়ে নৈগাঙ্গ পরগণার মোহাম্মদ হেলিম নামে জনৈক মোসলমান সদাগর আসিয়া বাস করেন;[৬] তৎকালে নারায়ণ শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নারায়ণ এই স্থানটি বাসোপযোগী মনে করিয়া আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নামে তখন ঐ স্থান "নারায়নপুর" বলিয়া খ্যাত হয়। কালক্রমে নারায়নের বংশধরবর্গ তথা হইতে উঠিয়া নগদীপুর গ্রামবাসী হন, কিন্তু সেই স্থানেও তাঁহারা স্থায়ী হইতে পারেন নাই; কামার খালির তীরবর্ত্তী কামারখাল গ্রামে গিয়া ইদানীং তাঁহারা বাস করিতেছেন। এই বংশীয় কৃষ্ণজীবন ও হরিশ্চন্দ্র পুরকায়স্থের নামে নৈগাঙ্গের ৫নং ও ৬নং তালুক বন্দোবস্ত হয়।[৭]

কামার খালের চৌধুরী বংশীয়গণ পুরকায়স্থ বংশের একটি শাখা; ইহারা বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানের অধীনে চৌধুরী আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই চৌধুরী বংশে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন। নৈগাঙ্গের ৭নং তালুকটি পুরকায়স্থ বংশের পুরোহিত চক্রবর্ত্তী বংশের এক ব্যক্তির নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

---

৬. পরবর্ত্তী ৩য় অধ্যায়ে ইঁহাদের কথা লিখিত হইবে। নৈগাঙ্গের এই উভয় বিবরণ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি, এ মহাশয় পাঠাইয়া উপকৃত করিয়াছেন।

৭. ১নং ২নং ৩নং ও ৪নং তালুক হেলিম সদাগরের নামে বন্দোবস্ত হয়।

পরগণা-লক্ষ্মণশ্রী

জয় কৈলাসের ভট্টাচার্য্য বংশ

এই পরগণার নাম দাস জাতীয় লক্ষ্মণ রামের নামে হইয়াছিল। লক্ষ্মণ রামের দেওয়ান পদবি ছিল। জয়কৈলাসের ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ এই দেওয়ান বংশের পুরোহিত। রাঢ়দেশের মহেশপুর হইতে স্বর্ণকৌশিক গোত্রীয় রামানন্দ ভট্টাচার্য্য তাঁহার জনৈক যজমান সহ কামরূপ গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে তদীয় গর্ভবতী পত্নীর নবম মাসে একটি সন্তান প্রসূত হয় ও তিনি পীড়িতা হইয়া পড়েন; উপায়ান্তর বিহীন হইয়া রামানন্দ তখন এদেশে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। এদেশে আসিলে তদীয় শিষ্য অতুল রায়েরও একটি পুত্র হয়, তাঁহারই বংশে দেওয়ান লক্ষ্মণ রামের উদ্ভব হইয়াছিল।

রামানন্দের পুত্রের নাম হরিচরণ, তৎপুত্র রাম জীবন, তাঁহার পুত্র আরাধন, আরাধনের মহাদেব নামে একপুত্র হয়; ইঁহার পুত্র হরিশঙ্কর; তাঁহার পুত্রের নাম রাঘব চন্দ্র; রাঘবের সর্ব্বানন্দ, পর্ব্বানন্দ ও রামানন্দ নামে তিন পুত্র হয়। পর্ব্বানন্দের পুত্র গোপাল চন্দ্র ন্যায় ভূষণ "স্মৃতি সংগ্রহ" এবং "সংসার যাত্রা" নামক দুই খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোপাল চন্দ্র তদঞ্চলের প্রায় ৩০ টি মৌজার রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বানন্দের পুত্রের নাম সুরানন্দ; সুরানন্দ ও তাঁহার পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। গোবিন্দ এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অনেক ব্যক্তিকে বিদ্যাদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র হারুচন্দের পুত্রের নাম বলরাম; ইঁহার বাক্য অতি মধুর ও বিনয় মাখা ছিল, তিনি সদা শিব-পূজায় রত থাকিতেন; এই জন্য লোকে তাঁহাকে "শিবঠাকুর"; বলিয়া ডাকিত; তিনি এক টোল স্থাপন করিয়া অনেক ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করেন। ইঁহার তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ব্রজনাথ, তৎপত্র ভারত চন্দ্র। ভারত চন্দ্রের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদি জীবিত আছেন।[৮]

পরগণা–সুখাইড়

সুখাইড়ের ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ তীব্রত্য দাস চৌধুরী বংশের পুরোহিত। এই বংশের আদি পুরুষ স্বীয় শিষ্য মহামাণিক্য রায় সহ পূর্ব্ব বাসস্থান হইতে এ দেশে আগমন করেন। পূর্ব্বে ইহারা রাঢ় দেশের বনগ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। হরিহর রায়ের সুমন্ত নামে এক পুত্র হয়, সুমন্তের পুত্র দুকরী, তৎপুত্র বাণেশ্বর, তৎপুত্র মুকুন্দ লাল, তাঁহার পুত্র বনমালী। ইঁহার জীবন রাম ও বলরাম নামে দুই পুত্র হয়; এই দুই শাখাই এক্ষণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বনমালীর প্রথম পুত্র জীবন রামের মঙ্গলানন্দ নামে এক পুত্র হয়, তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণ তৎপুত্র মোহন রাম; ইঁহার সল্লোক রাম নামে এক সৎ পুত্র জাত হয়; তাঁহার পুত্র জগন্নাথ ও গোপীনাথ; ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ন্যায়রত্ন বর্ত্তমান আছেন।

এই ভট্টাচার্য্য বংশ চারি ঘরে বিভক্ত হইয়াছে, ইঁহারা ভূসম্পত্তিরও অধিকারী। পূর্ব্বোক্ত গোপীনাথ একজন দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটী পতিত ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়বর্গের উন্নতির পথ নির্দ্ধারিত করিয়া যান।

৮. জয়শ্রী বাসী শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে এই বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সাধারণ বিভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়
কায়স্থাদি বংশকথা

কেশব পুরের দত্ত–

সুনামগঞ্জের আতুয়াজান পরগণায় কেশবপুরের দত্ত, পাইল গাওর চৌধুরী ও কুবাজপুরের চৌধুরী বংশ প্রভৃতি প্রাচীন ও সম্মামার্হ। প্রসিদ্ধ চক্রদত্ত বংশীয় দত্ত খাঁ ও বড়দত্ত খাঁর কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে; উক্ত বড়দত্ত খাঁর এক পুত্রের নাম প্রভাকর ছিল বলিয়া উক্ত হয়; প্রভাকর দত্ত আলিসারকুল হইতে কেশবপুরে গমন করিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রভাকরের পুত্র শম্ভুদাস রাজা বিজয় সিংহের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে পূর্ব্বাংশে তাহা কথিত হইয়াছে।[১] দেওয়ান শম্ভুদাসের, রামদাস, কেশবদাস ও লক্ষ্মণদাস নামে তিন পুত্র ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামদাসের নামান্তর বিজয় রাম ছিল, এবং তিনিও দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রামদাসের পুত্র মুকুন্দ তৎপুত্র রাজেন্দ্র, তাঁহার পুত্র রামজীবন ও রাম গোবিন্দ দত্ত। তন্মধ্যে রামজীবনের পুত্রের নাম ভানু নারায়ণ, তৎপুত্র হুলাশ চন্দ্র, তাঁহার পুত্র ভৈরব চন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীযুত অভয়া চরণ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত অমর চন্দ্র দত্ত মহাশয় হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে এ বংশের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশেই সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছে।

পাইলগাঁর চৌধুরী বংশ

পাইল গাওর তত্রত্য যে পাল বংশীয়গণের বসতি হেতু হইয়াছিল, তাঁহাদের কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র শুনা যায় যে, পাল বংশীয় পদ্মলোচনের একটি কন্যা ছিল, তাঁহার নাম রোহিণী। রাঢ় দেশের মঙ্গল কোট গ্রামের গৌতম গোত্রীয় কানাইলাল ধর নামক এক ব্যক্তি কোন কারণে এদেশে আসিয়া, গৃহ-জামাতা রূপে উক্ত রোহিণীকে বিবাহ করেন। কানাইলাল হইতে আটপুরুষ পরে, তদ্বংশে বালক দাস নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়, বালক দাস হইতে এই বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

বালক দাসের কয়েক পুরুষ পরে এই বংশে উমানন্দ ধর ওরফে বিনোদ রায় নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন; ইনি মোহাম্মদ শাহ বাদশাহ হইতে চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহার

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৩য় খঃ ২য় অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ এবং এই বংশীয়গণের সাহিত্য চর্চ্চার কথা বলা গিয়াছে। দেওয়ান শম্ভুদাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামগোবিন্দের পুত্র দুর্ল্লভ পুরকায়স্থ, তৎপুত্র অনুপচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রই ভারত সাবিত্রী ও পদ্মপুরাণ প্রণেতা রাধামাধব দত্ত। রাধামাধব দত্তের পুত্র বৈষ্ণবগীতি প্রণেতা স্বর্গীয় রাধারমণ দত্তের নাম সর্বত্র সুপরিচিত। অনুপচন্দ্রের পুত্রের নাম নন্দ কিশোর, তৎপুত্র কৃষ্ণকিশোর, তাহারপুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান আছেন। এবংশে পরমভক্ত ও জ্যোতিষী রাধাগোবিন্দের জ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান আছেন। এবংশে পরমভক্ত ও জ্যোতিষী রাধাগোবিন্দের উদ্ভব। তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর দত্ত এই বংশেই জাত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় আমরা ইঁহাদের বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রাপ্ত হই নাই।

মাধব রাম ও শ্রীরাম নামে দুই পুত্র হয়। মাধব রাম একটি দীঘী দিয়াছিলেন, উহা "মাধব রামের তালাব" নামে দাম দলাবৃত অবস্থায় আছে। মাধবের পুত্র মদনরাম, তৎপুত্র মোহন রাম;[২] মোহন রামের চারি পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম দুর্ল্লভ রাম, রামজীবন, হুলাস রাম ও যোগজীবন। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় দশসনা বন্দোবস্তের সময় নিজ নিজ নামে কিসমত আতুয়াজানের ১নং ২নং ৩নং ও ৪নং তালুক যথাক্রমে বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন; হুলাস রাম চৌধুরী বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান উমেদ রাজীব প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন ও দেওয়ান হইতে তিনি অনেক ভূমি দান প্রাপ্ত হন।[৩]

দেওয়ানের প্রদত্ত ভূমি হইতেই পাইলগাওয়ের জমিদারীর বিস্তৃতি ঘটে। এই বংশীয় কোন কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পাত্রে ভূমিদান করিয়া যশ ও পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এই বংশীয়গণ শক্ত ছিলেন, পরে কুরুয়ার জয়গোবিন্দ গোস্বামী হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন; গুরুপুত্র নন্দকিশোর গোস্বামী ও ঠাকুর যুগলের নামে তাঁহাদের প্রদত্ত ভূমি আছে। হুলাসরাম পাইল গাওয়ের স্বগীয় মদন মোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, ১২১৪ বাংলায় তাঁহার পাকা মন্দির নির্ম্মিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীরামের প্রপৌত্রের নাম গোলাবরাম ছিল, ইঁহার নামে তত্রত্য ৪নং তালুকের বন্দোবস্ত হয়। ৬নং তালুকটিও ধরবংশীয় জয়চন্দ্র রায়ের নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল; ইঁহার পুত্র জয়গোপাল, তৎপুত্র জয়গোবিন্দ সঙ্গীত নিপুণ ও একজন উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। ইনি দুলালীর গুপ্তবংশীয় প্রসিদ্ধ তিলকরাম শিরোমণির ভাগিনেয় ও ছাত্র ছিলেন।

যোগজীবনের পৌত্র ব্রজনাথ চৌধুরী একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন, তিনি জজকোর্টের ওকালতি ব্যবসায়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন, পরে অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযত সুখময় চৌধুরীও উক্ত পদারুঢ়। হুলাস রামের প্রপৌত্র শ্রীযুত রাসমোহন চৌধুরী মহাশয় এই বিবরণ প্রেরণপূর্ব্বক আমাদের সহায়তা করিয়াছেন।

কুবাজপুরের চৌধুরী বংশ

এই সুপ্রাচীন বংশের আদি পুরুষ হরিহর রায়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[৪] রাজা বিজয়সিংহ যখন হবিবখাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হন, তখন তাঁহার সম্পত্তির অনেকাংশ হরিহরের

২. মোহনরামের বংশধরবর্গের নামাবলী নিম্নের তালিকায় দৃষ্ট হইবেঃ–

মোহনরাম

দুর্ল্লভরাম	রামজীবন	হুলাসরাম		যোগজীবন
রামগোবিন্দ	গৌরগোবিন্দ	হরগোবিন্দ		বিজয়নারায়ণ
রাজ কিশোর	রাজগোবিন্দ	হরিচরণ	রামচরণ	ব্রজনাথ চৌধুরী
রমণকিশোর চৌধুরী ও নবীনকিশোর	রত্নগোবিন্দ চৌধুরী ও কৃষ্ণকুমার "	হরিকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি	রামমোহন চৌধুরী	রসময় চৌধুরী ও সুখময়

তালিকার লিখিত পরবর্ত্তিগণের পুত্রাদির নাম বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না, ইহারা সকলেই জীবিত থাকিয়া বংশগৌরব রক্ষা করিতেছেন।

৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৩য় খঃ ৩য় অধ্যায় "সাধারণ দুটা কথা" ইতি প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৩য় খণ্ডঃ ১ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।
এই বংশীয়েরা মহারাষ্ট্রদেশীয় ক্ষত্রকুলোৎপন্ন বলিয়া আপনাদিগকে বলেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ মহারাষ্ট্রদেশ হইতে প্রথমে লৌহজঙ্গও তৎপরে তথা হইতে কুবাজপুরে আগমন করেন। ইহাদের সম্বন্ধে "দ্বিজ" শব্দের ব্যবহার স্থলে ভ্রমতঃ পূর্ব্বাংশে "ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছিল।

বংশীয়গণ অধিকারপূর্ব্বক হবিব খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন, তাহাতে তাঁহাদের অধিকৃত ভূমি তাঁহাদেরই থাকিয়া যায়। দশসনা বন্দোবস্তের সময় উক্ত ভূমিই ১নং হইতে ৭নং এবং ১৭নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত ষোলটি বিভিন্ন তালুকে চিহ্নিত হইয়া এই বংশীয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল।[৫] এই বংশে অনেক প্রধান পুরুষের উদ্ভব হয়।[৬] তাঁহাদের বিষয় অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়।

দশসনা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এই বংশে জয়চন্দ্র চৌধুরী এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, ইঁহার পাঁচ পুত্র ও সাতটি কন্যা ছিল।[৭] এই পঞ্চপুত্রই ২নং হইতে ৬নং পর্য্যন্ত তালুকের অধিকারী ছিলেন;–ইঁহাদের নামেই সেই তালুকগুলির নাম হয়।[৮]

সন্ন্যাসীর কথা

এই পঞ্চভ্রাতার মধ্যে প্রাণবল্লভ চৌধুরী পরম সাধক ব্যক্তি ছিলেন। একদা পাঠখুরা বাজারের সন্নিকটে এক সন্ন্যাসী আগমন করেন। ইহা শুনিয়া প্রাণবল্লভ তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, সন্ন্যাসী সেই নির্জ্জন স্থানের এক বৃক্ষশাখে আপন পদদ্বয় বাঁধিয়া হেট শীর্ষে নিম্নের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছেন। গুপ্ত সাধক প্রাণবল্লভ বাহ্যাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। সন্ন্যাসীকে প্রকাশ্যে ঈদৃশ সাধন-প্রক্রিয়া প্রকাশ করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত কি বিগলিত হইলেন না, বরং বিতুষ্ট ও কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন এবং আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,–"বাদুড়কা মাফিক লট্‌কা হায়!"

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল, সন্ন্যাসী কোন কথা বলিলেন না; একটিবার মাত্র রোষ-কষায়িত নেত্রে চাহিয়াই নিজকার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টিমাত্র প্রাণবল্লভের অঙ্গে লোহিত বর্ণের বহু চক্র চিহ্ন দেখা দিল। তিনি নিজাঙ্গে কুষ্ঠ ব্যাধির প্রকাশ হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিলেন ও বাড়ীতে আসিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তাঁহার আদেশ ব্যতীত কেহ যেন দ্বার না খুলে। সেদিন গেল, তাহার পরদিনও অতীত হইল, প্রাণকৃষ্ণ দ্বার খুলিলেন না তৃতীয় দিনে তিনি সেই গৃহ হইতে বাহির হইলেন; তখন দেখা গেল যে, তাঁহার অঙ্গ পূর্ব্ববৎ সুন্দরই আছে, কুষ্ঠরোগের রেখা মাত্রও দেখা যায় না।

তিন দিন তিনি গৃহমধ্যে কি প্রক্রিয়া করিয়াছিলেন, কি ঔষধেই বা অঙ্গের রক্তবর্ণ চক্রচিহ্নগুলি মিলাইয়া গিয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। তিনি নিরাময় হইয়া পরে একদিন কিছু গাঁজা লইয়া সেই সন্ন্যাসীর সমীপে গমন করিয়াছিলেন; এবার সন্ন্যাসী সম্মান সহকারে তাঁহাকে সন্নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করেন ও তৎসহ অনেক আলাপ করেন। এই ঘটনার পরে সন্ন্যাসী তথা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রাণবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক সময় কাশী ছিলেন, তখন প্রাণবল্লভ একদা দেবগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সকলকে বলেন–"দাদার কাশীপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, অশৌচ ধারণ কর।" তাঁহার এই বাক্য যথার্থই হইয়াছিল; কাশীর পত্র প্রাপ্তে সকলে প্রাণ বল্লভের প্রভাব বুঝিতে পারেন ও

৫. ৮নং হইতে ১৬নং পর্য্যন্ত তালুকগুলি রাজা বিজয় সিংহের বংশধরেরা বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।

৬. পরবর্ত্তী ফ পরিশিষ্টে ইঁহাদের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইবে।

৭. "জয়চন্দ্র সুতাঃপঞ্চ সানন্দো বিজয়স্তথা। প্রাণদীপ সদানন্দ এতেপঞ্চ সহোদরাঃ দয়মন্তী প্রভাবতী কমলা অমরাবতী। অঘোরা স্বরূপা চৈব মালতী সপ্ত ভগ্নিকাঃ।"

৮. ফ পরিশিষ্টের বংশতালিকায় বন্দোবস্তকারিগণের নামে পার্শ্বের তালুকের সংখ্যা দেওয়া যাইবে।

বিস্মিত হন। প্রাণ বল্লভের পৌত্র লালচন্দ চৌধুরীর যত্ন ও অর্থব্যয়ে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে "লালচাঁদ মধ্য ইংরেজী স্কুল" স্থাপিত হয়।

প্রাণ বল্লভের অনুজ দ্বীপচন্দ্র চৌধুরী নামীয় চারি খানা দাস দাসী সম্বন্ধীয় দলিল সহ বংশবিবরণ তদীয় প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইয়াছি। উক্ত দলিলগুলিতে ১১৯৪ সাল হইতে ১২৩০ সাল পর্য্যন্ত তারিখ পাওয়া যায়।[৯] তাঁহার পুত্র প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী নামীয় ১২৪৫ সালের সম্পাদিত অনুরূপ দুই খানা দলিলও প্রাপ্ত হইয়াছি।

পরগণা-পাগলা

দাম ও দেব বংশের কথা

পাগলার দাম ও ঘোষ বংশ তথাকার মৌলিক অধিবাসী। ভূধরদামের সন্তান গোবর্দ্ধন দাম বর্ত্তমান বংশববর্গের প্রায় ২৮ পুরুষ পূর্বে বল্লালসেন প্রদত্ত কীর্ত্তিমতী[১৮] গ্রাম হইতে পুরোহিত সহ পাগলাতে আগমনপূর্ব্বক বাস করেন। তাঁহার সহিত ঘোষ বংশীয় এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন; ইহারা উভয়েই একত্রে সেই স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন দামের পুত্রের নাম নারায়ণ। নারায়ণ দামের সময়ে দেববংশীয় একব্যক্তি স্বজন সহিত পাগলাতে আগমন করিয়া স্বীয়বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। দাম ও ঘোষ বংশীয়গণ তাঁহার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা করেন নাই। কালক্রমে নারায়ণ দাম মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

নারায়ণ দামের পুত্রের নাম জনার্দ্দন। ইঁহার সময়ে দেব বংশীয়গণ দাম ও ঘোষ বংশের বিদ্যমান স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপনের কোন সম্ভাবনা নাই, দেখিয়া সদলবলে ইহাদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন।

জনার্দ্দনের স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন। মাধবদেব নামে দামদের একটি অনুগত ভৃত্য এই বিপৎপাতে, গর্ভবর্তী প্রভুপত্নীর প্রাণরক্ষার্থে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক বরমচাল অঞ্চলে চলিয়া যায়। সেই স্থানে গর্ভবর্তী দাম পত্নী এক বংশ রক্ষক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই পুত্র এবং তৎপর কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত সেই অঞ্চলেই অবস্থিতি করেন, কিন্তু ইহারা কেহই আপন পূর্ব্বনিবাস ও সম্পত্তি উদ্ধারের কথা ভুলেন নাই, কেবল সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে যখন "জোর জবরদস্থির" কাল চলিয়া গেল, ইংরেজের সুশাসনে দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন দাম বংশীয়গণ পাগলা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, যে স্থানে তাঁহারা নিজ শত্রু

৯. দাস দাসী বিক্রয়ের কয়েকখানা দলিল পূর্ব্বে বিষয় বিশেষের উদাহরণ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐরূপ দলিল উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মনুষ্য বিক্রয়পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হয় নাই, তাহারই উদাহরণ স্বরূপ একখানা দলিল এস্থলে উদ্ধৃত করা গেলঃ–

"ইয়া দকির্দ্ধ শ্রীদ্বীপচন্দ্র রায় চৌধুরী সদাশয়েষু লিখিতং শ্রীঝাটাই চঙ্গ ও শ্রীমতী খঞ্জন দাসী সাং মৌং ভাইটগাউ দরবিনে সাং কুবাজপুর মহল খালিসা নাদাবিপত্র মিদং কার্জ্জঞ্চ আগে আমরার উদর পররিস না হয় ছবর আমরার বেটা শ্রীপুরাইচঙ্গ ও শ্রীসুরাইচঙ্গ উম্মর মোঃ তপছিল তাহার খুস রজাবন্দিএ তুমার ইথানে খুদ আজির হৈয়া আজির বাহার মং ১৭ সতর রুপাইয়া লইয়া আমাদের দিয়া আমরার রাজি রফামতে এই মবলগ মজকুর খুদ তছরূপে করিয়া তারা ও আবার ফরজন্দানের নাদাবি দিলাম কাল কালা দায়া করি বাতিল" দান বিক্রি অধিকার তুমার এতদর্থে নাদাবিপত্র লেখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৯৪ সাল মাহে ৭ শ্রাবণ।

তপছিল	উম্মর	মুদ্দত
বৈং সুরাই চঙ্গ	১৫	৬০ বয়স
বৈং পুরাই চঙ্গ	১০	৬০ বয়স

(দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমতি খঞ্জণ ও ঝাটাইর দস্তখত ভিন্ন অক্ষরে লিখিত। বামপার্শ্বে "গুহাই" উল্লেখে ভবানী প্রসাদ দস্থ প্রভৃতি তিনজন সাক্ষির নাম লিখিত আছে।

দাম ও ঘোষকে বিমর্দ্দিত করেন, সেই স্থানের নাম "শত্রু মর্দ্দন" বলিয়া খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন যে, পূর্ব্ব সম্পত্তি সহজে উদ্ধারের আশা নাই; তখন বাণিয়াচঙ্গাধিপতি দেওয়ান উমেদ রজার প্রভাব সেই অঞ্চলে অতি প্রবল, তাঁহার নামে সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হয়। এতদ্দৃষ্টে তাঁহারা স্বয়ং বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, দেওয়ানেরই কাছে সুবিচার প্রার্থী হইলেন। দেওয়ান বাহাদুর দেখিলেন যে ইঁহারা পাগলা প্রকৃত মালিক বটেন, কিন্তু দেব বংশীয়গণ বহুদিন যাবৎ পাগলায় অধিকার স্থাপন করিয়া ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিলে ইঁহাদের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বশত্রুতা বিবর্দ্ধিতই হইবে, তাহা শান্তিভঙ্গের কারণ মাত্র হইবে এবং উভয় বংশে অবিরত বিবাদ চলিবে; সুতরাং তিনি এক নুতন পন্থা করিলেন, দাম বংশীয়গণ তত্রত্য মৌলিক অধিবাসী বলিয়া ইঁহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক "সিচ্‌নী" নামক গ্রাম প্রদান করিলেন। সিচনী গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া দাম বংশীয়গণ অগত্যা সন্তুষ্ট হইলেন, দেব বংশীয়দের সহিত আর বিবাদের প্রয়োজন হইল না।

দাম বংশীয় শিবরাম, কিম্বা তদীয় পিতা সিচনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। শিব রামের পুত্রের নাম সোণারাম, তাঁহার পুত্র দুর্ল্লভ রাম ও ভুবন রাম।

হরিষরাম নামে দুর্ল্লভ রামের জ্ঞাতি সম্পর্কিত এক ভ্রাতা ছিলেন। এই উভয়ের যুক্ত নামে তত্রতা ৩নং হরিষ দুর্ল্লভ চিটতালুকের নাম হয়। এই তালুকটি বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানের মূল তালুক হইতে "খারিজ" বলিয়া চিটতালুক নামে খ্যাত আছে। দুর্ল্লভ রামের পুত্র দুর্গাপ্রাসাদ ও রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের পুত্রের নাম রাধানাথ দাম।

ভুবন রাম দামের পুত্রের নাম গঙ্গা প্রসাদ দাম, তৎপুত্র সাধক প্রবর বৈষ্ণব শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুত লোকনাথ দাম এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত গোকুল নাথ দাম; ইঁহার চেষ্টাতেই আমরা এই বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

দাম ও দেববংশে সম্প্রতি সম্প্রীতি আছে। পাগলার পূর্ব্ব সম্পত্তি দাম বংশের হস্তচ্যুত হইয়া দেববংশের অধিকৃত হইলে, দেববংশীয়গণ সেই সম্পত্তিতেই ১নং হইতে ৮ নং পর্য্যন্ত তালুক নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। ৮নং তালুকের অধিকারী পরে মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন; এই বংশীয়গণ পাগলার বীরগাওয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। দেববংশে কৃষ্ণ কিঙ্কর চৌধুরী একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ দেব চৌধুরী প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

পাগলার হাঁসকুড়ী গ্রামে ঘোষ বংশীয় শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন। বেতাল পরগণার সাচন মৌজায় এই বংশের এক শাখা অবস্থাপন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

পরগণা-সিংহচাপড়

উম বংশ

পূর্ব্বে উমবংশীয় জনৈক কায়স্থ খালিসাজুরী হইতে আত্মীয়গণ সহ বিবাদ ক্রমে পাইল গাওয়ে আসিয়া বাস করেন; তাঁহার বাসস্থানটি তথায় 'উমের বাড়ী" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত আছে। কিন্তু সেই স্থানেও নানা কারণে তিনি অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই; তথা হইতে সিংহচাপড়ের জগঝাঁপ গ্রামে আগমন করিয়া তত্রতা জনৈক ধনাঢ্য কায়স্থ ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ কলিয়া তদীয় সম্পত্তির অধিকারী হন! এই উম্‌বংশীয়গণ কালক্রমে এই স্থানে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এই বংশীয় হরেকৃষ্ণ চৌধুরী, চাঁদ রায় চৌধুরী, খোসাল রাম চৌধুরী প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

পরগণা-সুখাইড়

চৌধুরী বংশের আদি কথা

সুখাইড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর; এখানে বৃক্ষলতার ঘন সন্নিবেশ না থাকিলেও প্রাকৃতিক মুক্ত শোভা এস্থানে কম নহে। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এস্থানে জন বসতি ছিল না, রাঢ়দেশের বর্ণাবিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে মহামাণিক্য দত্ত নামে জনৈক ভদ্রব্যক্তি নিজপুরোহিত হরিহর ভট্টাচার্য্য সহ তখন দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া এই স্থানে আগমন করেন; তৎকালে ইহা আরও নিম্নভূমি ছিল, এবং বারমাস জল থাকিত; তৎকালে কৈবর্ত্ত ও দাস প্রভৃতি জাতি এস্থানে বাস করিত।

পরগণার নাম

মহামাণিক্য যাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন, তিনি দাসজাতীয় ও একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার একটি অবিবাহিতা দুহিতা ছিল; সেই উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যা রূপযৌবন সম্পন্ন অতিথিকে দেখিয়া মোহিতা হইলেন এবং জনৈকা সঙ্গিণীর কাছে মনের কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উক্ত সঙ্গিনী তাঁহার জননীর নিকট এই কথা জানাইলে, তিনি আগন্তুক অতিথি-সহ কন্যার বিবাহের কথা পতির কাছে বলিলেন। সেই ধনী ব্যক্তি এই প্রস্তাব হরিহরের কাছে উত্থাপন করিলে, তাহাতে হরিহরের অমত হইল না, পরে তাঁহার পরামের্শ মহামাণিক্য আশ্রয়দাতার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। মহামাণিক্যের পুত্রের নাম বিষ্ণুচরণ, শিবরাম নামে বিষ্ণুচরণের একপুত্র হয়, তাঁহার পুত্র জয়ধর খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে ইহার সময়ে সুখাই নামে ঝাল জাতীয় এক ব্যক্তি বৌনাই নদীতে একদা মৎস্য ধৃত করিতে করিতে জালে এক কালীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সে সেই হইতেই এবং বংশের প্রতিপত্তি ঝটিতি বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। তদীয় উন্নতির মূল সুখাই প্রদত্ত দেবী মূর্ত্তি, জয়ধর ইহা মনে করিয়া, তদীয় নামানুসারে সেইস্থান "সুখাইর" বলিয়া খ্যাত করিলেন। এই নামপ্রাপ্তি বিষয়ে মতান্তর আছে; সে মতে মহামাণিক্যের আগমনের পূর্ব্বে এ স্থান সুখাই নামক দস্যুর অধিকারে ছিল, মহামাণিক্য তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া ইহা অধিকার করেন; এবং "সুখাইর" নামেই তাহা খ্যাত করেন। সুখাইর বা সুখাইড়ের চৌধুরাই জয়ধর প্রাপ্ত হন; তিনি নিজ পুরোহিতকে ১৯৭/০ হাল ভূমি ব্রহ্মত্র দান করিয়াছিলেন।

জয়ধরে নাম রাজধর, তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বল্লভ রায়, তৎপুত্র হরিরায় ইঁহার তিন পুত্র হইয়াছিল। সুখাউড়ের চৌধুরীদের সম্পত্তি বংশবৃদ্ধির সহিত কালে, বড়বাড়ী মধ্যবাড়ী ও ছোটবাড়ী এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। হরিরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবী দাস, তৎপুত্র গুরারাম রায়, তাঁহার পুত্র রাম রায়; ইনি এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ইনি দিল্লীর বাদশাহ হইতে এক সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।[১০] ইঁহার পুত্র বিশ্বনাথ রায় হইতেই এই বংশ বিস্তৃত হইয়াছে।[১১]

বিশ্বনাথের ২য় পুত্র শ্রীমন্তরায়ের নামে শ্রীমন্তপুর মৌজার নামকরণ হইয়াছিল। ইঁহার পুত্র সুবংশ রায়ের সময়ে এদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; প্রতাপ রায়, গোপী রায় ও সদারায় প্রভৃতি তদীয় অপর ভ্রাতৃবর্গ সেই দুর্দ্দিনে দেশত্যাগী হন। সুবংশের বদলা নামক এক ভগিনীকে বেহেলির মনোহর পুরকায়স্থ বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই ভগিনিটি এই দুর্দ্দিনে

১০. রাম রায়ের পঞ্চম পুরুষ মোহন লাল চৌধুরীর সময়ে গৃহদাহে এই সনন্দ ভস্মীভূত হয়।

১১. ইহার পরবর্ত্তী বংশাবলী এইঃ–

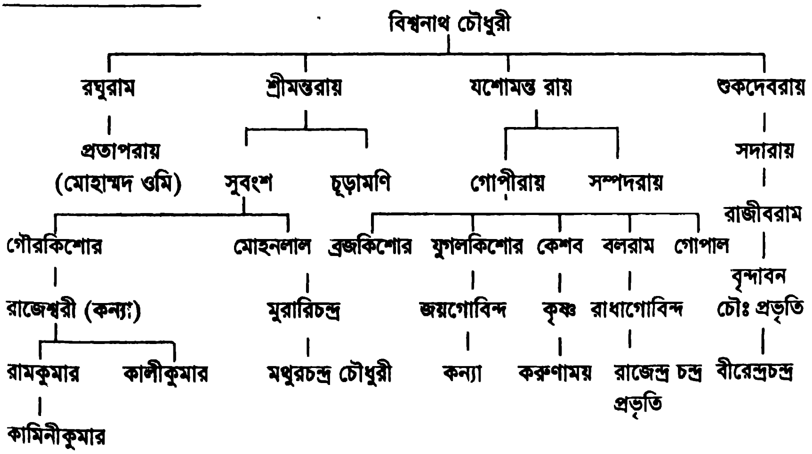
ভ্রাতাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রতাপ রায় মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মোহাম্মদ ওমি নামে খ্যাত হন, গোপীরায় ও সদারায় বাখরপুরে গিয়া বাস করেন; কিন্তু সুবংশ কাহারই খোঁজ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। যখন দশসনা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, সেই সময়ে প্রথমে প্রতাপরায় (মোহাম্মদ ওমি) আগমন করেন। প্রতাপরায় বংশে প্রধান এবং বয়োধিক ছিলেন, সুবংশ নিরাপত্যে ইঁহাকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ন্যায্যমত ছাড়িয়া দিলে, তাঁহারই নামে সুখাইড়ের ১নং তাং মাং ওমি বন্দোবস্ত হয়। মোহাম্মদ ওমি সেই স্থলে মোহাম্মদ নগর (মামুদ নগর) নামে গ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাড়ী প্রস্তুত করেন। সুবংশ নিজ নামে ২নং তালুক বন্দোবস্ত করেন।

ইহার পর অপর দুই ভ্রাতা আগমন করিয়া সম্পত্তির অংশ প্রার্থী হইলে সুবংশরায় ওমিকে এই কথা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু তিনি আপন অর্দ্ধাংশ হইতে ইঁহাদিগকে অংশ দিতে অস্বীকৃত হইলেন; তখন উদার হৃদয় সুবংশ নিজ অর্দ্ধাংশ হইতেই গোপীরায় ও সদারায়কে সমাংশে অর্দ্ধসম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন।

তখন সুখাইড়ের অর্দ্ধসম্পত্তির অধিকারী মোহাম্মদ ওমি রহিলেন, চতুর্থাংশ সুবংশের অধিকারে রহিল এবং অপর চতুর্থাংশ সুবংশের অধিকারে রহিল এবং অপর চতুর্থাংশ গোপীরায় ও সদারায় সমাংশে প্রাপ্ত হইলেন।

মোহাম্মদ ওমির বংশধরবর্গই রজাকপুরের মোসলমান চৌধুরীগণ। ওমির হিন্দুর নামে তত্রত্য প্রতাপপুর মৌজার নাম হইয়াছিল। সুবংশের নামেও সুখাইড়ের সুবংশপুর মৌজার নাম হয়।[১২] সুবংশের সম্পত্তি বড়হিস্বা, গোপী রায়ের সম্পত্তিমধ্যম হিস্বা এবং সদারায়ের সম্পত্তি ছোট হিস্বা নামে খ্যাত হইয়াছে। সুবাংশ নিজ গ্রামে স্বগীয় কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আরও স্মরণীয় হইয়াছেন।

সুবংশের পুত্র মোহন লাল নিজেদের দেবতা স্বগীয় লক্ষ্মীনারায়ণের নির্ম্মাণ করিয়া সেবা পরিচালনের জন্য বৃত্তি স্থাপন করেন। গৌররায় নামে ইঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার একমাত্র তনয়া রাজ্যেশ্বরী বিবাহযোগ্যা হইলে, জগঝাঁপের ভোলানাথ উমকে গৃহজামাতারূপে আনয়ন করিয়া তৎসহ রাজ্যেশ্বরীর বিবাহ দেন। প্রায় আট হাজার টাকা ব্যয়ে তাহাদিগকে পৃথক একটি



১২. এ বংশীয় আরও কয়েক ব্যক্তির নামে নিম্নলিখিত মৌজাগুলির নাম হইয়াছে;–বাবুপর, শুকদেবপুর, যশমন্তপুর, সম্পদপুর।

বাড়ী করিয়া দেওয়া হয় ও বার্ষিক ২৫০০ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করা হয়। এই বাড়ী "নয়াবাড়ী" নামে খ্যাত হয়; ইহা সুখাইড়ের ৪র্থ জমিদারবাড়ী।

জামাতা ভোলানাথ বুদ্ধিমান ও গুণবান ব্যক্তি ছিলেন, আজ পর্য্যন্ত লোকমুখে তাঁহার কথা গল্পের মত শ্রুত হওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাসী ভক্ত অল্পই দৃষ্ট হয়; অশীতি বর্ষ বয়সে সজ্ঞানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মোহন রায়ের পুত্র মুরারি চাঁদ সাধারণতঃ ময়ুর চৌধুরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ সুবিশাল ও পূর্ণায়ত দেহ সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ ছিল; তদীয় বিরাট বপুঃ দর্শনে লোকের ভয় ও বিস্ময় জন্মিত, আবার তাঁহার মুখশ্রী এমনই মনোহর ছিল যে, বহুলোক কেবল তাঁহাকে দেখিবার জন্যই আসিত। তাঁহার পুত্র দানশীল, পরহিত-রত ও সুপুরুষ বলিয়া খ্যাত শ্রীযুত মথুরামোহন চৌধুরী হইতে এই বিবরণীর এক প্রস্ত প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইয়াছি।

বেহেলির পুরকায়স্থ বংশ

সুনামগঞ্জের অন্তর্গত বেহেলি গ্রামবাসী দাসবংশের আদি পুরুষ প্রথমরায় রাঢ়দেশ হইতে এস্থানে প্রথমে আগমন করেন। তৎকালে ঐস্থান জঙ্গল পরিপূরিত ছিল, প্রথমরায় প্রথমে জঙ্গলভূমি সঙ্গীয় লোকদিগের মধ্যে "বিলি" দিয়া আবাদক্রমে গ্রাম বসাইয়াছিলেন; "বিলি" শব্দই বেহেলিতে রূপান্তরিত হইয়া গ্রামের নামে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমরায়ের পুত্রের নাম রবিরায়, তাঁহার পুত্র তিলকরাম ১০৬৭ হিঃ অব্দে (১৬৪৯ খৃঃ) শাহাজাহান বাদশাহের অনুমত্যনুসারে বঙ্গীয় নবাব শাহসুজার নিকট হইতে লাউড় পরগণায়, প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একখণ্ড ভূমির সনন্দ প্রাপ্ত হন।[১৩] এই ভূমি বেহেলি, রহিমপুর, হরিহরপুর, বাণিরপুর প্রভৃতি মৌজাভুক্ত ছিল, তন্মধ্যে দশ কেদার ভূমি বিশিষ্ট তদীয় ভদ্রাসনবাটী নিষ্কর নির্দ্দিষ্ট হয়। তিলকরাম "জমিদার" বলিয়া পরিণত হন। দিল্লীর বাদশাহের অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে স্থানে স্থানে যে জমিদার নিয়োজিত হইতেন, তাঁহাদের প্রাপ্ত সনন্দে ভূমির পরিমাণ যাহাই থাকুক, পরে নানা উপায়ে তাঁহারা প্রায়শঃ তাহার পরিসর বর্দ্ধিত করিয়া লইতেন, ইহার উদাহরণ বিরল নহে।

তিলক রামের পুত্র শ্যামরায়, তৎপুত্র সুন্দরও গোবিন্দ; তন্মধ্যে সুন্দরের চারি পুত্র হয়, ইহাদের নাম মনোহর, শম্ভু, রামনারায়ণ ও চন্দ্র নারায়ণ।[১৪]

মনোহর অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন; বাণিয়াচঙ্গাধিপতি তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ

১৩. উক্ত বাদশাহী সনন্দের ইংরেজী অনুবাদ পরবর্ত্তী ব পরিশিষ্টে প্রাপ্ত হইবে।

১৪. সুন্দর রাম হইতে পরবর্ত্তী বংশাবলী এইঃ-

সুন্দর রায়

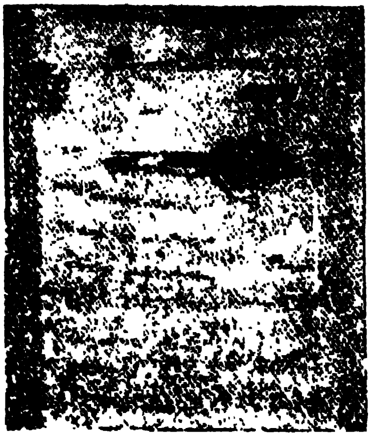
মনোহর　শম্ভু　রামনারায়ণ　চন্দ্রনারায়ণ

সোণারম　ধনরাম　স্বরূপরাম　অনন্তরাম　ভগীরথ　বিজয়নারায়ণ

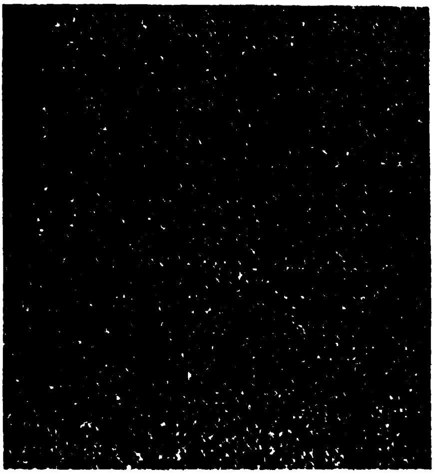
মুরারি　হরকিশোর　রাধামোহন　জগন্নাথ　সর্ব্বানন্দ　বিষ্ণুপ্রসাদ

জয়চন্দ্র (দত্তক)　প্রকাশচন্দ্র　বৃন্দাবনচন্দ্র

নদীয়াচাঁদ　হরকুমার　কৈলাসচন্দ্র　বরদ্যচন্দ্র



বেহেলী রায় পুরকায়স্থ বংশের সম্রাট-দত্ত ভূদানের সনন্দ



রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক উপহৃত

করিতেন। তাঁহার অনুগ্রহে মনোহর রায় লাউড়, বেতাল সুখাইড় ও আটগাও পরগণার কানুনগো পদে নিযুক্ত হইয়া "পুরকায়স্থ" পদবি প্রাপ্ত হন। তিনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অপরাপর কানুনগো হইতে অনেকাংশে তাঁহার ক্ষমতা অধিক ছিল।

বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান একদা বেহেলিতে আগমন করিয়াছিলেন। কার্য্যবশতঃ তখন মনোহর নিকটবর্ত্তী জয়শ্রী গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। মনোহর তত্রত্য জমিদার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরীর শালিকা-পতি ছিলেন; দুর্গাপ্রসাদ মনোহরকে দেখিতে পাইয়া শ্লেষব্যঞ্জস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–"পুরকায়েত মহাশয়। তোমার দেওয়ান সাহেব কবে আসিবেন?" উত্তরে মনোহর এইমাত্র বলিলেন–"দেওয়ান কি শুধু আমার, আপনার নহেন কি?" মনোহর আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া দেওয়ানের কাছে গেলেন ও ইহা বলিলেন। দেওয়ানের নৌকা-বহর তখন জয়শ্রীমুখে ফিরিল। দেওয়ান যথাকালে জয়শ্রী পৌঁছিয়া করাতদ্বারা, দুর্গাপ্রসাদকে দ্বিখণ্ডিত করিতে আদেশ দিলেন।

দুর্গাপ্রসাদের গৃহে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল, তাঁহার স্ত্রী মনোহরকে অন্দরে লইয়া গিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামীর প্রাণ–ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার কাকুতি মিনতি ও অনুরোধে মনোহরের চিত্ত দ্রব হইল, তিনি তৎপ্রদত্ত একথালা স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দেওয়ানের কাছে গেলেন ও দুর্গাপ্রসাদের অপরাধানুরূপ বহু লাঞ্চনা ভোগ হইয়াছে, এক্ষণে দেওয়ান বাহাদুর দয়া করিয়া ক্ষমা করিতে পারেন, মনোহরের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া দেওয়ান নজর গ্রহণ করিলেন। দুর্গাপ্রসাদ প্রাণ পাইলেন, কিন্তু মনোহরের সহিত তাঁহার আর সৌহৃদ্য স্থাপিত হয় নাই।

মনোহর সুখাইড়ের চৌধুরী বংশে যে বিবাহ করেন, সেই স্ত্রীর গর্ভে সোণারাম, ধনরাম ও স্বরূপরামের উদ্ভব; দাঁহার অপর পুত্রদ্বয় দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভসম্ভুত। সোণারাম পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত সনন্দের ভূমি ব্যতীত আরও অনেক ভূমি বন্দোবস্ত করেন, তন্মধ্যে; কতক ভূমি (১৭নং তাং) তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার ও অনন্তরামের যুক্ত নামে অপর একটা তালুক (১১২নং সোণা–অনন্ত) সংজ্ঞিত হইয়াছে। তাঁহার অনুজ ধনরামের নামেও একটি তালুকের নাম হইয়াছে (১১৩নং তাং)। তাঁহার ভ্রাতা স্বরূপরাম বেহেলির রাধামাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন।

দশসনা বন্দোবস্তের পর হইতে মনোহর রায়ের পরবর্ত্তী বংশধরগণ তালুকদার বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন, চন্দ্রনারায়ণের বংশীয়গণ পূর্ব্বের পুরকায়স্থ পদবিতেই পরিচিত আছেন। তাঁহারা সনন্দোল্লেখিত ভূমি প্রাপ্ত হন নাই, মনোহর প্রদত্ত কিছুটা জমি পাইয়াই তুষ্ট আছেন। বেহেলির গোস্বামী এবং ব্রাহ্মণগণ মনোহর প্রদত্ত দেবত্র এযাবৎ ভোগ করিতেছেন। এই বংশের উপযুক্ত সন্তান শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস মহাশয় স্বীয় বংশ বিবরণ, পূর্ব্ব পুরুষ প্রাপ্ত সনন্দের চিত্রাদি ও দাস বংশীয় অন্য ২/১ টি বিবরণ প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

গৌরারঙ্গের দাস-চৌধুরী বংশ

এই বংশের আদি পুরুষের নাম নিধিরাম। ইনি বঙ্গদেশীয় জনৈক কায়স্থ সন্তান। বাল্যে একটি মোহরেরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পদোন্নতি সহকালে শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। এখানে আসিয়া দাস জাতীয় কোন ভূম্যধিকারীর এক সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিয়া এদেশবাসী হন। সুরমা নদীর পশ্চিম ভাগে একটি উচ্চ জঙ্গল ভূমি, তিনি জনৈক রাজপুরুষের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বসতবাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বাটী যে শ্রীসম্পন্ন স্থানে বিনির্ম্মিত হয়, সে স্থানটী

লক্ষণশ্রী[১৫] নামে খ্যাত।

নিধিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র ধনরাম রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া "চৌধুরী" আখ্যায় খ্যাত হন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তরাম মোসলমানধর্ম্ম অবলম্বনে মোহাম্মদ আয়েজদী নাম প্রাপ্ত হন।

ধনরামের পুত্র শ্যামরায় স্থানীয় অস্বাস্থ্য লক্ষ্য করিয়া এস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী গৌরাঙ্গের গ্রামে চলিয়া যান। ইঁহার পুত্র কেশব রায় তৎপুত্র তিলক রায়। তিলক রায়ের পুত্র লক্ষণ রায় ও জগদীশ। পুত্রহীন লক্ষণরামের নাম লক্ষ্মণশ্রী পরগণার ৫নং তালুকটি রক্ষা করিতেছে, উহা লক্ষ্মণরাম বন্দোবস্ত করেন। জগদীশের পুত্র রাধাকান্ত রায়, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি ও তৎপুত্রগণ জীবিত আছেন।

খানপুরের দাস চৌধুরী বংশ

পরগণা বাজু সোণাইতার অন্তর্গত খানপুরের দাস চৌধুরীগণও প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। খানপুরে ইঁহাদের ৮টি পরিবারে ৮টি বাড়ী ছিল; তাঁহারা সকলেই সাহসী ও বীরধর্ম্মী ছিলেন। বর্ত্তমানে উক্ত ৮টি বাড়ীর স্থলে ৩টি মাত্র বাড়ী আছে। চৌধুরী বংশে ইদানীং গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; ইনি নিজ গ্রামে সংস্কৃত টোল ও পাঠশালা এবং আলীপুর গ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। ইনি ছাতকের ইংলিশ কোম্পানীর সেরেস্তায় কাজ করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক তাহার সদ্ব্যয় করেন। ইঁহার পুত্রের নাম গিরীশচন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত গীষ্পতীকুমার চৌধুরী, এবং তত্রত্য পুরকায়স্থ বংশে শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র পুরকায়স্থ বর্ত্তমান আছেন।

১৫. এই লক্ষ্মণ শ্রী পরগণা নহে, একটি গ্রাম। পরগণা লক্ষ্মণশ্রী হইতে বিভিন্ন জ্ঞাপনার্থে "ইহাকে পুরাণা লক্ষ্মণশ্রী" বলা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়
মোসলমান বংশ কথা

পরগণা-নৈগাঙ্গ

চৌধুরী বংশ

নয়টি গাঙ্গ বা নদী এই স্থানে থাকায় উক্ত স্থানটি নৈগাঙ্গ নামে খ্যাত হইয়াছে। উক্ত নয়টি নদীর নাম এই–চামটী, দাড়াখাই, পুঠিয়া, ধুপাখাই, ছনচাতল, কামারখালী, মাগুড়চামটী, হেড়াচাপড়ি, ও সুরমা।

নৈগাঙ্গের হুসেনপুর ও শ্রীধর পাশার চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ আরবদেশীয় সদাগর মোহাম্মদ হেলিম। এই স্থান বহুপূর্ব্বে যে খাসিয়াদের অধিকারে ছিল, নদীগুলির নামের অনেকটিতে "খাই" শব্দ থাকায় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে; আবার "খাই" খালবাচকও বটে। যাই হউক, হেলিম খাসিয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া এস্থান অধিকার পূর্ব্বক বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার নামানুসারে তদীয় বসতিগ্রাম হেলিমপুর (হালিমপুর) নামে খ্যাত হয়।

হেলিম খাঁর দুই পুত্র–দৌলতখাঁ ও হুসেন খাঁ। পরবর্ত্তী সময়ে ইহার নিজ নামে যথাক্রমে দৌলতপুর ও হুসেনপুর নামে দুইটি গ্রাম স্থাপন করিয়া, সেই সেই গ্রামে গমন করেন। উত্তরকালে দৌলত খাঁর বংশীয়গণ শ্রীধরপাশায় গিয়া বাস করেন।

দৌলত খাঁর বংশে মহবৎ খাঁর উদ্ভব হয়, ইহার সময় হইতেই এই বংশে "কুরসী নামা"[১] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইনি শ্রীধরপুর হইতে জগদীশপুর গমন করেন। মহবত খাঁর পিতামহ আজমত খাঁর সময় বাণিয়াচঙ্গাধিপতি নৈগাঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন; অবশেষে ঐ বিষয়টি

---

১. নৈগাঙ্গের চৌধুরী বংশাবলীঃ–

(১) দৌলত খাঁর বংশধর, মহবত খাঁ (২) হুসেনখাঁর বংশধর, মোহাম্মদ হায়াত (১নং তাং)

- গুরমোহাম্মদ প্রভৃতি
  - জায়ফর মোহাম্মদ
  - মোহাম্মদ রজা (২নং তাং)
  - বদিউজ্জমান (৩নং তাং)
    - সফীউজ্জমান
      - ইমাম বখস
        - আলী বখস
          - কাদির মোহাম্মদ প্রভৃতি চারি ভ্রাতা
        - মসুদ বখস
- মোহাম্মদ বাখর (৪নং তাং)

- মোহাম্মদ বাসির
  - মোহাম্মদ সাদির
    - মোহাম্মদ কলিম
      - মোহাম্মদ নইম
  - মোহাম্মদ বাসির
    - নুরমোহাম্মদ
      - মোহাম্মদ মনসুর
        - মোহাম্মদ মুজাফর
          - মোহাম্মদ মবঃসর

মুর্শিদাবাদের দরবারে নিষ্পত্তি হয়। বিচারে চৌধুরী ছয়পণ এবং দেওয়ান দশপণ প্রাপ্ত হন। চৌধুরীর প্রাপ্ত ছয়পণ অংশ বাণিয়াচঙ্গাধিপতির অধিকার হইতে খালাস বা মুক্ত হওয়ায়, "খালিসা" নামে কথিত হইয়া থাকে। ইঁহার পৌত্রগণের নামে দশসনা তালুকের বন্দোবস্ত হয়। মহবতের ৩য় পৌত্র বদিউজ্জমার সময় তাঁর বাড়ী খাসিয়াগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

পরগণা-দু-হালিয়া

দেওয়ান বংশ

দু-হালিয়ার দেওয়ান বংশ অতি সম্মানিত ও প্রাচীন। বঙ্গাধিপতি হুসেনশাহের রাজত্বকালে শ্রীমন্তরায় নামে রাঢ়দেশের এক উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত হিন্দু দু-হালিয়াতে আগমন পূর্ব্বক ১৯৷৷০ ভূমি সমন্বিত এক খানে-বাড়ী প্রস্তুতক্রমে পানাইল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম নরোত্তম, তৎপুত্র পুরুষোত্তম, তাঁহার পুত্র জিতামৃত, তৎপুত্র শিবচন্দ্র, ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র ও যশমন্ত। তন্মধ্যে রাজেন্দ্রের ব্রজনাথ প্রভৃতি তিন পুত্র হয়, এবং যশমন্তের প্রেমনারায়ণ নামে একজন পুত্র ছিলেন।

১১২০ পরগণাতি সনে প্রেমনারায়ণ মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেওয়ান মোহাম্মদ ইসলাম চৌধুরী নামে খ্যাত হন। ইনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র প্রত্যেকে দু-হালিয়ার ।/৬৷৷= অংশ এবং ব্রজনাথের অপর ভ্রাতৃদ্বয় কালীরায় ও প্রয়াগরায়, ইঁহারা প্রত্যেকে অংশ৵১৩।-করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সকলেই দশসনা বন্দোবস্তের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

দেওয়ান ইসলাম চৌধুরীর পুত্রের নাম দেওয়ান মোহাম্মদ বাসির, তৎপুত্র মোহাম্মদ আশরফ, তৎপুত্র মোহাম্মদ আসগর; ইঁহার পুত্র সাধারণের হিতব্রতী দেওয়ান মোহাম্মদ আসক চৌধুরী জীবিত আছেন।

লক্ষ্মণশ্রীর দেওয়ান বংশ

লক্ষ্মণশ্রী পরগণার তেঘরিয়া গ্রামের দেওয়ান বংশীয়গণও বিশেষ বিখ্যাত। এই বংশের পূর্ব্ব বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে নাই; এই বংশেরও আদিপুরুষ হিন্দু ছিলেন। গৌরারঙ্গের চৌধুরী বংশীয় অনন্তরাম মোসলমান হইয়া মোহাম্মদ আয়েজদী নামে খ্যাত হন। ইনি স্বীয় ভ্রাতা হইতে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া স্বনামে এক খাল কাটান ও এক গ্রাম স্থাপন করেন; এই খাল ও গ্রাম "আয়েজদী খালী" নামে খ্যাত আছে। ইঁহার শেষ বংশীয় মোহাম্মদ আসিম চৌধুরী পরলোকগামী হইলে, তাঁহার স্ত্রীকে কৌড়িয়াবাসী আলীরজা চৌধুরী বিবাহ করিয়া পরগণা কৌড়িয়া হইতে লক্ষ্মণশ্রী আগমন করিয়াছিলেন; তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেওয়ান হাছনরজা চৌধুরী একজন স্বনাম খ্যাত পুরুষ।

সমাপ্তি

এই খণ্ডটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহার কারণ, আমরা সুনামগঞ্জের অতি অল্প সংখ্যক বংশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি; ব্রাহ্মণ বিভাগে একটিমাত্র অধ্যায়; ইহাতে শিক সোণাইতার চৌধুরী ও আচার্য্য বংশের বিবরণ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। তৎপর

আতুয়াজানের কাশ্যপ ও হাউলি সোণাইতার গর্গগোত্রীয়গণের এবং দুহালিয়ার বাৎস্যগণের সংবাদ ও নৈগাঙ্গের ব্রাহ্মণ বংশ কথা ও লক্ষ্মণশ্রীর এবং সুখাইড়ের ব্রাহ্মণবংশ সংবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধারণ বিভাগের ক্ষুদ্র দুইটি অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কেশবপুরের দত্তবংশের উল্লেখপূর্ব্বক পাইল গাওর চৌধুরী ও কুবাজপুরের চৌধুরীদের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর পরগণা পাগলার দামবংশের বিবরণসহ ঘোষ ও দেববংশের প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। ইহার পর সিংহচাপড়ের উমদের বংশোল্লেখপূর্ব্বক সুখাইড় পরগণার দাস জাতীয় চৌধুরী বংশের বিবরণ সহ বেহেলির পুরকায়স্থ বংশ, গৌরারঙ্গের চৌধুরী এবং খানপুরের চৌধুরীদের বংশকথা উল্লেখ করিয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নৈগাঙ্গের ও দু-হালিয়া এবং লক্ষ্মণশ্রীর মোসলমান দেওয়ান বংশীয়গণের সংক্ষিপ্ত কথার সহিত এ খণ্ড পরিসমাপ্ত করা গিয়াছে।

এই পাঁচ খণ্ডেই শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের তৃতীয়ভাগ বা বংশবৃত্তান্ত পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

তৃতীয় ভাগ

পরিশিষ্ট (ক)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ১ম অধ্যায়।)

বুরুঙ্গার রঙ্গদ বংশপত্র।

- মধুকর মিশ্র
  - কীর্ত্তিদমিশ্র
    - দিবাকর মিশ্র
  - রঙ্গদমিশ্র
    - প্রভাকর মিশ্র
      - মহেন্দ্রমিশ্র
        - শ্রীকর মিশ্র
          - শ্রীগবর্ভচিন্তামণি
            - হিরণ্যগর্ভ বিদ্যারত্ন
              - রাঘব বিদ্যানিধি
                - দুর্গাদাস চূড় মণি
                  - হরিহর তর্কপঞ্চানন
                    - রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কার
                      - গঙ্গারাম শিরোমণি
                        - গঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য
                        - রামরুদ্রতর্কালঙ্কার
                          - রামরত্ন ভট্টাচার্য্য (৫)
                            - উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
                          - রামনিধি
                            - রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
                        - রামপ্রসাদ (উদাসীন)
                      - রামসদয় ভট্টাচার্য্য
                        - গণেশ ভট্টাচার্য্য
                          - গঙ্গাধর সিদ্ধান্তরত্ন
                          - ত্রিপুরানাথ ভট্টাচার্য্য
                    - রামনিধি বাচস্পতি
                    - কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য
                      - রাজেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
                      - কুলচন্দ্র তর্কচূড়ামণি চূড়ামণি
                      - কৃষ্ণচন্দ্র
                      - রামেশ্বর
                        - রাধাকৃষ্ণ পঞ্চানন (১)
                          - মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
                      - কালীচন্দ্র
                        - দুর্গাগোবিন্দ (২)
                        - উমাকান্ত বিশারাদ (৩)
                          - হরিকান্ত বিশারদ
                            - হরেন্দ্রনাথ (দত্তর্ক)
                        - রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ (৪)
                - মহেশ্বর বিশারদ
        - ইন্দ্রকর
          - শ্রীনাথ
            - রামনাথ
              - রামসন্তোষ
                - প্রজাপতি
                  - (রেঙ্গা) রামকান্ত
                    - বিজয়রাম
                      - বিশ্বনাথ
                        - (ইন্দেশ্বর) রাধানাথ পুরকায়স্থ
        - দুর্গাবর
          - রামচন্দ্র
            - গোবিন্দ
              - রঘুনাথ
                - জয়রাম
                  - রামশরণ
                    - রাধাকান্ত
                      - জগন্নাথ পুরকায়স্থ
  - উপেন্দ্রমিশ্র*
    - কংসারি
    - পরমানন্দ
    - জগন্নাথ প্রভৃতি
      - শ্রীবিশ্বরূপ
      - বিশ্বম্ভর
        - শ্রীচৈতন্য দেব
  - কৃত্তিবাস
  - ফণী (সর্প)

খ পরিশিষ্ট দেখ।

(১) ইনি কাশীবাসী হন। (২) শেষ জীবনে কাশীবাসী হইয়া মন্ত্রজপ করিতে করিতে সজ্ঞানে কাশীপ্রাপ্ত হন। (৩) ইনি দেশে টোল স্থাপন করেন; ইঁহার চাত্রবর্গের অনেকেই খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। (৪) বিদ্যার্জ্জনে সম্মানিত হন ও নবদ্বীপেএক টোল স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বিশেষ খ্যাতি ভাজন হন। (৫) শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী প্রণেতা।

পরিশিষ্ট (খ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়।)

ঢাকাদক্ষিণের উপেন্দ্র বংশপত্র।

- মধুরকর (বুরুঙ্গা)
  - কীৰ্ত্তিদ
  - রঙ্গদ (১)
  - উপেন্দ্রমিশ্র (ঢাকা দক্ষিণ)
    - কংসারি
      - প্রাদ্যুম্ন মিশ্র (সন্ন্যাসী) (৬)
    - পরমানন্দ
      - রামরত্ন মিশ্র (৩)
        - নীলরত্ন (৪)
          - হিরণ্যগর্ভ (৫)
            - রামচন্দ্র মিশ্র
              - গঙ্গানন্দ (৭)
                - হরিনাথ ন্যায়বাগীশ
                  - রাধানাথ
                  - গোপীনাথ ন্যায়ভূষণ
                    - বিশ্বনাথ (খতুরাম)
                      - রামভদ্র
                        - মহেশ্বর মিশ্র
                          - কৃষ্ণগোবিন্দ বিদ্যারত্ন
                            - অরবিন্দ (উঃ বৃন্দাবন)
                              - বিজরা মোহন প্রভৃতি
                      - শুকদেব
                        - সদানন্দ
                          - কৃষ্ণানন্দ
                            - ঈশান (৩য় পুত্র)
                              - ইন্দ্রকুমার মিশ্র
                    - জানকীনাথ (১১)
                      - মাধবরাম তর্কচূড়ামণি
                        - জয়কৃষ্ণ
                          - শ্যামচরণ
                            - রামচরণ
                              - রামসদয় মিশ্র
              - কৃষ্ণজীবন (৮)
                - রামজীবন (৯)
                  - জগজ্জীবন (১০)
              - বিষ্ণুদাস
                - মথুরেশ
                  - রত্নেশ্বর
                    - রতিনাথ
                      - রামভদ্র
                        - গৌরীশঙ্কর
                          - জগন্নাথ
                            - তারানাথ
                      - কমলাকান্ত জনাবদার
                        - গৌরীকান্ত
                          - ত্রিলোচন
                            - রামদয়াল
                  - রূপেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন
                    - শিবরাম সার্ব্বভৌম
                      - বিজয়
                        - রতিকান্ত
                          - চন্দ্রকান্ত
                            - সারদাকান্ত
                      - রামজীবন
                        - তর্কসিদ্ধান্ত জনার্দ্দন
                          - যোগজীবন
                            - শচীনন্দন প্রভৃতি
                - শ্রীকৃষ্ণবিদ্যানিবাস
                  - রামনারায়ণ শিরোমণি
                    - পরশুরাম মিশ্র
                      - উদয়রাম মিশ্র
                        - রামশরণ
                          - রামগতি বিদ্যালঙ্কার
                            - রমনীমোহন তর্কালঙ্কার
                        - বিশ্বনাথ
                          - কৃষ্ণচন্দ্র
                            - দেবেন্দ্রচন্দ্র মিশ্র
    - জগন্নাথ (নবদ্বীপ)
      - শ্রীবিশ্বরূপ
      - শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র (শ্রীচৈতন্যদেব)
    - সর্ব্বেশ্বর
    - পদ্মনাভ
    - জনার্দ্দন
    - ত্রিলোকপ (২)
  - কৃত্তিবাস
  - ফণী (সর্প)

এ বংশপত্র নিম্নোক্ত তিনখানা বংশ তালিকা দৃষ্টে বিশুদ্ধ ভাবে লিখিত।

[ক] বৃন্দাবন মিশ্র দত্ত আদি তালিকা। [খ] সারদাকান্ত মিশ্রের প্রাচীন তালিকা। [গ] দেবেন্দ্রচন্দ্র মিশ্র দত্ত তালিকা।

[১] ক পরিশিষ্ট দেখ। [খ] শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ত্রৈলোক্যনাথ।

(৩) (৪) (৫) ব তালিকায় এই তিন নাম ছিল না। (বিশ্বকোষ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের বংশপত্র ক তালিকানুসারে লিখিত।) [৬] ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়াবলী প্রণেতা।

[৭] ক তালিকা মতে গঙ্গাদাস। [৮] [৯] ক তালিকায় এই নামদ্বয় নাই। খ, গ তালিকায় আছে।

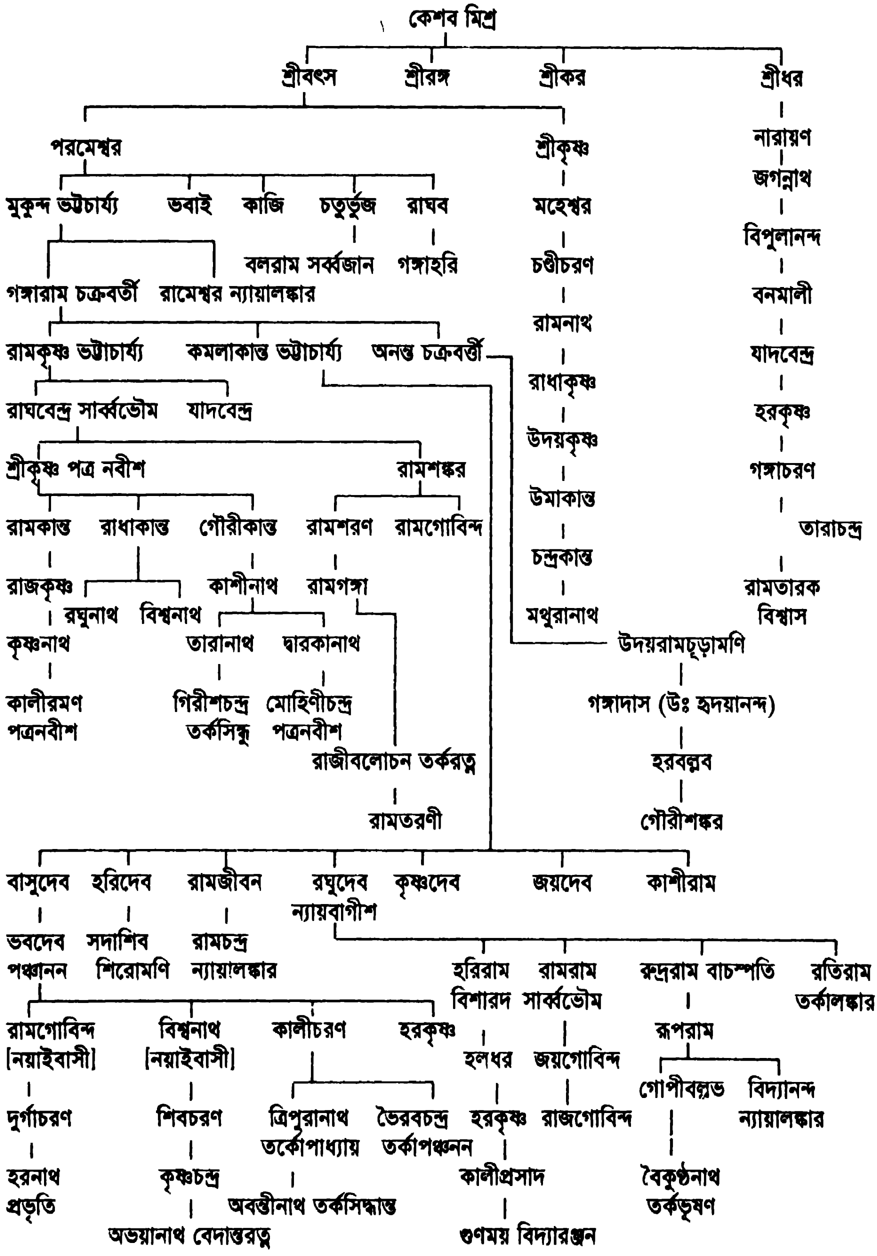
[১০] মনঃ সন্তোষনী রচয়িতা, ক তালিকায় ইহারও নাম নাই; খ, গ, তালিকায় আছে।

[১১] ক তালিকায় এই নামও নাই।

পরিশিষ্ট (গ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।)

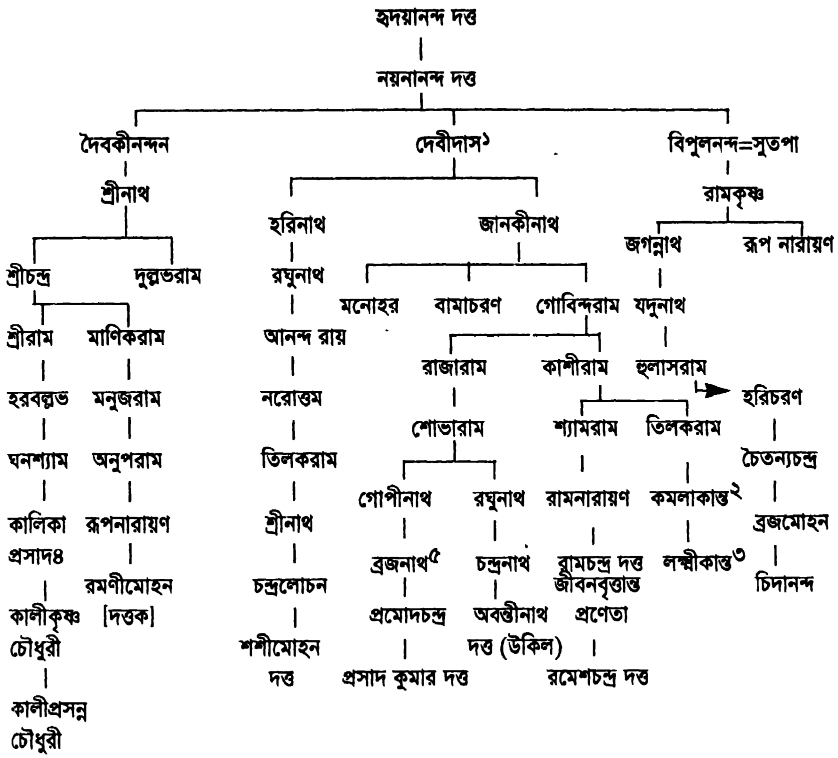
ঢাকাদক্ষিণের পত্রনবীশ বংশপত্র।



পরিশিষ্ট (ঘ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম অধ্যায়।)

ঢাকাদক্ষিণের দত্ত বংশপত্র।



এই দত্ত বংশ অতি বিস্তৃত, এস্থলে তিনটি শাখার অংশ বিশেস মাত্র উদ্ধৃত হইল।

(১) ইহার নামে দশসনা তালুক আছে।

(২) ইনি শ্রীহট্টে আমীনপদে ছিলেন।

(৩) ইনি মেদিনীপুর জেলায় আমীন ছিলেন।

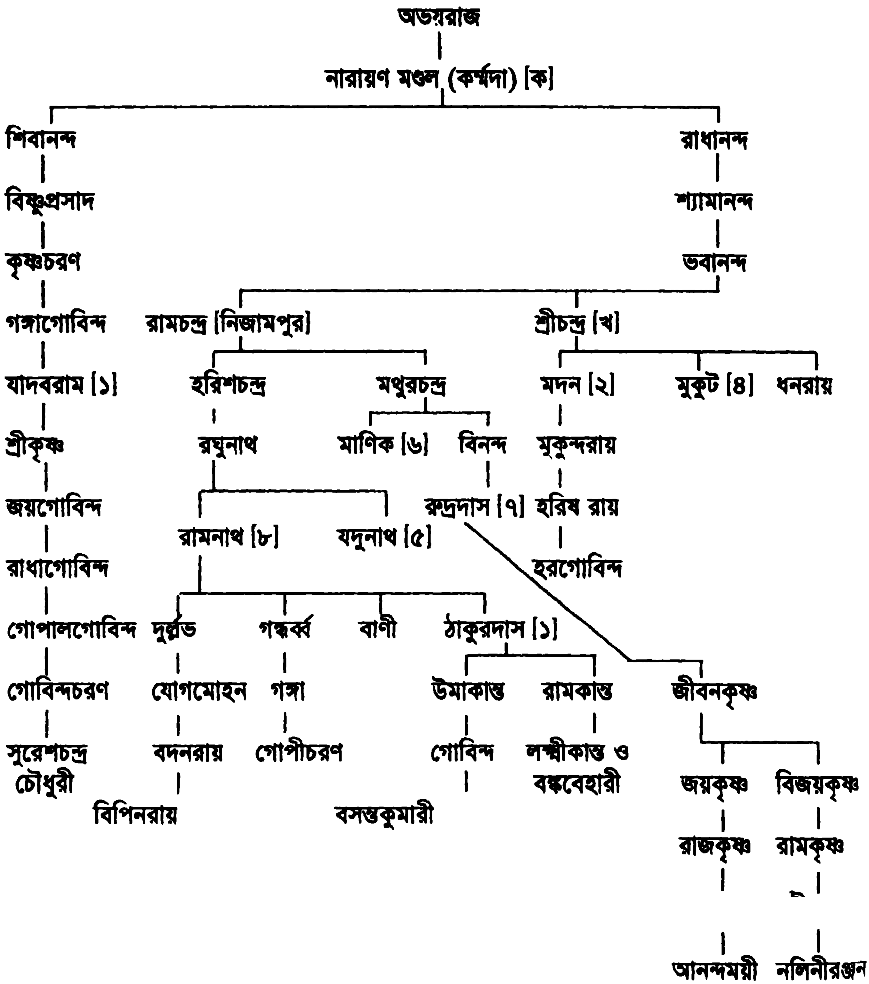
(৪) ইনি একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন।

(৫) জমিদারের নায়েব সদর-শ্রীহট্ট।

পরিশিষ্ট (ঙ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম অধ্যায় ।)

ইন্দানগরের চৌধুরী বংশ।



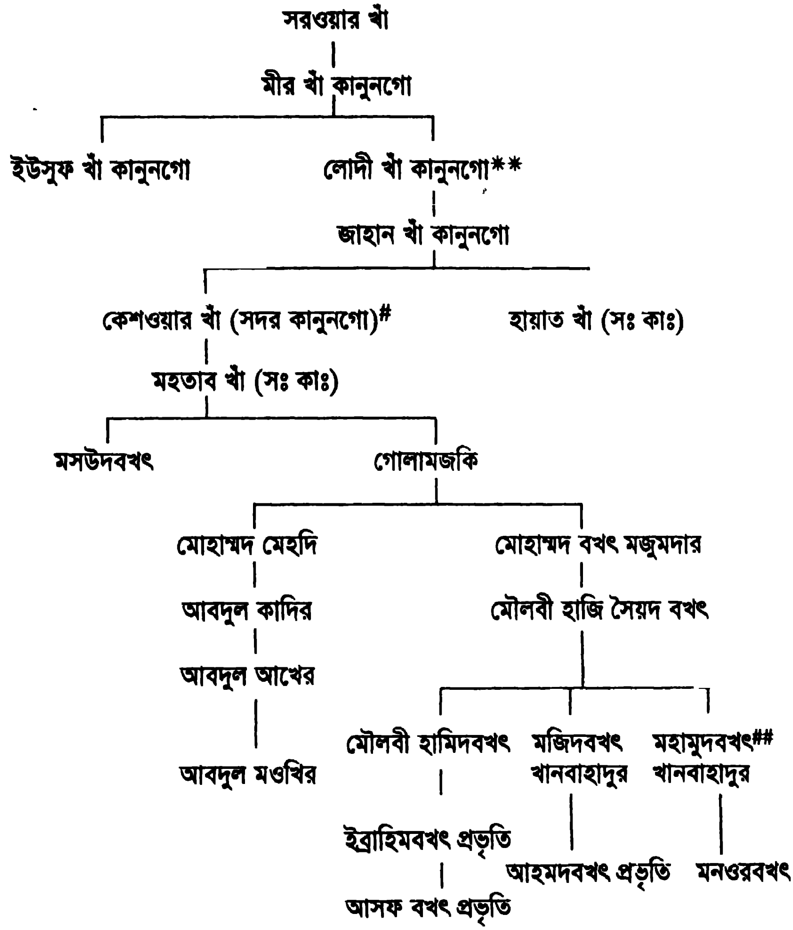
[ক] শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে এই বংশাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে; ইটার রাজবংশাবলীর সহিত এই বংশাবলীর পুরুষ সংখ্যার ঐক্য থাকা আবশ্যক; প্রকৃত পক্ষে তাহাই আছে।

[খ] ইহার রায় উপাধি ছিল। এই বংশীয়গণই পরগণার চৌধুরী, তত্রত্য ১নং হইতে ৯নং পর্য্যন্ত তালুকগুলি এই বংশীয়গণের নামেই বন্দোবস্ত হয়, যাঁহাদের নামে যে যে তালুক বন্দোবস্ত হয়, তাঁহাদের নামের পার্শ্বে [১] [২] [৩] ইত্যাদি ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইল। বর্ত্তমানে প্রথম শাখার উত্তরাধিকারী পরগণার প্রায় বার পণের মালিক।

পরিশিষ্ট (চ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়।)

গড়দুয়ারের মজুমদার বংশপত্র।



* এই বংশপত্রে কেবল প্রধান ব্যক্তিবর্গের নামই লিখিত হইল। এই বংশীয় ব্যক্তিবর্গ মধ্যে দীর্ঘজীবী পুরুষ সংখ্যা অধিক।

** ইহার সময় পর্য্যন্ত কানুনগোদের জিলা শাসনের ক্ষমতা ছিল। (আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ)

\# ইহার সময় হইতে কানুনগো পদের ক্ষমতা হ্রাস হয়, এবং এই বংশীয়গণ সদর কানুনগো নিযুক্ত হন।

\## ইনি দুইবার মক্কা গমন করিয়াছিলেন ও মক্কা সেরিফ কৌন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তুরস্কের সুলতান হইতে ৪র্থ গ্রেড "ষ্টার অব্ মেজিদি" উপাধি প্রাপ্ত হন।

পরিশিষ্ট (ছ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়।)

দরগা মহল্লার মুফতি বংশপত্র।

- খাজা বুরহান উদ্দীন কেতান
  - শাহজল্লাল উদ্দীন
    - মওলানা কামালউদ্দীন
      - মওলানা জিয়া উদ্দীন
        - মওলানা জামাল উদ্দীন
          - মওলানা শাহ ফতে মোহাম্মদ
            - মুফতি হাসন মোহাম্মদ
              - মুফতি মাং কাশিম
                - মাং হাজিম (নায়েব মোফতি)
              - মুফতি মাং আশিম
                - মুফতি মাং দাইম
                  - মাং হাতিম
                    - নজম উদ্দীন মোহাম্মদ
                      - জলাল উদ্দীন মোহাম্মদ
                        - আবদুল হক
                      - মাং আহমদ
                        - নসির উদ্দীন আহমদ প্রভৃতি
                      - আবদুল কাদির প্রভৃতি
                        - মাং বসির
                    - শমস উদ্দীন মোহাম্মদ
                      - নুরউদ্দীন মোহাম্মদ[১]
                        - আজহর উদ্দীন আহম্মদ[২]
                          - আবুল খয়ের রইসুদ্দীন
                  - মাং হাকিম
                  - মাং কাজিম
                  - মাং সালিম
                    - কাজি মাং হাসন
                      - মাং ইউনস
                        - নসিরউদ্দীন
                      - মাং ইউসুফ
                    - মাং হুসন
                - মাং কাইম
                  - গোলাম মহিউদ্দীন
                - মাং মনাইম o
              - শেক মাং কাজিম o
              - মৌলবী মাং আজিম o

(১) মিউনিসিপাল কমিশনার, শ্রীহট্ট।

(২) সব রিজেষ্টার।

পরিশিষ্ট (জ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায়।)

পঞ্চখণ্ডের স্বর্ণকৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশপত্র।

- জনার্দ্দন মিশ্র
- জগন্নাথমিশ্র
- জয়নারায়ণ
- সীতানাথ
- শ্রীনিবাস
- মহাদেব
- পুরুষোত্তম
- সীতরাম
- কুলপতি
- হরজয়
- বিশ্বময়
- কৃষ্ণগোবিন্দ
- হরিশঙ্কর
- গোবিন্দদাস
- মোহন
- বিহারী
- বিদ্যাপতি
- চন্দ্রশেখর
- রামপ্রসাদ
- শ্রীপতিবিদ্যার্ণব
- রাধাকৃষ্ণ
- রামজয়
- তারাপ্রসাদ
- গোকুলেশ
- গোবিন্দ বিশারদ
- ব্রজগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার
- বিজয়শঙ্কর
- মুকুন্দরাম ন্যায়বাগীশ
- রঘুনাথ তর্ক বাগীশ
- মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
  - রাঘব রাম
    - গঙ্গাধর
      - রূপেশ্বর — দুর্গাপ্রসাদ — রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত — রামনাথ নাথ তর্করত্ন — রজনী নাথ
      - হরিকান্ত — রত্নবল্লভ — রামগতি — রামকুমার — রমেশচন্দ্র
  - দামোদর
    - রামকৃষ্ণ
      - কমলাকান্ত
        - গোপীনাথ শিরোমণি — শিবচরণ — সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী
        - মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য — অভয়াচরণ ন্যায়ালঙ্কার

পরিশিষ্ট (ঝ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায়।)

সাম্প্রদায়িক কাত্যায়ন গোত্রীয় শ্রীধর বংশপত্র।

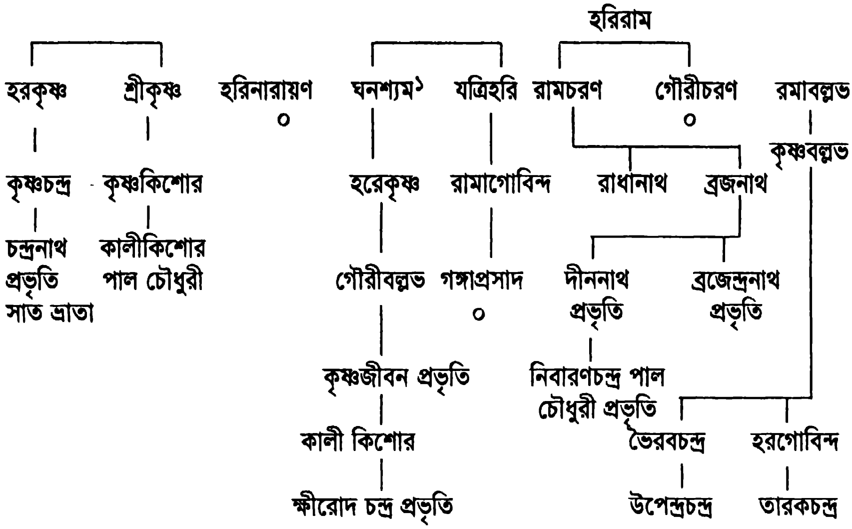
- শ্রীধরাচার্য্য
- শ্রীপতি
- শূলপাণি
- বেদগর্ভ
- শ্রীদত্তোপাধ্যায়
- হলধর
- গোবিন্দ
- শ্রীনন্দ
- গিরিধর
- কন্দর্প
- রামানুজ
- শ্রীনিবাস
- শশধর
- দিবাকর
  - বলভদ্রাচার্য্য
  - শ্রীগর্ভাচার্য্য
    - ভূধরাচার্য্য
      - বিভাকর
        - নীলকণ্ঠ
        - ভাস্করাচার্য্য
        - বৃহস্পতি
        - বিভাপতি
          - শ্রুতাচার্য্য
            - ঈশান
              - বিদ্যুন্মালী
                - হরিহরাচার্য্য
                  - রামকান্ত
                    - রামচন্দ্র
                    - গোবিন্দ
                      - রঘুপতি (ইটা)+
                        - রুদ্রপতি
                        - জয়কৃষ্ণ তর্কালঙ্কার
                        - রাধাকান্ত
                        - রামশরণ
                        - রাধাগোবিন্দ
                        - গোলোক চন্দ্র ন্যায়রত্ন
                        - রমেশচন্দ্র
                        - ব্রজেন্দ্রচন্দ্র
                      - রঘুনাথ শিরোমণি (নবদ্বীপ গমন)
                  - রঘুনাথ
              - রত্নগর্ভ
          - রামশঙ্কর (স্থানান্তরে গমন)
      - বিভাপতি

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ হইতে উদ্ধৃত।

\+ ইহার বংশাবলী ইটার বিবরণে উল্লেখিত হইবে বলিয়া এস্থলে মাত্র একটি শাখার পুরুষ সংখ্যা লিখিত হইল।

পরিশিষ্ট (এঃ)
(শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়।)
পঞ্চখণ্ডের পালবংশপত্র।

- কালিদাস পাল
  - হরধন পাল
    - হরপ্রসাদ
      - বারনসী পাল
      - বিশ্বনাথ
        - গৌরীচরণ
        - গৌরকিশোর
          - গঙ্গাধর
            - রাজা রামজীবন
            - রামেশ্বর
              - কামেশ্বর
                - কেশবরাম
                  - হরিশ্চন্দ্র
                    - জগজ্জীবন
                      - বিজয়রাম
                        - হরনাথ
                          - রামগোবিন্দ
                            - রামনাথ
                              - গোবিন্দ চন্দ্র
                                - রামনারায়ণ
                                  - রঘুনাথ
                                    - পীতাম্বর
                                      - চণ্ডীপ্রসাদ
                                  - হরিরায়
                                    - উদয়নারায়ণ
                                      - ভবানী নারায়ণ
                            - কামাখ্যা
                              - ব্রজেশ্বর
                                - বাণেশ্বর
                                  - ০
            - রাজ্যেশ্বর
              - তারানাথ
                - যাদবচন্দ্র
                  - জয়চন্দ্র
                  - কীর্ত্তিচন্দ্র
                  - শম্ভূচন্দ্র
                    - সদানন্দ
                      - কালীকৃষ্ণ
                        - নন্দকিশোর
                          - মাধবরাম
                            - গণেশ্বর
                              - রূপেশ্বর প্রভৃতি
                                - কালীরাম
                                  - রামকৃষ্ণ
                                    - রামধন
                                      - নরহরি
                  - গদাধর
                    - গঙ্গাধর
                      - রাধাকৃষ্ণ
                        - গণেশ
                          - রামচন্দ্র
                            - রামভদ্র
                              - রামরায়
                                - রুদ্ররাম
                                  - রঘুরাম
                                    - জয়হরি
                                      - মায়ারাম
                            - রত্নেশ্বর
                              - রুদ্রেশ্বর
                                - রামেশ্বর
                                  - রঘুনন্দন
                                    - রামশরণ
                                      - সম্পদরাম
                  - প্রতাপচন্দ্র (প্রচণ্ডখাঁ) মোসলমান
            - রত্নেশ্বর
          - শ্রীধর
      - রতিরাম



(১) এই শাখায় পুরুষ সংখ্যা ২৭শ চলিতেছে, অন্যান্য শাখায় ২৩/২৪শ পুরুষের অধিক দৃষ্ট হয় না।

পরিশিষ্ট (ট)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ১ম অধ্যায়।)

ছয়চিরি রাজা সুবিদনারায়ণের ভ্রাতৃবংশপত্র।*

বাংস্য আনন্দ হইতে ১৭শ পর্য্যায় নিধিপতি
- ভূধর
- কন্দর্প
- বৃহস্পতি
- লক্ষ্মীনাথ
- দেবচন্দ্র
- প্রভাকর
- শুভরাজ খাঁ

রাজা ভানুনারায়ণ
- রাজা সুবিদ নারায়ণ
- রামনারায়ণ
- ধর্ম্মনারায়ণ (রাজা)
  - লক্ষ্মীনারায়ণ ১।২।৩।৪
  - শিবনারায়ণ ১।২।৩
  - শ্রীপতিনারায়ণ ১।২।৩
  - চন্দ্রনারায়ণ ১।২।৩
  - মাধবরাম ১।২।৩।৪
  - গোপীনাথ ১।২।৩।৪
- বীরনারায়ণ
- রূপনারায়ণ

গোপীনাথ ১।২।৩।৪ (শুভরাজ খাঁ)
- বিপ্রহরি (রাজা)
- রামনারায়ণ
  - দর্পনারায়ণ → ভবাণীনারায়ণ → শিবনারায়ণ → দেবীপ্রসাদ → গুরুপ্রসাদ → সারদা প্রসাদ → অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী
  - গোবিন্দনারায়ণ (ক) → লক্ষ্মীনারায়ণ (উঃ বিজয়নারায়ণ) → জয়নারায়ণ
    - গঙ্গানারায়ণ → কমলনারায়ণ → সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
    - দুর্গানারায়ণ
    - সূর্য্যনারায়ণ → গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এল.এল.বি
      - ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
      - ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী
      - কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী বি.এল
- রমাবল্লভ → রত্নবল্লভ → জানকীবল্লভ (জ্যেষ্ঠ) → রাজবল্লভ (২য় পুত্র) → চন্দ্রবল্লভ (ঐ) → যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী
- রামচন্দ্র (নিরুদিষ্ট)

এই বংশ তালিকা চারিটি বিভিন্ন বংশ পত্রিকা হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, যে যে নামে যে তালিকা হইতে প্রাপ্ত, ১।২।৩।৪ ইত্যাদি সংখ্যা পার্শ্বে দিয়া, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা– ১নং। ১৯০৩ ইং শ্রীযুত দ্বারকানাথ চৌধুরী বি,এ; ই,এ,সি হইতে প্রাপ্ত তালিকার ১ চিহ্নিত সকল নাম আছে।

২নং। শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস উকীল হইতে প্রাপ্ত তালিকায় ২ চিহ্নিত সকল নাম আছে।

২নং খ। শ্রীযুক্ত রামকমল শাস্ত্রী প্রেরিত বংশ তালিকাটিও উকিল মহাশয় প্রদত্ত তালিকার অনুরূপ।

৩নং। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী (বরমচাল) প্রদত্ত তালিকায় ৩নং সকল নামই আছে।

৪নং। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী (বিষ্ণুপুর) প্রদত্ত তালিকায় ৪নং নামগুলিই আছে।

অচিহ্নিত পরবর্ত্তী নামগুলি সকল তালিকাতেই সমান।

(ক) ইঁহার নামে তালুক আছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশসনা বন্দোবস্ত কালে ইনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার অষ্টম পুরুষ উৰ্দ্ধ ধৰ্ম্মনারায়ণ, ২৩৩ বৎসর পূর্ব্বকার ধরিলেও ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ জীবিত ছিলেন বলা যাইতে পারে কি না বিবেচ্য।

পরিশিষ্ট (ঠ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ১ম অধ্যায়।)

বরমচাল–রাজা সুবিদনারায়ণের ভ্রাতৃ বংশপত্র।

- (রাজা) রামনারায়ণ (ব্রহ্মনারায়ণ)
  - প্রভাকর (রামচন্দ্র খাঁ)
    - হরিহর খাঁ
      - লক্ষ্মীনাথ
        - জিতামিত্র
          - জানকীনাথ
            - রামেশ্বর
              - মাধবরাম
              - রঘু বা রাঘব
                - গোবিন্দ জনাবদার (রামগোবিন্দ)
                  - বিশ্বনাথ ০
                - যোগমোহন প্রভৃতি
                  - বৈদ্যনাথ (কামদেব)
                    - কবি রাধানাথ
                      - দ্বারকানাথ চৌধুরী বি,এ,
    - রত্নাচার্য্য (ক)
    - পুরন্দর (খ)
  - বিভাকর (বিভাপতি খাঁ)
    - গৌরপতি খাঁ
      - হরিপতি খাঁ
        - শ্রীপতি
          - চন্দ্রাপতি
            - রামনাথ
              - রামজীবন
                - রামেশ্বর জনাবদার
                  - কুমুদচন্দ্র
                - শ্রীচন্দ্র
                  - গঙ্গানারায়ণ (রামচন্দ্র)
                    - কমলনারায়ণ (কীর্ত্তিচন্দ্র)
                      - কৃষ্ণজীবন [শ্রীনাথ]
                        - কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি
            - রামগোপাল
              - রামকেশব
                - রামনাথ
                  - রামকৃষ্ণ রায়
                    - খুসিনারায়ণ
                      - রাধাগোবিন্দ
                        - রামসুন্দর ০
                - হরিশ্চন্দ্র ০
            - আনন্দরাম
              - রাজীবরাম
                - শ্যামরায়
                  - হরকৃষ্ণ
                    - ঈশ্বরচন্দ্র ০

সিঙ্গুরগ্রাম নিবাসী

(ক) রত্নাচার্য্য (বংশের একটি ধারা)

- রাঘবেন্দ্র
  - মুকুন্দরাম শিকদার
    - রাজারাম শিকদার
      - বিশ্বরূপ শিকদার

উত্তরভাগ নিবাসী

(খ) পুরন্দর (বংশের একটি ধারা)

- বিশ্বরূপ
  - বিশ্বনাথ
    - দুর্ল্লভরাম
      - রামেশ্বর

হরিনাথ [মথুরানাথ]
- রামকৃষ্ণ
- রামনাথ
- রামশরণ
- শম্ভুনাথ
- ব্রজনাথ
- যোগেন্দ্র শিকদার

রামকান্ত [ইঁহার বংশ বহুবিস্তৃত]

তিলকরাম
- কৃষ্ণবল্লভ
  - রত্নবল্লভ
  - রঘুনাথ
  - লক্ষ্মীকান্ত [সর্ব্ব কনিষ্ঠ]
  - তারাকিঙ্কর
  - রামকিঙ্কর
  - রামধন ভট্টাচার্য্য
- গৌরীবল্লভ

পরিশিষ্ট (ড)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়।)

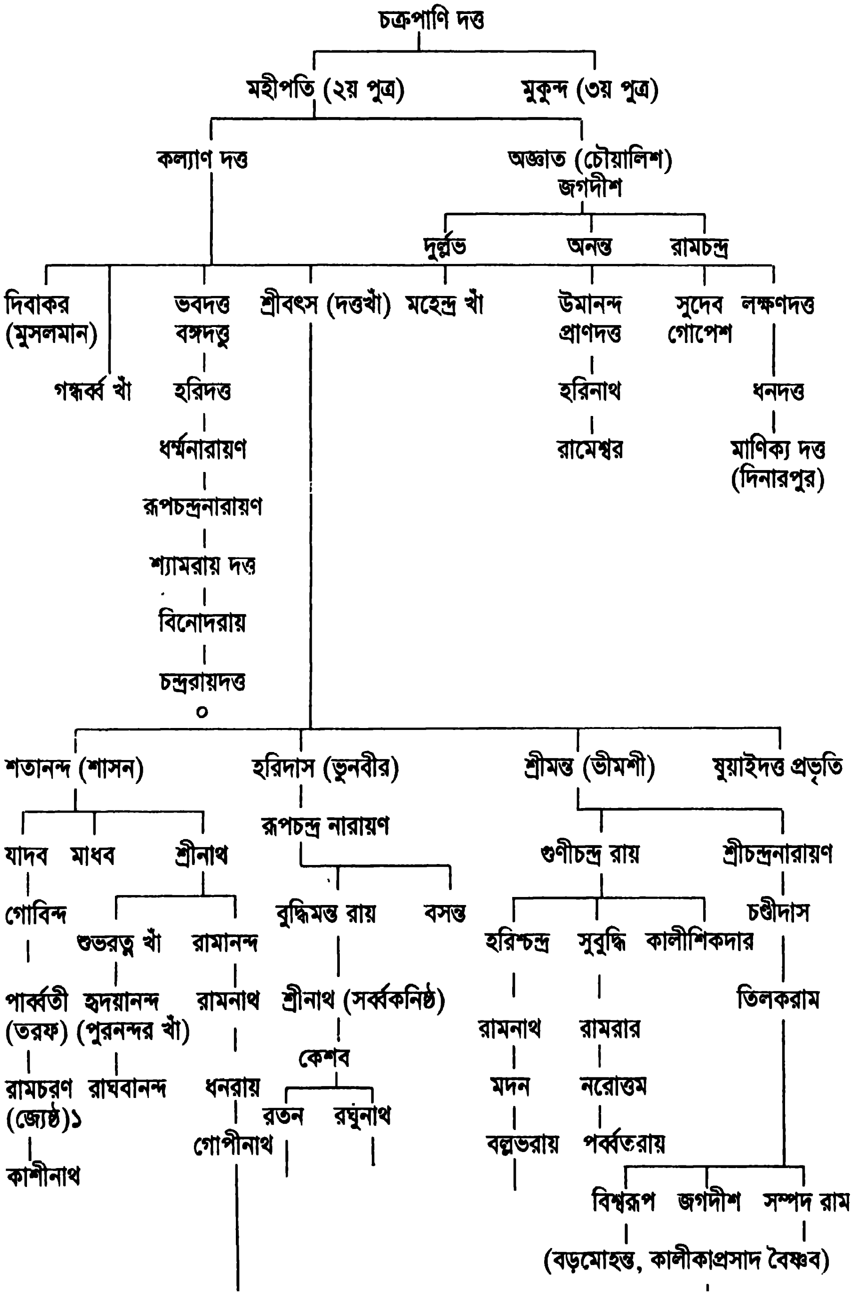
পরাশর গোত্রীয় পুরুষোত্তম বংশপত্র।*

পুরুষোত্তম — পরম — পশুপতি — উমাপতি — শশধর — শ্রীহরি — ভূধর — গুণাকর — যদুপতি — রাঘব — শঙ্কর — হরিহর — বিশ্বপতি — শ্রীধর — কন্দর্প — হলধর — শ্রীচন্দ্র — রামরাম বাচস্পতি — কৃষ্ণকান্ত — শ্রীকণ্ঠ — শ্রীনাথ — পুষ্কর (বিশ্বপতি)+ — রাঘব (রঘুপতি) — নীলকণ্ঠ (যদুপতি) — পুরুষোত্তম (কেশবরাম) — রাঘবেন্দ্র (শঙ্কর) — বাহুমিশ্র (শিবরাম) — শঙ্করাচার্য্য (সদাশিব) — গোপীনাথ (রাজ্যেশ্বর) — রুদ্রপতি (রামরাম) — রমাপতি

- রমাপতি
  - রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার (কাছাড়ী) — রামবল্লভ — কৃষ্ণদেব — কৃষ্ণকিঙ্কর — কৃষ্ণমোহন — বিরজানাথ
  - শ্রীকৃষ্ণ
    - রামচন্দ্র
      - সদাশিব — শ্যামানন্দ
        - উমাকান্ত শিরোমণি
        - কৃষ্ণগোবিন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ — রমণীমোহন — ক্ষত্রমোহন ভট্টাচার্য্য
      - সদানন্দ — সদানন্দ
        - শিবানন্দ বিদ্যাবাগীশ
        - কৃষ্ণচরণ — কালীচন্দ্র — মহেন্দ্রচন্দ্র
    - বিজয়কৃষ্ণ (পরে সন্ন্যাসী) — রাজকৃষ্ণ — রঘুনাথ বাচস্পতি — ০
  - মুকুন্দ বিশারদ — ০
  - রমানাথ (দেবীপুর)
    - রতিকান্ত — শিবচরণ বিদ্যানিবাস — রামলোচন — কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর
    - রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশ — রামপ্রসাদ — গঙ্গাপ্রসাদ — লোকেশ — গিরীশচন্দ্র — গোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রামকমল শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত বংশপত্র। + স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে প্রাপ্ত বংশাবলীতে শ্রীকণ্ঠের পরবর্ত্তী ৯ পুরুষের নাম ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। () চিহ্ন মধ্যে উহা প্রদত্ত হইল।

পরিশিষ্ট (ঢ)
(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়।)
সাতগাঁর দত্ত বংশপত্র।



বিষ্ণুপ্রসাদ (মিরাশী) → শ্রীকৃষ্ণ / হরেকৃষ্ণ → কালীচরণ (৩য় পুত্র) → ভারতচন্দ্র → প্রমোদচন্দ্র দত্ত বি,এল, / ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত

রাধাবল্লভ প্রভৃতি

রামজীবন (জ্যেষ্ঠ) → রাজবল্লভ (৩য় পুত্র) → কৃষ্ণবল্লভ (২য় পুত্র) → কালীকুমারদত্ত

সর্ব্বানন্দ → সম্ভুনাথ → চন্দ্রনাথ → শশীভূষণ → সূর্য্যকুমার দত্ত

বৈষ্ণব রূপরায় → নরহরি (বৈষ্ণব)

গোলাব রাম → গোপীকিশোর → যুগল কিশোর → মৃত্যুঞ্জয় → মদনচন্দ্র প্রভৃতি

এই দত্তবংশাবলী বহুবিস্তৃত, এস্থলে সংক্ষিপ্তভাবে একটি শাখার এক একটি ধারা মাত্র উল্লেখিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (ণ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।)

- আদিসেন
  - ভাস্কর সেন
    - শ্রীবৎস সেন
      - শ্রীপতি সেন
        - অর্জ্জুন সেন
          - দেবীবর সেন (জয়পুর)
            - নরহরি সরকার
              - রাঘবানন্দ (তুঙ্গেশ্বর)
                - রঘুনাথ [আঠালিয়া]
                  - যদুনাথ
                    - গোকুলানন্দ
                      - গৌরীনন্দন
                        - রাজকৃষ্ণ
                          - কালীকৃষ্ণ
                            - হৃদয়কৃষ্ণ
                              - শশিভূষণ সেন মজুমদার
                              - মনোরঞ্জন সেন মজুমদার
                - শ্রীনাথ [তুঙ্গেশ্বর]
                  - কাশীনাথ
                    - হরগোবিন্দ
                      - রামেশ্বর
                        - রামশরণ
                        - নবকিশোর
                        - শ্রীকৃষ্ণ
                        - হরিশরণ সেন
                          - শম্ভুচন্দ্র
                          - ভৈরবচন্দ্র
                            - গিরীশচন্দ্র
                              - শ্রীচন্দ্র সেন মজুমদার
                            - নবীনচন্দ্র
                              - নীরদচন্দ্র সেন মজুমদার
                            - ঈশানচন্দ্র
                            - কৈলাসচন্দ্র
                          - গোলকচন্দ্র
                          - শিবচন্দ্র
                            - মহেশচন্দ্র
                              - জগদীশচন্দ্র
                        - শ্রীপ্রসাদ
            - কংসারি দস্তিদার
            - কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস
            - কাশীনাথ নিয়োগী
              - পূর্ণানন্দ (জয়পুর)
                - কন্দর্প
                  - রামেশ্বর
                    - হরিনাথ
                      - জয়গোবিন্দ
                        - হরিহর
                          - জগন্নাথ গৌরীকান্ত
                            - কৃষ্ণপ্রসাদ
                              - শিবপ্রসাদ
                                - পার্ব্বতীচরণ
                                  - তারিণীচরণ সেন মজুমদার
                              - রাজকৃষ্ণ
                                - কাশীনাথ
                                  - চন্দ্রনাথ
                                    - গিরীশচন্দ্র সেন মজুমদার
              - হৃদয়ানন্দ [ক]
  - পুষ্কর সেন

[ক] হৃদয়ানন্দ তুঙ্গেশ্বরবাসী হন। ইহার বংশাবলী এইঃ-

- হৃদয়ানন্দ
  - মদন
    - রামনারায়ণ
      - রামজীবন
        - গোপীনাথ
          - গোপীকৃষ্ণ
            - ব্রজকিশোর
              - তারাকিশোর
                - আনন্দ কিশোর সেন মজুমদার
            - শ্যাম কিশোর
              - বিশ্বেশ্বর
                - অশ্বিণীকুমার সেন মজুমদার
              - জগচ্চন্দ্র
                - যোগেশ্চন্দ্র সেন মজুমদার
            - নবকিশোর
              - শরচ্চন্দ্র সেন মজুমদার

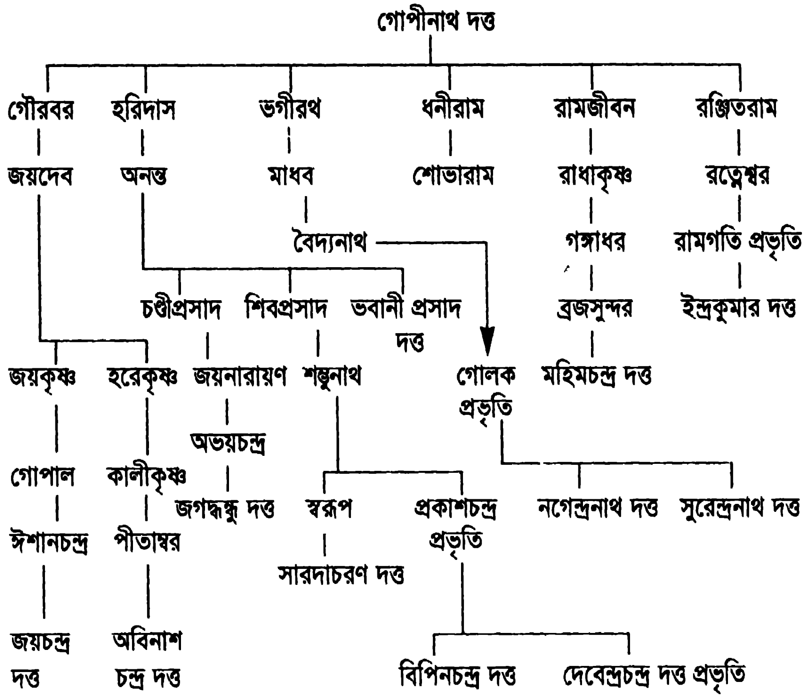
পরিশিষ্ট (ত)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৫ম অধ্যায়।)

লাখাইর দত্ত বংশপত্র।

- চক্রপাণি দত্ত
  - মহীপতি দত্ত
    - কল্যাণ দত্ত
      - দিবাকর (সালেমাহমুদ)
      - দত্তখান
      - বড় দত্তখান
        - চন্দ্র শেখর
          - অজ্ঞাত নাম পুত্রগণ
          - সানন্দরাম [লাখাই]
            - শিবানন্দ
            - বিপুলানন্দ
              - বলরাম
              - যশোমন্ত
              - কেশব
                - হরাই
                  - সোণারাম
                    - সুধারাম
                    - অক্ষয়
                      - আদিনাথ
                        - কালীনাথ দত্ত
                        - কেদারনাথ দত্ত
              - গঙ্গারাম
                - হরিদত্ত
                  - কুশলরাম
                    - সৃষ্টিধর
                      - কেবল
                - সন্তোষ
                  - হরিদত্ত
                    - আত্মারাম
                    - গঙ্গারাম
                      - গঙ্গাপ্রসাদ
                        - রামধন
                - বাসুদেব
                  - দুর্ল্লভ
                    - অনুপ
                      - জগন্নাথ
                        - গুরুদাস প্রভৃতি
                          - প্রসন্নকুমার দত্ত প্রভতি
                  - কৃষ্ণজীবন
                    - রাধাগোবিন্দ
                      - যুগলকিশোর
                        - জয়কিশো:
                          - নগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভতি
              - বাণীনাথ
              - গোপীনাথ [ক]
      - অন্যান্য সন্তানগণ

[ক] গোপীনাথ দত্তের বংশাবলী এইঃ-



+ ঠ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

✳ ইহাদের নামে যথাক্রমে দশসনা ১৩নং, ১৪নং, ১৫নং, ১৬নং, তালুক বন্দোবস্ত হয়।

+ ইহাদের নামেও তালুক (হালাবাদী?) আছে।

পরিশিষ্ট (থ)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৭ম অধ্যায়।)

তরফাদি স্থানের সৈয়দ বংশপত্র।

[শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড খ পরিশিষ্টের অপরাংশ]

- সৈয়দ শাহ নাসিরউদ্দীন
  - শাহ সিরাজ উদ্দীন
    - সৈয়দ মুসাফীর
      - খোদাবন্দ
      - ইসমাইল
        - সয়েস উদ্দীন (দাউদনগরের আদি)
        - বকরত
        - ইস্রাইল মুল্‌কউল্‌ উলামা
          - শাহ ইলিয়াস (কুতুবউল আউলিয়া)
            - শাহ তাহমস [শাহ খোন্দকার]
              - শাহ মোহাম্মদ
                - শাহ ফতু
                - সুলেমন
                - গদাহাসন
                  - সরফউদ্দীন
                    - আবুলহাসন
                      - আজগর হাসন
                        - কাজিনজমুল
                      - আকবর হাসন
                        - রজাউর
                    - সরবেহাসন
                      - হায়দর হাসন
                        - সুজাউল হাসন
                    - বদরউদ্দীন হাসন
                    - করার
                  - লোকমান
                - গিয়াস
                  - নিজাম উদ্দিন [মৌজাপুর]
                    - সমসউদ্দীন
                      - উমেদআলী
                        - করম আলী
                          - ওয়ারেশ আলী
                  - অজ্ঞাত [চাড়াভাঙ্গা]
                    - অজ্ঞাত
                      - পরাণ
                      - জাফর আলী
                        - নুর আলী
                  - নার [লাকুড়িপাড়া]
                    - শাহলাল
                      - শাহলাল
                        - হাফিজ
                          - ফয়েজ আলী
                - আলী
                - আবদুল্লা
                - কবির
                - হারুণ
              - শাহ মুসা [পৈল রাজবংশের আদি পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ খ পরিশিষ্ট দেখ]
            - মুজলা খোন্দকার [তরফ আউসপাড়া]
            - আবু সহিদ
            - বদর উদ্দিন
            - সালেহ মিয়া খোন্দকার [ত্রিপরা খান্দুড়া ও মৈয়মনসিংহের সিকন্দরনগর বংশ]
          - শাহ ইসমাইল (ত্রিপুরার গোকর্ণস্থ সৈয়দ বংশের আদি)
        - মিকায়েল (লস্করপুর ও সুলতানসী বংশের আদি)
        - জিবরাইল
      - সুলেমন
      - ইব্রাহিম
    - সৈয়দ শাহ ফকীর (রামশ্রী বংশের আদি)

হাসন | হাসন | সমসুল হাসন | কন্যা | ইন্দ্রাজ আলী

মহিউদ্দিন হাসন | আসাদুল হাসন | সবরুল হাসন | অনারেবল নবাব সৈয়দ সমসুলহুদা [গোকর্ণ] | বেলাই মিয়া

+ বেনাজিন হাসন | হাজি উবেদুল হাসন | আবদুল্লা মিয়া

গোয়াসুল হাসন | নরুল হাসন | সদরুল হাসন

হাজি সুলেমন হাসন | মজাফর হাসন | কুতুবুল হালসন | কন্যা

আমীন উদ্দীন হাসন | মমতাজুল হাসন | নসির উদ্দীন হাসন | আলিকুলহাসন | খান বাহাদুর মজিদ বখৎ মজুমদার [শ্রীহট্ট]

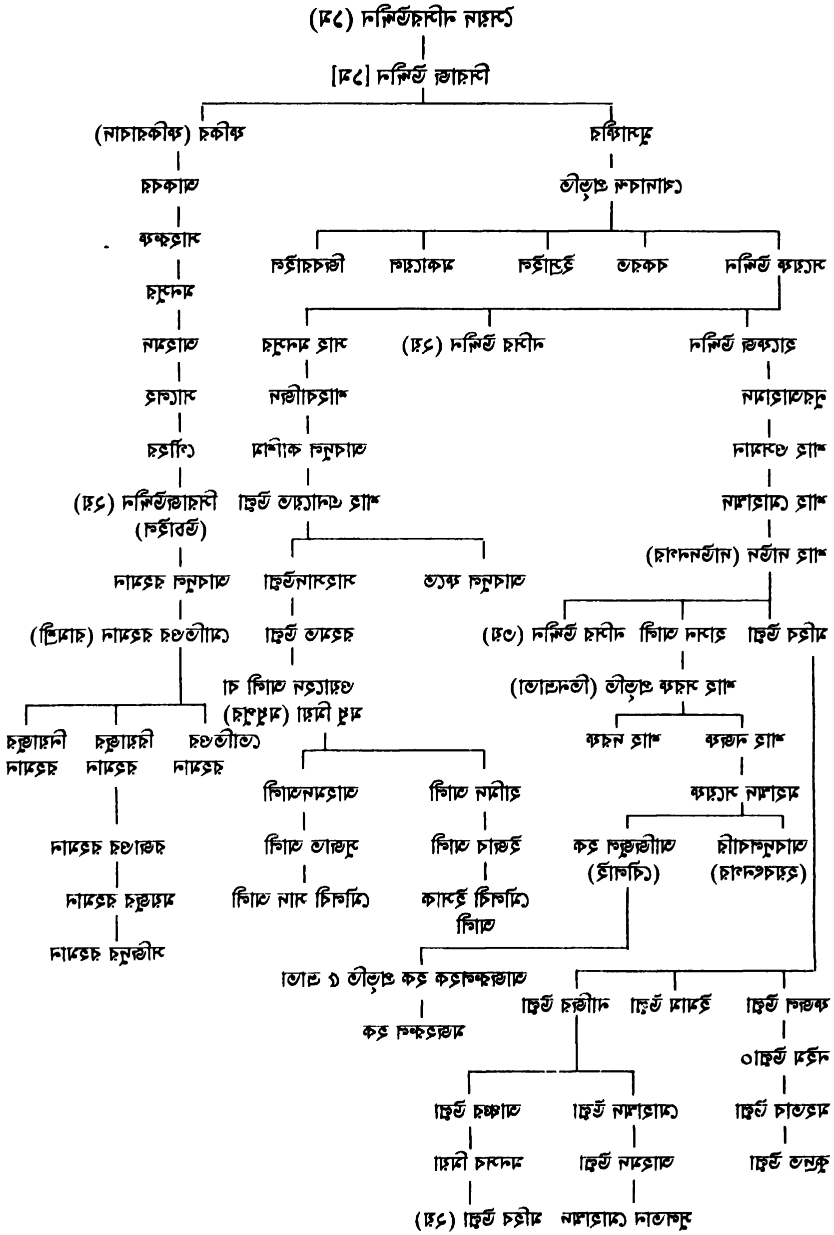
কন্যা | চাঁদ মিয়া | ময়েজউদ্দীন হাসন | হাজি জইদুল হাসন

+ ইনি কলিকাতার নবাব আবদুল লতিফ খাঁর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (ন)

[illegible]

[illegible]



পরিশিষ্ট (ধ)
বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৭ম অধ্যায়।
পারস্য সনদের ইংরাজি অনুবাদ

"Granted by the Emperor of Delhi.

This is the Sanad of Choudhuryee and Kanaguyee of Perganahs Satgaon and Balisira granted to Syed Riazur Rahman and Niazur Rahman on the 27th Safar 10th Julus

It is hereby made known to all the officers, Talugdars, tenants and cultivatior that Dhananjee and Paran kishen of Perganah Satgaon having fled away without payment of Shahi revenue, it this having become incumbert on the part of the Emperor to look after the Safety of the people, the officers of Kanangoe and Choudhury are conferred according to their prayer, on Syed Riazur Rahman and Syed Niazur Rahman who are also the Choudhury and Kanangoe of the Parganah Balisira.

1. Their duties and powers enumerated below :-
   - (i) They should try their utmost to discharge their duties.
   - (ii) They ought not to show any neglience but should act with vigilance and earefulness.
   - (iii) Their behaviour with tenants and other peoples should be Praise worthy amiable.
   - (iv) They should look to the increase of habitation.
   - (v) They should try their utmost that cultivation and revenue many increase.
   - (vi) They should carry on the administration in such a way that signs of prosperity and population may day by day appear.
   - (vii) They ought not to allow thieves and robbers to come within their boundary.
   - (viii) They high roads should be in such a state of safety their travellers may travel with perfect piece.
   - (ix) They should take care that theft and dacoity may not ocur.
   - (x) God forbid, if anybodys goods or treasures be robbed to plundered, the robbers should be detected and punished and things returned their legitimate owners.

In case robbers be not detected and things found out, they are to submit their resignation with all the state papers in their custody.

2. All the inhabitans of the porganahs ought to recognise the above mentioned gentlemen as the true Choudhury and Kanangoe in all the business of the Perganahs,
3. Taking this as the most urgent Takied on this head they ought to act accordingly,

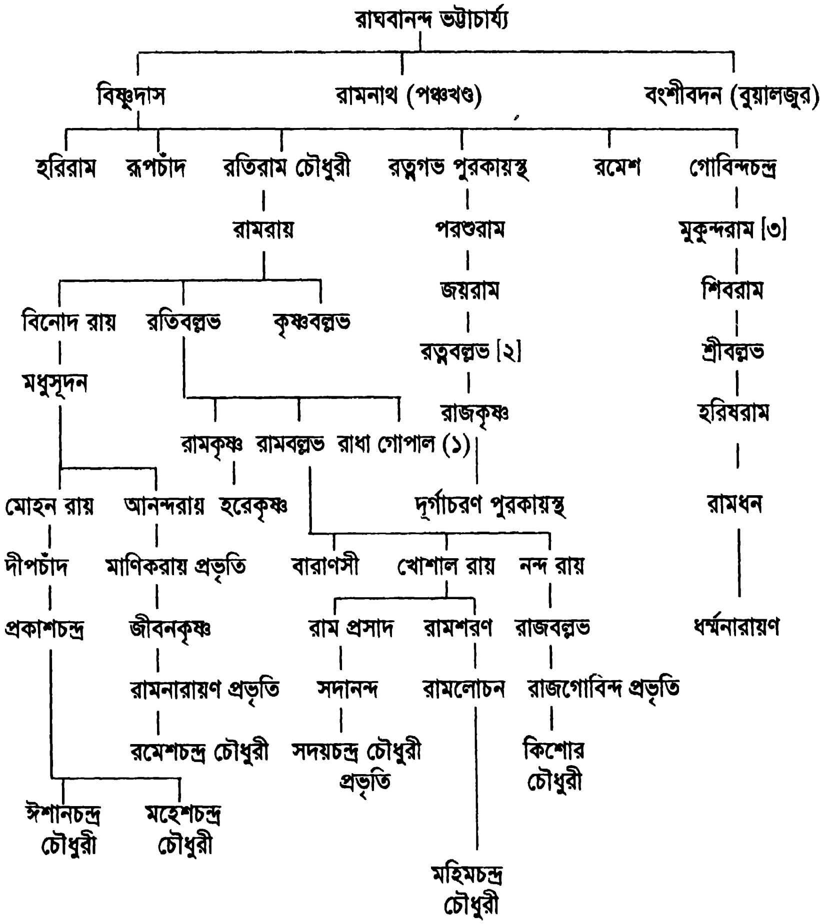
N. B. During the days of the Mughals of function of a Choudhury was collector of the state revenue.

N. B. A Kanangoe otherwise known as Karkun was just like a settlement officer.

পরিশিষ্ট (ন)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায়।)

সাচায়নির চৌধুরী বংশপত্র।

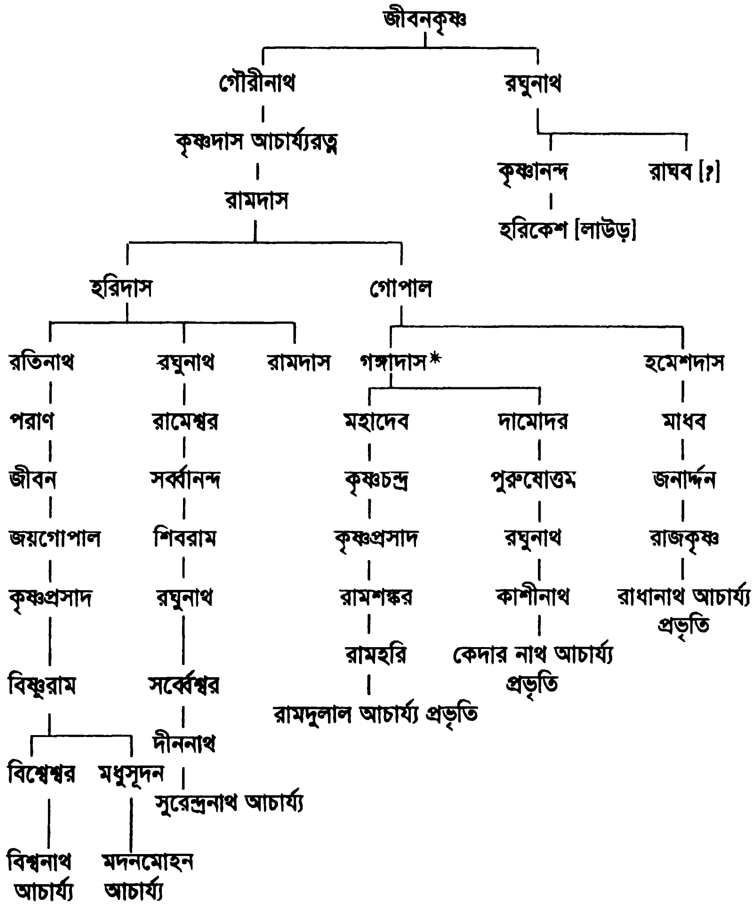


[১] ইহার নামে তত্রত্য ৪নং তালুক বন্দোবস্ত হয়।

[২] ইহার নামে তত্রত্য ৪০নং ঐ ঐ

[৩] ইহার নামে তত্রত্য ২০নং তালুকের বন্দোবস্ত হয়।

পরিশিষ্ট (প)
(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায়।)
শিবপুরের আচার্য্য বংশপত্র।



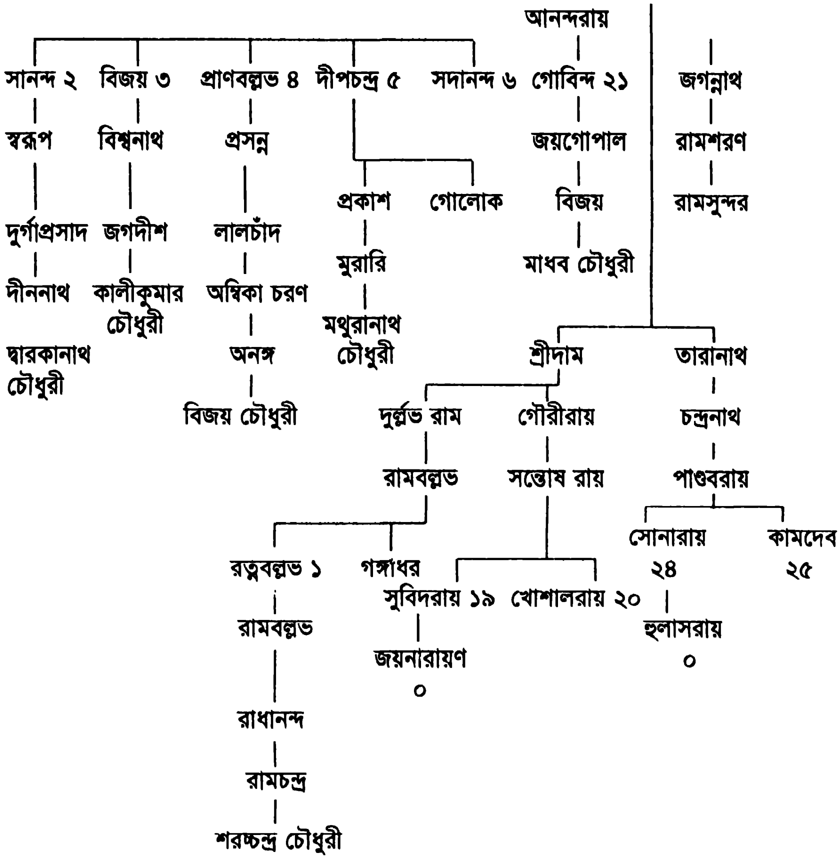
* ষ্টার চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের নামে দশসনা তালুক আছে।

পরিশিষ্ট (ফ)

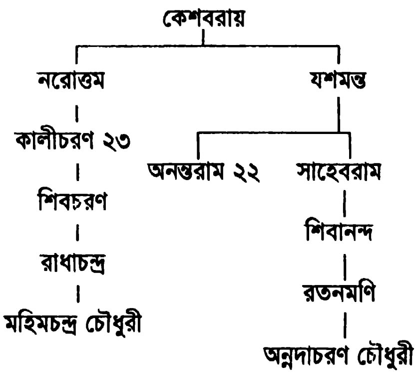
(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৫ম খণ্ড ২য় অধ্যায়।)

কুবাজপুরের চৌধুরী বংশপত্র।

- অজ্ঞাত
  - হরিরায়
    - বিষ্ণুরায়
      - ঈশ্বররায়
        - গঙ্গাধর
          - সন্তোষরায়
            - শ্যামনন্দ রায়
              - কৃষ্ণানন্দ রায়
                - পরমানন্দ রায়
                  - দুর্গানন্দরায়
                    - তারানন্দ
                      - রাধানন্দ
                        - ভবানন্দ
                          - দেবানন্দ
                            - ব্রাহ্মানন্দ
                              - হরিশ্চন্দ্র
                                - জয়চন্দ্র
                              - কেশব (ক)
                              - রসিক
                              - ধনরায়
                                - ভরতরায়
                          - কালারায়
                        - রাধানন্দ রায়
                          - গৌরীরায়
                            - গজেন্দ্ররায়
                              - রাধাকান্ত
                                - রামচন্দ্র
                                  - জুড়ারায় ১৭
                            - গোবিন্দ
                              - গোকুলচন্দ্র
                                - হরেকৃষ্ণ
                                  - হরগোবিন্দ ১৮
                  - রামশঙ্কর রায়
      - রামেশ্বর
  - ছিরিরায় (শ্রীরায়)
  - রামরায়



[ক] কেশবরায়ের বংশধারা যথাঃ–



দ্রষ্টব্যঃ– যে যে ব্যক্তির নামে তালুক বন্দোবস্ত হয়, তালুকের নম্বর তাঁহাদের নামে পশ্চাৎ দেওয়া গেল।

পরিশিষ্ট (ব)

(বংশ বৃত্তান্ত ৩য় ভাগ ৫ম খণ্ড ২য় অধ্যায়।)

বেহেলির বাদশাহী সনন্দ।

A Rough Translation of the Sand.

Seal of the Emperor Shah Mahamud

Shuja Bahadurshah Jahari year.

Where as the facts (circumstances) of Tilak Ram; resident of Pargana Laur; subdivision. Sylhet, were represented to His Gracious Majesty that from the time of his ancestors the here ditary estate (Miras) of Jagigalbari, e. g. marshy low-land (jhil) lake (bil) cultivated land and Jungle in Mauzas Beheli, Harihar pur; Rahimapur, Banirpur, (Baneswarpur). A head beheli, which constitute the revenue paying estate of the said Pargana, were granted to them (ancestors to Tilakram.) According to the Royal Farman 200 Kahans of couries has been fixed for Tilakram. That as the revenue of the said land was paid to Govt, from time of his ancestors, we grant the said land to him under the old settlement. It is necessary that the officers, present and appointed in future, should see to the carrying out of this Farman and know Tilakram as Zamindar He is also granted out of the said Mouzas one Keer of land rent free including the land on which the dwelling house is built.

Date 31st. year of the Reign year 1067 Hijiri.

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত

উত্তরাংশ

তৃতীয় ও চতুর্থভাগ।

শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি
ও
শ্রী বৈদ্যনাথ দে কর্ত্তৃক-

শিলচর
স্বরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত

সন ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

১৯১৭ সালে প্রকাশিত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ—এর আখ্যাপত্র

সূচিপত্র

চতুর্থ ভাগ

জীবন বৃত্তান্ত

অদ্বৈত-প্রভু

ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব জগতে বিখ্যাত অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের নবগ্রামে। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে অদ্বৈতের জন্ম হয়; তাঁহার পিতার নাম কুবেরাচার্য্য[১], এবং মাতার নাম লাভাদেবী। অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল-স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে "প্রভু" শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে অদ্বৈত প্রভুর কাহিনী স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে।[২]

অদ্বৈত শিশুকালাবধি মেধাবী ছিলেন। পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইত, তাহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা নবগ্রামের রাজপূজিত কালীদেবীর সম্মুখে বলি প্রদান হইতে দেখিয়া, কমলাক্ষ ব্যথিত হন। ছাগ শিশুর চীৎকার ও মৃত্যু যন্ত্রণা দৃষ্টে কমলাক্ষের কোমল চিত্তে অসহ্য ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তিনি তীব্রভাবে ইহার অবিধেয়তা সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে বলিতে মায়ের পূজাই হয় না। যিনি জগন্মাতা, তিনি সন্তান-শোণিত ব্যতীত কি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না?[৩] ভক্তিশ্রদ্ধাতেই মার আরাধনা সিদ্ধ হয়—বলিতে নহে। বলির অনুকূলে দুইচারিটি কথা বলিতে গিয়া কুবেরাচার্য্যকে শেষে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। কুবেরাচার্য্য পুত্রের প্রতিভা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষার্থে শান্তিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি দেশেই সাহিত্য ও অভিধান সমাধা করিয়াছিলেন; শান্তিপুরে গিয়া দর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

পুত্রকে বিদেশে বিদায় দিয়া পিতামাতা অত্যন্ত বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া পড়েন, তখন কোন প্রকারেই তাঁহারা আর দেশে তৃষ্টিতে না পারিয়া পুত্রের নিকট গমন করেন। সেই সময় কমলাক্ষের ষড় দর্শন সমাধা করিবার বড় বাকি ছিল না; পুত্রের এইরূপ কৃতিত্ব দর্শনে কুবের অতিশয় আনন্দিত হন।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানের বেদ অধ্যয়ন একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ কুবেরাচার্য্য বেদ অধ্যয়নের জন্য পুত্রকে আদেশ করেন।[৪] পিতৃ-আদেশে অদ্বৈত তখন বেদাধায়নে নিযুক্ত হন। শান্তিপুরের নিকটে অধুনালুপ্ত পূর্ণব্যাপ্তি নামক স্থানে শান্তদ্বিজের চতুষ্পাঠীতে তখন চারি বেদেরই অধ্যাপনা হইত; কমলাক্ষ উহার গৃহে গিয়া বেদ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন ও অল্পকাল

---

১. কুবেরাচার্য্য কাহিনী এবং নরসিংহ নাড়িয়াল কাহিনী পূর্ব্বাংশে দ্রষ্টব্য।

২. পূর্ব্বাংশে–১ম ভাঃ ৯ম অধ্যায় "পণাতীর্থ" প্রসঙ্গ এবং ২য় ভাঃ ৩য় খঃ ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এ স্থলে বহু বিস্তর অদ্বৈত-চরিত হইতে প্রধানতঃ শ্রীহট্ট সংসৃষ্ট এবং প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিই বর্ণিত হইতেছে।

৩. "প্রাণি হিংসাযজ্ঞে যেই হয় উল্লাসিত।
সে দেবীর উপাসনা না হয় উচিত॥
তেঁহো যদি জগন্মাতা জগৎ তার পুত্র।
সন্তান বধিতে কিবা আছে যুক্তি শাস্ত্র?"–অদ্বৈত প্রকাশ।

৪. "কুবের কহে পড় এবে বেদ চারি খান।
অবশ্য পাইবা তাহে ব্রহ্মানুসন্ধান॥"–অদ্বৈত প্রকাশ।

মধ্যেই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিপ্রভাবে সকলকে চমকিত করিলেন। তিনি একবার মাত্র যাহা অধ্যয়ন করিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না, এজন্য সকলে তাঁহাকে "শ্রুতিধর" বলিত। কিছুদিন মধ্যেই কমলাক্ষ বেদশাস্ত্রে উপযুক্ততা লাভ করিলে অধ্যাপক তাঁহাকে "বেদপঞ্চানন" উপাধি দিয়া বিদায় দিলেন।

এই সময় কুবেরাচার্য্যের গৃহে মাধবেন্দ্র পুরী নামক পরম পণ্ডিত এক যতী অতিথি রূপে আগমন করেন। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে জ্ঞান-চর্চ্চার বাহুল্য লক্ষিত হইত, ভক্তির আলোচনা বড় ছিল না, মাধবেন্দ্রই এদেশে ভক্তির বীজ স্থাপন করেন। অদ্বৈত গৃহাগত এই মাধবেন্দ্র পুরীর নিকটে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

তীর্থটান

অদ্বৈতের দীক্ষা গ্রহণের কিছুকাল পরে, নবতি বর্ষ বয়সে কুবের দেহত্যাগ করিলেন। অদ্বৈত-জননী পতিব্রতা নাভাদেবীর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ পতির অনুসরণ করিল, পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পরলোক গমন ঘটিল। লোকে ধন্য ধন্য করিয়া এক চিতাতেই উভয়ের দেহ অগ্নিসাৎ করিল। অদ্বৈত যথারীতি পিতৃকৃত্য সমাপনান্তর পিণ্ডদানোদ্দেশে গয়াধামে গমন করিলেন। গয়াতে বিষ্ণুপদে পিণ্ডসমর্পনান্তর তিনি তীর্থাটনে বহির্গত হইলেন। প্রথমেই তিনি রেমুণাতে গোপীনাথ দর্শন করিয়া নাভিগয়াতে গমন পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলেন। তথা হইতে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। জগন্নাথ দর্শনে তাঁহার যে অপূর্ব্ব ভাবোদয় হয়, বাল্যবধি যোগৈশ্বর্য্যশালী ও মুক্ত পুরুষ হইলেও, তাঁহার পক্ষেও ইঁহা অসাধারণ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে অনেকক্ষণ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে মূর্চ্ছা যে ভঙ্গ হইবে, ইহা কেহই মনে করিতে পারে নাই।

শ্রীক্ষেত্রে হইতে সেতুবন্ধ তীর্থ দর্শনোদ্দেশে দক্ষিণ মুখে তিনি যাত্রা করেন। দক্ষিণে কাঞ্চিপুর এক প্রধান তীর্থ,[৫] ইহার উত্তরাংশ শিবকাঞ্চী এবং দক্ষিণাংশ বিষ্ণুকাঞ্চী নামে খ্যাত, এতদ্দর্শনান্তে আরও দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী কাবেরী—তীরে তিনি উপস্থিত হন ও কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া দক্ষিণ মথুরা (মাদুরা) তীর্থে গমন করেন। তাহার পর অদ্বৈত সেতুবন্ধে উপনীত হন। লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে লক্ষণ ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সেতুর একটি স্থান ভাঙ্গিয়া দিলে, সেই স্থান ধনুতীর্থ নামে খ্যাত হয়, অদ্বৈত এস্থানেও স্নান করেন। তাহার পর তিনি রামেশ্বর শিব দর্শনে গমন করেন। রামেশ্বরে মধ্বাচারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। ইঁহাদের নিকট শাণ্ডিলা সূত্রে ও নারদ সূত্রে ভক্তিতত্ত্বব্যাখ্যা শ্রবণে তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন। এই স্থানে তিনি মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। অদ্বৈত "শ্রুতিধর" ছিলেন, শ্রবণ মাত্র যে কোন বিষয় আর ভুলিতেন না। তিনি তথায় কিছুদিন থাকিয়া এই শাস্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন।[৬] এইস্থানে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার সম্মিলন হয়। এই স্থান হইতে অদ্বৈত দণ্ডকারণ্যে (মহারাষ্ট্র দেশে) গমন করেন, তিনি নাসিক প্রভৃতি তদ্দেশীয় বহুতীর্থ দর্শনান্তে দ্বারকাধামে উপস্থিত হন। দ্বারকায় লক্ষ্মী-বাসুদেব দর্শন পূর্ব্বক তিনি প্রবাস ক্ষেত্রে গমন করেন; তথা হইতে পুষ্কর তীর্থ ও পুষ্কর হইতে কুরুক্ষেত্রে এবং তদনন্তর তদুত্তরদিগ্বর্ত্তী হরিদ্বারে গমন করেন। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া নরনারায়ণ দর্শন করেন।

---

৫. ইহা দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপুত জেলায় অবস্থিত, কাঞ্চিপুরের বর্ত্তমান নাম কাঞ্জিভেরাম।

৬. "শুনি মাত্র সব প্রভু কণ্ঠস্থ করিলা।
তাহা দেখি সাধুগণ বিস্ময় মানিলা।।—অদ্বৈত প্রকাশ

বদরিকাশ্রম হইতে অদ্বৈত গণ্ডকীস্নানে গমন করিয়াছিলেন, এই নদীর অপর নাম চক্রনদী; ইহা মুক্তিনাথ পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া হরিহর ছত্রের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই নদীস্থিত শিলাই শালগ্রামচক্র নামে খ্যাত। অদ্বৈত তথা হইতে একটি সুলক্ষণ সম্পন্ন শিলা লইয়া মিথিলায় আগমন করেন। সীতা দেবীর জন্মস্থান দর্শনে তাঁহার মনে নানা কথা জাগিতে লাগিল।

কবি-সম্মিলন

এমন সময়ে হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে অদূরে কাহারও কিন্নর নিন্দিত কণ্ঠে করুণ কৃষ্ণ-লীলা গীতি ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, মনঃপ্রাণ মুগ্ধকর সেই সুমধুর বিরহ-সঙ্গীত শ্রবণে অদ্বৈত অস্থির হইয়া সঙ্গীত-ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। এক নবীন বটবৃক্ষ মূলে ছায়া-তলে উপবিষ্ট একবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবভরে গান গাইতে ছিলেন। সে গানের কি মোহিনী শক্তি অদ্বৈত দৌড়িয়া গিয়া গায়ককে আলিঙ্গন করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন—"দ্বিজবর! এ অপূর্ব্ব সঙ্গীত কাহার রচিত? আপনিই কি লীলা সাগরে নিমগ্ন হইয়া এ রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন? এমন সঙ্গীত আর কোথায়ও শুনি নাই!"

এই যুবকের আলিঙ্গনে বৃদ্ধ গায়কের দেহ দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল, দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল; গায়ক বুঝিলেন যে, এ যুবক সামান্য নহেন; নতুবা তাঁহার স্পর্শে তাঁহার মনে সাত্ত্বিক ভাবোদয় কেন হইবে? তিনি যুবকের প্রতি আগ্রহ সহকারে চাহিলেন, আগ্রহ সহকারে প্রত্যুত্তরে বলিলেন "মহাশয়! আমার নাম বিদ্যাপতি, মিথিলার রাজান্নপুষ্ট রাজকবি বলিয়াই খ্যাতি বটে। এই সামান্য সঙ্গীত গুলি আমারই বাতুলতার পরিচায়ক।[৭]

এইরূপে অদ্বৈতের বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। কবি বিদ্যাপতি অতি দীর্ঘজীবী ব্যক্তি ছিলেন।[৮]

বিজয় পুরীর প্রসঙ্গ

অদ্বৈত মিথিলা হইতে অযোধ্যা ধামে গমন করেন, তার পরে কাশীধামে তাঁহার সম্মিলন ঘটে; এই সকল সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে একজনের নাম বিজয়পুরী। বিজয় পুরীর পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্টান্তর্গত লাউড়ে ছিল। অদ্বৈতের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যবহারিক সম্বন্ধ ছিল, পারমার্থিক সম্পর্কও ছিল। ইনি অদ্বৈত-জননী লাভাদেবীর পিতৃ-বংশের পুরোহিত-পুত্র ছিলেন এবং লাভা ইঁহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। ইনি লক্ষ্মীপতি সন্ন্যাসী হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও বিজয়পুরী নাম প্রাপ্ত হন।[৯] বিজয়পুরী সন্ন্যাসী হইলেও পরম ভক্ত ছিলেন, পূর্ব্বোক্ত মাধবেন্দ্রপুরী ইঁহার সতীর্থ

---

৭. দ্বিজ তব কিবা নাম শুনিতে মনে হয়; কাহার রচিত এই গীত সমুদয়?
রচনার মাধুর্য্য ঐছে নাহি শুমো আর; তায়ে স্বরালাপ হয় অতি চমৎকার।
এ হেন সঙ্গিত সুধা মোরে পিয়াইয়া। মত্ত করি এ স্থানে আনিলা আকর্ষিকা॥
বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি। রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত। সার গ্রাহী সাধু তুঁহ তেঁই ইথে প্রীত॥"
–অদ্বৈত প্রকাশ।

৮. বিদ্যাপতির প্রাপ্ত বীসপী গ্রামের দানপত্রে ২৯৩ লক্ষণাব্দ (১৪০১ খ্রীষ্টাব্দ) দৃষ্ট হয়। রাজা শিবসিংহের যৌবরাজ্যে থাকা কালেই ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি কৃত "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী" শিবসিংহের রাজত্ব কালে (১৪৪৭-১৪৫১ খৃঃ) রচিত হয়। এই সময় মধ্যে অদ্বৈত মিথিলায় গিয়া থাকিবেন এবং তখন উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। দেখাও যায় যে অদ্বৈত বিদ্যাপতির পদ গাইতে ভালবাসিতেন।

৯. "নাভাদেবী ভাই যারে বোলে সর্ব্বক্ষণ।
সে বিপ্র সন্ন্যাসী হৈল লক্ষ্মীপতি স্থানে।
বিজয়পুরী নাম তর সর্ব্বলোক শুনে॥"–প্রেম বিলাস।

ছিলেন।[১০] অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ সহকারে কৃষ্ণ কথা রসে তৎসহ নিশি অতিবাহিত করেন, তাহার পরদিন তিনি কাশী হইতে যাত্রা করিয়া প্রয়াগে উপস্থিত হন। তথায় ত্রিবেণীতে স্নান ও পিণ্ডদান এবং বেণীমাধব দর্শনান্তর তথা হইতে মথুরায় গমন করেন। মথুরায় যমুনা স্নান, আরতি দর্শন ও ধ্রুবঘাটে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক বৃন্দাবনে উপস্থিত হন।

মদন মোহন প্রকাশ

বৃন্দাবনে তিনি কয়েক দিন অবস্থিতি করেন। বৃন্দাবনে তখন প্রকৃতই বন মাত্র, তখন বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলাস্থল সকল বিলুপ্ত অপরিচিত হইয়া রহিয়াছে,—কোন তীর্থই প্রকাশিত হয় নাই; তখন তথায় কোন লোকালয়ও ছিল না। অদ্বৈত গোবর্দ্ধন দর্শনের পর এক বটবৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিলেন। অদ্বৈতের মনে কৃষ্ণলীলার নানা কথাই উত্থিত হইতে লাগিল, তিনি ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, নিদ্রিতাবস্থায়ও তাঁহার চিত্তে তাহাই উদিত হইতে লাগিল, তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। দেখিলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত; বলিতেছেন—"মদন মোহন নামে আমারই প্রাচীন এক প্রতিমূর্ত্তি ছিল,[১১] উহা দ্বাদশাদিত্য—তীর্থে নাতিগভীর ভূগর্ভে আছে, অদ্বৈত। তুমি উহা উদ্ধার কর।"

স্বপ্নটিকে অদ্বৈত মনের ভ্রান্তি বা অমূলক চিন্তা মাত্র বোধ না করিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং প্রভাতে গ্রাম্যলোক সমূহকে একত্রিত করিলেন। স্বপ্নের নির্দ্দেশানুসারে তিনি ব্রজবাসিগণ সহ দ্বাদশাদিত্যে গমন করিয়া, যমুনা তীরে একটি স্থানের বৃক্ষাদি কাটিয়া ভূমি খনন করিলে, যথার্থই অপূর্ব্ব এক কৃষ্ণমূর্ত্তি বাহির হইলেন। এই মূর্ত্তিই পরে মদন গোপাল নামে খ্যাত হন। অদ্বৈত এই মূর্ত্তি মথুরার জনৈক চৌবেকে প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন। এই মদনগোপালই পরে সনাতন গোস্বামী মথুরা হইতে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনের আদি মূর্ত্তির প্রকাশ শ্রীহট্টবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, ইহা বলা অন্যায় নহে।

তীর্থ পরিভ্রমণের পর অদ্বৈত যেমন শান্তিপুরে প্রত্যাগত হইলেন, অমনি জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু অদ্বৈত তীর্থ হইতে আসিয়াছেন, বৃথা বাদবিতণ্ডাতে বৃত হওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে, তথাপি বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইল; দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব অচিরেই খর্ব্ব হইয়া গেল; তিনি পরাজিত হইয়া তাঁহার ভক্তরূপে খ্যাত হইলেন; ইঁহার নাম শ্যামদাস।

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস

অতঃপর অদ্বৈতের মহিমার কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে লাগিল; এই সময়ে লাউড়ের রাজা দিব্যসিং কাশী গমন ব্যপদেশে শান্তিপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহার আর কাশী যাওয়া হইল না, অদ্বৈতের এক হুংকারে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত হন; লাউড়-বাসী বলিয়া শান্তিপুরে তিনি লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে সংজ্ঞিত হইতেন। তিনি অদ্বৈতের বাল্যলীলা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালার "বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলি রচনা করেন।[১২] কৃষ্ণদাস পরে শান্তিপুর হইতে

১০. "প্রেম গদ গদ দুর্ব্বাসা সাক্ষাৎ।
শ্রীমাধব পুরির সতীর্থ হয় যে বিখ্যাত॥"–অদ্বৈত মঙ্গল।

১১. শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকরাদি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১২ "কৃষ্ণদাস নাম তার অদ্বৈত রাখিলা।
অদ্বৈত চরিত কিছু তোঁহা প্রকাশিলা।"–অদ্বৈত প্রকাশ।

বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় বাস করেন, সেই স্থানে তিনি কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন নাই।[১৩] অতএব বৃন্দাবনে বাঙ্গালী সাধুগণের স্থায়ীরূপে বাস করার সূত্রপাত এই শ্রীহট্টবাসী কর্ত্তৃক হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। কৃষ্ণদাসের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।[১৪]

এই সময়ের অল্পপরে তাঁহার সহিত নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুহিতা শ্রীদেবী ও সীতাদেবীর বিবাহ হয়। অদ্বৈতের পাঁচ পুত্র,—যথা অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, স্বরূপ, জগদীশ ও বলরাম মিশ্র। ইঁহাদের বংশীয়গণ বঙ্গের নানাস্থানে "গোস্বামী" উপাধিতে খ্যাত হইয়া সসম্মানে বাস করিতেছেন।

প্রসিদ্ধ যবন হরিদাস অদ্বৈতের অতি অনুগত ছিলেন, তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে বাস করিতেন।[১৫] অদ্বৈতের শিষ্য সংখ্যা অনেক, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থে তাঁহাদের নামাবলী লিখিত আছে। কথিত আছে যে, আসামের শঙ্করদেব অদ্বৈতের শিষ্যরূপে কিছুকাল শান্তিপুরে ছিলেন।[১৬] অদ্বৈত প্রভুর শ্রীহট্টবাসী আর এক শিষ্যের সংবাদ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি "অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ" রচয়িতা ঈশান দাস। কামদেব নামক অদ্বৈতের অন্য এক শিষ্যের বংশবৃত্তান্তও আমরা ইতিপূর্ব্বে[১৭] বর্ণন করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাঁহার শিষ্য প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল।

অদ্বৈতের দুঃখ

অদ্বৈত যখন শান্তিপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনরূপ আলোচনা ছিল না, লোকের মতি ধর্ম্মের দিকে বড় ধাবিত হইত না। নবদ্বীপ শান্তিপুরাদি স্থানের ব্রাহ্মণবর্গ বিদ্যাচর্চ্চা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, সাধারণ লোকেরাও বিষয় ব্যাপারে নিবিষ্ট থাকিত, ধর্ম্মে কাহারই মতি ছিল না। লোকের নৈতিক অবনতি অবলোকনে অদ্বৈত অত্যন্ত আকুলিত হইতেন, অহরহঃ তিনি এই করিতেন যে, কিরূপে লোকের হিত হইবে—কিরূপে তাহাদের দুর্গতি দূর হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কখন কখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলোপ হইয়া যাইত, মন দৈববলে বলীয়ান হইয়া উঠিত, —নৈরাশ্য চলিয়া যাইত; আবিষ্ট ভাবে তদবস্থায় তিনি কখন কখন উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিতেন—দেশের এই দুর্গতি দূর করিতেই হইবে; যদি আবশ্যক হয়, ভগবানকে অবতীর্ণ করাইব, তাহা না হইলে আমার নাম মিথ্যা।[১৮] কিন্তু সাধারণ সময়ে সর্ব্বদাই তিনি দেশের নৈতিক অধোগতি লক্ষ্য করিয়া

১৩. "সভার প্রথমে ইহো বৃন্দাবনে গেলা।
বৃন্দাবন বাসী বলে সকলে বোয়িলা॥"–ঐ।

১৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৩য় খঃ ১ম অঃ ইহার বিস্তারিত কাহিনী দ্রষ্টব্য।

১৫. সাহিত্য মহারথ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষকৃত "হরিদাসের জীবন যজ্ঞ" এবং আমাদের প্রকাশিত "শ্রীমৎ হরিদাস–চরিত" গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

১৬. প্রেম বিলাসে লিখিত আছে যে অদ্বৈতের প্রচারিত জ্ঞানবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় শঙ্কর প্রভৃত শিষ্যগণ "ত্যাগী" ও দেশান্তরী হন;–"ত্যাগী হইয়া তারা দেশান্তরে গেল।"

১৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাঃ ১ম খঃ ৫ম অঃ দেখুন।

১৮. "স্বভাবে অদ্বৈত বড় করুণ হৃদয়। জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার। তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে শ্রীদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি। বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও হেথাঞি॥"
–শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

হরিদাসাদির সহিত ক্রন্দন করিতেন।[১৯] লোকের পাপাশক্তি দৃষ্টে যাঁহাদের অন্তরে দাহ উপস্থিত হয়, নয়নে জল ঝরিতে থাকে, তাঁহাদের দুঃখ দূর করা লোকের সুসাধ্য নহে। অদ্বৈত নিরুপায় হইয়া ভাবিলেন যে, লোকের আন্তরিক অশান্তি, লোকের দুর্গতি ভগবৎ শক্তি ব্যতীত দূর করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই। কিন্তু ভগবান তাঁহার প্রার্থনা শুনিবেন কেন?

একদা শাস্ত্রান্বেষণে তিনি একটি শ্লোক দেখিতে পাইলেন, শ্লোকটির মর্ম্ম এই, যে কেহ তুলসীমঞ্জরী ভক্তিভরে হরিচরণে সমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহার সঙ্কল্প পূরণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাস করিয়া তিনি এই সঙ্কল্প আবির্ভূত হইয়া সমস্ত পতিত জনের উদ্ধার করেন।[২০]

একটি নিভৃত স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক নিয়ত নিয়মিত রূপে কিছুদিন সেবা করিলে, সহসা তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন ও তথায় সাময়িক ভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত নবদ্বীপে

অদ্বৈতের এই যে জীব দুঃখ কাতরতা এবং জীব-দুঃখ দূর করিবার জন্য দুর্জ্জয় তপস্যা, ইহা দুর্ল্লভ পদার্থ। নিজের মুক্তি কামনায় অনেকেই তপস্যা করেন কিন্তু পরের মুক্তির তরে তপশ্চার্য্যা দুর্ল্লভ। অদ্বৈতের বিশ্বাসও দুর্ল্লভ, আর তাহার সফলতাও অসামান্য। নবদ্বীপ আসিয়া অদ্বৈত নিজ গৃহে গীতা ও ভগবতের ভক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই একজন করিয়া নাগরিক তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতেন। এইরূপে নবদ্বীপে একটি আদিবৈষ্ণব সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভায় নবদ্বীপ-প্রবাসী শ্রীহট্টের শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, চন্দ্রশেখর, মুরারিগুপ্ত, জগদীশ প্রভৃতি একত্রিত হইতেন। শ্রীহট্টের জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপও আসিতেন ও অদ্বৈতের ব্যাখ্যান শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।[২১]

অদ্বৈতের এই কাণ্ড দর্শনে পণ্ডিতবর্গ অবজ্ঞার হাসি হাসিতেন, কিন্তু অদ্বৈতের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, তদীয় বাক্যের দৃঢ়তা ও জীবনের লক্ষ্য বিচার করিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া যাইতেন। যাহা হউক, নবদ্বীপে অদ্বৈতের অনুরাগীর দল ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যে বিশাল ভক্তি-প্রবাহে একদিন শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে স্রোত গৌড় বঙ্গ আপ্লাবিত করিয়া সাগর তীরে পৌঁছিয়াছিল, তাহার উৎপত্তি ভূমি এই অদ্বৈত সভা বলা যাইতে পার। অদ্বৈতের আরাধনার ফল তাঁহার নবদ্বীপ আগমনের কিছু কাল পরেই তিনি প্রাপ্ত হন; তাঁহার বৈষ্ণব সভা সংস্থাপনের—তাঁহার গীতা ও ভাগবত বিচারের ফল কিছুকাল পরেই তিনি প্রাপ্ত হন। জগন্নাথ মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বম্ভর মিশ্র-যিনি শ্রীমহাপ্রভু অথবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পশ্চাৎ খ্যাত হন, তাঁহার আবির্ভাবেই অদ্বৈতের মনোরথ পূর্ণ হয়। উপসংহারে আমরা তাঁহার অমৃত-বর্ষী লীলাকথা প্রকীর্ত্তনে লেখনী পবিত্র করিব।

নানা দিদ্দেশ হইতে স্রোতস্বতী সমূহ দ্রুতগতি ধাবিতা হইয়া সরিৎপতিসঙ্গমে যেমন আত্মচরিতার্থতা লাভ করে, বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবর্গ আগমন পূর্ব্বক তদ্রূপ শ্রীমহা প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়া নবদ্বীপধামকে ভক্তিতরঙ্গে ডুবাইয়া দিয়া ছিলেন, অদ্বৈত ইঁহাদের মধ্যে

১৯. "অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥"–চৈতন্য ভাগবত।

২০. অদ্বৈতের আরাধনা স্থানে সম্প্রতি একটি দেবালয় স্থাপিত হইয়াছে।

২১. ইঁহার কাহিনী পশ্চাৎ উল্লেখ করা যাইবে।

অন্যতম এবং তিনিই প্রধান ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু ও অদ্বৈতের সম্মিলিত বহু বিস্তৃত লীলাকথা বর্ণনের একান্ত স্থানাভাব।

জ্ঞান ব্যাখ্যা

অদ্বৈতের জ্ঞানব্যাখ্যা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। শ্রীমহাপ্রভু বৃদ্ধ-তপস্বী অদ্বৈতাচার্য্যকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন, সময় সময় পদধূলি গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; ইহাতে অদ্বৈত মরমে মরিয়া যাইতেন। অদ্বৈতাদি ভক্তবর্গ শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তা সত্য কি না, তদ্বিষয়ে কঠোর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যাহার অতিরিক্ত পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, তদ্রূপ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মনুষ্য নহেন। সুতরাং বয়সে বালক হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গকে বৃদ্ধ অদ্বৈত আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন; পদধুলি লইতে তাহার শতবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে পারিতেন না। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ বিপরীত ব্যবহার করিয়া বসিতেন। ইহাতে অদ্বৈতের অন্তর ব্যথিত না হইবার কথা কি?

এইরূপ ব্যবহার পরে অদ্বৈতের অসহ্য হইয়া উঠিল—ভগবানের উপর ভক্তের অভিমান হইল। অভিমানের উত্তেজনায় তিনি মনে করিলেন— "দেখিব কেমন ভগবান! তিনি যে ভক্তিবাদের পক্ষপাতী, জ্ঞানব্যাখ্যা করিয়া ভক্তির প্রাধান্য উড়াইয়া দিব, আমি তাহাতে দোষ দিব, ইহাতে তিনি শাস্তি করেন কি না দেখিব।[২২] আমি দণ্ড্য হইতেই চাহি; দণ্ড ব্যক্তি পূজার্হ নহে; সুতরাং দণ্ড প্রাপ্তিই আমার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়।"

অভিমান—বিলিপ্ত চিত্তের সঙ্কল্প বিশুদ্ধ ও সুবিচার-সহ না হইলেও অনেকস্থলে বড়ই মধুর। অদ্বৈত অভিমান করিয়া অনতিবিলম্বে শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন ও জ্ঞানের প্রাধান্য প্রকীর্ত্তনে প্রবৃত হইলেন। অদ্বৈতের কয়েকজন শিষ্য সেই ব্যাখ্যা শ্রবণে বিমোহিত হইল। কেহ কেহ বা মনে ভাবিল যে, যিনি পূর্ব্বে ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তিনিই এখন জ্ঞানের প্রাধান্য প্রচার করিতেছেন,—এতদুভয়ের মধ্যে কোনটা সত্য? তাঁহার কোন কথা গ্রহীতব্য? তাঁহারা বড়ই সংশয়ান্বিত হইয়া রহিল।

শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতের এই কাণ্ড শুনিলেন, ইহার ভিতরে যে এক গূঢ় অভিসন্ধি রহিয়াছে, তাহা বুঝিলেন এবং নিত্যানন্দ সহ শান্তিপুরে চলিলেন। অর্দ্ধ পথে যাইতে না যাইতেই তিনি বাহ্যজ্ঞান—বিরহিত হইলেন, তাঁহার "আবেশ" উপস্থিত হইল; তদবস্থায় তিনি অদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হইয়া শিষ্য-বেষ্টিত জ্ঞানব্যাখ্যা-নিরত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া কঠোর ভাবে শাস্তি প্রদান করিলেন।

শিষ্যগণ এই ব্যাপার দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া রহিল, অদ্বৈতের পুত্র ও পত্নী প্রভৃতি ব্যাকুলিত ভাবে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের ভাব বিপরীত, শাস্তি পাইয়া তিনি আনন্দিত, এত আনন্দিত যে, তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গের পদধুলি লইয়া অঙ্গে মাখেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান—বিরহিত, কাজেই তিনি "না" বলিতেছেন না। বিশেষতঃ এই মাত্র যাঁহাকে প্রহার করিয়াছেন, সে পদধুলি লইতে কি বলিয়া বারণ করিবেন?

২২. "এবে জ্ঞানবাদ আমি করিব প্রচার।
যাহাতে প্রভুর হয় ক্রোধের সঞ্চার॥
শুনিয়া অবশ্য প্রভু আসি শান্তিপুর।
নিজ হাতেতে শাস্তি করিবে আমারে॥"—প্রেম বিলাস।

অদ্বৈতের সঙ্কল্প সিদ্ধি হইল। কুরুক্ষেত্রে ভক্ত ভীষ্মের একটি সঙ্কল্প, ভগবান নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে; শ্রীগৌরাঙ্গাকেও ভক্তের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য আপনার অনভিপ্রেত এই কার্য্যটি করিতে হইয়াছিল।

বলা গিয়াছে যে, অদ্বৈতের এই জ্ঞানব্যাখ্যা কল্পিত, ইহার বহুপূর্ব্বে অদ্বৈত যোগবাশিষ্ট ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিমার্গানুযায়ী ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন এই সুঅবসরে সেই দুই ভাষ্য গ্রন্থ শ্রীমহাপ্রভুকে দেখাইলেন।[২৩] শ্রীমহাপ্রভু উহা পাঠ করিয়া ইহার অত্যন্ত সুখ্যাতি করিলেন। অদ্বৈত কৃত এ দুইখানা ভাষ্য গ্রন্থ এক্ষণে কোথায়? ইহা কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে?

অতঃপর অদ্বৈত আপন শিষ্যগণ সমীপে প্রকৃত তথ্য ব্যক্ত করিলেন, ভক্তিই যে স্বশ্রেষ্ট—পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। পূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে যাঁহারা সংশয়ান্বিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রবুদ্ধ হইল, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি তার্কিকগণ বিতর্ক উপস্থিত করিয়া, অদ্বৈত কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইল। এইরূপে অনেক শিষ্য পরিত্যক্ত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিল, তথায় তাঁহারা বিবিধ মতবাদের সৃষ্টি করিয়া, লোকের ভ্রান্তি উৎপাদিত করিয়াছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত যে সকল উপধর্ম্ম বঙ্গভূমে পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে কোন কোনটি ইঁহাদের কাঁহার কাঁহারও কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীমহাপ্রভু চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটকাভিনয় করিয়াছিলেন, এই অভিনয়ে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে অদ্বৈতকে কৃষ্ণ সাজিতে হইয়াছিল। পরে এই ঘটনা হইতে, তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে কেহ কেহ "অদ্বৈত গোবিন্দ" বলিয়া একটা মতের সৃষ্টি করেন, ইঁহারা অদ্বৈতকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহারাও অদ্বৈত কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হন; তাহাতেই এই অভিনব মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। একথা এস্থলে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য অনেকটা উপলব্ধি হইবে, তাঁহার মহিমায় শিষ্যবর্গ কীদৃশ আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে কিরূপ উচ্চভাবে দর্শন করিতেন, এতদ্বারা তাহা বুঝা যায়।

শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপে ভক্তবর্গ সহ যে যে লীলা করেন, তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটিতে অদ্বৈতের যোগ ছিল, যাঁহারা গৌরলীলা অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের অবিদিত নহে।

শেষ কথা

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথমেই শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত পরম হর্ষিত হন। অদ্বৈত-গৃহ তৎক্ষণাৎ ভক্তবর্গে পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছিল, মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভুকে লইয়া ভক্তগণ তখন হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই কীর্ত্তনে অদ্বৈত কর্ত্তৃক বিদ্যাপতি কৃত একটি সুন্দর পদগীত হইয়াছিল, পদটি এই—

"কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর,
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥" ইত্যাদি।

---

২৩. "----দুইগ্রন্থ আনি সযতনে।
গৌর নিত্যানন্দ আগে করিলা স্থাপনে॥
যোগবাশিষ্ট আর শ্রীভগবদ্গীতা।
এউ দুয়ের ভাষ্য মোর প্রভু রচয়িতা॥
গৌরে দেখাইলা প্রভু করিয়া আদর।" ইত্যাদি–অদ্বৈত প্রকাশ।

শান্তিপুরে কয়েক দিন ভক্তের আনন্দ বিধান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অবশেষে নীলাচলে গমন করেন। অন্যান্য ভক্তবর্গসহ অদ্বৈত প্রতিবর্ষে নীলাচলে গিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতেন ও রথোৎসবের পরে চলিয়া আসিতেন।

একবার অদ্বৈত শ্রীমহাপ্রভুকে বড়ই উত্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সহজ অবস্থায় কখনও এরূপ ভাব প্রকাশ করেন নাই যে, তিনি অবতার। অবতার বলিয়া দৈবাৎ কেহ বলিয়া ফেলিলে তিনি বড়ই বিরক্ত হইতেন, তাই ভক্তগণ ভয়ে একথা মুখে আনিতেন না। নীলাচলে একদিন অদ্বৈত তাহাই করিয়া বসিলেন। শ্রীচৈতন্য বিষয়ক সঙ্গীত করিতে তিনি ভক্তবর্গকে অনুরোধ করিলেন, ভক্তবর্গ এই কঠিন অনুরোধ রক্ষা করিতে ভীত হইলেও বৃদ্ধ ঋষিকল্প অদ্বৈতের বাক্য তাহারা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া প্রস্তুত হইলেন; বিশেষতঃ অদ্বৈতের এই কথাটি সকলেরই মনের কথা ছিল। অদ্বৈত স্বয়ংই হর্ষে সঙ্গীত রচনা করিয়া দিলেন। তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক আদি সঙ্গীত, অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক সঙ্গীতের আদি রচয়িতাও শ্রীহট্টবাসী।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক সে সঙ্গীতটি এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

১। "শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু, মোরে দয়া কর।।"
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত:—"অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই গীত।"

২। শ্রীরাগ—

"পুলকে রচিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়
দেখরে চৈতন্য অবতারা।
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি, দ্বীজরূপে অবতরি,
সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহারা॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোহে রে,
আজানু লম্বিত মালা সাজে রে।
সন্ন্যাসীর রূপে আপন রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে॥
জয় জয় গৌর— সুন্দর করুণাসিন্ধু,
জয় জয় গৌর বৃন্দাবন রায়া রে।
জয় জয় সম্প্রতি, নবদ্বীপ পুরন্দর,
চরণ কমল দেহ ছায়া রে॥"

সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি শ্রবণে শ্রীমহাপ্রভু কীর্ত্তন স্থলে আসিয়াছিলেন, তিনি ভক্ত বর্গের এই অভিনব কাণ্ড দর্শনে তখনই সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বাসায় গিয়া তিনি শয়ন করিয়া রহিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কীর্ত্তনান্তে যথাকালে ভক্তগণ তৎসহ সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; মধুর প্রণয়কোপ চিহ্ন তাঁহার বদনে উদ্ভাসিত হইল, তিনি শয্যায় থাকিয়াই জিজ্ঞাসিলেন—"আজ আপনারা কি গাইলেন? আমি তো বুঝিতে পারি নাই। কৃষ্ণের স্থানে আবার কে অবতার হইয়া দাঁড়াইল।" ভক্তগণ নিরুত্তর—কি বলিলেন? বৃদ্ধপণ্ডিত শ্রীবাস তখন সূর্য্যের দিকে করপত্র আচ্ছাদন দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীমহাপ্রভু আবার বলিলেন—"কীর্ত্তন তো বুঝি নাই. পণ্ডিতের এই অভিনয়ের মর্ম্মও যে বুঝিতে পারিতেছি না! শ্রীবাস তখন উত্তর করিলেন—"হাতে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা যায় কিনা দেখিতেছি!"—"কারণ?"—শ্রীবাস বলিলেন "কারণ এই যে; যাহা হইতে ত্রিভুবন প্রকাশ

পাইয়াছে, সেই স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুকে অপ্রকাশ রাখার চেষ্টা কতদূর ফলপ্রদ, তাহাই দেখা।" এমন সময় বাহিরে বহুলোক—তাহারা সদ্য আগত পূর্ব্ববঙ্গের তীর্থযাত্রী, "জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিল। শ্রীবাসাদি সেই ধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিলেন "কেমন প্রভো; ইহাদিগকে তো কেহ শিখাইয়া দেয় নাই; তবে এ জয়ধ্বনি কেন?" শ্রীমহাপ্রভু আর কিছু বলিলেন না, ভক্তেরই জয় হইল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। একদা অদ্বৈত শ্রীমহাপ্রভুর নিকট একটি প্রহেলিকা বাক্য[২৪] প্রেরণ করিলেন, এই প্রহেলিকা-বাক্য শ্রবণে শ্রীচৈতন্যদেব ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। ভক্তবর্গ এই গূঢ়ার্থবোধক বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া শ্রীমহাপ্রভুকে তাহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আচার্য্য তন্ত্রজ্ঞ পূজক, তিনি দেবতার আবাহন করিয়া পুনঃ যথা সময়ে বিষর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহার কথার অর্থ তিনিই বুঝেন।" ইহার পর হইতেই শ্রীমহাপ্রভুর ভাব অন্যরূপ হইল, তিনি একরূপ বাহ্য জ্ঞান বিরহিত হইয়াই সর্ব্বদা থাকিতেন; এবং তদবস্থায় অপ্রকট হন। অপ্রকটের পর প্রহেলীর অর্থ ভক্তবর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এই প্রহেলিকা তদীয় লীলা সম্বরণের জন্য ইঙ্গিত মাত্র।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে অদ্বৈতের স্থান অতি উচ্চে, তিনি শিবের (কোন কোন মতে মহাবিষ্ণুর) অবতার বলিয়া পুজিত। এই মত যে পরবর্ত্তী কালে অদ্বৈত—ভক্ত কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হয়, তাহা নহে; শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অনুচর স্বরূপ গোস্বামী এই মতের উদ্ভাবক।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে ভাব ও শক্তি বিশেষের অবতরণ স্বীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মবশে অনশ্বর আত্মার জন্মান্তর গ্রহণের ন্যায় মুক্তপুরুষ বা দেবতার স্বেচ্ছাতঃ দেহধারণও স্বীকৃত হয়। সে যাহা হউক, শ্রীহট্টবাসী অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণব জগতে মহাবিষ্ণু বা মহাদেবের অবতার রূপে পূজিত হইতেছেন, ইহা শ্রীহট্টবাসিগণের কম গৌরবের কথা নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরও অনেক দিন অদ্বৈত জীবিত ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় তাঁহার বাহ্য জ্ঞান প্রায় ছিল না; অভ্যাস বশেই স্নানাহার করিতেন। অদ্বৈত-প্রেরিত পূর্ব্বোক্ত প্রহেলিকা-পদ্য প্রাপ্তির পর শ্রীমহাপ্রভুর শেষ কয়েক বৎসর যেমন কৃষ্ণবিরহে বাহ্যজ্ঞান বিহীন ছিলেন, অদ্বৈতও তেমনি শেষ কয়েক বৎসর গৌর-বিরহে বিহ্বল ছিলেন ও তদবস্থায় শতাব্দজীবী[২৫] শিবাবতার অদ্বৈতাচার্য্য অপ্রকট হন।

---

২৪. শ্রী অদ্বৈত প্রেরিত প্রহেলিকা, যথা :-

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাইল।"

পণ্ডিত রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন ইহার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্তকে (শ্রী মহাপ্রভুকে) বলিও—লোক কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে; আর কেহ বাকী নাই যে কৃষ্ণ প্রেম নিবে—প্রেম আর বিকায় না। আর বলিও যে এই প্রেম বিতরণ কার্যে কোন ত্রুটি হয় নাই। আর পাগল অদ্বৈতই ইহার বক্তা। (পাগল ব্যতীত কে নিদারুন বিদায়ের কথা ইঙ্গিত করিতে পারে?)

২৫. প্রেম বিলাসে লিখিত আছে শ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের চারিবৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ১০৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বধাম গমন করেন। কিন্তু অদ্বৈত প্রকাশ মতে তাঁহার অপ্রকট কাল ১২৫ বৎসর যথাঃ—

"সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরা ধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথা কালে॥"

এত দীর্ঘকালও যে লোক বাঁচিতে পারে, ইহার উদাহরণ এখনও একদা অপ্রাপ্য নহে। তাহা হইলে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্দ্ধান কাল বলিতে হয়।

আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী

আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী সাধারণতঃ আনন্দীকবি নামে খ্যাত। ইঁহার জীবিত কাল ১৭৭০ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ দুলালীবাসী ছিলেন। কবির পিতামহ দুলালী হইতে ছাতকে উঠিয়া আসেন, তদবধি তাঁহারা ছাতকবাসী। কবির রচিত পদ্মাপুরাণ ১২০৫।৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে লিখিত হয়। কবির ভাষা বেশ মধুর ও গম্ভীর, শব্দবিন্যাস চাতুর্য্যপূর্ণ, ভাব অতি উচ্চ; বৈষ্ণব সমাজ ব্যতীত অন্যত্র দুর্ল্লভ। তাঁহার এই পদ্মাপুরাণ ছাতকও দুলালী প্রভৃতি স্থানে গীত হইয়া থাকে। ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

আনন্দরাম (লালা)

শ্রীহট্ট শহরবাসী লালা আনন্দরামের রচিত ব্রজবুলি বিমিশ্রিত বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক "দোহাবলী" অতি প্রসিদ্ধ, এই দোহাবলীর কবিত্ব অতি মধুর ও রচনা অতি পরিপাটি। সকল দোহা সংগ্রহের চেষ্টা করিলে এখনও উহা বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

লালা আনন্দরাম শ্রীহট্টীয় সাহু-কুল-সম্ভূত ছিলেন, ইংরেজ আমলের প্রথমে ইনি শ্রীহট্টের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারকের সহকারী ছিলেন। দশসনা বন্দোবস্তের সময়ে এ জিলার তালুক সমূহের উপরে যে জমা (কর) ধার্য্য হয়, তাহা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্থাপনের ভার ইঁহার উপরেই ছিল; এইরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি বঙ্গ ভাষার সেবা করিতে বিস্মৃত হন নাই।

বর্ত্তমানে যেমন যশের জন্য অথবা অর্থের জন্যও অনেকেই সাহিত্য সেবক সাজেন পূর্ব্বে লোকের প্রবৃত্তি তদ্রুপ ছিল না; উহারা অনেকেই ধর্ম্মের জন্য—লোকের উপকারের জন্য কবিতা লিখিতেন। অল্প কেহ বা আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে সঙ্গীত রচনা করিতেন। লালার দোঁহা প্রণয়ন ধর্ম্মার্থে; তাই তিনি গুরুতর রাজকার্য্যে থাকিয়াও ইহার জন্য সময় করিয়া লইয়াছিলেন।

লালার হাতে প্রচুর রাজক্ষমতা ছিল—দেশের যত বড় বড় জমিদার তাঁহার করতলগত ও বাধ্য ছিলেন। কথিত আছে যে সেই ভরসাতে তিনি স্বজাতী সামাজিক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে একদা কাছারীতে গিয়া হঠাৎ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত ও জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন; তখন শিবিক সহায়ে তিনি গৃহে নীত হন ও অল্পকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। লালা আনন্দরাম সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনা গিয়া থাকে।

লাল্লার অনেকখানা নৌকা ছিল, ইহার অধিকাংশই ব্যবসায়ী নৌকা, একদা প্রত্যেক নৌকার একখানা করিয়া "বৈঠা" তাঁহার গৃহে আনীত হয়, তাহা একত্র রক্ষিত হইলে পুরুষ প্রমাণ উচ্চ হইয়াছিল। পূর্ব্বে শ্রীহট্টে শহরের সাহুজাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিই উত্তম ব্যবসায়ী ছিলেন। উচ্চ রাজপদে থাকিয়াও সকলেরই অবস্থা অতি উজ্জ্বল ছিল, এক্ষণে স্ববৃত্তি ত্যাগে সকলেরই অবস্থা অতি মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শহরের পল্লীগুলি লক্ষ্মীর কৃপা বিহীনতায় যেন ক্রন্দন করিতেছে; বিগত ভূকম্পে পূর্ব্ব গৌরবের ভগ্নাবশেষ চিহ্নও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ফরহাদ খাঁর পোলের পার্শ্বে গোয়ালিনী তীরে লালা আনন্দরামে প্রাসাদতুল্য গৃহের ভগ্নাবশেষ ও দেউড়ী-দেওয়াল প্রভৃতি বাল্যকালে আমরা দেখিয়াছি; এখন তাহা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

লালা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নিজ পুরোহিত গৃহের বংশীধারা দেবতার জন্য "পঞ্চরত্ন মন্দির" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।[২৬]

---

২৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাঃ ১ম খঃ ৪র্থ অঃ দেখুন।

আলী আমজাদ খাঁ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাঃ ৩য় খঃ ৯ম অধ্যায়ে পৃথিমপাশার জমিদার বংশের কথা বিবৃত করা গিয়াছে, এই বংশে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মৌলবী আলী আমজাদ খাঁর জন্ম হয়। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তদীয় পিতা আলী আহমদ খাঁর মৃত্যু হয়। পিতৃ বিয়োগের পর বালক আলী আমজাদ সুবিস্তৃত জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হইলে, গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক তাঁহার পিতামহী "ওলী" সাব্যস্থ হন, এবং শ্রীহট্টের জজ সাহেব "একজিকিউটার" নিযুক্ত হন।

আলী আমজাদ খাঁর শিক্ষার বন্দোবস্ত শ্রীহট্টেই হয়, কিছু দিন তিনি গবর্ণমেন্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। আলী আমজাদ বাল্যকালে বড়ই উদার ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহপাঠী ছিলেন, তাঁহারা ইহা বিশেষ রূপেই জানেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে পারেন নাই, শীঘ্রই জমিদারী শাসনের গুরুভার তাঁহাকে নিজহস্তে গ্রহণ করিতে হয়।

শিকার সংবাদ—আলী আমজাদ খাঁ একজন উৎকৃষ্ট শিকারী ছিলেন। প্রায়শঃ জঙ্গলে শিকারে যাইতেন। একদা শিকারে গিয়া এক বৃহৎকায় মৃগের অনুসরণে দুর্ভেদ্যবনে প্রবিষ্ট হইয়া মৃগের প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে এক ভীষণ ব্যাঘ্র ঐ মৃগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অমনি তিনি ৭টি কার্টিজ পুরিপূরিত বন্দুক ফিরাইলেন ও প্রথমেই ব্যাঘ্রকে নিহত করিলেন। মৃগটি তদবসরে সম্মুখবর্ত্তী নদী সন্তরণ পূর্ব্বক পরপারে উঠিয়া পলায়নপর হইল, কিন্তু নিষ্কৃতি পাইল না, দুইটি গুলি চালনা করিয়া তিনি মৃগকেও বধ করিলেন।

তিনি একদা মুর্শিদাবাদের নবাব-পুত্রের আহ্বানে তথায় গিয়া শিকারে নবাব-পুত্রের মনস্তুষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রায় পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

১৩১০ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর কৈলাশহরে পরিদর্শনে শুভাগমন করেন, তৎকালে খাঁ সাহেব কৈলাশহরের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহারাজ সহ শিকারে গিয়া তাঁহাকে এতদৃশ তুষ্ট করেন যে, বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলে, প্রত্যাগমন কালে মহারাজ তাঁহার গৃহে যাইতে স্বীকৃত হন।

ত্রিপুরা-পতির অভ্যর্থনা—মহারাজের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিয়া খাঁ সাহেব বিশেষ আনন্দিত হন ও কৈলাশহর হইতে লংলা পর্য্যন্ত দশমাইল পথের দুইধারে কদলীবৃক্ষ রোপণ করতঃ তাহার নিচে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রতিবৃক্ষের উপরে রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতেছিল এবং স্থানে স্থানে বিচিত্র তোরণ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। মঙ্গলসূচক উলুধ্বনি করার জন্য বিচিত্রবেশা সধবাগণকে প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। অভ্যর্থনার জন্য বাটিকাতে এক বৃহৎ কৃত্রিম বিশ্রামভবন বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ভিতরে স্বর্ণ রৌপ্য-খচিত অপূর্ব্ব বস্ত্র, মূল্যবান আসবাব, সুদৃশ্য মখমল ও উজ্জ্বল চন্দ্রাতপাদি সুশোভিত হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে লোহিত ও নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত পাইক পংক্তি প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিল। হিন্দু মহারাজকে হিন্দুভাবে গ্রহণের জন্য তদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক সংকীর্ত্তনের দল সমুপস্থিত রাখা হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই উচ্চ সংকীর্ত্তন ও রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত উলুধ্বনির মধ্য দিয়া সপার্ষদ মহারাজের শকট ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল। খাঁ সাহেব স্বয়ং পথপ্রদর্শক রূপে অগ্রে অগ্রে সুন্দর অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। শকট যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলে তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিজ কর্ম্মচারিগণসহ মিলিত হইয়া মহারাজকে পটমণ্ডপে লইয়া যান।

মহারাজ তথায় কয়েক মিনিট কালমাত্র অবস্থিত করেন। খাঁ সাহেব বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত একটি হস্তী ও বহুমূল্য একটি অশ্ব উপঢৌকন সহ মহারাজকে এক অভিনন্দনপত্র

প্রদান করেন। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলায় কোন হিন্দু বা মোসলমান, ত্রিপুরার মহারাজ হইতে এতাদৃশ সম্মান লাভ করেন নাই।

এই উৎসবে খাঁ সাহেবের পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হয়। মহারাজও তাঁহার সম্মানার্থ যাওয়া কালে, কৈলাশশহর ডিভিশনের সমস্ত আফিলের বিচার করার ক্ষমতা তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

হিতকর কার্য্য—১৯০০ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে ভালরূপ কৃষি না হওয়ায় তণ্ডুল অতি মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল, দরিদ্র প্রজাবর্গের মধ্যে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য লংলার হিঙ্গাজিয়ার এক দুর্ভিক্ষ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, খাঁ সাহেব এই সভার "সেক্রেটরী" ছিলেন, এবং এই সভায় প্রথমেই তিনি একসহস্র মুদ্রা দান করিয়া কার্য্যকরী সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে তিনি আরও অনেককে সাহায্য করেন। শ্রীহট্ট শহরের চাঁদনী ঘাটের উপরে যে ঘড়িঘর আছে, তাহা ইঁহার অর্থেই বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

বিদ্রোহ দমন—১৩০৭ বাংলায় ভানুগাছ পরগণা প্রায় ৩/৪ সহস্র মণিপুরী প্রজা বিদ্রোহী হইয়া তদীয় ভানুবিল কাছারীর কর্ম্মচারী রাসবিহারী দাম ও নইম উল্লা পাট্টাদারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিল। উক্ত দামের নাবালক পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি তাহাকে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া এবং পাট্টাদারপুত্রকে ২/০ দুই হাল ভূমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিনা খাজনায় ভোগ করিতে দিয়া সহৃদয়তার পরাকাষ্টা প্রদর্শন করেন।

এই হাঙ্গামায় মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, শ্রীহট্ট জিলার সমস্ত মণিপুরী জাতী চাঁদা দানে ভানুবিলের মণিপুরী প্রজাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। এদিকে এত লোক, আর অপরদিকে একা এক ব্যক্তি! বিংশতি সহস্র লোকের সমবেত শক্তিকে একা তাঁহার প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল। আসাম প্রদেশের তদানীন্তন চিফ কমিশনার সাহেব বাহাদুর তখন উভয় পক্ষকে ডাকিয়া "আপোষ" করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে খাঁ সাহেব প্রজাদিগকে অশীতি সহস্রমুদ্রা "রেহাই" দেন।

গবর্ণমেন্ট খাঁ সাহেবকে অনারেরী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনিও গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ নিদর্শন আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ জমিদারী সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকায় অবসরাভাবে একমাস মধ্যেই এই পদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বিগত ১৩১২ বাং ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাঁচা ঠাকুর

কাঁচা ঠাকুরের প্রকৃত নাম কি ছিল বলা যায় না, ইনি শ্রীহট্ট শহরবাসী এবং সাহুবণিক জাতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঠাকুর কাঁচা একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন; কথিত আছে একদা একব্যক্তি রাস্তা দিয়া একছড়া কলা লইয়া যাইতেছিল, সে ব্যক্তি তাহার কলা বিক্রয় করিবে কিনা, দূর হইতে তিনি ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। লোকটির ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরের কাছে উহা বিক্রয় করে, তাই সে মিথ্যা করিয়া উত্তর দিল—"ঠাকুর মহাশয়, কলা তো কাঁচা।" কদলী পরিপক্কই ছিল, ঠাকুরও কদলী পরিপক্কই দেখিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তির কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন "আচ্ছা, তাহাই হউক।" ক্ষণপরেই লোকটি দেখিতে পাইল যে, তাহার পক্ককদলী কাঁচা হইয়া গিয়াছে! এই ঘটনার পর হইতে ইনি "ঠাকুর কাঁচা" নামে খ্যাত হন, এবং তদবধি লোকেও তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে।

একদা শ্রীহট্টের জনৈক ধনী সওদাগর এক ভীষণ দুর্ভিক্ষে তণ্ডুল বিতরণ পূর্ব্বক পুরস্কার স্বরূপ শ্রীহট্টের নবাবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কথিত আছে তিনি উহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া শ্রীহট্টের

অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলে তিনি ঐ পদ প্রাপ্ত হন।[২৭] পূর্বোক্ত সওদাগরের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, পরে তিনি সাহুবংশে বিবাহ করিয়া বণিগ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছিলেন। সওদাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃই হউক, অথবা মূলে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় কয়েক প্রধান ব্যক্তি কোন সামাজিক বিবাদ মূলে স্বসমাজ হইতে পৃথক হইয়া, এই সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া হউক, উক্ত নবাব শ্রীহট্টীয় সাহু-সম্প্রদায়কে পুনঃ পূর্ব্ব উপযুক্ত স্থানে স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

একসময় উক্ত নবাব ১০৮ মূর্ত্তি কালী পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার উদ্যোগ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। জনশ্রুতি যে, এই কার্য্যের পূর্ব্ব সূচনা, স্বরূপ সিদ্ধ পুরুষ ঠাকুর কাঁচাকে একজন কালা পূজা করিবার অধিকার দেয়া হয়। ঠাকুর কাঁচা তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যে পূজা সমাধা করিয়া লন। তাঁহার পূজা সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছিল; প্রবাদ এই যে তৎশ্রবণে কাঁচা, দেবীর আবির্ভাবের প্রমাণ প্রদর্শনার্থ একটি ধান্য লইয়া মৃন্ময়ী প্রতিমার উরুদেশে একটি রেখাপাত করিলে তাহা হইতে শোণিত নির্গত হয়। কাঁচা ঠাকুরও নবাবকে আশীর্ব্বাদ প্রদান ব্যতিরেকেই চলিয়া আসেন। অতঃপর নবাবের ও পতন ঘটিয়াছিল।

কাশী নাথ

বালিরাশি পরগণার শঙ্করসেনা গ্রামে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কাশী নাথের জন্ম হয়, তাঁহার পিতার নাম সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা। কাশীনাথ বাল্যবধিই বিষয় বিরাগী ছিলেন, ধর্ম্মে তাঁহার মন একেবারে বসিত না বলিয়া তিনি বিবাহে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু আত্মীয়বর্গ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতেন; তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কিছুতেই আশক্তি জন্মিলনা। তিনি নারী জাতিকে জগন্মাতার প্রতিরূপা জ্ঞান করিতেন, সুতরাং পরিণীতা পত্নীর সহিতা দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন। ঈদৃশ উচ্চাঙ্গের সাধক কাশীনাথের কিছুতেই গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই।

কাশীনাথ প্রসিদ্ধ নির্ম্মাই শিবের[২৮] বাড়ীতে গিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন। সেই স্থানে তিনি শব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। বালিশিরার তরফদার বংশীয় চাঁদ তৎকালে তাঁহার "উত্তর সাধক" হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই নির্ম্মাই পূজা করিতেন। হরের আরাধনায় তিনি বাক্‌সিদ্ধ হইয়াছিলেন, যাঁহার কথা বলিতেন, তাহাই সফল হইত। এই জন্য লোক সমাজে তিনি "বাকসিদ্ধ কাশীনাথ" নামে খ্যাত হন।

নির্ম্মাই শিব এতদঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত, শিবরাত্রি ও বারুণী যোগে প্রতি বৎসর তথায় বহু যাত্রী উপস্থিত হইত, ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইলে আশ্রয়াভাবে ইহাদের অশেষ লাঞ্ছনা পাইবার সম্ভাবনা হইলেও, কাশী নাথের সময়ে একবারও তাহাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। "তোমাদের কোন ক্লেশ হইবে না" এই বাক্যটি তিনি বলিলেই ঝড় বৃষ্টি নম্র হইয়া মুহুর্ত্তে কোথায় চলিয়া যাইত।

তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তার কথা গল্পবৎ প্রতীয়মান হয়, তিনি মা মা বলিয়া কোন কোন যুবতীর স্তন্যপানে রত হইতেন। লোকে বিস্মিত হইয়া দেখিত যে, তিনি যেন শিশুভাব লাভ করিয়াছেন।

২৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ২য় খঃ ৪র্থ অধ্যায় এবং উত্তরাংশ ৩য় ভাঃ ২য় খঃ ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। শ্রীহট্টের নবাব হরকিষুণ দাস মনসুর উলমুলক বাহাদুর ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ১ম ভাঃ ৯ম অধ্যায় দেখ।

যে দিন তিনি দেহত্যাগ করেন, তাহার পূর্ব্বদিন শোণিত বমন করিতে করিতে অজ্ঞান ও রুদ্ধবাক হইয়া দিবারাত্রি যাপন করেন, কিন্তু পরদিন অরুণোদয়ে তাঁহার দেহে কোনরূপ রোগ চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। ঐ দিন এক ব্যক্তি মধু লইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি সেই মধুপানে আনন্দার্ণবে ভাসিলেন ও উপস্থিত ব্যক্তিদের সহিত কথা বলিতে বলিতে (অশীতি বৎসর বয়সে) সজ্ঞানে সাযুজ্য লাভ করিলেন। ইহার জীবনের অনেক অদ্ভুত ঘটনা কথক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; সে কথাগুলি সংগৃহীত হইলে এক উপাদেয় পুস্তক হইতে পারে।

কুবেরাচার্য্য

লাউড়বাসী নরসিংহের পুত্র কুবের তীক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতা শান্তিপুরে এক বাড়ী করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তথায় বাস করিয়া কুবের শান্তিপুরেই শিক্ষালাভ করিয়া তর্কপঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত হন, পরে ময়ুর ভট্টের অন্বয়জাতা লাভাদেবীকে তিনি শান্তিপুরে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

পিতার মৃত্যুর পর কুবেরাচার্য্য গয়াধামে গমন পূর্ব্বক পিতৃকৃত্য সমাপ্ত করতঃ শান্তিপুর হইতে লাউড়ে (শ্রীহট্টে) আগমন করেন। তৎকালে লাউড় রাজ্য রাজা দিব্যসিংহের শাসনাধীন ছিল। দিব্যসিংহ কুবেরাচার্যের অগাধ জ্ঞান-গৌরবে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে নিয়োজিত করেন।[২৯]

রাজমন্ত্রী কুবেরের সুমন্ত্রণা প্রভাবে লাউড় রাজ্য অচিরেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠে। মন্ত্রী কুবেরের দক্ষতায় রাজা সুখী, জন-হিতৈষণায় প্রজাবর্গ প্রফুল্ল অমায়িকতার প্রতিবেশীবর্গ বাধ্য ছিল। কিন্তু কুসুমেও কীট থাকে, কুবেরের মনেও সুখ ছিল না; তাহার কারণ লাউড়ে আসিয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার ছয়টি পুত্র জাত হইয়া অচিরকাল মধ্যে গতায়ু হয়। তাহার পরে একটি কন্যা জাত হয়, কন্যাটিও ভ্রাতৃগণের পথানুসরণ করে। কুবেরাচার্য্যের এই পুত্রগণের নাম যথা—লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, হরিহরানন্দ, কুশল, সদাশিব ও কীর্ত্তিচন্দ্র।[৩০]

এত গুলি পুত্রকন্যার মৃত্যু ঘটিলে পিতামাতার মনে কিরূপ ভাবোদয় হয়, তাহা না বলিলেও চলে। কুবেরের আর দেশে থাকিতে ইচ্ছা হইল না, তিনি পত্নীর সহিত শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং কিছুকাল উভয়ে তথায় সেই স্থানে অবস্থিতি কালে লাভাদেবীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই গর্ভজাত সন্তানটি বাঁচিবে কি না সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কুবের দৈব লাভাশায় নারায়ণের পূজা ও দরিদ্র সেবায় অনেক ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুবের, রাজা দিব্যসিংহের এক পত্র পাইলেন ও দেশে আসিলেন।[৩১]

কুবের স্বদেশে আগমন করিয়া প্রতিবাসিবর্গের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহারা সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন—"সেই গ্রামের লোক তাঁর সম্মান করিলা।" তার পর রাজার

২৯. "অথো কুবেরঃ সুবিচক্ষণশ্চ
প্রভুত শাস্ত্রে সুমতিঃ প্রশান্তঃ
শ্রীলাউড়ং শান্তিপুরাদ্য যোহি
তদ্দেশে পালেন মুহুঃ সমাদৃত।
সতর্কপঞ্চানন আর্য্য চুড়ো
নিত্যাদি শাস্ত্রৈর্বহিভিরভিজ্ঞঃ
তদ্রাজ্য পালেন সুশাস্ত্র দর্শিনা
দত্তং স্বমন্ত্রিত্বপাপ যত্নং।"—বাল্য লীলা সূত্রম

৩০. বাল্য লীলা সূত্র।

৩১. বিবাহান্তে ক্রমে তাঁর বহু পুত্র হৈল।
পুত্রগণ মৈলে তবে বিবেক হইল॥
তবে গঙ্গাতীরে রম্যে শান্তিপুরে আইলা॥
লাভাসহ কিছুদিন তাহা গোঙাইলা
একদিন শ্রীকুবের তর্ক পঞ্চানন।
আকারে জানিলা লাভার গর্ভের লক্ষণ।
হেন কালে রাজপত্রী কুবের পাইলা।
বণিতা সহিতে নিজ দেশে চলিলা।
—অদ্বৈত প্রকাশ

সহিত দেখা হইল, রাজাও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। রাজা বলিলেন—

"মন্ত্রি, তোমার অনুপস্থিতে আমার কার্য্য অচল হইয়া পড়ে, অধিক কি, 'তুয়া বিনা রাজ্যপাট শুন্য করি মানি'।"

কুবের কিদৃশ দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন, ইহাতেই বুঝা যায়। রাজাকে মন্ত্রী যে উত্তর দিলেন, তাহা এই—

"দরিদ্র ব্রাহ্মণে দয়া কর নিরবধি।
গঙ্গাতীর পুণ্য ভূমি অতি রম্য স্থান।
তাহা হইতে আসিবারে মন নাহি ধায়।
তবে যে আইনু চলি তোমার আজ্ঞায়॥
ঈশ্বর কৃপায় পুন হইল গর্ভাধান।
অদৃষ্টের ফল যেই হয় মূর্ত্তিমান।"—অদ্বৈত প্রকাশ।

রাজা মন্ত্রী-পত্নীর গর্ব্ভের কথা শুনিয়া সুখী হইলেন। বলিলেন—"এবার পুণ্যস্থানে গর্ভ হইয়াছে সন্তান বাঁচিতে পারে, আপনে বিজ্ঞ চিন্তা পরিহার করিবেন।"

অনন্তর রাজাজ্ঞায় গণক গর্ভফল গণনায় বলিলেন, এ গর্ভে এক দেবরূপী পুত্র সন্তান জাত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

গণকের এ বাক্য সফল হইয়াছিল, সেই গর্ব্ভের পুত্রই কমলাক্ষ (অদ্বৈতাচার্য্য), ইঁহার কথা ৪র্থ ভাগের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে।

কুবেরাচার্য্য তাহার পর দ্বাদশ বৎসর কাল লাউড় রাজ্যের কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন, তৎপর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গমন করেন, তথায় তাঁহার পরলোক গমন ঘটে।

কেশব বা অজ্ঞান ঠাকুর

প্রায় দ্বিশত বর্ষ অতীত হইল, ইটা পরগণার বুড়িকোণা গ্রামের উত্তরাংশে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণকুলে কেশবের জন্ম হয়, কেশব বাল্যবধিই সন্ধ্যাপূজা-পরায়ণ। শৈশবে রাখালদের সহিত খেলায় উন্মত্ত থাকা বশতঃ বৈষয়িক ব্যাপারে মোটেই কেশবের মন ছিল না। যখন তাঁহার বয়স ১৮/১৯ বৎসর, তখন পর্য্যন্ত লোকে তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া গণ্য করিত।

সময় সময় কেশবকে যজমানদের বাড়ীতে যাইতে হইত, কিন্তু তাহাতে ফল এই হইত যে, তথা হইতে ব্যাপারে প্রাপ্ত চাল কলাদি লইয়া আসিতে পথেই রাখালগণ কর্ত্তৃক প্রায়ই তৎসমস্ত লুণ্ঠিত হইয়া তাহাদের উদরসাৎ হইত, বাড়ী আসিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে তজ্জন্য কেশবকে গালি এবং কখন কখন বা উত্তম মধ্যমও খাইতে হইত।

একদিন রাখালগণ কর্ত্তৃক চাউল কলা লুণ্ঠিত হইলে, ভয়ে বাড়ীতে না গিয়া কেশব নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে চলিয়া যান। সেই জঙ্গলে ব্যাঘ্রও মহিষের অভাব ছিল না। কেশব সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাড়ীতে না আসাতে আত্মীয়গণ অনুসন্ধানে বাহির হইয়া তাঁহার বন প্রবেশের সংবাদ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। পরদিনও যখন তিনি আসিলেন না, তখন কোনও বন্যজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন বলিয়াই সকলে স্থির করিল।

তিনদিন পরে কেশব হঠাৎ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারানিধি লাভে আত্মীয়দের আহ্লাদের অবধি রহিল না, কিন্তু তিনদিন তিনি কোথায় ছিলেন, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও তাহা বলিলেন না; এই সময় হইতে তিনি দেবতার গৃহ বাস করিতে লাগিলেন ও অল্পভাষী হইলেন। তখন হইতে ইচ্ছা হইলে স্বয়ং পাক করিয়া কিছু খাইতেন, অন্যের পাক করা দ্রব্য খাইতেন না।

সকল পুরুষকেই "জেঠা" এবং স্ত্রীলোক মাত্রকেই "জেঠী" সম্বোধন করিতেন, কিন্তু তখনও রাখালদের সহিত পূর্ব্ববৎ খেলা চলিত।

একদিন খেলিতে খেলিতে রাত্রি হইল, রাখালেরা গরুর জন্য চিন্তা করিতে লাগিল, তখন কেশব সকলের গরু অনায়াসে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আর একদিন খেলায় সেইরূপ রাত্রি হইয়া গেলে, সেদিনও রাখালেরা চিন্তিত হইয়া পড়িল, তখন কাহার কোন গরু কোথায় আছে, রাখালদিগকে একে একে তাহা বলিয়া দিলে, তাহারা তখন অনায়াসে গরু লইয়া বাড়ী আসিল। রাখালেরা কেশবের এই কার্য্যে বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারা বাড়ী আসিয়া এই আশ্চর্য্য কথা সকলের কাছে প্রকাশ করিয়াছিল। এই সময় হইতেই কেশবের "সিদ্ধির" কথা প্রচারিত হয়; তখন হইতে নানাবিদ রোগী ও বিপদাপন্ন ব্যক্তির সমাগমে কেশবের বাড়ী পূর্ণ হইয়া যাইত। সমাগত ব্যক্তিবর্গও তাঁহার অনুগ্রহে বিবিধ ব্যাধি হইতে নিরাময় হইত; তাঁহার হস্ত স্পর্শে কঠিন পীড়াও প্রশমিত হইত বলিয়া কথিত আছে।

একদা বুড়ীকোণা বাসী, বিনন্দরাম ধর নামক একব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিলে তিনি বলিলেন—"জেঠা! তোমার গাছে আম পাকিয়াছে, আমার জন্য আন নাই কেন?" তখন আমের দিন নহে, আমের মুকুলই তখন হয় নাই। কিন্তু বিনন্দরাম বাড়ীতে গিয়া কথিত আম্র বৃক্ষটি দেখিয়াই অবাক! তাহার পুকুরের কিনারে ছোট গাছটিতে যথার্থই পাকা আম ঝুলিতেছে! বলা বাহুল্য সেই পরিপক্ক আম্রগুলি কেশবকে উপহার দেওয়া হইল!

এই সময়ে কুতবশাহ নামে খ্যাত জনৈক মোসলমান সিদ্ধ পুরুষ এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি ঘটনাক্রমে একদিকে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেন। কেশব ভাব বিশেষে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া তখন বাহ্য জ্ঞান বিরহিত প্রায় ছিলেন, তদবস্থায় তিনি মাটি হইতে উঠাইয়া উক্ত নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণ করেন। এতদ্দৃষ্টে কুতব সাহেব তাঁহাকে "অজ্ঞান" বলিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনা করেন। এই সময় হইতে কেশব "অজ্ঞান ঠাকুর" বলিয়া খ্যাত হন। তখন হইতে কুতব ও তিনি উভয়ে একত্রে থাকিতেন।

একদা পঞ্চগ্রামের নিকট এই দুই মহাত্মা এক অন্যে কুস্তি করিয়া দাস বংশীয় জনৈক ভদ্রলোকের পাকা ধান্যের ক্ষতি করিয়াছিলেন, ভদ্রলোক অপচয়কারী ব্যক্তি দ্বয়কে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কুতব পলায়ন করিলেন, অজ্ঞান ধরা পড়িলেন। অজ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্তে ভদ্রলোকটি শাস্তির পরিবর্ত্তে ১৩/০ হাল পরিমিত সেই ভূমিখণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। এই ভূমি পরে "অজ্ঞানের ছেগা তালুক" বলিয়া বন্দোবস্ত হয়।

অজ্ঞান ঠাকুর আদমপুরের পাহাড়ে "বনমালী" নামে এক নৌকা প্রস্তুত করিয়া ঐ নৌকা প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ পথ দিয়া টানিয়া নামাইয়া আনাইয়াছিলেন, ঐ নৌকাটানা পথ "অজ্ঞানের কাড়া বা অজ্ঞানের জাঙ্গাল" নামে খ্যাত আছে। অজ্ঞানের নৌকা নামান উপলক্ষে একটি সারিগান রচিত হইয়াছিল, অদ্যাপি লোকে বলিয়া থাকেঃ—

"সবে বল হরি হরি।
অজ্ঞানে সোয়ারি নাও যাইত অন্তেহরি॥"

অজ্ঞানের বাসস্থানে গ্রাম্য লোকে একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, উহা অদ্যাপি আছে এবং তাহাতে অজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ ও শালগ্রাম শিলা বিরাজমান। অজ্ঞানের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে কাওয়াদীঘী হাওরের নিকট "নুনডুবা" বলিয়া একটা স্থান আছে। প্রবাদ যে, কোন এক মহাজন অজ্ঞানকে লবণ না দেওয়াতে এই স্থানে তাহার লবণ পূর্ণ নৌকা ডুবিয়াছিল; তৎক্ষণাৎ সে প্রবুদ্ধ হইয়া অজ্ঞান ঠাকুরের শরণ লয় ও নৌকা উঠাইয়া ফেলে

এইবার সে ব্যবসায়ে যথেষ্ট লভ্য করিয়াছিল। অজ্ঞান ঠাকুর যেস্থানে রাখালদের সহিত খেলা করিতেন, তথাকার একটি উচ্চ স্থানকে লোকে "অজ্ঞানের টিপি" বলিয়া থাকে।

অজ্ঞান ঠাকুর শেষ বয়সে ভেখধারণ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন। তিনি সমাজের চক্ষে হীনপদস্থ হইলেও তদীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ সর্ব্বদাই তাঁহাকে শ্রদ্ধার নেত্রে দর্শন করিতেন। উপযুক্তের সম্মান দিতে হিন্দু কখনও কুণ্ঠিত হয় না, শ্রদ্ধা জাতিকুল অপেক্ষা করে না। শমশের নগরের চৌধুরীও কানুনগোবর্গ অজ্ঞান ঠাকুরের সেবা পরিচালনার জন্য ১১৬৪ সালে তাঁহাকে কতক ব্রহ্মত্রভূমি দান করিয়াছিলেন।[৩২]

অজ্ঞান ঠাকুর সর্ব্বজীবন সমদর্শী ছিলেন, যে কোন জাতীয় সাধু ব্যক্তিকেই তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। শেষাবস্থায় তাঁহার কাছে এতবেশী সংখ্যক লোক ঔষধাদির জন্য আসিতে আরম্ভ করে যে, তিনি একটু মাত্র সময় একাকী থাকিবার অবকাশ পাইতেন না। এইরূপে জনসমাগমে ক্রমাগত উপদ্রুত হইতে থাকিলে, একদা প্রভাতে যখন বহুলোক সমবেত হইল, তখনও তিনি মন্দির হইতে বাহির হইলেন না; তখন নিরাশ চিত্তে সমাগত ব্যক্তিবর্গ চলিয়া গেল। পরদিনও তিনি মন্দির হইতে বহির্গত বললেন না; এইরূপে সাত দিন গেল, মন্দিরের দ্বার সাত দিনই রুদ্ধ রহিল; অষ্টম দিবসে সকলে পরামর্শ করিয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল ও দেখিতে পাইল যে গৃহ শূন্য রহিয়াছে এবং একদিকে একটা গভীর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে; এই গত দৃষ্টে সকলেই সাধুর সংগোপন অনুমান করিয়া লইল।

কেশব লাল গোস্বামী

কেশব লাল জনতরির স্বর্ণ কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রতিনাথ। রতিনাথ সংসার স্পৃহা রহিত ছিলেন এবং দেবার্চ্চনায় সদা রত রহিতেন।[৩৩] বাল্যকাল হইতেই কেশব লালের চরিত্রে যে চিত্র প্রকটিত হয়, কেশব যে একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, জন্মান্তরীন যোগসিদ্ধি যে বাল্যাবধি তাঁহাতে বিকশিত হইয়াছিল, তদীয় বাল্য চরিত্র দৃষ্টে সকলেই তাঁহা বুঝিয়াছিল এবং তজ্জন্য বাল্যাবধিই তিনি আদৃত ও ভক্তিপাত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

যখন কেশব লাল ৪/৫ বৎসরের বালক, তখন জনৈক প্রতিবেশী একছড়া কাঁচা কলা তদীয় পিতৃপূজিত শ্রীধর দেবতাকে ভেট দিয়াছিল। এই কদলী দেখিয়া শিশু কেশব কদলীর লোভে কাঁদিতে থাকেন। নিকটে ২/৩ টি স্ত্রীলোক ছিল, দেবতার জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া একটি কদলী শিশুকে দিতে তাহারা বলিলে কেশব-জননী পুত্রের হাতে কটি কদলী দেন। কথিত আছে যে স্ত্রীলোকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল যে, কেশবের হাতে থাকিতে থাকিতে কাঁচা কলা পাকিয়া উঠিয়াছিল। এ কথা গ্রামে প্রচারিত হইলেই শিশুকে পূর্ব্ব সিদ্ধ মহাত্মা জ্ঞানে সকলে

৩২. উক্ত দান পত্রের প্রতিলিপি এইঃ—

"ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীঅজ্ঞান দাস বৈষ্ণব সাকিন পরগণে সমসের নগর সদাসয়েষু। লিখিতং শ্রীচৌরধুরীআন ও কানুনগৈ আন পং মজকুর পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে—আমরা পরগণা মজকুরে কেশবরাম পণ্ডিত তালুক কিং বিবাইবাদ ও বুড়িয়াপুন মং...আষ্ট কাহন্ দুই পন x x মিস্থান লেখা যায় এ হার উৎপন্ন জমার কামাল মবলগ ২১ একইস কাহন তুমাকে পুজে ব্রহ্মাউত্তর কব্বিয়া দিলাম এই মবলগ মজকুর আমরার পরগণা তাহুত কিস্তি হনে হাকিম x x x পাইলাম তুমাকেও মিনা করিয়া দিলাম তুমি হাকিমের সনদ হাসীল করিয়া পুজা করিয়া তুমার সন্তান ও শিষ্যক্রমে ভোগ দখল করহ এর উপর আমরার কোনু দাবী নাই। এতদর্থে পত্র করিয়া দিলাম। সন ১১৬৪ তারিখ ২০।

৩৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাঃ ৪র্থ খঃ ৩য় অধ্যায় দেখ।

বিশেষভাবে দেখিতে আরম্ভ করে।

কেশব লাল যখন বার বৎসরের বালক, তখন একটি গোবৎসে লইয়া সর্ব্বদা খেলা করিতেন, বাছুরটিকে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে চরাইতে লইয়া যাইতেন, এটিকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, লেখা পড়ায় কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেন না। পিতা বহুচেষ্টা করিয়াও যখন পুত্রকে পড়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি নিরাশ হইয়া সে চেষ্টায় বিরত হন। আট বৎসর বয়সে কেশবের উপনয়ন হয় তৎকাল পর্যন্ত তাঁহার পুথির সহিত পরিচয় হয় নাই, সেই বৎস সহ বনে গমনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইহার অল্পপরে একদিন বৎসচারণ হইতে বাড়ীতে আসিয়াই বৎস বাঁধিতে বাঁধিতে মাকে বলিলেন—"কানাইদাদা বলিয়াছে!" মা মনে করিলেন, ছেলে কোন বালকের সহিত খেলিতে যাইবে। পরদিন তাঁহাকে আর জাগাইয়া দিতে হইল না, কেশবলাল স্বয়ং জাগিয়াই বৎস লইয়া জঙ্গলে গেলেন।

প্রভাতে বাড়ীতে বালককে না পাইয়া আত্মীয়গণ সেই জঙ্গলে গিয়া দেখিলেন যে কেশবলাল একটি কদম্ব বৃক্ষের উপরে একাকী এক শাখা হইতে অন্য শাখার যাইতেছেন, যেন কাহার সহিত খেলা করিতেছেন, অদৃশ্য ভাবে কে যেন আগে আগে ছুটিয়া যাইতেছেন, যেন কাহার সহিত খেলা করিতেছেন, অদৃশ্যভাবে কে যেন আগে আগে ছুটিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধৃত করিতে তিনি চাহিতেছেন কিন্তু পারিতেছেন না। ইহা দেখিতে দেখিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বৃক্ষের নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলেন যে একটি বৃক্ষ শাখা কোলে করিয়া কেশব মাটিতে পতিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে আত্মীয়বর্গ দ্রুত ধাবিত হইয়া তাঁহাকে উঠাইতে গেলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমাকে ছুইও না। আমাকে কীর্ত্তন করিয়া গৃহে লইতে বাবাকে বল, তাহা না হইলে যাইব না।"

যাঁহারা আসিয়াছিল, তাঁহারাই একথা রতিনাথকে জানাইল ও সকলে কীর্ত্তন করিয়া কেশব লালকে বাড়ীতে লইয়া গেল। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই কেশব দেবগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ও কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

সকলেই কেশব লালকে পূর্ব্বসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত, সুতরাং আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। অষ্টাহ পরে তিনি গৃহ হইতে বাহির হন বলিয়া কথিত আছে এবং তখন তাঁহার অবক্ষয়ে অনেকটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। এই অষ্টাহ পরে যখন সকলের খাতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া শুনিলেন, যে নিরক্ষর কেশবের মুখে সুন্দর কবিতা স্ফুরিত হইতেছে। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া মনে করিল যে যাঁহারা কৃপায় রত্নাকর বাল্মীকি হইতে পারিয়া ছিলেন, তাঁহারই করুণায় এরূপ ঘটা বড় কথা নহে। কেশব লালের মুখ হইতে সর্ব্ব প্রথম যে কবিতা বাহির হইয়াছিল, তাহা এই:—

"জন্মিয়া ব্রাহ্মণ কুলে, ব্রহ্ম না চিনিলাম রে,
মিছা মায়ার দৃঢ়পাশে বন্ধ হৈয়া রৈলাম রে,
কেশব লালের ভরসা কেবল কানাইয়া ধন হরি।"

এই গীত গাইতে গাইতে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন, আর কেহ তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। তিনি যে কোথায় চলিয়া গেলেন, অনুসন্ধান করিয়াও কেহ পাইল না। তখন সুদীর্ঘজীবী ঠাকুর বাণী নাম[৩৪] প্রসিদ্ধ মহাত্মা বর্ত্তমান ছিলেন, ইঁহার সহিত কেশব লালের ঐ সময় দেখা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

৩৪. ইঁহার চরিত্র কথা পরে উক্ত হইবে।

নিরুদ্দিষ্ট কেশব লাল এক সময়ে বাণিয়াচঙ্গে উপস্থিত হন, তখন বানিয়াচঙ্গাধিপতি দেওয়ান উমেদরাজা বর্ত্তমান।[৩৫] উমেদরাজার অধিকৃত একটি গ্রামের জনৈকা যবনী, "পীরের শিরনী" বা ভোগ প্রস্তুত করিয়াছিল কিন্তু কোন সাধু ফকির না পাইয়া সে বড়ই দুঃখিতা হইয়াছিল; কেশবলাল ঐ রমণীকে দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে তাহার বিষাদের কারণ জিঙ্গাসিলে, সে তাঁহার কাছে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে; তাহার বাক্য শ্রবণে তিনি আপনাকে "ফকির" বলিয়া পরিচয় দেন। তখন সে রমণী আহ্লাদ ভরে তাঁহাকে দুখানা পিষ্টক প্রদান করে, তিনিও পিষ্টকদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরে তাহা খাইবেন বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিয়া আপন ঝুলিতে তুলিয়া রাখেন।

এই সময় দেওয়ানের বিশ্বাস উপাধধারী জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী সেই গ্রামে ছিলেন; তিনি ইহা জানিতে পারিয়া কেশবলালকে দেওয়ানের কাছে লইয়া গেলেন। দেওয়ান উমেদরাজা মোসলমান হইলেও হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি কেশবলালকে যবনীপৃষ্ট পিষ্টক গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি আপনাকে "ফকির" বলিয়াই উত্তর দিলেন। দেওয়ান তখন তাঁহাকে নিজ গৃহের প্রস্তুত "খানা" খাইতে বলিলেন ও খানা আনিতে ভৃত্যকে আদেশ দিলেন; তখন কেশব লাল ঠাকুরবাণীকে স্মরণ করিয়া একটি গীত গাইলেন, সে গীতটা এইঃ—

"মুই কেন আইনু দেওয়ানের বাজারে রে বাণী নাথ!
নদীর কুলে নগর,
বিচারিলাম ঘরে ঘরে,
ফকিরের যুগান কেন মানীরে বাণী নাথ!
মুই কেন আইনু দেওয়ানের বাজারে।
বাসিয়াছে ভবেরি হাট, যার যার কাজে তারিঠাট,
তাহাতে বেপারির কারখানা।
কেহ কিনে কেহ বেচে,
কেহ হরির নাম যাচে,
হরির নামের লাগিয়া কেশবলাল বাউলারে বাশী নাথ!
মুই কেন আইনু দেওয়ানের বাজারে।"

এই গীতে তাঁহার পরিচয় হইয়া গেল। তিনি যে ফকির নহেন—হিন্দু উদাসীন তাহা জানা গেল; খানা আর আসিল না। ইনি যে জনতরির নিরুদ্দিষ্ট পূর্ব্বসিদ্ধ বালক, তাহাও জানা গেল। দেওয়ান তখন তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইতে উদ্যোগ করিলেন ও ভূমিদান করিতে চাহিলেন। কেশব দান গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন—

"জমি ভূমি দোলা ঘোড়া রহুক পড়িয়া।
দেশে দেশে মাগি খাইমু গোবিন্দের নাম লইয়া।"

কিন্তু দেওয়ান কোনরূপেই ছাড়িলেন না, তখন তিনি সেই গোচারণের জঙ্গলটুকু মাত্র গ্রহণে ও একবার মাত্র গৃহ গমনে স্বীকৃত হইলেন।

বহুদিনে মায়ের ছেলে ঘরে গেল, বহুদিনে রতি নাথের শূন্য ঘর আলো হইল, বহু দিন পরে তাঁহার জননী হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন। হায়! তাঁহার পতি কোথায়? তিনি যে পুত্রশোকে শুকাইয়া বহু দিন পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। জননী পুত্র কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। করুণ হৃদয় কেশব লাল মার সে ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিলেন বলিলেন—"মা, আর কাঁদিও না, আমি

৩৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৩য় খঃ ২য় অধ্যায়ে ইহার কথা দ্রষ্টব্য।

তোমার জন্য গৃহী হইলাম।"

ইহা মাতৃভক্তির সুন্দর উদাহরণ; মাতৃ সন্তোষার্থ তিনি নিজের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। মাতৃভক্ত শ্রীমহাপ্রভু সংসার সম্বন্ধ শূন্য হইয়াও, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও মাতার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারই ধর্ম্মানুরত কেশব লাল উদাসীন পন্থী হইলেও ইহার পর যথার্থ গৃহী হইলেন; এমন কি মাতৃ আজ্ঞায় তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইল। সেই বিবাহে তাঁহার মুক্তালাল নামে একটি পুত্র জাত হয়। গৃহে থাকিয়া কিরূপে নির্লিপ্তভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করা যাইতে পারে, কেশবলাল তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মাচরণ জন্য যে গৃহ ত্যাগ অত্যাবশ্যক নহে, স্ত্রীপুত্র লইয়াও যে নির্লিপ্তভাবে সাধনভজন করা যাইতে পারে, কেশবলালের জীবনী আলোচনায় তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।

ঞ্চদেব ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য একজন কবি ছিলেন, তাঁহার বাসস্থান মান্দারকান্দি। কৃষ্ণদেব বিরচিত "নিয়ত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" নামে একখানা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এই পুঁথি হইতে কবির যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কোন স্থান হইতে আসিয়া মান্দার কান্দিতে বাস করেন; তাঁহার পুত্রের নাম কাম দেব বাচস্পতি; কবি কৃষ্ণদেব ইঁহারই পুত্র। কৃষ্ণদেব যে নিতান্ত আধুনিক ব্যক্তি নহেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। যে সময়ে শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে ভিন্নদেশাগত ব্রাহ্মণগণ অধিক মাত্রায় আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই কবির পিতামহ এ দেশের আসিয়া থাকিবেন; যে সময়ে বিবিধ পাঁচালী পুথি রচনায় লোকের উৎসাহ ছিল সে সময়টা নিতান্ত আধুনিক নহে। কৃষ্ণদেব কৃত "নিয়তমঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী পুঁথির যে প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত, ইহাতে কবি নিম্ন লিখিত আত্মপরিচয় দিয়াছেনঃ—

"বরবক্র তীরে সুখে করয়ে বাখান।
মান্দার কান্দি নাম দেশ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥
ব্রাহ্মণ সুজন লোক করেন বসতি।
সদালাপ বিনে কেয়র অন্যে নাহি মতি।
শ্রীকাশীশ্বর ভট্টের মহিমা অপার।
নিবাস করিলা আসি দেখি সদাচার॥
কামদেব বাচস্পতি তান তনয়।
রূপে গুণে কেহ তান সমান না হয়॥
তান সুত কৃষ্ণদেব ভট্ট মহামতি।
গুরুদেবের চরণে করিয়া ভকতি॥
নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী করি নমস্কার।
ভাষা কথা পদবন্দে চাই রচিবার॥
দেশবার্ত্তা হইতে গৃহীত।

গঙ্গারাম ঘোষ (প্রকাশ্য বঞ্চিত ঘোষ)

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ পদকর্ত্তা বাসুঘোষের বংশ কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উত্তরাংশ অংশ ৩য় ভাঃ ৩য় খঃ ৭ম অধ্যায় বিস্তারিত রূপে বলা হইয়াছে, সেই মহাবংশে পরম ধার্ম্মিক কৃষ্ণ ঘোষের উদ্ভব

হয়; ইঁহার পত্নী পরম সাধিকা রেবতীর গর্ভে এক পুত্র জাত হয় তাঁহার নাম গঙ্গারাম, এই গঙ্গারামেরই নামান্তর বঞ্চিত ঘোষ। বঞ্চিত ঘোষের জন্মের পর হইতে কৃষ্ণ ঘোষের অবস্থা ফিরিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কৃষ্ণঘোষ ইহার পরে বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নারায়ণ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বঞ্চিত অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইয়া পড়েন, তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পিতৃহীন বঞ্চিত শিশু বেলা হইতেই অদ্ভুত ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন এ সংসারে নিবদ্ধ ছিল না। সংসারের অন্তরালে কাঁহাকে সর্ব্বদা খুঁজিয়া ফিরিত; এই জন্য সকলে তাঁহাকে উন্মনা মনে করিতেন, লেখা পড়ায় বঞ্চিতের অনুমাত্র খেয়াল ছিল না, কেবল দুষ্ট বালকদল লইয়া খেলিতেন। ইহাতে মাতা রেবতী একদা তাঁহাকে বড়ই তিরস্কার করেন ও ভাতের পরিবর্ত্তে খাওয়ার সময় একথালা ছাই দেন, তদ্দৃষ্টেঃ—

"মাতাকে বলেন গোসাঞিও—'এই নাকি ভাত?'
মাতা বলে—'ছাই খাইয়া মরহ সাক্ষাৎ'।" —বঞ্চিত চরিত্র গ্রন্থ।

"যে বালক লিখাপড়া করেনা, ছাই খাওয়া তাহার কর্ত্তব্য।" মাতার ব্যবহার ও কথায় বালকের বড় বিধৃতি জন্মিল, গঙ্গারাম রাগ করিয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক ভাল স্বভাব-বশে সন্নিকটবর্ত্তী বনে চলিয়া গেলেন। বনে গিয়া হঠাৎ আর ফিরিলেন না, তিনি সরস্বতী—পতির আরাধনায় ব্রত হইলেন।

ঘোর গভীর বনে ভয়োদ্বেগ বিরহিত হইয়া গঙ্গারাম তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলেন। তদীয় উদাস-চক্ষু সর্ব্বদা কাঁহার সন্ধান করিতে বলিয়া বোধ হইত।

সত্যযুগে যমুনার তীরে পঞ্চ বর্ষীয় এক বালক বিমাতা কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত ভয়োদ্বেগ বিহান চিত্তে অবিচলিতভাবে ভগবদারাধনায় তন্ময় হইয়াছিল, গঙ্গারামের তপস্যা সেই দেব শিশুর (ধ্রুবের) কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে।

বঞ্চিত সেই বিজন বনে একটা ডোবার তীরে এক অশ্বত্থ-তলে চিন্তামগ্ন চিত্তে বসিয়া রহিলেন; সেই বনে ব্যাঘ্র ভল্লকের অভাব ছিল না, কোন হিংস্রজন্তু দ্বারাই তিনি উপদ্রুত হইলেন না, বন্য বৃক্ষ তাঁহাকে ফল যুগাইতে লাগিল।

এ দিকে তাঁহার খুল্লতাত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে না পাইয়া, তাহাকে আহ্বান করিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাতার মুখে কথাটি নাই যে অগ্নি তাঁহার অন্তরে জ্বলিয়াছিল, তাহার জ্বালায় তাঁহার চক্ষের জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। এতদূর হইবে বলিয়া তিনি ভাবেন নাই। মনে করিয়া ছিলেন যে তাহার অবজ্ঞা ও ভর্ৎসনায় পুত্রের মতি ভাল হইবে, লেখাপড়ায় মন হইবে, কিন্তু একি হইল! মার অন্তর আত্মগ্লানির অগ্নিতে অহঃরহঃ দগ্ধ হইতে লাগিল।

বঞ্চিত ঘোষ কিন্তু গৃহে ফিরিলেন না, সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল, মূর্খ বালক কবি হইয়া হইয়া উঠিল; গাইতে লাগিলেনঃ—

(১)

"হইলাম ভবের বঞ্চিত নাথ! ভবের বঞ্চিত।
কি, কহিব ছার মুখে তোমাতে বিদিত॥
ভবেতে আসিয়া মুই কি কর্ম্ম করিনু।
সবেধন রামনাম তাহে বিসরিনু॥
মিছামায়া মায়াবশে ভবে রইলু বান্ধা।

পন্থ হারি ঘোর বনে ফিরে যেন আন্ধা॥
মানুষ জনম পাইয়া হেলে গোয়াইনু।
গুরুদত্ত নামধন তাহে না চিনিনু॥
কাহ গঙ্গারাম ঘোষে জনম বিফল।
আপন কুমতি দোষে ভরা হৈল হল॥[৩৬]

(২)

"ওহে নাথ কৃপার সাগর হরি।
তব কৃপা হলে এ ভব তরিয়া
দেশেতে ফিরিতে পারি শুধু॥
রাধাকৃষ্ণ নাম দড়াইয়া না লইলু,
ভবের সম্পদ পাইয়া।
ওপারে পড়িয়া ডাকিছে তোমারে,
দিন গেল মোর গইয়া॥
নাম নিরঞ্জন, পতিত পাবন,
এ বেদ পুরাণে কয়।
(পড়ি) এ ভব সংসারে ডাকিহে তোমারে,
খণ্ডাহ শমন ভয়॥
জনমে জীবনে রাম না গাইনু
আপন করম দোষে।
দীনবন্ধু নামে ভরসা করিয়াছি
অধম বঞ্চিত ঘোষে॥"

(৩)

"গুণনিধি পতিত পাবন তোমার নাম।
ভবের সম্পদ পাইয়া, মুই পাপী ডুবিলুরে, মুখে না লইলু রামনাম॥
রাম কৃষ্ণ হরি, মুকুন্দ মুরারী, বাস করয়ে মোর ঘরে।
এ ভব সায়রে, পন্থ কি করিলু রে, আমি অধম ডাকি তোরে॥
অকুলে না গেলু সে কুলে না রইলু, ঠেকিলু দুকুল মাখায়।
বোর কন্টক বনে, পন্থ চিনাও মোরে; চরণে ঠেলিয়া কর পার।
পাইয়া পরশমণি, কোলে না তুলিনু রে, বলয়ে বঞ্চিত ঘোষে।
শিমলির ফুল চাইতে, জনম গোয়াইলুরে, দিন গেলমিছা পরবাসে॥

যাঁহার কৃপায় রত্নাকর ঋষি হইতে পারেন; মুর্খ গোবিন্দ দাস কবিত্ব লাভে গ্রন্থকার হইতে পারেন, তাঁহার কৃপাতেই এই বালকের মুখে ঈদৃশ ভক্তি সিক্ত সঙ্গীত বহির্গত হইয়া ছিল বলিয়া কথিত। বালকের এই করুণ গীতিকা তাঁহার মর্ম্ম বেদনারই ধ্বনি; আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অদ্ভুত বালক এইরূপ কাঁদিতে লাগিলেন।

শেষোক্ত গীতের ভাবে বোধ হয় যে, তিনি একবারে বঞ্চিত হন নাই, যে সময়েও

৩৬. গঙ্গারাম কেন বঞ্চিত নামে খ্যাত হন, তাহা জানা যায় না। এই গীতটি তাঁহার প্রথম রচিত ও প্রিয় ছিল; ইহার প্রথমেই "বঞ্চিত" শব্দ থাকায় কি তিনি "বঞ্চিত" নামে খ্যাত হন বলা যায় না।

"পরশমণি"র ক্ষণিক দেখা পাইতেন, কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্তি ঘটে নাই; পরে যখন দেখিলেন যে সে ক্রন্দনের শ্রোতা পার্শ্বের বন জঙ্গল মাত্র, যাঁহার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুলিত, তাঁহার দর্শন পাইতেছেন না, তখন তদীয় হৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া গেল, তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ ত্যাগ মানসে জলে ঝাঁপ দিলেন।

সেই সময় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিল, পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য হইতে এক গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী একতন্ত্রী যন্ত্র বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই পরম রূপবান সন্ন্যাসী মুহূর্ত্ত ব্যাজ ব্যতিরেকে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও বঞ্চিতকে উত্থোলন করিয়া সেই অশ্বত্থ তলে লইয়া বসাইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"বৎস, তোমার এ কুবুদ্ধি কেন হইল? তুমি যাঁহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাকে কি সহজে মিলে? আগে মন্ত্র গ্রহণ কর, তাহার পর সেই মন্ত্রটি এক দিবা রাত্র অবিচ্ছেদে জপ কর, তখন ভাগ্য থাকিলে দেখিতে পাইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। বালক মন্ত্র পাইয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া উঠিতে না উঠিতে, ঘন অরণ্যের অন্তরালে নিমেষ মধ্যে সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। বঞ্চিত গুরুকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসার অবসর পাইলেন না।

তদনন্তর বঞ্চিত অনন্য চিত্তে গুরুদত্ত কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জপ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে স্মিত বিকশিত-বদন জগন্মোহন মদন মোহনের অনুরূপ জাগিয়া উঠিল, নবীন নারদ-কান্তি রূপ মাধুরীর ধ্যানে তাঁহার চিত্ত ডুবিয়া গেল।

এক দিবা রাত্রি চলিয়া গেল,—ইহার মধ্যে বঞ্চিতের বাহ্য জ্ঞান হয় নাই, উষারে কিরণ বিকাশে কানন ভূমি যখন জাগিয়া উঠিল, পক্ষিকুল অভীষ্টসিদ্ধি কোলাহলে বনস্থলী মুখরিত হইল, তখন ধ্যান ভঙ্গে বঞ্চিত চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। এ কি? বঞ্চিত কি দেখিতে পাইলেন? দেখিলেন যে যাহার হৃদয়ের সেই ভুবন মোহনের রূপে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বঞ্চিত চক্ষু মুছিলেন, পুনঃ চাহিলেন, তবু সেইরূপ, চক্ষের সমক্ষে সেই বিদ্যুদ্দাম বিজরী তেজোমণ্ডিত নব নীরদ কান্তি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

বালকের মাথা ঘুরিয়া গেল, বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল, বঞ্চিত আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না, ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মুর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। যখন তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন দিবা অবসান হইয়াছে, রবি অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আজ বনভূমির উপর দিয়া এক অপূর্ব্ব বন্যা যেন চলিয়া গিয়াছে, এ স্থলের সকলই যেন কি এক ইন্দ্রজাল বশে আশ্চর্য্য ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বঞ্চিতের শীর্ষদেশে তরুশাখে বসিয়া তখন পর্য্যন্ত কোকিল পঞ্চম কণ্ঠে মধু বর্ষণ করিতেছে, সুরভি কুসুমের সুবাস লইয়া গন্ধবক ধীরে বহিতেছে, আর জঙ্গলের হিংস্রজন্তু—ব্যাঘ্রাদি হিংসা ভুলিয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের নৃত্য করিতেছে।

বঞ্চিতের তখন স্পষ্ট জ্ঞান হইয়াছে, বঞ্চিত বুঝিলেন যে, তিনি যে অনুরূপ দুর্লভ রূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহা চক্ষের ভ্রম দৃষ্টি নহে, তাহা মস্তক বিকৃতির ফল নহে—ধ্রুব সত্য; তাহা না হইলে এই বনস্থলে বৃন্দাবনের ভাব ফুটিয়া উঠিবে কেন? ব্যাঘ্রাদি পশু হিংসা বৃত্তি ভুলিয়া চাহিয়া থাকিবে কেন?

বঞ্চিত আর তখন অজ্ঞ বালক নহেন—তাঁহার হৃদয়ে "পূর্ব্বসিদ্ধ" জ্ঞানের উদয় হইয়াছে! প্রথমেই তাঁহার মনে দেশের ধর্ম্ম দরিদ্রের কথা জাগিল, হায়!

দেশের লোক অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করিয়া কি মোহেই মত্ত রহিয়াছে, বঞ্চিত আর বনে থাকিতে পারিলেন না,—লোকালয়ে—গৃহে চলিলেন।

কথিত আছে যে, একটি ভীষণ ব্যাঘ্র বঞ্চিতের অনুসরণ করিয়াছিল; যখন বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া বঞ্চিত লোকালয়ে উপস্থিত হন, তাহার পাছে পাছে কুকুরের মত একটা ভীষণ ব্যাঘ্র আসিতেছে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয় ও তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করে। বঞ্চিত বাড়ীতে পৌঁছিলে অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসে; বহুজন সমাগম দৃষ্টে ব্যাঘ্রটি বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হইয়া বনে চলিয়া যায়। ব্যাঘ্রটিকে বঞ্চিত আনিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে; কোন মহাশক্তি পরিচালিত হইয়া ভীষণ পশুটি বঞ্চিতকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, কে জানে?

বঞ্চিত গৃহে আসিলেন, গ্রামে কোলাহল উপস্থিত হইল; শত শত লোক লোকালয়ে। সমবেত হইয়া হরিধ্বনি দিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সংকীর্ত্তনে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল, বঞ্চিত বলিতে লাগিলেন।

"হরে কৃষ্ণ রাম নিত্য গুণ ধাম,
মনে রাইখ অবিরাম।
অনিত্য বিষয় সুখের লাগিয়া
কেনবা ছাড়হ নাম॥
যৌবন আবেশে সকামের বশে,
মজিওনা কামিনী রসে।
কুমতি উঠিল রতন হরিল,
বঞ্চিত বঞ্চিত ঘোষে॥"

কে জানিত যে বালক দুষ্ট সঙ্গীবর্গ সহ সারাদিন খেলিয়া বেড়াইত, যে বালক পুঁথির নাম শুনিয়া পলাইত, তাঁহার মুখ হইতে গভীর জ্ঞানের ধ্বনি উত্থিত হইবে? কে জানিত যে, সেই বালকেই হরিনামে দেশ মাতাইয়া তুলিবে? কাহার দ্বারা কি কৌশলে ভগবান কি কাজ করাইয়া থাকেন, তাহা লোক-বুদ্ধির অগোচর।

দেশের জমিদার, ইটার রাজবংশীয় ইস্রাইল খাঁ এই বালক তপস্বীর মহিমা শ্রবণে তৎসহ সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব ও দৈব-শক্তির কথা জ্ঞাত হইয়া তিনি তৎপ্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তদীয় তপঃক্ষেত্র পরিস্কৃত করাইয়া দান করিলেন, ইহাই "মোহন্তালয়" (অপভ্রংশ মহলাল) নামে খ্যাত হইল।

এইরূপে অঞ্চল হরিনামের ধ্বনিতে পূরিত হইল। একদিন বঞ্চিত কৃষ্ণ প্রেমাবশে নাচিতে নাচিতে ইটার ভাঙার হাটে উপস্থিত হইলেন। জোড়ারাম নামক অত্রত্য এক ব্যবসায়জীবী অতি ধার্ম্মিক ছিলেন, ক্রেতার একটি পয়সাও অতিরিক্ত লইতেন না। তিনি অন্বর্থনামা মহাজন ছিলেন। বঞ্চিত জোড়ারামকে বলিলেন, "সাধো, আমি বহুদিন যাবৎ উপবাসী, তুমি আমাকে দু'টি অন্ন খাইতে দাও।" সাধুর অবারিত করুণায় জোড়ারাম কৃতার্থ হইলেন। জোড়ারামের গৃহে আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইল, হরিনামের পবিত্র ধ্বনিতে সে স্থান পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

হরিশ্চন্দ্র নামে এক জাত্যভিমানী ব্যক্তি সর্ব্ব জাতির একত্র সমাবেশ ও মিশামিশি দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বহুলোক সহ জোড়ারামের গৃহে উপস্থিত হইলেন কিন্তু বঞ্চিতের কাছে আসিলে আর তাঁহার আক্রোশ থাকিল না; তিনি বুঝিতে পারিলেন, ধার্ম্মিকের কাছে সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হইতে পারে না, ধর্ম্ম সামাজিকতার অতীত, সিদ্ধপুরুষ বঞ্চিত সামাজিকতা প্রভৃতি ভেদ বিচারের বহু উর্দ্ধ স্তরে আরোহণ করিয়াছেন। বুঝিলেন যে, ভেদ বিচার ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতক্ষণ না মনে আত্মপর জ্ঞান রহিত হয়।

বাদশাহ সাক্ষাত

বঞ্চিতের বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র, এই সময় দিল্লীর বাদশাহ দেশের সাধু সমস্তের সংবাদ গ্রহণের অভিলাস করিয়া, কর্ম্মচারি বর্গের উপর তালিকা প্রস্তুতের আদেশ দেন। তদনুসারে শ্রীহট্টের শাসন কর্ত্তা বা আমিল, শ্রীহট্টের শ্রেষ্ঠ সাধু সমুহের মহিমা, নামাবলী জ্ঞাপন করিলে, তাঁহাদের কয়েক জনকে দিল্লী লইয়া যাইতে তিনি আদিষ্ট হন। এই আমিলের জন্মভূমি দিল্লী ছিল।

তৎকালে শ্রীহট্টে পাগল শঙ্কর, ঠাকুর রাণী, বৈষ্ণব রায় এবং বঞ্চিত ঘোষ মহিমাই বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং আমিল ইঁহাদিগকে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। শ্রীহট্টের সীমা অতিক্রম করিলেই একদিন বঞ্চিত ঘোষ ব্যতীত আর তিন জন আমিলকে বঞ্চিত করিয়া অদৃশ্য হন, তখন আমিল অগত্যা এই মহাত্মাকে লইয়া দিল্লী গমন পূর্ব্বক তাঁহাকেই সম্রাট সদনে উপস্থিত করেন। বাদশাহ সাধুর "কেরামত" বা গুণপনা দর্শনে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু যাঁহারা "ভবের বাদশাহের" হুকুমে চলিয়া থাকেন, তাঁহারা কোনও ব্যক্তি বিশেষে ইচ্ছা পূরণের জন্য "ইন্দ্রজাল" জারি করিতে রাজি হন না, বঞ্চিতও হইলেন না। বঞ্চিতের ব্যবহারে বাদশাহ বিরক্ত হইলেন, এবং অখাদ্য খাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিতে আদেশ দিলেন। দৈব বশতঃ সেই সময় দিল্লী নগরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল, নাগরিকের হাহাকার ধ্বনি সম্রাটের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সম্রাট নিজ মনে ইহা সাধু নিগ্রহের ঈশ্বর দত্ত শাস্তি বলিয়া বোধ করিলেন ও সেই অসৎ চিন্তায় বিরত হইলেন। সম্রাট ভাবিলেন—যে ব্যক্তি দিল্লীর বাদশাহের সম্মুখে বসিয়া বাদশাহের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে, তাঁহার সেই সাহস হইতে অদ্ভুত আর কি হইতে পারে? কোন্ "কেরামত" হইতে ইহা ছোট? এই ভাব মনে উদয় হইলে তিনি পূর্ব্ব কল্পিত সাধু দ্রোহের কথা স্মরণে লজ্জিত হইলেন ও তজ্জন্য সাধুকে বহুধন ও ভূমি দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সাধুর কি অভাব? তিনি এ দান গ্রহণ করিলেন না, বলিলেনঃ—

> বাদশাহ! "কামিনী আর কাঞ্চন দুই অনর্থের মূল।
> তাতে লোভ কৈলে হর ধর্ম্ম নিরমূল।"—বঞ্চিত চরিত্র গ্রন্থ।

বাদশাহ হিন্দু সাধুর নির্লোভ ভাব অবলোকনে প্রীত হইলেন; সাধুও সম্রাট সকাশে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে চলিলেন।

বৃন্দাবনে

পথিমধ্যে এক পর্ব্বত, পর্ব্বত পার হওয়াকালে মধ্য পথে এক প্রকাণ্ড অজগর তাঁহাকে আক্রমণ করে, সাধু প্রসন্ন চিত্তে সেই সর্পকে হরিনাম শুনাইয়া দিলেন, আর সাপ সেই নাম মন্ত্র শ্রবণে উন্নত মস্তক অধঃ করিয়া যেন তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, একটা বিদেহী দানব তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, সেও হরিনাম শ্রবণে সরিয়া যায়।

তিনি বৃন্দাবনে পৌছিলেন ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনে প্রেমে পুলকিত হইলেন। গৌর-পরিকর গোস্বামীগণের সমাধি দর্শনে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শোকাকুল চিত্তে শয়ন করিয়া নিদ্রা-বিভূত হইলেন, সেই সময় শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। তিনি শ্রীজীবের চরণে পতিত হইলে, গোস্বামী বলিলেন—যাও বঞ্চিত, দেশে যাও, নিজের সুখের জন্য বৃন্দাবনে বসিয়া রহিও না; অসংখ্য দেশবাসী যে কৃষ্ণ প্রেম সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, কে তাঁহাদিগকে সুধায় আস্বাদন করাইবে? যাও বঞ্চিত, দেশে যাও, তুমি দেশে গিয়া বিবাহ কর ও সংসারে অলিপ্ত থাকিয়া ধর্ম্ম পালনে লোক উদ্ধারের পন্থা প্রদর্শন কর।"

বঞ্চিত সাধন প্রভাবে অব্যাহত গতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে, বৃন্দাবনে তিনি সামান্য কয়েকদিন মাত্র ছিলেন, তাহার পরেই নিজগৃহে উপনীত হন। তিনি দেশে আসিলে তাঁহার মাতা বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, পঞ্চেশ্বরের বিশ্বাস বংশে একটি সুপাত্রী তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাকেই বধূ করিতে ইচ্ছা করিলেন; বঞ্চিত আর অস্বীকৃত হইলেন না, মাতৃ আজ্ঞাপালনে গৃহী হইলেন।

দেশে সংকীর্ত্তন

বিবাহের পর বঞ্চিতের ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিল না, বরং সংকীর্ণ তরঙ্গ আরও বর্দ্ধিত হইল, "বাণী চরিত্র" পাঠে জানা যায় যে, এই সময় ঠাকুর বাণী, পাগল শঙ্কর এবং বৈষ্ণব রায় তাঁহার সহিত কীর্ত্তনে কখন কখন যোগ দিতেন। কথিত আছে এতদঞ্চলে চৌতালা কীর্ত্তনের তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার কীর্ত্তন কেবল স্বগ্রামেই নিবদ্ধ রহিল না, তিনি ভক্তবর্গ সহ কীর্ত্তন লইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে গ্রামে তিনি যাইতেন তাঁহার মহিমায় লোক আকৃষ্ট হইয়া যাইত ও হরিনাম গ্রহণে পবিত্র যে যে স্থানে তাঁহার কীর্ত্তন বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল; তন্মধ্যে ভানুগাছ, বালিশিরা, সাতগাঁও আতুয়াজান, শ্রীহট্ট শহর, লক্ষ্মীপুর, ইন্দেশ্বর, লংলা প্রভৃতি প্রধান।

তিনি সাতগাঁও অবস্থিতি কালে ঠাকুরবাণীর শেষ মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্তে দিনারপুর গমন করেন ও তথায় ঠাকুরবাণীর সহিত মিলিত হন। এই উৎসবের শেষ দিনেই ঠাকুরবাণী আত্মীয় বর্গ হইতে বিদায় লইয়া লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া যান।[৩৭]

বঞ্চিত পরিভ্রমণ কালে, যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেন, তাহাকেই আগ্রহ সহকারে বলিতেন—

"হরি হরি একবার মুখে বল ভাই।
আমরা কলির জীবের অন্য গতি নাই॥

কীর্ত্তনে প্রায়শঃ তিনি স্বরচিত একটি গীত ব্যবহার করিতেন, তাহা এইঃ—

"একান্ত ভজ গৌরাঙ্গ চরণ।
এমন সম্পদ আর নাহিক ভুবন॥
নিরবধি ভববিধি যাহা না পাইলা।
অবতরি গোরাচাঁদ তাহা বিলাইলা॥
হরিনাম সংকীর্ত্তন নাচিয়া গাইয়া।
আপন মাধুর্য্য ভাব দিলা জানাইয়া॥
যশোদানন্দন পহুঁ মাধুর্য্য সাধিয়া।
নবদ্বীপ হাটে আনি দিলা চালাইয়া॥
মোসম অধম লাগি কৃষ্ণের অবতার।
বঞ্চিত কহরে জাণ গৌরাঙ্গ আমার॥"

ঘোষ ঠাকুর বালিশিরার জনৈক মোসলমানকে বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত করেন। ভানুগাছে অবস্থিত কালে তারণ রামধর নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতেই তাঁহার কীর্ত্তন স্থান নির্ণীত হইয়াছিল। আতুয়াজানে বহুতর ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকটে সমুপস্থিত হইয়াছিলও কেহবা তাঁহার হস্তস্পর্শে, কেহবা সংকীর্ত্তনের ধ্বনি তরঙ্গিত বায়ুস্পর্শে ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। প্রাণ শঙ্কর চৌধুরী নামে তথাকার এক ব্যক্তি বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা করেন। তিনি ইন্দেশ্বর পৌছিলে অত্রত্য খলাগ্রাম বাসী জনৈক চৌধুরী তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। লংলাতে

৩৭. ঠাকুর বাণীর বৃত্তান্ত এসব কথা বিস্তারিত কথিত হইবে।

প্রথমতঃ কোন কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারাও সিদ্ধ মহাত্মার মহিমা দৃষ্টে তাঁহার আদর করিতে অবহেলা করেন নাই।

বাড়ীতে

ঘোষ ঠাকুর এইরূপ নানা স্থানে কীর্ত্তন প্রচার পূর্ব্বক বহুদিন পরে বাড়ীতে আসিলে, সেই সকল স্থানের ভক্তবর্গ তাহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। একদা এক চোর ভাবিল যে, বিদেশের নানা জনে ইহাকে অবশ্য ধন দান করিয়া থাকে, এই ধন হস্তগত করিতে হইবে, এই ভাবিয়া সে একরাত্রে গৃহে প্রবেশ করিল। বিদেশ হতে যাঁহারা আসিত, তাঁহারা প্রায় তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিত; যখন চোর গৃহে প্রবেশ করিল, তখন সেই ভক্তবর্গ সকলেই নিদ্রাবিভূত, কিন্তু ঘোষঠাকুর স্বয়ং সেই শেষ রাত্রেও ইষ্ট চিন্তায় জাগ্রত রহিয়াছেন। তিনি চোরকে দেখিয়া মনে করিলেন, এ ব্যক্তি আমাকে জাগ্রত জানিলে চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহার আগমন ও পরিশ্রম বৃথা হইবে, হায়! সে না জানি কত অভাবগ্রস্ত! এইরূপ ভাবিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিতবৎ পড়িয়া রহিলেন—যেন চোর নিরুদ্বেগে ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি লইতে পারে। কিন্তু ঘটিল বিপরীত, তিনি চক্ষুমুদ্রিত করিলেন বটে, এদিকে দৈববশে চোরের দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল! সে মহা বিভ্রাটে পড়িল। ঘোষ ঠাকুর ইহা অনুভব করিতে পারিয়া করুণা পরতন্ত্র হইয়া চোরকে ধীরে ধীরে ডাকিলেন—যেন অন্যে শুনিয়া ও জাগ্রত হইয়া গণ্ডগোল ঘটাইতে না পারে। তাঁহার আহ্বানের সহিত চোরের দৃষ্টিশক্তি পুনঃ সমাগত হইল। চোর তখন আপন অভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ঠাকুরের চরণে লুটাইয়া পড়িল।

এই ঘটনা গুপ্ত রহিল না, এইরূপ আরও বহুতর ঘটনার কথাই তৎসম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায় এবং তাহাতে তিনি জনসাধারণ দেববৎ পূজিত হন। তাঁহার পুত্র পাঁচজন ছিলেন, ইঁহাদিগকে উপযুক্ত রাখিয়া, যথাকালে তিনি সমাধি যোগে দেহ ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তিনি একটি মশারির ভিতরে পদ্মাসন উপবেশন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চারি পার্শ্বে ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক উচ্চ সংকীর্ত্তন হইতেছিল। নিরূপিত সমায়ান্তে যখন মশারি উত্থিত হইল, তখন দেখা গেল যে ঘোষ ঠাকুর দিব্য ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গিরীশ চন্দ্র রায় (রাজা)

"১৭৬৬ শকাব্দের ৭ই চৈত্র বুধবার দ্বাদশী তিথিতে ২৩ দণ্ড সময়ে রাজা গিরীশচন্দ্র; শ্রীহট্টের বোয়ালজুর পরগণার চরভুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মদাতা পিতার নাম দীপচন্দ্র নন্দী চৌধুরী ছিল, রাজা গিরীশ চন্দ্রের পূর্ব্বনাম ব্রজগোবিন্দ নন্দী চৌধুরী ছিল।"

"যখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর ছিল, তখন সুপ্রসিদ্ধ "বাবু" মুরারি চাঁদের কন্যা তাঁহাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহার পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে "গিরীশচন্দ্র" এই নাম রাখা হয়। পোষ্য পুত্র রূপে গৃহীত হওয়ায় গিরীশচন্দ্র বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।"

"রাজা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত না হইলেও, সাহেবদের সঙ্গে আলাপকালে তাঁহাদের কথা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিতেন, সুতরাং ভাল ইংরেজী জানিতেন না বলিয়া তাঁহার ইহাতে কোন অসুবিধাই ঘটিত না। রাজার সহিত দীন দুঃখী ও পথের ভিখারীও আলাপ করিতে পারিত, ইহাদের দুঃখের কথা তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে শুনিতেন। রাজার শরীর যেমন সুশ্রী বলিষ্ঠ ছিল, মুখমণ্ডল যেমন প্রতিভা মণ্ডিত ছিল, মনও তেমনি উদার, উচ্চ ও কোমল ছিল; একদিন তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, তদীয় অমায়িকতা ও ভদ্রতায় বিমোহিত হইতে হইত।"

দরিদ্রকে দান করিতে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ দানই ঢক্কা রবে নিনাদিত

না হইয়া সংগোপনে সম্পাদিত হইত, এরূপ অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সংখ্যা করা যায় না। দেশের সাধারণ লোকে যাহাতে সুশিক্ষা পায় তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, এবং এ বিষয়েও তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি "গিরীশ বঙ্গ বিদ্যালয়"[৩৮] ও তৎসংসৃষ্ট সংস্কৃতচতুষ্পাঠী পরিচালন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মাতামহের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ "মুরারি চাঁদ এন্ট্রাস স্কুল" ও "মুরারিচাঁদ কলেজ" (১৮৮১ খৃঃ) স্থাপন করিয়া শ্রীহট্টবাসীর উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। "তাঁহার সময়ে তদীয় স্কুল কলেজের প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রই বিনা বেতনে ও অল্পবেতনে অধ্যয়ন করিত, তদ্ব্যতীত নিঃসহায় ছাত্রদের জন্য মাসিক কয়েকটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল।" "রাজা স্ত্রী শিক্ষারও পরম সহায় ছিলেন" এবং নানা রূপে তাঁহার সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

চা-ক্ষেত্র সংস্থাপন একটি ব্যয় সাধ্য উচ্চতর স্বাধীন ব্যবসায়, আসাম প্রদেশে বাঙালীর মধ্যে রাজা গিরীশচন্দ্রই সর্ব্ব প্রথম চা বাগান প্রস্তুত করিয়া, ঈদৃশ সম্মান জনক স্বাধীন ব্যবসায়ে সকলের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন।

১৩০৫ সনে গিরীশচন্দ্র রাজা উপাধিতে বিভূষিত হন। তদানীন্তন চিফ কমিশনার সার হেনরী কটন মহোদয় শ্রীহট্টে আসিয়া প্রকাশ্য দরবারে অতি জাঁকজমকের সহিত তাঁহাকে রাজোপাধির সনন্দ দান করেন। দরবারান্তে রাজা সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আশীর্বাদ গ্রহণান্তে তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দানাদি দ্বারা সৎকার করেন।

"রাজা গিরীশচন্দ্র লোককে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার ভবনে ভোজের সময় সর্ব্বদাই তিনি পংক্তির কাছে নগ্নপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও সম্ভাষণ করিতেন, তাঁহার বিনীত ব্যবহার ও মিষ্টালাপে সকলেই তুষ্ট হইত।" "হিন্দু, মোসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলের ধর্ম্ম কার্য্যেই তিনি অজস্র অর্থ দানে কুণ্ঠীত হইতেন না।"

"বিপদে পড়িয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তি আশ্রয় চাহিলেও রাজা তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিতেন, শহরের ধোপাদীঘী একদা গবর্ণমেন্ট দখল করিতে চাহিলে ধোপারা যখন রাজার আশ্রয় যাঁঞা করিল, তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন যে, তোমরা মোকদ্দমা কর, ধুপাদীঘী তোমাদেরই, ইহা আমি জানি।" মোকদ্দমার ব্যয় তখনই ১০০ টাকা দিয়া বলিলেন, "দরকার পড়িলে আরও ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত আমি দিতে স্বীকৃত আছি।" ফলতঃ রাজার অনুগ্রহে ধোপারা ধোপাদীঘীর অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিল।"

"রাজা বিধবাদের জন্য সর্ব্বদাই দুঃখ করিতেন।" যদি বিধবারা পবিত্রভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের কোন উপায় অনুষ্ঠিত হয়, অথবা নিরাশ্রয় বিধবাদের জন্য "একটি বিধবাশ্রম হয়, তবে তিনি ৫০০০ সহস্র টাকা দান করিতে" প্রস্তুত ছিলেন।

"রাজা গিরীশ চন্দ্রের মাতৃ-ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মাতার জীবদ্দশায় তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাতাকে প্রণাম না করিয়া কোন কাজেই যাইতেন না।"

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূকম্পের সময় রাজা গিরীশ চন্দ্রের সুরম্য প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়।"

"রাজা ইষ্টক স্তুপের নীচে পড়িয়াছিলেন," একটা বৃহৎ বিম আড়ভাবে শূন্যে থাকিয়া রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। "ইষ্টক স্তুপের নীচে পড়িয়া রাজা হে হরি! হে কৃষ্ণ! রবে যখন

৩৮. পূর্ব্বে ধর্ম্মপুর নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক "নবাব তালাব বঙ্গ বিদ্যালয়" নামে শ্রীহট্ট শহরে একটি বঙ্গ বিদ্যালয় নবাব তালাব নামক দীঘীর উত্তর তীরে স্থাপিত হইয়া দক্ষতার সহিত পরিচিত হইতেছিল, উহাই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গিরীশ চন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হয়। বলিতে গেলে সেই হইতেই সাধারণ শিক্ষার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। গিরীশ চন্দ্রের হাতে গিয়া উহা "গিরীশ বঙ্গ বিদ্যালয়" নামে খ্যাত হয়। পরে উহাই "গিরীশ মধ্য ইংরেজী স্কুল" রূপে পরিণত হইয়া অদ্যাপি চলিতেছে।

কাতর কণ্ঠে চিৎকার করিতে ছিলেন, তখন মটাই নামক জনৈক (মটাই কোংর মটাই) ব্যক্তি



৺গিরিশচন্দ্র রায়, সিলেট

এই কাতর ধ্বনি শুনিয়া রাজাকে ইষ্টক স্তূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করে। রাজা এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন এবং আজীবন মাসিক পেনশন ধার্য্য করিয়া দেন।

ভূকম্পে স্কুল ও কলেজ গৃহাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়, এই উপলক্ষে রাজার জনৈক হিতৈষী ব্যয় হ্রাসের প্রসঙ্গে বলেন, "এখনই স্কুল ও কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রকৃত সময়, এখন উহা উঠাইয়া দিলে কেহ নিন্দা করিবে না।"

একথা শুনিয়া রাজা জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন "এই দেহে প্রাণ থাকিতে আমি স্কুল ও কলেজ উঠাইয়া দিতে পারিব না।" রাজা তখন ঋণজালে জড়িত ছিলেন।"

"গিরীশ চন্দ্র তাঁহার নিজবাড়ী প্রস্তুতের পূর্ব্বেই স্কুল ও কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ ও মেরামত করাইয়া দিয়াছিলেন।" "শিক্ষা বিষয়ে রাজা স্বয়ং তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যান।" বিপুল ঋণ ভারাক্রান্ত তদীয় সম্পত্তির পক্ষে অন্যান্য বিষয় ছাড়া কেবল একটি বিষয়ে এরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও গিরীশ চন্দ্রের ন্যায় উচ্চান্তঃকরণ ব্যক্তির শোভনীয়ই বটে।

রাজা গিরীশ চন্দ্রের জীবনের পুণ্য কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত করার পক্ষে স্থানাভাব। দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ, বিপদগ্রস্থের দুঃখবারণ, আর্ত্তের পরিত্রাণে সর্ব্বদাই তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং সর্ব্বদাই তিনি তত্তদ্বিষয়ে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তাঁহার সৎকার্য্য প্রাচ্য রীত্যনুযায়ী সম্পাদিত হইত, ইহাতে ঢাক ঢোল বড় বাজিত না—গোপনেই হইত। তাঁহার ঐ সকল সংখ্যাতীত দানের পাত্র অনেক, সমষ্টি অপরিমিত! এ জিলার পূর্ব্বাঞ্চলের অসংখ্য উপকৃত ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতে জীবিত আছেন।

গিরীশ চন্দ্রের হৃদয় কিরূপ কোমল ছিল, একটি ঘটনায় তাহা বহু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেন। চট্টগ্রামের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে জনসাধারণের কষ্টের কাহিনী পাঠ করিয়া রাজার চক্ষু ছল ছল করিতে ছিল, তিনি অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সেই সমস্ত দুস্তব্যক্তির সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ এক সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৩১৪ বাংলার ২রা বৈশাখ রোববার বেলা ৯ ঘটিকার সময় রাজা বাহাদুর তাঁহার নিজ প্রাসাদে শান্তি মোহিত চিত্তে কথা কহিতে কহিতে শান্তিময়ের ক্রোড়ে চির আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বর্গারোহনের অর্দ্ধ মিনিট পূর্ব্বে তিনি সিভিল সার্জ্জন মিঃ ষ্টিনকে বলেন যে "তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে কি না।" ফলতঃ মৃত্যুকালে তাঁহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

"রাজার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ডিপুটী কমিশনার মিঃ কুহান ডিপুটী কমিশনার আফিস, লকেল বোর্ড আফিস, জজ আদালত, সব জজ আদালত, মুনসেফ কোর্ট ও গবর্ণমেন্ট স্কুল প্রভৃতি বন্ধ দিয়াছিলেন। বন্দর বাজারের মহাজনেরা তাঁহাদের স্ব স্ব দোকান সেই দিনের তরে বন্ধ করিয়াছিলেন। মুরারি চাঁদ কলেজ হাই স্কুল সাতদিনের তরে বন্ধ হইয়াছিল।"[৩৯] শহর নিস্তব্ধ নীরব হইয়াছিল, "কি হইল" বলিয়া সকলেই বিষাদ প্রকাশ করিয়াছিল। যথা সময়ে মহাড়ম্বরে রাজার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল।

গোবিন্দ খাঁ

শ্রীহট্ট—বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি গোবিন্দ খাঁর বৃত্তান্ত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ দ্বিতীয়ভাগ, ৩য় খণ্ড ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে আর লিখিত হইল না। উহা সেই স্থলেই দ্রষ্টব্য।

৩৯. ১৩১৪ বাংলার ২৩শে বৈশাখের পরিদর্শক হইতে এ প্রবন্ধে অনেক স্থল উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গোরাচাঁদ অধিকারী

গুরু গোরাচাঁদ লক্ষ্মীপুরের কামদেব বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এই বংশের সংক্ষিপ্ত কথা ৩য় ভাগের ১ম খণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এই বংশীয়গণ কায়স্থ হইলেও গুরুতা ব্যবসায়ী।

গোরাচাঁদের পিতার নাম মাধবদাস। মাধব দাসের শিষ্য সম্পদ অল্প ছিল না। পিতৃ বিয়োগের পর গোরাচাঁদ শিষ্য সংরক্ষণে ও "বার্ষিকী" আদায় করিতে শিষ্য বাড়ী যাইতে আরম্ভ করেন। অপূর্ব্ব শারীরিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত গুরুর যোগ্য গুণাবলীতে প্রথমে যে তিনি বিভূষিত ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুরুর ছেলে গুরু, তাই শিষ্য সমাজে তাঁহার অনাদর ছিল না।

যাঁহারা গুরুর উচ্চাসনে আরূঢ় হইতে অভিলাষী, তাঁহাদের চরিত্র যেরূপ সজ্জিত, নির্দ্দোষ ও অন্যের অনুকরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য, প্রথমে তাঁহাও যে তাঁহার ছিল, এমন নহে, তথাপি গোরাচাঁদ গুরু ছিলেন।

একদা তিনি এক শিষ্যগৃহে গমন করেন, শিষ্যের পত্নী অতি রূপবতী, সেই সরলা যুবতী গুরুকে প্রণাম করিতে আসিলেন; এদিকে গুরুদেব তাঁহার অতুল রূপ রাশি দর্শনে একবারে চঞ্চল চিত্ত ও অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন;[৪০] এমন কি তিনি নির্লজ্জ্যভাবে নিজ মনোভাব তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

সেই শিষ্যপত্নী গুরুর মুখে অনুচিত বাক্য শ্রবণে যেমন ব্যথিতা হইলেন তেমনি ক্রোধিতা হইয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ক্রোধে রমণীকে মুখরা করিয়া তুলিল; তিনি বলিলেন "গুরুদেব" আপনি পিতৃতুল্য, আপনার এ কিরূপ কথা?[৪১] "গুরুদেব"! আপনি না গোস্বামী বলিয়া পরিচয় দেন? গোস্বামী কাকে বলে জানেন না? গো শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়, যে ইন্দ্রিয় জয়ী. সে-ই গোস্বামী। কিন্তু ইন্দ্রিয় যাহার উপর স্বামিত্ব করে, সে "গোস্বামী গাভীর স্বামী ষাঁড় মাত্র গুরুদেব, আপনাকে অধিক কি বলিব, আপনি কি রূপ গোস্বামী বুঝিয়া লউন।"

সেবক-পত্নীর এই ভর্ৎসনা বাক্যগুলিতে গুরুদেবের জ্ঞান-নেত্র স্ফুরিত হইল, তিনি রমণীর

---

৪০. "কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস লক্ষ্মীপুরে।
ব্যবসা গুরুতা তাঁর জানয়ে সংসারে।
প্রথম যৌবনে ছিল অত্যন্ত সুন্দর।
একদিন চলিলেন সেবকের ঘর॥" ইত্যাদি।
—রঘুনাথ লীলামৃত (মুদ্রিত)

৪১. "গোরা চাঁদ অধিকারীর এবাক্য শুনিয়া।
রাগে পরিপূর্ণা নারী কহিল গর্জ্জিয়া॥
আপনি শ্রীগুরু।—মোর পিতার সমান।
বীজ মন্ত্র মম কর্ণে করেছ প্রদান॥"
"গোস্বামী বলিয়া লোকে দাও পরিচয়।
গোস্বামী শব্দের অর্থ কেহ মহাশয়?
"গো শব্দে দেহেন্দ্রিয় অভিধানে কয়।
যেই জন করিয়াছে ইন্দ্রিয়কে জয়॥
জিতেন্দ্রিয় যেই জন সেই সে গোস্বামী।
যাহা জানি বিস্তারিয়া কহিনু সে আমি॥
ইন্দ্রিয় স্বামিত্ব করে যাহার উপর।
গাভী স্বামী বৃষ-সেই কেবল পামর॥
ইন্দ্রিয়ের সুখে যেই ব্যাকুল সদায়।
তাহাকে গোস্বামী বলে, মনে দুঃখ পায়॥" ইত্যাদি

প্রতি বিরক্ত না হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সেবার আর তাহার "প্রবাসে" যাওয়া হইল না, বিবেকের তীব্র তাড়নার গৃহে ফিরে চলিলেন।

গোরাচাঁদ সহজ ধর্ম্ম প্রচারক শ্যাম কিশোর ঘোষের[৪২] কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, গৃহে গিয়া পত্নীর কাছে অকপটে চিত্তে সেই শিষ্য পত্নীর ভর্ৎসনার কথা বর্ণন করিলেন এবং এই অপমানে গৃহ ত্যাগের বাসনা করিলেন।

গোরাচাঁদের পত্নী পরম বুদ্ধিমতী ছিলেন, নানা উপায়ে তিনি পতিকে স্থির করিয়া আপন পিতার নিকটে তাঁহাকে পাঠাইলেন। গোরাচাঁদ শ্বশুড়ের নিকটে অনেকদিন অবস্থান করিলেন। সহজ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা ছিল, সেই স্থানে থাকিয়া তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয়াশক্ত পুরুষ সহজ ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করা উচিত নয়, এবং এই ধর্ম্মের সাধনায় উদ্দম পরিহার করিয়া মন অনেকটা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গোরাচাঁদ কাজেই সহজ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সে যাহা হউক গুরুগণের কিরূপ সতর্ক থাকিয়া চলা উচিত, অসতর্ক গুরু গোরাচাঁদের চরিত্র চিন্তা করিলে তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়।

গোবিন্দ চরণ দাস

গোবিন্দ চরণ দাস শ্রীহট্টীর সাহু বংশ সম্ভূত গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে শহরের রায় নগর মহল্লায় তাহার জন্ম হয়। গোবিন্দ চরণ তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন; তাঁহার মাতা পুত্রকে সংস্কৃত পড়াইবার বন্দোবস্ত করেন। বালক অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যাকরণাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ ব্যাকরণের তর্কে কখন কখন ব্রাহ্মণদিগকেও ঠেকাইতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার মাকে বলেন যে গোবিন্দ চরণের সংস্কৃত অধ্যয়ন বন্ধ না করিলে তর্কে পরাভূত কোন ব্রাহ্মণের অভিশাপে অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে; পুত্রের ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় মা ছেলের টোলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তখন গোবিন্দ চরণের বয়স তের বৎসর মাত্র। এই সময় দৈবক্রমে একজন মিশনারীর সহিত তাহার দেখা হইল। তিনি তাহাকে ইংরেজী পড়িতে পরামর্শ দেন।

তৎকালে ইংরেজী শিক্ষায় প্রেরণ করা একরূপ সমাজ বিদ্রোহিতা বলিয়া বিবেচিত হইত; ইংরেজী শিক্ষিতেরাও প্রায়তঃ খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইত। তদবস্থায় অনেকেই এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও গোবিন্দ চরণের অত্যাগ্রহে শেষে তাঁহার মাতা পুত্রকে ইংরেজী পড়িতে অনুমতি দিলেন।

ইংরেজী শিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল, সাহেব শিক্ষক তাঁহার পরিশ্রম ও প্রতিভা দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। গোবিন্দ চরণ ছয় বৎসর কাল ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়া অতি সুখ্যাতির সহিত জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও দুইটি মডেল প্রাপ্ত হন।

গোবিন্দ চরণ তখন চাকুরী গ্রহণে অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু তিনি অধ্যয়ন ত্যাগে স্বীকৃত না হইয়া ঢাকায় গিয়া ইংরেজী পড়িতে চাহিলেন। তৎকালে রেল বা ষ্টিমারে দূরদেশে যাইবার সুবিধা ছিল না, নৌকাপথে যাইতেও ডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল। তদবস্থায় মা কোন প্রকারেই পুত্রকে একা পাঠাইতে না পারিয়া তাহার সহিত ঢাকায় চলিলেন। তথায় দুই বৎসর অধ্যয়নের পর গোবিন্দ চরণ সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে আসিলেন। এতদূর পড়িয়াও গোবিন্দ চরণ যে খৃষ্টান হন নাই, তদ্দৃষ্টান্তে শহরবাসীর মন হইতে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ বহু পরিমাণ দূর হয়।

দেশে আসিবার পর গোবিন্দ চরণ কিছুদিন ময়মনসিংহের জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু জন্মভূমির প্রতি মনের টান তাঁহাকে শ্রীহট্টে আনয়ন করিল, শহরে পৌঁছিবা মাত্র তিনি

৪২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাঃ ৩য় খণ্ড ৮ম অঃ দেখ।

মিশন স্কুলের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

গোবিন্দ চরণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু প্রবল জ্ঞান-স্পৃহা বশতঃ স্কুলে কার্য্য কালীন তিনি বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আট বৎসর পরে মিশনারি সাহেবের সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন; গোবিন্দ চরণ নিজ ছাত্রদেরকে বড়ই ভালবাসিতেন, সহাস্যবধন শিক্ষক হাস্য কৌতুকের সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন; ছাত্রগণ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকতে পারতেন না। তিনি স্কুল ত্যাগ মাত্র প্রায় সকল ছাত্রই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসেন; ইহাই বলিতে গেলে মিশন স্কুলের মৃত্যুর কারণ; গোবিন্দ চরণ সেই ছাত্রদেরকে তখন স্বয়ং শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার পরেই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম কিছুদিন যিনি (উঁমাচরণ বাবু) প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি চলিয়া গেলে স্কুল কমিটির মেম্বর দের সকলেই ইচ্ছা হয় যে, গোবিন্দ চরণকে প্রধান শিক্ষকের পদ দেওয়া হয় যে। এই সময় শ্রীযুক্ত দুর্গা কুমার বসু নামক এক প্রতিভাবান যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে, ইহার চেষ্টায় তাঁহার দেশবাসী ছাত্রবর্গের মঙ্গল হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহার জন্য স্বয়ং কমিটিকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষা হইলে তিনি সানন্দে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

গোবিন্দ চরণকে অতঃপর কাছাড় জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রদান করা হয়, কিন্তু জন্মভূমির মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া ও নিজ পুত্র কন্যার শিক্ষার সুবিধার জন্য শীঘ্রই তিনি সে দেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পদে উপস্থিত হন। তৎপর তিনি কিছুদিন শ্রীহট্ট নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্য করেন। ইহার পরে জোড়হাট, ধুবড়ী ও গৌহাটিতে হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে এই পদোন্নতি গ্রাহ্য করেন নাই। শ্রীহট্টে থাকিয়া স্বয়ং স্বদেশীয় ছাত্রবর্গকে শিক্ষাদানের অপরিসীম আনন্দ অপেক্ষা তিনি আর্থিক লভ্য অকিঞ্চিৎকর বোধ করিতেন।

সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার বড়ই অনুরাগ ছিল, তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন না, সাধনায় কণ্ঠস্বর সুন্দর হইতে পারে বলিয়া তিনি তৎসাধনায় কঠোর প্রয়াস করিতেন। অভ্যাসকালে শীতের সময় গলা জলে নামিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত সাধনা করিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপে তিনি একজন বিখ্যাত "কালাওয়াত" বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার শরীরে সামর্থ্যও ছিল, তিনি তৎকালের রীতি অনুসারে "কুস্তি বা দেশী" কসরত করিতেন। মৃত্যুর মাত্র তের দিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় তাঁহার চিকিৎসকদিগকে দেশী কসরত দেখাইয়া বিস্মিত করেন।

তিনি প্রায় এক মাস কাল যকৃৎ ও তদানুষঙ্গিক পাণ্ডু রোগে ভুগিয়া বিগত ১৯০৬ ইং ফেব্রুয়ারী মাসে ৭০ বৎসর বয়সে মানব লীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ইংলিশমেন, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, ষ্টেটমেন প্রভৃতি ইংরেজী ও দৈনিক প্রভৃতি বাঙ্গালা কাগজে ঘোষিত হইয়াছিল।[৪৩]

গৌরহরি চক্রবর্ত্তী

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও শ্রীহট্টের বাহিরে বহু স্থানে শ্রীহট্টবাসী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া জন্মস্থানের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে বারাণশী ধামে অনেকে অবস্থান করিতেন। স্বর্গীয়

৪৩. তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র দাস শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে সগৌরমে বি. ই পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ হরি বিশারদ কাশীধামস্থ সমগ্র বাঙ্গালি সমাজের নেতা ছিলেন; এবং তৎপুত্র গঙ্গাহরি বিদ্যারত্নও তাদৃশ হইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই সমকালীন গৌরহরি চক্রবর্ত্তী সমগ্র বঙ্গীয় ও হিন্দুস্তানী উকিল বর্গের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাশীধামে প্রকাণ্ড বাড়ী এবং প্রভূত্ব সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তি স্বর্গীয় কাশীধামে খুব কমই ছিল; তিনি আজীবন সমগ্র কাশীবাসীর সম্মানভাজন হইয়া আজ প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল, পরলোক গমন করিয়াছেন।

গৌরী চরণ দাস

ইংরেজ আমলের প্রথম সময়ে শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাতু গ্রামে একটি মোন্সেফী আদালত ছিল; লাতুর সাহু বংশীয় লালা মহেশ রাম সেই আদালতে উকালতি করিতেন। লালার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরী চরণ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। তখন উকালতির সনন্দপত্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

গৌরীচরণ পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, অচিরেই তিনি স্বীয় ব্যবসায়ে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠেন; পারস্য ভাষায় তাঁহার এরূপ জ্ঞান ছিল যে, দূর দূরান্তের পারস্য ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্তি অনুতপ্ত করিতেন।

লাতুর সন্নিকটবর্ত্তী ভোগা-গ্রামবাসী মৌলবী আব্দুল গফুর চৌধুরীর বাড়ীতে তুরস্কবাসী জনৈক মৌলানা যদৃচ্ছা ক্রমে আগমন করেন, মৌলানা অতি বিদ্যান ও ভদ্র বংশীয় ছিলেন। ইহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য চৌধুরী, মুন্সেফীর এলাকায় তাবৎ পারস্য ভাষাবিৎ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার বাড়ীতে একটি সভা সম্মিলিত হয়, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গৌরীচরণ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই সেই বিদেশী মৌলানার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হন নাই। সভার সকলেই তুষ্ণীম্ভুত হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময় গৌরী চরণ উপস্থিত ন, দেশীয় মৌলবী বর্গের মুখ প্রফুল্ল হইল এবং মোনশীকে মৌলানা সহ আলাপের জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। মোনশী তৎক্ষণাৎ একটি পারস্য কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। কবিতার মর্ম্ম এই— "এই বিদ্বৎ সভায়, যে সুপুরুষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক শোভমান হইতেছেন, তিনি কে কোথা হইতে কি হেতু এস্থলে উপনীত হইয়াছেন।"

এই প্রশ্নোপলক্ষে আগন্তুক মৌলানা আপন বিবরণ বিবৃত করেন। তিনি মোনশী মহাশয়ের সহিত আলাপে মোনশীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ও শিষ্টাচারে এরূপ মোহিত হন যে, সেই সভায় স্পষ্ট বাক্যে বলেন যে, তাদৃশ উপস্থিত কবি সুবক্তা ও পণ্ডিত তাঁহার দৃষ্টিপথে বড় পতিত হন নাই; তিনি ইহাও বলেন যে ইঁহার সহিত পরিচিত হওয়ায় তাঁহার এদেশে আগমনের সার্থকতা হইয়াছে।

গৌরীচরণ যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার দেহায়তন ও তদ্রূপ সৌষ্টব সম্পন্ন ছিল, তাঁহার শারীরিক সামর্থ্যের ন্যায় আহারও ছিল। সরু দানার তণ্ডুল তিনি ভালবাসিতেন না, লম্বা দানা লাল চাল তাঁহার মুখ-রোচক ছিল, প্রতিবেলা তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতেন।

একদা শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ "বাবু" মুরারি চাঁদ রায়[৪৪] তাঁহাকে ঝুলন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি যখন আহার করিতেছিলেন, সৌজন্য প্রদর্শনার্থ "বাবু" তাঁহাকে বলেন—"মোনশী মহাশয় আওয়াজন সামান্য, পরিশ্রম মাত্রই সার হইল।" মোনশীর আহারের পরিমাণ না জানাতে পরিবেশক অন্যান্যোর ন্যায় তাঁহাকেও পরিবেশন করিতেছিল, তাই তিনি কহিলেন—"আয়োজনের কিছু মাত্র ক্রটি নাই, কিন্তু হাতায় মারে।" "বাবু" হাসিয়া পরিবেশক

৪৪. বাবু মুরারী চাঁদের কথা পরে কীর্ত্তিত হইবে।

ব্রাহ্মণকে বলিলেন "ঠাকুরজী, মোনসী যে আহারে আমারই তুল্য।" ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ বৃহৎ ৩২ খান লুচি ও দুইসের পরিমিত পায়স আনিয়া দিলে তথাবিধ আহারের পরেও মোনশী তত্তাবৎ উদরস্থ্ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার আহার দর্শনে "বাবু" বিশেষ সুখী হইলেন ও পরদিন উভয়ে একত্রে মধ্যাহ্নে ভোজনের জন্য সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন দেখা গেল যে, উভয়েই সম পরিমিত দ্রব্য আহার করিতে সমর্থ। তখনকার লোকের আহার ও সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্যের কথা শুনিলে এখন গল্প বলিয়াই বোধ হয়।

মোনশী বেশ গাইতে জানিতেন। তৎকালে লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা যথেষ্ট ছিল, তাঁহারা প্রায়শঃ সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করিত; সুরসংযোগে মহাভারত রামায়ণ, পদ্মা পুরাণ পড়িতে না পারিলে নিন্দিত হইতে হইত; মোনশী একবার ঝুলনোপলক্ষে স্বীয় গুরুপাট পাণিশালির আখড়াতে গিয়া ঝুলনের পালটি গাইতে ছিলেন। ইন্দানগরের জমিদার রাধাগোবিন্দ চৌধুরী সপরিবারে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বিবাহ যোগ্য কন্যা শ্রীমতী, মোনশীর সুকণ্ঠ নিশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে ও দৈহিক লাবণ্য দর্শনে মোহিতা হইয়া, ইহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহাই দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন। কন্যার ভাব ভঙ্গিতে তাহাতে গুরু ধনঞ্জয়ের উদ্যোগে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়।

মোনশী মহাশয়ের ন্যায় উদার ও জ্ঞাতি বৎসল ব্যক্তি বড় দেখা যায় না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ যখন পৃথগন্ন হন, মোনশী স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাধিক তাঁহাকে দিয়া স্বয়ং অল্পাধিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা ব্রজ রামকে তাঁহার গোমস্থা নিযুক্ত করিয়া জীবনোপায় করিয়া দিয়াছিলেন। "লাতুর লড়াই"[৪৫] অবসানে বিজয়ী সিপাহী কর্ত্তৃক বাজার বিলুণ্ঠিত হইলে, এই দোকানের দ্রব্যাদিও গৃহীত হয়। অতঃপর তিনি দোকানের সমস্ত স্বত্বই ব্রজরামকে দান করেন। ব্রজরামকে শুধু কর্ম্মঠ ও কার্য্যদক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য এতদিন দোকান নিজ সম্পত্তি ভুক্ত রাখিয়াছিলেন। ব্রজরাম এই দোকান হইতে প্রচুর অর্থলাভ করিয়া "মহাজন" বলিয়া খ্যাত হন। ব্রজরাম পরম ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি বিবাহ না করায়, তাঁহার ভাগিনেয় ফেদুরাম এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৪৬]

মোনশী মহাশয় যখন স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ দ্বয়ের বিবাহের উদ্যোগ করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার বিধবা খুল্লতাত পত্নী নিজ পুত্রের বিবাহ হইলনা বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কোন প্রকারে ইহা জ্ঞান হইয়া অগ্রেই সেই বিধবার ক্ষোভ নিবারণ করেন, কেবল তাহাই নহে, সেই পিতৃহীন খুল্লতাত ভ্রাতাকে উপার্জ্জন-ক্ষম করিবার উদ্দেশ্যে লাতুর বাজারের একটা দোকানে ইহাকে গোমস্তা করিয়া দিয়াছিলেন; এই দোকান হইতে সেই ভ্রাতা স্বীয় অবস্থায় উন্নতি বিধান পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করেন।[৪৭]

মোনশীর আর একজন জ্ঞাতি ভ্রাতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, এইজন্য তাঁহাকে তিনি নিজের উকালতি সনন্দ দান করিয়া স্বয়ং ব্যবসায় ত্যাগ করেন, সেই ভ্রাতার নাম রাজীব লোচন ছিল। রাজীব লোচন এই দান প্রাপ্ত সনন্দ বলে উকালতি করিয়া আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

---

৪৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৫ম খঃ ৩য় অঃ দেখ।

৪৬. কামাখ্যা নামক জনৈক কায়স্থ-সন্তান লাতুর অষ্টপতি বংশে বিবাহ করেন, তাহার অধস্তন বংশীয়বর্গ তদীয় নামানুসারে "কামুর গোষ্টি" নামে খ্যাত হয়। ফেদুরাম এই বংশীয় ছিলেন এ এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায়, ফেদু রামের পুত্র শ্রীযুত গোবিন্দ চরণ, রায় জীবিত আছেন।

৪৭. মোনশী মহাশয়ের এই ভ্রাতার নাম ভবানী চরণ, ইঁহার পুত্রই লাতুর অন্যতম জমিদার শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ চরণ রায় অষ্টপতি মহাশয় বর্ত্তমান আছেন।

গৌরী চরণ মোনশী একজন সমাজ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, কঠিন সামাজিক প্রশ্ন সকল সহজে মীমাংসা করিয়া দিতেন, এজন্য নানা স্থান হইতে বিবাহ মীমাংসার জন্য তাঁহার কাছে লোক আসিত, সেই আগন্তুক বর্গ তাঁহার আদর আপ্যায়নে ও পরামর্শ প্রাপ্তে তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিত।

বিবাহের সপ্ত প্রদক্ষিণ কালে কন্যাকে বহন করিয়া প্রদক্ষিণ করাইবার প্রতি তাঁহার মনোগত ছিল না, তজ্জন্য তিনি আপন মধ্যম পুত্রের বিবাহ কালে কন্যাকে হটাইয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইয়া ছিলেন। তৎকালে যদিও ইহা বিসদৃশ বলিয়া অনেক বোধ করিয়াছিল, কিন্তু পরে শ্রীহট্টের সাহু সমজে ইহা ক্রমশঃ গৃহীত হয়; ইদানীং সকলেই ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন এবং এই প্রথা সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মোনশী গৌরীচরণ পরম জ্ঞানী ও বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। ঢাকার অন্তর্গত উথলীর স্বর্গীয় বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী প্রায়শঃ লাতু আসিয়া তৎসহ সম্মিলিত হইতেন। একদা শ্রীহট্টের সুনাম প্রসিদ্ধ "বাবু" মুরারি চাঁদ রায়কে তিনি বলিয়াছিলেন "যখন মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন লাতুতে গিয়া গৌরীচরণের সহিত আলাপ করিলেই শান্তি পাই।" বৈষ্ণব সাধক গোস্বামী মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চে, সুতরাং তাঁহার এই বাক্যে গৌরীচরণের সমাজ ধর্ম্ম তৎপরতা ও জ্ঞান গৌরবের পরিমাণ অনুমান করা যাইতে পারে। বেকি টেকার সাধক হরনাথ চক্রবর্ত্তী এবং রফি নগরের সিদ্ধ ফকির শাহ ভৌলা প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। ভোলা বলিতেন—"লাতুতে এক ধূনী ও তিন চেরাগ জ্বলিতেছে।"

ধূনী অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নি স্বরূপ মোনশী গৌরীচরণ আর তিন চেরাগ অর্থাৎ প্রদীপ স্বরূপ তাঁহার পুত্র ত্রয়কে উদ্দেশ্য করিয়াই ইহা বলা হইত। তাঁহার পুত্রত্রয়ের নাম চৈতন্য চরণ, বৈষ্ণব চরণ ও গুরুচরণ। চৈতন্য চরণ নসিরাবাদের মুন্সেফ ছিলেন, মধ্যম বৈষ্ণব চরণ ঢাকায় সব জজ হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ গুরুচরণ জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়ন পূর্ব্বক কৃষ্ণ নগরে অনেক দিন মুন্সেফ পদে ছিলেন, পরে অফিসিয়েটিং সব জজ নিযুক্ত হইয়া ৩৯ বৎসর বয়সে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

জন্মান্তরীণ কোন কর্ম্ম ফলে বলা যায় না, মোনশী গৌরীচরণের এই তিন চেরাগ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু দারুণ পুত্রশোকে এই গম্ভীরাশয় মহাত্মাকে বিচলিত করিতে সামর্থ হয় নাই। তিনি যে কিরূপ উচ্চহৃদয় ও মানসিক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, এই সময় তাহা বুঝা গিয়াছিল; তিনি দৈনিক লক্ষ হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, নাম জপেই প্রায় সারাদিন কাটাইয়া দিতেন; পুত্রশোকে তাঁহাকে অবসন্ন করিতে অবসর পাইত না।

তিনি যদিও হাস্য রসিক পুরুষ ছিলেন[৪৮], এবং রহস্যাত্মক ও কূটার্থ বোধক বাক্য বলিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু এই সময় হইতে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বৈষয়িক পরামর্শ বা উপদেশ প্রার্থী, অথবা আত্মীয় স্বজন কাহারই সহিত পূর্ব্বরূপ আলাপ করিতেন না, সর্ব্বদা জপ মালা হাতে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন। ফলতঃ এই সময় হইতে তিনি সাংসারিক কোলাহলের দূরে

৪৮. মোনশী গৌরিচরণ জ্যোতিষের আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন, তিনি প্রত্যহ প্রাতে পঞ্জিকা হইতে সেদিনকার বিবরণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। জীবনরাম দাস নামক তাঁহার একজন হাস্যরসিক প্রতিবেশী যদিও লিখাপড়া জানিতেন না, তথাপি ছন্দোবন্দে রহস্যাত্মক কথা রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে গ্রামবাসিগণকে উপহার দিতেন। মোনশী মহাশয়ের পঞ্জিকা-প্রীতি দর্শনে জীবনরাম একবার নববর্ষের হাস্যাত্মক পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন, তাহার প্রথমেই লিখিত ছিল—"অস্মিন বর্ষে গৌরী চরণ মোনশী রাজা, তস্য মন্ত্রী নিরামিয় ব্রজরাম মহাজন" ইত্যাদি। এইরূপ আরম্ভ করিয়া সেই পঞ্জিকাতে লাতু গ্রামের তৎকালীন ইতরভদ্র সকলেরই কীর্ত্তি উদঘাটিত হইয়াছিল।

চলিয়া গিয়াছিলেন। তদবস্থায় ৮৪ বৎসর বয়সে ১২৭৭ বাং কার্ত্তিক মাসে এক একাদশী তিথিতে তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ একাদশী, আমার শরীর অবসন্ন লইয়া পড়িতেছে, সাবধান, কেহ আমার মুখে গঙ্গাজলটুকুও দিও না।" এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরে মালা জপ করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে নিদ্রা গ্রস্তের ন্যায় ঢলিয়া পড়িলেন; তখন দেখা গেল যে গুপ্ত সাধকের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে!

গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

গৌরী শঙ্কর ইটার পঞ্চগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুলে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। জগন্নাথের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও গৌরী শঙ্গর। গৌরী শঙ্কর গৌর বর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন।

গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই গৌরীশঙ্গরের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল। তিনি যখন কিশোর বয়স্ক পিতা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন। পিতৃ বিয়োগে গৌরী শঙ্কর অত্যন্ত বিস্বাদিত হন এবং একদা রাত্রিযোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপ গমন করেন। তখন গৌরী শঙ্করের বয়স পঞ্চদশ হয় মাত্র, পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক অপরিচিত নবদ্বীপে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ন্যায়াধ্যয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তৎকালে দেশে বিদ্যা আর অর্থের অভাব ছিল না, অধ্যাপকবর্গ ছাত্রের আহার দিতেন, দেশের জমিদারবর্গ হইতে তাঁহার সাহায্য পাইতেন।

গৌরী শঙ্কর নিরুদ্বেগে নবদ্বীপে ন্যায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ও অসাধারণ প্রতিভা বলে অল্প কাল মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, তাঁহার যশঃপ্রভা কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

গৌরী শঙ্কর যথাকালে অধ্যাপক হইতে "তর্কবাগীশ" উপাধি লাভ করেন এবং কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির পরামর্শে কলকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় অল্পকাল মাত্র অবস্থিতির পরেই তিনি শোভাবাজারের রাজা কমল কৃষ্ণ রাম বাহাদুরের সহিত পরিচিত হন, গুণগ্রাহী কমলকৃষ্ণ তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি, ও শোভাবাজারের বালাখানায় বাসের জন্য একটি বাটিকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

প্রখ্যাত কীর্ত্তি সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় যখন সতীদাহ নিবারণের জন্য চেষ্টান্বিত হন, তখন গৌরী শঙ্কর তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন; ইহার হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত তর্কে সতীদাহের বিরুদ্ধ পক্ষকে অনেক সময় নিরুত্তর থাকতে হইত। তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে রাজার সহিত এক মতাবলম্বী হইলেও প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে রাজারাম মোহন রায়ের সহিত অচিরেই তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে।

তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র অতঃপর আরও প্রসরতর হইয়া পড়িল, স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত সংবাদ প্রভাকরের অনুকরণে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাজার আনুকূল্যে "সম্বাদ ভাস্কর" পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রথমতঃ দৈনিক ছিল। এই কাগজের শীর্ষে দুইটি সংস্কৃত শ্লোক থাকিত, তাহাতে ভাস্কর সম্পাদকের নাম ও তিনি যে পূর্ব্বদেশ বাসী, তাহার উল্লেখ ছিল।

ভাস্কর ব্যতীত গৌরী শঙ্কর "রসরাজ" নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন, রসরাজ ব্যঙ্গ বিদ্রুপের অফুরন্ত উৎস স্বরূপ ছিল, কিন্তু উহা জন্ম মাত্রই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে কাশীম বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের কুৎসা প্রকাশিত হওয়ায় তৎবিরুদ্ধে রাজা মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, ইহাতে গৌরী শঙ্করের বিনাশ্রমে ছয় মাস কারাবাসের ও পাঁচ শত

টাকা জরিমানার এবং ১০০০ টাকার দুই জন জামিন দেওয়ার আদেশ হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে হইতে সম্বাদ ভাস্কর সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয়, পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে সপ্তাহে তিনবার করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে এবং মূল্য ১২ টাকা স্থানে ৮ টাকা নিরূপিত হয়। এই সময়ে তিনি রসরাজ বন্ধ করিয়া দেন।

গৌরী শঙ্কর গ্রন্থ প্রণয়নেও বিরত ছিলেন না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর "নীতি-কথা" নামক এক খানা শিশু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরী শঙ্করই নীতি কথার রচয়িতা ছিলেন। গৌরী শঙ্করের নীতি কথার তিনটি ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইহার বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি "ভূগোল" "জ্ঞান প্রদীপ" ১ম ও ২য় ভাগ এক মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবী মহাত্মা চণ্ডীর একখানা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

কাশীদাসের মহাভারত যখন প্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়, তখন শ্রীরামপুরের কেরী সাহেবের পণ্ডিত, যশোহর বাসী জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ইহার অনেক স্থল পরিবর্ত্তন করিয়া ভাষা শুদ্ধি বিধানের যত্ন করেন, জয়গোপালের পরে গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশও এই প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার সংশোধিত মহাভারতের বন পর্ব্বের সমাপ্তিতে লিখিত আছেঃ—

"শ্রীগৌরী শঙ্কক বলে ভারতের শাখা।
বণপর্ব্ব অপূর্ব্ব সমাপ্ত রস মাথা॥
শোধন করিতে যত পাইলাম ক্লেশ।
সাধুগণ পঠনে হইবে দুঃখ শেষ॥"

(বঙ্গবাসী প্রকাশিত মহাভারতের ভূমিকা হইতে)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইহার পরবর্ষে (১২৬৫ বাং ২৫ শে মাঘ) ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।[৪৯]

গৌড় গোবিন্দ (রাজা)

শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্য এককালে এ প্রদেশে এক শক্তি সম্পন্ন খণ্ডরাজ্য ছিল, গোবিন্দ ইহার অধিপতি ছিলেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইনি শ্রীহট্টে শাসন দণ্ড পরিচালন করেন, ইহার বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

চন্দন শর্ম্মা

বাণিয়াচঙ্গ পরগণার অন্তর্গত দড়য়া মৌজায় চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি দাস জাতির যাজনা করিতে আরম্ভ করেন, চূড়ামণির রাম, চন্দন, বলাই ও জগন্নাথ নামে চারি পুত্র হয়, তন্মধ্যে চন্দন, গুরুর উপদেশ অনুসারে কামাখ্যা পীঠে মন্ত্র সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ হইতে দেশে আসিলে নানা ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইত।

চন্দন শর্ম্মার গুণ শ্রবণে দাউদ নগরের প্রসিদ্ধ সাধক পীরবাদশা[৫০] তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। চন্দন পীরবাদশার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন ও "খানা" গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। পীর বাদশার কথামত তখন মোসলমানের ভক্ষ্য খাদ্য দ্রব্য আনীত হইল। চন্দন সেই পাত্রের আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা গেল যে, পাত্রে পুষ্প, ঘৃত, তণ্ডুল ও চিনি রহিয়াছে, আনীত

৪৯. এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে দেশবার্ত্তা ও বিজয়া পত্রিকার প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধের সাহায্য পাইয়াছি।
৫০. ইঁহার কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ২য় খঃ ৫ম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

পরিপক্ক আমিষ এক রতিও নাই।[৫১] এইরূপে তাঁহার দৈব শক্তির পরিচয় পাইয়া পীর সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তদবধি চন্দন ঠাকুর দাউদ নগরে প্রায়শঃ যাইতেন। চন্দনের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া পীর সাহেব "কর্শা" মৌজায় তাঁহাকে কতক ভূমি দিতে ইচ্ছা করেন; তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন এবং বলেন—"সম্পত্তি ইষ্ট সাধনে অনিষ্ট করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণের তাহাতে প্রয়োজন কি?"

চন্দন পীর বাদশার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলে, তাঁহার নাম মোসলমান সমাজেও পরিজ্ঞাত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, একবার অনাবৃষ্টি হইয়া ছিল ও বহুলোক তাঁহার কাছে আসিয়া বারিপাতের উপায় করিয়া দিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি সমাগত লোক দিগকে বলেন—"বিধাতার ইচ্ছা হইলে বৃষ্টিপাত হইবে, আমি কি করিব? তোমরা সকলে ভগবানকে ডাক, এখনই বৃষ্টিপাত হইতে পারে।" চন্দন ঠাকুরের এই কথা পরেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়।

যখন চন্দন ঠাকুরের মৃত্যু হয় পীর বাদশা তখন ক্ষৌরি করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি নাপিতকে বলিয়া উঠেন—"বন্ধু অপেক্ষা করিতেছেন শীঘ্র ক্ষৌরি শেষ কর।" তৎক্ষণাৎ তিনি বন্ধু দর্শনে যাত্রা করেন।

চন্দনের ভ্রাতা রাম চন্দ্রের পুত্রের নাম শ্যামানন্দ এবং বলাইর পুত্রের নাম গঙ্গাধর। ইহারা নবদ্বীপের বুড়াশির তলায় সিদ্ধি লাভ করেন। খুল্লতাতের মৃত্যুর পর দুই ভাই দেশে আসিয়া তদীয় অভাব পূর্ণ করেন। ইঁহারা "রাগিনী সিদ্ধ ছিলেন; কথিত আছেন যে যখন তাহারা মল্লার রাগিনী আলাপ করিতেন তখন মেঘাড়ম্বর হইত। ইহাদের এই গুণের কথা শুনিয়া বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান উমেদ রাজা ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান পূর্ব্বক দ্বিপ্রহর রৌদ্রের মধ্যে মেঘ আনিতে বলিয়াছিলেন এবং শুনা যায় যে তাঁহারাও উভয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা দেওয়ান হইতে প্রচুর পরিমিত পারিতোষিক ও ৩/২।। ভূমির বাড়ী ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন! শ্যামানন্দ বিরচিত দেবী বিষয়ক বহুতর সঙ্গীত আছে। এখনও কালী পূজাদিতে বলিদানের সময় যে "রণগীতি" হয় তাহাতে দ্বিজ শ্যামানন্দের ভণিতা শুনা যায়।

চন্দ্রনাথ নন্দী

ইনি বাণিয়াচঙ্গ নিবাসী। ইনি আসাম সেক্রেটারিয়েটে বিচক্ষণতার সহিত কাজকর্ম্ম করিয়া যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে আজিও "সিলেট ক্লার্ক" দেব নাম সাহেবদের নিকট সমাদৃত আছে। তাঁহারই নেতৃত্বে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত সর্ব্বনন্দ দাস (ই এ সি) বাবু শরচ্চন্দ্র ধর, রায় বাহাদুর সারদা চরণ দাস, রায় সাহেব রক্ষিনী কান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দীন নাথ দাস ও কৈলাশ চন্দ্র দাস এবং শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া শ্রীহট্টের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। "নন্দী বাবু" পশ্চাৎ ই এ সি হন। কালেক্টরির কার্য্যে তাঁহার ন্যায় দক্ষলোক দৃষ্ট হয় না। ইনি অতি নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন, সেরেস্তা হইতে ঘুষখোরের দল তাড়াইয়া এক সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তেস্বিতা, দেশ বাৎসল্য, স্বধর্ম্ম পরায়ণতা ইত্যাদি গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। ৭১ বৎসর বয়সে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাহার কাশী প্রাপ্তি ঘটে।

চন্দ্রনাথ নন্দী মজুমদার

ইটাখলার নন্দীবংশ ইহার জন্ম; (শ্রীঃ ইঃ ৩য় ভাঃ ৪র্থ খঃ ৫ অঃ বেজোড়ার নন্দী বংশ কথার

৫১. এইরূপ কথা অন্যত্রও শুনা গিয়াছে। অমাবশ্যায় চন্দ্রোদয়, মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমাতে শানিত প্রদর্শন প্রভৃতি বিনয়ের ন্যায় এই ঘটনাও বহু সাধক চরিত্রের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

টাকায় বংশ তালিকা দেখুন) ইতি শিলচরের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন, ইনি ও তাঁহার সহোদর দীননাথ নন্দী মজুমদার অত্যন্ত গৌরবের সহিত উকালতি করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে উকালতি ছাড়িয়া আসিবার সময় তাঁহার মক্কেল কাছাড়ের প্রায় সমস্ত প্লেন্টার সভা করিয়া ও প্রচুর উপঢৌকন দিয়া তাঁহার অসাধারণ গুণ সত্তার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ছিলেন। দুঃখের বিষয় ইহার বিস্তৃত জীবন চরিত আমরা পাই নাই। কাছাড়ে ইনি সেরূপ প্রতিভা ও গৌরব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, সুখের বিষয় মাননীয় শ্রীযুক্ত কারিনা কুমার চন্দ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যবহারজীবী মহাশয়গণ তাহা অব্যাহত রাখিয়া শ্রীহট্টের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন।

চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীহট্টবাসী ভক্তগণের নামের মধ্যে চন্দ্র শেখরের নামও আছে। চন্দ্র শেখর বৈদিক শ্রেণীর ছিলেন এবং বিদ্যা শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে গমন করিয়া ছিলেন। চন্দ্র শেখর পাঠ সমাপন পূর্ব্বক আচার্য্যরত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপে মায়াপুর নামক পল্লীতে শ্রীহট্ট বাসী জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি বাস করিতেন। চন্দ্রশেখরও ঐ পল্লীতেই থাকিতেন। সুপাত্র বোধে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ইঁহার নিকট আপন কনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্ব জয়াকে সম্প্রদান করেন। বিবাহের পর নবদ্বীপে বাড়ী প্রস্তুতক্রমে তথায় বাস করিতে থাকেন, ইঁহার বাড়ী জগন্নাথ মিশ্রের বাটিকা হইতে যে অধিক দূরে ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

চন্দ্রশেখরের পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গের মাসী ছিলেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে তাঁহার যাতায়াত ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে আসিয়া পরম ভক্ত রূপে পরিচিত হন, ঐ সময় একদা তিনি পাত্র ও পাত্রী নির্দ্দেশে নাটকাকারে কৃষ্ণ লীলার অভিনয় করেন। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় ইহাই সর্ব্ব প্রথমে নাটকাভিনয়, গৌরাঙ্গই তাহার উদ্ভাবক। এই অভিনয় চন্দ্র শেখরের গৃহে হইয়াছিল।

গৌর জননী শচী দেবী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন; শ্রীবাস পত্নী মালিনী, ধাত্রীমাতা নারায়ণী (ইনি শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নহেন) বিষ্ণুপ্রিয়া—সখী কাঞ্চনা প্রভৃতি মায়াপুরের অনেক স্ত্রীলোকই নাটক দর্শনে গিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহ গ্রামের কেন্দ্রস্থলে ছিল বলিয়া রমণীগণের যাতায়াত সুবিধাজনক ছিল।

জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর চন্দ্রশেখর শ্রীগৌরাঙ্গের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন কিন্তু পরে ইনিও তাহার ভক্তরূপে পরিগণিত হন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, চন্দ্রশেখর তখন কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভিভাবক বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ইঁহাকেই তদীয় সন্ন্যাস গ্রহণের কার্য্য সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর যন্ত্র চালিতবৎ এই নিদারুণ কার্য্যভার পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা অনুমেয়। সন্নাসের পর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, চন্দ্রশেখর তাঁহাকে দেখিতে প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন।

পদকল্পতরু প্রভৃতি পদাবলী গ্রন্থে অল্প সংখ্যক অতি সুন্দর ইহার পদ আছে। আচার্য্যরত্ন প্রাগুক্ত নাটকাভিনয়ে অভিনেতাদের অন্যতম ছিলেন সঙ্গীতালোচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল।

জগদীশ তর্কালঙ্কার

জগদীশ তর্কালঙ্কার একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন, ইঁহার নামে ন্যায়শাস্ত্রকে "জাগদীশ" বলিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কৃতিত্ব অনুভব করা যাইতে পারে। জগদীশের প্রতিভা নবদ্বীপেই

ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু জগদীশ কি তদ্দেশ বাসী ছিলেন? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ১৩২১ বাং পৌষ মাসের ভারতবর্ষে (২য় বর্ষ ২য় খঃ) একাদশী তত্ত্ব প্রস্তাবে ৯১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"আপনি বাঙ্গাল বলে কাকে অবজ্ঞা কচ্ছেন বাঙ্গাল নিয়েইত নবদ্বীপ। জগদীশের বাড়ী ছিল সিলেটে। গদাধরের বাড়ী ছিল রংপুরে। রঘুনাথ রঘুনন্দনের বাড়ী যে কোথায় ছিল, ঠিক করে বলতে না পাল্লেও আমার মনে হয়, তারাও বাঙ্গাল ছিলেন।"

প্রেম বিলাস নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে—"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।" ইঁহার সনাতন ও পরাশর নামে দুই পুত্র হয়, সনাতন মিশ্র একজন পণ্ডিত ছিলেন, ইঁহার পুত্র যাদবমিশ্র ও একজন নৈয়ায়িক; যাদবের ৩য় পুত্রই জগদীশ। জগদীশ শিরোমণি কৃত দীধিতি প্রভৃতির টিপ্পনী, গঙ্গেশোপাধ্যায় জগদীশ। জগদীশ শিরোমণি কৃত দীধিতি প্রভৃতির টিপ্পনী, গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত অনুমান ময়ূখের ভাষ্য, দ্রব্য ভাষ্যের ও লীলাবতীর টীকা প্রভৃতি প্রণয়নে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" ও "তর্কামৃত" নামে দুইখানা মৌলিক গ্রন্থ তাঁহারই কৃত। প্রথম খানি মুদ্রিত হইয়া এম এ পরীক্ষার সংস্কৃত পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। "নবদ্বীপ মহিমা" নামকগ্রন্থে ইঁহাদের কথা বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে।

জগদীশ পণ্ডিত

এই জগদীশ পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় পিতৃবয়স্ক ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। নিমাইর বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁহার গৃহ ছিল। ইনি পরম সাধু ব্যক্তি ছিলেন। এক একাদশীতে শিশু নিমাই ইঁহার প্রস্তুত নৈবেদ্য ভক্ষণ জন্য ক্রন্দন করিতে থাকেন। জগদীশ নিমাইর ক্রন্দন শুনিয়া দেখিতে আসেন। নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার বালগোপাল বলিয়া মনে হইল ও তৎক্ষণাৎ তিনি বিষ্ণুর জন্য প্রস্তুত নৈবেদ্য আনিয়া প্রদান করিলেন, নিমাই শান্ত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে উপসংহারে ইঁহার কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। ইনি মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ ভুক্ত ছিলেন এবং এদেশে হইতে নবদ্বীপে—মায়াপুরে গিয়া শ্রীহট্টবাসী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত একত্রে বাস করেন। "জগদীশ চরিত্র বিজয়" নামক প্রাচীন গ্রন্থে ইঁহাকে "পূর্ব্ববঙ্গবাসী" বলা হইয়াছে। নিমাই সন্ন্যাসে পরে ইনি নবদ্বীপ হইতে যশোড়া গ্রামে গমন করিয়া জগন্নাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন ও তথায় অবস্থিতি করেন।

জগন্নাথ বৈদ্য

জগন্নাথ বৈদ্য কৃত "শ্রীচৈতন্যের পাঁচালী" নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে; এই পাঁচালীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা-ভোগ কি ভাবে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে জনৈক রাজা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা ভোগ সম্বন্ধে এক স্বপ্নদর্শন করেন এবং জগন্নাথ বৈদ্য দ্বারা তাহা লিখাইয়া রাখেন, ইহাতেই পাঁচালীর উৎপত্তি হয়।

গ্রন্থকার যে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ঢাকাদক্ষিণের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবার বিবরণ ও রীতি বর্ণিত করাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ঢাকাদক্ষিণের "বেজের পাড়া" নামক স্থানে পূর্ব্বে বৈদ্য জাতীয় লোকের বাস ছিল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেনঃ—

"বিদ্যাপুর হৈতে যে সাধুজন আইলু
দেশ ভাষা মতে গ্রন্থ লেখিয়া আনিনু॥
সাধু জন দ্বারায় গ্রন্থ আনিল এথাতে।
নিজ ভাষা মতে লিখি রাখে জগনাথে॥
জগন্নাথ নামে মূঢ়—গৌরদেশে স্থিতি।
স্বপ্নহনে (?) সে চৈতন্যে পদে রহুক ভকতি॥

বোধ হয় জগন্নাথের পূর্ব্বনিবাস বিদ্যাপুর গ্রাম। বিদ্যাপুর কোথায়? শ্রীহট্টে বিদ্যাপুর, বিদ্যানগর প্রভৃতি নামাত্মক একাধিক গ্রাম আছে, জগন্নাথের বিদ্যাপুর কোনটি, বলা যায় না। "গৌরদেশ" কোন্ দেশ? শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ গৌড় না কি? না শ্রীগৌর বিগ্রহের দেশ ঢাকাদক্ষিণই "গৌরদেশ" নামে কথিত হইয়াছে? সম্ভবতঃ "গৌড়দেশ" স্থলে লিখিবার ভুলে গৌরদেশ হইয়া পড়িয়াছে; শাহজলাল কর্ত্তৃক বিধ্বস্থ হইলেও প্রাচীন "গৌড়" নামটি অনেকেরই প্রিয় ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের পাঁচালী সম্বন্ধে এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা ভার পাঠকের হাতে থাকাই ভাল।

শ্রীচৈতন্যের পাঁচালীর যে প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঢাকা দক্ষিণের "বিশম্ভর মিশ্র কর্ত্তৃক ১২৭৪ বাং বুধবার ১ দণ্ড থাকিতে লেখা সমাপ্ত হয়।" শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের দ্বিতীয় ভাগ ১ম খঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের টীকায় শ্রীহট্টবাসী রঘুনাথকৃত বাবাম্বর নামক আর একখানা পাঁচালীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শণির পাঁচালী, ঘোর মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী, হাস্য নাথের পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী প্রভৃতি অনেক পাঁচালী গ্রন্থ প্রায় এক সময়ই শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাকার কর্ত্তৃক রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

জগন্মোহন গোসাই

প্রায় চারি শত বৎসর অতীত হইল, মহাপুরুষ জগন্মোহন জন্ম গ্রহণ করেন। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাঃ ৪র্থ খঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায় জগন্মোহনের কিঞ্চিত কথা বলিয়াছি।) জগন্মোহনের পিতার নাম সুন্দরানন্দ, মাতার নাম কমলা। জগন্মোহন জাতিতে বৈদ্য (মতান্তরে কায়স্থ) ছিলেন। জগন্মোহনের পৈতৃক নিবাস বাঘাসুরা, তাঁহার স্ববংশীয় বর্গের খ্যাতি "অধিকারী," এখনও তাঁহারা বাঘাসুরাতে অবস্থিতি করিতেছেন।[৫২]

৫২. বাং ১৩১৯—পৌষ সংখ্যা নব্যভারতের জনৈক লেখক ইঁহাকে বরিশাল বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি একথার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। ১৩২০ বাং—মাঘ মাসের নব্য ভারতে "জগন্মোহন ভগবত" অনুসারে জগন্মোহন কথা আলোচিত হইয়াছে; বিজয়া পত্রিকায় আমরাও তাঁহার রচিত কথা কীর্ত্তন করিয়াছি।

লবনী দাস নামক জনৈক গোড়ীয় বৈষ্ণব জগন্মোহনের মতানুরাগী হইয়া পড়েন এবং তিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনুকরণে জগন্মোহন ভাগবত রচনা করেন। তিনি বলেন "নিতাই গুড়রূপে হৈল জগতমোহন গোসাঞি।" আবার এক স্থলে বলিয়াছেন "শ্রীচৈতন্য জগতমোহন নিশ্চয়।" কাজেই তিনি জগন্মোহনের প্রত্যেক লীলা শ্রীচৈতন্য লীলার সহিত মিলাইয়া লিখিয়াছেন।

নিমাইর জন্ম ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে হইয়াছিল, আবার যখন "চতুর্দ্দশ শত পঞ্চাশ শত্রাদিত্য শকে মাঘি পূর্ণিমা আসি উপসন্ন হইল" তখন জগন্মোহন জন্ম পরিগ্রহ করেন। জন্ম তিথিটাও একরূপ মিলিয়া গেল, গ্রন্থকারের জগন্মোহন চরিতটা শ্রীচৈতন্য লীলার সহিত মিলিইয়া লিখিতে সাধ হইবে না কেন? শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ, কাজেই তদীয় অবতার জগন্মোহনের জন্মস্থানের নামও দ্বীপান্তক হওয়া চাই। বর্ত্তমান বাঘাসুরার সন্নিকটবর্ত্তী তৎকালপ্রসিদ্ধ চন্দ্রপুর বা চান্দপুর গ্রাম (মেজর জে, রেনেল এফ. আর, এস কৃত ১৬৭৯ খৃঃ অঙ্কিত মেপ দেখ,) চন্দ্রদ্বীপ নামে তদীয় জন্মভূমি রূপে লিখিত হইল!

জগন্মোহনের পিতার নাম ও মাতার নাম আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি; জগন্মোহন ভাগবতে তদ্রুপ নহে, ঐ গ্রন্থে জগন্মোহনের মাতার নাম সুধাবতী এবং পিতার নাম পুরন্দর বলিয়া লিখিত, এ স্থলেও যে শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ পুরন্দরের নাম অনুকৃত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। এ সব স্থলে জগন্মোহন ভাগবতের কথার অনুসরণ করা নিরাপদ নহে। আমরা সর্ব্বত্র ইঁহাব অনুসবণ না করিয়া "জগন্মোহন চরিত্র" গ্রন্থ ও পূর্ব্বাপর প্রচলিত জনশ্রুতিই গ্রহণ যোগ্য মনে করিয়াছি।

লবণী দাস যে গোড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, গ্রন্থের সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় আছে, তিনি অনেক স্থলে অদ্বৈতবাদী জগন্মোহনের মুখে "আপনে প্রকৃতি হেন মনে কর জ্ঞান; পুরুষোত্তম পরমাত্মা ভজ মতিমান।" ইত্যাদি কথাও অলক্ষে প্রকাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

জগন্মোহনের বাল্য চরিত্র অতি সুন্দর। কিন্তু জগন্মোহন ভাগবত কার অনেক স্থলেই শ্রীচৈতন্য লীলার ছাঁচে ফেলিয়া উহা লিখিতে গিয়া পাঠককে সংশয়ান্বিত করিয়াছেন।[৫৩]

জগন্মোহন শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত। জগন্মোহনের পিতা বিষ্ণুভক্ত হইলেও পুত্রের এই ভক্তিভাব একবারেই ভালবাসিতেন না; কিন্তু মাতা পুত্রেরই পক্ষপাতিনী ছিলেন। শেষটা এইরূপ দাঁড়াইল যে, পিতা তাঁহাকে সংকীর্ত্তনে যাইতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং পুত্র যাহাতে সংসারাসক্ত হয়, তজ্জন্য এক সুন্দরী বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন।[৫৪]

বিবাহের কিছুকাল পরে ঘটনাক্রমে তাঁহার গৃহে গোপীনাথ নামক জনৈক বৈষ্ণবের আগমন ঘটে, পিতা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। এই বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রভাবে জগন্মোহনের অনুরাগ আরও বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। পরে পিতা ইহা জানিতে পারিয়া পুত্রের প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হন এবং

---

৫৩. জগন্মোহনের জন্মের পর শ্রীহট্টের চিরাচরিত আচার মতে ৬ষ্ঠ দিনে—
জাত কর্ম্ম অন্তে নাম করণাদি ক্রিয়া যত।
ষষ্ঠি আদি ক্রিয়া কৈল বেদ বিধিমতে॥
সম্পন্ন হইয়াছিল।
শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইলে যেমন নারিগণ দর্শনে আসিয়াছিল, শ্রীচৈতন্য ক্রন্দন করিবার কালে হরি বলিলেই যেমন থামিয়া যাইতেন। ইঁহার সম্বন্ধে তদ্রুপ লিখিত হইয়াছে, যথা রমণিগণ—
"রাম নারায়ণ বলি হাতে তালি দিল।
নাম ধ্বনি শুনি শিশু হাসিতে লাগিল।
শ্রীচৈতন্য যখন শিশু, তখন একদা একটি সাপ আসিয়া শয্যায় উপস্থিত হইয়া শচীর ত্রাস উপস্থিত করিয়াছিল, ইঁহর সম্বন্ধেও তদ্রুপ কথা আছে, এক ব্যক্তি জগন্মোহন জননীকে সংবাদ দেয় যথা—
"এক সাপ বেড়িয়াছে কুমার তোমায়। নিদ্রা যায় মোহন চেতনা নাহি তার।"
শ্রীচৈতন্যকে একদা মাটি খাইতে দেখিয়া শচী ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, জগন্মোহন ভাগবতকার এ কথাও ভুলেন নাই, লিখিয়াছেনঃ—
"কতক্ষণে সুধাবতী আসিয়া দেখেন। মাটি কেন খাও বাচা, তর্জ্জিয়া বলিল॥
শিশু বলে ও গোম মাও বৃথা দেও গালি, মাটিতে উদ্ভব দেখি হইয়াছে সকলি॥—ঐ
উত্তরে মা বলিলেন—"মাটি খাইলে রোগ হয়, কান্তি হয় ক্ষয়"
তাহা শুনিয়া পুত্র বলিলেন—"তবে আগো ইহা মাগো কেনে না বলিলে॥" ইত্যাদি ইত্যাদি
মাঘ, সংখ্যা নব্য ভারতের লেখক জগন্মোহনের জন্মস্থান সম্বন্ধে কোন "উচ্চ বাচ্য" না করিলেও এ সব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যে ১৪৫০ শকে শ্রীচৈতন্য এবং "নিত্যানন্দ প্রভু সশরীরে বিদ্যমান। তদবস্থায় তাঁহার দ্বিতীয় অবতার কিরূপে সম্ভব হয়?" "শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের অবতার সহ জগন্মোহনকে জোড়া দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে, সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।" আমরা বলি—এ জোড়া উদ্দেশ্যে চন্দ্রদ্বীপ ও পুরন্দর প্রভৃতি নাম এবং পূর্ব্ব বর্ণিত লীনা-কথার বর্ণনাও ব্যর্থ ও ভিত্তি বিহীন। উদাহরণ স্থলে মাত্র কয়েকটি কথা এ স্থলে প্রদর্শন করিলাম।

৫৪. জনশ্রুতি মতে এই কন্যার নাম গঙ্গা, জগন্মোহন ভাগবতকার লিখিয়াছেন—
যজ্ঞেশ্বর রায়-কন্যা মায়াবতী। অপূর্ব্ব লক্ষণা কন্যা যে ভগবতী॥"
ভাগবতকার বলেন যে বিবাহের ঘটকের নাম গঙ্গাদাস ছিল। তাহা হইতেও পারে এবং মায়াবতীর নামান্তরও গঙ্গা হইতে পারে। ঐ গ্রন্থ মতে চন্দ্রদ্বীপের তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ইহার মাসীকে বিবাহ করেন। বৈদ্য কায়স্থের এই বিবাহের প্রসঙ্গে নব্য ভারত বলিয়াছেন—"চন্দ্রদ্বীপে বৈদ্যরাজা ছিলেন কি না জানা যায় না। বোধ হয় পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপেও কায়স্থগণ বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করিতেন। সে প্রথার অবশেষ মৈমনসিংহ শ্রীহট্টাদি দেশে এখন বিরাজমান।"
লেখক এই চন্দ্রদ্বীপের প্রকৃত পরিচয় না পাওয়াতেই এতটা কল্পনা করিয়া বৈদ্য কায়স্থ বিবাহের অর্থ করিয়াছেন। এই চন্দ্রদ্বীপ যে শ্রীহট্টেরই চন্দ্রপুর বা চান্দপুর (বাঘাসুরা), তাহা জানা থাকিলে এই বৈদ্য কায়স্থ বিবাহ প্রসঙ্গের সঙ্গত কারণ পাইতেন। কল্পনার আশ্রয় লইতে হইত না। বলা বাহুল্য যে শ্রীহট্টেই বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত আছে।

পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এই সময় জগন্মোহনের পত্নী গর্ভবতী হইয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীরের শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছে, যাঁহার প্রাণ তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়া যাইতে আকুলি বিকুলি করিতেছে, দড়ির বন্ধনে তাঁহাকে কি আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে? স্বয়ং ভগবানই বুঝি তাঁহার মুক্তির উপায় বিধান করিয়া দিয়া থাকেন। একদা আলস্যবশে জগন্মোহনের গর্ভবর্তী পত্নী সন্ধ্যার পরে যখন নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন উড়িয়া-পাণ্ডা বেশী পুরুষ[৫৫] জগন্মোহনের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন—"জগন্মোহনা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমায় শ্রীক্ষেত্রে লইয়া যাইব। কি কৌশলে বলা যায় না, জগন্মোহন দেখিলেন যে তাঁহার পায়ের শৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাবিবার আর সময় ছিল না। অভাগিনী গর্ভবতী পত্নী সম্মুখে নিদ্রিতা, তাঁহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না, সেই পান্ডা বেশী পুরুষের সহিত তিনি চলিলেন। জগন্মোহনের বয়স তখন বিংশতি বৎসর মাত্র।

শ্রীহট্ট জিলা অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত লালমাই পাহাড়ে পৌঁছিলেন,[৫৬] তখন সেই পুরুষ বলিলেন, একটু দাঁড়াও, আমি নিকট হইতেই অন্য যাত্রী লইয়া আসিতেছি। জগন্মোহন দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু সে পুরুষ আর ফিরিয়া আসিলেন না; তখন তিনি একাকীই বনপথে ধাবিত হইলেন।

জগন্মোহন ভাগবতের মতে তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থে উপনীত হইয়া কিছুদিন তথায় যোগমগ্ন হইয়াছিলেন; তৎপর তথা হইতে ক্ষেত্র পথে ধাবিত হন। অন্যত্র কিন্তু চন্দ্রনাথ গমন প্রসঙ্গ নাই, লালমাই হইতেই শ্রীক্ষেত্র গমন লিখিত আছে।

জগন্মোহনের সঙ্গে কাণাকড়িও ছিল না; কিন্তু সাগর-গামিনী বেগবর্তী নদীকে কোন বাঁধাই আটকাইয়া রাখিতে পারে না, তিনি তথা হইতে কয়েক দিনে আঠারনলার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রিগণের নিকট হইতে এই ঘাটেই তখন রাজকর আদায় হইত, জগন্মোহন কর দিতে না পারিয়া বিরস-বদনে বসিয়া রহিলেন। কথিত আছে, সেই রাত্রে মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা স্বপ্নে একটি আদেশ প্রাপ্ত হন তাহা এইঃ—

"জগন্মোহন নাম তার জগত বিদিত।
আঠার নালার ঘাটে ভক্ত উপস্থিত॥"
জগন্মোহন চরিত্র। (১২৩৮ বাং প্রতিলিপি হইত।)

পরদিন প্রভাতে প্রধান পাণ্ডার প্রেরিত লোক আঠারনালার ঘাটে গিয়া খোঁজ করিয়া জগন্মোহনকে পাইল ও সম্মান সহকারে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। জগন্মোহন এযাবৎ অদীক্ষিত ছিলেন, পিতার ভয়ে গৃহে থাকা কালে একথা মুখে আনিতে পারেন নাই। এক্ষণে জগৎ পিতার আদেশ লইয়া মুরারিজী নামক জনৈক ছত্রধারী রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইলেন।[৫৭] "পূর্ণব্রহ্ম" উচ্চারণপূর্ব্বক "সাধু সত্য কি বাণী, গুরু সত্য," এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,

৫৫. জগন্মোহন ভাগবত মতে জনৈক সন্ন্যাসী। উক্তগ্রহ মতে এই সন্ন্যাসী আপনাকে (শ্রীচৈতন্যেরগুরু) ঈশ্বরপুরী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, জগন্মোহন যে নিত্যানন্দ, একথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয় চন্দ্রশেখরে যাওয়ার জন্য অনুজ্ঞা করেন, তাহাতেই (বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর অনুজ্ঞায়) বৈষ্ণব জগন্মোহন শৈষতীর্থে গমন করেন।

৫৬. চন্দ্রশেখর যাইতে করিল গমন।
উপসন্ন হৈলা যাইয়া গহন কানন॥—জগন্মোহন ভাগবত।

৫৭. এই মুরারিজা সুপ্রসিদ্ধ দোঁহাকার তুলসী দাসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া জগন্মোহী সম্প্রদায়ে উক্ত হন। ভক্তমালা প্রণেতা নাভাজীর সহিত তুলসী দাসের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ভক্তমালা গ্রন্থে আছে। এই হিসাবে তিনি সম্রাট আকবরের সমসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। জগন্মোহনের গুরু মুরারিজী তুলসী দাসের শিষ্য হওয়া অসম্ভব নহে : জগন্মোহন ভাগবতেও ইঁহার নাম আছে, কিন্তু মিলনটা গৃহে থাকা কালে ("রামবাগে") লিখিত হইয়াছে। একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কবিরদাস কৃত রামকৃষ্ণচরিতে শ্রীক্ষেত্রে মিলন প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে।

ফলতঃ ইহা তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র স্বরূপ হইল। জগন্মোহনের গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা ছিলনা, মনে করিয়াছিলেন যে, রথে জগন্নাথ দর্শনান্তে রথচক্রে প্রাণদান করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না; দেশে গিয়া দেশের লোককে জ্ঞান দান করিতে, গুরু মুরারিজী দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে আদেশ দিলেন।

গুরুর আদেশে জগন্মোহন দেশে আসিলেন কিন্তু না গিয়া মাছুলিয়ার বিজনবনে বিরলে বসিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। শশধর উদিত হইলে তদীয় জ্যোতিরেখা চতুর্দ্দিকে আপনা হইতেই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; জগন্মোহনের সংবাদ গোপনে রহিল না। অচিরেই নানা স্থানের সাধু সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিতে লাগিল, সুধারাম নামে এক নাগাসন্ন্যাসী একশত সাধু সহ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন যে, কোন দেবমূর্ত্তি নাই। তিনি এই বিষয় প্রশ্ন করিলে গোসাই বলিলেন "বৈষ্ণব ভগবানের বিগ্রহ, স্বতন্ত্র বিগ্রহের প্রয়োজন কি?" ইত্যাদি। কোন পর্ব্ব উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ "চতুর্দ্দিকে আলিঙ্গ (লম্বাগৃহ) নির্ম্মাইল, ও তাহার মধ্যে দোল মঞ্চ স্থাপন করিল; তৎপরে শিষ্যবর্গ তাঁহাকেই পূজা করিল। ইহাতে ব্রাহ্মণবর্গ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এমন কি তাঁহারা এ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের প্রতিকার জন্য আমিলের কাছে নালিশ করিলেন। গোসাই আমিল সদনে উপস্থিত হইয়া বুঝাইলেন, আত্মাই ব্রহ্ম, শিষ্যদের তদ্রূপ পূজা দোষাবহ হয় নাই; ইত্যাদি। ফলতঃ জগন্মোহনের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; দেশপতি সুলতানশীর মোসলমান ভূস্বামীও তাঁহার পক্ষপতি হইয়া পড়িলেন।[৫৮] ইহাতে তদীয় মহিমা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং ভক্তবর্গ জুটিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দের সঙ্গীত

এই সময়ে তাঁহার আদি শিষ্য গোবিন্দ গোসাই তাঁহার নিকট আগমন করেন; গোবিন্দ রাঢ়িশাল বাসী; ও সাহাবংশীয় ছিলেন।[৫৯] গোবিন্দ ধ্যান-মগ্ন জগন্মোহনের নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষিত হইতে চাহিলে, মাছুলিয়ার বিজন বনে জগন্মোহন গোবিন্দকে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গুরুতত্ত্বের মাহাত্ম্য বিশদ ভাবে বর্ণন করেন। তুলসী পত্রের ও গোময়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে জগন্মোহন বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ছিলেন! জগন্মোহন ভাগবতকার বলেন তিনি—

"দেব বিধি মত যত পরিত্যাগ কৈল।
কেবল অভেদ পরমার্থ প্রচারিল॥" ইত্যাদি

গোবিন্দ গোসাঞি জগন্মোহনের মতানুযায়ী যে সকল সঙ্গীত রচনা করেন, জগন্মোহনী সম্প্রদায়ে তাহা "নির্ব্বাণ সঙ্গীত" নামে উক্ত হয়।[৬০]

ইহার পর হরি সেম, রামনারায়ণ, মুরারিদত্ত প্রমুখ শত শত লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণে ঐ মতে প্রবিষ্ট হয়, হিম্মত খাঁ ও বাহাদুর খাঁ মনসুর খাঁ নামক তিন জন মোসলমানও তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিল; যথাঃ—

---

৫৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ২য় ভাঃ ৪র্থ খঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ইঁহার বিবরণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৫৯. জগন্মোহন ভাগবত মতে ইঁহার নাম গোবিন্দ বল্লভ নাগ, তাঁহার পিতার নাম গৌরী বল্লাভ নাগ।

৬০. উদাহরণ স্থলে তিনটি নির্ব্বাণ সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ-

(১) "বজহে পরব্রহ্ম থাকিবা আনন্দে। কিশের কারণে ভাই লাগি রৈলা ধন্ধে॥
পূর্ব্বে না ছিল কেহ না থাকিবে পাছে। মিছা মায়া সংসারে ভ্রমেতে ভুলিয়াছে॥
আপনার প্রাণ পুনি নহে আপনার। পিতা মাতা সুত কান্তা কেমনে তোমার॥
দেখ শুকদেব নারদ প্রহ্লাদ সনাতন। বিচার করয়ে আর যত মুনিগণ॥
আরো, সর্ব্ববেদে সর্ব্বশাস্ত্রে করেছে নির্ণয়। গুরু বিনে তরাইতে কেহ না পার॥
ওহে বৈরাগোয় পরে ধর্ম্ম নাহি কদাচিত। বলেন গোবিন্দ দাস নুই ভবে বঞ্চিত॥"

"মনসুর খাঁর নাম হৈল মনোহর দাস,
হিম্মত খাঁর হইল নাম হৃদানন্দ দাস॥
বানেশ্বর দাস নামাবাহাদুর খাঁর হৈল।
সর্ব্ব পরিত্যাগী ভিনে বৈরাগী করিল॥"—জগন্মোহন ভাগবত।

বলা গিয়াছে জগন্মোহন যখন শ্রীক্ষেত্রে যখন শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবর্তী ছিলেন। সেই গর্ভে যথা কালে দুইটী যমজ পুত্র জাত হয়, ইহাদের নাম শ্যাম ও সুদাম। ইহারা কিঞ্চিত বড় হইলে, সঙ্গীয় দুষ্ট বালকেরা তাহাদের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসিলে তাহারা কিছুই বলিতে পারিত না, তাহাদের মুখ মলিন হইয়া যাইত; ইহাতে অজ্ঞাত পিতার প্রতি তাহাদের বড়ই অনুরাগ জাত হয়। বালক দুটি পরে যখন জানিতে পারিল যে, মাছুলিয়ার জঙ্গলে তাঁহাদের পিতা ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল ও তাঁহার কাছে গমন করিল। নির্লিপ্ত জগন্মোহন তাহাদিগকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন কিন্তু তাহারা কোনরূপেই পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে চাহিল না।[৬১]

গোবিন্দ গোসাঞি পিতা পুত্রের এই ব্যবহার দৃষ্টে পুত্রদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন ও তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া রাখিতে একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রিয় শিষ্যের একান্ত অনুরোধ গুরু একবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, অগত্যা মন্ত্র দেওয়ার ভার তাঁহাকেই দিলেন; তখন শ্যাম গোবিন্দ হইতে মন্ত্র পাইয়া শান্ত গোসাঞি নামে খ্যাত হইলেন। সুদাম গৃহী রহিলেন, তদ্বংশীয়গণ এখনও বাঘাসুরাবাসী। জগন্মোহন ১৪৮১ শকাব্দে[৬২] দেহত্যাগ করেন। ইঁহার জীবন সম্বন্ধে বিবিধ আলৌকিক কথা বর্ণিত আছে।

---

(২) "ভাবের বন্দো, ভাবের বন্দো পতিতের বন্ধু তুমি হে।
প্রভু তোমার লাগিয়া প্রাণ দিতে চাই আমি হে॥
রূপ দেখ, ধাতু মূর্ত্তি পাষাণ না হও। সর্ব্ব ঘটে আছ তুমি কাকে নাহি ছও॥
ঢাকিয়া আছ হে প্রভুর সর্ব্ব কলেবর। স্বর্গ মর্ত্তা রাখিয়াছ উদর ভিতর॥
অংশ বিন্দু কলা নহ অক্ষরের পর। বলেন গোবিন্দ দাস সব ভাইর ভিতর॥

(৩) "গুরু দেবের চরণ শরণ লওযে ভাই ভব সিন্ধু তরিতে তরণী আর নাই॥
মহা অন্ধকার ধন্ধু গুরু না ভজিলে। অন্ধ মীন থাকে যেমন অন্ধকূপ জলে॥
পশু পক্ষী থাকে যেমন ডিম্বের ভিতর। মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম বৃথা গেল মোর॥
সাফল্য জীবন যার গুরু যেই ভজে।
অগম্য গমিতে পারে অনাহত বুঝে॥
অভাব ভাবিতে পারে অমূল্য মিলায়। আনন্দ পূর্ণিত তনু ভাব সিদ্ধি হয়॥
আপনার নিজ গৃহে পায়স তেজিয়া। দুর্ম্মতি ফিরয়ে যেন ভিক্ষা বিচারিয়া।
এতকে জানিয়া ভাই হও সাবধান।
আপনে বুঝহ কিবা জ্ঞান অজ্ঞান॥
জ্ঞানহীন কর্ম্মত্যজ বিভল প্রমাদ। বলেন গোবিন্দ দাস গুরুর প্রসাদ॥

৬১. চন্দ্রদ্বীপ হইতে পিতৃসদনে ইঁহাদের গমন বৃত্তান্ত জগন্মোহন ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। এই "চন্দ্রদ্বীপ" কোথায় ছিল, বলিয়াছি। ইহারা যে বরিশাল বা তদ্রুপ দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে পিতৃসদনে উপস্থিত হইয়াছিল, ভাগ্যতের বর্ণনাতেও তাহা পাওয়া যায় না। পুত্রদ্বয়ের মুখে পরিচয় প্রাপ্তে আত্মীয় স্বজনের জন্য জগন্মোহনের বিচলিত হইয়া ক্রন্দন করা ইত্যাদি উক্ত গ্রন্থের বর্ণিত প্রসঙ্গ নির্লিপ্ত জগন্মোনের পবিত্র চরিত্রোপযোগী হয় নাই।

৬২. "চৌদ্দশত পঞ্চাশ শকে আবির্ভাব হৈল। বিংশতি বৎসর প্রভু বেবাক লীলা কৈলা॥
এক বিংশতিতে প্রভুর পরমার্থ গ্রহণ দ্বাত্রিংশ বৎসরে প্রভু হৈল অদর্শন॥
চৌদ্দশত একাশী শক তাতে হয়। এই ত কহিল প্রভুর লীলার বিষয়॥"
জগন্মোহন ভাগবত।

জয় গোবিন্দ সোম

জয়গোবিন্দ সোম শ্রীহট্টের সাহুবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি শহরের উপকণ্ঠ আকালিয়াবাসী দোল গোবিন্দ সোমের পুত্র।

ওয়েল্‌শ্‌ মিশনের প্রচারক প্রাইজ সাহেবের নাম শ্রীহট্টবাসী ভুলিবে না, প্রাইজ সাহেবই শ্রীহট্টে ইংরেজী শিক্ষার বীজ রোপন করিয়া ছিলেন। জয়গোবিন্দ ইহার প্রতিষ্ঠিত মিশন স্কুলে প্রথমে প্রবিষ্ট হন। জয়গোবিন্দ বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়নের জন্য কলিকাতা গমন করেন এবং ১৮৬৩ অব্দে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বি এ এবং এম এ পরীক্ষা এক সঙ্গে দিতে প্রস্তুত হইতে থাকেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এম এ অনার পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাতে সর্ব্ব প্রথম জয়গোবিন্দ নাম দৃষ্ট হইবে। এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এই উভয় পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হওয়া সামান্য শক্তির পরিচালক নহে; এরূপ প্রতিভা অধিক দৃষ্ট হয় না। জয়গোবিন্দের পূর্ব্বে শ্রীহট্টবাসী কেহ এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। ইনিই শ্রীহট্টের,—শ্রীহট্টের কেন হয়তঃ পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম এম এ। জয়গোবিন্দ কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া অল্প কিছুকাল মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া ছিলেন, তৎপর কলিকাতায় চলিয়া যান এবং কেথিড্রেল মিশন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, ও সঙ্গে সঙ্গে আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে আগমন করেন ও কিছু দিনের জন্য জজ আদালতে উকালতিতে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় তৎকর্ত্তৃক এক খানা সংবাদ পত্র পরিচালিত হইত। ইহার খাতিরে পুনঃ তিনি কলিকাতায় চলিয়া যান ও কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। তিনি তদবধি আমরণ কলিকাতা হাইকোর্টে উকালতি করিয়া ছিলেন।

প্রাইজ সাহেবের বিমল চরিত্র শ্রীহট্টের অনেক যুবকের অনুকরণীয় হইয়াছিল, আর তাঁহারা সকলেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন, জয়গোবিন্দ তন্মধ্যে অন্যতম। ১৮৭৫/৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হইতে "ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টিয়ান হেরাল্ড" নামক ইংরেজী পত্রিকা পরিচালনা করেন; শ্রীহট্টবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরেজী কোনও পত্রিকা তৎপূর্ব্বে বাহির হয় নাই। তিনি ইণ্ডিয়ান খৃষ্টিয়ান সোসাইটির" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার সেক্রেটারী ছিলেন। বাঙ্গালী খৃষ্টান সমাজে জয়গোবিন্দ প্রধান স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

জয় গোবিন্দ একজন বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন বটে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকেও তিনি বিশেষ সম্মান ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। কদাপি হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দাবাদ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না, বরং হিন্দুর বাল্য বিবাহ প্রথা সমর্থন করিয়া তিনি ১২৯৩ সনে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বদেশীয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। তিনি পীড়িত হইয়া মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহার স্বদেশ হইতে বহুদূরে—মধুপুরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩য় অক্টোবর তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৬৩]

জয় নারায়ণ (রাজা)

ইনি জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে ৩য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এস্থানে কিছুই লিখিত হইল না।

৬৩. ইঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে তদীয় চিত্র "শ্রীহট্ট গৌরব চিত্রাবলী" ভুক্ত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

জীবন ঠাকুর

ঠাকুর জীবনের জন্মস্থান সতরশতী পরগণার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রাম। ঠাকুর জীবন দাস জাতীয় ছিলেন। ইনি বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় গোকুলের গোঁসাঞিদের শিষ্য ও একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

ঠাকুর জীবনের বাড়ীর নিকটেই বরাক নদী, নদী ঐ স্থানে ভাঙ্গিয়া একটি ঘুর্ণিচক্রের উৎপত্তি করিয়াছিল। কথিত আছে, একদা কি জানি কি এক দৈব নির্দ্দেশে ঠাকুর জীবন তটভূমি হইতে ঝম্পদিয়া উক্ত ঘুর্ণিচক্রে পতিত হন ও প্রায় দুই ঘন্টা কাল ডুবিয়া থাকিয়া তৎপরে এক জগন্নাথ বিগ্রহ থেকে বক্ষে ধারণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হন। এই ঘটনা হইতেই তিনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত হন, এই ঘটনার পর হইতেই ক্রমশঃ নদীতে চড়া পড়িয়া, সে স্থান হইতে নদী প্রায় দুই হাল অন্তরে চলিয়া যায়। এই ঘটনা ঠাকুর জীবনের দৈবশক্তি প্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সাধারণে প্রচারিত হয়। প্রকৃতই অতঃপর তাঁহার বিবিধ দৈব্য শক্তি প্রকাশ পাইতে থাকে এবং জনগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে অত্যাগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকে। ঠাকুর জীবনের শিষ্য সংখ্যা সামান্য নহে। ঠাকুর জীবন একজন প্রধান সিদ্ধ পুরুষ হইলেও, দুঃখের বিষয় আমরা তদীয় জীবন বিবরণী সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। ঠাকুর জীবনের রোপিত একটি "জিরবট" বৃক্ষ চাঁদপুরে আছে, লোকে বৃক্ষটিকে যথেষ্ট মান্য করিয়া থাকে।

ঠাকুর ফকির

ঠাকুর ফকিরের প্রকৃত নাম কি ছিল জানা যায় না, ইনিও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। যিনি তরফের চকহায়দরের আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা তিনি ও ইনি এক গুরুর শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই অল্পকাল মধ্যে সাধন প্রভাবে সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, গুরু শিষ্যদ্বয়ের কৃতিত্ব দর্শনে এক দিন বলেন যে "এক খাপের ভিতরে দুই তরবারি থাকিতে পারে না।" গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া দুই শিষ্য দুই দিকে গমন পূর্ব্বক দুই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সেই সময়েই প্রতাপগড় পরগণার উত্তর প্রান্তে গড়ের সন্নিকটে সিঙ্গীছড়া নামক পার্ব্বত্য স্রোতের জঙ্গলাকীর্ণ তটে আসিয়া স্বীয় সাধনার স্থান স্থির করেন। এস্থানে অবস্থিতি কালে একদা স্নানে গিয়া জলের নীচে এক জলের নীচে এক প্রস্তর বিগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং সেই বিগ্রহকে উত্থাপিত করিয়া স্থাপন করেন।

ঠাকুর হিন্দু মোসলমান সকলকেই সমান ভাবে দর্শন করিতেন। উভয় জাতীয় লোকই সমভাবে তাঁহার কাছে যাইত ও তাঁহার অনুগ্রহে কঠিন হাত হইতে মুক্তি পাইত। ক্রমে তাঁহার নিকট পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে মোসলমান যাইতে আরম্ভ করে, ইহা শুনিয়া জফরগড়ের জনৈক মোসলমান ভূম্যধিকারী ফকিরের "আস্থানে" সাতটি বৃষ জবাই জন্য প্রেরণ করেন। ভক্তবর্গও তৎসংবাদ প্রাপ্তে কি হইবে ভাবিয়া বিমর্ষ হয়। যাহা হোক ভূম্যধিকারী নিয়োজিত লোক বৃষ গুলোকে কোন প্রকারেই জবাই দিতে হয় নাই, প্রত্যেক উদ্যম এক একটা প্রতিবন্ধক ঘটিয়া বিফল হইতে লাগিল; তদ্দৃষ্টে ভূম্যধিকারী বিস্মিত হন, ও ইহা ফকিরের প্রভাবেই বা বশে হইতেছে বুঝিতে পারেন। বৃষ আর জবাই করা হইল না, ভূম্যধিকারী প্রীত হইয়া ফকিরের দেবতার নামে অনেক ভূমি দেবত্র দান করিলেন। পরে জফরগড়ের হিন্দু ভূম্যধিকারী, মৈনার চৌধুরীবর্গও দেবতা কানাই লালের দেবত্র দান করিয়া কানাই দেবত্র সম্পত্তির বৃদ্ধি করেন। কানাইর দেবত্র ভূমিতেই প্রসিদ্ধ গোহাট "কানাইর বাজার" ও তন্নামীয় ডাকঘর স্থাপিত আছে।

ঠাকুর ভেখশ্রিত বৈষ্ণব ছিলেন, হিন্দুগণ তাঁহাকে "ঠাকুর" এবং মোসলমানগণ "ফকির" বলিত বলিয়া তিনি "ঠাকুর ফকির" নামে খ্যাত ছিলেন। গঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত আখড়াই অতি প্রাচীন ও সম্মানিত এবং প্রসিদ্ধ।

দয়ালকৃষ্ণ দস্তিদার

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশং ২য় ভাঃ ২য় খঃ ৪র্থ অধ্যায়ে নবাব হরকৃষ্ণ বিবরণ প্রসঙ্গে দস্তিদার বংশের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তিত হইয়াছে; এই বংশে দয়াল কৃষ্ণের উদ্ভব।

দয়াল কৃষ্ণের জীবন সরস্বতীর অর্চ্চনায়—বিদ্যালোচনায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সভ্রাতৃক দয়াল কৃষ্ণের বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল, তৎপতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, কনিষ্ঠ গোপাল কৃষ্ণই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, দয়ালকৃষ্ণ পুথি পত্র লইয়াই দিনপাত করিতেন। কিন্তু এইরূপ নিরুদ্বেগে অধিক দিন কর্ত্তন করিতে পারেন নাই, ভ্রাতৃ বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে কিছুকাল সাংসারিক জঞ্জালে বিব্রত থাকিতে হয়। কথিত আছে যে, এই ভ্রাতৃ বিরোধ উপলক্ষে মামলা মোকদ্দমার ব্যয় বাহুল্যে বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি ঋণদায়ে তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল।

দয়ালকৃষ্ণ পিতার ন্যায় জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তদ্ব্যতীত সাধারণ সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার আত্যন্তিক অনুরাগ ছিল।

শাকুনিক শাস্ত্র—"কাকচরিত্র" বিদ্যা একসময়ে অতি আদরের ছিল, ইহা এখন অনালোচ্য হইয়া পড়িয়াছে। আলোচনার অভাবে এ বিদ্যার আর আদর নাই এবং ইহার সঙ্কেত সকল বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে ইহাতে বিশ্বাস সংস্থাপিত করা কঠিন হইয়াছে। পক্ষীর স্বর এবং গতি ও অঙ্গভঙ্গি হইতে অনেক সময় প্রাকৃতিক অবস্থা বিপর্য্যয়ের জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, "কাকচরিত্র" আলোচনায় অনেক সময় ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণীত হইত, তাহার অনেক বিশ্বাস্য কাহিনী শুনা গিয়া থাকে। দয়ালকৃষ্ণ কাকচরিত্র ভাল রকম জানিতেন।

একদা দস্তিদার গৃহে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছিল, হঠাৎ দয়ালকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন—"আজ সুন্দররূপে ব্রাহ্মণ ভোজন হইল না, আমরা আজ, ব্রাহ্মণভোজনে দধি ও ক্ষীর দিতে পারিব না।"

"কেন পারিবেন না; ক্ষীর লইয়া তো গোয়ালা আসিতেছে?" পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক পরিচারকের এ কথার উত্তরে বলিলেন—"হতভাগ্য গোয়ালার পদস্খলিত হওয়ায় এই মাত্র তাহার দধি ও ক্ষীরের কড়াই (পাত্র) পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; কাজেই ইহা দিতে পারিব না।"

এইকথা বার্ত্তার ক্ষণপরেই গোয়ালা রিক্তহস্তে আসিয়া পথের ঘটনা জানাইল। গোয়ালা সত্য বলিতেছে কি প্রতারণা করিতেছে, তাহা জানিতে (এবং দয়ালকৃষ্ণের উক্তির যথার্থ্য পরীক্ষার্থ) তখনই ঘটনাস্থলে লোক প্রেরিত হইল; সেই লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল যে যথার্থই পথে দধিভাণ্ড ও ক্ষীরাধার ভগ্ন হইয়া দধি ও ক্ষীর পতিত হইয়াছে।

দয়ালকৃষ্ণ কাকধ্বনি হইতেই এই বিষয় জ্ঞান হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় জমিদার নবকৃষ্ণ দস্তিদার এই দয়ালকৃষ্ণের ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। নবকৃষ্ণের সুযোগ্য পুত্রগণ এক্ষণে বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

দীননাথ দত্ত

হবিগঞ্জ সবডিভিশনের অন্তর্গত তরপ পরগণার সাতকাপন নামক পল্লীতে ১৭৬৬ শকের কার্ত্তিক মাসে তত্রত্য রতিরাম দত্তের একটি পুত্র জাত হয়। নাম দীননাথ দত্ত। ইহার পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বে অন্যত্র ছিলেন। দীননাথের অষ্টম পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদ্যনাথ দত্ত সাতকাপনের দুর্য্যধন করের কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া এস্থানে বসতি করেন, তদবধি দত্ত বংশীয়গণ এস্থান বাসী।

বৈদ্যনাথের পুত্র রাধানাথ, তৎপুত্র গঙ্গাহরি, তাঁহার পুত্র প্রাণ বল্লভ, তৎপুত্র রঘুনাথ, তৎপুত্র রঞ্জিত রাম, ইনিই দীননাথের পিতামহ। পুরুষ বৈদ্যনাথকে প্রায় ২৫০ বৎসরের

পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী লোক বলা যাইতে পারে।

দীননাথ দত্ত ইংরেজী অধ্যয়ন না করিলেও, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে ন্যূন ছিলেন না। ইহার গবেষণা শক্তি অতি প্রসংশনীয় ছিল। ইনি পরোপকারী, দেশ হিতৈষী অধ্যবসায়ী ছিলেন; এ দেশে দেশবাসীগণ যাহাতে যৌথ কারবার করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ছিল এবং এ বিষয়ে তিনিই প্রথম পথ প্রদর্শক কাছাড় নেটিভ জয়েন্ট ষ্টক কোংও ভারত সমিতি তাহার নিদর্শন স্বরূপ বৰ্ত্তমান আছে। উক্ত কোম্পানি দুইটি ইঁহারই উদ্যোগে উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং নববিধান মতের অনুসরণ করিতেন। গত ১৯২৪ শকের মাঘ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন; তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দত্ত পিতৃপদানুসরণে যোগ্যতার সহিত ভারত সমিতির কাৰ্য্য করিয়াছেন।

দুর্গাপ্রসাদ কর (দুর্গা সাধু)

ইটা পরগণার অন্তর্গত ক্ষেম সহস্র গ্রামবাসী হরিবল্লভ করের তৃতীয় পুত্রের নাম প্রসাদ। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে (কার্ত্তিক মাসে) ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে দুর্গাপ্রসাদের লেখাপড়া হয় নাই বলিলেই চলে, হাতেখড়ির পরে স্বগ্রামে মাত্র বৎসর কাল ওঝার কাছে লেখাপড়া করিয়া ছিলেন; তাহার পর পাঠে যাওয়ার কালে একদা সহপাঠী নিত্যানন্দ করের গৃহে তিনি তিন পাতের একখানা হস্তলিখিত পুথি প্রাপ্ত হন। সেই পুথি পাঠে তাঁহার মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়; সেই হইতে তিনি পাঠ ও বালকদের সহিত খেলা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া উক্ত তিন পাতের পুথি লইয়া থাকিতেন।

পুত্র পাঠ ত্যাগ করিলে, পিতা তাহাকে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে বলিলেন। ধাতুর বাসন প্রস্তুত করাই তাঁহাদের ব্যবসায়; পিতৃ আজ্ঞায় দুর্গাপ্রসাদ তাহা শিখিয়া লইয়া স্বয়ং কাজ করিতে লাগিলেন। ইহার পর একাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তিনি কনিষ্ঠ হইলেও কাৰ্য্যতৎপরতা বশতঃ অল্প কাজ মধ্যেই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা তদীয় পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কোন কাৰ্য্যই করিতেন না।

যখন তাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর, তখন সেই ক্ষুদ্র সংসারে তিনি একজন কৃতি পুরুষ। তখন তিনি কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সময় তিনি উদ্যোগী হইয়া জ্যেষ্ঠের বিবাহ দেন। তাঁহার পরে তিনি দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন এবং আমিষ ভক্ষণ বৰ্জ্জন, একাদশী প্রভৃতিতে উপোষণ ও নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপে চারি বৎসর গত হয়, তখন ধৰ্ম্মতত্ত্ব ভালরূপে অবগত হইতে তাঁহার প্রবল আকাজ্ক্ষা জন্মে; কিন্তু এক বৎসর কাল উপযুক্ত উপদেষ্টার অনুসন্ধান করিয়া তিনি বিফল মনোরথ হইলেন এবং নিরাশ চিত্তে নিয়মিতরূপে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন নাম গ্রহণের ফলে তাঁহার শিক্ষা গুরুর সঙ্গ লাভ ঘটিবে।

তাঁহার সহপাঠী নিত্যানন্দের জননী মনোমোহিনীর পতির প্রতি অকৃত্রিম ভাব এবং সরল ব্যবহার তিনি অনেক দিন দেখিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, নিত্যনন্দ জননীর নিষ্ঠাই তাঁহাকে উদ্দিষ্ট পথে চালাইতে সহায় হইতেছে, ঈদৃশ নিষ্ঠা ব্যতীত ধৰ্ম্ম বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং নিত্যানন্দ জননীর ভাবানুকরণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া মাতৃ বয়স্কা সেই বর্ষীয়সী রমনীকেই মনে মনে শিক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিলেন। একথা কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না।

দুর্গাপ্রসাদ মনে মনে হরিনাম করেন ও সকলের আজ্ঞাতে শিক্ষাগুরুরূপিনী মনোমোহিনীকে যেরূপেই হউক, প্রত্যহ দূর হইতে একবার দর্শন করিয়া মনে মনে প্রণাম করিয়া আসেন। এদিকে নিজভাব গোপনের জন্য বাসনের কাজ কর্ম্মে অধিকতর মনোযোগ দিলেন।

এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ নিজ হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে তখনও বাসনা রহিয়াছে কাম ক্রোধ স্থান পাইতেছে। এ সকল থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু এ সব যাইবে কিরূপে? নাম, একমাত্র হরিনাম গ্রহণই তিনি এ রোগের মহৌষধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ দিবারাত্রি অবিচ্ছেদে নাম লইতে সঙ্কল্প করিলেন। দিবসে কোন বাধা হয় না, কাজ করেন ও মনে মনে নাম লয়েন, কিন্তু রাত্রে নিদ্রার জন্য তাহা হইয়া উঠে না! তখন নিদ্রার সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিদ্রা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সারারাত্রি ব্যাপিয়া হাতুড়ীতে ধাতু পিটিতে আরম্ভ করেন ও ইহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হন। কর্ম্মানুরোধে নিদ্রা আসিত না এবং কয়েক দিনে তাহা একরূপ অভ্যাস হইয়া যায়। প্রভাতের পূর্ব্বে একঘন্টা কি অর্দ্ধঘন্টা মাত্র বসিয়া হাঁটুতে মাথা রাখিতেন, ইহাতেই একটু মাত্র নিদ্রাবেশ হইত! এইরূপে নিদ্রা কমিয়া গেলে প্রায় অবিচ্ছেদে নাম লওয়া চলিতে লাগিল। এই সময় হইতে তিনি একবেলা স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করেন।

এক বৎসর এইরূপ ভাবে গেল; একবৎসরের পরিশ্রমে, পাইকারী দরে সস্তায় বাসন বিক্রয় করিয়াও তাঁহার হাতে ৫০০ টাকা জমা হইল। এই টাকা হইতে তিনি ১০০ টাকা দীক্ষাগুরুকে ও পুরোহিতকে, ১০০ টাকা শিক্ষা গুরুকে এবং বাকি ৩০০ টাকা ভ্রাতৃহস্তে অর্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠকে বলিলেন "ভাই, আমার দ্বারা সংসারের কিছু হইবে না, সম্পত্তি তোমাদেরই রহিল, দিনান্তে একমুষ্টি তণ্ডুল ব্যতীত আমি আর কিছু চাহি না।" এই দিনই সকলে জানিল যে মনোমোহিনীকে তিনি শিক্ষা গুরুরূপে দর্শন করেন; মনোমোহিনীও তাহা সেই দিনই জানিতে পারিলেন।

এই সময় দুর্গাপ্রসাদের বয়স ২৪ বৎসরের অধিক নহে, এই সময় হইতে দৈনিক একমুষ্টি মাত্র করিয়া অন্নাহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এক দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইল, পূর্ব্বে কর্ম্মের ঝোকে নিদ্রা আসিত না, সারারাত্র হরিনাম করিতে পারিতেন। এক্ষণে কর্ম্মত্যাগ করায় কতক রাত্র পরেই নিদ্রা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি নিদ্রা তাড়াইতে কখন কখন উঠিয়া দৌড়িতেন, কখন কখন বা জলে নামিতেন। শীতে গায়ে কাপড় দিতেন না, যে গৃহে থাকিতেন তাহার চালে এক গাছি বড় শিকা খাটাইয়া সেই শিকায় এইজন্য উঠিয়া বসিতেন ও ঝুলিতেন; পড়িবার ভয়ে নিদ্রা দূর হইত। এইরূপে আর বৎসর গেল।

ইহার পর আহার ত্যাগই ইন্দ্রিয় দমনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিলেন এবং দিন দিন অন্তর একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাও অভ্যস্ত হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে দেহযষ্টি একেবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। এইরূপে আরও এক বৎসর কাল অতীত হইল, তৎপর তাঁহার এক বিধবা মাসী বহু অনুরোধে তাঁহার পাক প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন।

অবিশ্রান্ত হরিনাম লইতে হইত বলিয়া তাঁহার লোকের সহিত আলাপের সময় ছিল না, লোকের সহিত আলাপ করিতেন না; শেষটা আলাপের ইচ্ছাই হইত না। এইরূপে আলাপ বন্ধ থাকিতে থাকিতে অবশেষে শব্দ উচ্চারণের শক্তি দূর হইল, বাক্য কখন বন্ধ হইয়া গেল। তখন আর ইচ্ছা করিয়াও আলাপ করিতে পারিতেন না, জিহ্বায় জড়তা বশতঃ শব্দ উচ্চারিত হইত না। এইরূপ অবস্থা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান—স্নানাহারের ইচ্ছা প্রভৃতিও দূর হইতে লাগিল। তখন হইতে নাম স্বতঃ স্ফুরিত হইত; নাম তখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে,—সতত

তালুমূলে টক্ টক্ ধ্বনির সহি নামের ক্রিয়া চলিত।

তখন যে কেহ ডাকিলে বা কিছু আদেশ করিলে আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় চলিতেন; কিন্তু এই নির্বাক পুরুষকে কেহ সংকীর্ত্তনে লইয়া গেলে, সেই কীর্ত্তন খুবই জমিয়া উঠিত, এইজন্য লোকে তাঁহাকে কীর্ত্তনে লইয়া যাইত।

তাহার পর সাধু আর এক নিয়ম করিলেন। একদিন মাসী অন্ন লইয়া আসিলে, তিনি গুরুগৃহ দেখাইয়া দিলেন। মাসী বুঝিলেন, সাধু প্রসাদ খাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তিনি থালা লইয়া মনোমোহনীর গৃহে গেলেন। মাসীর অনুরোধে সেই থালা হইতে মনোমোহনী কিঞ্চিৎ খাইলে মাসী তাহা লইয়া আসিয়া সাধুকে খাইতে দিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, সাধু স্বয়ং ভিক্ষায় বহির্গত হন। ভিক্ষাস্বরূপ তণ্ডুলে অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং তিনি গুরুগৃহে লইয়া যাইতেন ও তাহা হইতে গুরু কিছু খাইলে অবশিষ্ট আহার করিতেন।

মনোমোহিনীর সাধুকে প্রসাদ প্রদান প্রসঙ্গ লইয়া গ্রামের লোকে হাস্য পরিহাস করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে মনোমোহিনী বড়ই বিরক্ত হইলেন, সাধুকে আসিতে নিষেধ করিলেন। পরদিন সাধু অন্ন লইয়া গেলে তিনি স্পর্শ না করিয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন। নির্ব্বাক সাধু বিরশ বদনে গৃহে চলিয়া আসিলেন ও অনাহারে বসিয়া রহিলেন। তিন দিন চলিয়া গেল, সাধু খাইলেন না, মনোমোহিনীকে লোকে অনুরোধ করিলেও প্রসাদ করিয়া অন্ন দিতে তিনি অস্বীকৃত হইলেন। তাহার পর সাত দিন গেল, সাধু খাইলেন না; আরও সাত দিন অতীত, সাধু জলবিন্দুও গ্রহণ করেন নাই। গ্রামের লোক ভীত হইল ভাবিল, সাধু অনশনেই প্রাণত্যাগ করিবেন। এই প্রকারে সাধুর মৃত্যু হইলে থানার দারোগা তাঁহাদিগকেই দায়ী করিবে,—গ্রাম শুদ্ধ লোককে জবাবদেহি হইতে হইবে। সহপাঠী নিত্যানন্দ ও তাহার জ্যেষ্ঠগণের গরজ বেশীই হইল, তখন গ্রামবাসিগণ মনোমোহিনীকে ধরিয়া বসিল এবং তিনিও "না" বলিতে পারিলেন না।

তখন হইতে সাধুর মহিমা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু দুষ্টব্যক্তি বর্গ তখনও তাঁহাকে নির্য্যাতন করিত। ইটা চা বাগানের এক কুলি এই সময় তাঁহাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছিল, কিন্তু অচিরে সাধু দ্রোহের ফল স্বরূপ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়!

দুর্গ-প্রসাদের বাক্য বন্ধ হওয়ার সময় হইতে সেই পর্য্যন্ত বার বৎসর গত হয়, বার বৎসর একটি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। বার বৎসরের পরে একটি ঘটনা ঘটে, একদিন মনোমোহিনীকে সাধু অধিক পরিমিত অন্ন পাক করিতে ইঙ্গিত করেন, রন্ধন হইলে সেই দিন ১২/১৩ জন লোকের আহারোপযোগী অন্ন একাকী আহার করেন, কিন্তু তাহাতেও সেদিন তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নাই, পেটে হাত দিয়া এই ভাব দেখাইলেন। ইহার পর একদা গুরুগৃহে হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া মুখ দিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দস্রোত বহির্গত হইতে থাকে, যেন দুইটি লোক অজ্ঞাত ভাষায় আলাপ করিতেছে! সাধুর ইচ্ছা নহে, যেন ভিন্ন কোন শক্তির চালনায় কিছুক্ষণ শব্দস্রোত প্রবাহিত হইয়া পুনঃ বন্ধ হইয়া গেল। তখন হইতে সময় সময়ে এইরূপ হইত, কিন্তু স্বেচ্ছায় কিছু বলিবার তখনও সমর্থ্য হয় নাই।

এইরূপে বাহ্যবিলোপের সহিত অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য বলিবার সময়ে তাহাতে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা কথাও মুখ হইতে মিশ্রিতভাবে বাহির হইত। এইরূপে বহুদিন পরে, ক্রমে তিনি বাক্য কথন শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন ও আলাপ করিতে সমর্থ হন। এই সময়েও অভ্যস্ত নাম তালুমূলে সদা ধ্বনিত হইত, ইহার আর বিরতি হয় নাই, ইহা আজীবনই ছিল।

অতঃপর কীর্ত্তনে সাধুর নানারূপ অলৌকিক ভাবোদয় হইত। একদিন মহাসহস্রবাসী শক্তি উপাসক তারা সুন্দর ভট্টাচার্য্য "জয়দুর্গারশিব" ধ্বনির সহিত সাধু গৃহে উপস্থিত হইলে, সাধুর

শিবের আবেশ হইয়াছিল। আর একদিন কতকটি যাত্রী ইটার বদনহাটার কালী বাড়ীতে "মানস" আদায় করিতে আসিয়াছিল, তাহারা যে স্থানে ছিল দৈবতঃ দুর্গাপ্রসাদ তথায় গমন করিলে, কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তখন তাঁহার গৌরদেহে কাল আভা প্রকটিত হইয়া কালিকার আবেশ হয়। যাত্রিগণ মা মা বলিয়া স্তুতি করিতে আরম্ভ করে, ও সেই স্থানেই "মানসিক" প্রদান করিয়া, কদম হাটায় না গিয়াই ফিরিয়া যায়। একদিন কীর্ত্তনের সময় জগন্নাথ মূর্ত্তির ন্যায় হাত পা যেন সঙ্কোচিত হইয়া উঠিয়া ছিল! এই সময়ে মনোমোহিনীর একটি পুত্র তাঁহার স্পর্শে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া উঠেন!

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অর্দ্ধোদয় যোগোপলক্ষে দুর্গাপ্রসাদ তীর্থ যাত্রা করে নবদ্বীপ, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, অযোধ্যা প্রভৃতি দর্শন করিয়া তিনি দেশে আসেন, সেই সময় অনেক সাধুর সহিত তিনি সম্মিলিত হইয়া ছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে মনোমোহিনীর মৃত্যু হয়, শিক্ষাগুরুর পরলোক গমনে তাঁহার মুখে কোনরূপ শোকচিহ্ন বা বিকারভাব লক্ষিত হয় নাই; তিনি নিয়মিত সময়ে অন্ন প্রস্তুত করিয়া মনোমোহিনী যে স্থানে বসিয়া খাইতেন তথায় রাখিলেন। পরলোকগতা মনোমোহিনীর আর খাওয়া হইল না, দিনে পর দিন চলিয়া গেল, দুর্গাপ্রসাদ উপবাসী রহিলেন; কত লোক সাধ্য সাধনা করিল, শুনিলেন না; কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প ভাঙ্গিল না; এই রূপে ১৯ দিন উপবাসী রহিলেন! পরে বিংশতি দিনে হঠাৎ আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—"সেবা হবে" সেবা হবে সংবাদে সমুপস্থিত ভক্তবর্গ সুখী হইল। সে দিন বেলা অতীত হইয়াছিল, আর অন্ন পাক হইল না ফল মূল মনোমোহিনীকে নিবেদন করিয়া সাধু খাইলেন ও পরদিন তদ্রুপ সেই অন্নহার করিলেন। ১৯ দিনের প্রাণপণ সাধনায় ভগবানের কৃপায় তিনিই মনোমোহিনীকে তৈজস মূর্ত্তিতে পাঠাইয়া নিজ ভক্তের প্রাণ বাঁচাইয়া ছিলেন, এতদ্ব্যতীত ইহার আর কি অর্থ হইতে পারে?

দুর্গাপ্রসাদ ১৯টা দিন জলবিন্দুও গ্রহণ না করিয়া দেহধারণ করিয়া ছিলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অসম্ভব; সাধকের পরিপক্ক দেহ বলিয়া, তিনি অনশনে অভ্যস্ত বলিয়া ১৯ দিনের উপষোগে তাঁহার কিছুই হয় নাই। এই ঘটনার পর সাধু আরও কয়েক বৎসর ছিলেন, তখন তাঁহার মহিমা চতুর্দ্দিকে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার গৃহ "সাধুর আখড়া" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে এবং ভক্ত সংখ্যাও বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন তাঁহার গৃহে অবিরত কীর্ত্তন লাগিয়া রহিত। এইরূপ কয়েক বৎসর অতীত হইলে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়।[৬৪]

দুর্ল্লভ ঠাকুর

কুশিয়ারা নদী ও অমৃতকুণ্ডের মধ্যস্থলে আদমপুরে ঠাকুর দুর্ল্লভের বাড়ী ছিল। ইঁহার বিবরণ সুকবি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ঠাকুর দুর্ল্লভের বিষয় সম্পত্তি ছিল না, তিনি ভিক্ষাও করিতেন না, কিন্তু বাড়ীতে সদাব্রত ছিল। তিনি নিজে উৎকট রোগে পীড়িত ছিলেন, তাহার কোন প্রতিবিধান করিতেন না, কিন্তু মুখের কথায় শত সহস্র রোগকে আরোগ্যদান করিতেন। ঠাকুর বাণীর সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা ছিল, দুই বন্ধুতে বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, একটি দিনও পরস্পরের অন্ততঃ একবার দেখা না হইলে চলিত না। দুইজনের বাড়ীর মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা ৭/৮ মাইলে কম হইবে না।

একদিনের একটা গল্প এই। ঠাকুরবাণী সন্ধ্যার পর দুর্ল্লভের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হাসিখুশি চলিল, তাহার পরে ঠাকুরবাণী উঠিয়া বাড়ী

৬৪. আমাদের কৃত "সাধুচরিত্র" গ্রন্থে ইঁহার বিস্তৃত জীবন-কাহিনী বিবর্ণিত হইয়াছেন।

চলিলেন। ঠাকুর দুর্ল্লভ বলিলেন, "এত রাত্রিতে একা যাবে, চল আমিও কিছুদূর সঙ্গে যাই।" উভয়ে গল্প করিতে করিতে শেষটা ঠাকুর বাণীর বাড়ীতেই উপস্থিত, তখন ঠাকুর বাণী বলিলেন, "তা কি হয়, তুমি এতদুর একা যাবে? চল আমিও খানিকটা যাই।" এই "খানিকটা" যাইতে যাইতে উভয়ে আবার আলমপুর উপস্থিত! এইরূপ সেই রাত্রিতেই না কি উভয়ে সাতবার যাতায়াত করিয়া রাত্রিটি প্রভাত করেন! কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে? আমরা প্রকৃত মানুষ কিরূপে বুঝিব?

শ্রীশ্রীভবানী মাতার বাড়ীতে স্বর্গীয় হরানন্দস্বামী গল্প করিয়াছিলেন, তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিলেন এবৃং ভবানীপুরে অবস্থিতি করিবার জন্য আদেশ পাইলেন, তখন এক রাত্রিতেই ভবানীপুরে অবস্থিতি করিবার জন্য আদেশ পাইলেন, তখন এক রাত্রিতেই ভবানীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে লোকের সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, যে স্থান হইতে একরাত্রিতে ভবানীপুরে আসিয়াছিলেন, খুব দ্রুত আসিলেও ভবানীপুর হইতে সেস্থানে তিনদিনের কমে যাওয়া যায় না!

ঠাকুর দুর্ল্লভের অনেক গল্প আছে। দুর্ল্লভের আখড়ায় এখনও অতিথি হইয়া থাকে।"

নরসিংহ লাড়িয়াল

শ্রীপতি নামক নাড়ুলী গ্রামী একব্যক্তি শ্রীহট্টের লাউড়াধিপতি সূর্য্যসিংহের মন্ত্রী হইয়া শ্রীহট্টে আগমন করেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরবর্গ তদবধি লাউড় বাসী হন; শ্রীপতির বৃদ্ধপ্রপৌত্র নরসিংহ প্রসিদ্ধ নামা ব্যক্তি। তিনি বিদ্যা শিক্ষার্থ রামকেলিবাসী জটাধর সর্ব্বাধিকারী বাটিকায় গমন করিয়াছিলেন। নৃসিংহের পিতা পিতামাতাদি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন বলিয়া কুলীন সমাজে সম্প্রদানাদির অসুবিধা ঘটায়, তিনি শান্তিপুরে একবাটী প্রস্তুত করিয়া ছিলেন এবং শ্রীহট্ট হইতে কখন কখন তথায় গিয়া বাস করিতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ আরু ওঝা নাড়ুলী গ্রামী ছিলেন; সেই জন্য নরসিংহ শান্তিপুরে "নাড়িয়াল" নামে খ্যাত হন।[৬৫] শান্তিপুরে তৎকালে ব্রাহ্মণবাসী গ্রামবাসী শুকদেব আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পিতৃ শ্রাদ্ধে নানাস্থানের কুলীন শ্রোত্রিয়বর্গের সমাগম হয়। নরসিংহেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তাঁহার ভোজনের সময় উপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল, কিন্তু সমাগতেরা তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই ভোজনে উপবেশন করেন। কিঞ্চিৎ পরে নরসিংহ উপস্থিত হইয়া ব্যাপার দৃষ্টে আপনাকে অতি অপমানিত জ্ঞান করেন এবং তাদৃশ বিসদৃশ ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসিলে সকলে প্রত্যুত্তর করেন যে বহুকাল যাবৎ উচ্চ ঘরে তাঁহাদের সম্প্রদানাদি না থাকায় তাঁহার হীনত্ব ঘটিয়াছে। কাজেই তাঁহার জন্য অপেক্ষার আবশ্যক অনুভূত হয় নাই। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে কুলীন—শ্রেষ্ঠ মধুমৈত্রকে তিনি যদি কন্যাদান করিতে পারেন; তবেই তিনি পূর্ব্বানুরূপ পূজিত হইবেন।[৬৬]

ঐ সময়ে দৈবক্রমে দিনাজপুরের রাজা গণেশের সহিত তাঁহার দেখা হয়। গণেশ তাঁহার

---

৬৫. "মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে করে অবস্থিতি।
নরসিংহ নাড়িয়াল নাড় লীও কয়।
নাড়িয়াল, নাউড়িয়াল, নাড়ুলী একই অর্থ হয়।"
—প্রেম বিলাস।

৬৬. "সবে বলে বড় ঘরে নাহি কন্যা দান।
সে কারণে তোমাকে করি হেয় জ্ঞান॥
মধুমৈত্রে যদি কন্যা সমর্পিত পার।
আমরা মিলিয়া পূজা করিব তোমার॥—ঐ

বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও বিদ্যাবত্তা দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে তাঁর স্বীয় মন্ত্রীপদ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। নরসিংহ রাজাকে কন্যাদায়ের কথা জানাইয়া বলিলেন যে মধ্যগ্রাম নিবাসী মধুসূদন মৈত্রকে কন্যাদানে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা না করিয়া তিনি কার্য্যান্তরে বৃত হইবেন না। রাজা তদীয় সঙ্কল্প শ্রবণে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে বিবাহের ব্যয় তিনিই বহন করিবেন।[৬৭]

ইহার পর নরসিংহ ধন রত্ন ও কন্যাদি সহ এক নৌকারোহণ করিলেন এবং মধুমৈত্রের গ্রামে গিয়া নদীর মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। পরদিন মধু প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে গিয়া সেই নৌকা দেখিতে পাইলেন ও কোথা হইতে নৌকা আসিয়াছে এবং নৌকাতেই বা কে আছেন, জিজ্ঞাসিলেন। তখন নরসিংহ অগ্রসর হইয়া মধুমৈত্রকে বলিলেন, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণই গতি, আপনার ঘাটে আসিয়াছি, কন্যাদায় হইতে রক্ষা করুণ, নতুবা স্ত্রী ও কন্যা এবং শ্রীচক্রাদি সহ ডুবিয়া মরিব।[৬৮]

নরসিংহ তৎপর তাঁহাকে স্বীয় নৌকায় উঠাইলেন ও রূপবতী তনয়াদ্বয় সহ বহু অর্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মধুমৈত্র তখন যুবক নহেন যে রমণীর রূপে উন্মত্ত হইবেন কিন্তু তিনি স্ত্রীবধের ভাগী হইবেন, ব্রহ্মবধের পাতক তাঁহার ঘাড়ে হয়তঃ পতিত হইবে ইহা ভাবিয়াই ভীত হইলেন ও বহু পরিমিত ধন সহ কন্যাদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে এক বিভ্রাট ঘটিল, মধুর পুত্রগণ ইহাতে প্রতিবাদী হইয়া পিতাকে ত্যাগ করিল, মধু সমাজ—বর্জ্জিত হইলেন। মধুর ভগিনীপতি ধৈঞ্ৰী বাগচী কুলীন-প্রধান ছিলেন। ধৈঞ্ৰীর এক নিমন্ত্রণে একদা মধু যোগ না দেওয়াতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। আজ এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া মধু ভগিনীপতির শরণ না লইয়া থাকিতে পারিলেন না। মধুর বশ্যতা স্বীকার বিফলে গেল না। যখন মধুর বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন ধৈঞ্ৰী বাগচী সেই শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া ভোজন করিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি মধুর পুত্রগণকে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিলেন ও পিতার বাধ্য হইয়া চলিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তদীয় বাক্য গ্রহণ করিল না। তখন ধৈঞ্ৰী ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং পিতা অবাধ্য সেই গর্ব্বিত পুত্রগণকে সমাজে হীন করিয়া দিলেন। মধুর পুত্রগণ তদবধি "কাপ" নামে খ্যাত হইলেন।

এইরূপে কন্যার বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া নরসিংহ সমাজে সম্মানিত হইলেন এবং মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণে দিনাজপুরে গমন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রণাবলে দিনাজপুরের রাজার রাজ্য শ্রী বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে যোগ্যতর শাসনকর্ত্তা কেহ ছিল না, সেই সুযোগে রাজা গণেশের মনে উচ্চাভিলাষ উপজাত হয়, মন্ত্রীর সহিত সেই বিষয়ে পরামর্শ ক্রমে তিনি

---

৬৭. "রাজার সঙ্গে হইল কথোপকথন।
নৃসিংহের মনোভাব রাজা করিল গ্রহণ॥
রাজা বলে মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ কর তুমি।
বিবাহের যত ব্যয় সব দিব আমি॥"
তখন—"নরসিংহ মন্ত্রিত্ব পদ স্বীকার করিল।
বিবাহের যত ব্যয় সব রাজা দিল॥"
—প্রেম বিলাস।

৬৮. "ধনরত্ন পাইয়া নরসিংহ মহামতি।
স্ত্রীপুত্র কন্যাদ্বয় লইয়া সংহতি॥
নৌকায় চড়িয়া মাঝ গাঙ্গে চলি গেল॥"
"নরসিংহ বলে যদি কন্যা নাহি লও।
সবংশে মরিব তুমি ব্রহ্মঘাতি হও॥—ঐ

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে[৬৯] গেয়াসউদ্দীন বাদশাহের পৌত্র দ্বিতীয় শামস্ উদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। বঙ্গদেশ বহুকাল পরে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় হিন্দুর গৌরবচ্ছটায় অল্পমাত্র প্রভাসিত হয়।

কুলীন শ্রেষ্ঠ মধুমৈত্রকে কন্যাদান নরসিংহের একটি কীর্ত্তি। নরসিংহের পত্নী কমলাবতী রত্নগর্ভা ছিলেন; তাঁহার গর্ভে লাউড়ের রাজমন্ত্রী বৃহস্পতিবুদ্ধি কুবেরাচার্য্যের জন্ম হয়। ইঁহার কথা যথাস্থানে উক্ত হইয়াছে।

নবকিশোর সেন রায় সাহেব

পূর্ব্বে সমগ্র জোয়ানশাহী পরগণা শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল, এখন ইহার অধিকাংশ ময়মনসিংহ ভুক্ত হইয়াছে। এই জোয়ানশাহীর অন্তর্গত অষ্টগ্রামে কিশোর সেন জন্ম গ্রহণ করেন। নবকিশোর আশৈশব শ্রীহট্টবাসী। শৈশবে তরফ—পৈল নিবাসী ভগিনীপতি রাজমোহন মোনশী মহাশয়ের অদূরে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন; পরে শ্রীহট্টে শহরে গিয়া ইংরেজী ভাষায় কৃত বিদ্য হইয়া প্রথমতঃ মিশনারী স্কুলে কাজ করিয়া স্বীয় দক্ষতা ও সৌজন্যে স্মরণীয় হইয়াছিলেন। পরে তিনি শ্রীহট্টে কাছাড়ের ডিপুটী ইস্পেক্টর অব স্কুল নিযুক্ত হন। এই কাজে তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল প্রতিষ্ঠ থাকিয়া কেবল শিক্ষা বিষয়ে নহে—সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে সহায়তা করেন। তিনি কয়েক মাস কাল আসামের স্কুল ইনস্পেক্টরের পদেও সমাসীন হইয়া দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সুরমা উপত্যকার স্কুল ডিপুটী ইনস্পেক্টরের চার্জ্জ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে সমজাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালে হীরক জুবিলী উপলক্ষে তিনি "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি তরফ সুঘরের মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া তৎসন্নিকটস্থ জাজিউতা গ্রামে বাড়ী করিয়া নিজেকে শ্রীহট্টের অধিবাসী বলিয়া খ্যাপন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এক মাত্র পুত্র সন্তানটি অকালে মৃত হওয়ায় ঐ বাস বাটিকা স্থায়ী হইতে পারিল না। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ কৃতজ্ঞ শ্রীহট্ট ও কাছাড়বাসী নানা অনুষ্ঠান করিয়াছেন—তন্মধ্যে কৃষিশিক্ষার্থ "নবকিশোর বৃত্তি" (শ্রীহট্ট ছাত্র ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত) উল্লেখযোগ্য। ১৯১০ সালে ৪২ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারূঢ় হন।

নারায়ণ দেব

নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণের এক প্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার পিতার নাম নরসিংহ ছিল[৭০] জল সুখার নগরগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়, নগরে অদ্যাপি দেব উপাধি বহু বংশের বাস আছে। কবি চিরদিন নগরে ছিলেন না, কোন কারণে নগর হইতে উঠিয়া ময়মনসিংহের বোর গ্রামে গমন করেন। নারায়ন দেবের জন্মস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে নগরের শ্রীরামধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে লিখেন—"নারায়ণ দেব আর কবি বল্লভ পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে ছিলেন। তৎপর নারায়ণ দেব ময়মনসিংহ জেলার বুরগাও নামক স্থানের এবং কবিবল্লভ[৭১] নবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শাখুয়া কি ভুবিরবল মৌজায় যাইয়া বসবাস করেন। অতিপূর্ব্বে জলসুখা পরগণায় নগর ভিন্ন

---

৬৯. বাল্য লীলাসূত্র-গ্রন্থে গণেশ কর্ত্তৃক নোলমান বিজয়ের তারিখ এইরূপ লিখিতঃ—
"গ্রহ পক্ষাক্ষি শশা ধৃতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান।
ঘণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃ গভুৎ॥"

৭০. "নরহরিতনএ যে নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥"

৭১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরার্দ্ধ ৩য় ভাঃ ২খঃ ২য় অঃ ভট্টশ্রীর ভট্টাচার্য্য বংশ কথা দেখ।

কোথাও কোন ভদ্রলোকের বাড়ী ছিল না"[৭২] ময়মনসিংহর ও শ্রীহট্টের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা বিচারে তাঁহাকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

বোরগ্রাম শ্রীহট্টের সীমা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী না হইলেও বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ জেলার অন্তবর্ত্তী।[৭৩] তাই কবিকে ময়মনসিংহবাসী বলিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ উল্লেখ করেন এবং ইহা স্বাভাবিকই বটে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে এই কবিকে জোয়ান শাহী বাসী বলিয়া লিখা হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার সহোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু "আর্য্যাবর্ত্ত"—১৩১৯ সাল জ্যৈষ্ঠ, ১২৩ পৃষ্ঠায় এই কবি সম্বন্ধে একটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—যথা "নারায়ণ তাঁহার পদ্মাপুরাণের একস্থানে লিখিয়াছেন, চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনকা "বেহারী রাজার কন্যা" ছিলেন। দ্বিজ বংশী লিখিয়াছেন, মগধের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশে হলবাহক জাতীয় বছাই নামক রাজা মনসাদেবীর পূজা প্রবৃত্তিত করেন। নারায়ণদেব স্বয়ং মগধে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাঢ় হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে করেন। নারায়ণ দেব স্বয়ং মগধে জন্ম গ্রহণ[৭৪] করিয়া রাঢ় হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জিলার বুর গ্রামে বাস করেন। সুতরাং এই তিন প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, মনসামঙ্গলের উপাখ্যান আদৌ মগধ অঞ্চলের কথা ছিল।"

এ মগধ কোথায়? দীনেশ বাবু বেহার অঞ্চলই অনুমান করেন। এই আহবান প্রকৃত নহে বলিয়া মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে না কি? সহজেই মনে হয়, বেহারের একব্যক্তি এতদেশ মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আগমন পূর্ব্বক তদঞ্চলের ভাষায় পদ্মাপুরাণ লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয়তঃ এ গ্রন্থ কবির প্রবীণ বয়সে রচিত নহে। বালক কবির বেহার হইতে দূরবর্তী পূর্ব্ববঙ্গে আগমন এবং অপরিচিত দেশে আহারের সংস্থানে বৃত না হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন কতদূর সঙ্গত, বিবেচ্য বটে। কবি চতুর্দ্দশ বর্ষে দেবাদিষ্ট হইয়া এ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।[৭৫] কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সহায় সম্বল হীন অবস্থায় বেহার হইতে আগমন করা অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও দূরবর্ত্তী একটা নূতন দেশে আসিয়া একজন ভিন্ন ভাষা-ভাষী ব্যক্তি, নূতন দেশের ভাষা—প্রাদেশিক শব্দাদি পর্য্যন্ত, অত্যল্পকাল মধ্যে আয়ত্ত করিয়া গ্রন্থ রচনা করাটা অবিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক কি না বিবেচ্য। "বেহারীর রাজকন্যার কথা" গ্রন্থকারের বেহারে থাকাকালে লিখাই স্বাভাবিক হয়। আর সেই রাজকন্যার কথা তদঞ্চালর কেহ জানেনা,—শ্রীহট্ট অঞ্চলেই ইহার এত প্রচার কেন? বস্তুতঃ প্রকৃত বিষয়টি তাহা নহে; নারায়ণ দেবের বাসভূমি মগধে অবস্থান কোথায়, তাহার সংবাদ সম্ভবতঃ অনবগত বলিয়া দীনেশ বাবু এই মগধকে বেহার বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। নারায়ণের জন্মভূমি এই মগধ

---

৭২. ১৩১৩ বাং ২রা পৌষ তারিখের লিখিত পত্র।

৭৩. কবি যে সময়ে বোর গ্রাম বাসী হন, তখন ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয় নাই, ময়মনসিংহ জেলা মাত্র ১২৫ বৎসর অতীত হইল, গঠিত হয়। তৎপূর্ব্বে ইহার উত্তরপূর্ব্বাংশ এবং পূর্ব্বাংশ শ্রীহট্টেরই অধীন ছিল—কাজেই বোর গ্রামও সম্ভবতঃ শ্রীহট্টাধীন ছিল।

৭৪. "নারায়ণ দেবে হে জন্ম মগদ।"
ইত্যাদি, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ভূমিকা ধৃত নারায়ণী পদ্মাপুরাণের বাক্য।

৭৫. "চৌদ্দ বৎসরের কালে দেখিল স্বপন।
মহাজন সহিত পথেতে দরশন॥
শিশু রুপগত গোসাই হাতেত করি বাশী।
আলিঙ্গন দিয়া বলে যায় মুখে হাঁসি
গোবিন্দের আশা মোর সেই সে কারণ।
প্রণাম করিনু মুঞি ভজিব চরণ॥ —নারায়ণী পদ্মাপুরাণ।

ায় মগধ হইতে অভিন্ন বোধ করিলেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়। শ্রীহট্টের বিলুপ্তি মগধ রাজ্যের কথা[৭৬] শ্রীহট্টের ইতিবৃ পূর্ব্বাংশে বলা গিয়াছে। নারায়ণ দেবের জন্মস্থান এই মগধেরই অন্তর্গত নগর গ্রাম।

শ্রীহট্ট জিলার সব্বত্র বিশেষতঃ পশ্চিমার্দ্ধে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ পাওয়া যায়। এই পদ্মাপুরাণের ভনিতায় কবিবল্লভের ও দ্বীজ বংশীদাসের নামও পাওয়া যায়। কবিবল্লভ যে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন তাহা জানা গিয়াছে, আমাদের বোধ হয় দ্বিজ বংশীও শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, তাদৃশ অনুমান করিবার কারণও আছে।

নারায়ণ দেবের লিখার মধ্যে পাকে প্রকারে যেমন "শ্রীহট্ট নামের উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে, ইহাদের লিখিত অংশেও তদ্রূপ পাকে প্রকারে শ্রীহট্টের (গৌড় জয়ন্তীয়া) জয় কৈলাস (জয়কলঙ্ক) প্রভৃতি স্থানের এবং রত্না প্রভৃতি নদীর নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৭৭] শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু কেতকা দাস ও গেমানন্দের গ্রন্থে বর্দ্ধমান অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম সন্নিবেশ দৃষ্টে "কবিদ্বয়কে বর্দ্ধমান বাসী বলিয়া" যেমন বোধ করিয়াছেন, সেইরূপ ইহাদের গ্রন্থে শ্রীহট্টের নামাদি লিখিত থাকায়, ইঁহাদিগকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়াই বোঝা যায়।[৭৮]

নারায়ণ দেবের ভণিতায় সুকবি বল্লভের উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ বলেন যে নারায়ণ

---

৭৬. "ত্রিপুরা কৌকিকাচৈব জয়ন্তী মণি চন্দ্রিকা।
কাছাড়ী মাগধী দেবী অস্যামী সপ্তপর্ব্বতা:॥"
কামাক্তা তন্মোক্ত এই শ্লোকের উল্লেখিত সপ্তপর্ব্বতের মধ্যে একটি পর্ব্বতের নাম মাগধী। শ্রীহট্টের জনৈক প্রাচীন কবি-বিরচিত "বাবস্বর" নামক একখানা পাঁচালী গ্রন্থে—
"শ্রীহট্ট—নগরে বাস মগধ নৃপতি।
চিরকাল করি তার রাজ্যেতে বসতি॥"
ইত্যাদি বিবরণ পাঠ্যে উক্ত মগধ শ্রীহট্ট বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশিত হইয়াছে, ইহার রাজধানীর নাম নগর ছিল, ইহাও বুঝা যায়। "নগর" জলসুখা প্রভৃতি অঞ্চল লইয়াই ছিল, সন্দেহ নাই। ষ্টুয়ার্ড সাহেবের বাঙালাব ইতিহাসেও লিখিত আছে যে জলসুখার সন্নিকটবর্ত্তি আজমীরগঞ্জ এক সময় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। শ্রীহট্টের এই মগধের উল্লেখ পৃথিবীর ইতিহাস ৪র্থ ভাগ ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৩য় খঃ ৩য় অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।
"উবা নালে কাপড় পিন্ধে কেশ মুক্ত করি।
মাথা হৈতে পদ্মাবতী বিষ লয় ঝাড়ি॥"
"লাম লাম ওরে বিষ ত্রিবেণীর দ্বারে।
তেজিয়া শ্রীহট্ট ঘর নাম বঙ্ক নালে।"
"সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার প্রবন্ধে কহি এক লাচাড়ী॥"
(২) "ত্রিপুরা, জৈন্তা, জয়কলঙ্ক, ভ্রমিয়াছি নালারঙ্গ, গৌড়মণ্ডল আদি করি।"
"দ্বীজ বংশীদাসে ভণে, চান্দের কৌক মনে, শেষে কৈল কন্যার বিচার।"

৭৮. সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী ও দ্বারিক্য নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদিত বংশী দাসের পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বংশী দাস ময়মনসিংহ নিবাসী ছিলেন বলা হইয়াছে। আরও শুনা যায় যে কবির নাম্মীয় তালুক তথায় আছে। যদি বংশীদাসের জন্ম শ্রীহট্টে হয়, তবে নারায়ণ দেব ও কবিবল্লভের ন্যায় তিনিও স্থানত্যাগী হইয়াছিলেন বলিতে হইবে; জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল পাঠে জানা যায় যে প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও মানে ভয় হইয়া অনেক লোক ভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পরেও অনেক দিন চলিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ বংশী দাসের বর্ণনায় শ্রীহট্টের যে সকল নদীর নাম পাওয়া যায়,—যথা কালিয়ানী কোলনী), রত্না ইত্যাদি এবং "কালাঞ্জুরা" প্রভৃতি গ্রাম জলসুখার সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, তাঁহাকে ঐ স্থানের সন্নিকট বাসী বলিয়াই মনে হয়। তৎলিখিত হল বাহক জাতীরও তদঞ্চলেই বাস অধিক।

দেবের উপাধি কবিবল্লভ ছিল; কিন্তু ইহা উপাধি না হইয়া কবিবল্লভ নামক অন্য এক সুজনের প্রসঙ্গ মনে করাই সঙ্গত।

"নারায়ণ দেবে কয়, সুকবিবল্লভ হয়,
নারীগণে দিতেছে জোকার।"

ইত্যাদি স্থলে 'সু'টি বিশেষণ এবং কবিবল্লভ নামরূপে গৃহীত হইতে পারে না কি? এইরূপ যুক্তনামাত্মক ভণিতা বঙ্গ সাহিত্যে নূতন নহে।[৭৯] এইরূপ উদাহরণাদি দৃষ্টেই অনেকেই বলেন যে কবিবল্লভ পৃথক কবির নামই বটে, ইহা নারায়ণ দেব ও কবিবল্লভের সম্বন্ধ সূচক কবিতা। নারায়ণ দেব কবিতা লিখিয়া স্বীয় বন্ধু ও কবি কবিবল্লভকে শুনাইতেন, শুনিয়া তিনি "হয়" (হাঁ) বলিয়া অনুমোদন করিতেন, কবিতায় তাহাই প্রকাশ করে। তাঁহাদের মতে ১৪শ বর্ষী বালক-কবির পক্ষে তাহাই উপযুক্ত এবং ইহাতেই তাঁহার আত্মতৃপ্তি সাধিত হইত। যাঁহারা বলেন, কবিবল্লভ নাম নহে—উপাধি, তাঁহারা প্রমাণ প্রয়োগার্থে নারায়ণ দেবের উক্তি বলিয়া দুইটি চরণ প্রদর্শন করেন,[৮০] কিন্তু মুদ্রিত পদ্মাপুরাণ ও নব লিখিত দুই একখানা পুথি ব্যতীত প্রাচীন পুথিতে উহা প্রাপ্ত না হওয়াতে অনেকেই উহার উপর বিশ্বাস করেন না।

পদ্মাপুরাণের উক্ত ভণিতার প্রসঙ্গে এরূপ মতও শুনা গিয়াছে যে, নারায়ণ দেবের উক্ত বন্ধুর প্রকৃত নাম বল্লভ ছিল, সুকবি তাঁহার বিশেষণ। বিশ্ব নামের সহিত "কবি" শব্দের প্রয়োগ বঙ্গসাহিত্যে বিরল নহে।[৮১] বিজয় পাণ্ডব নামক গ্রন্থপ্রণেতা এক বল্লভদাসের ভাষা এ অঞ্চলের ভাষা হইতে বিভিন্ন নহে।

যদি ইহা সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, বল্লভই সচরাচর "কবিবল্লভ" নামে কথিত হইয়া থাকিবেন; কিন্তু আমরা যখন বাণীবল্লভের সহোদর রূপে কবিবল্লভকে প্রাপ্ত[৮২] হইয়াছি, তখন "কবিবল্লভ"ই যে নাম, তাহা মনে হয়। শ্রীহট্টে বহুতর প্রশিদ্ধ কবিবল্লভের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৮৩] সুতরাং আলোচ্য কবিবল্লভ যে নাম নহে, তাঁহা কিরূপে বলিব? "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" নামক চরিতাভিধানেও কবিবল্লভকে এক ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া লিখা হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থের

---

৭৯. (১) "রায় বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত, নন্দিত গোবিন্দ দাস।"—পদকল্পতরু।
(২) "নব নারায়ণ ভূপতি ভান। বিজয় নারায়ণ ইহা রস জান॥"—ঐ।
(৩) "কহে হরিদাস, কি বলিব আর কিসে হৈল হেন গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরিতে, সতত সে রসে ভোরা॥—ঐ

৮০. দুই একখানি মুদ্রিত পদ্মাপুরাণে নাকি—
"কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি গুণযুত॥"
ইত্যাদি আত্মশ্লাঘাকর আত্মপরিচয় ও উপাধির উল্লেখ আছে। নারায়ণ দেব বিজ্ঞ ও বিদ্যাবিশারদ হইলেও সেই দীনতা প্রকাশের যুগে তিনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন মনে করিতে ইচ্ছা হয় না (শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু দ্বিশতাধিক বর্ষের হস্ত লিখিত প্রাচীন এক পুথি পাইয়াছেন, তাহাতে ইহা নাই এবং কাহার নামাদি নাই। প্রাচীন পুথি গুলিতে নারায়ন দেবের আত্ম-শ্লাঘার স্থলে বরং "মিশ্র পণ্ডত নহে ভট্টাবিশারদ" বলিয়া আত্মত্রুটির উল্লেখ আছে। নারায়ণ দেবের ন্যায় ব্যক্তি একই গ্রন্থে এইরূপ পরস্পর বিসংবাদী কথা লিখিয়াছিলেন—"নারায়ন দেব পদ্মাপুরান রচনা করিয়া কবিবল্লভ উপাধি লাভ করেন।" গ্রন্থ রচনা করিয়া উপাধি পাইয়া থাকিলে সেই গ্রন্থ মধ্যেই পরে প্রাপ্ত উপাধি কিরূপে প্রবেশ বিশেষত্বঃ এই গ্রন্থ দেবাদিষ্ট কথা প্রামাণ্য নহে বলিয়াই বোধ হয়।

৮১. (১) "কহে কবিশেখর কি কহব কান।"—পদকল্পতরু ৬৬৩। ৩। ১৪ পল্লব।
(২) "অভিনব সৎকাবি, দাসজগন্নাথ." ইত্যাদি পদকল্পতরু ৭২৭। ৩। ২৫ পল্লব।

৮২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাঃ ২য় খঃ ২য় অঃ দ্রষ্টব্য।

৮৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে ২য়ঃ ভাঃ ২য় খঃ ৪র্থ অধ্যায়ে এক প্রসিদ্ধ কবিবল্লভের উল্লেখ আছে।

৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"কবিবল্লভ ও বংশীদাস দ্বিজ নামক দুই জন কবি নারায়ণ দেবের রচিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থ মধ্যে এত বহুল পরিমাণে নিজ নিজ রচনা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, প্রায় উহা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে পরিগণিত হইয়াছে।"

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে কবিবল্লভ ও বংশীদাস উভয় নামাত্মক ভণিতার মধ্যে বংশীদাসকে যেমন এক ভিন্ন কবি বলা হয়, কবিবল্লভের সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা সমীচীন দেখা যায় না। ইঁহাদের পরস্পরের জীবিত কালও প্রায় একই বলিয়া জানা যায়,[৮৪] সুতরাং ইঁহারা পরস্পর বন্ধুতায় আবদ্ধ থাকার জনশ্রুতি প্রকৃত বিবেচনা করিবার কারণ আছে এবং তাঁহারা যে একদেশী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"সৌরভ" পত্রে সুহৃদ্বয় শ্রীযুক্ত বিরজা কান্ত ঘোষ মহাশয় নারায়ণ দেবও পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে গবেষণামূলক একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমার মত সমর্থিত হইয়াছে।[৮৫]

নিধিপতি

প্রাচীন ইটা রাজ্যের অধিস্বামী, বাৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নিধিপতির বিস্তৃত কাহিনী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে পুনরুক্ত হইল না।

নিমাই পণ্ডিত (নিত্যানন্দ)

ইতিপূর্ব্বে আমরা গঙ্গারাম ওরফে বঞ্চিত ঘোষের বিবরণ বর্ণন করিয়াছি, ঘোষ বঞ্চিতের ৬ষ্ঠ পুরুষে ১৭০০ শকাব্দে নিমাই পণ্ডিতের জন্ম হয়, ইঁহার পিতার নাম আনন্দিচাঁদ ঘোষ। আনন্দিচাঁদের পুত্র নিত্যানন্দ, নিমাই পণ্ডিত এই উপনামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

---

৮৪. ইতিপূর্ব্বে বংশীদাস নামীয় একটি তালুক থাকা উল্লেখিত হইয়াছে। বংশীদাস স্বীয় পদ্মাপুরাণে যে তারিখ লিখিয়াছেন তাহা এই—

"জরধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার (১৪২৭)
শ্রকে লচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥"

সুতরাং ৩৩৭ বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ই তালুকাদির নাম হয়। ইহাতে কেহ কেহ বংশীকে এই সময়কার লোক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ময়মনসিংহের হাজারদি পরগণান্তর্গত পাতুয়ারী গ্রামে বংশীয় নামে যে তালুক আছে, উহা পরবর্ত্তিকালে, ময়মনসিংহগামী কোন উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক তাঁহার নামে হইয়া থাকিবে। বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পুরুষের নামে পরবর্ত্তী ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ তালুকের নাম নির্দ্দেশ করার বহু উদাহরণ আছে, পাঠক তাহা বহু স্থানে পাইয়াছেন; এস্থলেও তদ্রূপই হইয়াছে।

বংশীদাসের উল্লেখিত সময়ের সহিত কবিবল্লভের ভ্রাতৃবংশের (ভট্টশ্রীর ভট্টাচার্য্য বংশ) পুরুষ সংখ্যায় তুলনা করিলে উভয়ের সময়ের মধ্যে বড় অনৈক্য লক্ষিত হইবে না।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একখানা নারায়ণী পদ্মাপুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ও তৎদৃষ্টে নব্য ভারতে একটা প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম উহাতেও কবিবল্লভের ও বংশীদাসের নাম ছিল মনে হয়! ঐ পুঁথিতে কোন তারিখ ছিল না, পুঁথির অবস্থা দৃষ্টে অনুমানতঃ তিনশত বৎসরের প্রাচীন মনে করিয়া লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তত প্রাচীন না হইতে পারে।

৮৫. কামরূপ অঞ্চলে এক নারায়ণ দেবের অসমীয় পুঁথি দৃষ্ট হয়, তাহা পদ্মাপুরাণেরই প্রায় অবিকল অনুবাদ। ঐ অঞ্চলে প্রবাদ যে নারায়ণ দেব দরঙ্গ রাজগণের সভাসদ ছিলেন। তাহা হইলে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক হন। আমাদের নারায়ণ দেব ও কামরূপের নারায়ণ দেবে স্পষ্টতঃ অভিন্নত্ব দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ নারায়ণ দেব রোব গ্রামে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এক সময়ে আসাম অঞ্চলে গিয়া রাজসভায় সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন।

সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত নিত্যানন্দ- লেখাপড়ার চেষ্টা করেন নাই। গ্রাম্য বালকদল সহ কেবল খেলিয়া বেড়াইতেন। পিতা মাতা ও প্রতিবেশী বর্গের তিরস্কারে অতঃপর নিকটবর্ত্তী একটি টোলে প্রবিষ্ট হন, তখন দেখা গেল যে ইঁহার স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর, একবার পুঁথি দেখিলেই অভ্যাস হইয়া যায়। বুদ্ধিও চমৎকার, পাঠের সদর্থ আপনিই করিয়া লইতে সমর্থ। পুত্রের এই প্রশংসাবাদ শুনিয়া পিতামাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও পুত্রকে এক বার বাড়ী আসিতে সংবাদ দিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ কিন্তু নিত্যানন্দ না গিয়া লিখিলেন; পাঠ সমাধা করিয়া একসঙ্গেই আসিবেন।

অন্যে একমাসে যে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ। নিত্যানন্দ একদিনেই অক্লেশে তাহা শিখিয়া ফেলেন; কাজেই বৎসরেক মাত্র সময় মধ্যে তাঁহার পাঠ একরূপ সমাধা হইল; তিনি গুরু গৃহ হইতে স্বগৃহে আগমন করিলেন। সমগ্র গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম গুস্ক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি এক টোল স্থাপন করেন, অনেকেই সেই টোলে শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিল, সেই ছাত্রদের মধ্যে দুই এক জন খ্যাতিনামা পণ্ডিত এখনও আছেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, ফলিত জ্যেতিষ আলোচনা দ্বারা তিনি প্রশ্ন গণনায় ভবিষ্যৎ ফলাফল বলিয়া দিতে পারিতেন। এক বৎসর পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বারিপাত না হওয়াতে দেশের কৃষককুল বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইটার মনসুর নগরের জমিদার দেওয়ান গাফুর মিয়া, প্রশ্ন গণনায় নিত্যানন্দের সুখ্যাতি শ্রবণে, তাঁহাকে আহ্বান করতঃ বৃষ্টি ফলাফল গণনা করিতে বলেন। গণনা করিয়া তিনি স্বয়ংই সন্দিহান হইয়া নিরুত্তর রহিলেন, পরে দেওয়ানের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে উত্তর করিলেন—"দেওয়ান সাহেব! গণনায় অসম্ভব বিষয় দেখিতে পাইতেছি, বলিতে সঙ্কোচ হইতেছে। কথা শুনিয়া দেওয়ানের কৌতুহল হইল এবং অসঙ্কোচে গণনার ফল প্রকাশ করিতে বলিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন—গণনায় আজই বিষম বৃষ্টি হইবে, প্রবল বেগে ঝড় উঠিবে, বলিতে সঙ্কোচ হইতেছে।

দেখিতেছি সাহেবের গৃহের পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে। বারবার গণনাতেও একই ফল বাহির হইল।"

দেওয়ান হাসিয়া উঠিলেন; পণ্ডিতের উভয় কথাই সম্ভাবনার অতীত। কারণ তখন আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্রও ছিল না।

নিত্যানন্দ একরূপ অপ্রস্তুত ভাবেই নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু সেই রাত্রেই আশাতীত বৃষ্টি হইল, প্রবল ঝড় বহিল এবং তাহাতে বাস্তবিকই দেওয়ানের বাড়ীর একটি গৃহের চালা উড়াইয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্কর্ণীর জলে ফেলিয়া দিল।

দেওয়ান সাহেব এবং যাঁহারা ঐ গণনার সংবাদ রাখিতেন, তাঁহার নিত্যানন্দ ঘোষের গণনার সাফল্য দর্শনে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন। দেওয়ান পরদিন পুনঃ লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নেওয়াইলেন এবং একখানা শালবস্ত্র ও একটি স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে স্বীয় "দ্বারপণ্ডিত" নিযুক্ত করিলেন। ধার্য্য হইল যে, তিনি সপ্তাহে একদিন করিয়া দেওয়ান গৃহে উপস্থিত হইবেন। নিত্যানন্দ আজীবন দেওয়ানের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। যে দিন তিনি দেওয়ানের গৃহে যাইতেন, তাহার প্রত্যেক বারই তিন টাকা করিয়া বিদায় পাইতেন। শেষকালে তিনি মহাদেবী বড়কাপনের শ্যাম সুন্দর ভট্টাচার্য্যকে নিজ পদে রাখিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

নিত্যানন্দের একটি ষাঁড় ছিল, তিনি ষাঁড়টাকে বাঁধাইয়া লওয়াতে দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন, ইহাতে সমাগত পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র বিচার হয়; ইটার প্রসিদ্ধ

পণ্ডিত রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কিছু [illegible] হওয়াতে, মীমাংসার জন্য নবদ্বীপে লেখা হয়। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ নিত্যানন্দের মীমাংসারই পক্ষে মত দেন। ইহাতে দেশীয় পণ্ডিতবর্গ নিত্যানন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন চিত্তে সকলে তাঁহাকে "নিমাই পণ্ডিত" উপাধি প্রদান করেন। নিত্যানন্দ ঘোষ, নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের পার্ষদ বংশীয়, "নিমাই পণ্ডিত" উপাধিটি সেই সম্বন্ধ সূচক বোধ হয়।

প্যারীচরণ দাস

প্যারীচরণ দাস সাহু বংশে লাতুর মোনশী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্ব বর্ণিত মোনশী গোরীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম শ্যামচরণ দাস। প্যারীচরণ যে কবি প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, বালক-কাল হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যখন তিনি ৬/৭ বৎসরের বালক তখন বড়ই চঞ্চল ছিলেন, সেই সময় মৈনা গ্রামে তদীয় জ্যৈষ্ঠা সহোদরার গৃহে একদা গিয়াছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য বালকদল তথায় একত্রিত হইয়া একদা কোলাহল করাতে, তদীয় সহোদরার বর্ষীয়সী শাশুড়ী গোলমাল থামাইতে ইহাদিগকে ধমক দিলে, প্যারীচরণ সেই প্রবীণাকে নিম্নোক্ত কথা বলিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন, যথাঃ—

"ভেউ ভেউ করিও না, কথা কহিও কম।
নিশ্চয় জানিও বুড়ি আমি তোমার যম।"

অন্যান্য বালকেরাও তখনই ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া বৃদ্ধাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল।

ইহার বৎসর তিনেক পরে পুনঃ পুনঃ তিনি ভগিনী-গৃহে আগমন করেন। তখন তাঁহার চাঞ্চল্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। ঐ সময় বারুনীযোগে সেই গ্রামের অনেকেই, প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মাধবতীর্থে (জলপ্রপাত) গমন করেন, প্যারীচরণ প্রমুখ কয়েকটি বালকও তাঁহাদের অনুষঙ্গী হইয়াছিল; প্যারীচরণের সহচরেরা তদীয় রচনা শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, এবং মাধব উপস্থিত হইলে, একটি কবিতা বলিতে তাহারা অনুরোধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেনঃ—

"পর্ব্বত উপরে বসে মাধব সোণার;
রূপা গলাইয়া সেই ঢালে দুইধার।
অসুর শয়নে ছিল পুড়ি হৈল ছাই;
শিলারূপে হাড় তার দেখিতেই পাই॥

ইহাতে যদিও শব্দ বিন্যাসাদি নাই, তথাপি ইহা যে মাধব জল প্রপাতের একটি সরল ও প্রকৃত বর্ণনা, যাঁহারা মাধব গিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন।[৮৬]

প্যারী বাবু যখন পাঠ্যাবস্থায়, তখন জনৈক বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে "মিত্র বিলাপ" নামে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া একক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে তাহা প্রকাশ করেন (১৮৭০ খৃঃ); ইহাই তাহার প্রথম পুস্তক। এই সময় তিনি কলিকাতায় ছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীহট্ট মিশন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতায় শিক্ষার্থ গমন করেন, কিন্তু তথায় ইণ্ডিয়া আফিসের পররাষ্ট্র বিভাগে একটি কেরাণীগিরি কার্য্য পাওয়ায়, অধিক অধ্যয়নে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কেরাণীর কার্য্যে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্রুতগতি উন্নতিপথে ধাবিত হইতেন,

৮৬. "মাধব" আদম আইল না পাথারিয়া পাহাড়ের প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত, প্রায় দ্বিশত হস্ত উর্দ্ধ হইতে দুইটি জলধারা নিম্নে পতিত হইয়া, তাহা একবাটি পার্ব্বতা স্রোতা রূপে একদিকে চলিয়া যাইতেছে; ঐ স্রোতের বুকে অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড সমূহ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ১ম ভাঃ ৯ম অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই অফিসের উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু একটি আকস্মিক ঘটনায় তাঁহাকে কার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক দেশে আসিতে হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সিমলা হইতে কলিকাতার আফিস আসিলে, একদিন আফিস হইতে বাসায় আসিবার কালে দৈবাৎ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সারসের (William Circes) নামক এক সাহেবের সহিত তাঁহার কলহ উপস্থিত হয়; সাহেব তাঁহাকে "ঘুসি" মারিতে উদ্যত হইলে, প্যারীচরণের হাতের একখানা দাগতলা ছুরী (Eraser) উক্ত সাহেবের গলদেশে লাগিয়া একটা শিরা ছিন্ন হইয়া যায়, এবং ক্ষত হইতে রক্তপাত হইয়া সাহেবের মৃত্যু হয়। প্যারীচরণ অভিযুক্ত হইয়া স্পষ্টাক্ষরে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করেন; বিচারে তাঁহার তিন মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়।

তিন মাসের পর কারামুক্ত হইয়া দেশে আসিবার পূর্ব্বে আফিসের সেই ঊৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই সদাশয় সাহেব প্যারীচরণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে অনুরোধ করেন এবং পুনর্ব্বার কার্য্য দিতে প্রতিশ্রুত হন, তিনি অতঃপর সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

দেশে আসিয়া তিনি সংবাদ পত্রের অভাব অনুভব করেন ও শ্রীহট্ট হইতে "শ্রীহট্ট প্রকাশ" নামক সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচার করেন। প্রথমতঃ উহা কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনা হইত, কিন্তু অতি সত্বরই তিনি একটি মুদ্রা যন্ত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট প্রকাশ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচারিত হয়। এক সময় এদেশে শ্রীহট্ট প্রকাশের খুব নাম ডাক ও প্রচার ছিল। এমন কি, অশিক্ষিত সমাজে সংবাদ পত্র মাত্রকেই শ্রীহট্ট প্রকাশ নামে অভিহিত করতে শোনা গিয়াছে। প্রচার বাহুল্য এই সংবাদপত্রের নাম দেশে কিরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায়।

প্যারী বাবু শ্রীহট্ট প্রকাশ প্রকাশে বিব্রত থাকায় অবসর অল্পই পাইতেন তখন মফঃস্বল সংবাদদাতা মিলিত না; সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত; প্রায় সমস্ত লেখাই স্বয়ং লিখিতে হইত। তদ্ব্যতীত দেশীয় লোকদিগকে বেতন দিয়া রাখিয়া প্রেসের কাজ স্বয়ং শিখাইয়া কাজ লইতে হইত, একেবারেই সময় ছিল না। সুতরাং তিনি কোন বৃহত্তর কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে না পারিলেও তিনি যে উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা তদীয় যে কোন কবিতা পাঠেই বোধ হয়। শ্রীহট্ট প্রকাশে বেনামীভাবে অনেকটি কবিতা তিনি প্রকাশ করেন, তাহার সকলটিই এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে হাস্যাত্মক ও শ্লেষব্যঞ্জক কবিতাও ছিল।[৮৭]

"রণরঙ্গিণা" নামে প্যারীবাবুর কৃত ক্ষুদ্র এক পুস্তিকা আমরা দেখিয়াছি, উহা ফরাসী রমণীগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খা-জ্ঞাপক একটি কবিতা মাত্র। তাঁহার "পদ্যপুস্তক" ৩য় ভাগের কবিতা গুলি কেবল যে সরল কবিত্বের ভাণ্ডার তাহা নহে, ইহাতে তদীয় স্বদেশ বাৎসল্য, পরিজন প্রীতি এবং মাৰ্জ্জিত নীতিব বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানাও তাঁহার পাঠ্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তদীয় "ভারতেশ্বরী" কাব্য স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "এম্প্রেস" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে লিখিত হয়। তৎকৃত পদ্যপুস্তক প্রথম ভাগ (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬ খৃঃ) বহুকাল এতদঞ্চলের পাঠশালা সমূহের পাঠ্য

৮৭. তদ্রূপ একটি কবিতার আরম্ভ মনে আছে, তাহা এইঃ—

"শুন শ্রোতাগণ, সমাহিত চিতে, নব-রস-কথা মনের সুখে।
দিবে হরিদাস, বাউল বাবাজি, মাধুকরী মাখি সবার মুখে॥

আর একটি কবিতার আরম্ভ এইরূপ ছিলঃ—

"পদ্রম-বন মধু ভ্রমরের ঝি;
হংস পুচ্ছ-মুখে বসগো আসি।"

পুস্তক ছিল। বর্ণ শিক্ষাদানের উপদেশ (শিক্ষকদের) নামক শিশুদের উপযোগী এক পুস্তিকা মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। উহা প্রচারিত হয় নাই, গৃহদাহে সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

তিনি শেষাবস্থায় বহুমূত্র রোগে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই সময়ে শিলং সেক্রেটারিয়েটে তিনি একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু রোগের তাড়নায় শীঘ্রই কার্য্যত্যাগ করিয়া পুনঃ শ্রীহট্টে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন, সেই রোগেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

শ্রীহট্টের ঘাটুগান প্রথমে উপাদেয় ছিল, দুঃখের বিষয় পরে ইহা বিকৃত হইয়া পড়ে; শ্রীহট্ট শহরে এক সময় ঘাটুর নাচের অত্যন্ত প্রাবল্য ছিল, ঘাটুর ছোকরাদের তখন অত্যন্ত আদর ছিল, উহারা "রাজভোগে" আহার পাইত, রাজ কুমারের ন্যায় সুর্বেশ ধরিয়া থাকিত, ইহাদিগকে নর্ত্তকী বেশে আসরে আসিয়া নাচিতে ও রাধা কৃষ্ণ লীলাত্মক সঙ্গীত গাইতে হইত। প্যারীবাবুর চক্ষে ইহা বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত, এই জন্য তিনি উদ্যোগী হইয়া, ধর্ম্মপুর নিবাসী তদীয় বন্ধু কৃষ্ণচরণ দাসের সহায়তায়, এই কুপ্রথাকে শহর হইতে চির বিদায় দিয়াছিলেন। ইহাতে সামান্য বেগ পাইতে হয় নাই, বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শহরে সর্ব্বশেষ ঘাটু নাচ হওয়ার পরদিন ছোকরাটিকে একটি গর্দ্দভের উপর উলটা চড়াইয়া শহর হইতে বিদায় দেওয়া হয়; বলা বাহুল্য যে সেই কুপ্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশই এই অনুষ্ঠান করা হয়।

প্যারীচরণ দাস

এই প্যারীচরণ ব্রাহ্মণ ছিলেন; নিবাস শ্রীহট্টের পুটিজুরী। নামের পরে তিনি "দাস" খ্যাতি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার জীবন যে কিরূপ দৈন্যময় হইয়াছিল, ইহাতেই তাহা বুঝা যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে দাস উপাধিতে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়, তাঁহারা আপনাকে নিতান্ত হীন মনে করিতেন; প্যারীচরণের দাসোপাধি ধারণ সেই ভাব জাত।

প্যারীচরণের জীবন কাহিনী অল্পই জ্ঞাত হইয়াছি, তিনি অবিবাহিতাবস্থায় বৃন্দাবন গমন করেন এবং চির কৌমার্য্য ব্রত পালন করেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত তদীয় কোন কোন আত্মীয় তাঁহাকে তথা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বিবাহ দিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছিল। যাঁহার আকর্ষণে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সামান্য অস্থায়ী কল্পিত সুখের আশায় তিনি তাহা পরিত্যাগ প্রয়াসী হন নাই।

তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য অতুল্য ছিল, ভক্তি অসাধারণ ছিল। ভগবৎ মহিমা বর্ণন করিতে তাঁহার মুখে বড়ই মধুর শুনাইত। তিনি বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডতীরে বাস করিতেন। নির্জ্জন রাধাকুণ্ডতীর ভজনের পক্ষে অতি উপযোগী, সেই স্থানেই বিগত ১৩০৬ সালে তিনি দেহরক্ষা করেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র

প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ নিবাসী ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম কংসারি মিশ্র, ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যৈষ্ঠতাত পুত্র। প্রদ্যুম্ন মিশ্র একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; "শূদ্রাহ্নিকাচার" নামক গ্রন্থের রচিয়তা এই প্রদ্যুম্ন মিশ্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে আগমন করিয়া ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত ইঁহার সম্মিলন ঘটে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য-সুধা শ্রবণে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে, এবং তিনি সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বহুব্যক্তি নীলাচলে গিয়াছিলেন, চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছেঃ—

"সহস্র সহস্র লোক না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চাটি গ্রাম বাসী।
শ্রীহট্টীয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥"
প্রদ্যুম্ন মিশ্র এই যাত্রিদল সহ নীলাচলে উপস্থিত হন।

সচরাচর শ্রীমহাপ্রভুকে ভক্তবর্গ সাক্ষাৎ ভাবে কোন প্রশ্ন করিতেন না; এই সরল বিদেশী ব্যক্তি সেই নিয়ম রাখিয়া চলেন নাই। ভক্তবর্গ সম্ভবতঃ সম্ভ্রম বশতঃ জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচিত হইতেন; ইনি কতকটা আত্মীয় গৌরবেও হইতে পারে, নীলাচলে গিয়া শ্রীমহাপ্রভুর কাছে কৃষ্ণলীলা রহস্য শ্রবণ করিতে চাহেন। শ্রীমহাপ্রভুর স্বয়ং তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, নীলাচলের অন্যতম প্রধান পুরুষ রায়রামানন্দের নিকট প্রেরণ করেন।

বিদ্যানগরের রাজ রামানন্দ রায়কে নীলাচলের কে না জানিত; রামানন্দ নীলাচলের অধিপতি প্রতাপরুদ্র গজপতির প্রতিনিধি রূপে বিদ্যানগরের শাসনকর্তা ছিলেন; পক্ষান্তরে তিনি একজন প্রধান ভক্ত ও রসতত্ত্ববেত্তা ছিলেন; কিন্তু প্রদ্যুম্ন মিশ্র নতুন লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে তিনি রমানন্দের গৃহে গিয়া, তাঁহার কোন কোন ব্যবহারের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার হ্রস্বতা জন্মে এবং তিনি কৃষ্ণলীলা রহস্য-কথা না শুনিয়াই ফিরিয়া আসেন; তখন শ্রীমহাপ্রভু রামানন্দের আচার ব্যবহার ও মহিমার কথা তাঁহার কাছে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তদীয় ভ্রান্তি দূর করেন ও পূনর্ব্বার তাঁহাকে তৎসদনে প্রেরণ করেন। এবার প্রদ্যুম্নমিশ্র রমানন্দ রায়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া পরমসুখী হইয়া আসিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী দর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে প্রদ্যুম্নশ্রী "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" নামে একখানা গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন। এই গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উপেন্দ্রমিশ্র বংশোদ্ভব, গ্রন্থ সমাপ্তিতে শ্লাঘার সহিত একথাও লিখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ বিবরণ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে আর একজন প্রদ্যুম্ন মিশ্রের নাম পাওয়া যায়, তিনি এই সন্ন্যাসী প্রদ্যুম্ন হইতে ভিন্নব্যক্তি, তিনি গৃহস্থ ও নীলাচল বাসী ছিলেন। নীলাচলের রায়রামানন্দ তাঁহার সুপরিচিত ছিলেন।

প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য

বুরুঙ্গার গৌতম গৌত্রীয় প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্যের কথা তত্রত্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত বিবরণ হইতে গৃহীত। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, প্রসন্ন কুমার কলিকাতার রাজেন্দ্র নারায়ণ কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া দেশে আগমন করেন। দেশে আসিয়াই তিনি একটি কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তদঞ্চলে তখন তস্করের এত দৌরাত্ম্য ছিল যে, তজ্জন্য তত্রত্য অধিবাসীকে সর্ব্বদা অস্থির থাকিতে হইত; সিন্দুকের টাকা, ভাণ্ডারের ধন, গোশালার গরু, ঘাটের নৌকা, পুকুরের মাছ, কিছুই নিরাপদ ছিল না। প্রতি রাত্রেই চুরি হইত, প্রতিবাড়ীতে প্রতি রাত্রে চোরের গতিবিধি ছিল। এরূপ বিপদ হইতে গ্রামবাসিগণকে রক্ষা করিতে যাঁহারা সাহস করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাঁহারা ধন্যবাদভাজন এবং তাঁহাদের ঈদৃশ কার্য্য অনুকরণীয়।

যাহারা চোর বা দুষ্ট দমনে সচেষ্ট হন, তাহাদের যথেষ্ট অর্থবল বা জনবল থাকা আবশ্যক, কিন্তু প্রসন্ন কুমার ধনী বা বড় সহায় সম্বল সম্পন্ন ছিলেন না কিন্তু মানসিক বল তাঁহার যথেষ্ট ছিল, তাই একাই তিনি এই বিপজ্জনক কার্য্যে সাহসের সহিত অগ্রসর হইলেন। কার্য্যটি সাধারণের হিতজনক হইলেও তিনি কাহারও সহানুভূতি সম্যক প্রাপ্ত হইলেন না। চোরদের ভয়ে প্রকাশ্যে কেহই তাঁহার সহিত যোগ দিতে চাহিল না, আত্মীয় স্বজন বরং ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ ও নিরস্ত করিতে ক্রটি করিলেন না; ইহাতে প্রাণহানির সম্ভাবনা বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলেন।

প্রসন্নকুমার সকলই শুনিলেন কিন্তু গ্রামবাসিগণের রাত্রিকালের অশান্তি ও আতঙ্কের কথা মনে করিয়া, তিনি স্থির রহিতে পারিলেন না, তিনি তস্কর-দলনে বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহার অতুল উৎসাহ দর্শনে আরও কয়েকটি লোক যোগ দিল এবং ক্রমেই দলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন চোরদের একটি তালিকা প্রস্তুত হইল ও প্রমাণ সংগৃহীত হইল। তাহার পর তিনি এই সংবাদ গবর্ণমেন্টের গোচর করিলেন, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসন্নকুমারের উদ্যোগে এক প্রকাণ্ড সভায় সন্নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি হইতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইল। কিন্তু সকলই নিস্তব্ধ, চোরদের বিরুদ্ধে প্রথমে কেহই সাক্ষ্য দিতে সাহস করিল না; সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রসন্ন কুমার অগ্রসর হইলেন, সভামধ্যে দাঁড়াইয়া সাহেবকে সর্ব্বাগ্রে বদমাশদিগকে দেখাইয়া দিলেন ও তাহাদের দুষ্কীর্ত্তি, পল্লীর দুরবস্থা অধিবাসিবর্গের ত্রাসের কথা নিপুণতার সহিত বুঝাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু প্রমাণের উল্লেখও করিলেন। তাঁহার এই সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইল এবং সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল; তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ মতে পুলিশ তৎক্ষণাৎ চোরদিগকে বন্ধন করিয়া ফেলিল; বলা বাহুল্য যে চোরদের উপযুক্ত শাস্তি হইল; এই একটি নিঃসহায় যুবকের চেষ্টায় দেশে দীর্ঘকালের জন্য শান্তি বিরাজিত হইল।

সকল দেশেই স্থানে স্থানে চোরের উপদ্রব আছে, কিন্তু দুষ্ট দমনে প্রসন্ন কুমারের ন্যায় সৎসাহস প্রদর্শন অল্প লোকেই করিয়া থাকে, প্রসন্নকুমারের উদাহরণ এসব স্থলে সর্ব্বদা অনুকরণীয়।

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলায় যাঁহারা ব্যয়বহুল শাস্ত্র বিহিত বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদনপূর্ব্বক পুণ্যের সহিত দেশ বিদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইজন প্রধান। এক তরফ জয়পুরের অভয়াচরণ ন্যায়রত্ন যাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও নৌকাপূজার কথা আজিও লোকমুখে প্রচারিত হইতেছে; দ্বিতীয় বাণিয়াচঙ্গের প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। দরিদ্রাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া লোকে চেষ্টা ও চরিত্রবলে লক্ষপতি হইতে পারে, ইনি তাহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জলসুখার জমিদারদের মোহরেরি করিয়া অবস্থার উন্নতি বিধানে প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থান "মোহরের পাড়া" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। তিনি নৌকাপূজা এবং মহাভারত পাঠ উপলক্ষে বহু ব্যয় করিয়া ছিলেন এবং কাশীধামে তুলাপুরুষ দান করিয়া সেই স্থানেও স্মরণীয় হইয়াছেন। সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও মৃত্যুকালে তিনি পুত্রদ্বয়কে প্রভূত বিত্ত প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও পিতৃপদবী অনুসরণ করিতেছেন এবং অল্পকাল হইল, সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে "মহারত্ন" উপাধি লাভ করিয়া ধন্য

বল্লভ মিশ্র

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুই বিবাহ, তাঁহার ১মা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভ মিশ্র নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর পিতা, মাতামহ, মাতৃস্বসৃপতি প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন; তাঁহার শ্বশুর বল্লভাচার্য্যেরও পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্টেই ছিল।

"স্বরূপ চরিত" নামক ময়মনসিংহের এক ঐতিহাসিক (কুলগ্রন্থ) পুঁথি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে শ্রীহট্টবাসী মাণিক্য মিশ্র নামক জনৈক বৈদিক বিপ্রের বল্লভ নামে এক পুত্র হয়, এই বল্লভ অত্যন্ত সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন, নবদ্বীপে তিনি অল্পকালমাত্র অধ্যয়ন করিয়া তীক্ষ্ণ প্রতিভা বলে কৃতিত্ব প্রকাশকপূর্ব্বক অধ্যাপক হইতে "আচার্য্য" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যয়ন কালে নবদ্বীপের অনেকের সহিত তিনি ভালবাসা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, উপাধি লাভের পর দেশে আসিয়া তিনি অধিক দিন অবস্থিতি করিতে পারেন নাই, সপরিবারে নবদ্বীপে চলিয়া যাইতে সঙ্কল্প করেন এবং তদভিপ্রায়ে আগে একাকী নবদ্বীপে গিয়া একটি বাটিকা প্রস্তুত করেন।

বর্ত্তমান ময়মনসিংহের ভিটাদিয়া একটি প্রাচীন গ্রাম, ভিটাদিয়াবাসী লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর পিতা ও বল্লভের পিতা, একে অন্যের সহপাঠী ছিলেন; এই সূত্রে লক্ষ্মীনাথ ও বল্লভের মধ্যেও পরিচয় ছিল। শ্রীহট্টবাসী ব্যক্তিবর্গ গঙ্গাস্নানে গমন কালে প্রায়শঃ লক্ষ্মীনাথের বাড়ীতেই আতিথ্য করিতেন, লক্ষ্মীনাথ ধনী লোক ছিলেন।[৮৮] ইহার আর একটি কারণ এই ছিল যে লক্ষ্মীনাথের পিতার টোল পূর্ব্বাঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, শ্রীহট্টের বহুছাত্র এই টোলে অধ্যয়ন করিত।[৮৯]

নবদ্বীপে গৃহাদি নির্ম্মাণের পর বল্লভ সঙ্কল্পানুসারে স্বীয় পরিবারবর্গকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্য দেশে আসেন, এবং পত্নী ও কন্যা প্রভৃতিকে লইয়া যান। যাওয়া কালে তিনি লক্ষ্মীনাথের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনাথের পিতা বন্ধু-পুত্রকে সস্ত্রীক প্রাপ্ত হইয়া একমাস কাল পরম যত্নে আপন গৃহে রাখিয়াছিলেন। বল্লভাচার্যের সহিত বনমালী ও কাশীনাথ নামে নবদ্বীপ প্রবাসী আরও দুইজন শ্রীহট্টীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বল্লভের দ্বিবর্ষীয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী কন্যাটি প্রকৃতই লক্ষ্মীরূপিনী ছিলেন, কেননা এই একমাস কাল মধ্যে লক্ষ্মীনাথের গৃহ ধনধান্যে পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছিল।[৯০] বল্লভাচার্য্য তথা হইতে স্ত্রীকন্যাদি সহ নবদ্বীপে গিয়া বাস করেন।

বল্লভাচার্য্যের এই কন্যাকেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় বার বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ পিতৃভূমি শ্রীহট্টে আগমন করেন। এই আগমন বৃত্তান্ত চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে আছে, কিন্তু তিনি যে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই; যাহা হউক আগমন কালে পথিমধ্যে লক্ষ্মীনাথের সহিত দৈবক্রমে তাঁহার দেখা হয়, লক্ষ্মীনাথ পরম পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আকার প্রকার ও ভাব স্বভাব দর্শনে তাঁহার বোধ হয় যে এই পরম সুন্দর যুবক মনুষ্য নহেন,—ইনি নরবেশী নারায়ণ;[৯১] কাজেই তিনি এই

৮৮. "কুলীন ধনবান্ লক্ষ্মীনাথ বিপ্রমহাশয়। পণ্ডিত সদাচারী জিতেন্দ্রিয় হয়।" স্বরূপ চরিতগ্রন্থ।

৮৯. "শতশত শ্রীহট্টিয়া পিতার কাছে পড়ে।
অন্নদান করি পিতা রাখয়ে সবারে॥" ঐ

৯০. "দ্বিবর্ষীয়া এক কন্যা আছিল সঙ্গিনী।
লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম তার লক্ষ্মী স্বরূপিনী॥
পরমাসুন্দরী কন্যা যার ঘরে রয়।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ তার ঘর হয়।—স্বরূপ চরিত

৯১. "লক্ষ্মীনাথ বলে প্রভু দেখি যে লক্ষণ। তাহাতেই বোধ হয় তুমি নারায়ণ॥"
—স্বরূপ চরিত।

পরমপণ্ডিত যুবককে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যান।[৯২] তাঁহার গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ চারিদিন অবস্থিতি করেন।[৯৩]

পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে শ্রীগৌরাঙ্গ কোন কোন সুপাত্রকে হরিনাম গ্রহণের উপদেশ দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই স্থানে ভক্ত লক্ষ্মীনাথকে পাইয়া তিনি সংকীর্ত্তন রসে দেশ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন; ইহাই বোধ হয়, তাঁহার প্রথম কীর্ত্তন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনাথ মহাপ্রভুকে নবদ্বীপ-প্রবাসী শ্রীহট্ট দেশীয় ব্যক্তিবর্গের কথা জিজ্ঞাসা করেন, কথাপ্রসঙ্গে বল্লভাচার্য্য-সুতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার কথাও উপস্থিত হয়। লক্ষ্মীরূপিনী সেই মেয়েটি কেমন আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে চিনেন কি না এবং তাহার কোথায় বিবাহ হইয়াছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন। লক্ষ্মীনাথের প্রশ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলেন যে ইঁহাদিগকে তিনি বিলক্ষণ রূপেই জানেন, লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁহারই পত্নী।[৯৪] এই উক্তি শ্রবণে লক্ষ্মীনাথ অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে জানা যায় যে তখন নবদ্বীপে শ্রীহট্টবাসীর পৃথক একটি সমাজ গঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যেই আদান প্রদানাদি চলিত।[৯৫]

চারিদিন লক্ষ্মীনাথের গৃহে অবস্থিতি বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু বাজিতপুরের পথে শ্রীহট্টের বুরুঙ্গা দেশে আসিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার শ্রীহট্টে প্রথমাগমন। সন্ন্যাসের পর তিনি শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্তও গিয়াছিলেন।[৯৬]

বাণীকিশোর (ঠাকুর বাণী)

ঠাকুরবাণী এক প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। বাণী হইতে তদ্বংশীয়গণ "গোস্বামী" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ঠাকুরবাণীর বংশবৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।[৯৭] ঠাকুরবাণীর শিষ্য সম্প্রদায় শ্রীহট্ট জেলার বহুস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ঠাকুরবাণীর জীবনের কয়েকটী আখ্যায়িকা মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়।

বাণীর পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র, নিবাস দিনারপুর। বাণীকিশোর যখন কিশোর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; বাণী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতাই যোগাড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বিবাহ দেন। মাতা বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিলেন বটে, কিন্তু উদাসচিত্ত পুত্র কোন প্রকারেই কাজ কর্ম্ম দেখিতেন না। কিঞ্চিৎ জমাজমি ছিল, মাতাই তাহার "বিলিবন্ধন" করিতেন। একবার এই ভূমির রাজস্ব বাকি পড়িয়াছিল, কর আদায়ের জন্য প্যাদা উপস্থিত হইলে বাণীকিশোর ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। নিকটে এক ঝাড় জঙ্গল ছিল, তাড়াতাড়ি কোথাও যাইতে না পারিয়া সেই বনের আড়ালে মাথাটি গুজিয়া রাখিলেন, বাকি দেহখানা বনের বাইরেই রহিল। বনের আড়ালে মাথা থাকায় তিনি অবশ্য প্যাদাকে দেখিতে পাইলেন না, এবং মনে করিলেন যে, তাঁহার মত অন্যেও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না! বাণীর চিত্ত যে শিশুর ন্যায় একবারে সরল ছিল, ইহাতেই বুঝা যায়। এরূপ সরল-চিত্ত পবিত্রাত্মা দেবানুগ্রহ লাভে কেন অসমর্থ হইবেন? যাহারা কোন কিছু গোপন করিতে গিয়া হাস্যাস্পদরূপে ধরা পড়ে,

---

৯২. "প্রভুকে সঙ্গে করি লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী। লইয়া গেলেন তিনি আপনার বাড়ী॥"—ঐ

৯৩. "সেই লক্ষ্মীনাথ ভক্ত পণ্ডিত প্রধান। দিনচারি তার ঘরে প্রভুর বিশ্রাম॥"—ঐ

৯৪. "প্রভুবলে লক্ষ্মীপ্রিয়াপত্নী, বল্লভমিশ্র শ্বশুর হয়।"—ঐ

৯৫. "বহু শ্রীহট্টিয়া বিপ্র নবদ্বীপে বৈসে। সম্বন্ধবন্ধ চলে তথা দেশে নাহি আইসো॥"—ঐ

৯৬. "এই উত্তরাংশের উপসংহারাধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিত" দ্রষ্টব্য।

৯৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাঃ, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ডের যথাক্রমে ৫ম ও ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

"বাণীঠাকুরের ভাগা" কথাটি তাহাদের প্রতি তুল্য-উদাহরণ স্বরূপ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।[৯৮]

এই ঘটনার পর ঠাকুরবাণী গৃহত্যাগ করিয়া নানাস্থান ভ্রমণ করেন। শ্রীহট্ট শহরে উপস্থিত হইলে তিনি পাগল বলিয়া বন্দিশালে নীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধন পুনঃ পুনঃ মুক্ত হইয়া পড়ায়, কারারক্ষক বিস্মিত হন,—তিনি ইহা নবাবকে জ্ঞাপন করেন। শ্রীহট্টের নবাব এই সংবাদ অবগত হইয়া বাণীকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে অনেক অর্থদান করেন। তিনি সেই অর্থ পথে পথে বিতরণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসেন। শহরের লোকেরা তাঁহার মহিমা জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে দিল না, তিনমাস কাল পরম যত্নে তথায় রাখিয়া দিল; এবং অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল।

শ্রীহট্ট হইতে ঠাকুরবাণী রূপনাথদর্শনে জয়ন্তীয়ায় উপস্থিত হন। জয়ন্তীয়াতে তিনি সাত দিন ছিলেন। তথায় এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, স্বয়ং মহাদেব তাঁহাকে বলিতেছে—"সাধো পাগল শঙ্কর সমীপে সত্বর উপস্থিত হও তিনিই, তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।" এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে বাণী তথা হইতে চলিলেন ও নানাস্থান ভ্রমণপূর্ব্বক নবিগঞ্জের বাজারে উপস্থিত হইলেন, এই স্থানে পাগলশঙ্কর নামক সাধু পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, বাণী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; পাগলশঙ্করও বাণীর ন্যায় মহাত্মার সঙ্গলাভে পরম সুখী হইলেন।

পাগলশঙ্কর সম্মিলন

পাগল শঙ্করের জন্মস্থান সতরশতী পরগণার বরাকপার গ্রাম, পাগলশঙ্কর পরম সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, শ্রীহট্ট জেলার নানাস্থানেই তাঁহার অনেক ভক্ত ছিল; বাণীকিশোর এক মাস কাল পাগল শঙ্করের কাছে অবস্থিতি করিলেন। এই একমাস উভয়ে কেবল হরিনাম প্রসঙ্গে যাপন করিয়াছিলেন। এই সময় আর একজন মহাপুরুষ তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত ও বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হন; ইনি তরফের সৈয়দ বংশীয় সাধক গদাহাসন সাহেব; ইহার নামে তত্রত্য একটি পরগণার নামকরণ হইয়াছিল, স্থানান্তরে বলা গিয়াছে।

কিছুদিন পরে ঠাকুরবাণী ও পাগলশঙ্কর গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ গমন করেন। নবিগঞ্জ হইতে যাত্রা করিয়া

> "পথে পথে নানা ভঙ্গি নর্ত্তন কীর্ত্তন।
> পঞ্চদশদিনে পাইলা দর্শন।"
>
> —চরিত্র চিন্তারত্ন।

তথা হইতে কণ্টকনগর, অম্বিকা প্রভৃতি দ্বাদশ পাঠ পরিভ্রমণপূর্বক নবদ্বীপে উপস্থিত হন; নবদ্বীপ হইতে শ্রীক্ষেত্র গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহাদের "বঙ্গাধিপতি যবনরাজের" সহিত সাক্ষাৎ হয়; তিনি সাধুদের দৈবশক্তির পরিচয় পাইয়া—

> "শ্রীহট্টাধিপের স্থানে এক পত্র দিয়া
> বাণীকে পাঠাইলা দেশে সম্মান করিয়া।"
>
> —চরিত্র চিন্তারত্ন।

দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয়ে একে অন্যের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন

৯৮. এই গল্পটি বাণীবংশজ আমাদের শ্রদ্ধাভাজন প্রেরক মহাশয় হইতে প্রাপ্ত নহে। সাধু মহাত্মা সরল, তাঁহারা সাংসারিক বিচারবুদ্ধির চালে চলেন না বটে, কিন্তু নানা কারণে এ গল্প কতদূর সত্য বলা যায় না; তবে "বাণী ঠাকুরের ভাগা" কথাটা সুপ্রচারিত।

করিলেন। ইহার পরে প্রসিদ্ধ বঞ্চিত ঘোষ অজ্ঞান ঠাকুর ও মালী ধর্ম্মদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

মালী ধর্ম্মদাস সম্মিলন

ধর্ম্মদাস একজন কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন, প্রথমাবস্থায় তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "হুসেনপর্ব্ব" রচনা করিয়া যশস্বী হন; শেষ বয়সে তিনি পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠেন, এবং সাধু মহাত্মারূপে দেশবাসীর ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। ধর্ম্মদাস জাতিতে মালী ছিলেন।

বাণীর জননী পুত্রকে বিবাহ দিয়াছিলেন; বাণী দেশে আসার পর সেই পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ইহার নাম অনন্ত; ইহার কথা পূর্ব্বে (বংশ বিবরণে) বলা গিয়াছে। বাণীর আর একজন পুত্র ছিলেন;—তিনি অনন্তের বৈমাত্রের ভ্রাতা।

একদা বাণীর এক শিষ্য কালীপূজার আয়োজন করেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, বাণীকে দিয়া পূজা করাইবেন। কিন্তু একথা পূর্ব্বে বাণীকে বলা হয় নাই। যেদিন পূজা হইবে সেদিনই ইহা মনে হইল এবং তাহার প্রাণ বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। সিদ্ধপুরুষ শিষ্যের আকুলতা নিজ প্রাণে অনুভব করিতে পারিলেন, তাঁহার মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল ও অনতিবিলম্বে তিনি শিষ্যালয়ে উপনীত হইলেন; যথা—

"দৈববলে জানিযা সেবকের মনোরথ।
চারিদণ্ডে গেলা এক দিবসের পথ॥
শিষ্যালয়ে উত্তরিয়া কল্যাণে তাহার।
কালীপূজা করিয়া দেখাইলা চমৎকার॥
নভূত নভবিষ্যতি—জীবের অসাধ্য।
প্রতিমাকে ভক্ষাইলা পূজার নৈবেদ্য॥"—চরিত্র চিন্তারত্ন।

সিদ্ধপুরুষ বাণীকিশোর কি শক্তিবলে একদিবসের পথ চারিদণ্ড সময়ের মধ্যে গিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ঠাকুর দুর্ল্লভের জীবনী প্রসঙ্গে যথার্থই বলা হইয়াছে "আমরা প্রকৃত মানুষ, তাহা কি রূপে বুঝিব?" আর শিশু প্রকৃতি সরল ভক্তের আব্দার রক্ষার্থ চিন্ময়ী শক্তি, জড় প্রতিমার বিকাশ প্রাপ্ত হয় কি না, এবং সেই প্রতিমা নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে পারে কি না, তাহাও আমরা সংসারের মায়ামোহিত মানুষ কিরূপে বুঝিব? কিন্তু এই রূপ অদ্ভুতকথা বিশ্বাসী লেখকগণের গ্রন্থপত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তমানা প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থেও এরূপ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দয়া বশতঃ দ্বিতীয়বার বিবাহ

শিষ্যালয় হইতে বাণী অপর এক ব্রাহ্মণ গৃহে উপনীত হইলেন। এই ব্যক্তির এক কুব্জাকন্যা ছিল, কুব্জা বলিয়া তাঁহাকে কেহই বিবাহ করেন নাই। কন্যাটি বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছিল, পিতা তনয়ার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত ছিলেন, তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া বাণী এই কন্যাকে বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিলেন। শিষ্য এতৎবাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদ সহকারে গুরুকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই কন্যার গর্ভে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

রাজেন্দ্র যখন উপযুক্ত হইয়াছেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ একদিন পাগল শঙ্কর বাণীগৃহে উপস্থিত হইলেন। দুইজনে বহু কথাবার্ত্তা হইল; পাগল শঙ্কর বিদায় লইয়া পুনঃ তীর্থ যাত্রা করিলেন; বহুতীর্থ দর্শনান্তর কুরুক্ষেত্রে গেলে তাঁহার দেহপাত হইল। সিদ্ধপুরুষ বাণীর নির্ম্মল

হৃদয়-দর্পণে ঐ ঘটনার ছায়াপাত হইল। ইহা তাঁহার জ্ঞানগোচর হইলে, আর গৃহে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা রহিল না, তিনি নিজ পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিলেন ও এক মহামহোৎসবের আয়োজন করিতে বলিলেন।

পিতৃবাক্য শ্রবণে পুত্রেরা অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আমি সময়ে সময়ে তোমাদিগকে দেখা দিব, তোমরা হরিপদে মনস্থির রাখিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর।"

অদৃশ্য হওয়ার কথা

বাণীর অভিপ্রায়মত মহা মহোৎসবের আয়োজন হইল; অবিরত কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, যখন কীর্ত্তনে সকলে মত্ত, তখন হঠাৎ ঠাকুরবাণী অদৃশ্য হইলেন, তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না। পুত্রগণ পিতার মৃত্যু কল্পনা করিয়া শোকাভিভূত হইলেন।

সেই রাত্রে রাজেন্দ্র স্বপ্নে দেখিলেন, যেন পিতা বলিতেছেন, "রাজেন্দ্র! ভ্রান্তধারণা ছাড়, আমি মরি নাই, আমার শ্রাদ্ধ করিও না। তবে লোকনিন্দা পরিহারের জন্য কিছু করা কর্ত্তব্য; আমার উদ্দেশে কিছু চিড়া, গুড়, কদলী, দধি ও দুগ্ধ দিও। এসব দ্রব্য গোপালের কাছে ভোগ দিয়া প্রসাদস্বরূপ আমাকে প্রদান করিও; ইহাই যথেষ্ট।" পুত্রগণ পিতার শ্রাদ্ধ না করিয়া, পিতার উদ্দেশ্যে গোপালের প্রসাদ মাত্র নিবেদন করিয়া দিলেন।

কালক্রমে রাজেন্দ্রের হরিরাম নামে একটী পুত্র জাত হয়, জন্মের ৬ষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে যখন আত্মীয় স্বজন সকলে সমবেত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে এক যোগীপুরুষ ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। যোগী আর কেহ নহেন—ঠাকুর বাণী। পুত্রেরা এবং অন্যান্য সকলে বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দে বসিতে আসন দিলেন; কিন্তু তিনি না বসিয়া সূতিকালয়ে গেলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে বধূ কর্ত্তৃক শিশু তৎসমীপে আনীত হইলে, তিনি শিশুর মাথায় দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন; কোথায় গেলেন, আর কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

এই হরিরামের পৌত্র, ঠাকুরবাণীর বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়গোবিন্দের মনে হইয়াছিল যে ঠাকুরবাণীর শ্রাদ্ধাদি হয় নাই; ইহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে এবং তদ্বংশীয়গণের প্রত্যবায় স্বরূপ। এই দীর্ঘকাল মধ্যে অবশ্যই ঠাকুরবাণীর মৃত্যু হইয়া থাকিবে, অতএব গয়াতে গিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, গয়াতে যাইবেন স্থির করিলেন। প্রকাশ্যে গয়ার কথা কাহাকেও না বলিয়া তীর্থে যাইবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এতৎ শ্রবণে তিনজন শিষ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার মানসে পুড়াউন্ধা নামক পাহাড়তলির পথে আসিতে আসিতে পথ ভ্রমে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইলেন; এমন সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, জটা বস্কলধারী এক ঋষি বন হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেছেন, পথিকত্রয় বিস্মিত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া স্তম্ভিতপ্রায় হইলেন; তাঁহাদের গতিশক্তি যেন রহিত হইয়া আসিল, তাঁহারা ঋষির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাপসের হাতে বিল্বফল (মতান্তরে দাড়িম্বফল); তিনি পথিকদের নিকটে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন "পথভ্রষ্ট পথিক, তোমাদের মঙ্গল হউক!" তারপরে দূরে একটি পথের রেখা দেখাইয়া বলিলেন—"এই পথে তোমরা দিনারপুরে যাইতে পারিবে।" হাতের ফলটি একজনকে দিয়া বলিলেন "এই ফলটি জয়গোবিন্দকে দিও; বলিও বাণী মরে নাই, গয়াতে তাহার পিণ্ড দেওয়া নিষ্প্রয়োজন"! এই বলিয়া মহাপুরুষ পুনঃ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

তাপস চলিয়া গেলে পথিকত্রয় তৎপ্রদর্শিত পথে প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থানকরতঃ অল্পদূরে গিয়াই পরিচিত পন্থা প্রাপ্ত হইয়া দিনারপুরে পৌঁছিলেন। তাঁহারা আপনাদের গুরু জয়গোবিন্দকে ঋষিদত্ত ফল প্রদানান্তর তৎকথিত কথাগুলি অবিকল বলিলেন। শুনিয়া জয়গোবিন্দ গয়া গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। এই জটাবল্কলধারী ঋষি যে ঠাকুর বাণী ব্যতীত আর কেহ নহেন, তাহা সকলেই বুঝিল। জয়গোবিন্দ আপন মনে গয়া-গমনের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ই তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইল। সকলেই বুঝিল যে তপঃ প্রভাবে বাণী এখনও জীবিত রহিয়াছেন। ইহাও বুঝিল যে, সিদ্ধ মহাপুরুষদের কিছুই অগোচর থাকিবার নহে। স্ববংশীয়বর্গকে আশ্বস্ত করাই এই আত্মপ্রকাশের হেতু—গয়ার পিণ্ডদান নিবারণের কথা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

ঠাকুরবাণীর রোপিত একটি তেঁতুলবৃক্ষ দিনারপুরে আছে, বৃক্ষটি অতি প্রকাণ্ড ও "সিদ্ধ তেঁতুল" নামে খ্যাত। বৃক্ষের তলা ইষ্টকে বাঁধান। ঠাকুর বাণীর উদ্দেশ্যে এই বৃক্ষের নীচে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। একদা ঠাকুরবাণী "তেঁতুলের টক" খাইয়া তাহার একটি বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই বৃক্ষ জন্মিয়াছিল।

বালক কবি প্রশান্তকুমার

চাপঘাট নিবাসী একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস বি,এ মহাশয়ের ছেলে প্রশান্তকুমার দাস সবেমাত্র বার বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া [গত ১৩২১ বাং জ্যৈষ্ঠমাসে] মাতামহালয় বাণিয়াচঙ্গে জীবনত্যাগ করিয়াছে। অল্পবয়সেই বালকের অসাধারণ প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইতিমধ্যেই কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কোনও কবিতা জীবর্দ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু কবিতার খাতাখানিতে যে গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় এই কবিকোরক অকালে কালকীট দৃষ্ট না হইলে ইহার যশঃ সৌরভে মাতৃভূমি আমোদিত হইত।

বিপিন বিহারী দাস

করিমগঞ্জ সবডিভিশনের অন্তর্গত মর্য্যাতকান্দি গ্রামে মাণিক্যরাম দাস নামে এক সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন; লাতু নিবাসী মোন্‌শী গৌরীচরণ, ইঁহার সহিত আপন দুহিতা সুভদ্রার বিবাহ দেন; এই সুভদ্রাই বিপিন বিহারীর গর্ভধারিণী। বিপিনবিহারী পিতৃতেজস্বীতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিপিনবিহারীর পিতার অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া পুত্রের শিক্ষার জন্য তিনি ব্যয় দিতে পারেন নাই, এদিকে বিপিনের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু কলিকাতায় থাকার ব্যয় সঙ্কুলানের কোন উপায়ই হইল না, তখন তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য আসামে গমন করেন ও তাহাতে কোনরূপ পাঠের ব্যয়মাত্র সঙ্কুলান পূর্ব্বক এফ, এ এবং বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি,এ পরীক্ষা দিয়া গৌহাটীতে নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন ও এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। দুই বৎসর পরে কঠিন রসায়ন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক থাকাকালে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "রসায়ণের উপক্রমণিকা" নামে এক সচিত্র গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক ১২৮৪ বাংলার শ্রাবণ মাসে উঁহা প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে তৎসঙ্কলিত বহু পারিভাষিক শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে রসায়ণশাস্ত্রের তাদৃশ

উপযোগী শব্দরাজি প্রকাশিত হয় নাই। এবং তাঁহার এই উপক্রমণিকার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় রসায়ণশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এতাদৃশ সুন্দর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় নাই।

বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার প্রিয় সামগ্রী ছিল এবং নিজেও কবিতা লিখিতে পারিতেন। স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাস মহাশয়ের পদ্য পুস্তক ১ম ভাগ প্রকাশিত হইলে, বিপিন বাবুই ইহার দ্বিতীয়ভাগ রচনা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করেন ও প্যারী বাবুকে তাহা জ্ঞাপন করেন। প্যারীবাবু সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করেন এবং নিজে ২য় ভাগ না লিখিয়াই ৩য় ভাগ প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে উহা পূর্ণ হইতে পারে নাই। ফলে পদ্যপুস্তকের ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই।

বিপিন বাবু এম, এ পরীক্ষার পরবৎসরেই বি,এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও কাছাড়া গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। দুই চারিমাস মধ্যে তথায় তাঁহার প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। কাছাড় অঞ্চলে ইংরেজ ও বাঙ্গালীর কাছে সমভাবে তাঁহার সম্মান ছিল।

ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াই তিনি বিবাহ করেন। এ বিবাহটি হিন্দুর পক্ষে একটা বিসদৃশ ব্যাপার। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—মহিলা সুবিখ্যাত রমাবাই সরস্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রিজেষ্টরী হইয়াছিল। বিবাহের পর বিপিন বাবু সমাজ বর্জ্জিত হন।

রমাবাই সরস্বতীর কথাঃ

এস্থলে প্রাসঙ্গিকভাবে রমাবাইয়ের ২/১টি কথা বলা অন্যায় হইবে না। বোম্বাই প্রদেশে মেঙ্গালর জেলায় অনন্ত শাস্ত্রীয় বাস ছিল, তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষ্মীবাই; ইনিই রমাবাইয়ের গর্ভধারিণী ছিলেন। রমাবাইয়ের প্রখর স্মৃতি শক্তির পরিচয় অতি বাল্যকালে প্রাপ্ত হইয়া, লক্ষ্মীবাই কন্যাকে স্বয়ং উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। রমার বয়স যখন নয় বৎসর তখন অনন্ত শাস্ত্রী পত্নী ও পুত্র কন্যা লইয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন ও ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় রমা পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়েন; তখন একমাত্র সহোদর শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ব্যতীত রমার আর আশ্রয় রহিল না।

তীর্থভ্রমণ কালে শিক্ষা বিষয়ে নারীজাতির হীনতা লক্ষ্য করিয়া রমা ব্যথিতা হইতেন, এক্ষণে পিতামাতার ন্যায় দেশে দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষা—বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে কলিকাতায় উপনীত হন, এই স্থানে বুধমণ্ডলী হইতে তিনি "সরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হন। রমাবাই তৎপর ঢাকাতে এবং তথা হইতে শ্রীহট্টে আগমন করেন। তিনি যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই পণ্ডিতবর্গকর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিতা হন। শ্রীহট্টে আগমনের পরে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীয় মৃত্যু হয় এবং তাহার পরেই বিপিন বাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের মাত্র উনিশ মাস পরে বিপিন বাবু বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন; দারুণ কৃতান্ত তাঁহার এই সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল।

পতির মৃত্যুর পর শিশুকন্যা মনোরমাকে লইয়া আশ্রয়-হীনা রমা পুনা নগরে গমন করেন। পুনা হইতে তিনি ইংলণ্ড ও তথা হইতে আমেরিকায় গমন করেন। ফিলাডেলফিয়াতে অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করেন, তথায় তিনি "The High caste Hindu woman" নামক ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ করেন (১৮৮৭ খৃঃ); Rachel H. Bodley M A, M d, ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

পতিহীনা বিধবা বিদ্যাবলে বিদেশে এইরূপ সহায় সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া পুনাতে প্রত্যাগমন

পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য "সারদাসন" নামে আশ্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নীরবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।[৯৯]

বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ

শ্রীহট্টের গুটাটিকর নিবাসী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বিরজানাথ গত পৌষমাসে (১৩২১ বাং) কামাখ্যাধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে গত ৩রা ফাল্গুনের সুরমা পত্রিকায় শ্রীহট্টের গৌরব কবিবর শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন "ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বয়স যদিও ৭০ বৎসর হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে দেখিলে সেরূপ বোধ হইত না, যোগানুষ্ঠানের ফলে তাঁহার শরীর অনেকটা দৃঢ় ছিল। তিনি বাহিরে বড় একটা যাইতেন না, বাড়ীতে থাকিয়াই তদ্‌গত চিত্তে সর্ব্বানন্দ ভৈরবের সেবা করিতেন।"

"ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের জীবনটা যেমন পবিত্র ছিল, তাহার পরিণামও তদনুরূপই হইয়াছে। তিনি শ্রীহট্টের মহালক্ষ্মী মহাপীঠের ভৈরব সর্ব্বানন্দের আবিষ্কর্ত্তা। সর্ব্বানন্দ শিবটিলা নামক স্থানে মৃত্তিকাস্তূপে আবৃত হইয়া দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিলেন, ব্রাহ্মনন্দ পুরী ঐস্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া যান, কিন্তু ন্যায়বাগীশ মহাশয়ই পুনঃ পুনঃ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সর্ব্বানন্দের আবিষ্কার করেন।"

"তাঁহার জীবন এবং বিদ্যা নিয়তই আড়ম্বর শূন্য ছিল। তিনি ব্রহ্মানন্দপুরী কৃত 'মোহচপট' অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ সঠিক সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (তদ্ব্যতীত তিনি সর্ব্বানন্দ প্রকাশ গ্রন্থ রচনা করিয়া সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।) তাঁহার বহু ছাত্র উপাধিধারী অধ্যাপকধারী আছেন, বিষয়ীর মধ্যেও অনেক তাঁহার শিক্ষাধীনে প্রতিভাবান্ হইয়াছেন।"

"ইদানীং তিনি সংসার সম্পর্ক একপ্রকার ত্যাগ করিয়া কেবল সর্ব্বানন্দের সেবাতেই কায়মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে সর্ব্বানন্দের বাড়ীতে একটি মেলা হইয়া আসিতেছে। তাঁহার যত্নে সর্ব্বানন্দের একটি মন্দির হইতেছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনুষ্ঠাতা চলিয়া গেলেন।"

"শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব সরস্বতী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ভালবাসা ছিল এবং তাহারই অনুরাগে তিনি শ্রীগৌরীতে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষদের উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথাকার কার্য্য শেষ হইলে পদ্মনাথ বাবুর সঙ্গেই তিনি কামাখ্যা দর্শনে যাইবেন, সেইদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে উমানন্দ ভৈরবকে দর্শন করিতে যান। তাঁহার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনি গল্প করিয়াছেন, উমানন্দ দর্শনে যাইয়া "অনুজ্ঞানং দেহিমে দেব কামাখ্যা দর্শনং প্রতি" এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে করিতে চক্ষের জলে প্লাবিত হইয়া ছিলেন। উমানন্দ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই তিনি কামাখ্যা দর্শনে চলিলেন সঙ্গে পদ্মনাথ বাবু। নীলাচলে আরোহন করিতে করিতে "কাশ্যাঃ ফলাধিকা পুরী" এই শ্লোকার্দ্ধ অনেকবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। নরকাসুর নির্ম্মিত সেই সুদীর্ঘ পথ প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, ১০/১২ গজ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে তিনি মাথা ঘুরিতেছে বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণ দেখিলেন, ক্ষণ কাল মধ্যে তিনি নির্ব্বাক নিষ্পন্দ, তাঁহার নাড়ীর গতি ক্ষীণ।"

"তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রামে সংবাদ প্রেরিত হইল। জনৈক সহচর সহ ভ্রাতুষ্পুত্র যথাকালে উপস্থিত হইলেন, যথোচিত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। পৌষী পূর্ণিমায় তিনি রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, নয় দিবসকাল পক্ষাঘাত

---

৯৯. পণ্ডিতা শ্রীযুক্তা রমাবাই সরস্বতীর জীবনকাহিনী সহোদরপ্রতীম শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রণীত "নারীরত্নমালা" পুস্তকে বিস্তারিত বিবর্ণিত হইয়াছে, তদবলম্বনে এস্থলে ২/৪টি কথা লিখিত হইল।

রোগে নির্ব্বাক নিস্পন্দ থাকিয়া ২৫শে পৌষ কৈলাসধামে যাত্রা করেন। তিনি কামাখ্যা মাতাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, জগন্মাতা তাঁহাকে তেমনই কৃপা করিয়াছেন। জগন্মাতা তাঁহার প্রিয় পুত্রকে একবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন, আর তাঁহাকে সংসারের নরক কোলাহলে ফিরিয়া যাইতে দিলেন না।"

ব্রহ্মানন্দ পুরী

ব্রহ্মানন্দ পুরীর জন্মস্থান শ্রীহট্ট নহে, কিন্তু শ্রীহট্টের সহিত তাঁহার যেরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জাত হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহাকে কোন প্রকারেই ভিন্নদেশী বলিয়া পরিগণিত ও তজ্জন্য তাঁহার কথা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে না। ব্রহ্মানন্দপুরী কৃত "মোহচপটম্" গ্রন্থ সঠিক ও সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত ঐ গ্রন্থের ভূমিকা হইতে তাঁহার জীবন কথা উদ্ধৃত হইল।

"পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ পুরীর জন্মস্থান উড়িষ্যাঅঞ্চল এবং এইরূপ প্রবাদ যে তিনি উড়িষ্যার রাজগুরু ছিলেন; যৌবনের প্রথমভাগেই স্ত্রী পুত্রাদি শমন-রাজ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে পাশ-মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় তিনি বৈরাগ্যের উন্মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন। পূর্ব্বের জীবন সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জানা যায় নাই। সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু বলেন না; সুতরাং শ্রীহট্টে কি অন্যান্য যে সকল স্থানে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ অবস্থান করিয়া গিয়াছিলেন, তত্তৎস্থলের অনেকেই তদীয় অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, শিষ্যবৎ ভক্তি-সহকারে সতত তাঁহার সমীপে অবস্থান করিলেও তাঁহার জনকের নাম, কোন্ গ্রামে বসতি ছিল, শিক্ষা দীক্ষা কোথায় কতদূর হইয়াছিল, ইত্যাদি জীবনীর আবশ্যক কথা কেহই জানিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল। ঐ সকল উড়িয়া অক্ষরে লিখিত দেখিয়া তিনি উড়িষ্যা দেশজ ছিলেন, ইহারই মাত্র স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

"শ্রীহট্টে তাঁহাকে আনুমানিক ১২৬৭ সালে সর্ব্বপ্রথম দেখা গিয়াছিল। শ্রীহট্ট শহর হইতে অনতি দূরবর্ত্তী গোটাটিকর নামক জনপদে তিনি বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার নাম 'পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী'। তান্ত্রিক বীরাচারী সাধকের রীতি অনুসারে তাঁহার সঙ্গে প্রাচীন বয়স্কা একজন ভৈরবীও ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ—তদানিন্তন পূর্ণানন্দ—সর্ব্বদা কারণ-বারি সমাশ্রয়ে নিত্যানন্দে বিভোর থাকিতেন। যে স্থানটি সম্প্রতি শ্রীহট্টের মহাপীঠ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে, তিনি সেই স্থানেই তখন সাধন ভজন করিতেন।"

"তাঁহার পাণ্ডিত্য একরূপ অতলস্পর্শী ছিল। এতৎ সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। এস্থলে একটিমাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎকালে শ্রীহট্ট অঞ্চলে রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয় একজন মহামহোপাধ্যায়—প্রতিম ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত পূর্ব্বাঞ্চলে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, একদা কোনও নিমন্ত্রণে এই সার্ব্বভৌম মহাশয় গোটাটিকরস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসিয়া এই মহাত্মাকে দেখিতে পান এবং মদ্যপ-ভৈরবী-সহচর গৈরিক ধারীকে একজন পূতাচারী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সচরাচর যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনিও ইহার প্রতি সেইরূপ কতকটা ঔদাস্যভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী ইহাতে মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সঙ্গে শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হন। রাম রাবণের যুদ্ধের ন্যায় বহুক্ষণ উভয়ের মধ্যে নানা শাস্ত্রের বিচার চলিতে লাগিল, ক্রমশঃ সার্ব্বভৌম মহাশয় নিস্তেজস্ক হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা ভদ্রলোক আসিয়া উভয়ের পাদপ্রান্তে পড়িয়া এই দ্বৈরথ-তর্কযুদ্ধের অবসান করাইয়া দেন। X X এই স্থান হইতে তিনি কামাখ্যা মহাপীঠে চলিয়া

যান। কামাখ্যায় অবস্থানকালে তদীয় সাধন-সহচারী-ভৈরবীর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। সেই স্থলে তিনিও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দপুরী এই সংজ্ঞা ধারণ করেন। অতঃপর প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীহট্টস্থ বাণিয়াচঙ্গ নগরে যে কালীবাড়ী আছে,[১০০] তাহাতে গিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতে তিনি প্রত্যাদেশ লাভ করেন।"

"গোহাটীতে তখন কাত্যায়ন বংশীয় স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস-প্রমুখ বাণিয়াচঙ্গ-নিবাসী অনেকে রাজকর্ম্মোপলক্ষে অবস্থান করিতেন; তাঁহাদের নিকট হইতে বাণিয়াচঙ্গের কালীবাড়ীর অবস্থা অবগত হইয়া এবং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রত্যাদেশের বংশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মানন্দ আনুমানিক ১২৭০ সালে বাণিয়াচঙ্গে আগমন করেন, এবং মানবলীলার অবশিষ্ট সময় এই স্থানেই অবস্থিত করেন। কিন্তু বাণিয়াচঙ্গ নিয়ত বসতির স্থান হইলেও তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্ট শহরে বিশেষতঃ তৎসন্নিকৃষ্ট গোটাটিকর অঞ্চলে পদার্পণ করিয়া তদীয় পূর্ব্বপরিচিত অনুরক্ত ব্রাহ্মণ ভদ্রদিগকে চরিতার্থ করিতেন।"

"বাণিয়াচঙ্গ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বহুল স্থান; এই স্থানে আসিয়া পরমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বীয় অগাধ ত্ত্বতার সবিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। সর্ব্বদা প্রাহ্নে অপরাহ্নে মহাত্মা চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া পণ্ডিত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু জনগণের ভিড় লাগিয়াই থাকিত।

"পরমহংস ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হইলেও, অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ প্রধানতঃ তাঁহার অবলম্বনীয় হইলেও তাহাতে ভক্তিভাবের স্ফুরণ প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হইত। অথচ তাঁহার চক্ষু হইতে অনবরত দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইত। অথচ তাঁহাকে সর্ব্বদাই একজন আনন্দময় পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। তিনি যেন সতত সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন; অথচ শাস্ত্র-কথা পড়িলে তিনি পঞ্চানন্দ-কল্প হইয়া অনর্গল সংস্কৃতময়ী বক্তৃতায় তাহা বুঝাইয়া দিতেন, তিনি যে কোন্‌শাস্ত্র জানিতেন, কোন্ শাস্ত্র জানিতেন না, তাহার কেহই ইয়ত্তা করিতে পারিত না। যে কোনও শাস্ত্রের কথা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। আবার, শাস্ত্রকথা বলিতে বলিতে যখন মধ্যে মধ্যে সহসা অট্টহাস্য করিয়া অমনি গভীর ভাবরাশিতে নিমগ্ন হইয়া নিস্তব্ধ ভাব ধারণ ও নয়নজল বর্ষণ করিতেন, তখন সকলে অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। কখন কখন বা সংস্কৃত তোটক বা পজ্‌ম টিকা ছন্দে স্বরচিত সঙ্গীত সুমধুর কণ্ঠে গান করিয়া সকলের মনোহরণ করিতেন। তাঁহার নিদ্রা একপ্রকার ছিল না বলিলেও হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাণদ্বারা তিনি কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রৎ রাখিতেন।"

"এবম্প্রকার মহাপুরুষের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বাঞ্চলের বড় বড় বংশীয় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণবর্গের অনেকে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার কতা সুদূর মণিপুর রাজ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিল।"

"তখন মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র মণিপুর রাজ্যের অধিশ্বর ছিলেন, X X কীর্ত্তিচন্দ্র কোনও ধর্ম্মতত্ত্ব মীমাংসার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যখন কান্দিগ্‌ভূত হইয়াছিলেন, তখন স্বপ্নে পরমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বামীর শরণাপন্ন হইতে আদিষ্ট হন। ব্রহ্মানন্দ পুরীকে স্বীয়রাজ্যে আনিবার নিমিত্ত মহারাজ নির্ব্বন্ধ সহকারে শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ জানাইলেন, তিনি তন্ত্রাচারী, "কারণ" না হইলে তাঁহার চলে না। বৈষ্ণব মহারাজ যদি তাহার ব্যবস্থা না করেন, তবে তিনি মণিপুর যাইতে পারিবেন না; তখন পিপায় পিপায় "কারণ" সংগৃহীত হইল, ব্রহ্মানন্দ কতিপয় অনুচর সহ মণিপুর গিয়া কিয়দ্দিবস সেই স্থলে অবস্থান করিয়া মহারাজের

---

১০০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ৩য় খঃ ২য় অধ্যায়ের প্রথমেই এই কালীর বিবরণ আমরা প্রদান করিয়াছি।

মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। এরূপও প্রবাদ আছে যে, মণিপুরে দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টি ছিল, ব্রহ্মানন্দ জলে নামিয়া তপস্যা করিয়া বৃষ্টিপাত করাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি পূর্ব্বে মণিপুরে বিল্ববৃক্ষ ছিল না; ব্রহ্মানন্দপুরী একটি বেলের চারা নিয়া তথায় রোপণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ব্রহ্মানন্দ যখন ফিরিয়া আইসেন, তখন মহাবাজ কীর্ত্তিচন্দ্র একটি নিম্বকাষ্ঠ—নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি সহ অলঙ্কার সমেত উপহার প্রদান করেন এবং বার্ষিক একটা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

"আনুমাণিক দশ বৎসর কাল বাণিয়াচঙ্গে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মানন্দপুরী, ১২৮১ সালে সমাধি লাভ করেন। এই বৎসর নারায়ণী যোগে করতোয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। অন্তিম মুহূর্ত্তে তিনি কাত্যায়নী মাতার সাক্ষাৎ উপবিষ্ট হইয়া স্তবস্তুতি করিলেন ও তৎপর যোগমগ্ন হইয়া নশ্বর দেহ হইতে মুক্ত আত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাঁহার দেহ কি রূপ সমাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারেই কার্য্য হইয়াছিল।[১০১]

"ভবাণী দেব্যা"

ইনি বামৈর চৌধুরীয়া বংশীয়া ছিলেন। হবিগঞ্জের বামৈর ব্রাহ্মণ চৌধুরী বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ইনি বালবিধবা ছিলেন ও কাশীধামে গিয়া যোগসিদ্ধ হন। প্রায় ৫০/৬০ বৎসর হইল সাধনোচিগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সময়ে বারাণসীতে গিয়া লোকে যেমন মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে দেখিত, তেমনি এই 'যোগিনী"কেও দেখিয়া বিস্মিত হইত, কেননা ইনিও আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ থাকিতেন।

ভৈরবচন্দ্র রায়

বেগমপুরবাসী ভৈরবচন্দ্র রায় এক অতি কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি স্বীয় সামর্থে অবস্থার আশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। উদ্দ্যোগী পুরুষের নৈরাশ্যের কারণ মাত্র থাকিতে পারে না। ভৈরব রায় তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রতাপগড় পরগণার গবর্ণমেন্টের খাস মহালের তহশীলদার রূপে তিনি দীর্ঘ কাল কার্য্য করেন এবং তাহাতেই দক্ষতাগুণে তিনি যেমন কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হন, তেমনি স্বীয় অবস্থারও পরিবর্ত্তনে সক্ষম হন। দীর্ঘকাল কার্য্য করার পর বার্দ্ধক্যে পেনসন গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে গমন করেন।

দেশেতেও তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় একটি কার্য্যের দ্বারা সকলে পাইয়াছিল। অরঙ্গপুরের ৮নং তালুকটীর প্রজাগণ বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিল, কেহই ঐ তালুক দখলে রাখিতে পারিত না; এজন্য "দেওলা তালুক" বলিয়া ইহার কুখ্যাতি ছিল। ভৈরবচন্দ্র রায় জানিয়া শুনিয়া ঐ তালুক ক্রয় করেন এবং বিনা অত্যাচারে আশ্চর্য্য কৌশলে উহা এমন শাসন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে উহার "দেওলা" নাম চিরতরে ঘুচিয়া গিয়াছে।[১০২]

ভোলানাথ শিরোমণি

বামৈ পরগণার সিংহগ্রামে ভোলানাথ শিরোমণির বাস ছিল, তিনি প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন। এক সময় শাস্ত্র-বিচারে তিনি কলিকাতার বহুতর পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কালীঘাটে মায়ের বাড়ীতেই তিনি থাকিতেন এবং তথায় তৎসংসৃষ্ট অনেক অদ্ভুত ঘটনা অনেক ব্যক্তিই

১০১. সম্প্রতি সমাধি স্থলে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছে।

১০২. শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি এ হইতে প্রাপ্ত।

প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তিনি তাহাতে একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তথাকার সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল, সুদূর চট্টগ্রামের চক্রমালার বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদা তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার ভয়ানক জ্বর কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না; অসুস্থ অবস্থাতেই যাইতে প্রবৃত্ত হন ও বহুকষ্টে পুরীতে পৌছেন। যাওয়াকালে ভুলবশতঃ কলিকাতায় তাঁহার জপমালার ঝোলা হারাইয়া যায়। তিনি যখন নীলাচঙ্গে পৌছেন, তখনও তাঁহার দেহে জ্বর ছিল, হাঁটিয়া "দর্শনে" যাইবার শক্তি ছিল না।

যখন তিনি ভাবিতেছেন যে কষ্টেশ্রেষ্টে পুরী পৌছিয়াও তাঁহার সাধ মিটিল না—দর্শন ঘটিল না, হয়তঃ তাঁহাকে অন্তিম শয্যাশায়ী হইতে হইবে; তখন হঠাৎ একজন অপরিচিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে একরূপ বহন করিয়া লইয়া দর্শন করাইলেন। এই বৃদ্ধের সাহায্যে দুই তিন দিনই তাঁহার দেবদর্শন ঘটিল, তাঁহার পরে আর উহাকে আসিতে না দেখিয়া, উনি কে তাহা ভাবিতে ভাবিতে আত্মস্থ হইয়া পড়েন। ইহার সম্বন্ধে তিনি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন প্রকাশ নাই, কিন্তু আত্মস্থ হইয়া তাঁহার হারাণ মালার ঝোলা কোথায় রহিয়াছে জানিতে পারেন, ও ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে কথা নির্দ্দেশিত স্থানে উহা পুনঃ প্রাপ্ত হন। শিরোমণির সম্বন্ধে ঈদৃশ বহু কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

ভৌলা শাহ

ভৌলা শাহের জন্মস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত রফিনগর পরগণা। ইনি শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইয়া স্বীয় মাসী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ অনুরাগ জন্মে এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৫/১৬ বৎসর বয়সে তিনি পশ্চিমে গমন করেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এক সিদ্ধ ফকিরের সঙ্গ প্রাপ্ত হন; তিনি সেই ফকিরের তামাক সাজিয়া দিতেন।

একদা ফকির তাঁহার অনুষঙ্গিবর্গকে বলেন "শীঘ্রই আমি চলিয়া যাইব, তোমরা কেহ কাছ ছাড়া হইও না।" অতঃপর তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। অনুষঙ্গিবর্গ অনিদ্রা করিয়া সতর্কভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেকদিন গেল, শিষ্যবর্গ অবিরত অনিদ্রা থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গুরুভক্তি ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। তখন আর সকলে সকল সময় কাছে থাকেন না, পাশ কাটিয়া এড়াইতে পারিলেই সুখী! কিন্তু একজন শিষ্য এই রোগাক্রান্ত হন নাই।

অকস্মাৎ এক রাত্রে ফকির শিষ্যগণকে ডাকিলেন, তখন সকলেই নিদ্রিত,—কেহ শুনিলেন না। কিন্তু ভৌলা তখনও ফকিরের সেবার জন্য জাগিয়া রহিয়াছেন; ফকিরের আহ্বানে তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন। ফকির ভৌলাকে কাছে যাইতে ইঙ্গিত করিলে তিনি নিকটে গেলেন; তখন ফকির তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, আমার যা কিছু ক্ষমতা, তাহা তোমাতে সঞ্চারিত হউক, এক্ষণে দেশে যাও।" এই কথাগুলি বলিয়াই ফকির দেহত্যাগ করিলেন।

ভৌলা তখন তথা হইতে যাত্রা করিয়া, এক সবেবরাতের দিনে মাসীর গৃহে উপনীত হইলেন। মাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, অতিথি বলিয়াই স্থান দিলেন। পরদিন মাসীকে তিনি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। দেশের লোকেরা জানিতে পারিল যে ভৌলা জ্ঞানী ও পীর হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন গ্রামের অনেকেই উপদেশ-প্রাপ্তি প্রত্যাশায় প্রত্যহ তাঁহার কাছে উপস্থিত হইত, তিনিও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। এই রূপে তথায় এক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইল। ভৌলা কাহাকেও কোনরূপ অদ্ভুত কার্য্য দেখাইতেন না, বরং তাহা গোপন রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহা সময় সময় প্রকটিত হইয়া পড়িত।

তাঁহার মাসী প্রত্যহ অগ্নিসেবন করিতেন, কাজেই তাঁহার কাঠের খুব প্রয়োজন ছিল। মাসী তাঁহাকে কাঠের অভাব জানাইলে, একদা রাত্রিতে ৬/৭ হাত বেষ্টনি বিশিষ্ট একটা গাছ কোন অদৃশ্য শক্তি সাহায্যে আনাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর আর তিনি আত্ম-গোপন করিতে সমর্থ হন নাই।

শ্রীহট্ট শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বস্ত্র পরিধান করিতেন না; বলপ্রয়োগেও কিছু হয় নাই;[১০৩] বস্ত্র পরিধান করিলে তাঁহার প্রাণ যেন আকুলই হইয়া উঠিত, ছটফট করিত। তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একেবারে উলঙ্গিনী রহিয়াছিলেন। তাঁহার বাসের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, একটী সুন্দর গৃহে তাঁহাকে একাকিনী থাকিতে দেওয়া হয়; সেই গৃহে তাঁহার জনৈকা সখী ও দাসী ব্যতীত কেহই যাইতে পারিত না, সে গৃহ সর্ব্বদা চাবিবন্ধ থাকিত।

গৃহস্বামী জমিদার মহাশয় কোনক্রমে ভৌলার গুণের কথা শুনিয়া তৎকর্ত্তৃক কোন দৈবপ্রতিকার দ্বারা কন্যার এই বস্ত্রবিদ্বেষরোগ আরোগ্য হয় কি না, দেখিতে ইঁহাকে পরম সমাদরে বাড়ীতে নেন। কিন্তু ভৌলাকে কিছুই করিতে হয় নাই, তাঁহার উপস্থিতি মাত্র আবদ্ধ গৃহের ভিতর হইতে স্ত্রীলোকটি পরিধেয় বস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বস্ত্র দেওয়া হয় এবং তিনি স্বয়ং তাহা পরিধান করেন। তদবধি উহার বস্ত্র-বিদ্বেষ বিদূরীতা হয়, এবং তৎপর তাঁহার বিবাহ হয়।

শাহ ভৌলার শিষ্য পিয়ারশাহ, তাঁহার শিষ্য নাইওর শাহ, তৎশিষ্য লাল শাহ, ইহার পুত্রগণ বর্ত্তমান আছেন।

মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য

হবিগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত বাজুকা গ্রামে মথুরানাথের জন্ম, ইঁহার পিতামহ বিবাহ সূত্রে একটি বিষয়ের অধিকারী হইয়া বাণিয়াচঙ্গের জাতুকর্ণ পল্লী হইতে রাজুকায় গিয়া বাস করেন। মথুরানাথ শৈশবে অভিভাবক বিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; ইহার বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল, মাত্র এক বৎসর কাল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন কি স্মৃতি, কি সাহিত্য, কি জ্যোতিষ, যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেন; অতি অল্পকালেই তাহাতে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিত, এইজন্য তাহার স্বজ্ঞাতি -খুল্লতাত প্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু সাংসারিক অবস্থার পীড়নে তাঁহাকে শীঘ্রই পড়াশুনা ছাড়িয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হয়। তাহার উপর পৈতৃক শত্রুদের উৎপীড়নের মাত্রাও প্রথমতঃ অল্প হয় নাই; কিন্তু ইহাতে সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার এতাদৃশ পরিপক্কতা জন্মে যে, তদীয় কার্য্যকুশলতা দৃষ্টে চতুর ব্যবহারজীবীও চমৎকৃত হইতেন।

সংকীর্ত্তন বা কবির দলে গীত হইবার নিমিত্ত গনের প্রয়োজন হইলে, ঈষদায়াসেই ইনি তাহা সুষ্ঠু রচনা করিয়া ধনাগমের উপায় উদ্ভাবনেই রত থাকিতেন। তিনি গ্রামে যৌথ লোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল তাহা দক্ষতার সহিত করিয়াছিলেন।

---

১০৩. নানা কারণে এই জমিদার তনয়ার পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল না। এইরূপ ঘটনা অঘটনীয় নহে, আমরা দেখিয়াছি, জফরগড় নিবাসী একটি বালক উলঙ্গ থাকিত, ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে বস্ত্র পরিধান করে নাই; পরিধান করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ খুলিয়া লইত। সে একখানা কাপড় (সাধারণতঃ যোগীয়ানা গিলাপ) গায়ে দিয়া থাকিত, উহা উপবীতাকারে হাটুর নীচ পর্য্যন্ত পড়িত ও তাহাতেই লজ্জা নিবারণ হইত। লোকটি এখনও জীবিত আছে কিন্তু এইক্ষণে বস্ত্র ব্যবহার করে। পূর্ব্বোক্ত বালিকার বস্ত্রবিদ্বেষ ইহার অপেক্ষা অধিক ছিল।

মথুরানাথ আচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ও অমায়িকপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে বালবৃদ্ধ সকলই মোহিত ছিল। গ্রামস্থ লোকের তৎপ্রতি এত বিশ্বাস ছিল যে, অতি গোপনে তাঁহার কাছে নিজ অর্থবিত্ত সর্ব্বদা গচ্ছিত রাখিত। বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে তাহা হইতেই সর্ব্বাগ্রে তাহারা সৎপরামর্শ পাইত। আত্মীয় কুটুম্বের কোন ক্রিয়াকলাপ হইলে মথুরানাথ না গেলে যেন তাহা অপূর্ণই রহিত। অভ্যাগত অতিথি কদাপি তাঁহার গৃহ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। গ্রামে তিনি একটি সাপ্তাহিক ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তাহাতে গ্রামবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়। এই সমস্ত কারণে মথুরানাথ লোকের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। বিগত ১৩০৪ বাংলার ফাল্গুণ মাসে তিনি পরলোকগমন করেন।

মহাদেব পঞ্চানন

সংসারশক্তি-বিরহিত ভাবে কিরূপে সংসারে অবস্থিতি করা যাইতে পারে, বাণিয়াচঙ্গের গৌতমগোত্রীয় মথুরানাথ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন; এই সাধক মহাত্মার পুত্রই মহাদেব। মহাদেবের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতা যে রূপে দেব-দেব মহাদেবের কৃপা-নিদর্শন অনুভব করেন, তাহা "বংশবৃত্তান্ত" বর্ণন প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাদেব যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন শিশুদর্শনে গিয়া সকলেই দেখিতে পান যে, শিশুর গলদেশ বেষ্টন করিয়া একটা সর্পও জাত হইয়াছে; এই সর্পটি জাত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই একদিকে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে একদিন কার্য্যন্তর হইতে তাঁহার মাতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান যে, সেই সর্পটি আসিয়া শিশুর গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মাকে দেখিয়া সাপটি পলাইতে চাহিল ও তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু দুগ্ধ আনিয়া দিলে তাহা পান করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর আর একদিন এইরূপ হইল, তৃতীয় দিনে মথুরানাথ স্বয়ং এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হন ও সাপটিকে ধরিয়া দুগ্ধ খাইতে দেন। ইহার পর আর ইহাকে দেখা যায় নাই। এই সকল কাণ্ড দর্শনে মথুরানাথ পুত্রের নাম মহাদেব রাখেন।

মহাদেব যখন ক্রন্দন করিতেন তখন কালী কালী বলিলে ক্রন্দন ত্যাগ করিতেন। কিঞ্চিৎ বড় হইলে কালীমূর্ত্তি গঠন করিয়া খেলিতেন—ফুল ও দুর্ব্বাদ্বারা পূজা করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা শিবপূজার নৈবেদ্যাদি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় পুত্র সম্মুখের নৈবেদ্যটি নিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন! দেবোদ্দিষ্ট নৈবেদ্য হরণ করায়, পুত্রের ভবিষ্যৎ অনিষ্টাশঙ্কায় মাতা ভীতা হইলেন; কিন্তু পুত্রকে তজ্জন্য তিনি তাড়না করিলেন না—তাড়না করিতে ইচ্ছাও হইল না।

পঞ্চম বৎসরে মহাদেবের বিদ্যারম্ভ হয়, তাঁহার পাঠে অভিনিবেশ ও প্রখর স্মৃতিশক্তি দর্শনে শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই মনে ধারণা হয় যে, মহাদেব অসাধারণ পণ্ডিত হইবেন। তাঁহাদের অনুমান অসত্য হয় নাই, অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ না হইতেই তিনি সমুদয় শাস্ত্রাঙ্গে সুশিক্ষিত হইয়া "পঞ্চানন" উপাধি লাভ করেন। উপাধি লাভের পরেই তিনি সাংখ্যদর্শনের একখানা ভাষ্য লিখেন এবং তদ্দারা ভারতীয় দার্শনিক সমাজে পরিপূজ্য হন।

তৎপরে তিনি কয়েকটি গর্ব্বিত পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করেন। পরে তাঁহার দৈবশক্তির কথা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়ে, তৎশ্রবণে অতঃপর কোন পণ্ডিতই তৎসহ বিচারে সাহসী হইতেন না। মহাদেবের দৈবশক্তি তাঁহার জন্মজাত ছিল; কোনরূপ সাধন-লব্ধ ছিল না, তিনি যখন পঠদ্দশায় ছিলেন, তখন এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঘটনা বিশেষে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্বংশীয় শ্রীযুক্ত সারদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে যে বিবরণ প্রদান

করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, বেজোড়ার রমানাথ বিশারদ ইহার সহপাঠী ছিলেন।[১০৪] উভয়ে একদা গুরুগৃহ হইতে বাড়ী আসিতে ছিলেন, একটা বন্যপথ পার হইবার কালে রমানাথ কিঞ্চিৎ অগ্রে ছিলেন, তিনি হঠাৎ একটা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। কিন্তু ব্যাঘ্র তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। ইত্যবসরে মহাদেব তথায় আসিয়া পড়িলে, তাঁহাকে দর্শন মাত্র ব্যাঘ্র চলিয়া যায়। এই ব্যাপার দৃষ্টে রমানাথ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না যে কেন তাঁহাকে দেখিয়াই ব্যাঘ্র মার্জ্জারবৎ নিরীহভাবে চলিয়া গেল। উত্তরে মহাদেব বলেন যে, তন্ত্রবিদ্যায় আরও অগ্রসর হইলে তিনি স্বয়ংই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

তাহার পরে মহাদেব ও রমানাথ উভয়ে একত্রে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সমীপে উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী বিশারদকে দেখিয়াই বলিয়া উঠেন—"বৎস, তুমি স্বনামধন্য পুরুষ, কিন্তু তোমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার মৃত্যুর দিন নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিলেন। এতৎশ্রবণে মহাদেব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"মহাশয়! ঐ সময় প্রকৃতপক্ষে উহার মৃত্যু ঘটিবেক না, মৃতবৎ হইলেও পরে বাঁচিয়া উঠিবেন।"

সন্ন্যাসী তীব্র দৃষ্টিতে মহাদেবের প্রতি চাহিলেন, মহাদেবের বদনে কি জানি কি দেখিলেন, তাঁহার মনে কি জানি ভাবতরঙ্গ উঠিল, তিনি চাহিতে চাহিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুর্চ্ছাভঙ্গের পর বিশারদকে বলিলেন—"বৎস, তোমার বন্ধুটিকে সামান্য মনে করিও না, সাক্ষাৎ মহাদেব বলিয়াই জানিও।"

মহাদেব ও বিশারদের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল, এই প্রণয় চিরদিন অক্ষুণ্ণই ছিল; বিশারদের জ্যৈষ্ঠপুত্রের সহিত মহাদেবের দুহিতার পরিণয় সম্পাদিত হওয়ায় উভয় পরিবারের ঘনিষ্টতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাদেব সুরাপান মহাপাপ জ্ঞান করিতেন; এমন কি, পূজাদি উপলক্ষে মন্ত্রপূত সুরাপানেও তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বলিতেন, সুরাপানে প্রতি সহস্রে একব্যক্তি "কুলকুণ্ডলিনী" জাগাইতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু ৯৯৯ ব্যক্তিই নিশ্চিত নরকের পথে ধাবিত হয়; এমত স্থলে ইহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এ সম্বন্ধে বহুতর সুরাপক্ষপাতী পণ্ডিতকে তিনি বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক শিষ্য সংখ্যা প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ছিল, তিনি সুরাপানের ঘোরতর প্রতিবাদী হওয়াতে ইহাদের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হয়।

তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচারের প্রণালী অতি সুন্দর ও সরল ছিল, শাস্ত্রার্থ জটিল করিয়া প্রতিবাদীর পরাভব করা অপেক্ষা শাস্ত্রের জটিল স্থলের সরল মীমাংসা করিতেই তাঁহার অত্যাগ্রহ লক্ষিত হইত; তিনি বিনা কারণে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, সহজে বিচারবিতর্ক বৃত হইতে চাহিতেন না; শেষটা শাস্ত্র বিচারে যাইতেন না ও ভালবাসিতেন না; বিচারবিতর্ক ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

তিনি কালীভক্ত ছিলেন; শেষকালে গৃহে থাকিয়া কালীভজনা করিয়া সমাধিতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেন। একদিন কালীস্তুতি করিতে করিতে সমাধিস্থ হন, সে সমাধি আর ভাঙ্গে নাই।

মহাদেবের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে লোকে তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেবের অবতার জ্ঞান করিত।

---

১০৪. এই প্রবন্ধে বিশারদ সম্বন্ধীয় যে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাও উক্ত বিবরণ প্রদাতার প্রেরিত। কিন্তু বিশারদ বংশীয়গণ উহা সর্ব্বাংশে স্বীকার করেন না। বিশারদের বিবরণ অতঃপর কথিত হইবে।

মহেন্দ্রনাথ দে

মহেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টের অন্তর্গত জগৎশী গ্রামবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব স্বর্গীয় দেওয়ানজী দোলগোবিন্দের পুত্র। মহেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন, গণিত শাস্ত্রে ইঁহার ন্যায় কৃতীছাত্র এ জেলায় বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মহেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ, বি এস সি, উপাধি ধারণ করিয়া দেশে আসেন। তিনি নিজের স্বার্থ বা অর্থচিন্তায় বিব্রত না হইয়া দেশে যাহাতে জ্ঞানের প্রসার প্রবৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে স্বীয়শক্তি নিয়োগ করেন। এজন্য তিনি উচ্চ বেতনের কোন রাজকার্য্য গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হন। দেশের লোকের সৎশিক্ষা ও জ্ঞান প্রবর্দ্ধনের জন্য তদ্বৎ কয়েকটি উন্নত হৃদয় যুবকের উদ্যম ও উচ্চ আকাঙ্খা জন্মিয়াছিল। এই সুন্দর সঙ্কল্পের আভাস "প্রভাত" পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্র পাঠে[১০৫] জানা যায়। সে পত্রের প্রথমে লিখিত ছিল—"যে শ্রীহট্টে শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি, রাজযোগী দিব্যসিংহ, বর্ত্তমান যুগের চাণাক্যস্বরূপ নৃসিংহ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজনীতিতে, ধর্ম্মনীতিতে, ভাষাতত্ত্বে, জ্ঞানবত্তায় যে শ্রীহট্ট একদিন বাঙ্গালায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল—আমরা সেই শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি আবার এই বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালদেশে জ্ঞানে ও প্রতিভায় আগুন জ্বালাইয়া না দিতে পারি, তবে আমাদের জঙ্গলে জন্ম গ্রহণ করাই ভাল হইত।" মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকদের আকাঙ্খা এই কয়েক পংক্তি পাঠেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মানুষের সাধু ইচ্ছা সর্ব্বত্র পূর্ণ হয় কৈ?

মহেন্দ্রনাথ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা জানিতেন। লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায়ও তাঁহার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল; তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার "প্রিয় ল্যাটিন ও গ্রীক পুস্তকের নাম করিয়া 'দিন' 'দিন' বলিয়া তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়াছিলেন।"

মহেন্দ্রনাথ বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিশোরগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু অচিরেই কার্য্যত্যাগ করিতে হয়। ময়মনসিংহে যখন প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়, স্কুলের সম্পাদক তখন রাজনীতি সংসৃষ্ট উক্ত সমিতিতে শিক্ষক অথবা ছাত্রবর্গকে যোগ দিতে নিষেধ করেন। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যহত হইয়াছে বোধ করায় মহেন্দ্রনাথের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এবং তাহাতেই তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। এই ঘটনাতে তিনি তথায় উপস্থিত লোক-নায়কগণের পরিচিত হইয়া পড়েন। ইহার পর এম, এ পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন ও জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক উক্ত বিদ্যালয়ের গণিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

স্বদেশ-সেবার যে ব্রত তিনি জীবনের লক্ষ করিয়াছিলেন, তদনুরোধে ইহার পরে মহেন্দ্রনাথ হবিগঞ্জ জাতীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই স্থানে অবস্থিতি কালে তাঁহার উদ্যোগে ১৩১৬ বাংলার বৈশাখ মাস হইতে "মৈত্রী" (মাসিক) এবং পরবর্ত্তী বৈশাখ মাস হইতে "প্রজাশক্তি" (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয়। মহেন্দ্রনাথের "অরুণাচল" আশ্রম আশ্রয় করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই উভয় পত্রিকাই যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল,—যদিও মহেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে মৈত্রী ও প্রজাশক্তির সম্পাদক ছিলেন না। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী জীবন নানাকারণে আমরা আলোচনা-যোগ্য মনে করিতেছি না। বিশেষতঃ ইহার সহিত এমন কয়েকটি সমস্যা বিজড়িত, যাহার রহস্যোদ্ভেদ এক ভগবান ভিন্ন কাহারও সাধ্যায়ত্ত বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। তাঁহারই ইচ্ছায় বন্দুকের গুলি দ্বারা আহত অবস্থায় শ্রীহট্টের হাসপাতালে ১৯১২ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে মহেন্দ্রনাথ অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; হায় নিয়তি!

---

১০৫. করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "প্রভাত" পত্র—১৩১৮ বাং ১ম পক্ষ, "কতিপয় যুবকের উচ্চ আকাঙ্খা" প্রবন্ধ।

মাণিক্যচন্দ্র রায় সেনাপতি

কৌড়িয়া পরগণার চন্দর গ্রামে "সেনাপতি" বংশ নামে যে এক প্রাচীন বংশ আছে; শীর্ষলিখিত ব্যক্তি হইতেই এ বংশ উক্ত নামে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়া আসিতেছে।

মাণিক্যচন্দ্রের পিতামহ নরেন্দ্রকিশোর রায় এই স্থানে প্রথম আগমন করেন। তাঁহার ২য় পুত্র গজেন্দ্রকিশোর জয়ন্তীয়ারাজের সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র শৌর্য্য বীর্য্যে পিতার তুল্য ছিলেন বলিয়া জয়ন্তীয়ারাজ বড় গোসাঞিঁর অনুগ্রহে তিনি পিতৃপদে নিয়োজিত হন। তিনি দীর্ঘকাল এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই সেনাপতি বংশের সমৃদ্ধি ও গৌরব সম্যক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইঁহার পুত্রাদি হয় নাই। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্রকিশোর রায়ের বংশধরগণই বংশের নাম ও গৌরব রক্ষা করিতেছেন। রাজেন্দ্ররায়ের ৭ম পুরুষ স্থানীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় সেনাপতি মহাশয়-প্রেরিত বিবরণ হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে।

মাধব দাস

নবদ্বীপবাসী দুর্গাদাসের পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট ছিল। কোন কারণে তিনি শ্রীহট্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপে সস্ত্রীক গিয়া বাস করেন। সনাতন ও পরাশর নামে তাঁহার দুইপুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে পরাশরকে সকলে কালিদাস বলিয়া ডাকিত, ইহার একটা কারণও ছিল, তিনি পৈতৃক বৈষবধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালীভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি কালিদাস নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ও খ্যাত হইয়াছিলেন। মাধব কালিদাসেরই একমাত্র পুত্র।[১০৬]

সনাতনের এক কন্যা ও একটি পুত্র হয়, কন্যাটিই জ্যেষ্ঠা, ইহার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া পরম লাবণ্যসম্পন্না, পবিত্রচিত্তা ও ভক্তিস্বরূপিনী ছিলেন। ধৈর্য্যে বসুমতী তুল্যা এই বালিকাকে সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী ইঁহার অনুজ ভ্রাতার নাম যাদব মিশ্র।

মাধব শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট কিয়ৎকাল শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভু গ্রন্থ পাঠে তুষ্ট হইয়া ছিলেন।[১০৭] ইহার পরে তিনি অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন।

একদা বাসগৃহে ভক্তগণ পরিবৃত শ্রীগৌরাঙ্গকে বালক মাধব দর্শন করিয়া ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ড পথে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে তাঁহার নীলাচল—প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া মাধব তৎসমীপে গমন করিতে উৎসুক হন। মাধব শিশুকালেই পিতৃহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার জননী বালবিধবা বিধুমুখীদেবী পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়া ভীত হইলেন ও পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্যাপার

---

১০৬. "শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি॥
তাহার দুই পুত্র অতি গুণধাম।
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর নাম॥
পরাশর বিপ্র বড় কালী ভক্ত হয়।
কালিদাস নাম তারে সকলে ডাকয়॥
কালীদাস নাম তিঁহর প্রসিদ্ধি পাইল।
তাঁর পুত্র মাধবদাস সুপণ্ডিত হইল।
—প্রেমবিলাস গ্রন্থ।

১০৭. "শ্রীঅদ্বৈত স্থানে শাস্ত্রঅধ্যয়ন।
মাধব আচার্য্য বলি বিখ্যাত ভুবন॥
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্দ।
গীতে বর্ণিলা তাহা করি নানা ছন্দ।
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যপদে সমর্পণ কৈলা।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দ্বারে দীক্ষা দেওয়াইলা॥"
—প্রেমবিলাস গ্রন্থ।

দৃষ্টে মাধব পলাইয়া বৃন্দাবনে গেলেন ও পরমানন্দ পুরীর নিকট সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। মাধব অতঃপর শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী হইতে বৈষ্ণবীয় ভজন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১০৮]

নবদ্বীপে যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর বিগ্রহের সেবাধিকারী, তাঁহারা তদীয় অনুজ যাদব মিশ্রের বংশ। যাদবের পুত্রই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের সতীর্থ ভবানন্দের নিকট ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি দীধিতি গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ন্যায় গ্রন্থের টীকা রচনা উপলক্ষে এতাদৃশ সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহার নামে নব্যমতকে কেহ কেহ "জগদীশী" বলিয়া আখ্যাত করেন।[১০৯] জগদীশকে শ্রীহট্টের লোক বলা যাইতে পারে না, মাত্র তদীয় পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। মাধবদাসের জন্ম শ্রীহট্টে না হইলেও তাঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠতাত পিতামহ প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন বলিয়া—শ্রীহট্টবাসীর সন্তান বলিয়া—তাঁহার কথা এস্থলে উল্লেখিত হইল।

মুনিব উদ্দীন

মুনিব উদ্দীন একজন মোসলমান সাধুপুরুষ; ইহার নামান্তর দৈখোরা মোনশী। "যাঁহারা সংসারত্যাগী মহাপুরুষ, তাঁহারা প্রায়শঃ নিজ নাম জন্মস্থান ইত্যাদি গোপন করিয়াই থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা নিজকে আউলিয়া বা পাগল বলিয়া রটাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজের জন্মগত পরিচয় দিবেন দূরে থাকুক, তাঁহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, বাহ্য আচার আচরণে অনেকে তাহাও প্রকাশ করেন না। এই নিমিত্ত অনেক ইউরোপীয় পর্য্যটক ফকিরের বেশ ধরিয়া মক্কা মদিনা প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে পারিয়াছেন।"

"এই সাধুপুরুষের জন্মস্থান নাকি নোয়াখালি অঞ্চলে ছিল। কিন্তু তিনি আপনার জীবনের প্রথমাবস্থায়ই জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের এই শ্রীহট্ট অঞ্চলে আসিয়া আমরণ এখানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শুনা যায় আজিও বাহাদুরপুরে তাঁহার সমাধি স্থান আছে। শ্রীহট্টে অনেক মোসলমান সাধু মহাত্মা আসিয়া বাস করেন, তাহার একটু কারণও আছে। সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহজলাল মজঃরদ এই স্থানে আসিয়া জীবনের শেষার্দ্ধকাল যাপন করেন এবং এই স্থানে আজিও তাঁহার সমাধি মন্দির বর্ত্তমান থাকিয়া সমগ্র মোসলমান-জগতে একতম দর্শনীয় পিঠস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে।"

"এই মোসলমান সাধকটির উপনাম "দৈখোরা" হইবার কারণ এই যে ইনি দধিভক্ষণে বিশেষ আশক্ত ছিলেন। প্রকৃত নাম না জানায় সাধারণে তাঁহাকে "দৈখোরা মোনশী" বলিয়া সম্বোধন করিত এবং সাধু নিজকে 'দৈখোরা পাগল' বলিয়া অভিহিত করিতেন।"

---

১০৮. "পরমানন্দ পুরী স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল।
রূপ সনাতনে স্থানে ভজন শিখিল॥"
—প্রেমবিলাস গ্রন্থ।

১০৯. মাসিক বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় (৪১০ গৌরাব্দের) ৪০৩ পৃষ্ঠায় "যাদব ও মাধব" প্রবন্ধে ৪১১ অব্দের পত্রিকায় "মাধব ও কৃষ্ণমঙ্গল" প্রবন্ধে এবং ৪১২ অব্দের উক্ত পত্রিকায় "প্রেম বিলাসের প্রামাণ্যতা" "মাধব" ও "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থে মাধব সংবাদ" ইত্যাদি প্রবন্ধে আমরা কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা এই মাধব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এ প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত সার। আর এক পরাশর সূত—তাঁহারও নাম—মাধবাচার্য্য, তিনি চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি প্রণেতা; উক্ত প্রবন্ধাদিতে উহার কথাও পাওয়া যাইবে, তিনি এই কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি শক্তি উপাসক, সঙ্গীত ব্যবসায়ী ও গৃহাশ্রমী ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী।

"এই সাধু সর্ব্বদাই অতি সুমিষ্টস্বরে সঙ্গীত করিতেন। গানগুলিতে তাঁহার নাম যোজিত থাকায় ঐ সকল তাঁহারই রচিত, এ কথা স্পষ্টই সূচিত হয়। ঐ সকল গান বাউল সঙ্গীতের মত গূঢ়ার্থক দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় হওয়াতেই কেহ কেহ তাঁহাকে "বাউল" মনে করিতে পারেন কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে তিনি "বাউল" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। + + + তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন সুমধুর ছিল যে তাঁহার গান শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইত, যে একবার শুনিত সেই মুগ্ধ হইত এবং তৎপ্রতি অনুরক্ত হইত। + + + ফলে শ্রীহট্টের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলে কৃষিজীবী মৎস্যজীবী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মোসলমানগণের মধ্যে এই দৈখোরা সাধুর গান অত্যন্ত প্রচলিত এবং সেই শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেও ভদ্রোচিত কোনও কোনও গান গীত হইতে শুনা যায়।

"দৈখোরা মোনসীর জীবনচরিত সম্বন্ধে ইতোহধিক বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। বড় বেশী দিন হয় নাই, তিনি নশ্বরজগত পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার তিরোভাবের সন তারিখ জানা যায় না। + + + যাহা হউক, দৈখোরা মহাত্মার গান গুলি[১১০] তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।"[১১১]

মুরারি গুপ্ত

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম অধ্যায়ে মুরারি গুপ্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছি। বৈদ্যবংশীয় মুরারিগুপ্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি পরম আসক্ত ছিলেন। উভয়েই শ্রীহট্টবাসীর সন্তান, নবদ্বীপের এক পল্লীতে উভয়েরই বাস, এবং উভয়েই তত্রত্য এক টোলে অধ্যয়ন করিতেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে মুরারির ন্যায় যুবক হইতে নিমাইর ন্যায় বালক পর্য্যন্ত পড়িত। মুরারি বয়সে নিমাই হইতে অনেক বড় হইলেও নিমাই তাহাকে উত্যক্ত করিতে ছাড়িতেন না। এই গঙ্গাদাসের টোলে কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি আরও বহুতর ছাত্র পড়িতেন, কিন্তু নিমাইর যত আক্রোশ তাঁহার স্বদেশী এই মুরারির প্রতি।

নিমাই যখন ক্রীড়াশক্ত বালক, তখনও মুরারির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল; তখন একদিন মুরারি সঙ্গিগণ সহ অদ্বৈতবাদ আলোচনা করিতে করিতে পথে যাইতেছিলেন, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাদ্দিকে হাস্য কলরব শুনিতে পাইলেন। চাহিয়া দেখেন যে, নিমাই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে সঙ্গীসহ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তিনি যেমন হাত নাড়িয়া তত্ত্বালোচনা করিতেছেন, নিমাইর অভিনয়ও ঠিক তদ্রূপ হইতেছে। দেখিয়া মুরারির রাগ হইল,

১১০. এই মোসলমান সাধক-কবি-কৃত একটি সঙ্গীত নমুনাস্বরূপ এই স্থানে দেওয়া গেলঃ—
"আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে।
সখীরে, পরাণ বন্ধে ছাড়িয়া গেল আমারে॥ (ধুয়া)
বৃন্দাবনে মধুপুরে হয় গো রসের খেলা।
তাহে হয় মদনজ্বালা হায় হায় হায়॥
এগো শুক্না কমল শুকাইয়া গেল, পায় না মদু ভমরায়॥
মধুপুরে গেলা হারি না আসিলা আর।
হইল গোকুল অন্ধকার হায় হায় হায়॥
এগো করণে সুখ চারিণী টুরে ভ্রমর নিরলে।
দৈখোরা পাগলে বলে আল্লার নাম সার।
মিছা ভবের বাজার হায় হায় হায়।
কি জোবাব দিবায় মনা! কবর হাসরে॥"

১১১. ১৩১৮ বাং কার্ত্তিকের ১ম পক্ষের "প্রভাতে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিবাস মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে জীবনচরিত ও টীকায় উল্লেখিত সঙ্গীতটি উদ্ধৃত হইল।

বলিলেন—"এটা কি অপদার্থ!" উত্তরে ধূলি—ধূসরিতাঙ্গ নিমাই বলিলেন—"ভাল, ভোজন সময় দেখাইব।" মুরারি আর দৃকপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

মুরারির একথা আর মনে নাই। তিনি আহারে বসিয়াছেন, ভোজন পূর্ণ হইয়াছে প্রায় এমন সময় উলঙ্গ বালক (নিমাই) মুরারির গৃহে উপনীত হইলেন এবং মুরারির থালে প্রস্রাব করিলেন; কি জানি কেন, মুরারি যেন অপ্রতিভ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। নিমাই বলিলেন—"মুরারি! হাত মুখ নাড়িয়া বড় জ্ঞানব্যাখ্যা কর দেখি! জগতের প্রাণাধার হরি যে একমাত্র ভক্তিলভ্য, কই-তাহাত বল না?"

বালকের মুখে এ কি কথা? শুধু তাহা নহে, বালকের বদনমণ্ডল হইতে যেরূপ প্রভা বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহা যেন স্বাভাবিক নহে। মুরারি নিমাইর এই অমানুষী অঙ্গপ্রভা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভোজবাজির ন্যায় কি যে হইল, কি যে দেখিলেন, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! নিমাই চলিয়া গেলে, মুরারির চিন্তাভারাক্রান্ত-চিত্তে উদয় হইল যে নিমাই সাধারণ নব—শিশু নহেন। একথাটি মনে উদয় হইবা মাত্র মুরারি জগন্নাথ-গৃহে গিয়া ধূলিধূসরিতাঙ্গ বালককে (নিমাইকে) পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ইহাতে চমকিত হইয়া মুরারির হাতে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"পুনঃ পুনঃ প্রণামের প্রয়োজন কি, ক্ষান্ত হও; এই শিশুকে তোমার ন্যায় প্রাজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তি প্রণাম না করিলেও দোষ হইবে না।" মুরারি বলিলেন—"আপনার এই পুত্র কি বস্তু তাহা পশ্চাৎ জানিতে পারিবেন; এ বালকের জনকের ন্যায় ভাগ্যবান আর কে আছে?

ইহার পরে যখন নিমাই গঙ্গাদাসের টোলে প্রবিষ্ট হন, তখন মুরারিকে তথায় প্রাপ্ত হইয়া সময় সময় উত্যক্ত করিতে ছাড়িতেন না। মুরারি বিরক্ত হইলেও নিমাইকে কিছু বলিতেন না, তৎপ্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক ভালবাসা ছিল। আবার নিমাই যখনই তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতেন, তখনই যেন তাঁহার দেহ দিয়া এক আনন্দ লহরী চলিয়া যাইত। কোনও দিন সেই ভোজনের কীর্ত্তিটাও মুরারির মনে হইত, ভাবিতেন নিমাই কি দেববালক!

এই যাহা বলা হইল, ইহা স্বয়ং মুরারি লিখিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক অতঃপর নিমাই যখন পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেন, নিমাই যখন অসাধারণ ভক্তরূপে পরিচিত হইলেন, তখন মুরারি চমকিত হইলেন, তাঁহার চিত্তে বালকের সেই ভৎর্সনা বাক্য জাগিল—"জগতের প্রাণাধার হরি যে ভক্তিলভ্য, কই, তাহাত বলনা?" মুরারি পৃথক রহিতে পারিলেন না, আকৃষ্ট হইয়া নিমাইর এক প্রধান ভক্তরূপে পরিণত হইলেন। মুরারি সর্ব্বদা নিমাইর সঙ্গে সঙ্গে রহিতেন, নিমাইর প্রত্যেক লীলাতেই তাঁহারও যোগ ছিল এস্থলে তত্তাবৎ বর্ণনের স্থানাভাব।

মুরারি নিমাইর জন্ম হইতে সকল ঘটনাই দেখিয়াছেন এবং তাহার প্রধান প্রধান লীলার অনুষঙ্গী ছিলেন, এই সকল দৃষ্ট ঘটনাবলী অবলম্বনে ১৪৩৫ শকাব্দে তিনি "চৈতন্য চরিত" নামে এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; গৌরলীলা সম্বন্ধে ইহাই আদি গ্রন্থ। পরবর্ত্তী কবিগণ এই গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চারিতামৃতকার লিখিয়াছেনঃ—

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রন্থিত।
+ + + +
তার এই সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণন করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥" ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস লিখিয়াছেনঃ—

"শ্রীমুরারিগুপ্ত যেবা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥
+ + + +
শ্লোক বন্ধে কৈল পুথি চৈতন্য চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারির মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহো গৌরাঙ্গ চরিত॥"

মুরারি গুপ্ত কেবল সংস্কৃত শ্রীচৈতন্য চরিত রচনা সমাপ্ত[১১২] করিয়াই লেখনী ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার সরস লেখনী মাতৃভাষার সেবায়ও নিয়োজিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় তাঁহার বিরচিত পদাবলী কবিত্বে অতুল্য; প্রাচীন কবি জয়ানন্দ স্বীয় চৈতন্য মঙ্গলে লিখিয়াছেনঃ—

"মুরারি গুপ্ত কবীন্দ্রের কবিত্ব সুশ্রেণী।
পরম অক্ষর তার পদে পদে ধ্বনী॥"

শ্রীহট্টবাসীর ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে যে, যখন বঙ্গভাষা শৈশব অতিক্রম করে নাই, তখন তাহাদেরই স্বদেশবাসী জনৈক মহাত্মা কর্ত্তৃক ইহা পরিপুষ্ট হয়, এবং সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক লীলাগ্রন্থ লিখিবার সূত্রপাত করা হয়।[১১৩]

যদুনাথ কবিচন্দ্র

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাঃ ১ম খঃ ৩য় অধ্যায়ে রত্নগর্ভ আচার্য্যের প্রসঙ্গে যদুনাথের নাম করিয়াছি। কেহ কেহ শ্রীহট্টের বুরুঙ্গাকে ইহার জন্মস্থান বলেন। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার পিতার

"প্রভুর পিতার সহ জন্ম এক গ্রাম।"

এবং শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র যখন বুরুঙ্গা হইতে ঢাকাদক্ষিণ আগমন করিয়াছেন ও এই স্থানেই তাঁহার জগন্নাথাদি পুত্রগণের জন্ম হয়, তখন রত্নগর্ভ-তনয় কবিবর যদুনাথকে ঢাকাদক্ষিণবাসীই বলিতে হইবে।[১১৪] যদুনাথের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে উল্লেখিত হইলেও এস্থলে বলা অসঙ্গত নহে যে কবিচন্দ্রের কবিকীর্ত্তি শ্রীহট্টবাসীর পরম গৌরবের বিষয়। কবিচন্দ্র বঙ্গভাষায় সুললিত পদাবলী লিখিয়া ভক্ত ও সাহিত্যসমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে কবিচন্দ্রের অতুলনীয় পদাবলী সমূহ সংগৃহীত আছে। কবিচন্দ্রের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের ঐতিহাসিক মূল্যও সামান্য নহে, কেননা তিনি দৃষ্টবিষয়ই পদে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবিচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ও তাঁহার পার্ষদপর্য্যায় ভুক্ত ছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে, যথাঃ—

"মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥"

১১২. চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পঞ্চত্রিংশতি বৎসর।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতম্।

১১৩. শ্রীহট্টদর্পণ পত্রে আমাদের লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

১১৪. শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকায় পদকর্ত্তৃবর্গের পরিচয় প্রসঙ্গে সম্পাদক জগবন্ধু ভদ্র বি এ মহোদয় ইহার জন্মস্থান সম্বন্ধে আমাদের মতটি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং মতান্তরের কথাও বলিয়াছেন বলিয়া এস্থলে দ্বিমতেরই উল্লেখ করা গেল।

যশোমন্ত দেব

যখন আসাম প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যের করতলস্থ হয় নাই, তখনও বহু শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ, ভদ্র ও তদিতর জাতীয় অনেক হিন্দু এবং মোসলমান আসাম অঞ্চলে প্রবাস করিতেন, অনেকে আবার সেই স্থানে বিবাহাদি করিয়া রহিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আসাম প্রদেশ অধিকৃত হইবার পরে বহুসংখ্যক ব্যক্তি চাকরী এবং উকালতি প্রভৃতি পেশা উপলক্ষে আসামের নানা স্থানে অবস্থান করিতেন। শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে চাকুরিয়া অনেকেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থান করিতেছেন বটে, কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায়ী উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতি শ্রীহট্টের অধিবাসী কমই দেখা যায়। যাহা হউক, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নৈখাই নিবাসী যশোমন্ত দেব গৌহাটি শহরে উকালতি করিতেন। এই সময়ে মোনশী দ্বীপচাঁদ রায়ও প্রতিপত্তি সহকারে উকিলের ব্যবসায় করিতেন। যশোমন্ত দেব আসামের প্রাচীন উকিলবর্গের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া প্রভূত বিত্ত উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। গৌহাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি রাস্তা "যশমন্ত রোড" নামে প্রায় ৩০ বৎসর হইল পরলোক গত এই প্রতিভাবান ব্যবহারজীবের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ইদানীং শ্রীহট্টে রায় দুলালচন্দ্র দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ শ্যাম, বাবু রাধাবিনোদ দাস প্রমুখ বহু উকিলবর্গের প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা শ্রীহট্টের গৌরবসূচক সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বিদেশে খ্যাতিমান উকিল ইদানীং বড় দেখা যায় না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

জন্মস্থান বিচার

"নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক মহাত্মা রঘুনন্দ ভট্টাচার্য্য তদীয় স্মৃতিগ্রন্থাবলীতে নিজ পরিচয় সম্বন্ধে মাত্র দুইটি কথা বলেন (১) তাঁহার পিতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য এবং (২) তিনি বন্দ্যঘটী কুলের ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্মভূমি কোথায়, সেই সম্বন্ধে তিনি নিজগ্রন্থে কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই।"

"বঙ্গের সারস্বত পীঠ নবদ্বীপ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থান রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। স্থানটি আবার গঙ্গার্তীরবর্ত্তী হওয়াতে বাঙ্গালার নানাস্থানের লোক প্রথমতঃ অধ্যয়নার্থ আসিয়া ভাগীরথীতে নিত্য স্নানার্থ এই স্থানটি অনুকুল মনে করিয়া এই খানেই ঘরবাড়ী বাঁধিয়া অবস্থান করিত। আবার যাঁহারা প্রতিভাশালী পণ্ডিত হইতেন, তাঁহারা আপন দেশে ফিরিয়া গিয়া টোল সংস্থাপন করিলে আশানুরূপ ছাত্র জুটিবে না মনে করিয়া স্বীয় প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সাধনার্থ এই পাণ্ডিত্যের কেন্দ্রভূমিতেই চতুস্পাঠী সংস্থাপন করিয়া পুত্র পৌত্রদিক্রমে এখানেই বসবাস করিতেন।"

"এখন রঘুনন্দন কোন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাই আলোচনার বিষয়। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী নামক জনৈক ব্যক্তি রচিত "নবদ্বীপমহিমা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছেন,—"রঘুনন্দের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। তিনিও নবদ্বীপে একজন স্বার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। হরিহরের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠের নাম যদুনন্দন। যদুনন্দন বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন। হরিহর কুলীন ছিলেন। কুলীনদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ তৎকালে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু হরিহর পুত্রের কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপেই পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের পরই রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ইত্যাদি।" গ্রন্থকার কোথা হইতে এই সকল কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না। তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখা আছে, "আমি নবদ্বীপ নিবাসী।" বাল্যকাল হইতে নবদ্বীপের মহাজনদিগের সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ যতদূর

সঙ্গত বোধ হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে।' ইহাতে এইমাত্র প্রতীত হইতেছে যে রঘুনন্দনের সম্পর্কে উপরিভাগে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী নয়।"

"মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়[১১৫] তদীয় "উদ্বাহ চন্দ্রালোকের" "বিজ্ঞাপন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বন্দ্যঘটীর বংশং পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশঞ্জ জন্মনালস্কৃতবন্তঃ। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গপ্রদেশে তেষাং বংশ্যাঃ সন্তি। পরতন্তু তেষাং নিরাসো নবদ্বীপে জাত ইতি কিংবদন্তী।' ইত্যাদি।"

"শৈশবে পাঠ্যাবস্থায় একদা দৈববাণীর ন্যায় শুনিয়াছিলাম, রঘুনাথের জন্মভূমি শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ উপরিভাগেস্থ্ নবিগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী মান্দারকান্দি নামক গ্রাম। মান্দারকান্দি গ্রামটিতে গিয়া খুঁজ করা হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু ইহাতে আমার বাল্যকাললব্ধ ধারণাটি দূর হইল না।"

"অদ্য প্রায় চারি শতাব্দী অতীত হইল, রঘুনন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতদিন পরে তাঁহার জন্মভূমিতে কেহ তাঁহার সংবাদ রাখিবে এইদেশে এমনটি আশা করা বৃথা। তাঁহার বংশীয়েরা, পূজনীয় তর্কালঙ্কার মহাশয় কথিত শ্রীহট্টের তথা পূর্ব্ববঙ্গের অন্যত্র অবশ্যই আছেন, ইহাতে অসম্ভাব্যতা কিছুই নাই বরং প্রতিপোষক আর একটি উদাহরণ শ্রীহট্ট হইতেই দিতেছি।"

"শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেও আজ পাঁচ শতাব্দীর কথা। আজ যদি অদ্বৈত প্রকাশ প্রভৃতি প্রামান্য গ্রন্থে এই কথাটির উল্লেখ না থাকিত, তবে কি শ্রীহট্টভূমি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান বলিয়া গৌরব করিতে পারিত?"

"তবে কি শ্রীহট্ট রঘুনন্দনের জন্মভূমি নয়? মান্দারকান্দি গ্রাম সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহট্টই যে রঘুন্দনের জন্মস্থান, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। শ্রীহট্ট কিছুদিন আসামভুক্ত হইয়া থাকিলেও ইহা পূর্ব্ববঙ্গেরই একটা প্রকৃষ্ট অংশ; সুতরাং আমার এই ধারণা পূজ্যপাদ তর্কালঙ্ককার মহাশয়ের মতদ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে।"

"এই সিদ্ধান্তের সমর্থক অবান্তর আরও প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথ সমপাঠী ছিলেন—উভয়ে সৌহার্দ্দও বিলক্ষণ ছিল এবং ইহারা উভয়েই শ্রীহট্টীয় সুতরাং এক সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ছিল। রঘুনন্দন বোধ হয় ইহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ, অতএব অল্পবয়সে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নবদ্বীপ পরিত্যাগ করাতে তদীয় জীবন চরিতে রঘুনন্দনের কোন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ পরিত্যাগের পরে যখন রঘুনাথ মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নবদ্বীপাকাশে দেদীপ্যমান ছিলেন, তখন রঘুনন্দনকে তদীয় সম্পর্কে আসিতে দেখিতেছি। "নবদ্বীপ মহিমা" হইতেই তৎসম্বন্ধে একটা গল্প উদ্ধার করিলামঃ—"কথিত আছে রঘুনন্দন আপন পুত্রের উপনয়ন স্বমতে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ উপনয়নের পর তাঁহার পুত্র কোনও কর্ম্মোপলক্ষে রঘুনাথ শিরোমণিকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া প্রথানুসারে তাঁহাকে নমস্কার করেন। কিন্তু শিরোমণি একটু চিন্তা করিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না। বালক পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে জেঠা মহাশয়কে নমস্কার করিলাম কিন্তু তিনি প্রতি নমস্কার করিলেন না। রঘুনন্দন শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। যথাসময়ে শিরোমনি উপস্থিত হইলে রঘুনন্দন তাঁহাকে প্রতি নমস্কার না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা

১১৫. এই প্রবন্ধটী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ, মহোদয় কর্তৃক ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়; সেই প্রবন্ধ হইতে কিয়োদংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। যখন প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয় তৎকালে তর্কালঙ্কার মহাশয় জীবিত ছিলেন এবং নব্যভারতে প্রবন্ধ দিবার পূর্ব্বে লেখক কর্ত্তৃক তাঁহাকে শুনান হইয়াছিল।

করিলেন। তখন শিরোমনি বলিলেন 'ভাইহে, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম তুমি যে মতে পুত্রের উপনয়ন দিয়াছ, তাহাই যদি শাস্ত্রের প্রকৃত মত হয়, তাহা হইলে তোমার তদনুসারে উপনয়ন না হওয়ায়, তুমি নিজে অব্রাহ্মণ রহিয়াছ। সুতরাং অব্রাহ্মণের সন্তান কোন মতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন না। আর যদি তোমার মত যথার্থ শাস্ত্রসম্মত না হয়, তাহা হইলে তোমার পুত্রও এক্ষণে ব্রাহ্মণ হয় নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি তোমার পুত্রকে প্রতিনমস্কার করি নাই।' তদবধি রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্বের উপনয়ন প্রথা অপ্রচলিত হইল। এক্ষণে উপনয়ন প্রাচীন মতেই হইয়া থাকে। এই কাহিনীটি হইতে সূচিত হইবে যে উভয়ের মধ্যে সামাজিক ঘনিষ্ঠতাও ছিল; রঘুনাথ বৈদিক ছিলেন, কিন্তু রঘুনন্দন বন্দ্যঘটীয় ছিলেন, উহাদের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠভাব অন্যত্র অসম্ভব হইলেও শ্রীহট্টের বলিয়াই সম্ভব, কেননা শ্রীহট্টের রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র ভেদ কদাপি ছিল না, এখনও নাই। রঘুনাথ-রঘুনন্দন নামেরই বা কি ঘনিষ্ঠতা। যদি তাঁহাদের বংশগত ভিন্নতা না জানিতাম, তবে জেঠা মহাশয়কে, ছেলের পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদরই ভাবিতাম প্রতিভায়ও উভয়তঃ কি সাদৃশ্য! একই প্রদেশের দুইজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যদি একত্রে ভিন্ন স্থানে যায়, তন্মধ্যে যদি একজন বিষয় বিশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে অপরেও বিষয়ান্তরে তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। ইহা স্বাভাবিক এবং এতন্নিমিত্তও উভয়েই শ্রীহট্টের লোক বলিয়া ধারণা করা অসঙ্গত বোধ হয় না।"

"আর একটি কথা এস্থলে উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীহট্টে—অতি অল্পাংশ ভিন্ন, সেও অতি অল্পদিন যাবৎ প্রবর্ত্তিত—রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত নহে। ইহা বরং রঘুনন্দনের শ্রীহট্টীয়ত্ব প্রমাণিত করে; কেননা ইংরেজী প্রবাদ বাক্যই ইহার সমর্থক। মহাপুরুষেরা স্বীয় জন্মভূমিতে সম্মান লাভ করেন না। ফলতঃ স্বদেশীয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রঘুনন্দন যেমন মহত্ত্ব-লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই স্বদেশীয়দের হিংসামূলে তাঁহার মত নিজের সমাজে প্রচলিত হয় নাই। নৈয়ায়িক শিরোমণির একটি মাত্র ফক্কিকার চোটে সংস্কার তত্ত্বের উপনয়নটা উড়িয়া গেল—রঘুনন্দনের পরম ভাগ্য যে অন্যান্য বিষয় সেই কুশাগ্র বুদ্ধির তর্কের আবর্ত্তে পড়িয়া মারা যায় নাই।"

"আশা করি শ্রীহট্টের পক্ষ হইতে এই দাবিটি সুধী-সমাজে নিতান্ত উপেক্ষিত হইবে না।"

রঘুনন্দন নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক, তাঁহার প্রণীত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব বঙ্গের স্মৃতি ব্যবসায়ীর অবশ্য পাঠ্য।

রঘুনাথ শিরোমণি

(জন্মস্থান বিচার)

রঘুনাথ শিরোমণি ভারত বিখ্যাত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত, ইনি নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মিথিলার প্রধান পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে পরাজয় করিয়া তিনি নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে ইঁহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। উক্ত ৭ম অধ্যায়ের টীকাধ্যায়ে আমরা রঘুনাথের জন্মস্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম, ইহার পরেও এই বিষয় কোন কোন পত্রিকাতে আলোচনা হইয়াছে, ইহার পরেও এই বিষয় কোন কোন পত্রিকাতে আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ যে প্রবন্ধটিতে[১১৬] রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থানের আলোচনাই প্রধানতঃ করা হইয়াছে, তাহা হইতে কিয়দংশ মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে; বলা বাহুল্য যে ইহা জীবনচরিত নহে—জন্মস্থান বিচার মাত্র।

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উপাদান মধ্যে শ্রীহট্টবাসী পণ্ডিতগণের যে সকল সাক্ষ্য বাক্য আছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা নিস্প্রয়োজন—কেন না, তাহা আপাততঃ পক্ষপাত দুষ্ট বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। তাই শ্রীহট্টের অধিবাসী ভিন্ন যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই উল্লেখিত হইতেছে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

সবিনয় নিবেদনমেতৎ ২৫শে শ্রাবণ ১৩২১

※ ※ ※ ※

"রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান শ্রীহট্টই, এরূপ কিংবদন্তী আমরা শিশুকাল শুনিতেছি। অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকটেও এইরূপ শুনিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়গণ সকলেই এরূপ বলেন। তাঁহারাও অধ্যাপক পরম্পরায় এরূপ অবগত হইয়াছেন। ইঁহার বিরুদ্ধে কথা এ যাবৎ আর শুনি নাই। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ (মহামহোপাধ্যায়) মহাশয়ও এরূপ বলিলেন। তিনিও নিজ অধ্যাপকের নিকট এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের নিকট হইতে এরূপ অবগত আছেন। আমাদের কলেজের অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকট জানিলাম তাঁহারাও এই কিংবদন্তী অবগত আছেন এবং বিশ্বাস করেন।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সোসাইটি হইতে প্রকাশিত কুসুমাঞ্জলির ভূমিকার একথা লিখিয়াছেন। সেই লেখা এইরূপ।

রঘুনাথ শিরোমনিঃ প্রসিদ্ধ স্মার্থো রঘুনন্দনশ্চ পূর্ব্ববঙ্গ বাস্তব্য আসীৎ। গদাধরোহপ্যুত্তর বঙ্গ বাস্তব্যঃ। পশ্চান্নবদ্বীপে অধীত্য তত্রৈব নিবাসং চক্রুঃ। তদেবং নবদ্বীপে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আসন্ তে প্রায়োবঙ্গদেশীয়া এবেতি জ্ঞায়তে।"

"রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টবাসী, এই কিংবদন্তী অবাধে পুরুষানুক্রমে সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান ভাবে প্রচলিত আছে। ইহার বিরুদ্ধে কোনও গ্রন্থের উক্তি বা প্রবাদের কণিকামাত্র নাই। এই অবস্থায় এই কিংবদন্তী প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত তর্কদর্শন তীর্থ মহাশয়ের এইরূপ মত।

※ ※ ※ ※

অনুগ্রাহ্য শ্রীযামিনীনাথ শর্ম্মণঃ।"

"ইনি ময়মনসিংহের পণ্ডিতরত্ন (সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত যামিনী নাথ তর্কবাগীশ মহাশয়। মহামহোপাধ্যায় দর্শনতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীও ত্রিপুরা জেলায়। অর্থাৎ কেহই শ্রীহট্টের লোক নহেন। ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী এখন পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতগণ কি বলেন দেখা যাউক।

"শ্রীহট্টের ইটাবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ মহাশয় বোধ হয় প্রাগুক্ত লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে বিচলিত হইয়া এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করেন। কিয়দ্দিন হইল তিনি লিখিয়াছেন—"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন রঘুনাথ শ্রীহট্টের কি না নিশ্চয়ই জানিনা, কিন্তু তিনি পূর্ব্বদেশীয় ছিলেন এবং অতি অল্প

১১৬. "প্রতিভা" নামক মাসিকপত্রের জনৈক লেখক রঘুনাথকে শ্রীহট্টের লোক বলিতে অনিচ্ছুক হইয়া ঐ পত্রে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন। শ্রীহট্টবাসী দুই লেখক তাঁহার প্রবন্ধের উপযুক্ত উত্তর আনন্দবাজার ও সুরমা পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন। ঐ সকল বাদ প্রতিবাদ দৃষ্টে সৌরভ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব সরস্বতী মহাশয়কে প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞাসিলে তিনি যে উত্তর প্রবন্ধ ১৩২১ বাং মাঘ মাসের সৌরভে লিখেন তাহার কথাই বলা যাইতেছে। (ঐ প্রবন্ধই দ্রষ্টব্য।)

বয়সে জননীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। একথা প্রবাদরূপে জানা আছে।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, রঘুনাথ পূর্ব্বদেশীয় রাঢ়ী শ্রেণীর লোক বলিয়া তাঁহার ধারণা। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন না কি একদা শ্রীহট্টের কোনও মেধাবী ছাত্রকে 'রঘুনাথ শিরোমণির দেশের উপযুক্ত ছাত্র' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

"দেখা গেল যে, পশ্চিম বঙ্গের মনীষিগণ রঘুনাথ পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া জানেন; এবং পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে শ্রীহট্টের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহাই স্বাভাবিক; পশ্চিমবঙ্গের নিকট সকল জেলার ব্রাহ্মণই এক—কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন অংশের খবর রাখিবারই কথা।"

আলোচনা—

রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেও তৎসম্বন্ধে দুইটি অবান্তর বিষয়ে শ্রীহট্টবাসী কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—তন্মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছেন। সন্ধিগ্ধবিষয়ে উদাসীন থাকিলে ঐতিহাসিকের প্রকৃত কর্ত্তব্য করা হয় না, তাই তদ্বিষয়ে এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি—যদিও পূর্ব্বকথিত প্রতিবাদে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। সন্দেহের বিষয় দুইটি—

(১) রঘুনাথ শিরোমণি কাত্যায়ন গোত্রীয় ছিলেন কি না;

(২) তিনি কাত্যায়ন গোত্র হইলেও রঘুপতির ভ্রাতা ছিলেন কি না।

প্রথম সন্দেহের কারণ এই যে "কাত্যায়ন খনিজ মণেঃ" ইত্যাদিক যে শ্লোকটির অস্তিত্ব ও মৌলিকতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া উল্লেখিত বিশিষ্ট ব্যক্তি হতাশ হইয়াছেন। তিনি জানিয়াছেন যে সংস্কৃত কলেজের ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের প্রবীন অধ্যাপকগণও ঐ শ্লোকটি অবগত নহেন বলিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় সন্দেহের কারণ এই যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকমল শাস্ত্রী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের বংশবিবরণের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তদীয় বংশলতিকা যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে তিনি স্বয়ং রঘুপতি হইতে নবমপুরুষ মাত্র। শতাব্দীতে তিন পুরুষ কল্পনা করিলেও রঘুপতি মাত্র ৩০০ বৎসরের লোক হইয়া দাঁড়ান, তাঁহার অনুজ রঘুনাথ কিরূপে চারিশত বৎসরের শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর সমপাঠী হইতে পারেন?

প্রথম বিষয়টি অভিনব, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়া বহু লেখাপড়া হইয়াছে। যাহাহউক এস্থলে উভয় সম্বন্ধে মীমাংসার কথা বলিতে হইল।

শ্রীযুক্ত রামকমল শাস্ত্রী মহাশয় হইতেই "কাত্যায়ন খনিজমণেঃ" ইত্যাদিক শ্লোক পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে উপরিউক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই ঃ—

(১) যে পুস্তকে তিনি ঐ শ্লোকটি পাইয়াছেন, সেই পুস্তকের নাম "ক্ষণভঙ্গুর-বাদ-গদাধরী টীকা"। ইহার স্বত্ত্বাধিকারী পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্ন-যিনি নবদ্বীপের স্বর্গীয় ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন মহামহোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। ঐ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথমেই ঐ শ্লোকটী রহিয়াছে। অতএব অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ শ্লোকের প্রামাণ্য অবধারণ করিতে পারেন।

এস্থলে বক্তব্য যে রঘুনাথ কাত্যায়ন গোত্রীয় হইলে শ্রীহট্টের না হইয়া যান না। কেননা কাত্যায়ন গোত্র শ্রীহট্ট ভিন্ন দেখা যায় না। অন্যত্র দুএক ঘর যদি থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্ট হইতেই গিয়াছেন; একথা বলিয়া থাকেন। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।)

(২) পুরুষ সংখ্যা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তিন পুরুষে শতাব্দী রাজরাজড়াদের সম্বন্ধে খাটিলেও, যে বংশে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়েনের বিধান প্রচলিত ছিল, তাহার সম্বন্ধে খাটে না। তাঁহারা ৩৫/৪০ বৎসরের কন্যা বিবাহ করিতেন, ইঁহাদের সন্তান হইতে আরো ৫/৭ বৎসর হইত, আর প্রথমেই যে পুত্র সন্তান হইত, তাহাও নহে। অথচ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিবার প্রয়োজন হইলে পঞ্চাশোর্দ্ধোও সন্তান জন্মিত। এসব কারণে সুদীর্ঘজীবী সংযমী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধারায় শতাব্দী দুই পুরুষে গণনা করিলে কোনও অসম্ভাবিত কিছু হইল বলিয়া মনে করা যায় না। এরূপস্থলে দুই পুরুষে শতাব্দী গণনাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। দেবীযুদ্ধ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের কাল বিচারপূর্ব্বক ইহার উদাহরণ সহ এ বিষয়ে আমাদিগকে লিখিয়াছেন—"তিন পুরুষে শতাব্দীর গণনা আধুনিক প্রণালী। পূর্ব্বকালে লোক এত অল্পায়ু ছিল না।" আমরাও ইহার উদাহরণ পাইতেছি। শ্রীমহাপ্রভুর পিতৃবয়স্ক প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের ২য় পুত্র কৃষ্ণমিশ্র ১৪০৭ শকে (অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর জন্ম শকাব্দে) জাত হন। ইহার একটি বংশশাখায় বর্ত্তমানে ৯/১০ পুরুষ চলিতেছে।[১১৭]

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত "প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" (চরিত) গ্রন্থের পরিশিষ্টবর্ণিত ঐ অদ্বৈত বংশেরই অপর একটি শাখার উদাহরণ উল্লেখিত হইতে পারে। শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক অদ্বৈতপুত্র বলরাম মিশ্র হইতে ঐ শাখায় বর্ত্তমানে ৯ম পুরুষ মাত্র চলিতেছে।[১১৮] শ্রীমহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর মিশ্রের বংশ তালিকা "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ২য় ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে শ্রীচৈতন্য জননী শচীদেবীর অনুজ বিষ্ণুদাসের বংশে ৯ম পুরুষ চলিতেছে।"[১১৯]

হিন্দু ব্রাহ্মণই বা বলি কেন, কোন কোন মোসলমান বংশেও তাদৃশ পুরুষ সংখ্যায় ন্যূনতা দৃষ্ট হয়। (অবশ্য এসব বংশে সাধু সংযমী পুরুষসংখ্যার বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।) শ্রীহট্ট পৃথিমপাশার মৌলবী আলী আমজাদ খাঁর পূর্ব্বপুরুষ সকিসালামত ৯০৬ বঙ্গাব্দে (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে) এদেশে আসিয়া ইটারাজ সুবিদ নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন; ঐ বংশেও ৯ম পুরুষমাত্র চলিতেছে।[১২০]

পরিশেষে বলিতেছি যে এ বিষয়ে আমরা যথাশক্তি স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গেলাম, যদি কোনও ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ গবেষণা দ্বারা আমাদের মত খণ্ডন করেন, ইহাতে সত্যপ্রকাশের সহায়তাই হইবে। তবে আমাদের যুক্তিতর্কে ছিদ্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক রঘুনাথকে শ্রীহট্টে হইতে সরাইয়া ফেলিবার একটা গূঢ়াভিসন্ধি দেখিলে আমরা কেন, শ্রীহট্টের সুসন্তান মাত্রেই যে ব্যথিত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

১১৭. শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র (১) কৃষ্ণ মিশ্র, তৎপুত্র (২) রঘুনাথ, তৎপুত্র (৩) যাদবেন্দ্র, তৎপুত্র (৪) রাম গোপাল, তৎপুত্র (৬) গৌরচন্দ্র, তৎপুত্র (৭) আনন্দ তর্কভূষণ, তৎপুত্র (৮) রামচন্দ্র গোস্বামী, তৎপুত্র (৯) শ্রীমৎ রাধিকা নাথ গোস্বামী, তৎপুত্র (১০) শ্রীমহৎগৌরবিনোদ গোস্বামী প্রভু।

১১৮. অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র (১) বলারাম, তৎপুত্র (২) দেবকীনন্দন, তৎপুত্র (৩) বংশীবদন, তৎপুত্র (৪) জগদীশ, তৎপুত্র (৫) কৃষ্ণকান্ত, তৎপুত্র (৬) মোহনকৃষ্ণ, তৎপুত্র (৭) গোপীমাধব, তৎপুত্র (৮) শ্রীমৎগৌরবিনোদ, তৎপুত্র (৯) শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী প্রভু।

১১৯. শ্রী বিষ্ণু দাসের পুত্র (১) গোপাল দাস, তৎপুত্র (২) কবি রাজীবলোচন, তৎপুত্র (৩) রামকৃষ্ণ তৎপুত্র (৪) রাম নারায়ন, তৎপুত্র (৫) শ্রীরাম, তৎপুত্র (৬) রঘুনাথ, তৎপুত্র (৭) রাম জগন্নাথ, তৎপুত্র (৮) গঙ্গাপ্রসাদ, তৎপুত্র (৯) রাম কানাই ন্যায়পঞ্চানন।

১২০. যথা— (১) সকিসালামত, তৎপুত্র (২) খাঞ্জা খাঁ, তৎপুত্র (৩) শামস্ উদ্দিন, তৎপুত্র

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগে ইটার প্রসিদ্ধ বিদ্যাবিনোদের কথা বলা গিয়াছে, সেই বংশে রঘুনাথের জন্ম হয়। ছয় বৎসরের সময় রঘুনাথ পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়েন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হয়, তদনন্তর তাঁহার অধ্যয়ন আরম্ভ। কিছুদিন মধ্যেই তিনি ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভপূর্ব্বক অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন।[১২১] বাল্যবধিই তিনি হরিভক্ত; একদিন কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বলিলেন যে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার বৈষ্ণবমত পোষণ করা অনুচিত। এতদুত্তরে রঘুনাথ যাহা বলেন, অধ্যাপকের তাহা মনোমত না হওয়ায়, উভয়ে এতদ্বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়, ফলে তদবধিই তাঁহার অধ্যয়নের শেষ হয়।

আত্মীয়বর্গ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদের কৌলিক গুরুবংশীয় এক ব্যক্তিকে আনাইলেন, সেই বৃদ্ধ কুলগুরু বীরাচারী হইলেও সিদ্ধ মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, তিনি রঘুনাথকে অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই যখন রঘুনাথকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না, তখন বলিলেন—"বাছা, আমি কৌলিক সিদ্ধমন্ত্রটি তোমাকে দিতেছি, ইহা জপ করিলেই তুমি শক্তিমন্ত্রের মহিমা বুঝিতে পারিবে, তারপর যাহা মনে হয় করিও।"

রঘুনাথ বৃদ্ধ হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, জপিতে জপিতে তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে শ্যামমূর্ত্তির অত্যুজ্জ্বলরূপ ফুটিয়া উঠিল, পরম উৎসাহে তিনি আরও জপ করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেই মধুরমূর্ত্তি জগদ্ব্যাপিনী; অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সেই বরাভয়দাত্রী মূর্ত্তি বিরাজিতা।[১২২]

মন্ত্রশক্তির অব্যর্থতা প্রত্যক্ষীভূত হইলেও উদ্বেগ গেলনা, শক্তিমন্ত্রে বিশ্বাস জাত হইলেও, হৃদয়ের বদ্ধমূল ভাব মন হইতে একবারে দূর হইল না।

বয়স ২৫ বৎসর মাত্র, তখন চিন্তাকুলিত চিত্তে অনেক খানা পুঁথিপত্র লইয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। মনুমুখের নিকটবর্ত্তী ঢেউপামা নামক স্থানে "খেয়া" পার হইবার কালে দেখিলেন এক পরমলাবণ্যবতী বিধবা বালা জল লইতে আসিতেছে।

রূপজ মোহ বড় ভয়ঙ্কর, ইহাতে বিদ্বান্ ব্যক্তিও আকর্ষিত হন, সাধকের বহুদিনের পরিশ্রম পণ্ড হইয়া পড়ে। যুবক রঘুনাথের চিত্ত রূপের ফাঁদে ঠেকিল, তাঁহার চিত্তফলকে সে রূপের ছায়া পতিত হইল, তিনি বাঁধা পড়িলেন। আর তাঁহার ভ্রমণে যাওয়া হইল না, ফিরিয়া দাড়াইলেন ও যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিত তাবৎ তদীয় পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, এ সময় গৃহী অতিথি ফিরায় না, রঘুনাথ সেই গৃহে রাত্রিবাসের অনুমতি পাইলেন। পিতৃগৃহে সেই বিধবা কন্যাই অতিথি পরিচর্য্যার ভার পাইল।

রূপবিমুগ্ধ রঘুনাথের হিতাহিত জ্ঞান অনেকটা লোপ পাইয়াছিল, তাই অবসর বুঝিয়া পরিচর্য্যানিরতা সেই বিধবাকে মনোভাব বলিতে লজ্জা অনুভব করেন নাই। রঘুনাথের ভাব দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া যুবতী একটু হাসিল ও বলিল—"ঠাকুর বড়শী দিয়া মাছমারা দেখিয়াছেন তো, বড়ই উৎসাহে মাছ 'টোপ' গিলিতে গিয়া প্রাণ দেয়। আপনি জ্ঞানী হইয়া পাপ-

১২১. "যে যে অধ্যাপক আছে করেন পঠন।
অল্পদিনে সর্ব্ববিদ্যা করিলা শিক্ষক॥"—রঘুনাথ লীলামৃত (মুদ্রিত)

১২২. "পঞ্চ মকারেতে দেবীর করিলা পূজন।
সিদ্ধমন্ত্রগুণে দেবী দিলা দরশন॥"

বড়শী স্পর্শিতে যাইতেছেন কেন?"[১২৩] রঘুনাথ শুনিয়াও শুনিলেন না, তাঁহার অন্তরে বাসনার অনল জ্বলিতেছে; সামান্য দু'টি কথায় তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তিনি রমণীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন এবং তদীয় স্থৈর্য্য ও পবিত্রতা প্রভৃতি দর্শনে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

প্রভাতে রঘুনাথের বিদায় কালে গৃহস্বামী আগন্তুকের সঙ্গে এক বোঝা পুঁথি দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে, তিনি এত পুঁথি লইয়া কোথায় যাইতেছেন। এ প্রশ্নে রঘুনাথের বড়ই সুবিধা হইল, তিনি উত্তর করিলেন যে, তিনি বিদ্যার্থী, থাকিবার স্থান অন্বেষণ করিতেছেন, গৃহস্বামী স্থান দিলে এখানে থাকিয়াই এসব আলোচনা করিবেন। সরল গৃহস্থ স্বীকৃত হইলেন, ও রঘুনাথ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে বর্ম্মানিবাসী শ্যামকিশোর ঘোষ সেই গৃহস্থের বাড়ীতে আসিলেন। শ্যামকিশোর সহজধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন,[১২৪] তিনি রঘুনাথের ভাবভঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন যে, গৃহস্থ তনয়াতে তিনি আকৃষ্ট। শ্যামকিশোর তখন নির্জ্জনে রঘুনাথকে বলিলেন "ঠাকুর, যে বিষ প্রাণনাশক, সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থায় তাহা 'অমৃত' সদৃশ হিতপ্রদ হইয়া থাকে, তুমি যে বাসনানলে পুড়িতেছ, সুপথে চালিত হইলে তাহাও শান্তিপ্রদ হইতে পারে; যদি আত্মহিত কামনা কর, তবে সদ্বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, দুলালীতে বৈদ্যরাজ তিলকচন্দ্রের[১২৫] কাছে গেলে সুব্যবস্থা পাইবে।"

রঘুনাথ বীরাচারী ছিলেন, শ্যামকিশোর ঘোষের নিকট সহজধর্ম্মের কিছু কিছু তথ্য অবগত হইয়া, তাঁহার ভালই বোধ হইল; উভয় মতে অনেকটা সাদৃশ্যও দেখিতে পাইলেন, কাজেই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দুলালীতে চলিলেন। শ্যামকিশোর ঘোষ তখন সেই গৃহস্থকে নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিয়া কন্যাসহ দুলালীতে পাঠাইলেন। গৃহস্থ শ্যামকিশোরকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। দুলালীতে তিলকরাম গুপ্তের সহিত রঘুনাথের দেখা ও কথাবার্ত্তা হইল, রঘুনাথ তাঁহার নিকট সহজধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, সেই বিধবাই তাঁহার সাধনের সহায়স্বরূপ নির্দ্দেশিত হইলেন।[১২৬]

ইতিপূর্ব্বে তিলকরাম শিরোমণি দুলালীর নারায়ণনামক জনৈক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাবংশজাত রঘুনাথকে শিষ্য করায় ব্রাহ্মণসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণবর্গ ইটার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত "সার্ব্বভৌমকে" মুখপাত্র রূপে লইয়া বিচার করিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিলকরামের সহিত তাঁহাদের বিচার হইল না, রঘুনাথের কূটকৌশলে দ্বারদেশ হইতেই তাঁহাদিগকে একরূপ পরাজয় পাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।[১২৭] অতঃপর রঘুনাথ ঢেউপাশাতে প্রত্যাগমন করেন; আর তিনি গৃহে না গিয়া সেই শূদ্র তনয়াকে লইয়া সহজভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

---

১২৩. "বড়শী গ্রাস করে মৎস্য আধার দেখিয়া
পাছে প্রাণ যায় তার কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
সেইরূপ পাপ বর্শী প্রকৃতি সকল।
জ্ঞানী হইয়ে তুমি কেন হইলে পাগল॥"
—রঘুনাথ লীলামৃত।

১২৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৮ম অধ্যায়ে ইহার কথা দেখ।

১২৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৫ম ইহার কথা দেখ।

১২৬. সহজধর্ম্মের মর্ম্ম শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ১ম ভাগ ৮ম অধ্যায়ের সংক্ষেপে বলা গিয়াছে। স্ত্রীলোকের সাহায্য-সাপেক্ষে বলিয়া এ ধর্ম্ম-সাধনে ফল লাভ করা সাধারণের পক্ষে এক রূপ অসাধ্য। সুতরাং ইহাতে নানারূপ ভ্রষ্টাচার ও পাপাচারের নিদর্শন সর্ব্বদাই সীমিত হইয়া থাকে।

১২৭. "দ্বারীরূপী প্রভুর কাছে পণ্ডিতের গণ। তর্কেতে হারিয়া সবে করিলা গমন॥" রঃ লীঃ।

দেশের লোক রঘুনাথের ঈদৃশ ব্যবহারের ব্যথিত—কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মনুতীরবর্ত্তী দুর্ল্লভপুরের প্রাণকৃষ্ণ বসু তন্মধ্যে একজন। প্রাণ কৃষ্ণ যুক্তি ও শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ব্যবহারের অবৈধতা প্রদর্শন করিলে, তিনিও তাঁহাকে সহজধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বলিলেন; তাহাকে প্রাণকৃষ্ণের মন ফিরিয়া গেল এবং তিনি রঘুনাথের নিকট দীক্ষিত হইয়া পড়িলেন।

একদা একটা সর্প রঘুনাথকে দংশন করিয়াছিল, সাধক রঘুনাথের তাহাকে কিছুই হয় নাই; তদ্দৃষ্টে লোকে রঘুনাথকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞান করিতে লাগিল; বৃন্দাবনদাস নামক এক ব্যক্তি এই সময় তাঁহার শিষ্য হন। একদা ভানুগাছের রামপাশা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ তনয়াকে দেখিয়া এই বৃন্দাবন ইহাকে গুরুর উপযুক্ত পাত্রী মনে করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে, কন্যার পিতা মদনরাম সম্মত হন। বৃন্দাবনদাস ঢেউপাশাতে গিয়া এই সম্বন্ধে প্রসঙ্গ প্রকাশ করিলে বিধবাসাধিকা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ফলে রঘুনাথ তাঁহার আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিবাহ করিলেন।

যে বিধবার কথা বলা হইল, সেই বিদুষী রমণীর নাম শ্রীমতী; শ্রীমতী সহজধর্ম্মে সুবিজ্ঞা ছিলেন, তিনি সহজধর্ম্মমূলক পদ বাঙ্গালায় রচনা করিয়া গিয়াছেন; রঘুনাথলীলামৃত গ্রন্থে তাঁহার দুই একটি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রঘুনাথের বিবাহের পর শ্রীমতী অধিকদিন ছিলেন না, রঘুনাথকে সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। রঘুনাথকৃত সহজধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রঘুনাথলীলামৃতে ইহার কৃত কয়েকটি পদও পাওয়া যায়।

শ্রীমতীর মৃত্যুর পর রঘুনাথ অনেকদিন জীবিত ছিলেন, তিনি অনেক ব্যক্তিকে সহজধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তৎকর্ত্তৃক এতদঞ্চলে সহজধর্ম্মের মত বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। সহজধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সর্প লইয়া খেলা করিতে গেলেই পদে পদে প্রাণহানির সম্ভাবনা। জলে নামিবে অথচ বস্ত্র ভিজিবে না ইহা যেমন অসম্ভব; অপরিপক্ক অসিদ্ধ সাধারণ লোকের পক্ষে তদ্রূপ স্ত্রীলোক অবলম্বনে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়ারও সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই সহজ ধর্ম্ম বর্জ্জনীয় ও ইহা সামাজিক ধর্ম্ম নহে।

রঘুরাম

শ্রীহট্টের অন্তর্গত জলডুবগ্রামে-রাঢ় জাতির বাস, ইঁহাদের মধ্যে নিধিরামের বংশে প্রায় দশ বার পুরুষ চলিতেছে। নিধিরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সূর্য্যরামের শিবপ্রতিষ্ঠা ও ভূমি দানাদি সৎকার্য্যের ভূমি উদাহরণ পাওয়া যায়। সূর্য্যরামের পুত্রের নাম রঘুরাম।

রঘুরামের শারীরিক অসীম বলের কথা অদ্যাপি লোকমুখে শুনা যায়। যখন রঘুরামের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, সেই সময়ে একটা প্রকাণ্ড শূকর তদীয় যষ্ঠির আঘাতে নিহত হয়। ইহার পর ঘটনা বশতঃ ৭/৮ হাত উচ্চ একটা বটবৃক্ষ লম্ফদানে ডিঙ্গাইয়া যাওয়ায় সাধারণে তাঁহাকে "ডিঙ্গাইরাম" এই উপনামে ডাকিত।

একদা ঢাকাদক্ষিণের রণিকালিতে একটা প্রচণ্ড ব্যাঘ্রকে জালাবদ্ধ করা হয়, তথায় উপস্থিত কোন ব্যক্তিই সেই ভীষণ পশুর উপরে অস্ত্রাঘাত করিতে সাহস করে নাই। শ্রীহট্ট যাওয়ার পথে এতদ্দৃষ্টে রঘুরামের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে, রঘুরামকে হাসিতে দেখিয়া সকলেই তাহাকে বাঘ মারিতে অনুমতি দেয়। তাহার একগাছি "জাঠি" ছিল, ঐ জাঠির বাটও লৌহ নির্ম্মিত ছিল। কথিত আছে যে ছয়জন লোক এই লৌহ জাঠি আনিতে প্রেরিত হইয়া কষ্টে বহন করিয়া আনিয়াছিল। রঘুরাম জাঠি লইয়া জালের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক এক আঘাতেই ব্যাঘ্রকে বধ করিলে, সকলেই তদীয় সাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

একবার পঞ্চখণ্ডের স্বর্গীয় বাসুদেবের রথটানাকালে দৈববশতঃ টানের বেগে রথের কিছুটা গড়াইয়া, যে দীঘীর তীরে রথটানা হইতেছিল, উহার উপরে চলিয়া যায়। কি উপায়ে রথকে ঠিক রাখিয়া যথাস্থানে আনা যাইবে, যখন সকলেই এই পরামর্শে ব্যস্ত ছিল, তখন রঘুরাম কাহাকেও কিছু না বলিয়া জলে নামিয়া, ঠেলিয়া একাই রথ উঠাইয়া দেওয়াতে দর্শকমাত্রই বিস্মিত হইয়া রহিল।

একদা সন্নিকটবর্ত্তী গোলাপরায়ের বাজারের অংশ লইয়া দুই বিরুদ্ধ দলে হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, রঘুরাম একপক্ষে উপস্থিত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী বাঁশ ঝাড় হইতে একটা বরুয়া বাঁশ একটানে উৎপাটিত করিয়া লইলে বিপক্ষগণ তাহার পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

রঘুরামের যে জমিজমা ছিল, তাহার রাজস্ব না দেওয়াতে তাঁহাকে শ্রীহট্টে নেওয়া হয়, কিন্তু রঘু রাজস্ব পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে, তখনকার একতর ভীষণ দণ্ড, তক্‌তার নিকট চাপ দিলেও তাহার কোন কষ্টই হয় নাই। তাহার বলের পরিচয় পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশাগত এক "পলওয়ানের" সহিত তাহাকে "কুস্তি" করিতে বলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি ইহার শরীরের গঠন ও দৃঢ়তা দৃষ্টে শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া রঘুর অধিকৃত ভূমির রাজস্ব রেহাই দেন। রঘুনাথের ভ্রাতার নাম ছিল রামনারায়ণ, ইহার ৭ম পুরুষে রায়চাঁদের উদ্ভব, রায়চাঁদের সময়ে রঘুরামের অর্জ্জিত সম্পত্তি কিছুই ছিল না, রায়চাঁদের শ্রম ও সততামূলে অবস্থার সুপরিবর্ত্তন ঘটে, ইহার প্রপৌত্র হইতে রঘুরামের কথা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

রতনমণি সাহাজী

রতনমণি সাহাজী শ্রীহট্টশহরবাসী সাহুবংশীয় একজন ব্যবসায়ী; ইঁহার চরিত্র অতি মার্জ্জিত ছিল। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস "বাণিজ্য যে করে তার সত্য কথা নাই।" ইদানিং অনেকত্র তাহা দৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বে ব্যবসায়িবর্গের ব্যবহার প্রায়শঃ ইহার বিপরীত ছিল। এজন্য "মহাজন" ও "সাধু" ইত্যাদি সততাসূচক নাম প্রাপ্ত হন। রতনমণি যদিও বড় বেশীদিনের ব্যক্তি নহেন, তথাপি তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বকার বণিগ্বর্গের ন্যায় নির্দ্দোষ ও সততাময় ছিল।

রতনমণি পরম সাধু ছিলেন, কৃষ্ণনাম শ্রবণমাত্র তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিত, কৃষ্ণের মহিমাসূচক কোন সঙ্গীত শুনিলে চক্ষে জল আসিত। শ্রীভগবানের প্রতি কিরূপ আশক্তিতে এ ভাব জন্মে, সংসারের কীট আমরা তাহার কি বুঝিব? যে কৃষ্ণ নাম লয়, রতনমণির গৃহে তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল।

ঢাকাদক্ষিণের শ্রীমহাপ্রভুবিগ্রহ দর্শনে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, প্রতিবৎসর বারুণী, ঝুলন ও রথে তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন। তদ্ব্যতীত যখনই কোন একটা উৎকৃষ্ট ফল পাইতেন, অমনি তাহা লইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে দিতে আসিতেন। তখন পরিপুষ্ট পীতবর্ণ কদলী, কখন বা সরস সুপক্ক আম্র, কোল দিন একটা বৃহৎ কায়ফল (পেঁপে) লইয়া ঢাকাদক্ষিণে যাইতে প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যাইত।

একবার রথের পূর্ব্বে তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেবারে রথের দিন, ঢাকা দক্ষিণে তাঁহার যাওয়া হইল না, মনে বড়ই অশান্তি উপস্থিত হইল। রথ হইতে ঠাকুর না নামান পর্য্যন্ত তিনি অভুক্ত থাকিতেন ; এবার সে নিয়মে অভুক্ত অবস্থায় ঠাকুর তুলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি তুলসী তলায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার ভাবের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, ত্রস্তভাবে "আহা কি হইল" বাক্য উচ্চারণ করিয়াই "রক্ষা হইল" বলিয়া স্থির হইলেন। নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা "কি, কি," বলিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর করিলেন—"ভাবনা বশে শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে একটা অনুচিত চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল।"

সাহাজীর প্রতি সঙ্গীদের একব্যক্তির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, সে একথাটি ভুলিয়া না গিয়া দেশে আসিলে যাহারা ঢাকাদক্ষিণের রথে গিয়াছিল, তাহাদের কাছে সন্ধান পাইল যে, রথের সময় কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না, কিছু হয় নাই বলিয়া সকলেই বলিল। একব্যক্তি বলেন—"সামান্য একটা ঘটনা হইয়াছিল মাত্র, প্রভুর মাথার মুকুটটা পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু পড়ে নাই ; একব্যক্তি হঠাৎ ধরিয়া ফেলিল।" সেই ব্যক্তি অতঃপর ঢাকাদক্ষিণে গিয়াও অনুসন্ধানে এই কথাই জানিতে পারে। বৃন্দাবনে তুলসীতলায় ধ্যানাবিষ্ট সাধুর উচ্চারিত বাক্যদ্বয়ের অর্থ তখন বুঝিতে পারা গেল। ঐকান্তিক ভক্তের ভাবনেত্রে সময়ে সময়ে কিরূপে দূরবর্ত্তী ঘটনা-চিত্রের ছায়াপাত হয়, তাঁহারাই তাহা বলিতে ও বুঝিতে পারেন।

মহাপ্রভুর নাটমন্দির পূর্ব্বে পাকা ছিল না, ইহা পাকা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় ; কিন্তু সেই গৃহখানা অতি সুন্দর ছিল বলিয়া মিশ্রঠাকুরগণ উহা ভাঙ্গিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েক বৎসর পরে পাহারাদারের মশালের আগুনে গৃহখানা ভস্মিভূত হয়। এই সময় সাহাজীর আর্থিক অবস্থা অনেকটা মলিন হইয়া পড়িয়াছিল, হাতে টাকা ছিলই না কিন্তু তাহাতে তিনি নিরস্ত হইলেন না ও সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কতকখানা ইষ্ট লইয়া উপস্থিত হইলেন নাট মন্দিরের "নেউ" বা ভিত্তিস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। কাজ সেই পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল।

তাহার কিছুকাল পরে তিনি কতক তৈল আনাইতে টাকা পাঠাইলেন। মনে সঙ্কল্প রহিল যে এই বারে যত লভ্য হইবে, তৎসমস্ত মন্দির নির্ম্মাণে অর্পিত হইবে। কিন্তু ছাতকের বাজারের ভাটিতে আসিয়াই নৌকা ডুবিয়া গেল!

সাহাজীর আশা পুরিল না, তখন তাঁহার কাছে এই সংবাদ আসিল, তিনি "প্রভুর যেমন ইচ্ছা" এই মাত্র বলিলেন। পরে শীত ঋতুর অবসানে নদীর জল যখন কমিয়া গেল, তখন সাহাজীর ডুবা-নৌকার "গলুইটি" জলের উপরে দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিল। নৌকা চেষ্টা করিলে উত্থোলিত হইতে পারে বলিয়া সংবাদ পাইয়া তিনি একটি লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই লোকটি "ডুবারি" দ্বারা অনুসন্ধান লইয়া জানাইল যে, বোঝাই নৌকাখানা পলিমাটিতে বসিয়া রহিয়াছে ; মালপত্রও নষ্ট হয় নাই, তুলাইতে পারিলে উঠিবে। সাহাজীর তখন স্বয়ং তথায় গিয়া বহুলোক লাগাইয়া সন্তুপর্ণে সুকৌশলে অগ্রে তৈল ভাণ্ডগুলি উঠাইয়া লইলেন, দেখা গেল যে মুখঢাকা তৈলপূর্ণ পাত্র সমূহে জল প্রবিষ্ট হয় নাই, ফলে সকল তৈলই মিলিল।

এই সময়ে তৈল অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং এই তৈলবিক্রয়ে চতুর্গুণ লভ্য হইল ও তদ্দারা মহাপ্রভুর নাটমন্দির প্রস্তুত হইয়া গেল! এই নাট মন্দির অনেক দিন ছিল, বিগত ভূকম্পে বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীহট্টের কালীঘাটের জগন্নাথ দেবতাকে প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে ২/৩ দিনের জন্য তিনি নিজগৃহে আনিয়া মহামহোৎসব করিতেন। কথিত আছে, চট্টগ্রাম বাসী জনৈক কুষ্টরোগী শ্রীক্ষেত্রে "হত্যা" দিয়াছিল ও প্রত্যাদেশ প্রাপ্তে ইঁহার কাছে আসিয়া প্রসাদপ্রার্থী হয়, বহু অনুনয়ে তিনি ভুক্তাবশেষ স্বরূপ একটি বাতাসা দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন। সেও তাহাতেই তুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপ প্রত্যাদেশ ও প্রসাদগ্রহণের কথা আরও শুনা যায়, ইহার ভিতরকার রহস্য কি, বলা যায় না।

রমজান মণ্ডল

করণশীর অন্তর্গত মতির গ্রামে রমজান মণ্ডল নামে এক মোসলমানের বাস ছিল। ইনি একটি সাধকমণ্ডলীর অগ্রণী। এই সাধক মণ্ডলে স্ত্রী পুরুষ একত্রে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মসঙ্গীতাদি ও

ধর্ম্মালাপ করিয়া থাকে। দিবসে সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া রজনীতে একত্রে ধর্ম্মসাধন করাই এই মণ্ডলীর নিয়ম। ইহারা সত্য ও প্রেমের সাধক। বোধ হয় হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত সহজ ভজনাদি উপধর্ম্মের অনুকরণে রমজান দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা দ্বারা একটি ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হইতে পারিয়াছে, নিরক্ষর হইলেও তাঁহার গুণ ও কার্য্য স্মরণীয় সন্দেহ নাই।

রমাকান্ত রায়

"শ্রীহট্টজিলার অন্তর্গত জলসুখা গ্রামে ১৮৭৩ খৃঃ রমাকান্ত রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীকিশোর রায় সেই অঞ্চলে একজন সুবিখ্যাত পুরুষ ছিলেন।" "জলসুখার জমিদারগণ দানশীলতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য বিখ্যাত।" "রমাকান্ত রায়ের মাতামহগণের অনেকেই শ্রীহট্ট হইতে পদব্রজে পূরী নৌকাযোগে মথুরা বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে বহির্গত হইতেন।" "রম্যকান্তের বয়স যখন একবৎসর, তখন তাঁহার মাতাপুরী গমন করেন।" ঐ সময় শিশু রমাকান্ত অতিরুগ্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। "বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং পিতৃব্য সন্তানের মথুরচন্দ্র রায়ের হস্তেই লালনপালনের ভার ন্যস্ত হয়। তিনি আপন সন্তানের ন্যায়ই স্নেহ করিতেন।

"জলসুখার কৃষ্ণগোবিন্দ মধ্যে ইংরেজী বিদ্যালয়ে রমাকান্ত শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই স্কুল তাঁহারই মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ সদাশয় জমীদার কৃষ্ণগোবিন্দ রায়ের স্থাপিত। রমাকান্ত এখান হইতে ১৮৯০ অব্দে মধ্যে ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন ও শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট স্কুলে পড়িতে যান। কিছুদিন পর শ্রীহট্ট হইতে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে গমন করেন। সেখান হইতে আবার ১৮৯৩ অব্দে শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসেন এবং ১৮৯৪ অব্দে গবর্ণমেন্ট স্কুল হইতে এন্ট্রেস পাশ করেন। তৎপর কলিকাতা সিটি কলেজে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন।"

"ছাত্রাবস্থায় সকলের সঙ্গেই তাঁহার সদ্ভাব ছিল। একদিন কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু রমাকান্তকে সকলেই বড় ভয় করিত। কারণ তাঁহার সৎসাহস বড়ই প্রবল ছিল।" "রমাকান্ত যখন মধ্য ইংরেজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন, ক্রিকেট ক্রীড়ার সময় তখন ঘটনাবশতঃ একটি বালক সাংঘাতিকরূপে আহত হয় ও সেই আঘাতেই মারা যায়।" "এমন গুরুতর অভিযোগ পড়িয়াও নির্ভীক চিত্তে বালক রমাকান্ত উকীলদের জটিল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া প্রশংসালাভ করেন। বলাবাহুল্য যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ টিকিতে পারে নাই।"

"সাধারণ লোকের উপর তাঁহার প্রীতি যেমন অল্পবয়সে বিকশিত হইয়াছিল, এতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। একদিন পথে যাইতে রমাকান্ত দেখিতে পাইলেন যে একজন ভিক্ষুক ওলাউঠাগ্রস্ত হইয়া রাস্তার পাশে পড়িয়া আছে। রমাকান্ত তখনই দুচারিজন লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন ও যথাসম্ভব ঔষধাদি ব্যবস্থা করাইলেন, তাঁহার সাহায্যে ভিক্ষুক আরোগ্য লাভ করে। আর একবার একটি বিদেশী নৌকার মাঝি পীড়িত হইয়া পড়ে। মাঝিটি বন্ধুবান্ধবহীন ও নীচ জাতীয় ছিল, তার শুশ্রূষার লোক কেহ ছিল না। রমাকান্ত সে সংবাদে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি নিজে গিয়া তার আর শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন।" "নীচজাতীয় বলিয়া পূর্ব্বে যারা লোকটিতে স্পর্শ করে নাই, তাঁহার দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় তাহারাই পরে শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।"

এইরূপ ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার মহত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত, বাহুল্য ভয়ে যে সমস্ত উল্লেখিত হইল না। রমাকান্ত রায় বাঙ্গালীর শিক্ষার্থ জাপান যাত্রার প্রদর্শক, জাপানে খনিতত্ত্বে বুৎপন্ন হইয়া তথাকার একটি খনির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। জাপানে কিছুদিন কাজ করিয়া তিনি

স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, দরিদ্র ছাত্রবর্গ বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভে সমর্থ হয়, এইজন্য তাহাদের সাহায্যার্থে তিনি দেশে আসিয়াই "চারিআনা ফান্ডের" উদ্বোধন করেন। অতঃপর তিনি কাশ্মীর রাজ্যের খনিতত্ত্ববিদের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীনগরে গমন করেন। কিছুদিন তথায় কাজ করিয়া ছুটি লইয়া দেশে আসেন, যখন রমাকান্ত কলিকাতায় পৌছিলেন, তখন স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। রমাকান্ত তখন মাতৃসেবায়—আত্ম-শক্তি ঢালিয়া দিলেন। ছুটির দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল, রমাকান্ত মাতৃসেবা ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না, আবার বিদায় চাহিলেন কিন্তু বিদায় পাইলেন না, তখন তাঁহার আয়ের একমাত্র পথ চাকুরীটি ছাড়িয়া দিতে হইল, দেশের কাজের জন্য যাঁহারা ত্যাগ স্বীকারে আনন্দিত হন, রমাকান্ত তাহাদের অগ্রগণ্য ছিলেন।

"ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সমক্ষে প্রস্তাব করা হইল দেশীদ্রব্য বিনালাভে যুবকদিগের দ্বারা বিক্রয়ের কোন উপায় হয় কি না?

সকলে আনন্দের সহিত এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।" "রমাকান্ত বলিলেন কালই তিনি হাটে গিয়া কাপড় লইয়া আসিবেন। সেদিন শুদ্ধ পরীক্ষার ৬০ টাকার কাপড় লওয়া হইয়াছিল।" "প্রশ্ন উঠিল—কাপড় লওয়া যায় কি প্রকারে? তিনি বলিলেন—মুটে ভাড়া দিয়া অনর্থক দাম বাড়াইয়া কাজ নাই। এই বলিয়া নিজেই মোট মাথায় তুলিয়া লইলেন।" "তাহার দৃষ্টান্তে সকলে স্বদেশের নামে কর্ম্মব্রত গ্রহণ করিলেন, —দলে দলে যুবকগণ এই গৌরবময় কাজের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন।"[১২৮]

রমাকান্তের কর্ম্মময় জীবন যৌবনেই পর্যবসিত হয়, বিগত ১৯০৬ খৃঃ জ্বর রোগে রানীগঞ্জে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে শিক্ষার্থ বিদেশগত চারিজন ছাত্রের পাথেয় ব্যয় নিবাহার্থ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, পরে উহাদেরই আমেরিকায় শিক্ষার বহনার্থ মাফিক মাসিক আড়াই টাকায় হাজারিবাগে একটি কর্ম্মস্বীকার করেন। বেতনের টাকা হইতে নিজ ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য মাত্র পঞ্চাশটি টাকা রাখিয়া বাকি দুইশত টাকা ছাত্রদের সাহায্যে পাঠাইয়া দিতেন।

রমাকান্তের মৃত্যুতে কলিকাতার ন্যায় শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে শোকসভা সম্মিলিত হইয়াছিল।

রমানাথ বিশারদ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাঃ ৪র্থ খঃ ৩য় অধ্যায়ে বেজোড়ার বিশারদ বংশের কথা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। যে রমানাথ হইতে সেই বংশ "বিশারদের বংশ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। রমানাথের পিতার নাম রতিদেব। রমানাথের বিদ্যা শিক্ষা নবদ্বীপে হইয়াছিল। রমানাথ অতুল প্রতিভাবলে অশেষ জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া "বিশারদ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাই মাত্র তাঁহার মহিমা নহে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনের বিবিধ অলৌকিক ঘটনা অসীম মাহাত্ম্যের পরিচায়ক।

একবার তিনি অধ্যাপকগৃহ হইতে একা বাড়ীতে আসিবার কালে, কথিত আছে যে, মেঘনাতীরে উপস্থিত হইলে সন্ধ্যা হইয়া যায়, অন্ধকারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তদবস্থায় নদী পার হইবার সময়ে হঠাৎ তাঁহার সাধনবিষয়ক একখানি তন্ত্রগ্রন্থ মেঘনা নদীতে ডুবিয়া যায়। কোন অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ তাহা পৃষ্ঠে লইয়া ফিরাইয়া দিয়া যায়। তিনি তাঁহার বংশ পরম্পরা "কচ্ছপ মাংস অভক্ষ্য" বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

---

১২৮. সঞ্জীবনী পত্রিকা—১৩১০ বাং ২৭ শে বৈশাখ এবং ১৩১৪ বাং ৩ রা জৈষ্ঠ্য। রমাকান্ত রায়ের প্রতিকৃতি "শ্রীহট্ট গৌরব চিত্রাবলীর" অন্যতম চিত্ররূপে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

বানিয়াচঙ্গের মহাদেব পঞ্চানন ও বিশারদের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় ছিল, এই ইতি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, উভয়েরই সেই ইচ্ছা ছিল, বিশারদের জ্যৈষ্ঠ্যপুত্রের সহিত মহাদেবের কন্যার বিবাহ হওয়াতে উভয় পরিবারে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নব্য হইতেই অনেক ব্রাহ্মণ এবং বেজোড়ার চন্দ্র প্রভৃতি এ বংশের শিষ্য ছিলেন। পূর্ব্বে দেশে আসিলে আরও বহু ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বিশারদের ইষ্টনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। দত্তবংশীয় তদীয় জনৈক শিষ্য যাহার নামে একটি তালুক করিয়া দিয়াছিলেন। একদা এই তালুকের রাজস্ব আদায় করিতে প্যাদা আসিলে তিনি ইহা জানিতে পারেন ও সেই তালুকের, স্বত্ব তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন। প্রধান ধারণার ও পূজার্চ্চনার পরিপন্থি ভূসম্পত্তিসহ তাহাকে সম্পর্কিত করায় সেই শিষ্যের প্রতি তিনি বিতুষ্ট হন ; কথিত আছে যে তাহাতেই না কি সেই ভদ্রলোকটি রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

একজন সন্ন্যাসী বিশারদের নির্দ্দিষ্টদিনে অকালমৃত্যুর কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বিশারদের জীবনান্ত হয় নাই। যে মহাপুরুষের অনুগ্রহ নানা সময়ে নানারূপে লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, তিনি অকালে কাল-কবলিত হইলে তাহাদের গতি কি হইত? যাঁহার ইঙ্গিতে অগণ্য শিষ্যমণ্ডলী আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথে প্রধাবিত হইবে, দৈব্যপ্রেরিত হইয়াই তাঁহারে রক্ষা করিতে সন্ন্যাসী যথাকালে সমুপস্থিত হইবেন আশ্চর্য্য নহে। নিরূপিত দিনে বিশারদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই মূচ্ছাই হয়তঃ মৃত্যুরূপে পরিণত হইত, যদি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে তাহা নিরাকৃত না হইত।[১২৯] তাই মূর্চ্ছাকেই সন্ন্যাসী অপমৃত্যু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাখাল শাহ

রাখাল শাহ জাতিতে ধোপা ছিলেন, পূর্ব্বে তাহার অন্য কোন নাম ছিল কিনা জানা যায় না। তিনি সাধারণের কাছে পীর বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেন। সম্ভবতঃ মোসলমানগণই তাঁহাকে "শাহ" নাম দিয়া থাকিবে। সুরমা নদীর তীরে কানাইঘাট স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার কাছে সর্ব্বদাই লোক যাইত এবং আপনাপন ইষ্টানিষ্ট জানিয়া আসিত, সন্নিকটবর্ত্তী স্থানীয় লোকেরাই তাঁহাকে আহার আনিয়া দিত। সকলের জিনিস তিনি রাখিতেন না; ভবিষ্যতে যাহার মঙ্গল হইবে, সামান্য হইলেও তাহার দ্রব্যেই গ্রহণ করিতেন, অন্যথায় বহুমূল্য বস্তুও ছুইতেন না। এই ইঙ্গিতেই সাধারণতঃ লোকে নিজের ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া লইত ও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইত।

একদা নরসিংহপুরের কয়েক ব্যক্তি তাঁহার কাছে গিয়াছিল, আরও লোক তথায় ছিল; ইহারা গেলে তিনি উঠিয়া গিয়া তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে "বেদম" প্রহার করিয়া সে ব্যক্তি দুইনল

---

১২৯. এরূপ ঘটনাও অবিশ্বাস্য বা অঘটনীয় না হইতে পারে। অনুরূপ একটি আধুনিক বৃত্তান্ত ১৩২০ বাংলার আষাঢ় মাসের "অলৌকিক রহস্য" নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রায় ৪০ বৎসরের ঘটনা। বসুন্দিয়া বাসী শ্রীযুত বিধুভূষণ ঘোষ লিখিয়াছেন যে তাঁহার গুরুদবে অকালে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন বলিয়া, সদিচ্ছদানন্দস্বামীনামক জনৈক উপস্থিত হইলে, গুরুদেবকে সংযম করাইয়া একটি ঘরে জনৈক সতীর্থ সহ আবদ্ধ করিয়া রাখেন ও নিজে অন্য ঘরে প্রবিষ্ট হন এবং প্রাণান্ত ঘটিলেও প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কাছে যেন কেহ না যায়, বলিয়া দেন। মধ্যরাত্রে গুরুর গাত্রে অতিমাত্র জ্বালা উপস্থিত হয়, প্রাণ যাইবার উপক্রম হয় কিন্তু গুরুর শত অনুরোধেও সতীর্থ স্বামীকে সে সংবাদ দিলেন না। এদিকে গুরু ছটফট করিতে করিতে নির্জ্জীবের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে দ্বার উন্মুক্ত হইল, গুরুদেব উত্থিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে স্বামীর সাধন প্রভাবে তিনি মৃত্যুমুখ রক্ষা পান। ৭/৮ বৎসর হইল, সে সতীর্থের মৃত্যু হইয়াছে।

আন্দাজ দূরে গিয়া বসিয়া রহিলে, বলিলেন "বেটা রক্ষা পাইলে।" ইহার কিছুক্ষণ পরে সকলে চলিয়া গেলে, নরসিংহপুরের লোকেরাও যাইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু তিনি যাইতে দিলেন না, সমস্ত রাত্রি তাহাদের কাছে শনির পাঁচালির কথা কহিয়া কাটাইলেন।

পরদিন তাহারা বাড়ীতে গিয়া ভাবিল যে তাহাদের মধ্যে কাহারও গ্রহদোষ থাকিতে পারে। এইরূপ তখন কোষ্ঠী বিচারে দেখা গেল যে, প্রহৃত ব্যক্তির রাশিতে শনির দৃষ্টি আছে। ইহার কিছুদিন পরে, কার্য্যবশতঃ সেই ব্যক্তি মাঠে গেলে, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, বিদ্যুৎ চমকিতে থাকে। একবার তীব্রতেজে বিদ্যুৎ ছুটিল, সে ব্যক্তি ভয়ে দৌড়িয়া দুইনল আন্দাজ যাইতে না যাইতেই সেই স্থান বজ্রাঘাতে দুইটি মহিষ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এতদ্দৃষ্টে সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিল যে কেন সাধু তাঁহাকে প্রহার করিয়া দুইনল দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

লোকের প্রদত্ত দ্রব্য প্রায়শঃ তিনি বিলাইয়া দিতেন। একদা কয়েকটি দস্যু তাহাকে "মারধর" করিয়া কতক দ্রব্য লইয়া যায়। জনৈক পোলিশ কর্ম্মচারী কোনও প্রকারে ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সেই সকল লোকের নাম বলিয়া দিতে অনুরোধ করে। তিনি হাসিয়া উত্তর দেন "তুমিই" মারিয়া ধন নিয়াছ। পোলিশ কর্মচারী প্রকৃত তথ্য না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

জনৈক আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, একদা তিনি কোন কার্যোপক্ষে শ্রীহট্ট শহরে যাওয়া কালে, নৌকা হইতে ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একটা রূপার বাঁধা হুক্কায় তামাক সাজা ছিল এবং খাইতে খাইতে গিয়াছিলেন। রাখাল শাহ হুক্কাটি চাহিয়া লন। শ্রীহট্টে গেলে তাঁহার কার্য্যটি অল্পায়াসে সুসিদ্ধ হওয়ায়, তিনি প্রত্যাগমন কালেও সাধুকে দেখিতে যান। হুক্কাটি দেখিতে না পাইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে চাহিদা নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সাধু তাহা অপর ব্যক্তিকে দিয়াছিলেন। আত্মীয় নৌকায় ফিরিবার কালে প্রবল বেড়ে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে পান যে, যে স্থানে সাধু বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার কিছুটা স্থান ধরিয়া বারিপাত হইতেছে না।

রাখাল শাহের মৃত্যু আশ্চর্য্য রকমে হইয়াছিল। একদিন তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে সংকীর্ত্তন করিতে বলেন, তিনি কখনও কীর্ত্তনাদি করিতেন না, তাঁহার স্থানে কীর্ত্তন সেই প্রথম ও শেষ। হিন্দুগণ পরম উৎসাহে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, তিনি কীর্ত্তনের মণ্ডলী মধ্যে আসন করিয়া বসিলেন ও দেখিতে দেখিতে সেই আসনোপাবিষ্ট অবস্থাতেই দেহত্যাগ করিলেন। লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল ও তাঁহার দেহ "সমাধি" দিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, শুনা যায় যে ইহার ১২ দিন পরে তাঁহাকে অন্যত্র অনেকেই দেখিতে পাইয়াছিল এবং সে আতিবাহিক দেহ সত্বরেই দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়াছিল।

কানাইর ঘাটে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ছিলেন, মধ্যে কিছুদিনের জন্য "মোগলের চক" নামক স্থানে গিয়াছিলেন। ২০/২২ বৎসর হইল, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাখাল শাহকে হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধা করিত। মোসলমানগণ তাঁহাকে মোসলমান মনে করিত, হিন্দুগণ সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিত।

রাজারাম দত্ত

শ্রীহট্টের নবাব রফিউল্লা খাঁ বাহাদুরের সময়ে (১১০০ সনে) দত্তগ্রামের দত্তবংশীয় পারস্য ভাষাবিৎ রাজারাম উক্ত নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় নবাব প্রীত ছিলেন, তিনি একদা বিদায় গ্রহণে বাড়ীতে আগমন করেন, এবং ডৌয়াদির প্রবল প্রতাপ

কর মোহাম্মদ চৌধুরীর[১৩০] সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। চৌধুরী তখন অন্দরে ছিলেন। ভৃত্য রাজারামের আগমন সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রাজারাম তদানুসারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও, চৌধুরী আসিতেছেন না দেখিয়া চলিয়া আসিলেন। এদিকে চৌধুরী বাহিরে আসিয়া যখন জানিলেন যে রাজারাম চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না, তিনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া তখনই রাজারামকে ফিরাইয়া আনিতে ভৃত্যকে পাঠাইলেন। আদিষ্ট হইয়া ভৃত্য অনতিবিলম্বে রাজারামকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিল। রাজারামের আগমন সংবাদপ্রাপ্তে চৌধুরীও তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার মতলব করিলেন। কর মোহাম্মদের দয়াবতী জননী ক্রুর চরিত পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভৃত্যদ্বারা রাজারামকে এক গুপ্ত পথে পলায়নের পরামর্শ দিলে, রাজারাম তৎক্ষণাৎ পলায়নপূর্ব্বক বাড়ীতে আসিলেন ও সেইক্ষণেই কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন।

নবাব রফিউল্লা খাঁ বাহাদুর দেওয়ানকে বিষন্নচিত্ত ও বিদায় ভোগের পূর্ব্বেই প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি সমস্তই নবাবের গোচর করিলেন এবং সাধারণের প্রতি কর মোহাম্মদের অত্যাচার বর্ণনপূর্ব্বক প্রতীকারপ্রার্থী হইলেন; অধিকন্তু নবাবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় বাসভূমি ডৌয়াদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে প্রার্থনা করিলেন।

নবাব রাজারামের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন, এবং কর মোহাম্মদের অধিকৃত ডৌয়াদি পরগণা হইতে, রাজারামের বাসভূমি সম্বলিত একটি পৃথক পরগণা খারিজ করিয়া দিলেন; নবাব রফিউল্লা খাঁর নামে ঐ নূতন পরগণা "রফিনগর" নাম প্রাপ্ত হইল।

রাজারামের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাই নবাবও তাঁহাকে একটা কঠিন সমস্যায় ফেলিলেন। বলা গিয়াছে যে রাজারাম পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তদুল্লেখে নবাব বলিলেন—"দেওয়ানজি, পারস্য ভাষায় আপনার যেরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান, উহা মোসলমানের পক্ষেও শোভনীয়। আমার ইচ্ছা, আমার দানের প্রতিদান স্বরূপ আপনে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আমার কাছে অবস্থিতি করেন।"

নবাবের ঈদৃশ্য বাক্য শ্রবণে রাজারাম কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, তিনি বুঝিলেন যে তত সহজে নবাবের অনুগ্রহ লাভের কারণ ইহাই। যাহাহউক, তিনি নবাবের বাক্যে অস্বীকৃত হইয়া বিপদ ঘনীভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন না—ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোহাম্মদ রজা নামে সংজ্ঞিত হইলেন ও রফিনগরের "চৌধুরাই" সনন্দ পাইলেন।

মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনের পর রাজারাম আর গৃহে গেলেন না, পরে এক সময় দেশে আসিয়া পুষ্করিনীর তীরে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায়ই অবস্থিতি করিলেন। এই সময়ে একদিন তাঁহার স্ত্রী সাহেবরাম ও বদলরাম নামক পুত্রদ্বয়কে লইয়া স্বামীর কাছে গিয়া পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তখন স্বামী স্ত্রীকে বলিলেন—"সাধ্বি, তোমার পতি কর মোহাম্মদের সহিত বিবাদে নিহত হইয়াছে তুমি এখন বৈধব্যাবলম্বনে পুত্রদ্বয় সহ স্বধর্ম্ম পালন কর। এই অনাথ বালকদ্বয় যাহাতে কোন অসুবিধায় পতিত না হয়, আমি তাহা করিব।"

"আমার স্বধর্ম্ম পালন ইহাই" এই বলিয়া তখন পুত্রদ্বয় সহ রাজারামপত্নী ধর্ম্মত্যাগী পতির পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। রাজারাম তখন নিরূপায় হইয়া পুত্রদ্বয় সহ পত্নীকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলে, পুত্রদ্বয় যথাক্রমে সাহেবউদ্দীন ও বদরউদ্দীন নামে সংজ্ঞিত হইলেন। ইঁহাদের উভয়ের নামেই রফিনগরে দুইটি দশসনা তালুক (তাং সাহেবদী ও বদরদী) আছে।

১৩০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাঃ ২য় খঃ ৫ম অঃ ডৌয়াদির বিবরণে ইহার বিষয় বলা হইয়াছে।

রাজারাম

জলডুবের রাঢ়জাতীয় শিবরামের বংশে (তদীয় দশম পুরুষে) রাজারামের উদ্ভব হয়। রাজারামের পিতার নাম সাধু। সাধুতে সাধুতা, পরদুঃখকাতরতা ও ন্যায়দর্শিতা প্রভৃতি গুণ যথেষ্ট ছিল। পিতৃগুণ পুত্রে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইত, তদ্ব্যতীত রাজারামের উপার্জ্জন চেষ্টা, পটুতা ও পরিশ্রম-পারগতা অসাধারণ ছিল। শুধু কায়িক পরিশ্রমে ন্যায়পথে থাকিয়া রাজারামের যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহার পরিমাণ সামান্য ছিল না, একজন প্রধান ধনী বলিয়া জলডুবে রাজারামের নামডাক হইয়াছিল; এই ধন তাহার একজীবনেই অর্জ্জিত হয়। রাজারামের উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়ও তৎকর্ত্তৃকই হইয়াছিল। তখন তৎসমাজে পূজাপার্ব্বণ সদ্ব্যয়ের একমাত্র পন্থা বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। স্বর্গীয় বিষহরি পূজা, কপিলদান, ভূদান, বৃক্ষমূলে স্বর্গীয় কালাচাঁদ দেবতার আসন স্থাপন, আখড়া প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যেই তাঁহার অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হয়। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, দেবসেবা, মহোৎসব, শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শন ইত্যাদি সৎকার্য্যও তাঁহার কম ছিল না। এ সকল সৎকার্য্যের জন্য তাহার নাম তত্রতা লোকের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাই তাহার অধস্তন বংশীয়গণকে গৌরবান্বিত করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ধনসম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীসুত্রে ভোগে লাগে, পূর্ব্বপুরুষের কৃত সৎকীর্ত্তিও তদ্রূপ পরবর্ত্তিগণের প্রভূত হিতসাধন করে। রাজারামের ছয়পুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ তনয় হইতে আমরা রাজারামের কীর্ত্তি-কথা প্রাপ্ত হইয়াছি।

রাজীব লোচন দাস

মৈনা নিবাসী পণ্ডিত রাজীব লোচন দাস আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও স্বচেষ্টায় ও প্রগাঢ় অধ্যয়নে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বিদ্বৎসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। করিমগঞ্জ শহর যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়া নদীর উত্তরতটে জকিগঞ্জ নামক স্থানে ছিল, তখন তথাকার মাইনর স্কুলে, তিনি কিছুদিন প্রধান পণ্ডিতের কাজ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি "পদ্যপ্রসূন" নামে একখানা কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন (১২৮৫ বাংলা।) স্বচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল। শ্রীহট্ট শহর হইতে প্রকাশিত "শ্রীহট্ট দর্পণ" মাসিকপত্রে তিনি "দৃষ্টান্ত শতক" নামক বিরল-প্রচারিত সংস্কৃত উপাদেয় গ্রন্থ খানা স্বকৃত অনুবাদ সহ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, (১৩০৬ বাংলা।) তিনি তখনকার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, সজ্জনতোষণী, আনন্দবাজার প্রভৃতি বৈষ্ণব পত্রে রাশি রাশি বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ কবি লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ তাঁহারই সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে বহরমপুর-রাধারমণ যন্ত্রাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তিনি পদসমুদ্র নামক মহাগ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়বহনে স্বীকৃত হইয়া অগ্রিম ৫০ টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্যোক্তার পরলোকগমন ঘটায় উহা হইয়া উঠে নাই। এই সময়ে তিনি একজন গোস্বামী সন্তানের বিবাহ ব্যয় এবং একজন ব্রাহ্মণ তনয়ের উপনয়ন ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেন।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" ইতি নীতি স্মরণে বানপ্রস্থধর্ম্মের অনুকরণে তিনি ৫২ বৎসর বয়সে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় প্রায় দুই বৎসর পরমানন্দে বাস করার পর গণ্ডমালা রোগে শয্যাগত হইয়া পড়েনও মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ভেখআশ্রয়পূর্ব্বক রাধাপদ দাস নাম ধারণ করেন। এই সময় খাওয়া পড়ার জন্য যৎসামান্য অর্থ স্ত্রীকে দিয়া অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ (১২০০০ টাকা) গুরুদেবের পদে সমর্পণ করিয়া বিষয় হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হন। ৪২২

গৌরাব্দে (১৩১৪ বাংলা) ২০ শে বৈশাখ তারিখে তিনি ব্রজলাভ করেন। তাঁহার ভেখ গ্রহণে তদীয় পত্নীও ভেখগ্রহণপূর্ব্বক পৃথক গৃহবাসিনী হইয়াছিলেন, তিনিও পরলোক গত হইয়াছেন।

রাধাগোবিন্দ পুরকায়স্থ

করিমগঞ্জের অন্তর্গত দত্তগ্রামের দত্তবংশীয়গণ অতি সম্ভ্রান্ত। এই বংশে রাধাগোবিন্দ পুরকায়স্থের জন্ম ; রাধাগোবিন্দ তত্রত্য জমিদার ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁহার বাড়ীতে শ্রীধর, বাসুদেব ও মধুসুদন প্রভৃতি দেববিগ্রহ নিত্য পূজিত হইতেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী রামায়ত প্রভৃতি তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

একদা এক দীর্ঘবাহু গৌরকান্তি মহাতেজা সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজপুত্রের ন্যায় তাঁহার লাবণ্যদর্শনে ও তদীয় মধুময় ধর্ম্মকথা শ্রবণে প্রত্যহ বহুলোক তথায় সমবেত হইত। একদিন তত্রত্য রামগোবিন্দ পুরকায়স্থ, জয়গোবিন্দ পুরকায়স্থ প্রভৃতি ভব্যব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন "এস্থানে আসিবার সময় আমি যে এক অপূর্ব্ব বস্তুর দর্শন পাইয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে বলিব।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চুপ করিয়া রহিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে সন্ন্যাসী আমান্নভোজা ছিলেন দুগ্ধ পর্য্যন্ত অগ্নিপুষ্ট করিতেন না এবং তিনি সাধনসম্পন্ন ছিলেন। দত্ত গ্রামের লোক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাঁহাকে "সিদ্ধবাবা" বলিত। তাঁহারা বাবার কথা শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি পুনঃ বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—"অত্রত্য গান্দাই নদীর দক্ষিণ তীরে যে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে, উহার মধ্যে এক দেবমূর্ত্তি নাম—রঘুনাথ ও বহু মূল্য দ্রব্যাদি নিমজ্জিত আছে। উহার উত্তরে ও পশ্চিমে সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীলা সজ্জিত মনোহর স্থান—যোগ সাধনের উপযোগী বলিয়া এস্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক কিছুদিন সাধন করিব ইচ্ছা হইয়াছে। সে যাক, একসময়ে আমি মণিপুর রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া দেবালয়ে একা সীতামূর্ত্তি পূজিতা হইতেছেন দেখিয়া মহারাজ গম্ভীর সিংহকে "রামশূন্য সীতা কেন" জিজ্ঞাসিলে তিনি বলেন যে তাঁহার সীতাকুমারী, সময়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছা আছে এবং আমি বরপক্ষ হইতে পারিব কি না। মহারাজের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া বলিয়া ছিলাম যে পর্য্যটনোপলক্ষে কোথাও সীতাশূন্য রাম দেখিতে পাইলে তাঁহাকে সংবাদ দিব। মহারাজও তাহাতে স্বীকৃত হন। পূর্ব্বোক্ত দীঘীতে যে রামমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাঁহারই সহিত মণিপুররাজের সীতার বিবাহ দিতে চাহি। এই বৃহৎ ব্যাপারে আপনারা সাহায্য করিবেন। অর্থ সাহায্য নহে, তাহা আমিই বহন করিব।" রাধাগোবিন্দ প্রমুখ সকলেই আনন্দের সহিত প্রস্তাবের অভিনন্দন করিলেন। যোগসিদ্ধ পুরুষের অনায়ত্ত বিষয় কিছুই নাই; অন্তেয় সিদ্ধি ঘটিলেই দূরস্থধনরত্ন দৃষ্টিপথে পতিত হয়; ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

যে দীঘীর কথা বলা গিয়াছে, উহার নাম ঘাঘরা দীঘী। উহার পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী টীলায়ও তদুত্তরবর্ত্তী টাংপাড়া গ্রামের পশ্চিমের টীলায়, দুইটি আশ্রম নির্ম্মিত হইল; বাবা উভয় স্থানে বা কখন বা রাধাগোবিন্দের বাড়ীতে বাসা করিতে লাগিলেন।

একদিন দীঘী হইতে মূর্ত্তি উত্তোলনের সংবাদ ঘোষিত হইল, যথাকালে দীর্ঘিকা তীরে বহু কীর্ত্তনদল সমবেত হইয়া মধুর কীর্ত্তনধ্বনিতে দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, তাহাতে দীঘীর স্থির জল কম্পিত হইতে লাগিল ও পরে স্ফীত হইয়া উঠিল। যোগের প্রাকাশ্য সিদ্ধিবশে বা যে কারণেই হউক দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র নৌকাকৃতি আধার সমেত রঘুনাথ বিগ্রহ ভাসিয়া সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী হইলে বাবা জলে নামিয়া রঘুনাথকে কোলে তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

রাম সীতার বিবাহ কথা

সমাগত জনসমূহ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে বাবার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। বাবা শ্রীমূর্ত্তিকে আশ্রমে আনিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজাদি দিলেন এবং মণিপুররাজ গম্ভীর সিংহের নিকট এই বৃত্তান্তঘটিত পত্র সহ লোক পাঠাইলেন। মহারাজ নির্দ্দিষ্ট দিনে সীতা সহ আগমনের সম্মতি জানাইলে, বাবা ত্রিপুরেশ্বরকেও এই উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কার্ত্তিকমাসে রঘুনাথের উদ্ধার হয়, এই সময় হইতেই রাধাগোবিন্দের বিশেষ সাহায্যে উৎসবের অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। মেলাস্থল, বিবাহ বাসর সভামণ্ডপ, রাজনিকেতন, ভৃত্যনিবাস, অভ্যাগত বাসস্থান, অশ্বশালা, বাদ্যাগার প্রভৃতি ঘাঘরাদীঘীর চতুস্পার্শ্বে নির্ম্মিত হইল। ঘোড়দৌড় ও পাতিখেলার স্থান পরিষ্কার, কদলীবৃক্ষ-সারি রোপন ও ধ্বজা উত্তোলন প্রভৃতি সম্পন্ন হইল, অপরিমিত খাদ্যদ্রব্যে ভাণ্ডার পরিপূরিত হইল। সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণগণ উৎসাহের সহিত ব্যাপারে যোগ দিলেন। নানাস্থানের নিমন্ত্রিত ও দর্শকসমূহে খেলাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল।

মাঘ মাসে বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্যাপারের ৩ দিন পূর্ব্বে মণিপুরপতি সীতাসহ লোকজন সমভিব্যবহারে উপনীত হইলেন। ত্রিপুরেশ্বর বহু সৈন্য সহ আসিতে উদ্যত হন, কিন্তু সসৈন্যে আসিতে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বারিত হওয়ায় তিনি স্বীয় মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে প্রেরণ করেন।

বিবাহের দিন যথারীতি ব্রাহ্মণাদি ভোজন সমাপন হইলে নানাবিধ আমোদ প্রমোদ সম্পন্ন হয়। রাত্রে বিবাহের প্রাক্কালে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন, আলোকমালা প্রজ্জ্বালন এবং সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল; ধূপ ধুনা জ্বলিয়া দিক আমোদিত হইল এবং শঙ্খ করতাল, মৃদঙ্গধ্বনির মধ্যে মণিপুর-পতি সীতাসহ বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধবাবা তখন রামকে বুকে তুলিয়া দাঁড়াইলেন এবং অপর এক সন্ন্যাসী সীতাকে হস্ততলে তুলিয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করিলেন। মণিপুরপতি কন্যাদানের দক্ষিণাস্বরূপ সুবর্ণ-নির্ম্মিত গুবাক ও কদলী কয়েকটি প্রদান করিলেন।

বিবাহের পরদিন ঘোড়দৌড় পাতিখেলা প্রভৃতি আমোদ ও শাস্ত্রবিচার এবং ব্রাহ্মণের ভুরিভোজন সম্পন্ন হইল; তাঁহার পরদিন ত্রিপুররাজমন্ত্রী এবং মণিপুরপতি স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। মহারাজের বস্ত্রাবাস হইতে লঙ্গাই নদী পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে গমনপথের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষের সারি রোপিত হইয়াছিল। মহারাজ অশ্বারোহণে গমনকালে উভয় হাতে উলঙ্গ তরবারি ধরিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে কদলী সারি দ্বিখণ্ডিত করিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার যাইবার বহু সময় পরে বাতাস বহিতে আরম্ভ হইলে একসঙ্গে সেই কদলী বৃক্ষ শ্রেণী ভূপাতিত হইয়া যায়।

ইহার পরও উৎসব সপ্তাহ কাল স্থায়ী হয়, তাহার পরে সিদ্ধবাবা সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গকে আশীর্বাদ করিয়া তীর্থভ্রমণে বর্হিগত হইতে চাহেন। সিদ্ধ বাবা রাধাগোবিন্দের আগ্রহে বাঁধা না দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে চন্দ্রনাথ তীর্থে উপস্থিত হন; তৎপরে কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই; রাধা গোবিন্দও তাহা প্রকাশ করেন নাই। এক বৎসর পর রাধা গোবিন্দ বাটীতে প্রত্যাগমন তুম্ চলে আও" এই ধ্বনি হঠাৎ সকলে শুনিতে পাইয়া চমকিত হয়; এই ধ্বনি সিদ্ধ বাবার ডাকের মত শুনা গিয়াছিল। সিদ্ধ বাবার আকৃতি, অপরিমিত অর্থব্যয়ের প্রকার এবং মণিপুরপতি ও ত্রিপুরাজ্যের সহিত তদ্বিধ পরিচয় ইত্যাদি আলোচনায় অনেকের অনুমান যে ইনি কোনও রাজবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন। (দত্তগ্রামবাসী শ্রীযুত মথুরামোহন দত্ত পুরকায়স্থ মহাশয় হইতে এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।)

রাধানাথ চৌধুরী

করিমগঞ্জের অন্তর্গত আগিয়ারামের কাকুরা গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে দেবীপ্রসাদ এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম গৌরীপ্রসাদ, রাধানাথ ইঁহারই পুত্র। ১৮৫৬ খৃঃ রাধানাথ জন্মগ্রহণ করেন। রাধানাথ গ্রাম্য পাঠশালে কিঞ্চিৎ বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া পঞ্চদশবর্ষ বয়ক্রম কালে, ইংরেজী শিক্ষার জন্য শিলচর হাইস্কুলে গমন করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালকৃষ্ণ তথাকার একটি চা-বাগানে কেরাণীর কর্ম্ম করিতেন, তিনিই কোন প্রকারে রাধানাথের খরচ যোগাইতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ একটি সামান্য কারণে তিনি কর্ম্মচ্যুত হওয়ায়, রাধানাথের শিলচরবাসের পথ রুদ্ধ হইয়া উঠে, রাধানাথ স্বয়ং বহু চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। রাধানাথ নিরুপায় হইয়া তখন শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলেন ও কোনপ্রকার এখানে থাকিতে পারেন কি না, চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। খ্যাতনামা উকিল স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র ঘোষের আশ্রয়ে তিনি শ্রীহট্টে থাকিতে পারিলেন বলিয়া সুখী হইলেন। তিনি রন্ধনাদি করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া যে একটু সময় পাইতেন, তাহাতেই স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিতেন, এইরূপে ২১ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন (১৮৭৬ খৃঃ)।

বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতায় গিয়া মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হন। যে দুই বৎসর বৃত্তি ছিল, এই বিদ্যালয়েই সুখ্যাতির সহিত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পর কলিকাতায় থাকার তাঁহার কোন সুবিধাই হইল না, তখন বিমর্ষভাবে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া রাধানাথকে আসিতে হইল; পড়িবার সুযোগ ঘটিল না বলিয়া রাধানাথ বড়ই দুঃখিত হইলেন, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে যতদিন বাঁচিবেন—দেশের দরিদ্র ছাত্রদের পাঠের অসুবিধা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন। বলিতে ভুলিয়াছি যে তিনি কলিকাতায় থাকাকালেই কলিকাতা প্রবাসী শ্রীহট্টের মনস্বী ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক স্ত্রীশিক্ষাবিধায়িনী "শ্রীহট্টসম্মিলনী" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ মধ্যে রাধানাথ অন্যতম ছিলেন।

সরল মনে কোন জনহিত-জনক শুভ সঙ্কল্প করিলে মঙ্গলময় ভগবানই সে সৎকার্য্যের সহায় হইয়া থাকেন। রাধানাথ যখন শ্রীহট্টে আগমন করেন, তখন "মুফতি" স্কুল নামক শ্রীহট্টের একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে উঠিয়া যাইতেছিল, রাধানাথের সতীর্থ স্বদেশবৎসল শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুত রাজ চন্দ্র চৌধুরী তৎকালে শ্রীহট্টে সমুপস্থিত হইয়া (১৮৮০ খৃঃ ৫ই জানুয়ারীতে) মুফ্‌তি স্কুলের ছাত্রবর্গ লইয়া "শ্রীহট্ট নেশনেল স্কুল" স্থাপন করেন। বিপিন বাবুর উদ্যোগে এই সময়ে "পরিদর্শক" নামক সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

তিন মাস কাল মধ্যেই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ২৫০ জন হয়, এই ভাবে কিছুকাল স্কুল পরিচালনা করিল নিঃসম্বল যুবকদের অর্থাভাব উপস্থিত হইল, কিন্তু তাঁহাদের "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" পণ ছিল। কঠোর পরিশ্রমে কিছুকাল মধ্যেই বিপিন বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি কলিকাতা যাইতে বাধ্য হইলেন; অপরেরাও তাঁহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হন; যখন স্কুলের অবস্থা এইরূপ শঙ্কটাপন্ন, সেই সময়েই মহাপ্রাণ রাধানাথ কপর্দ্দক শূন্য নিঃসম্বল হইলেও অগ্রসর হইলেন ও এই দুইটি ব্যয়সাধ্য গুরুভার স্বইচ্ছায় নিজ মাথায় তুলিয়া লইলেন। কিন্তু অর্থাভাবে অচিরেই তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইল, তখন "দেশ হিতৈষণায় সমধিক অগ্রণী" স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ সোম মহাশয়ের উপদেশ ও সাহায্য তিনি বিশেষ উপকৃত হন।

জয়বাবু কলিকাতা হইতে দুইজন উপযুক্ত শিক্ষক প্রেরণ করিলেন, রাধানাথ বাবু স্বয়ং ২য় শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত জয়বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রেভারেণ্ড সনাতন সোমও

শিক্ষাদানে যোগ প্রদান করেন। রাধানাথ বাবু ও সনাতন বাবু এক কপর্দ্দকও বেতন লইতেন না। রাধানাথ বাবুর স্কন্ধে স্কুল ব্যতীত পরিদর্শকের ভারও ন্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াছি, এ দুইটি কার্য্য সুদক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে যে কতদূর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

কিছুদিন পরে সনাতন বাবুর সহিত তাঁহার মতদ্বৈত উপস্থিত হয়। সনাতন বাবু ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাইবেল পাঠের প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলে, রাধানাথ তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই হইতে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং প্রশ্ন উঠে যে উভয়ের মধ্যে স্কুলের আধিপত্য কে গ্রহণ করিবেন? কিন্তু তিনি ভাবেন নাই যে যিনি সমস্ত ছাত্রের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাকে স্কুল হইতে তাড়ান সহজ নহে।

ঘটনাস্রোত গড়াইয়া চলিল, একদিন যখন রাধানাথ স্কুলে আসিতেছিলেন, তখন সোম মহাশয় তাঁহাকে স্কুল আসিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "আমাদের একজনকে আজ স্কুলের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া, বিদ্যালয় পরিচালনার পথ নিষ্কন্টক করা কর্ত্তব্য।" অমনি রাধানাথ বাহিরে তাকিয়াই ছাত্রবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এস ছাত্রগণ! আমার বিদ্যালয় আমিই পরিচালন করিব।" ছাত্রগণ নিমেষ মধ্যে রাধানাথের পার্শ্বে "কাতারে কাতারে" আসিয়া দাড়াইল রাধানাথের হৃদয় তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি স্কুলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিচালক হইলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার এরূপ স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল যে বন্ধুহীন কোন প্রবাসী ছাত্র পীড়িত হইয়া পড়িলে তিনি স্বয়ং ঔষধ ও পথ্য লইয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন।

স্কুলের ন্যায় পরিদর্শক পত্র লইয়াও তাঁহাকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। যে সকল ভদ্রলোক যৌথভাবে পরিদর্শকের ব্যয় বহন করিতেছিলেন, একে একে তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, তখন প্রেসটি স্বর্গীয় দীননাথ মোক্তার মহাশয় ক্রয় করেন ও রাধানাথ চৌধুরীর অত্যাগ্রহে পরিদর্শক বন্ধ না করিয়া প্রচারভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাতে অর্থক্ষতি হইতেছে দেখিয়া কিছুদিন মধ্যেই তিনি পরিদর্শক বন্ধ করিতে উদ্যোগ করেন। তখন রাধানাথ স্বয়ং ইহার মুদ্রণব্যয়ভারও গ্রহণ করেন। কেবল দেশের হিত কল্পেই জানিয়া শুনিয়া এইরূপ অর্থক্ষতি সহ্য করিতে তিনি অগ্রসর হন। রাধানাথের আর্থিক আয় যে বড় বেশী ছিল তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সৎ ছিল এবং প্রবল সৎসাহস ছিল।

অল্প দিনেই রাধানাথ বুঝিতে পারিলেন যে নিজের প্রেস না হইলে এইরূপে পরিদর্শকের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন না, তখন তিনি একটি প্রেস করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু অর্থ কই? তখন তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি পরহস্তে দিয়াও পরম প্রিয় প্রতিজ্ঞাটি পুরাইতে অভিপ্রায় করিলেন। সৎকার্য্যে তাঁহার একান্ত উৎসাহ ও আন্তরিকতা দৃষ্টে মোহিত হইয়া তদীয় ভ্রাতৃবর্গ এই সদনুষ্ঠানে তাহাকে সহায়তা করিলেন। তখন জমি বিক্রয় ব্যতীতই একটি প্রেস আনয়ন করা হইল এবং পরিদর্শক নিজের প্রেস হইতে বাহির হইতে লাগিল।

রাধানাথ চৌধুরীর সময়ে শ্রীহট্ট শহরে ক্ষুদ্র বৃহৎ হিতকর অনুষ্ঠান যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার সংশ্রয় ছিল। শহরে কাহারও গৃহে অগ্নি লাগিলে সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে তথায় দেখা যাইত; কেহ মোকদ্দমা করিতে আসিয়া নিরাশ্রয়ে পীড়িত হইয়া পড়িলে, রাধানাথকে তাহার শুশ্রূষায় ও পরিচর্য্যায় নিয়োজিত রহিয়াছেন দৃষ্ট হইত। একদা এক রাজপুরুষ পতিপার্শ্বস্থ এক রুগ্ন ভিখারীর বিনাদোষে কশাঘাত করিতে থাকেন, রাধানাথ বিদ্যুৎ বেগে মধ্যে পড়িয়া সে আঘাত নিজপৃষ্ঠে লইলেন। দেখিয়া লোক অবাক হইয়া চলিয়া গেলেন।

একদা কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে প্রত্যাগমন কালে একটা প্রথম শ্রেণীর আরোহী ৩য়

শ্রেণীর এক দরিদ্র আরোহীকে তামাক সেবনোপলক্ষে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, রাধানাথ বাঁধা দিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। ভাড়া দিতে পারিলেই এখনই দরিদ্র ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আর একবার একব্যক্তি এক নির্ব্বোধ আরোহীকে তাহার জাতি তুলিয়া গালি দেয়, রাধানাথ ইহার প্রতিবাদ করিয়া সেই উদ্ধত ব্যক্তিকে নিরস্ত করেন। তাঁহাকে সংবাদপত্র সম্পাদক জানিয়া সে ব্যক্তি পরে রাধানাথকে ভদ্রতার সহিত একটা "চুরট" দিতে অগ্রসর হইলে, রাধানাথ তাহা প্রত্যাখান করিয়া বলেন—"যিনি একটি দুর্বল ব্যক্তিকে জাতি তুলিয়া গালি দিতে পারেন, তাহার প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিতে আমি ইচ্ছা করি না।" এই কথার পর সে ব্যক্তিকে লজ্জিত হইয়া আপন ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়।

রাধানাথ কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া শ্রীহট্ট হইতে প্রথমে গমন করেন। প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কংগ্রেস সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। জাতীয় স্কুলের প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজধন বিদ্যানিধির সহিত এতদ্বিষয় মতান্তর হওয়ায়, বিদ্যানিধি সেই সভাতেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিদ্যানিধি ভাবিয়াছিলেন যে, যেরূপ তীব্র প্রতিবাদ তিনি করিয়াছেন, তাহাতে রাধানাথ নিশ্চিত বিরক্ত হইয়া থাকিবেন; এমতাবস্থায় জাতীয় স্কুলে তাঁহার আর কাজ করা শোভনীয় হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি ছাত্রবৃন্দ হইতে বিদায় লইয়া, একখানা ত্যাগ-পত্র সহ রাধানাথের বাসায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেখিলেন যে স্বাধীনভাবে রাধানাথের তৎপ্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হন নাই এবং তিনি তাঁহার স্পষ্টবাদিতার প্রশংসাই করিলেন। নিজের যেমন স্বাধীন প্রকৃতি, অন্যকেও তদ্রুপ স্বাধীনভাবে অকুণ্ঠিতভাবে চলিতে দিবেন না কেন? পণ্ডিত আর ত্যাগপত্র দিলেন না, রাধানাথের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া চলিয়া আসিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কুলগৃহ পাকা করিতে সাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হন, অচিরেই ১৭০০ টাকা স্বাক্ষরিত হয়, চাঁদা সংগ্রহীত হইলে গবর্ণমেন্ট ১০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে শ্রীহট্টের ডিপুটি কমিশনার সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৮৬ খৃঃ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। চাঁদা আদায় ও গৃহ নির্মাণের কাজ অতি ধীর গতিতে চলিয়াছিল, কিন্তু ১৮৯২ খৃঃ তাঁহার কর্ম্মময় জীবন পরিসমাপ্ত হইয়া যাওয়াতে, তদীয় সকল আশাই রহিয়া যায়।[১৩১]

রাধারাম নবাব

রাধারাম দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরেচ্ছানুসারে প্রতাপগড়ের জমিদাররূপে গণ্য হন এবং বন্য কুকিদের সহায়তায় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন ও নবাব উপাধি ধারণ করেন। পরে গবর্ণমেন্ট সৈন্যহস্তে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। ইঁহার কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে ২য় ভাঃ ২য় খঃ ১১শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থানে বর্ণিত হইল না।

রামকুমার নন্দী মজুমদার

বেজোড়ার নন্দীবংশে শ্রীহট্টের অশ্রান্ত কবি রামকুমারের উদ্ভব হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত নন্দী মজুমদার, রামকুমার ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান, কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষানুরাগ ও প্রতিভা সামান্য ছিল না, তাহাতেই নিজের চেষ্টায় তিনি বাঙ্গালা, পারস্য ও কিছু কিছু ইংরেজী ও অল্প সংস্কৃত শিক্ষা

১৩১. শ্রীযুত উমেশ চন্দ্র প্রণীত "রাধানাথ চরিত" (শ্রীহট্ট গৌরব চরিতাবলী নং ১) গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত। রাধা নাথের প্রতিকৃতি "শ্রীহট্ট গৌরব চিত্রাবলী"র অন্যতম চিত্ররূপ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।



কবি রামকুমার নন্দী, বেজোড়া

করিয়া ছিলেন। "কাশীদাসের মহাভারত খানি প্রায় তিনি কণ্ঠস্থ্ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন হইতেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, গ্রামস্থ্ জনৈক কলাবিৎ ব্রাহ্মণ এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিতেন।"

অল্প বয়সেই তিনি যাত্রার পালা রচনা করিয়া কবি প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। "যখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র তখনই তিনি 'দাতাকর্ণ' নামক একটি যাত্রার পালা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, একজন অল্প শিক্ষিত পল্লীগ্রামস্থ্ বালকের পক্ষে ইহা কম প্রতিভার পরিচায়ক নহে।"

"বেজোড়ার নন্দীবংশের অনেকেই কাছাড় শিলচরে রাজকার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেন। রামকুমারের শিক্ষা দীক্ষা অল্প হইলেও দারিদ্রের তাড়নায় তাহাকে সত্বরই কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল, এবং আত্মীয়বহুল শিলচরের দিকেই তদর্থে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি প্রথমতঃ তিন টাকা মাত্র বেতনে তত্রত্য ডিপুটী কমিশনারের অফিসে ঢুকিয়া, অবশেষে স্বাভাবিক উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে নিজে নিজে কার্য্যোপযোগী ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ঐ আফিসের একাউন্টেন্ট্ গিরি ও সর্ব্বশেষে ৮০ টাকা বেতনে খাজাঞ্চির কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।"

"শিলচরে অবস্থানকালে রামকুমার সঙ্গীতের সবিশেষ চর্চ্চা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন; কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনকল্পে তৎকাল প্রচারিত পুস্তক ও পত্রিকাদির পাঠ ভিন্ন আর কিছু করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।"[১৩২]

রামকুমারের ন্যায় সাহিত্যানুরাগী অতি অল্পই দেখা যায়, বৃদ্ধাকালেও তিনি যোগীর ন্যায় সাহিত্যের অনুধ্যানে নিরত থাকিতেন। তিনি সদগ্রন্থ্ পাঠে যেমন আনন্দানুভব করিতেন, অন্যকেও তাহার অংশী করিতে তদ্রূপ চেষ্টা পাইতেন। বিমল গঙ্গাস্রোতের ন্যায় তাঁহার কবিতার ধারা অবিরত প্রবাহিত হইত। মাইকেল মধুসুদন দত্তের বীরাঙ্গনার পত্রের উত্তরচ্ছলে তিনি "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য" প্রণয়ন করেন, ইহা প্রকাশিত হইলে কবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। "উষোদ্বাহ কাব্য" নামক তৎকৃত অন্য এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ্ এবং চারিখণ্ড পর্য্যন্ত "পরমার্থ সঙ্গীত" ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থ্ মুদ্রিত হয় নাই। তিনি তদ্ব্যতীত অনেক সঙ্গীত, গানের পালা, কাব্য ও নাটক প্রণয়ন করিয়া কীর্ত্তিস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের নামাবলী নিম্নে লিখিত হইল, কিন্তু ইহাই যে সম্পূর্ণ তালিকা, তাহা আমরা বলিতে পারিনা।

(১) বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর (মুদ্রিত) (১ম ও ২য় ভাগ)
(২) উষোদ্বাহ কাব্য (মুদ্রিত)
(৩) দশমহাবিদ্যা (খণ্ডকাব্য)
(৪) নবপত্রিকা (পৌরাণিক)
(৫) কলঙ্ক ভঞ্জন (পাঁচালী)
(৬) মালিনী উপাখ্যান (গল্প) যাত্রার পালা
(৭) রাসলীলা।
(৮) উমা আগমন।
(৯) চণ্ডীর পালা। প্রহসন
(১০) বলদ মহিমা নাটক। সঙ্গীতের পালা
(১১) লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ্ব।
(১২) ঝুলন-যাত্রা।
(১৩) দোল যাত্রা
(১৪) পদাঙ্ক দূত।
(১৫) দেবীর বোধন (চন্দ্রোদয় অবলম্বনে)
(১৬) পরমার্থ সঙ্গীত (৪র্থ খণ্ড পর্য্যন্ত)
(১৭) ভগবতীর জন্ম ও শিববিবাহ।
(১৮) প্রবন্ধ মালা (বিবিধ কবিতা)
(১৯) জীবম্মুক্তি (সংস্কৃত প্রবোধ মুদ্রিত হইয়াছে।)
(২০) গণিতাঙ্ক [বিদ্যালয়ে পাঠ্য মুদ্রিত]

১৩২. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদন কর্ত্তৃক ১৩১৫ বাং শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

কাব্য

কবির বাল্যরচিত "দাতাকর্ণের" পাণ্ডুলিপি লোপ পাইয়াছে। তদ্ব্যতীত "নিমাই সন্ন্যাস" "সীতার বনবাস" "বিজয় বসন্ত" নামক আরও তিনখানা যাত্রার পালার নাম শুনা যায়।[১৩৩]

রামকৃষ্ণ গোসাঞি

রিচি পরগণাবাসী দাসবংশীয় বনমালী অপুত্রক ছিলেন, পত্নী জাহ্নবীর সহিত শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া পুত্রকামনা করেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে চলিয়া আসিলেই জাহ্নবীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই গর্ভে ৯৮৩ বাং[১৩৪] রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণের বয়স যখন তিন বৎসর মাত্র, সেই সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। রামকৃষ্ণ পিতা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া গ্রাম্য পাঠশালে প্রবিষ্ট হন ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। রামকৃষ্ণের বুদ্ধি অতি চমৎকার, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সকলই মোহিত হইয়া প্রশংসা করিত। যখন রামকৃষ্ণের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; নিরাশ্রয় রামকৃষ্ণ তখন স্বগ্রামবাসী মাতুলের প্রতিপাল্য হইয়া উঠেন।

যখন রামকৃষ্ণ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন মাছুলিয়া আখড়াবাসী জগন্মোহন সম্প্রদায়ী শান্তগোসাঞি[১৩৫] রিচিতে জনৈক শিষ্যগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। শান্ত গোসাঞি পরম ধার্ম্মিক ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি রিচি অবস্থিতিকালে ইঁহাকে দেখিতে অনেকেই যাইত, তাহাদের সহিত একদিন বামকৃষ্ণ গমন করিয়াছিলেন। বালক রামকৃষ্ণের সরল সুন্দর চেহারা শান্তগোসাঞির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; তিনি ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন, রামকৃষ্ণ নিজ পরিচয় দিয়া তদীয় আশ্রয় ও কৃপাপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণের কথায় তিনি বিগলিত হইয়া মাছুলিয়ার আখড়াতে তাঁহাকে যাইতে বলিলেন। পিতৃমাতৃহীন রামকৃষ্ণ সংসারের অনিত্যতা ও নির্ম্মমতায় সংসারের প্রতি সেই বয়সেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ ৯৯৯ বাংলায় মাছুলিয়ার আখড়াতে গিয়া শান্তগোসাঞি হইতে ভেখ আশ্রয় করিলেন। বেশ মধ্যে মাথায় টুপর বা "টুপ" ও খিলকা এবং তিলক মালা ধারণে আদেশ পাইলেন। সন্ধ্যায় "নির্ব্বাণ সঙ্গীত" গাইয়া পরে "সাধো" এবং 'ব্রহ্মকি বাণী গুরুসত্য" বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে উপদিষ্ট হইলেন। আমিষবর্জ্জন ও স্ত্রীসঙ্গত্যাগে বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইল। এইরূপে রামকৃষ্ণ গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ও দ্বাদশ বৎসর (১০১১ বাং পর্য্যন্ত) এই স্থানে থাকিয়া ভজন করিলেন। এই সময় তিনি স্বয়ং সঙ্গীত রচনা করিয়া গান ও ভজন করিতেন, তৎকৃত দুইটি "নির্ব্বান সঙ্গীত" এই ঃ—

১। "তোমারে আমি ভজিব কেমনে,
ও নাথ! তোমারে আমি ভজিব কেমনে। ধ্রু।
অক্ষর নির্ণয় নাই, জপ তবে নাহি পাই,
রূপ বর্ণ না দেখি নয়নে
হইয়াছে হইবে যত, তোমার মহিমা হত,
নিমিষেতে না রবে সকল।
তুমি প্রভু দয়াময়, লীলা তব না বুঝিয়ে,

---

১৩৩. শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের প্রযত্নে শ্রীহট্ট গৌরব চিত্রাবলী সংরক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহার চিত্র অন্যতম।

১৩৪. এই তারিখটা কবিরদাস বৈষ্ণব লিখিত "শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ চরিত' হইতে প্রাপ্ত।

১৩৫. এই ৪র্থ ভাগে জগন্মোহনের জীবন চরিত দ্রষ্টব্য।

এইভাবে মন সে বিকল॥
তুমি সে জীবের জীব, তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব,
তুমি প্রভু ধরণী আকাশ!
হইতাম তোমার দাস, তুমি কর নিরাশ,
যত দেখি সকলই বিনাশ॥
যে কর সে কর তুমি, তোমার কি বলিব আমি,
মনে মাত্র এই রাখি আশা।
রামকৃষ্ণ দাসে কয় না দিও তুমি পরিচয়,
বঞ্চিতের গুরুই ভরসা॥"

২। "সাধুরে ভাই; পূর্ণব্রহ্ম গুরু কেমন ভাবে পাই?
ছাড়িয়া সকল মায়া, প্রভুর পদে লও ছায়া,
অন্তকালে আর লক্ষ্য নাই।
অবিনাশে কর মন, বুদ্ধি কর স্থিতি।
হেলায় তরিবা ভব পাইবা মুকতি॥
হীন রামদাসে বলে সেবায় বড় হীন।
কৃপাকরি রাখ পদে না ভাবিও ভিন॥

শান্ত গোসাঞির ছয়জন প্রধান শিষ্য মধ্যে রামকৃষ্ণ ও গোপীনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

গোপীনাথ জলসুখার সাহা সম্প্রদায়ী দেবীদাসের বংশসম্ভূত ছিলেন, জলসুখার আখড়া ইহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্ত গোসাঞির অপর শিষ্য কৃষ্ণ গোসাঞি মনতলার আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা। ঐ স্থানে একটি মহোৎসবে উপস্থিত বহুতর "সম্প্রদায়ী-বৈষ্ণব" বর্গ সমক্ষে তিনি স্বীয় দৈবক্ষমতা প্রকাশ করিলে, তথায় তাঁহার মহিমা খ্যাপিত হয়, ত্রিপুরাধিপতি তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে অনেক ভূমি দান করেন এবং তাহাতেই তত্রত্য শাখা আখড়ার উৎপত্তি হয়। শান্ত গোসাঞির যদুনাথ, রাজবল্লভ ও রাজারাম নামক অপর শিষ্যত্রয় মাছুলিয়াতে তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করায়, স্থানান্তরে গিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

রামকৃষ্ণ যখন ২৮ বৎসরের যুবক, তখন গুরুদেবের আদেশে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। এই বয়সেই তিনি দেশের লোকের অর্চ্চনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তীর্থযাত্রা করিলে তাঁহার অনুগত অনেকেই তদনুষঙ্গে চলিল, তিনি সস্নেহে উপদেশ প্রদানে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু এক ব্যক্তিকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিলেন না, কৃপাপূর্ব্বক ইহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলেন; এই ব্যক্তির নাম কৃপালু।

মাছুলিয়া হইতে রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান হবিগঞ্জ হইয়া বিথঙ্গল আসিলেন। প্রশস্তরক্ষা নদীর তীরবর্ত্তী এই স্থানটি তাঁহার বড়ই সুন্দর বোধ হইল, তৎকালে ইহা তপস্যার উপযোগী জঙ্গল ছিল। তপস্যাযোগ্য এই স্থানটিতে উপনীত হইলে গুরুর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, গুরু স্মরণে একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া সেই স্থানে বসিয়া তিনি গান করিলেন, সঙ্গীতটা এই ঃ

"গুরু ভজ পরম আনন্দে।
দুঃখে সুখে রওরে মন তুমি প্রভুর যে ধ্যানে॥
সুখ সম্পদ পাইয়া মন তুমি ভুলিয়া না রহিও।
নিকেট যমের ঘাট রে সাবধান হইও॥
যে ছিল মনের দুঃখ গুরুবিনে কাহাতে কহিব।

বাহ্য অন্তর নাহি মন সকলি সঁপিল॥
হীন রামদাসে বলে সমুদ্রে ভাসিয়া।
পাকে না ঠেকাইও গুরু, মোরে নিবে উদ্ধারিয়া॥"

রামকৃষ্ণের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, সঙ্গীতবন্দে প্রায়শঃ তাহা গাইতেন, কৃপালু শুনিতে শুনিতে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। রামকৃষ্ণ অল্পদিন মধ্যেই ঢাকায় উপস্থিত হন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করেন। ঢাকা হইতে তিনি ভবানীপুরে কালীঘাটে গিয়া সাতদিন থাকেন, পরে তথা হইতে গঙ্গাসাগরে উপনীত হন। তথা হইতে শ্রীক্ষেত্র গমনপথে "ক্ষীর চোরা গোপীনাথ" ও "সাক্ষিগোপাল" দর্শনপূর্ব্বক পূরী পৌঁছেন। দূর হইতে মন্দিরের চূড়াদর্শনে তাঁহার মনে অপার আনন্দ উপজাত হয়, আনন্দভরে একটি বংশীবাদন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে তিনি পথ চলিতে আরম্ভ করেন, পৌঁছিয়াই জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন ও সজলনয়নে

"নমঃ প্রসন্ন নেত্রায় নীলাচল বিহারিণে।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ দরুব্রহ্ম রূপায়তে॥"

নিজকৃত এই স্তুতিগীতি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছিলেন। জগন্নাথকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইলনা, তিনি দশ বৎসরকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন। তিনি রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক সর্ব্বদা গুরুদেবের ধ্যানে নিশি কর্ত্তন করিতেন।

গুরুদেবের আজ্ঞা তীর্থ ভ্রমণে,—তীর্থবাসে নহে, তাই দশ বৎসর পরে তাঁহার নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে হইল। তিনি একদিন নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া আলাল নাথ গমন করিলেন ও তৎপরদিনে তথা হইতে শীরুলীতে উপস্থিত হইলেন।[১৩৬] শীরুলী হইতে মান্দ্রাজ গমন করেন, তৎপর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া সেতুবন্ধে উপস্থিত হন। সেতুবন্ধ হইতে নীলগিরিতে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করতঃ নির্জ্জন উপাসনা করেন। তৎপর পশ্চিমাভিমুখ হইয়া সেতারা, বুম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থানের তীর্থাদি দর্শন করিয়া একবৎসর কাল সেই স্থানে বাস করেন। তথা হইতে দ্বারকাধামে উপস্থিত হন ও তথায় একবৎসর অবস্থিতি করেন। দ্বারকা হইতে জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি হইয়া মথুরায় যান ও তথা হইতে বৃন্দাবনে পৌঁছেন, বৃন্দাবনের পবিত্র ধুলায় তিনি গড়াগড়ি দিয়া "হা কৃষ্ণচন্দ্র" বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করেন; অবরুদ্ধ জলস্রোত যেন ফুলিয়া ফুলিয়া দেশ ভাসাইয়া চলিল, বিলোকনে কৃপালু বিস্মিত হইয়া গেলেন। বৃন্দাবনের সারধন গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দর্শন ও যুগল কুণ্ডজলে নিমজ্জনাদিপূর্ব্বক

১৩৬. রামকৃষ্ণচয়িত গ্রন্থে রামকৃষ্ণেব তীর্থভ্রমণোপলক্ষে দক্ষিণদেশের যে নাম গুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্রমানুযায়ী বলিয়া বোধ হয় না এবং অনেকটিই বোধ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। কোন কোন স্থানের দেবতার নাম হইতে অভিন্ন কি না বলিতে পারি না। এস্থলে আমরা কৃপালু গোসাঞির লিখিত নামাবলী যথানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিলাম, যথা—শীরুলী, বাবুমন্দর, গোদাবরী, পানানরসিংহ, গণ্ডুর বেঙ্কটগিরি, দক্ষিণ কৈলাস, বালাজী, লক্ষ্মীনারায়ণ, কার্ত্তিকস্বামী, পঞ্চতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, মন্দ্রাজ শহব, শিলিশ্বর মহাদের, কুম্ভকরণ, রঙ্গনাথ, গরবোলাখাড়ি, সেতুবন্ধ, ধনুস্তীর্থ দরপ্সেন, তোতাদারি, সুন্দর মহাদেব, কুমারী কন্যা, লম্বনারায়ণ, ছোটনারায়ন, আদিকেশব, ঠচ্করা—মচকরা, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন, জংজিতগোপাল, বম্বক্লেশর—মহাদেব, বুচিবন্দর, নীলগিরি, মহীসুর, কুমারস্বামী, কিষ্কিন্ধ্যা, মেলকুটা, ভগলকুটা, পাণ্ডারপুর, পুনা, সেতারা, মুম্বাই, নাসিক, সোমনাথ, মাধবদ্বার, মাধবপ্রাচীর, ভীমনাথ, প্রভাস, ডাকরাজি (গুজরাট) গৃহ্বার, দ্বারকা, ভোটদ্বারকা, গোপীতলা, শরতীর্থ, পুষ্করতীর্থ, জয়পুর, ভারতপুর, মথুরা, বৃন্দাবন, হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, গোমুখী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, নেপাল, মথুরা, গয়া, কাশী, বৈদ্যনাথ, ঢাকা, প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে দক্ষিণাভিমুখে গিয়া কন্যাকুমারী, তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে ও তদনন্তর উত্তরমুখে গমন করিয়া গুজবাট প্রভৃতি হইয়া হরিদ্বার, তৎপরে নেপাল আসিয়া পূর্ব্বমুখে দেশে আসিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়।

তিন বৎসর অতিবাহিত করেন, তন্মধ্যে একবৎসর শ্যামকুণ্ডে ছিলেন। তারপর ফাল্গুণ মাসে সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করেন, কুরুক্ষেত্রে গ্রহণোপলক্ষে গৃহত্যাগী বহুতর তপস্বী একত্রিত হইয়াছিলেন, ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন। তাহার পর তিনি হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থদর্শনপূর্ব্বক নেপালরাজ্যের পথে মিথিলাতে গিয়া উপস্থিত হন। মিথিলা হইতে গয়া ও তথা হইতে কাশী দর্শনান্তর, দেশে আসিবার মানসে পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমাগত চলিয়া ঢাকা শহরে আসিয়া উপনীত হন। শহরের দক্ষিণাংশে ফরিদাবাদে তিনি উপস্থিত হইলে তথায় সমবেত কতিপয় বৈষ্ণবসহ তাঁহার দেখা হয়, বৈষ্ণববর্গ রামকৃষ্ণের মুখে অবিরত "পূর্ণব্রহ্ম" ইতি ধ্বনি শ্রবণে তাঁহাকে অসম্প্রদায়ী বোধ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তদীয় অত্যদ্ভুত মহিমা তাঁহাদের গোচরীভূত হয়, তাঁহাকে পরম সাধুজ্ঞান তখন সকলেই বিশেষ সমাদর ও ভক্তি প্রদর্শন করেন।

উৎসব রায় নামে ত্রিপুরার জনৈক রাজা রাজ্যসংক্রান্ত বিরোধবশতঃ উপদ্রুত হইয়া ঢাকায় গিয়া বাস করিতেছিলেন, তিনি এই সাধুর সংবাদ শ্রবণে তৎসমীপে গমন করেন ও সাধুজনোচিত সদ্ব্যবহার এবং অদ্ভুত মহিমা দর্শনে বিস্মিত হন, রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি জন্মে, ফরিদাবাদে উৎসব রায়ের কতকটা ভূমি ছিল, তাহা তিনি রামকৃষ্ণ গোসাঞিকে দান করেন ও তাঁহার কাছে দীক্ষিত হন। ইহাতেই ফরিদাবাদে রামকৃষ্ণ গোসাঞির আখড়া স্থাপিত হয়। ঢাকা হইতে রামকৃষ্ণ কুমিল্লা, জোয়ানশাহী প্রভৃতি হইয়া এবং তত্তৎস্থানে বহুশিষ্য রাখিয়া পরে মাছুলিয়াতে আসিয়া পৌছেন। বিহঙ্গমের ন্যায় মুক্তবাতাসে ৩৬ বৎসর বিচরণ করিয়া ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আখড়াতে উপস্থিত হন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শান্ত গোসাঞি লোকান্তরবাসী হওয়ায় গুরুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। এবং রামকৃষ্ণকেই তখন গদীতে বসিতে হইল।

রামকৃষ্ণ গদীতে বসিলে, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ নানাস্থানে ভক্তাভক্তনির্ব্বিশেষে বহুলোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তদীয় গুণাবলী শ্রবণে তরফের অন্যতম জমিদার সৈয়দ হুসেন আলী[১৩৭] তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, রামকৃষ্ণ জমিদার তনয়কে উপযুক্ত সম্ভাষণের সহিত আসন প্রদান করিলেন। হুসেন আলী বসিলেন এবং সাধুর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, তাঁহাকে উপহার দেওয়ার উপলক্ষে, হিন্দুর অভক্ষ্য দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন।

রামকৃষ্ণ একটি শঙ্খবাদন পুরঃসর উপহার গ্রহণ করিলেন। আচ্ছাদন উন্মোচন করিলে দৃষ্ট হইল যে পাত্রের মধ্যে মিছরি, চিনি, কদলী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে। হিন্দুর অস্পৃশ্য কোন বস্তুই নাই। এতদৃষ্টে সৈয়দ সাহেব রামকৃষ্ণকে প্রকৃত সাধুপুরুষ জ্ঞান করিয়া, পরীক্ষা করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। এই সময় হইতে দেশে রামকৃষ্ণের সুখ্যাতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বঙ্গীয়া নবাব কর্ম্মচারী ইমামকুলি নামে দস্যুবৃত্ত জনৈক মোসলমান শ্রীহট্টে আগমন কালে, রামকৃষ্ণ মহিমাশ্রবণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তিরোহিত হয়। ব্যাধিযন্ত্রণা বিদূরিত হইলে, কুলির এক দুষ্টবুদ্ধি জন্মিল, ভাবিলেন যে এই সাধুকে সঙ্গে রাখিলে আর কখনও রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। সুতরাং তিনি রামকৃষ্ণকে আপন দেশে লইয়া যাইতে মতলব করিয়া, প্রত্যাগমন কালে তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। রামকৃষ্ণ গোসাঞি আখড়াত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন কুলি তাঁহাকে জোর করিয়া, বাঁধিয়া লইয়া নৌকাপথে দেশে চলিলেন। সনাতন ও ব্রহ্মনামক শিষ্যদ্বয় তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

---

১৩৭. ইনি তরফের কোন বংশীসম্ভুত ছিলেন—জানা যায় নাই।

ইমামকুলির নৌকা মাছুলিয়া হইতে নোয়াবাদ নামক স্থানে পৌঁছিল। ঐ স্থানবাসী নয়ান কৈবর্ত্তের নবাবী নাম্নী কন্যা অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত এই পবিত্রাত্মা নারীর বিবাহ হয় নাই, সে রামকৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞান করিত। রামকৃষ্ণকে কুলি লইয়া যাইতেছেন শুনিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিল; এদিকে নৌকা সেইস্থানে আসিয়া আটকিয়া গেল। কুলি তীরে বৃদ্ধাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলে, বৃদ্ধা রামকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিতে প্রার্থনা করিল। কুলি রহস্যভাবেই বলিলেন "বুড়ি, যদি একঢাল টাকা দিতে পারিস্ তবে তোর বেটাকে ছাড়িয়া দিতে পারি" বৃদ্ধার বাস্তবিক কিছু টাকা ছিল, জাল বুনিয়া সে উহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে একখানা ঢাল পুরিয়া যাইবে, তত ছিল না। রামকৃষ্ণের স্নেহবিহ্বলা বৃদ্ধার কিন্তু এতটা বিচার করিবার শক্তি ছিল না। শিষ্য সনাতনও বৃদ্ধাকে সম্মত হইতে পরামর্শ দিলেন; তদনুসারে বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি গৃহে গিয়া টাকার ভাণ্ডটি লইয়া বাহির হইয়া আসিল, বৃদ্ধা আসিতে ত্রস্ততাবশতঃ হাত হইতে পড়িয়া সে মৃৎভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া গেল—ঝর ঝর করিয়া টাকা ভূমিতে পড়িল, তখন দেখা গেল টাকার পরিমাণ অল্প নহে, বহুপরিমিত অর্থ ভূতলে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া রহিল, কুলি একঢালের পরিবর্ত্তে বহু ঢাল পরিমিত অর্থ পাইয়া পূর্ব্ব স্বীকৃতি মতে রামকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কুলি পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণের দৈবশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, এই কাণ্ডটিও তাঁহারই ইচ্ছাসঞ্জাত বোধে মনে করিলেন যে সাধুর অনিচ্ছায় তাঁহাকে আর ক্লেশ দেওয়া সঙ্গত নহে। রামকৃষ্ণ সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন; সেই স্থানে রামকৃষ্ণ কৈবর্ত্তিনী-তনয় রূপেই পরিচিত ছিলেন।

সন্নিকটবর্ত্তী বিথঙ্গল নামক জঙ্গলে তখন হরাই ও সুরাই[১৩৮] নামে দুই ভীষণ দস্যু বাস করিত; বুড়ির টাকার গল্প শুনিয়া তাহারা লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। একরাত্রে বুড়ির বাড়ীতে বড় আশায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দুস্যদ্বয়ের দস্যুজীবনের অন্ত হইবার সময় আসিয়াছিল, তাই রামকৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহারা সঙ্কল্পিত ইত্যাদি পাপে সংলিপ্ত না হইয়া, সাধুর চরণে পতিত হইল ও অনুতাপ করিতে লাগিল। দস্যুদ্বয়কে রামকৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন, তাঁহারা তদীয় কৃপাপ্রাপ্তে ভক্তরূপে পরিণত হইল।

দস্যুদ্বয় রামকৃষ্ণকে বিথঙ্গলের জঙ্গলে লইয়া যাইতে চাহিল। রামকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে বহুতর কৈবর্ত্তকে ভেখ দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া জলপথে বিথঙ্গল গমন করেন।[১৩৯]

মহাত্মা রামকৃষ্ণ গোসাঞি কর্ত্তৃক বিথঙ্গলের প্রসিদ্ধ আখড়া স্থাপিত হয়; এতাদৃশ বৃহৎ আখড়া পূর্ব্বাঞ্চলে দ্বিতীয় নাই। রামকৃষ্ণ তীর্থভ্রমণকালে এই বিথঙ্গলের জঙ্গলের ধারে একদা উপবেশন করিয়াছিলেন ও গুরুস্মরণে একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন। বিথঙ্গলের শ্যামল-বন-সুষমা, বিশালবক্ষাঃ প্রবাহিনীর নীলিমার সহিত মিলিয়া এক শান্ত সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া হল, তদ্দর্শনে এই স্থানেই সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিতে তৎকালে তাঁহার বাসনা জাত । ভক্তের বাসনা কদাপি অপূর্ণ রহে না, বাঞ্ছাকল্পতরু হরিই পূরণ করিয়া থাকেন; তাই এথাকার দস্যুদ্বয় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া শিষ্য হইয়া গেল ও তাঁহাকে এথায় আনয়ন করিল।

বিথঙ্গলে থাকিয়া রামকৃষ্ণ জগন্মোহনী-মত বিশেষ উদ্যম সহকারে প্রচার করিতে লাগিলেন।[১৪০] তাহাতে তাঁহার নামে কেহ কেহ এই সম্প্রদায়ের নামও করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ

---

১৩৮. ইহাদের প্রকৃত নাম হরিবংশ ও সুরানন্দ। হরিবংশ সাহাকুলোদ্ভব এবং সুরানন্দ দাস জাতীয় ছিলেন। ইহাদের উভয়ের বংশ আছে এবং বংশধরবর্গের অবস্থাও হীন নহে বলিয়া জানা যায়।

১৩৯. বিথজলে এক ব্যক্তির নিকট একটি "শ্রীঅঙ্গরী" দিয়া রামকৃষ্ণ বলেন যে, "ইহাতে আমার শ্রী রাখিয়া গেলাম।" তৎপর অঙ্গুরীয়কটি তাহার বাড়ীতে নিয়া প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানই শেষে "শ্রীমঙ্গল" নামে খ্যাত হয়। (এ শ্রীমঙ্গল বিথঙ্গলেরই নামান্তর)

জগন্মোহন গোসাঞিই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, ইহা জগন্মোহনের জীবন চরিতেই বলা হইয়াছে। বৈষ্ণসমাজে প্রাচীন শ্রীসম্প্রদায় যেমন পরবর্ত্তী রামানুজ স্বামীর নামে চলিতেছে, পরবর্ত্তী মধ্বাচার্য্যের নামে যেমন প্রাচীন ব্রহ্মসম্প্রদায় সংজ্ঞিত হয়, রুদ্র সম্প্রদায় যেমন পরবর্ত্তী বল্লভাচার্য্যের নামে পরিচিত এবং সনক সম্প্রদায় নিম্বাদিত্যের নামেই আখ্যাত, তদ্রুপ জগন্মোহনী সম্প্রদায়ও জগন্মোহনের পরাপর শিষ্য (তাঁহার চতুর্থ স্থানীয়) রামকৃষ্ণের নামেও কখন কখনও আখ্যাত হইয়া থাকে।[১৪১]

রামকৃষ্ণ গোসাঞি সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি আছে। একটি মোসলমান ফকির তাঁহাকে চাতুর্য্যজালে আবদ্ধ করিয়া শিষ্য করিয়াছিল বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে তাহা যে একেবারে মিথ্যা, তাহা সহজেই বোধ হয়। বিথঙ্গলে রামকৃষ্ণ ১২ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। বার বৎসর অতীত হইলে একদা তিনি দেহত্যাগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শিষ্যবর্গকে সংবাদ দেন; তখন শত শত শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তে বিথঙ্গল পূর্ণ হইয়া গেল, রামকৃষ্ণের অভিপ্রায় মতে তাহারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, তিনি ধীরে ধীরে মধ্যস্থানে গিয়া বসিলেন, যোগের প্রণালী অনুসারে আসনগ্রহণ করতঃ প্রাণাবায়ু নিরোধ করিয়া বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইলেন ও কিছুক্ষণ পরেই সেই সহস্র ভক্তের কীর্ত্তনমণ্ডলী মধ্যে সমাধি অবলম্বনে ১০৫৯ বাং (১৬৫২ খৃঃ) মাঘী পূর্ণিমাযোগে ৭৬ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

রামচন্দ্র পাল

শ্রীহট্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জ উপবিভাগের পৈল গ্রামে রামচন্দ্র পাল জন্মগ্রহণ করেন, তিনি একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন।

প্রথম বয়সে তিনি ঢাকায় সদর আলার দফ্‌তরে পেস্কারী করিতেন, হাকিম তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তৎকালে উৎকোচ গ্রহণ করা কেহ গ্লানিজনক জ্ঞান করিত না; কিন্তু রামচন্দ্র ঈদৃশ অন্যায়াচরণ অতি ঘৃণনীয় মনে করিতেন। একদা ভাওয়ালের জমিদার কালীচরণ রায়ের সহিত নীলকর ওয়াট্ সাহেবের একটা মোকদ্দমা বাঁধে, এই মোকদ্দমার সরেজমিন তদন্তের ভার হাকিম ইঁহার উপরই অর্পণ করেন। রামচন্দ্র সরেজমিনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই কালীচরণের পক্ষীয় লোক তাহাদের স্বপক্ষে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ২০০০ হাজার টাকা উৎকোচ প্রদান করিল। উৎকোচ গ্রহণ না করিলে তখন তাঁহাকে প্রাণশঙ্কটে পড়িতে হইত, কাজেই বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে বলিতে হইল যে টাকাটা ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেই নিরাপদে পাওয়া যাইবে। এই উপায়ে তিনি ধর্ম্ম ও প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া আসিলেন। যদিও অবস্থানুসারে রিপোর্টটা কালীচরণের পক্ষে দিতে হইয়াছিল, তথাপি প্রেরিত ২০০০ টাকা তিনি পরে ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই কথাটা সকলেই শুনিয়াছিল এবং আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সদর আলার কর্ণেও কথাটা গিয়াছিল, শুনিয়া তিনি রামচন্দ্রকে বিষয়-বুদ্ধি-বিহীন বলিয়া প্রকাশ করেন। ফলতঃ এই ব্যাপারে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা মনে করিয়াই তিনি স্নেহভাজন রামচন্দ্রকে এই তদন্তে প্রেরণ করেন। তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ উন্নত ছিল, এই একটিমাত্র উদাহরণেই তাহা বুঝা যায়।

---

১৪১. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের ১ম ভাগে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন।" তিনি একটু পরে ইহাও লিখিয়াছেন—"রামকৃষ্ণের সময়েই এই মত সমধিক প্রচারিত হয়।" ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন—A new religious sect has spring up among the Kailbartas founded by a certain Ramkrishna Gosain a member the that sect &c. &c-Imperial Gazetteer of India. 2nd. Ed. p 149.
এই উভয় গ্রন্থকারেরই কোন কোন বিষয়ে ভ্রম হইয়াছে, বলা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

ঢাকা হইতে তিনি শ্রীহট্টে আসিয়া ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীহট্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কর্ম্মঠতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সদরে প্রধান মুন্সেফ নিযুক্ত করেন। শ্রীহট্ট হইতে পরে তিনি বরিশালের কোটেরহাট বদলী হইয়াছিলেন।

সচরাচর দেখা যায় যে, নিজের বা পরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী অনেকেই ততটা লক্ষ্য করে না, রামচন্দ্র এ প্রকৃতির ছিলেন না, তিনি সামান্য দোষকেও বৃহৎবৎ মনে করিতেন। বরিশালে থাকাকালে এক বৃদ্ধা পাটুনী প্রতিবেশিনী একদা তাঁহার বাসায় আসিয়া কিছু কলমী শাক দেয়। তিনি খাইতে বসিয়া প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই শাক কোথায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী পাটুনী বুড়ির কথা বলিলে, দাম দেওয়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। যখন তিনি জানিলেন যে বুড়িকে শাকের দাম দেওয়া হয় নাই তখন অমনি পাত হইতে উঠিলেন ও বাহিরে গিয়া তখনই সেই বুড়িকে ডাকাইয়া আনাইয়া দামটি দিয়া তবে কাছারিতে গেলেন! বস্তুতঃ এইরূপ ক্ষুদ্র কার্য্যেই লোকের অন্তঃকরণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

বরিশাল হইতে একদা পূজার সময় বাড়ী আসিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, গ্রামের লোকেরা একটি অসহায় ব্রাহ্মণ পরিবারকে অন্যায়রূপে সমাজচ্যুত করিয়াছেন। শুনিয়াই তাঁহার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল, তিনি সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে নিজ পৌরহিত্যে বরণ করিয়া লইলেন। ইহাতে কাজেই তাঁহাকেও সমাজচ্যুত হইয়া একা থাকিতে হইল। ষোল বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া একা থাকেন, একদিনের জন্যেও তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, রামচন্দ্র এরূপই সদাশয় ছিলেন।

সুবিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইঁহারই একমাত্র পুত্র। বিপিন বাবু তাঁহার "প্রাণতুল্য" ছিলেন; কিন্তু এই "প্রাণতুল্য" পুত্র যখন হিন্দু ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মমতের অনুসরণ করেন, তখন তেজস্বী পিতা আপন হস্তে আপনার হৃদয় উৎপাটনাপেক্ষা গুরুতর কাণ্ড করিয়া বসিলেন; তিনি আপনার "প্রাণতুল" পুত্রকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে বর্জ্জন করিলেন। তিনি মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে, ইহাতে পুত্রের মত পরিবর্ত্তিতও হইতে পারে কিন্তু যখন তাহার কেন চিহ্নই দেখা গেল না, তখন নিষ্ঠাবান রামচন্দ্র পিণ্ডলোপের ভয়ে বৃদ্ধবয়সে দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হইক, পুত্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ বিলুপ্ত হয় নাই, তিনি অন্তিমকালে যে উইল করিয়া যান, তাহাতে সমস্ত সম্পত্তিই পুত্রকে প্রদত্ত হয়।[১৪২]

রুদ্রদেব মুনিগোসাঞি

ছাতি আইনের ভট্টাচার্য্য বংশে আন্দাজ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে রুদ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম শঙ্করদেব ভট্টাচার্য্য। জেলা ত্রিপুরার নুরনগরের দেবগ্রামবাসী শুভগিরের নিকট তিনি দীক্ষিত হইয়া কসবাতে গিয়া কালী সাধনায় বৃত হন। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছিল।

ত্রিপুরার মহারাজ তাঁহার গুণগ্রামে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অনেক ভূমি দান করিতে চাহেন, কিন্তু তাহা গ্রহণে তিনি অস্বীকৃতি হইলে, দৈনিক দুগ্ধের বরাদ্ধ জন্য মহারাজ মাসিক দুই টাকা হিসাবে বার্ষিক ২৪ টাকার বৃত্তি অবধারিত করেন এবং কালীবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেন।

রুদ্রদেব বিবাহ না করায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শুভঙ্কর শুরু শুভগির সদনে গিয়া ভ্রাতাকে বিবাহ করার আদেশ দানের জন্য বারবার প্রার্থনা করেন। শুভগির তখন শিষ্যকে বিবাহ করিতে আদেশ করেন। এদিকে ভ্রাতাও বিবাহের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হন; ফলে অতি শীঘ্রই

১৪২. বিজয়া পত্রিকা ১৩১৯ বাং মাঘ সংখ্যায় লিখিত "পিতা পুত্রে" প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

ব্যাপার উপস্থিত হয়। যখন সপ্তপ্রদক্ষিণ হইবে, তখন একটা ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ তিনি কোথায় চলিয়া যাওয়ায়, সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাওয়া গেল না, কিন্তু কতক্ষণ পরে তিনি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে তাঁহার নিরুপিত জপকাল উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। শ্বশুর জামাতার এই কাণ্ডদর্শনে তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগল মনে করিয়া বিষাদিত হইয়াছিলেন কিন্তু ভব্য ব্যক্তিবর্গের কথায় তাঁহাকে "সিদ্ধপুরুষ" জানিয়া আশ্বস্ত হন।

একদা ছাতিআইনে একটা বন্যহস্তী সমাগত হইয়া লোকের ভীতি উৎপাদন করে; উপায়ান্তরহীন ও একান্ত ভীত হইয়া বহু ব্যক্তি রুদ্রদেবকে ইহা জানাইলে, তিনি আড়াই হাত মাত্র লম্বা একটি লাঠি তাহাদিগকে দিয়া তদ্দারা হাতী তাড়াইতে অনুমতি দিলেন। লোকেরা কেহই হাতী তাড়াইতে সাহসী হইল না, তখন তিনি স্বয়ং হাতীর কাছে গিয়া বলিলেন "বাবা, যে পথে আসিয়াছ, চলিয়া যাও।" সাধু এই কথা যেমন বলিলেন, কথিত আছে যে হাতীটা অমনি চলিয়া গেল। সাধুর ইচ্ছাশক্তির ও আদেশের ক্ষমতা দেখিয়া দর্শকগণ ভক্তিপুতচিতে তাঁহাকে প্রণাম করিল ও তদবধি তাঁহাকে সকলে "মুনিগোসাঞি" বলিয়া আখ্যাত করিল।

মুনিগোসাঞি শেষটা বসন পরিধান করিতেন না, দিনের বেলায় একখানা মোটা গিলাপ গায় দিয়া রাখিতেন, ইহা হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িত, রাত্রে কিছুই গায় থাকিত না, ও উলঙ্গাবস্থায় শ্মশানে গিয়া জপ করিতেন। ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ গঙ্গাধর মাণিক্যের বিশেষ প্রার্থনা তদ্দত্ত একটা বড় ঝারি (গাড়) তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাহা ব্যবহার করিতেন। ইহার জল, সকলের সকল প্রকার রোগে, প্রার্থীকে ব্যবহার করিতে দিতেন ও তাহাতেই তাহারা নিরাময় হইত।

কখন কখন তাঁহাকে পদ্মপত্রে উপবিষ্ট হইয়া জপকরিতে দেখা যাইত। তখন তাঁহার দেহ অসম্ভব লঘু হইয়া যাইত। ইহা শুনিতে অসম্ভব বোধহয় বটে, কিন্তু সাধকপুরুষদের ব্যবহার পক্ষে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাওয়া সুযুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না।[১৪৩] রুদ্রদেব ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত তিনি দেহত্যাগ করেন।

লব কিশোর দাস

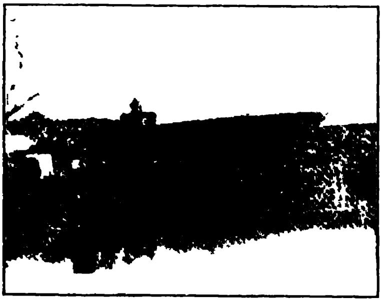
ত্রিপুরার অন্তর্গত ধরমণ্ডলের ধরবংশীয় একব্যক্তি পূর্ব্বে পঞ্চখণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি শিকারে গিয়া সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী সাহুকুলোৎপন্না রূপ লাবণ্যশীলা এক বালিকাকে জল আহরণে আসিতে দেখিতে পান। তিনি তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই জলাশয়েই জল পান করিতেছিলেন। তিনি বালিকার রূপে মোহিত হন ও তাহাকে বিবাহ করিয়া এদেশে থাকিয়া যান। তাঁহার নারায়ণ ও বিষ্ণু নামে দুই পুত্র হয়, যথাক্রমে ইহাদের যাদব ও বলরাম নামক দুইটি সুকৃত তনয় জন্মে; তাঁহাদের আবিষ্কৃত খামার ভূমি "যাদব বলাইর কালাইওরা" নামে আজিও চিহ্নিত হইয়া থাকে, এবং তাঁহাদের বংশ "যাদব বলাইর বংশ বলিয়া পরিচিত"।

বলরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম লালচন্দ্র ও মুলুকচন্দ্র; লালচন্দ্রের পুত্রই লবকিশোর। লবকিশোর যৌবনে কাছাড় জিলার লক্ষ্মীপুর থানার পোলিশের দারোগা ছিলেন। পোলিশের স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী যে তাহাতে ছিল না, এমন নহে। তিনি একজন তেজস্বীপুরুষ ছিলেন।

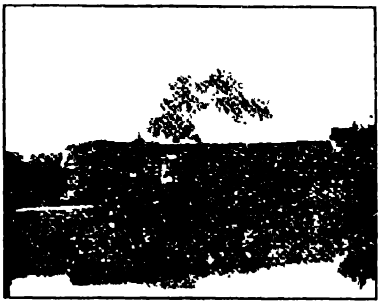
"ঈশ্বর মঙ্গলময়" এ কথায় তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল, এজন্য বিপৎপাতে তিনি ভরসাশূন্য

---

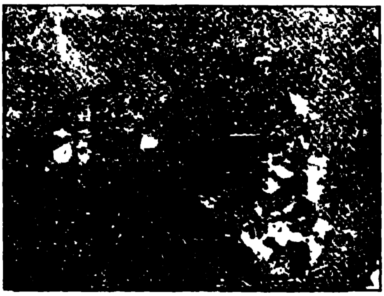
১৪৩. পদ্মপত্রে উপবেশনপূর্ব্বক জপ করিতে যাঁহারা বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন, এইরূপ দুই এক জন বৃদ্ধ জীবিত আছেন বলিয়া আমাদের বিবরণ দাতা লিখিয়াছিলেন।



(১) বিথঙ্গলের আখড়া- উত্তরদিক্ হইতে



(২) বিথঙ্গলের আখড়া- পূর্ব্বদিক্ হইতে



রামকৃষ্ণ গোসাঞির সমাধি

হইতেন না, এবং সর্বদাই এই বিশ্বাস তাঁহাকে সদানন্দ রাখিতে পারিত। একদা এক দরিদ্র নিজের অর্জ্জিত অর্থ দারোগার চরণে উৎসর্গ করিয়া বলিয়াছিল যে অনর্থকর অর্থের পরিমাণ এইরূপেই হইয়া থাকে, এই বাক্যটিতে তাঁহার আত্মদৃষ্টি উন্মোষিত হয়, কার্য্যে আর মনোযোগ থাকিল না, এবং তদবধি পদে পদেই ত্রুটি লক্ষিত হইতে লাগিল। এই সময়ে জিরিঘাট চা বাগানের মেনেজার সাহেবের প্রায় আট সহস্র টাকা অপহৃত হয়; লবকিশোর দুইটি চোর ধৃত করেন, অন্য এক ব্যক্তি এই ব্যাপারের মূলাধার ছিল, কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাবে দারোগা তাহাকে

ধৃত না করায়, মেনেজারের উদ্যোগে তাঁহার উপর উৎকোচ গ্রহণের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু বিচারে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হন। পূর্ব্বেই তাঁহার মনে একরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, এই ঘটনার পর তিনি স্বেচ্ছাতঃ কর্ম্মত্যাগ করেন, এবং অল্প কিছুদিন দেশে অবস্থিতির পর বাটী ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ নবদ্বীপে ও তাহার অল্পকাল পরেই বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ নিস্পৃহতা, বৈরাগ্যাদি দর্শনে স্বর্গীয় গোবিন্দদেবের সেবাধিকারী প্রীত হইয়া স্বর্গীয় গোবিন্দের বাড়ী হইতে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন; তিনি নিশ্চিন্তে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি ভেখাশ্রয়পূর্ব্বক নরোত্তম দাস নামে খ্যাত হন ও মনের আনন্দে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া "বৃন্দাবন প্রাপ্ত" হন। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে যে, তাহাই মানবের জীবনতরি সুপথে চালিত করিয়া থাকে, লবকিশোরের জীবন তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থানীয়।

লেঙ্গটা বাবা

আগিয়ারাম পরগণার চক্রবাণী বাসী হুলাস পাটুনীর পুত্র অর্জ্জুন বাল্যকালে রাখালদের সঙ্গেই সময়াতিবাহিত করিত। বয়োধিক হইলে "রামায়নী গানে" যোগ দিতে অর্জ্জুনের বড়ই আগ্রহ ছিল। এখনও অনুন্নত সমাজে চরহাতে লইয়া রামায়ণী গাইবার প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। অর্জ্জুনের পিতার ইহাতে সম্মতি ছিল না বলিয়া অর্জ্জুনের গানে যাওয়া হইল না, পিতৃ অভিপ্রায়ে তাহাদের কাপড়ের ক্ষুদ্র দোকানেই তাহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইল। প্রতিবেশী কিশোর পাটুনীর বাড়ীতে গানের "তালিম" (শিক্ষা) হইত, অর্জ্জুন গোপনে মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া যোগ দিত।

একদা কিশোরের গৃহ হইতে একটি "ঝাপি" (বেত্র নির্ম্মিত পেটিকা) অপহৃত হয়, উহাতে গহনা পত্রাদি ছিল। বাড়ীর লোকেরা অর্জ্জুনের উপরেই সন্দেহ করিল। অর্জ্জুনকে তাহারা চুরির কথা জানাইলে অর্জ্জুন বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কিশোরের গৃহে যাওয়া বন্ধ করিল। ইহাতে কিশোরদের মনে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল এবং তাহারা রীতিমত থানায় এজাহার দিল। পোলিশ তদন্তে আসিলে, কিশোরদের ষড়যন্ত্রে ছেঁড়াজাল পূর্ণ একটা ঝাঁপি অর্জ্জুনদের গৃহের সন্নিকট-বর্ত্তী জলপূর্ণ খানা হইতে, কিশোরদের লোক কর্ত্তৃকই উত্তোলিত হইল, ফলে চোর বলিয়া অর্জ্জুনকে হাজতে প্রেরণ করা হইল।

কাল মাহাত্ম্যে প্রথমতঃ মিথ্যারই জয় দৃষ্ট হইতে লাগিল, অর্জ্জুন আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া হাজত হইতে পলায়ন করিল কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতেই ধৃত হইয়া বিচারে দেড় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়।

কারামুক্তির পর দেশে আসিলে অর্জ্জুনের ভাবান্তর দৃষ্টে সকলেই মনে করিল, লজ্জায় অর্জ্জুন কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না। কিন্তু তাহার ভাব ছুটিল না বরং দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন পাগল হইল—ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে বা চিৎকার করিয়া উঠে; তবে কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে না, কাহাকেও কোন কথা বলে না। কিছুদিন মধ্যেই অর্জ্জুন পরিধেয় বসন ত্যাগ করিয়া লেঙ্গটা হইয়া রহিল, বস্ত্র দিলেও ফেলিয়া দিত।

একদিন একজন মোসলমান, অকারণে লাঠির আঘাতে অর্জ্জুনের মাথা ফাটাইয়া দিল—রক্তপাত হইতে লাগিল। দর্শকগণ অকারণে প্রহারকারী লোকটাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু পারিল না অর্জ্জুন বাধা দিয়া লোকটাকে রক্ষা করিল। তখন লোকেরা বুঝিতে পারিল যে অর্জ্জুনের হাস্য ক্রন্দনাদি বায়ুর বিকৃতিজনিত নহে। সেই দিন হইতে অর্জ্জুনের পাগল

নাম ঘুচিল, অর্জ্জুন গৃহত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে কিঞ্চিৎ ডাল চাল সংগ্রহক্রমে একটা মৃৎপাত্রে একত্রে তাহা সিদ্ধ করিয়া তদ্দারাই ক্ষুধানিবৃত্তি করিতনে। মৃৎপাত্রটা একটা গাছের ডালে লটকাইয়া রাখা হইত।

অর্জ্জুনের বিবিধগুণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল, যাহাকে যে কথা বলা হইত, তাহা সফল হইতে লাগিল। অতি দূরবর্ত্তী স্থানে যাহা ঘটিত বা ঘটবে, অর্জ্জুন একস্থানে বসিয়া তাহা বলিয়া দিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। তদবদি অর্জ্জুন "লেঙ্গটা বাবা" নামে খ্যাত ও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হন।

ইহার পর "লেঙ্গটা বাবাকে" চলিতাবাড়ীর আখড়ায় দেখা যায়, ঐ স্থানে তাঁহাকে বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা গেলেও লেঙ্গটা বাবা নামটি যায় নাই। অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উদ্ভব হইয়া থাকে। লেঙ্গটা বাবার বিবরণ তাহার প্রমাণ; ভগবৎকৃপা যে বিদ্যাকুলের অপেক্ষা রাখেনা, লেঙ্গটা বাবার কথা ইহারও উদাহরণ।

শরচ্চন্দ্র তপস্বী

শরচ্চন্দ্র বৈদ্য সন্তান, তাঁহার পিতা নাম সোণাচাঁদ দত্ত। মাতা সিদ্ধেশ্বরী। সতরশতী পরগণার বাউরভাগ গ্রামে ১২৪৬ বাংলার কার্ত্তিক মাসে পুরকায়স্থ বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যাবধি শরচ্চন্দ্রের সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্য লক্ষিত হইত, ইহাই পরে প্রবল বৈরাগ্যে পরিণত হইয়াছিল।

শরচ্চন্দ্র কাশীধামে গমন করিয়া "চরক সংহিতা" অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাহার পর তথায় পাঁচবৎসর কাল বেদান্ত অধ্যয়নের পর তিনি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে তিনি গোবিন্দদেবের "ফৌজদার" নিযুক্ত হইয়া বহুদিন গোবিন্দের চাকুরি করেন। ইহাতে তাঁহার যে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, তদ্বারা তিনি "গোবিন্দঘাট" ও "শরৎকুঞ্জ" প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক স্বর্গীয় গোবিন্দের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান।

শরচ্চন্দ্র চিরকুমার, পরমজ্ঞানী ও পবিত্রচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ চরিত্রবান ব্যক্তি সহসা দেখা যায় না। তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও শাস্ত্রজ্ঞান অসাধারণ ছিল, বৃন্দাবনে অবস্থানকালে বহুকাল তিনি যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই বৃন্দাবনে "তপস্বী" নামে খ্যাত হন। বৃন্দাবন হইতে "শ্রীচৈতন্য মত বোধিনী" নাম্নী যে মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়, ইনি তাহার কর্ণধারস্বরূপ ছিলেন। ১২৮৫ কি ৮৬ বাংলায় তিনি ভেখ আশ্রয় করিয়া গুরুচরণ দাস নামে খ্যাত হন, এবং বৃন্দাবনের "কুসুম সরোবরে" ভজনানন্দে ক্ষেপন করেন, সেই স্থানেই ১৩০৬ বাংলার কার্ত্তিক মাসে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বৃন্দাবনের অনেক মহাত্মা ব্যক্তি তাঁহার অভাবে দুঃখিত হন। বৃন্দাবনের "শ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব" পত্রে "ইহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট গুণীলোকের অভাব, গুণজ্ঞ মাত্রেরই অনুভূত হইল" বলিয়া খেদসূচক বাক্য প্রকাশিত হয়।

শান্তারাম অধিকারী

দাস জাতীয় পানিয়সী ও মহিষাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের নামে পানিশালি পরগণার নাম হয়। এক বিপ্রপুত্র হয়বৎনগরের গদিতে ভেখগ্রহণে শুকদেব নাম ধারণ পূর্ব্বক এই পানিশালিতে আগমন করেন; ইহার শিষ্য ঠাকুর ব্রজবল্লভ, ইনি তথায় এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, উহাই পানিশালির আখড়া বলিয়া খ্যাত। এই আখড়া হয়বৎ নগরের আখড়ার শাখা বিশেষ।

ঠাকুর ব্রজবল্লভ পং ডেওয়াদিনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করেন। ইনি একজন প্রতিভাশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন, বৈষ্ণব হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যে ইনি বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব স্মৃতি, ও ভক্তিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, সদাচার, পরমার্থ নিষ্ঠা ও ভক্তিতে আবাল বৃদ্ধ বিমোহিত হইত; ইহার ফলে শ্রীহট্টের পূর্ব্বাঞ্চলের অসংখ্য লোক পানিশালির আখড়ার শিষ্যশ্রেণী ভুক্ত হয়।[১৪৪] এই মহাত্মার নাম শান্তরাম, সচরাচর তিনি ঠাকুর শান্তরাম নামেই কথিত হইয়া থাকেন।

শান্তারাম যে শুধু সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন এমন নহে, দেশের রাজশক্তি, শ্রীহট্টের আমিল বা ফৌজদারগণ, তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বহু সংখ্যক সনন্দদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবত্র দান করিয়াছিলেন।[১৪৫] ১১৯৩ সালে তাঁহার "প্রাপ্তি" (মৃত্যু) ঘটে।

পানশালির আখড়ার দেবতার নাম স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহের দেবত্র ঠাকুর শান্তরামের প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি অনেক ছিল, বালাগঞ্জের বাজার প্রভৃতি তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই বাজার লালা আনন্দরামের স্ত্রী স্বীয় গুরু ধর্ম্মদাসকে (ধর্ম্মদাস শান্তরামের শিষ্যের প্রশিষ্যে ছিলেন) দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আখড়ার ধর্ম্মনিরত অধিকারিগণ পরমার্থ চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, আর্থিক উন্নতি অবনতির প্রতি লক্ষ্যমাত্র ছিল না, তাই তাহা পরে হস্তচ্যুত হয়। কোন অধিকারী (পূর্বোক্ত ধর্ম্মদাস) একদা ইষ্ট চিন্তায় উপবেশন করিয়াছিলেন তৎকালে সরকারি প্যাদা রাজস্বের জন্য ডাকাডাকি করায়, বিরক্ত হইয়া ধর্ম্মবিঘ্নজনক সেই সম্পত্তিগুলি (ধর্ম্মপুর

১৪৪. ধনীবাম নামে এক বিদ্রোহী আত্মা ইহাব শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। উক্ত বিদ্রোহী অলকেস্য থাকিয়া আখড়াব বিবিধ কার্য্য করিয়া দিত। ধনীরা[illegible] উদ্দেশ্যে অদ্যাপি আখড়ায় ভোগের একখানা প্রসাদ অর্পিত হইয়া থাকে।

১৪৫. ঠাকুর শান্তবামের প্রাপ্ত কয়েকটি সনন্দের মর্ম্ম এস্থলে প্রদান করা অসঙ্গত হইবে না।

(১) নবাব হরিকিষুণ দাস মনসুর উল মুলক এক সনন্দে (নং ১১০৫) ৩ জলুসের তারিখে পং ঢাকা উত্তর মৌজে করগাও হইতে ৬।১৷৷ ভূমি দেবত্র দান করেন। ইহার মন্তব্যে লিখিত আছে যে "শান্তরাম অধিকাবিব প্রাপ্তি" হইলে তাঁহাব শিষ্য জয়গোবিন্দ অধিকারী ও দয়ালদাস অধিকারী "বিত্ত তছরূপ" করেন। ইহাও জানা যায় যে, ১২০৭ সালে দয়ালদাসের প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার শিষ্য ধর্ম্মদাস বৈষ্ণব উহা "তছরূপ" করেন।

(২) নবাব হাজি হুসেন খাঁ বাহাদুর বয়ালজোর হইতে এক সনন্দে (নং ১০৬৪) তাঁহাকে ১।০৩৷৷ ভূমি দেবত্র দেন। ঐ সনন্দের মন্তব্যে লিখিত আছে যে ১১৯৩ সালে তাঁহার প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার শিষ্য জয়গোবিন্দ ও দয়ালদাস উহা "তছরূপ" করেন।

এইরূপ অনেক সনন্দ আছে, দুইখানা মাত্র উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইল। সাকিন ফুরকাবাদ বাসী রত্নবল্লভ দেব ও রামবল্লভ দেব ১১৭০ সালে তাঁহার নামে ফুরকাবাদ হইতে ৪।০৷৷... ভূমি দেবত্র দান; এই দলিল কালেক্টারিতে ১০৮৮ নং ভুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছে। দেশের ভূমাধিকারিগণের প্রদত্ত এই রূপ বহু দেবত্রই ছিল; এস্থলে মাত্র একটি কথা উল্লেখিত হইল। ঠাকুর শান্তরাম ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অন্যব্যক্তিদের নামেও দেবত্রের দানপত্র কালেক্টরীতে দৃষ্ট হয়; ঠাকুর শান্তরামের শিষ্য পূর্বোক্ত জয়গোবিন্দ অধিকারী কুশিয়ারকুল হইতে তাঁহাকে ১০০/হাল ভূমি দেবত্র দান করেন।

ইন্দেশ্বরবাসী শ্যামরাম সোম ও আনন্দরাম ১১৮২ সালের ২৫ সাবান তারিখে ইন্দেশ্বর হইতে "দেবতার সেবার জন্যে" ৷৷১৷৷০ পরিমিত ভূমি এক দানপত্রে (নং ৩৩৮) গানিশালির "চম্পকপ্রিয়া বৈবাগিনি ঠাকুরাইন" নামে অর্পণ করেন।

শ্রীহট্টের ফজলআলী মজুমদার উক্ত আখড়ার গউরদাস বৈষ্ণবকে ইন্দ্রেশ্বর হইতে /১ জমি "ব্রহ্মত্র" দান করেন। অধিকারী উপাধি না থাকায় বোধ হয় যে, ইনি সাধারণ বৈষ্ণব ছিলেন।

এই আখড়ার অধিকারী ও বৈষ্ণববর্গ যে গুণী ও জ্ঞানী ছিলেন এবং সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; কালেক্টরীতে রক্ষিত এই সব সনন্দ তাহার প্রমাণ দিতেছে। ব্রাহ্মণ অধিকারিগণের দাসাত্মক নাম শুদ্রত্বব্যঞ্জক নহে, দীনতাজ্ঞাপক মাত্র।

এবং বাজার প্রভৃতি) ত্যাগ করেন। অনেক মহালই রাজস্ব বাকিতে এবং কোন কোন মহাল "বিপ্লবী" ব্যক্তিবর্গের চক্রে হস্তান্তর গিয়াছে।

এই আখড়াতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতীয় কেহ অধিকারী হইতে পারেন না; আখড়ার অনেক ব্রাহ্মণ ও ভদ্র শিষ্য ছিলেন ও আছেন।

ঠাকুর শান্তরামের শিষ্য জয়গোবিন্দ ও ঠাকুর দয়াল, তাঁহার শিষ্য ধর্ম্মদাস (ঠাকুর ধনঞ্জয়), ঠাকুর ধনঞ্জয়ের শিষ্য ভক্তিময়জীবন ঠাকুর রামমোহন ও ঠাকুর নিমাই চাঁদ, ইহার শিষ্য ঠাকুর নিতাই চাঁদ, ইহার শিষ্য শ্রীযুক্ত রত্নগোবিন্দ অধিকারী এক অতি প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

শাহ আব্দুল আলা চরিত

ইহার নিবাসস্থান শ্রীহট্ট এবং সাধনস্থান সুবর্ণগ্রাম। "মোগড়া পাড়া গ্রামের উত্তরাংশে গোহাটা মহল্লায় সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ আব্দুল আলার সমাধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইনি পোকাই দেওয়ান নামে পরিচিত। কথিত আছে ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর কাল নিবিড় অরণ্য মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই সময়ে ইহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল; এমনকি, আহারাদির জন্যও ইনি কোনও সময়ে ধ্যানভঙ্গ করেন নাই। ইঁহার অনুচরবর্গ এই পরমযোগী মহাপুরুষের অন্বেষণে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই স্থানে ইহাকে একটী উইর ঢিপিমধ্যে ধ্যানমগ্নাবস্থায় প্রাপ্ত হয়। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ ১৮৬৪ সনে সুবর্ণগ্রামে এরূপ বয়োবৃদ্ধ লোক বিদ্যমান ছিলেন যাঁহারা এই মহাপুরুষের পুত্র শাহ ইমাম বক্স বা চুলুমিঞাকে তথায় জীবিতাবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। চুলুমিঞা বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহট্ট হইতে পিতার সমাধিস্থান পরিদর্শন করিতে এখানে আগমন করেন এবং কতিপয় বৎসর এখানে বাস করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। পিতা পুত্রের সমাধি একই স্থানে পাশাপাশি ভাবে রহিয়াছে।

J.A.S.B. 1874 Pt. I."

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড)

শাহ জলাল

শাহ জলাল মোসলমান ধর্ম্মজগতে অতি উচ্চ অধিকারী এবং অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন একজন প্রধানতম দরবেশ ছিলেন; ইঁহার জীবনচরিত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ২য় খঃ ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানে পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

শাহ পাতা

হযরত শাহ জলাল শ্রীহট্ট আগমনের অল্প পরে শাহপাতা শাহ জলালের যশঃ গৌরব শ্রবণে এদেশে আগমনপূর্ব্বক পং ভাদেশ্বরের অন্তর্গত দক্ষিণভাগে বাস করেন। তৎকালে তদঞ্চল জঙ্গল পুরিত ছিল, কদাচিৎ তিনি জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া জেলেদের পল্লীর নিকটবর্ত্তী বাজারে আসিতেন।

ঐ জেলে পাড়ায় এক "চণ্ডী" জাতীয়া জেলেনী তদীয় ভিক্ষাজীবী দরিদ্র স্বামীকে নানা যন্ত্রণা দিত, যেদিন স্বামী সেই বিরলবসতি স্থানে ভিক্ষা না পাইয়া রিক্তহস্তে ফিরিত, জেলেনী সেইদিন ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভিক্ষাজীবী যুবককে আক্রমণ করিয়া প্রহারে জর্জ্জরিত করিত। রক্তমাংসের শরীর তো, কত সহে? একদিন স্ত্রী কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া যুবক নিজ মনে ধিক্‌কৃত

হইল ও জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত হইবে মানসে জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইল। যুবক যাইতে যাইতে হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কোন হিংস্র জন্তুর সহিত দেখা হইল না, তৎপরিবর্তে এক কন্থাধারী শীর্ণকায় সাধুকে দেখিতে পাইল; যুবক চিনিল যে, এই সাধু সেই ব্যক্তি, যাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বাজারে দেখা যাইত। সাধু এক বৃক্ষমূলে একটি মৃৎভাণ্ডে ডালচাল একত্রে মিশ্রিত করিয়া রন্ধন করিতেছেন, আর ইষ্টনাম জপ করিতেছেন। যুবক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, এদিকে সাধু মুষ্টেক অন্ন দুই পাতে পরিবেশন করিয়া যুবককে ইঙ্গিত করিলেন। আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া যুবক দেখিল যে নিকটে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র পোষিত বিড়ালের ন্যায় বসিয়া লাঙ্গুল নাড়িতেছে! যুবক ভাবিল এইবার আশা পুরিবে।

সাধুর তাহার মনোভাব বুঝিতে বাকি নাই, তিনি বলিলেন "ভাই মরিবে কেন, বাড়ীতে গিয়া খোদার নাম লও, মঙ্গল হইবে।" যুবক শুনিতে শুনিতে সেই অন্নমুষ্টি খাইতে লাগিল। যুবক অনেক খাইল, আর খাইতে পারে না, কিন্তু সেই অন্নমুষ্টি তখনও শেষ হয় নাই। যুবক সাধুদত্ত অন্নের মহিমায় আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তদীয় আদেশে বাড়ীতে চলিল।

যাওয়ার কালে সাধু বলিয়া দিলেন "সাবধান যুবক, এথাকার কোন কথা লোকালয়ে ব্যক্ত করিও না, তাহা হইলে অনিষ্ট ঘটিবে।"

যুবক জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইলে সেই রনচণ্ডী তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়াছিল এবং আপনার আচরণের কথা স্মরণে অনুতপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সে স্বামীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রেম-গদগদবাক্যে ক্ষমা চাহিয়া, সে কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসিল। পত্নীর মিষ্টবাক্য শ্রবণে যুবক মুহূর্তে সকল ভুলিয়া গেল, সাধুর নিষেধ বাণী আর তাহার স্মরণ রহিল না, সে সাধুর কথা সর্বাগ্রেই প্রকাশ করিয়া ফেলিল! সাধুবাক্যের ব্যত্যয় নাই; তৎক্ষণাৎ সে এক ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল ও দেখিতে দেখিতে গতাসু হইল।

এই আশ্চর্য্য কথা পরমুহূর্তে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল, সাধুকে বাহির করিতে বহুলোক দা, কুড়ালি দ্বারা জঙ্গল আবাদ করিতে লাগিল। জঙ্গল বহুদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইল; কিন্তু কন্থাধারী সাধুকে পাওয়া গেল না।

সেই স্থানের নিকটে বহুশাখাসম্বলিত একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল, একদিন হঠাৎ লোকে তাহার মূলে কন্থাধারীকে দেখিতে পাইল। সে দিন তত্রত্য জমিদার গৃহে এক উৎসব ছিল, জমিদার সাধুকে নেওয়ার জন্য লোক পাঠাইলেন। সাধু বলিলেন "আমার কাপড় নাই, আমি যাইতে পারি না" জমিদার লোকমুখে ইহা শুনিয়া ভাল কাপড় দিয়া আবার সেই ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। সাধু কাপড় গ্রহণ করিলেন কিন্তু নিজে ব্যবহার না করিয়া "বড়শীত" এই কথাটি বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন।

ভূস্বামী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বস্ত্র চাহিয়া পাঠাইলেন, সাধু হাসিতে হাসিতে অগ্নি হইতে সেই বস্ত্রই তুলিয়া দিলেন। দগ্ধবস্ত্র পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ভূস্বামী বিস্মিত হইলেন। ভূস্বামী অনতিবিলম্বে সেই স্থানে স্বয়ং আগমন করিলেন, হায়! তখন কন্থাধারী দেহত্যাগ করিয়া চলিযা গিয়াছেন!! অশ্রু-বিসর্জন পূর্ব্বক ভূ-স্বামী স্বহস্তে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন। এই সাধুর নাম পাতা শাহ। ইহার কবর এখন তথায় আছে।

শাহ পেড়া

পেড়া শাহ মোসলমান জাতীয় ছিলেন। পেড়া শাহের প্রকৃত নাম কি ছিল বলা যায় না। পেড়া শাহের স্ত্রী অসচ্চরিত্রা রমণী ছিল, এবং পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জনৈক প্রতিবেশীর সঙ্গে

পলাইয়া গিয়াছিল। পেড়াশাহ পত্নীকে বড়ই ভালবাসিতেন, সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তিনি তাহার বিরহে জর্জ্জরিত হন। নিকটে এক প্রৌঢ়ার বাড়ী ছিল, পেড়া তাহার কাছে কখন কখন হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ করিতেন। স্ত্রীর কথা কহিতে কহিতে তাঁহার নয়ন দিয়া জলধারা বহিত। একদিন সেই প্রৌঢ়া তাঁহাকে বলিল "তুমিত স্ত্রীর জন্য কাঁদিতেছ কিন্তু সে দুষ্টা কি তোমায় স্মরণ করিতেছে, সে হয়তঃ এখন উপপতির সহিত রসালাপে মত্ত আছে। এত কাঁদিতে পারিতে যদি খোদার নামে, তবে খোদা থাকিতে পারিতেন না, তোমায় দেখা দিতেন, তোমার দুঃখ তাপ দূর করিতেন।"

পেড়া স্থির হইয়া কথাগুলি শুনিলেন, দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু খোদাকে ডাকা আমার মতো গরিব কিরূপে পারিবে, পোড়া পেটই এখন বৈরী, কে আমার আহার যোগাইবে বল?" স্ত্রীলোক বলিল—"আমি দিব, তুমি খোদার উপর নির্ভর কর।"

পেড়া শাহা জঙ্গলে লুক্কাইত হইলেন, মনুষ্যসঙ্গ একবারে পরিত্যাগ করিলেন; মাত্র দিবসের মধ্যে একবার আসিয়া সেই মোসলমানীর গৃহে আহার করিয়া যাইতেন; কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না।

দরিদ্রা রমণী কোন প্রকারে শাক অন্ন যোগাইত। একদিন তাহার বাড়ীতে তদীয় জামাতা আসিবার কথা ছিল, এবং সেই জন্য ভাল তণ্ডুল সংগৃহীত হইয়াছিল। ভাল তণ্ডুল দৃষ্টে তিনি বধূকে সাধুর জন্য তাহা পাক করিতে বলিলে, বধূ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহা পাক করে। খাইতে আসিলে সেই তণ্ডুলের অন্ন তাঁহাকে দিতে আসিলে তিনি বলিলেন, "এ অন্ন খাইব না, ইহা জামাতার জন্য আনা হয়, ইহা আমাকে দিতে তোমার বধূর ইচ্ছা ছিল না।"

পেড়া শাহা বধূর মনের কথা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? ফলতঃ এই ঘটনা হইতে তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত হন; তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহা সফল হইত। তিপ্‌লি বিলের ধারে জলডুবে একস্থানে তিনি বসিয়া রহিতেন।

ইনি মুসিম শাহ নামক এক ব্যক্তিকে বড়ই স্নেহ করিতেন। মুসিম শাহও কালে গুরুর ন্যায় লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। বহুলোক ঔষধপ্রাপ্তির আশায় তাঁহার কাছে যাইত। টাকা পয়সাকে তিনি "চাড়" (মৃৎপাত্রাদির ভগ্ন অব্যবহার্য্য খণ্ড) বলিতেন। অল্প কয়েক বৎসর হইল ইহারও মৃত্যু হইয়াছে।

শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন

শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চাননের জন্মভূমি বাণিয়াচঙ্গ। বাণিয়াচঙ্গের জাতুকর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার উদ্ভব হয়। ইদানীন্তন কালে ইনি একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। "ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই তাঁহার তুল্য এবং প্রগাঢ় অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম-ক্রিয়ানুষ্ঠান জ্যোতিষ গণনা, গদ্য পদ্য সংস্কৃত রচনা ইত্যাদি বিষয়েও তিনি প্রধান শ্রেণীতে আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন।"

"প্রাচীন বয়সে নিজ পরিবারস্থ ছেলেদিগকে ইংরেজী স্কুলে পড়াইতে দিয়া তিনি নিজে উহাদের অধ্যয়ন পরীক্ষাচ্ছলে, ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, জ্যামিতি ইত্যাদিতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সামাজিক এমন অনেক ব্যবহার আছে, যাহা কেবল শাস্ত্রদ্রষ্টা দ্বারা মীমাংসা হয় না, ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার নিকট এমন সদুপদেশ ও মীমাংসা পাওয়া যাইত, যাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই তদীয় প্রখর বুদ্ধিকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেন না।"

"শিবচন্দ্রের প্রখর স্মৃতিশক্তিতে লোকে তাঁহাকে শ্রুতিধর সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।" "শুনা গিয়াছে, তিনি একদা কোন মোকদ্দমার রায়ের নকল আনিতে যান। রায় বড় ছিল, তাই কর্ম্মচারিবর্গ উহার নকল লইতে অনেক টাকা ফিস লাগিবে বলেন, উহাতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ এত টাকা দিতে অসমর্থ হইয়া কোন কর্ম্মচারীকে, একবার তাঁহাকে রায় খানা পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। পঠিত রায় শ্রবণানন্তর তিনি বাড়ী আসিয়া অবিকল তাহা লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ক্রোধন ও অহঙ্কারী হইতে দেখা যায়, ন্যায় পঞ্চাননে তাহার লেশ মাত্রও ছিল না। বরং ইহা তাঁহার একপ্রকার দোষ ছিল যে, তিনি না ঘাটাইলে বিদ্যাগৌরব প্রদর্শন করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেন। সংক্ষেপতঃ বিচার-মল্ল বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আদর্শ স্বরূপ তিনি ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে দৃঢ়মতি ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার শরীরে কোনও এক ভীষণ ব্যাধির সূত্রপাত দেখা দিয়াছিল; তিনি কেবল শাস্ত্রানুমোদিত সদানুষ্ঠান দ্বারাই তাহা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।"

"তিনি এতাদৃশ বিনীত ও নিরহঙ্কার ছিলেন যে নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার সমস্ত গুণাবলী কেহই জানিতে পারিত না। ফলতঃ তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যার এবং বিনয়গম্ভীর স্বভাবের ইয়ত্তা করা সুদূর পরাহত।"[১৪৬] বিগত ১৩০১ বাংলার ২৬শে আষাঢ় রজনীতে সন্ন্যাসরোগে শ্রুতিধর শিবচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীহট্টগৌরব স্মৃতিফলকাবলীতে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার ফলক নিবিষ্ট হইয়াছে।

শিবরাম

জলডুবের রাঢ়জাতীয় শম্ভুরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সোণা ও গণেশ্বরের নামে তত্রত্য "সোণাগণাই" তালুক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহাতে সোণারাম ও গণেশ্বরের দশসনা বন্দোবস্তের সমকালে জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়। ইহাদের বংশে কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সোণারামের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র শিবরামের কথাই এস্থলে আলোচ্য।

বাল্যবধিই শিবরামের যথেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণতা ছিল, অন্যান্য বালকদের হইতে তাহার স্বভাবের বিশিষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষিত হইত; যৌবনকালেও একটি লোকের সহিত তাহার ঝগড়া কলহ হয় নাই; বয়োবৃদ্ধি সহকারে মিতবাক্ হইয়া পড়িলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে প্রায়ই তাহাকে দেখা যাইত। তদ্ব্যতীত সাংসারিক কার্য্যে তাহার উদাসীনতা বিলক্ষণ ছিল, তদ্দৃষ্টে তদীয় পিতা নারায়ণ ও সহোদর মাগনরাম তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া একটি সুশ্রী পাত্রী স্থির করিলে, উপায়ন্তর না দেখিয়া উদাসচিত্ত শিবরাম অলক্ষ্যে গৃহের বাহির হইয়া পিঞ্জরবিমুক্ত পক্ষীর ন্যায় কামাখ্যাধামে গমন করতঃ আত্ম-শক্তিমত ভক্তিকথা কথনে জীবন উৎসর্গ করিয়া যশস্বী হন। অভ্যাসবশে শিবরামের ইহাতে বেশ দক্ষতা জন্মিয়াছিল, তথাকার লোকে তাঁহাকে "কথক" উপাধি দিয়াছিল।

শিবরামের সংসারে বীতরাগতা ও গৃহত্যাগ এবং ধর্ম্মকথা কীর্ত্তনাদি-সদুদাহরণ, তদ্বংশীয় অব্যবহিত পরবর্ত্তী বালকবৃন্দের চিত্ত-ক্ষেত্রে এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, অচিরেই তাহাদিগকে তৎপথানুগামী করিতে সমর্থ হয়। শিবরামের ভ্রাতুস্পুত্র মাধবচরণ তাহার এক উদাহরণ। পিতৃব্যের ন্যায়, তরফে গুরুগৃহে গিয়া ভেকআশ্রয়পূর্ব্বক "শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম" প্রচারে ইহার জীবনও অতিবাহিত হয়। শিবরামের গোষ্ঠিসম্পর্কিত তদীয় পৌত্র স্থানীয় নন্দকিশোর

১৪৬. উদ্ধৃত অংশসমূহ ১৩০১ বাং ২রা শ্রাবনের পরিদর্শক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

দাসের নামও এস্থলে করা যাইতে পারে। নিষ্ঠা-সহকৃত সৎকার্য্য স্ববংশীয় বালকবর্গের চিত্তে কীদৃশ ক্রিয়াপর হয়, শিবরামের চরিত্রের উদাহরণে তাহা বেশ দৃষ্ট হয়। শিবরামের সময় বড় দূরবর্ত্তী নহে, ইহার ভ্রাতার পৌত্রগণ বর্ত্তমান।

শীতল গিরি

করিমগঞ্জের অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে নাথকুলে শীতরগিরির উদ্ভব। আবাল্য ধর্ম্মপিপাসু শীতল নাথ বাল্যে কানাইঘাটের সিদ্ধপুরুষ রাখাল শাহের নিকট দীক্ষিত হইতে উপস্থিত হইলে, রাখাল শাহ অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। বালক শীতলনাথ ইহাতে নিরস্ত না হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট গমন করিলে, রাখালশাহ তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হন। শীতলকে ভীত হইতে না দেখিয়া রাখাল শাহ আরও ক্রুদ্ধ হন; তখন তাহার উপর প্রকৃতই প্রহার চলিতে লাগিল, কিন্তু শীতলনাথ অটল! তাহার অন্তরে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তদীয় উপদেশ রূপ বারিবর্ষণ ব্যতীত তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। রাখালশাহ শেষটা পরাস্ত হইলেন; বালকের প্রতি তখন তাঁহার ক্রোধের পরিবর্ত্তে পরম স্নেহ পরিদৃষ্ট হইল; তিনি পরমাদরে তাহাকে আশ্রয় দিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর শীতলনাথ, শীতলগিরি নামে খ্যাত হইয়া স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইরে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী ব্যক্তিবর্গ তাঁহার জন্য আহার্য্যাদি লইয়া যাইত। এই সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে নিজ ইষ্টানিষ্ট বিষয়ক ভবিষ্যৎ সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারিত। কেবল তাহাই নহে, তদীয় কথা মাত্রে—তাঁহার ইচ্ছাপ্রভাবে তাহাদের অমঙ্গল শান্তি হইত।

লোকে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিতে লাগিল। লোকের কথা কি সত্য? সত্যই কি "যোগ সিদ্ধি" তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে? এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, তাঁহার নিজমনে এই কথা উত্থিত হইল এবং নির্দ্দিষ্টকালের জন্য ভূগর্ভে অবস্থিতি করাই তাঁহার পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইল। কিন্তু ইহা অপরের সাহায্য সাপেক্ষ; কে সে সাহায্য করিবে? শীতলগিরি সন্নিকটবর্ত্তী ভরণের অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় স্বরূপচন্দ্র রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে মাটিতে পুতিয়া রাখিতে অনুরোধ করিলেন। স্বরূপচন্দ্র ভীত হইয়া অস্বীকৃত হইলেন। শীতলগিরি তৎপর বটরশীবাসী মোহাম্মদ কাশিম চৌধুরীর কাছে গিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরোধ করিলে, তিনিও ভীত হইয়া প্রথমতঃ অস্বীকৃত হন, কিন্তু "ইহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার মঙ্গলই হইবে, অন্যথায় অমঙ্গল সম্ভাবনা; এবং এই কার্য্যদ্বারা বিপদে পড়িবার কিছুমাত্র সম্ভব নাই" ইত্যাদি বাক্য সাধু তাঁহাকে বার বার বলিলে, সাধুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তিনি সাধুর অভিপ্রায় মত একটি গর্ত্ত খনন করাইয়া দিলেন। চরাকুড়িনামক নিকটবর্ত্তী স্থানের একটি নিভৃত অংশে এই "কবর" খনিত করা হইল। চৌধুরী মহাশয়ের সংবাদমতে তাঁহার বিশ্বস্ত অনেক ভদ্রলোক ব্যাপার দর্শনে আগমন করিলেন। সকলের সাক্ষাতে সাধু যথাকালে তাহার ভিতরে উপবিষ্ট হইলে কিছুটা গাজা, একখানা রুটি ও একগ্লাস দুগ্ধ পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল; দেখিতে দেখিতে সাধু ধ্যানস্থ ও বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া পড়িলে, পূর্ব্বোপদেশ মত তাহার উপরে বাঁশের আচ্ছাদন দিয়া, তদুপরি মাটি ক্ষেপনে ঢাকিয়া রাখা হইল,—গর্ত্তে বায়ু প্রবেশের পথ রহিল না। (১২৭৮ বাংলা)

জীবন্ত ব্যক্তিকে ভূগর্ভে কবর দিয়া পরে চৌধুরী বড়ই ভাবিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে বড়ই উৎকণ্ঠা জন্মিল, তিনি বিশ্বস্ত লোক প্রহরায় রাখিয়া দিলেন, এবং সাত দিন পূর্ণ হইলে, হতাশচিত্তে স্বজন সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সাধুকে উঠাইতে আদেশ

দিলেন। উপরের মাটি সরান হইলে গর্ত্ত হইতে যেন একটা রশ্মি-রেখা চলিয়া গেল বলিয়া দৃষ্ট হইল, সাধুর কোনরূপ অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে মনে করিয়া চৌধুরী আতঙ্কিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে সাধু পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিয়াছেন। বর্হিবায়ু দেহে লাগিয়া অচিরাৎ সাধুর চেতনা হইল এবং তিনি অনতিবিলম্বেই গর্ত্ত যে গঞ্জিকা, রুটি ও দুগ্ধ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে দৃষ্ট হইল—সাধু স্পর্শ করেন নাই।

পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ হরিদাস ভূগর্ভে প্রবেশের পূর্ব্বে কয়েকটি প্রক্রিয়া করিতেন; সুদূর গ্রাম্য অঞ্চলে সাধু শীতলগিরি তদ্রূপ কোন প্রক্রিয়া করিয়াছিলেন কি না; কেহ তাহার সংবাদ রাখে নাই, সুতরাং বলিতে পারা যায় না।

এই ঘটনার কথা প্রচারিত হইলে বহুলোকের সভক্তি দৃষ্টি শীতলগিরির উপর পতিত হয় এবং বহুলোক কর্ত্তৃক তিনি নানাভাবে সম্মানিত হন। সাধু সমাধি হইতে না উঠা পর্য্যন্ত ঘটনাটি সংগোপনে রাখা হইয়াছিল। এই সমাধি ব্যাপারের পর সাধু প্রায় ২৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

শৈলজা দেবী

শৈলজা দেবী একজন সতী। সতরশতী পরগণার সাধুহাটী গ্রামের প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশে গঙ্গারাম শিরোমনি[১৪৭] ও বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য নামে দুই সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে বিষ্ণুদাসের পত্নীর নাম শৈলজা। শৈলজাসুন্দরীর পতিভক্তি অতুলনীয় ছিল, তিনি প্রত্যহ পতি-পাদোদক পান না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না; ছায়ার ন্যায় সদা পতির অনুগতি করিতেন। তাঁহার মুখে সর্বদাই হাসি দেখা যাইত, তিনি অতি মিষ্টভাষিণী ও প্রিয়ংবদা ছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, সতীর স্মিতপ্রফুল্ল বদনে বিষাদের কালিমা-রেখা পতিত হইল, হাসির স্থলে অশ্রুরাশি দেখা দিল, বিষ্ণুদাস কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন।

পীড়িত সকলেই হয়, কিন্তু বিষ্ণুদাস পীড়িত হওয়া মাত্রই পতিপ্রাণা শৈলজার প্রাণে কি এক আশঙ্কার উদয় হইল, আর তাহা দূর হইল না। সতীর আশঙ্কা দেখিতে দেখিতে সত্যে পরিণত হইল, বিষ্ণুদাস ব্যাধি হইতে উঠিলেন না—মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

পতির মৃত্যুর পর শৈলজার আর এক ভাব দেখা গেল, পূর্ব্বে যিনি বাত্যা-বিতাড়িতা ব্রততীর মত ব্যাকুলিতা ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্থির ধীর প্রশান্ত, গৈরিক স্রাবের পূর্ব্বে বহ্নি-গর্ভ গিরি যেরূপ শান্তভাবাপন্ন বোধ হয়, তদ্রূপ। এই ভাব দৃষ্টে সমাগত স্বজনগণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, সতী পতির সহগামিনী হইবেন। তখন ভব্য ব্যক্তিবর্গ প্রবোধ দিয়া, তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু কিছুতেই সে দৃঢ় সঙ্কল্পের অন্যথা হইল না।

যখন বিষ্ণুদাসের চিতা জ্বলিয়া উঠিল, তখন সতী সহাস্যাননে পতির পাদদেশে বসিয়া পান খাইতে খাইতে পরমার্থ তত্ত্বের উপদেশ দিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আশ্বস্ত করিলেন। বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে সমাগত সকলে দেখিতে লাগিল যে, সতীর কটিদেশ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখে একটুও বিকার নাই, তিনি তখনও কথা কহিতেছেন। তাহার উপর উদর দগ্ধ হইয়া গেলে, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না-পতি পদে ঢলিয়া পড়িলেন। সতীর পবিত্র আত্মা নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত উর্দ্ধলোকে চলিয়া গেল।

যে স্থানে সতী "সহমরণ" গমন করেন, সে স্থান "সতীকুণ্ড" রূপে খ্যাত হইয়াছে; বরাক নদীর যে স্থান হইতে "খিরাউনা" খালা গিয়াছে, এই "সতীকুণ্ড" সেই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪৭. সাধুহাটীর গঙ্গারাম শিরোমণি একজন সনন্দ প্রাপক সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩ য় ভাঃ অঃ শেষ টীকা দেখ।

শ্যাম রাম দাস

শ্রীহট্ট শহরে গৌরকিশোর দাস নামে সাহু বংশীয় এক ধনবান ভূমাধিকারী ছিলেন। ধনজনের অভাব না থাকিলেও তিনি একটি পুত্ররত্নের অভাব অনুভবে সর্ব্বদা ভাবিত থাকিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহার দান ধ্যানের ক্রটি ছিল না, ইহার প্রদত্ত ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুর বাড়ীর আনন্দ রাম মিশ্র নামীয় ১২২১ সনের ২৪শে মাঘ তারিখযুক্ত দুলালী পরগণায় /১ ভূমি দেবত্র দানের রিজেষ্টরীকৃত এক দলিল আমরা দেখিয়াছি।

ভগবান গৌরকিশোরের আশা পুরাইয়াছিলেন, শার্ষোল্লেখিত শ্যামরামই তাঁহার পুত্র। শ্যামরাম বাল্যবধিই সুশীল ও মেধাবী। শহরবাসী ধনী সন্তানের কোন দোষই তাহাতে ছিল না। তিনি যেমন বিনীত, তেমনি পরোপকারী ছিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে মুন্সেফপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও দক্ষতার সহিত সে কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার সময়ে পৈত্রিক সম্পত্তি ও সম্মান আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট শহরের অধিকাংশ ভূমি ইঁহার ছিল, পরে সরকারী কার্য্যে গবর্নমেন্ট তাহা গ্রহণ করেন। শহরের উপরে ইঁহার অনেক অট্টালিকা ছিল, অদ্যাপিও তাহার ২/১টি আছে। ইহার পুত্রের নাম সূর্য্যকুমার দাস। সূর্য্যকুমার বাবুর দৌহিত্রগণ তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে পণ্ডিতের পাড়া নামক এক পল্লী আছে, তত্রত্য, ব্রাহ্মণবর্গের সাধারণ খ্যাতি পণ্ডিত। শ্রীবাস পণ্ডিত সপরিবারে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে, শ্রীবাস প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। নবদ্বীপের যে পল্লীতে শ্রীহট্টবাসিগণ বাস করিতেন, শ্রীবাস তথায়ই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর সন্নিকটেই তাঁহার বাড়ী ছিল। শ্রীমহা প্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীবাসের সমবয়স্ক ও বন্ধু ছিলেন। বন্ধু তনয় নিমাইকে শ্রীবাস পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; মান্য ব্যক্তি ও পিতৃবন্ধু বলিয়া নিমাইও শ্রীবাসকে দেখিলেই নমস্কার করিতেন।

যুবক নিমাইর একটা কাণ্ড এই ছিল যে, বৈষ্ণব পাইলে তিনি একটু রঙ্গ করিতে ছাড়িতেন না, এই বৈষ্ণব যদি আবার শ্রীহট্টবাসী হইত, তবে মাত্রা আরও চড়িত। শ্রীবাস বৈষ্ণব প্রধান, কিন্তু গুরুলোক বলিয়া নিমাই তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। একদিন কিন্তু সে সুযোগ ঘটিয়া গেল। একদিন শ্রীবাস পথে নিমাইকে পাইয়া বলিলেন—"ভাল নিমাই। এখন তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ নও, এখন নদীয়া যুড়িয়া তোমার যশঃ সৌরভ, এখন কি আর তোমার চাপল্য শোভা পায়? তুমি বৈষ্ণববর্গকে অনর্থক চটাও কেন?" নিমাই দাড়াইয়া মাথা হেট করিয়া শান্ত ছেলের মতো কথা কয়েকটি শুনিলেন, যেন বড়ই লজ্জা পাইয়াছেন। কথা শেষ হইলে ভূমি-লগ্ন নয়নেই বলিতেছেন—"সে ভাল, তবে আরো কিছুদিন পড়ে নেই, তারপর আপনাদের কৃপায় ভক্ত হইব;" একটু থাকিয়া বলিতেছেন,—"এমন ভক্ত হইব যে ব্রহ্মা শিবাদি আমার দ্বারস্থ থাকিবেন" "ভাল উপদেশ দিতে আসিয়াছিলাম" ভাবিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ উপদেষ্টা আর তথায় তিষ্ঠিলেন না-চলিয়া গেলেন।

নিমাই বৈষ্ণববর্গের সহিত রঙ্গ করিয়া যাহা বলিতেন, কিছুদিন পরে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সে সমস্ত বাক্য একেবারে মিথ্যা নহে। শ্রীবাসও তখন বুঝিতে পারেন যে নিমাই যে ভক্তিধনের অধিকারী, তাহাতে ব্রহ্মা শিবাদি তাঁহার দ্বারস্থ হওয়া বড় কথা নহে। নিমাইর অতুলনীয় প্রেমভক্তি, নিমাইর মধুর কীর্ত্তন-লীলা শ্রীবাসাদি সকলকেই আকৃষ্ট করিল, তাঁহারা

নিমাইর পার্ষদভক্তরূপে পরিণত হইলেন। তখন শ্রীবাসের বাড়ীতেই কীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, এই স্থানেই সকলে সম্মিলিত হইতেন ও সন্ধ্যার পরে দ্বার দিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীবাসের বাড়ী প্রাচীর বেষ্টিত ছিল।

শ্রীবাসাদি নিমাইকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কি কি লক্ষণ দর্শনে কোন্ পরীক্ষার পর তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস জ্জাত হয়; এস্থলে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; তাঁহাদের এ বিশ্বাস অটল ছিল। একদা শ্রীবাস-গৃহে কীর্ত্তন হইতেছে, শ্রীবাসের এক মাত্র পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় শায়িত; হঠাৎ গৃহে ক্রন্দন উঠিল, ব্যাপার কি শ্রীবাস তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া কীর্ত্তন ছাড়িয়া গৃহে গিয়া সকলকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার আঙ্গিনায় স্বয়ং ভগবান ভাববশে নৃত্য করিতেছেন, তদবস্থায় শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, ইহা তাহার পরম ভাগ্য, আমাদেরও ভাগ্য। যদি চিৎকার করিয়া তোমরা তাঁহার কীর্ত্তনের বাধা জন্মাও, আমি জাহ্নবীতে প্রবেশ করিব।" স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দনে ক্ষান্ত হইলেন।

শ্রীবাস পুনঃ কীর্ত্তনমণ্ডলীতে আসিলেন; এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? যে ব্যক্তির অবস্থা ঈদৃশ শোক দুঃখের অতীত হইয়া গিয়াছে, তৎপতি যে দেবদুর্ল্লভ পুরস্কার প্রযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, শ্রীবাস তাহাই পাইলেন—গৌরনিতাইকে পুত্ররূপে পাইলেন। এক গেল—দুই হইল, নশ্বর গেল—অবিনশ্বর রহিল।

কীর্ত্তনের তেজ উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত হইল; তখন গুজব উঠিল যে, গৌড়ের মোসলমান বাদশা কীর্ত্তন দমনে আসিতেছেন। নিরীহ ভক্তবর্গের কেহ কেহ যথার্থই ভীত হইলেন। একদিকে ভয়, অন্যদিকে অনুরাগ, ভক্তবর্গ বড়ই বিপদে পড়িলেন। যখন অনুরাগেরই জয় হইল,—যখন তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ার্দ্র হইয়া মনের অমূলক আশঙ্কাটাও দূর করিয়া দিলেন।

শ্রীবাসের ভ্রাতুস্পুত্রী নারায়ণী তখন চারি বৎসরের বালিকা, সে সম্মুখে খেলিতেছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—"পণ্ডিত! গৌড়ের বাদশাহ আসিতেছে শুনিয়া ভীত হইয়াছ; মিথ্যা কথা-বাদশাহ আসিবেন কেন? যদিইবা আসেন, ভয় কি? হরিনামে কি তাহার রুচি জন্মিতে পারে না? যদি আসেন, নিশ্চয় জানিও, তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবে,—মনের বিদ্বেষবুদ্ধি দূর হইয়া মন নির্ম্মল হইবে, আমার বাক্য মাত্রে তিনি ভক্তিপরিপ্লুত হইবেন। হইবে কি না, উদাহরণ দেখ।" এই বলিয়াই নিমাই সম্মুখে ক্রীড়ারতা বালিকাকে বলিলেন "নারায়ণি! তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক।"

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশের কি মহিয়সী শক্তি, শ্রবণমাত্র চারি বৎসরের বালিকা যন্ত্রচালিতবৎ কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল, তাঁহার অঙ্গে রোমহর্ষাদি সাত্বিক ভাবোদয় হইতে লাগিল, নেত্র হইতে জলধারা বহিতে লাগিল, ও বালিকা ব্রজগোপিকার মত কৃষ্ণবিরহে হাহাকার করিতে লাগিল।

শ্রীবাসাদি দেখিলেন, নিমাইর বদনমণ্ডল হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাঁহারা "জয় গৌর ভগবান" বলিয়া জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। সেই হইতে তাঁহাদের মনে আর আশঙ্কার লেশও রহিল না; সেই হইতে শ্রীগৌরাঙ্গেরও সময় সময় ভগবানাবেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়া যান, তখন হইতে "শ্রীবাসাঙ্গন" পরিত্যক্ত হয়; শ্রীবাস গৌরশুন্য নবদ্বীপে বাস করিতে না পারিয়া, এস্থান ত্যাগ করতঃ কুমারহট্টবাসী হন। সেই স্থানবাসী বৈকুণ্ঠ দাস নামক একটি ব্রাহ্মণ তনয়ের সহিত বাল্যকালেই নারায়ণীর বিবাহ হয়, কিন্তু নারায়ণী বালবিধবা হইয়া পড়েন। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বল্পগর্ভা

নারায়ণী মাতুলায়ন শ্রীহট্টে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে শ্রীহট্ট থাকে কালে,[১৪৮] তথায় বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবন দাসের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ। তিনি লিখিয়াছেন—

"নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তার গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন॥"

বৃন্দাবন দাস শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট থাকা কালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই; এই জন্য তিনি গ্রন্থ মধ্যে খেদ করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস বর্দ্ধমানের দেনুড়নামক স্থানে পরবর্ত্তী কালে বাস করেন, দেনুড়ে "বৃন্দাবন দাসের পাট বাটী" বলিয়া খ্যাত তদীয় জীর্ণ বাটিকা কেবল বৈষ্ণবের নহে-বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীরও পীঠস্থান স্বরূপ; চৈতন্য ভাগবত দেনুড়েই রচিত হয়।[১৪৯]

সত্যভানু উপাধ্যায়

সত্যভানু উপাধ্যায় শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, শ্রীহট্টের কোন্ স্থানে তাঁহার গৃহ ছিল, তাহা জানা যায় না। নামটিও যে প্রচ্ছন্ন নহে, তাহা বলা যায় না। তিনি জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। সত্যভানু শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করিয়া নানাতীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক নবদ্বীপে উপস্থিত হন ও জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।[১৫০]

সত্যভানুর বালগোপাল উপাসনা ছিল, জগন্নাথগৃহে তিনি অন্ন প্রস্তুত করিয়া নিজ ইষ্টদেব স্বর্গীয় গোপালকে যথারীতি অন্ন নিবেদন করেন। জগন্নাথ-তনয় নিমাই তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। সত্যভানু ধ্যানান্তে নয়নউন্মীলনে দেখিতে পান যে জগন্নাথ মিশ্রের শিশু পুত্র কোথা হইতে আসিয়া সেই অন্ন উভয় হাতে আহার করিতেছে। দেবতার ভোগ নষ্ট হইল বলিয়া অতিথিরও আর আহার হইল না। এই ঘটনায় জগন্নাথ মিশ্র বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং ক্রটীস্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাকের দ্রব্যাদি দিয়া, পাকের জন্য অনুরোধ করিলেন। অতিথি পাকে গেলে পুত্রকে বিশেষ সাবধানে রাখিলেন। কিন্তু পাক শেষ হইলে ভোগ প্রস্তুত করিয়া সত্যভানু যখন গোপালকে নিবেদন করিতে লাগিলেন তখন সতর্কতার মধ্যেও নিমাই গিয়া সেই অন্ন পূর্ব্বৎ আহার করিতে লাগিল।

এবার জগন্নাথ বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিমাইকে মারিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠতনয় কিশোর বিশ্বরূপ আসিয়া বিবাদের মীমাংসা করিলেন। নিমাই অবোধ ও চঞ্চল বলিয়া, পিতাকে বুঝাইয়া তিনি অতিথি বিপ্রের কাছে গেলেন ও তাঁহাকে বহুতর মিনতি করিয়া পুনঃ রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলেন। সত্যভানু বলিলেন "মনে ক্লেশ অনুভব করিও না, বিধাতা আজ অন্ন লিখেন নাই, তাই বার বার বাধা পড়িতেছে।" কিন্তু বিশ্বরূপ কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না। তাঁহার মধুর বাক্যে অতিথিকে পুনঃ পাক করিতে হইল। এবার নিমাইকে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল, জগন্নাথ মিশ্র লাঠি হাতে দ্বারে রহিলেন। এদিকে অতিথি ভক্তিভরে গোপালকে অন্ন নিবেদন করিতে বসিলেন। বড়ই আশ্চর্য্য কথা যে তৎকালে জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতির একটা মোহ উপস্থিত হইল, দৈবমোহে তাঁহারা যেন তন্দ্রাবিভূত হইয়া পড়িলেন, তদবসের নিমাই গিয়া সেই গৃহে উপস্থিত। এবার নিমাই কথা কহিলেন, বলিলেন—"অতিথি!

১৪৮. সজ্জনতোষনী পত্রিকা ১২৯৭ সালে কবি বৃন্দাবন দাসের জীবন চরিত (বঙ্গরত্ন ২য় ভাগ) প্রণেতা দেনুড়বাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী কবিরঞ্জন মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৪৯. কবি বৃন্দাবন দাস শ্রীহট্টে কতকাল ছিলেন, অথবা কি না, ঠিক জানা যায় না। তবে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীহট্টে অঞ্চলে প্রচলিত "থইবাম' (থুইব), "নি" (কি?) ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ আছে।

১৫০. আনন্দ বাজার পত্রিকা---১৩১৮ বাং ১৬ই কার্ত্তিক সংখ্যায় লিখিত "দ্বিজ বলরাম ও শ্রীপাঠ দোগাছিয়া" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তুমি আমাকে ডাকিয়া অন্ন নিবেদন কর, আমি থাকিতে পারি না, ভোগের অন্ন সেবন করি।"'

সত্যভানুর সমূদয় সন্দেহ দূরীভূত হইল, সত্যভানু সেই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়া লইলেনঃ—

"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই
শচীসুত হৈল সেই।"

সত্যভানু আনন্দে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। আর তাঁহার ভ্রমণ হইল না, তিনি নবদ্বীপে রহিয়া গেলেন ও প্রত্যহ আসিয়া নিমাইকে একবার করিয়া দেখিয়া যাইতেন। সত্যভানু গম্ভীরাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তাই এই অদ্ভুত কথা তৎকালে ব্যক্ত করেন নাই, পরে যখন নিমাইর মহিমা প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ভক্তবর্গকর্ত্তৃক তিনি অবতাররূপে পূজিত হইতে থাকেন, তখনই প্রকাশ করেন।

সত্যভানুর তিনপুত্র; ইঁহাদের নাম বলরাম, জনার্দ্দন, ও মুরারি। জনার্দ্দনের শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ অনুরাগ ও অধিকার ছিল; মুরারিও "পরম পণ্ডিত" ছিলেন। বলরাম দাস শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ও একজন পদ রচয়িতা কবি ছিলেন, তিনি দোগাছিয়াতে বালগোপাল বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু দোগাছিয়াতে সময় সময় যাইতেন। জনার্দ্দন ও মুরারি অদ্বৈতভক্ত ছিলেন; ইঁহাদের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১২শ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। জনার্দ্দনের বংশীয় ব্রাহ্মণগণ নদীয়া জেলার মেহেরপুরে এবং মুরারির বংশধরবর্গ উক্ত জেলার ভানুকাগ্রামে বাস করিতেছেন।

সুবিদ নারায়ণ (রাজা)

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ইটা নামক খণ্ডরাজ্যের অধিপতি। ইনি তদানীন্তন কালে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতিরূপে অনেক নিয়ম প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের দেওয়ান ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পরে খোওয়াজ ওসমান নামক পাঠান কর্ত্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হন। ইঁহার বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত কথিত হইয়াছে।

সাদেক আলী

লংলা পরগণার অন্তর্গত হিঙ্গাজিয়া থানার দুই মাইল পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র গ্রামে গৌরকিশোর সেনের বাস ছিল। তিনি কোন কারণে মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও সাদেক আলী নামে খ্যাত হন। সাদেক আলী মোসলমান সমাজে এতদ্দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহারের কতকটা সংস্কার সাধনে চেষ্টিত হন ও কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হন। তিনি মোসলমান সমাজে ব্যবহার্য্য কয়েকখানা কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল কেতাব মোসলমান সমাজে অতি আদরের সহিত পঠিত হয়। তাঁহার কৃত "হালতুন্নবি", "রদ্দেকুফুর" প্রভৃতি পুস্তক শ্রীহট্টীয় নাগরাক্ষরে[১৫১] মুদ্রিত হইয়াছে। রদ্দেকুফুর কেতাবে তাঁহার নিজের জীবন সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে।

সৈয়দ শাহ খোদাবন্দ

শাহ খোদাবন্দ তরফের অধিকারী ছিলেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায়ে ইঁহার নাম পাঠক পাইয়াছেন। কথিত আছে যে ইনি তত্রত্য আদিত্যবংশীয় জনৈকা বালিকার পাণি গ্রহণ করেন। আদিত্য বংশীয় রামচন্দ্র খাঁ তৎকালে তরফের বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন; তিনি রৌপ্যনির্ম্মিত এক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। খোদাবন্দ ইঁহার

---

১৫১. শ্রীহট্টীয় মুসলমানী নাগারাক্ষরে নমুনা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশ প্রথম ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে।

দুহিতাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল এবং শ্রীহট্ট শহরের কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে দেশের প্রথা মত কন্যাপক্ষ হইতে খোদাবন্দ সকাশে "পান" প্রেরিত হইলে, তিনি কন্যাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তদুদ্দেশে বলিলেন—"যাও বিবি সালামত, আও বিবি আনামত।"

খোদাবন্দ একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় এ বিবাহ যে মঙ্গলপ্রসূ হইবে না, ইহা অনেকেই মনে করিয়াছিল। কথিত আছে, কন্যা সহ গৃহে যাইতে পথেই পতির মৃত্যু হয়। বিধবা কন্যা শ্বশুরগৃহে গেলেন বটে কিন্তু তথায় নিয়ত অমঙ্গল ঘটিতে লাগিল। এই বিধবা বধূই তাবৎ দুর্নিবিত্তের কারণ ভাবিয়া শ্বশুর তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কন্যার আগমনে এ স্থানেও বিবিধ অমঙ্গল ঘটিতে লাগিল, স্বয়ং রামচন্দ্র এক আকস্মিক বেদনায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলেন এবং কন্যাটিও রোগে শোকে মৃত্যুদশাগ্রস্থা হইয়া উঠিল। বিপদের সময় হঠাৎ আদিত্যের মনে হইল যে এ সকল দুর্নিমিত্ত মহাপুরুষ খোদাবন্দকে অমান্য করা হেতু ঘটিতেছে। ইহা মনে হওয়া মাত্র তিনি শিবিকাযোগে তনয়াকে খোদাবন্দের সদনে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে বাস্তবিকই সর্ব্বত্র সুমঙ্গল হইল। কন্যা ও পিতা প্রভৃতির রোগ দূরীভূত হইল। আদিত্যতনয়া মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে খোদাবন্দ তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। "আও বিবি আনামত" একথার অর্থ তখন বুঝিতে পারা গেল। এই রমনী নিজ ব্যয়ে সিউরিকান্দির পালপাড়ায় এক পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এই পুষ্করিণী "ঠাকুরাণীর পুকুর" নামে খ্যাত আছে। এই রমণীর তৃতীয় পুত্রই "মদালল ফওয়ায়েদ" নামক পারস্য গ্রন্থের রচয়িতা সৈয়দ শাহ ইস্রাইল মুলক-উল-উলামা ছিলেন।

সৈয়দ শাহ ইলিয়াস কুতুব-উল-আওলিয়া

শাহ ইলিয়াছের পিতার নাম সৈয়দ শাহ ইস্রাইল। ইলিয়াস বাল্যাবধি উদাসীন ছিলেন। একদা একটি দাসীর মুখে "দিন গিয়া" বাক্যটি শুনিয়া, সাংসারিকতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। দিন নাই। দুনিয়াতে আসিয়া কি করিলাম! ইহাই ভাবিয়া তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া উত্তর দিকে গমন করেন ও খোয়াই নদীর দুই মাইল উত্তরে এক জঙ্গলে উপবিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপস্যায় সময়াতিবাহিত করেন। তপস্যায় তিনি সিদ্ধ মনোরথ হন। কথিত আছে, এক অন্ধকার রজনীতে জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় একটি স্নিগ্ধ কিরণ রেখা আকাশপ্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার সাধনাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল, তদবধি ঐ স্থান "চন্দ্রচুরি" নামে খ্যাত হয়। এবং তদবধি তিনি কুতুব-উল-আউলিয়া" এই শ্রেষ্ঠ উপাধিতে আখ্যাত হইতে থাকেন।

ইলিয়াছের পূর্ব্বনিবাস খোয়াই তীরবর্ত্তী ঘরগাও। তাঁহার বাটিকার স্থানটিকে অদ্যাপি লোকে "পীরের বাড়ী" বলিয়া থাকে। তথায় তাঁহার ব্যবহৃত তিন খণ্ড পাথর আছে; উহার একটিতে তিনি উপবিষ্ট হইয়া "ওজু" করিতেন, ২য় টি "নমাজের" (উপাসনার) জন্য ব্যবহৃত হইত এবং ৩য় টিতে বসিয়া আহার করিতেন বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে।

কুতুব সাহেব আরবি ও পারস্য ভাষায় সুবিজ্ঞ ছিলেন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়ও তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল, তাঁহার কৃত আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলিতে এই চারি ভাষারই শব্দের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।[১৫২]

১৫২. কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের একটি সঙ্গীত এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া গেলঃ—

স্ত্রীকবি হেমপ্রভা

হবিগঞ্জের অন্তর্গত ষাটিয়াজুরি নিবাসী মুন্‌সেফ্ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার কর বি এল মহাশয় ইহার স্বামী। স্বর্গীয় উকীল শরৎচন্দ্র দত্ত ইহার পিতা ছিলেন। ইনি "বামা বোধিনী" পত্রিকাতে প্রায়ই সুন্দর কবিতা লিখিতেন।

গত ১৩২০ বাং বৈশাখ মাসে ২৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগতা হইয়াছেন।

হরনাথ চক্রবর্ত্তী

হরনাথের বাসস্থান হবিগঞ্জের অন্তর্গত বেকিটেকার আসেরা গ্রাম। হরনাথ পণ্ডিত ব্যক্তি ও শিবোপাসক ছিলেন। শিবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শিবকীর্ত্তন করাই উপাসনার অঙ্গ বলিয়া বোধ করতঃ তাহাতেই রত থাকিতেন। তিনি গঞ্জিকা ও মদ্য গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন না; কিন্তু তজ্জন্য তিনি অশ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না; মহাত্মা বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি করিত।

লাতুর পার্শ্ববর্ত্তী চালদিয়া পল্লীতে তাঁহার মাতুলালয় ছিল, তথাকার গোপীমোহন নামক এক ব্রাহ্মণতনয় তাঁহার বাড়ীতে থাকিতেন। বর্ষাকালে সেই অঞ্চল জলপ্লাবিত হইলে এক সময় তাঁহার শিবমন্দিরের ৩০ হস্ত আন্দাজ উত্তরে বনান্তরালে তিনি মলত্যাগ করিয়াছিলেন। রাত্রে আহারান্তে শয্যায় যাইতে গোপীমোহন দেখিলেন যে একটা শৃগাল গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঘরে বাতি ছিল, গোপীমোহন তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট হইয়া কোথাও শৃগালকে দেখিতে পাইলেন না। তখন নিশ্চিত মনে শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রাবেশ হইলে, শৃগালে যেন তাঁহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরিয়াছে, এইরূপ স্বপ্নদৃষ্টে জাগিয়া গেলেন ও পাশ ফিরিয়া শুইলেন; এবারও পুনঃ সেই স্বপ্ন। তখন জাগিয়া "উবুড়" হইয়া শুইলেন, কি জঞ্জাল! এবারও তদ্রূপই দংশন স্বপ্ন! এবার আর তিনি শুইলেন না, উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। তখনও অধিক রাত্রি হয় নাই, দেখিলেন হরনাথ বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন।

গোপীমোহন হরনাথকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন, শুনিয়া হরনাথ যেন একটু ধ্যানস্থ হইলেন, তারপর বলিয়া উঠিলেন "মন্দির সন্নিকটে মলত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? এখন শিবের কাছে দুধকলা মানস করিয়া শুইয়া থাক।" গোপীমোহনের বহির্দ্দেশ গমনের কথা মনে হইলে, তিনি

রাগিনী---আহিরী।
"(সেই তোর কি দোষ কেল রে জানম্, মুই তোর কি দোষ কৈল?)
আরজু ফরদম [রুহ্ এ] তু দিদম্ (তন মন পাগল্ ভৈলু।)
হামচু + মজনু বাহরেতু লেয়লি (ভাবিয়া ব্যাকুল হৈলু রে জানম্।)
ইম্‌রুজ ফজবে দিলবরে জানম্ (আসিবার বলিয়া গেলে!)
রুজ গুমাপ্তা কাম রসিদা আফ্‌তক (তুই ঘরে না আইলে রে জানম্।)
চসমে চুঁ আহুঁ চিনি বুদবুদ, চন্দানে চুঁদানে আনার
এস্‌কে তোমরা মারানা মুদি [কালুবালা] (চিত্তে ধইলু)
[শালে মূল্ গয়ের তরেহিম রওসন] (মুই তোর অন্ত না পাইলু রে জানম্)
[লাতক্ না তু মির রহমতুল্লাহে] কুতুবে মান্দামে (হিয়া)
[ইন্নাল্লা ইনফেরু জনুবা] (ভুলিয়াছ নি তুমি) বা জানম্ (মুই তোর কি দোষ কৈলু?)"
এই সঙ্গীতটি বাঙ্গালা, পারস্য, হিন্দি, আরবি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার শব্দ সংযোগে রচিত। ( ) বন্ধনী মধ্যস্থ পদ বাঙ্গালায় লিখিত, "+" চিহ্নিত শব্দগুলি হিন্দি : + চিহ্নিত নাম দুইটি প্রেমিক প্রেমিকার। ইহাদের অর্থাৎ মজনু ও লেয়লির প্রসঙ্গে এই আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচিত হয়। "+" চিহ্নিত শব্দ সংস্কৃত এবং [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ পদগুলি আরবি বাকি সমস্ত পারস্য ভাষায় লিপিত। রামশ্রীর সৈয়দ শ্রীযুক্ত সাজিদুর রহমান সাহেব হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

অপরাধযুক্ত মনে শিবকে প্রণাম করিয়া মানস করিলেন ও তৎপরে শয্যায় গিয়া শুইলেন। এবার আর তিনি স্বপ্ন দেখিলেন না। গোপীমোহন যে মন্দির সন্নিকটে বাহ্যে গিয়াছিলেন, হরনাথ ইহা দেখেন নাই, কিন্তু তিনি সাধনবলে তাহা জানিতে পারিয়াছেন দেখিয়া গোপীমোহন চমৎকৃত হইলেন এবং তিনিই পরে একথা অনেককে বলিলেন।

একবার শীতকালে হরনাথ গোবর্দ্ধন বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ তত্রত্য ১০/১২ জন ব্রাহ্মণ সহ বাদলাগ্রামে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যাইতেছিলেন; বাদলার মাঠ তখন জঙ্গলময় ও ব্যাঘ্রাদির বসতিস্থল ছিল। শ্রাদ্ধের পরদিন পুনঃসকলে একত্রে যখন এই মাঠ পার হইতেছিলেন, একটা প্রকাণ্ড শূকর তখন তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। তদ্দৃষ্টে সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, হরনাথ তাহাদিগকে থামাইতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। দূরে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে হরনাথ শূকরের শরীরে হাত বুলাইয়া দিলেন, আর সে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল![১৫৩] তাহারা সকলেই তদবধি হরনাথকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিল।

হরনাথ যখন মাতুলালয়ে আসিতেন, তখন লাতুনিবাসী মোনশী গৌরীচরণের কাছেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন; উভয়ে অত্যন্ত প্রণয় ছিল বলিয়া তিনি প্রায়শঃ লাতুতে আসিতেন ও প্রতিবারেই বহুদিন করিয়া থাকিয়া যাইতেন।

হরিচরণ রায়বাহাদুর

মহাখল গ্রামে সাহুবংশে হরিচরণ দাস রায়বাহাদুরের জন্ম হয়। ইঁহার ভ্রাতা গোলোকচন্দ্র একজন প্রতাপশালী ও ব্যয়ী ব্যক্তি ছিলেন। হরিচরণ ইঁহার কনিষ্ঠ। হরিচরণ বি এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়নপূর্ব্বক বি এল হইয়া দেশে আসেন ও শিলচরে গিয়া উকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। আইনে তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি অনতিবিলম্বে শিলচরের গবর্ণমেন্ট প্লিডার নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সদগুণে তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

হরিচরণ বাবু অতি চরিত্রবান, সদালাপপরায়ণ ও সদ্ব্যয়ীব্যক্তি ছিলেন। দরিদ্রের প্রতি দয়া ও সাধারণ জনহিতে তাঁহার মতি ছিল। বিগত ১৩২২ সনের ভাদ্র মাসে তিনি পরলোকগত

"হরি ঠাকুর"

পরগণা দিনারপুরে হরিঠাকুর নামে এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইনি ব্রাহ্মণবংশ প্রসূত ও তরফ পরগণার খরিয়া গ্রামবাসী ছিলেন। রামেশ্বর পুরের তরফদার বংশীয়গণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও গৃহে যাইতেন না। আবশ্যক হইলে শিষ্যদের পুকুরের পারে আসিয়া একটা নিমগাছের তলায় বসিয়া শঙ্খ বাদন করিতেন, তৎশ্রবণে শিষ্যবর্গ আসিয়া যথাশক্তি তাঁহার পুজা করিয়া যাইতেন।

একবার তিনি শিষ্যবর্গকে বলিলেন, যে তিনি আর এদেশে থাকিবেন না পশ্চিমে চলিয়া যাইবেন; শিষ্যগণ তৎশ্রবণে বিলাপ করিতে লাগিল। তিনি তখন তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া সম্মুখবর্ত্তী একটা বটবৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন যে সেই বৃক্ষে তাঁহার অধিষ্ঠান হইবে—তাঁহাদের চিন্তা করিবার কারণ নাই। কথিত আছে যে এই কথা বলিবার পর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া

১৫৩. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পাঠক জানেন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুষ্ট জলকণা স্পর্শে বন্য হস্তীযুথ বনপথে নৃত্য করিয়াছিল।

গেল না, তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

তদবধি সেই বৃক্ষ সকলের নিকট পূজিত হইতে লাগিল। অনেক পরে একদা এক ব্যক্তি সেই বৃক্ষে একটা অশ্ব বাঁধিয়া খাইতে দিয়াছিলেন। দড়ির টানে গাছের ছাল উঠিয়া গিয়াছিল এবং কথিত আছে যে তাহা হইতে রক্তের ন্যায় নির্য্যাস বাহির হইয়াছিল। কালক্রমে বৃক্ষটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার মূলের মৃত্তিকা হইতে একটি কদম্ববৃক্ষ জাত হয়, এই বৃক্ষটিও বটবৃক্ষের ন্যায় লোকের মান্য হইয়াছে ও হরিঠাকুরের গাছ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

হরিশরণ সেন মজুমদার

তুঙ্গেশ্বরের মজুমদার বংশে ১৬৭৯ শকাব্দের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহাত্মা হরিশরণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠের পরে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখা গেল—জীবনের যেন কোন চিহ্নই নেই; তখন পিতা রামেশ্বর সুতিকা গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিছুকাল মধ্যে তাঁহার ক্রোড়ে শিশু চেতনালাভে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এই শিশু কালক্রমে এক অতি বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠেন।

হরিশরণ সেন দেশবাসী সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; তাঁহার গুণগ্রামে দেশের তাবৎ লোকই তাঁহার অনুগত ছিল। তিনি যোগশাস্ত্রের আলোচনায় পারদর্শিতা লাভ করেন ও যোগসিদ্ধ পুরুষরূপে পরিগণিত হন। তাঁহার ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, ত্যাগ ও বিরাগ, সদাচার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সকলই আদর্শ স্থানীয় ছিল। সুখ বা দুঃখ, সম্মিলন বা বিয়োগ, কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। মৃত্যুকে দেহ পরিবর্ত্তন বই তিনি কিছুই মনে করিতেন না। অনেকেই গ্রন্থপাঠে তাহা জানিলেও উপলব্ধি করিতে পারে না, তাঁহার তদ্রূপ ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুচন্দ্র মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়িয়া যখন এ জগতের সহ শেষ বিদায় লইতেছিলেন, ইষ্টধ্যান-নিরত হরিশরণ, পুত্রের মায়ায় ধ্যানভঙ্গ করিয়া শেষ দেখাটা পর্যন্ত করেন নাই, একথা আমরা মায়িক লোকে শুনিলে আশ্চর্য্য হই। এই সময় এক উদাসীন অতিথি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে, বরং তিনি অতিথি সৎকারেই রত হইয়াছিলেন। কিন্তু শোকের কোলে ঢলিয়া পড়েন নাই।

দেবদ্বিজে তিনি পরম ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। নম্রতাই মহদ্বংশের ভূষণ ও লক্ষণ; কোন ব্রাহ্মণ অবজ্ঞা সহকারে "দাস" সম্বোধন করিলে, কেহ সে কথা কিঞ্চিৎ দুঃখের সহিত তাঁহাকে জানান; তৎশ্রবণে তিনি বলিয়াছিলেন, "হরিশরণ দাস, ব্রাহ্মণের দাস; বাজারে ঢোল পিটিয়া একথা সকলে ঘোষণা কর।"

একদা পুঁটিজুরীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ চম্পক বৃক্ষারোহণে পুষ্পচয়ন করিতে ছিলেন, সুন্দর সুপুষ্ট ফুল। ব্রাহ্মণের মনে হইল, এই ফুলগুলি পরম সাধক "মহাশয়কে"-হরিশরণ মহাশয় উপনামে খ্যাত ছিলেন,—দিলেই উপযুক্ত হয়। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-চিত ফুল ব্রাহ্মণেতরকে কিরূপে দিবেন? এইভাব মনে হইলে তিনি, মহাশয়কে ফুল দিবেন না বলিয়াই মনে করিলেন। দৈবাৎ সেই সময় তিনি ভূপতিত হইলেন। ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষু তখন ফুটিল, বুঝিলেন যে তাঁহার এই ভূপতন মহতের অবজ্ঞার প্রত্যক্ষ ফল। ইহা মনে করিয়াই ব্রাহ্মণ ফুল লইয়া মহাশয়কে দিতে চলিলেন।

ব্রাহ্মণ ফুল সহ সেন মহাশয়ের সকাশে বিরস বদনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি বলিলেন "ঠাকুর! নীচ জাতির ব্যবহারের জন্য,—আপনি ব্রাহ্মণ, কেন ফুল দিতেছেন?" ভৃত্যকে বলিলেন "এই ব্রাহ্মণকে সত্বর নববস্ত্র প্রদান কর, বৃক্ষ হইতে পড়িয়া ব্রাহ্মণের কাপড় ছিড়িয়া গিয়াছে।" ব্রাহ্মণ যে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা কেহ দেখে নাই এবং তাঁহার পরিহিত বস্ত্রও যে ছিন্ন হইয়াছে, ইহাও অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু পরে দেখা গেল যে মহাশয়ের কথাই সত্য। পরম

সাধক সেন মহাশয় ব্রাহ্মণের মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ যেমন লজ্জিত হইলেন, তেমনি চমকিত হইয়া গেলেন।

একদা এক ধনী তাঁহাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহার ধানক্ষেত্র মর্দ্দন করিয়া স্বর্গীয় পূজার ভাসান লইয়া যাইতেছিল, সেন মহাশয় তৎশ্রবণে কিছুই প্রতীকার করিলেন না। এদিকে হঠাৎ অগ্নিসংযোগে সেই ধনীর গৃহাদি সমুদয় সম্পত্তি সহ ভস্মসাৎ হইল। মহৎ ব্যক্তির লঙ্ঘনে এতাদৃশ প্রতিফল দৈব কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের উত্তরাধিকারী অংশীদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, যখন অনেকেই ইহা মীমাংসায় অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে উভয় পক্ষই হরিশরণ সেনের মধ্যস্থতায় আপোষ হইয়াছিল এবং পারিতোষিকস্বরূপ এক খানা ঢাল পূর্ণ টাকা প্রদান করা হয়; কিন্তু তিনি শিষ্টাচারের সহিত তাহা গ্রহণ করেন নাই। হরিশরণ সেন মজুমদার ধর্ম্মাত্মা ও মহাত্মা ছিলেন, এই জন্যই সাধারণ্যে তাঁহার "মহাশয়" উপনাম হয়। "মহাশয়" বলিলে আজও লোকে হরিশরণ সেনকে বুঝিয়া থাকে। "মহাশয়ের বাড়ী" বলিলে তরফের তুঙ্গেশ্বরের মজুমদার বাড়ীই বুঝে। কেবল তাহাই নহে, "মহাশয়" শব্দের তাদৃশ ব্যবহার তুঙ্গেশ্বরের মজুমদার মহাশয়ের প্রভাবের কম নিদর্শন নহে। হরিচরণ সেন মজুমদার মহাশয়ের প্রভাবের কম নিদর্শন নহে। হরিচরণ সেন মজুমদার ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৭৬৫ শকে সজ্ঞানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হারু দরবেশ

খুরসেদপুর নামক গ্রামে হারুর জন্ম; ইঁহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাই এস্থলে পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া বিদায় লইব।

"বেগমপুরের পশ্চিমে নাড়িকা নদীর পশ্চিম পারে, বাণাই হাওরের ঠিক পূর্ব্বতটে হিজল গাছের একটি বাগান বা সুন্দর কুঞ্জ আছে, ইহাই প্রসিদ্ধ পাঁচ পীরের মোকাম। একসময়ে পাঁচজন ফকির লোকহিতার্থে এই মোকাম স্থাপন করেন। বৃক্ষগুলি তাঁহাদেরই হস্তরোপিত। তাঁহারা দরবেশ ছিলেন, কে হিন্দু, কে মোসলমান জানিবার উপায় নাই। নদীয়া জেলার পাগলা কানাই ও পাগল শাহা প্রসিদ্ধ দরবেশ ছিলেন, পানাউল্লা, হারু প্রভৃতি তাঁহাদের অসংখ্য শিষ্য ছিল। ইঁহাদিগকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা দরবেশ কি পদার্থ তাহা বুঝিবেন।"

"হারু স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাকরান্ ভোগী বেহারা ছিল, শেষ বয়সে দরবেশ হইয়াছিল। পাঁচ হাত লম্বা পুরুষ মাথায় দীর্ঘ জটা। হরিনাম শুনিবার অবসর পাইলে হারুর আহার নিদ্রা থাকিত না। দক্ষিণ হস্তের তজ্জনী উর্দ্ধে তুলিয়া হারু যখন মালসী গান ধরিত, তখন ঝর ঝর করিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইত, শ্রোতাদেরও হৃদয় গলিত।"

"পাঁচপীরের মোকামের পীরেরাও সেই জাতীয় ছিলেন। পাঁচজনে মিলিয়া কেহ ভিক্ষা করিতেছেন, কেহ বিপন্নকে উদ্ধার করিতেছেন, কেহ অতিথি সৎকার করিতেছেন, এই তাঁহাদের কর্ম্ম, এই তাঁহাদের ধর্ম্ম, এই তাঁহাদের সাধন ছিল। বিপন্ন কিরূপ, তাহা বলিতেছি।"

"মিল্লিক দাওরাই প্রভৃতি গ্রাম তখন বসে নাই। পশ্চিমে আতুয়াজান, দক্ষিণে আগনা, সুনাইতা প্রভৃতি, পূর্ব্বে অরঙ্গপুর বেগমপুর, করণশী ও দুলালী, উত্তরে বনভাগ প্রভৃতি, এই বিস্তীর্ণ সীমার মধ্যে একটি মাত্র হাওর এবং তাহাতে বড়দই প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিল ছিল। এই হাওরে ডাকাতির কথা কখনও শুনা যায় নাই, কিন্তু বর্ষাকালে নৌকাযাত্রীরা পথ হারাইয়া বিষম বিপন্ন হইত; অনেক নৌকা মারাও যাইত। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই উক্ত পাঁচ

মহাত্মা এইখানে মোকাম স্থাপন করেন। ইহারা সন্ধ্যা হইলেই প্রকাণ্ড দুইটি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেন এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহাতে ইন্ধন যোগাইতেন। দুইটি অগ্নির উদ্দেশ্যে, যদি একটিতে লোকে ভূতের আগুন মনে করিয়া বিশ্বাস না করে। এই অগ্নি দেখিয়া অনেকেই গন্তব্য পথের 'দিশা' করিয়া লইত, অনেকে নিরুপায় হইয়া ইহাদিগের আশ্রমে হাজির হইত, ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিত। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, বিনা টাকায় না কি দেশের উপকার হয় না।"

"কেবল মানুষের নহে, ইহারা গোজাতিরও পরম উপকারী ছিলেন। ভিক্ষায় বাহির হইলে গো-পীড়ার ঔষধ সঙ্গে রাখিতেন।"

উপসংহার

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

জন্মকথা

শ্রীহট্টের বুরঙ্গাবাসী মধুকর তনয় উপেন্দ্রমিশ্রের কথা পূর্ব্বে বহুস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে; উপেন্দ্র মিশ্র বুরুঙ্গা হইতে ঢাকা দক্ষিণে আসিয়া বাস করেন। উপেন্দ্র মিশ্রের ৩য় পুত্র জগন্নাথ মিশ্র অধ্যয়ন-মানসে নবদ্বীপে গমন করিয়া সেই স্থানেই বাস করেন। তিনি শ্রীহট্টবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের "পুরন্দর" উপাধি ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ এই শচী-পুরন্দরের দ্বিতীয় পুত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বে জগন্নাথ স্ত্রীকে লইয়া দেশে (ঢাকাদক্ষিণে) আসিয়াছিলেন। তথায়ই শচীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়; তখন জগন্নাথ-জননী শোভাদেবী এক বিচিত্র স্বপ্নদর্শনে এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া বধূকে স্বপ্নকথা বলেন এবং তাঁহাকে নবদ্বীপে প্রেরণ করেন; আমরা "ইতিবৃত্তের" ৩য় ভাগ ১ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছি; শচীর সেই গর্ভের সন্তানই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪০ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমাযোগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, নবদ্বীপের হিন্দু অধিবাসীবর্গ পবিত্র মনে গঙ্গাস্নান করিয়া তখন হরিনাম করিতেছিল। যিনি ভবিষ্যতে হরিনামের বিজয়ভেরী বাদন করিয়া ভারতবাসীকে মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মকালেই তৎসূচনা হইয়াছিল।

শচী তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। নিমাইর কি যে এক মোহিনী শক্তি ছিল; যে তাঁহাকে দেখিত, মোহিত হইত; সংসারের ভাবনাবিবর্ত্ত তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইত। নিমাই যখন শিশু, তখন শচীদেবী গৃহের মধ্যে নানারূপ অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিতেন। কখন যেন শুনিতেন বাহিরে কাহারা স্তুতি করিতেছে, কখন শিশুর শুন্যপদে নুপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইতেন। এইরূপ বহুবিধ ঘটনায় শচী ও জগন্নাথের মনে বিবিধ আশঙ্কার উদয় হইত। পাছে কোন দৈব উৎপাতে শিশুর অনিষ্ট ঘটে, ইহা ভাবিয়া ভীত হইতেন। উৎপাতও নানারূপ উপস্থিত হইত।

শীশুলীলা

একদিন একটা সাপ আসিয়া শিশুর পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছিল, দেখিয়া সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল, সাপটি কিছুকাল পরে আপনিই চলিয়া গেল। এমন আর একদিন হইয়াছিল। শিশু যখন কাঁদিতেন—কিছুতেই থামানো যাইত না, ক্রন্দন থামাইবার একমাত্র মন্ত্র ছিল হরিনাম। কেহ হরিনাম করিলে শিশু তাঁহার মুখের দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিত, ইহাতে বড়ই আমোদ বোধ হইত; সকলেই ইচ্ছা করিয়া হরি হরি বলিয়া হরিনাম করিলে শিশু সহজেই কোলে যাইত; সুন্দর শিশুকে হরি বলিয়া লোকে কোলে লইত। গৌরবর্ণ এই সুন্দর শিশুর ঈদৃশ অদ্ভুত স্বভাব দেখিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে গৌরহরি নাম প্রদান করেন; গৌরহরিই শেষটা গৌরনাথ নামে খ্যাত হন। পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন বিশ্বম্ভর মিশ্র।

নিমাই হাঁটিতে শিখিলে জননী তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কারে সাজাইয়া রাখিতেন কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য অত্যন্ত অধিক ছিল—গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি তাঁহার হাতে পড়িলেই বিনষ্ট হইত। একদিন একজন অতিথি গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নিমাই তাঁহার নিবেদিত অন্ন বার আর আহার

করিয়া সকলকে বিব্রত করেন। শেষটা অতিথি নিমাইকে বালগোপাল মনে করিয়া, তাঁহার উচ্ছিষ্টান্নই আহার করেন।[১]

আর একদিন নিমাই আঁস্তাকুড়ে গিয়া পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপরে বসিয়াছিলেন। শচীর বড় শুচিবাই ছিল, তিনি পুত্রকে অশুচিস্থানে দেখিয়া হায় হায় করিয়া উঠিলেন। এই সময় বালক তাঁহাকে বলিয়া উঠিল—"মা! সর্ব্বত্রই হরি আছেন, কোন্ স্থান অপবিত্র?" শচী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, হয়তঃ ভাবিলেন যে নিমাইকে কেহ এই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শিখাইয়া দিয়াছে; তারপর মাতা উত্যক্ত হইতেছেন দেখিয়া নিমাই তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

বাল্যলীলা

নিমাইদের বাড়ীব কাছে জগদীশ পণ্ডিতের বাড়ী ছিল, জগদীশের পূর্ব্ব নিবাস "বঙ্গদেশে' (সম্ভবতঃ শ্রীহট্টে) ছিল।[২] নিমাই এক একাদশী দিনে হঠ ধরিলেন যে, জগদীশ পণ্ডিত বিষ্ণুর জন্য যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাহাই খাইবেন। নিমাইকে কত প্রকারে বুঝান গেল, নিমাই মানিলেন না, কোন প্রকারেই তাঁহার ক্রন্দন থামিল না, সেদিন ক্রন্দন বারণের মহাস্ত্র হরিনামও ব্যর্থ হইল। এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে এই বালকের দেহে গোপাল বিরাজ করিতেছেন, আর অমনি তিনি দেবতার জন্য প্রস্তুত নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইকে দিলেন।

একদিন একটা চোর নিমাইর অঙ্গে অলঙ্কার দেখিতে পাইয়া "সন্দেশ দিব" বলিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যায়। কিছুদূর যাইতে যাইতে চোরের মনের মন্দভাব চলিয়া গেল, এবং সে মোহবশে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিমাইর বাড়ীতে আসিল ও তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীহট্টবাসী মুরারির গৃহ নিমাইদের বাড়ীর পার্শ্বেই ছিল, মুরারি গুপ্ত নবদ্বীপে পড়িতেন। তিনি অধ্যাত্মচর্চ্চা বড় ভালবাসিতেন। একদিন নিমাই তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিলেন; মুরারি গুপ্তের জীবন-কথা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে।

অদ্বৈতার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অদ্বৈতাচার্য্য যখন নবদ্বীপে রহিতেন, নিমাইর অগ্রজ বিশ্বরূপ প্রায়শঃ তাঁহার কাছে গিয়া ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। শচীদেবী খাওয়ার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে কখন কখন নিমাইকে পাঠাইতেন। নিমাই যখনই অদ্বৈতের "বৈষ্ণব সভায়" যাইতেন, অদ্বৈতের হৃদয় তখন যেন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি ভাবিতেন এ বালককে দেখিলে মন এমন করে কেন? সংসারে কথা ভুলিয়া মন কেন এক অজানা দেশে চলিয়া যায়? অদ্বৈতের কত কথাই মনে হইত, আতুড় ঘরে যখন সস্ত্রীক আচার্য্য শিশু-নিমাইকে দর্শন করেন, তখন হইতেই তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হয়; অদ্বৈত ভাবিতেন "ইনিই কি তিনি?" ফলে নিমাইকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসিতেন।

নিমাই পাড়ার বালকদল লইয়া বাড়ীর ধারে পথে গিয়া কখন কখন নাচিতেন ও গান গাইতেন। কখন কখন ইহাতে বড়ই রঙ্গ হইত, দেখিতে পথের লোক কখন কখন দাঁড়াইত ও কি জানি কি মোহবশে অজ্ঞাতভাবে তাঁহারাও বালকের সহিত নৃত্য যুড়িয়া দিত! পরে অন্য নূতন পথিক লোক দেখিলে তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিত—জ্ঞান হইত ও তখন তাঁহারা লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি তথা হইতে পলাইয়া যাইত। এই সময়ে নিমাইর বয়স ছয় বৎসরের বেশী ছিল না,

১. ৪র্থ ভাগে সত্যভানুর বিবরণ দেখুন।
২. ১৩২০ বাং আষাঢ় সংখ্যা আসাম বান্ধব পত্রিকায় এই জগদীশ ভট্টের জন্মস্থান "পূর্ব্বদেশ" কামরূপ ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

জগন্নাথ মিশ্র এই সময় বিশ্বরূপকে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। বিশ্বরূপ তাহা জানতে পারিয়া নিজ মামাত ভাই লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া একদা রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া যান,[৩] ও শীঘ্রই উভয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিমাই ভ্রাতৃবিরহে বড় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। তথাপি মাতার ক্রন্দন দেখিয়া বালক যখন বলিয়াছিল "মা, আমি ত তোমার রহিলাম, দাদার জন্য তুমি কাঁদিওনা।" তখন যথার্থই মাতাপিতার দুঃখ দূর হইয়াছিল।

জগন্নাথ মিশ্র স্থির হইয়া, পুত্র বিশ্বরূপ যে পথে গিয়াছেন, সে পথ হইতে যেন প্রত্যাবৃত্ত না হন, যেন ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া গৃহে না ফিরেন, এইজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন! ধর্ম্মপ্রাণ এমন পিতামাতা নহিলে নিমাইর ন্যায় পুত্র জন্মেন না।

নিমাইর যথাকালে উপনয়ন হয়, তাহার পর জ্বররোগে জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক গমন ঘটে। নিমাই যথারীতি বাপের শ্রাদ্ধ করেন। এই সময় হইতে নিমাই কিছু গম্ভীর হন, চঞ্চল বালকদল সহ আর খেলিয়া বেড়াইতেন না।

অধ্যয়নাদি

জ্ঞানোলোচনার ফলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, এই মনে করিয়া জগন্নাথ মিশ্র ভয়ে নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পতির মৃত্যুর পর শচীদেবী পুত্রকে পুনরায় টোলে পাঠাইয়া দেন। গঙ্গাদাস আচার্য্য নামক পণ্ডিতের কাছে নিমাই সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তৎপরে আপনাদের পুরোহিত বিষ্ণু মিশ্রের নিকট স্মৃতি ও জ্যোতির শাস্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর সুদর্শন পাণ্ডিতের নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; দুই বৎসরে তাঁহার ইহা সমাপ্তি হয়। তাহার পর অল্প কিছু কাল ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায়ের এক টোল স্থাপন করেন; সার্ব্বভৌমের টোলে শ্রীহট্টবাসী রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি পড়িতেন, নিমাইও অল্পদিনমাত্র পড়িয়াছিলেন। নিমাই ন্যায় অধ্যয়ন কালে ন্যায়ের এক টীকা লিখিয়াছিলেন, রঘুনাথও ঐ সময় তাঁহার প্রসিদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রঘুনাথ নিমাইর প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি নিমাইর গ্রন্থ রচনার সংবাদে চিন্তিত হন ও একদিন গঙ্গাপার হইবার কালে নিমাইর উক্ত গ্রন্থের দুই একটি সিদ্ধান্ত শুনিয়া যেমন বিস্মিত হন, নিজ গ্রন্থের আর প্রসিদ্ধির আশা নাই ভাবিয়া তেমনি বিষাদিত হন। রঘুনাথের এইভাব দর্শনে নিমাই দয়ার্দ্রচিত্তে নিজ গ্রন্থ গঙ্গায় বিসর্জ্জন করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশ ২য় বাঃ ২য় খঃ ৭ম অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রঘুনাথের কীর্ত্তিকথাও পূর্ব্বাংশে যথাস্থানে বর্ণন করিয়াছি।

অদ্বৈতাচার্য্যের কথা বলিয়াছি, অদ্বৈতের কাছে নিমাই কিছুদিন বেদ পাঠ করেন। পূর্ব্ব হইতেই অদ্বৈত নিমাইকে জানিতেন, এক্ষণে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, নিমাই দৃষ্টিমাত্র পাঠ আয়ত্ত করিয়া লন; বোধ হইত যে বিদ্যাশিক্ষা নিমাইর একটা অভিনয় মাত্র, সমস্তই যেন তাঁহার পূর্ব্বের অধীত। ফলে অত্যল্প কাল মধ্যেই নিমাই বেদে ব্যুৎপত্তি লাভক্রমে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত গৃহে আগমন করেন। এই সনন্দে তাঁহার বয়স ষোল বৎসরের অধিক ছিল না।

---

৩. "ইচ্ছামাত্র লোকনাথ আসিয়া মিলিল।
[illegible] নিয়া বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেশ গেল॥—প্রেম বিলাস।

গৃহস্থাশ্রম

পাঠ সমাধা করিয়া, সেই অল্প বয়সেই নিমাই নবদ্বীপে ব্যাকরণের এক টোল স্থাপন করেন। তাঁহার টোলে দেখিতে দেখিতে বিস্তর ছাত্র জুটিল ছাত্রদিগের পাঠের সুবিধার জন্য নিমাই একখানা ব্যাকরণের প্রস্তুতক্রমে তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিতেন; উহা "বিদ্যা সাগরী টিপ্পনী" নামে খ্যাত ও দেশে সুপ্রচারিত হইয়াছিল।[৪] এই সময়েই নবদ্বীপবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ইহার পরে কাশ্মীর দেশীয় কেশব নামক একজন পণ্ডিত, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত সকলকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করিয়া, নবদ্বীপের পণ্ডিত সকলকে জয় করিতে আগমন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁহার নাম শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত অবলীলাক্রমে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ব্যাকরণীয়া পণ্ডিত নিমাইর নিকট পরাজিত হইলে, সেই গর্বিত পণ্ডিতের অহঙ্কার দূর হইয়া মন পবিত্র হয় এবং তিনি নিমাইকে অসাধারণ পুরুষ বুঝিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। নিমাই কোন ব্যক্তিকেই সর্ব্বসমক্ষে লজ্জিত অপদস্থ করিতে চাহিতেন না, এই জন্য সন্ধ্যার পরে এই পণ্ডিতের সহিত বিচার করিয়াছিলেন।

ইহার পর নিমাই পণ্ডিতের মনে এক অভিলাষ জন্মিল, তিনি "বঙ্গদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাটী, সুতরাং পৈতৃক বাসস্থানে দেখিতে কৌতূহল জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?"[৫] নিমাই এই উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া পদ্মাবতীর তীরে আগমন করিলেন। তৎপরে পদ্মা নদী পার হইয়া তিনি বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করেন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে—

> "বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
> অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥"
> অপিতু—
> অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে সর্ব্ব বঙ্গ দেশে।
> শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রীপুরুষে॥"

প্রাজ্ঞ গ্রন্থাকার কর্ত্তৃক "সর্ব্ব বঙ্গদেশ" পদের প্রয়োগ হওয়ায়, কেবল পদ্মাতীরবর্ত্তী ফরিদপুরাদি নহে, শ্রীহট্ট ময়মনসিংহাদি সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ উদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীহট্টে গমন

প্রাচীন প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গে যে শ্রীহট্টগমন সংবাদ লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রথমতঃ তিনি পদ্মাতীরে অনেক ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন, তৎসঙ্গে ঐ সকল স্থানে তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তনও প্রচার করেন।[৬] পূর্ব্ববঙ্গেই তাঁহার কীর্ত্তন—বিলাস প্রথমে প্রকটিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে নবদ্বীপে থাকাকালে বা ইহার পরে তথায় গিয়া তিনি ভ্রমেও হরিনাম করেন নাই। নিমাইর তাবৎ চারিত্রই অভিনয়বৎ। পদ্মাতীরে অবস্থিতিকালে মহাপ্রভুর মনে পিতৃ জন্মভূমির দর্শনাভিলাষ জন্মে,[৭] তাহাতেই তিনি বিক্রমপুরের নূরপুর[৮] উপস্থিত হন ও তথা

---

৪. কলাপের আরও একটি "বিদ্যাসাগরী টীকা" শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ নিবাসী বাণীনাথ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। অদ্যাপি ঢাকাদক্ষিণে বিদ্যাসাগরের বংশীয়েরা আছেন, তাঁহাদিগকে "সাগরের বংশ" বলে এবং ইঁহারা আবাল বৃদ্ধ সকলেই "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে খ্যাত।

৫. বঙ্গ দর্শন ১২৮৪ সাল।

৬. "নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সব লোকে আপনি যাচিয়া॥
"—চৈতন্যমঙ্গল।

৭. "কিছুদিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে॥
পিতৃ-জন্মস্থান পিতামহের দেখিয়া।
পদ্মাবতী তীরে ঝাট আসিব চলিয়া॥"
—প্রেমবিলাস।

৮. অধুনা ইহা পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত।

হইতে যাত্রা করিয়া সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখ হইয়া ব্রহ্মপুত্রতীরে লাঙ্গলবন্দে পৌঁছেন ও ব্রহ্মপুত্র স্নানান্তে এগারসিন্দুর আগমন করেন।[৯] পরে এগারসিন্দুর হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ বেতাল গ্রামে বাস করেন; ইহার অল্পদূরে ঢোলদিয়া, ভিটাদিয়া প্রভৃতি প্রাচীন পল্লী। মহাপ্রভু ভিটাদিয়াতে লক্ষ্মীনাথ লাহীড়ির গৃহে অতিথিরূপে উপনীত হন। লক্ষীনাথ পরম বৈষ্ণব ও শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন, তিন বিশেষ যত্নের সহিত মহাপ্রভুর আতিথ্যসৎকার করেন। মহাপ্রভু লক্ষ্মীনাথের গুণে—বিশেষতঃ ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহে কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন; তাহার পর তিনি শ্রীহট্টে শুভাগমন করেন।[১০] এই স্থানে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের কবিতাংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, তিনি অমৃতাভ নামক তদীয় অপূর্ণ শেষ কাব্যে লিখিয়াছেন—

> "পূণ্যবান পিতৃস্থান দেখিতে নিমাই,
> গেলেন শ্রীহট্টে পূর্ব্ববঙ্গে পুণ্যবতী,
> দেখিলেন পূর্ব্ববঙ্গ শস্য সুশ্যামলা
> অন্নপূর্ণা জগতের।"[১১]

শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নিমাই প্রপিতামহের স্থান ঘুবরঙ্গাতে (বরগঙ্গায়) গমন করেন। তৎকালে তদীয় পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র, বুরুঙ্গাস্থিত তদীয় ভ্রাতৃবর্গের আহ্বানে কোন কারণে ঢাকা দক্ষিণ হইতে স্ত্রীর সহিত বুরুঙ্গাতে আগমন করিয়াছিলেন; কাজেই এই স্থানেই আপন পৌত্র শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা দর্শন করেন। পিতামহী পৌত্রকে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হন ও সুমিষ্ট পনস ফল প্রভৃতি খাওয়ান। ইহার পরে উপেন্দ্র মিশ্র দেহত্যাগ করেন।

যখন শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ হরিনামের বন্যায় ভাসাইয়া দিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী পতিবিরহে জর্জ্জরিতা হইতেছিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বরগঙ্গায়, তখন লক্ষ্মী কণ্ঠাগ্রতপ্রাণা; লক্ষ্মীকে

৯. "ব্রহ্মপুত্রে লাঙ্গলবন্দে করেন স্নান তর্পণ।
লোহিত্যকে নানারূপে করেন স্তবন॥
তথা হইতে মহাপ্রভু পঞ্চমী ঘাট গেলা।
নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিতে লাগিল॥
তথা হইতে মহাপ্রভু ঘিঘাট আইলা
সেই স্থানে পরশুরাম যজ্ঞ কৈরা ছিলা॥
সেই স্থানে কৈলেন প্রভু স্নানাদি তর্পণ।
এগারসিন্ধুর দেশে পরে উপস্থিত হন॥" —স্বরূপ চরিত গ্রন্থ।
(স্বরূপ চরিত ময়মনসিংহের জনৈক ব্যক্তি কৃত একখানা প্রাচীন কুলগ্রন্থ।)

১০. "তাহার নিকটে আছে ভিটাদিয়া গ্রাম।
নানাদেশে সুপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান॥
সেই স্থানে আছেন বিপ্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পরম বৈষ্ণব সর্ব্বগুণে সর্ব্বোপরি॥
তার ঘরে কৈলা প্রভু ভিক্ষা নির্ব্বাহনে।
+ + + +
লক্ষীনাথ বরদিয়া প্রভু গৌহরি।
কিছুদিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥" —প্রেমবিলাস।

১১. "গৌরাঙ্গ লীলা" (রামযাদব বাগচী এম ডি), "নিমাই সন্ন্যাস" (মতিলাল রায়) প্রভৃতি বহুতর আধুনিক গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের এই সময়কার শ্রীহট্টাগমন কথা লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে প্রেমবিলাস ও স্বরূপ চরিত্রে এই সংবাদ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আর যন্ত্রণাভোগ করিতে হইল না, বিরহই যেন সর্পরূপ ধরিয়া তাঁহাদের দংশন করিল, লক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করিলেন। একে পুত্রের অদর্শন জনিত জ্বালা, তাহাতে প্রাণ সমা বধুর বিয়োগ, বৃদ্ধা শচী একান্ত ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। জননীর রোদনে দূরে—অতি দূরে থাকিলেও নিমাইর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি সত্বর পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে চলিলেন।[১২]

এই সময়ে তপন মিশ্র নামক এক বিপ্র তাঁহার কাছে গিয়া সাধ্য সাধন জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই তাঁহাকে হরিনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া কাশী যাইতে বলেন। বৃদ্ধ তপন মিশ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া ভার্য্যার সহিত কাশীগমন করিয়াছিলেন। এই তপন মিশ্রকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন; লাউড়ে ইঁহার নিবাস ছিল, এবং তথায় ঐ বংশ থাকার কথা শুনা গিয়া থাকে।[১৩] এই সময়ে আরো এক ব্যক্তি এইরূপেই শ্রীমহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠেন ইঁহার নাম জগন্নাথ আচার্য্য ছিল।[১৪]

পুনঃ নবদ্বীপ

শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপে পৌছিয়া একটু বিশ্রামান্তরই মাকে প্রবোধ দেন। মা পুত্রমুখ দর্শনে ও তাঁহার মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া বিগত ক্লেশ হইলেন, তাঁহার পরে শ্রীমহাপ্রভু সশিষ্য গঙ্গাস্নানে গমন করেন, স্নানান্তে আহারাদি করিয়া প্রতিবেশীবর্গ সহ সম্মি ত হন। অনেক কথাবার্ত্তার হাসিয়া হাসিয়া বঙ্গদেশী লোকদিগকে তাহাদের দেশীয় কথার অনুকরণে কথা বলিয়া হাস্যামোদ করিয়াছিলেন; যথা—চৈতন্য ভাগবতেঃ—

"বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥"

কিন্তু ব্যঙ্গের মাত্রাটা শ্রীহট্টবাসিগণের প্রতি অধিক ছিল, যথা তত্রৈব—

"বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টীয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টীয়গণ বলে হয় হয়।
তুমি কোন দেশীলোক কহত নিশ্চয়?" ইত্যাদি

শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া এই রঙ্গ আরম্ভ করেন। শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের কথা শিখিয়া গিয়া, তদনুকরণে তাঁহাদিগকে বিদ্রুপ করিলে, তাঁহারা যে বড় উত্যক্ত হইত, তাহা নহে; কেননা তিনি স্বয়ংই শ্রীহট্টীয়ার সন্তান, এই কথাটি তাঁহারা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেও ভুলিত না; তাঁহারা নিমাইকে এ সম্বন্ধে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঠেকাইত।[১৫]

স্বদেশীয় ভক্তগণসহ শ্রীমহাপ্রভু যে এসব রঙ্গ করিতেন, তাহা এক্ষণে শুনতে বড়ই সুখ বোধ হয়, তাই একটু বিস্তৃত ভাবে বলিলাম।

---

১২. এইবারে শ্রীমহাপ্রভু ঢাকাদক্ষিণে পিতামহগৃহে গমন করেন নাই, প্রপিতামহালয় বুরুঙ্গাতে পিতামহ ও পিতামহীকে প্রাপ্ত হওয়াতে ঢাকাদক্ষিণে যাওয়ার আবশ্যক হয় নাই, এ স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বধুবিয়োগ-বিধুরা জননী শচীদেবীর উদ্বেগসূত্রে এস্থানে তাঁহার হৃদয়ে চঞ্চলতা জন্মে এবং তাহাতেই তাড়াতাড়ি তথা হইতে চলিয়া যান।

১৩. শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দাস প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৪. "জগন্নাথ আচার্য্য দুর্ব্বাসা মহামতি।
চৈতন্যের শাখা যার শ্রীহট্টে বসতি॥"—বৈষ্ণবাচার দর্পণ।

১৫. "পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার?" —চৈতন্য ভাগবত।

বিষ্ণুপ্রিয়া

যাহা হউক, শচীদেবী পুনর্ব্বার পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন এবং রাজ পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। এদিকে নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বে ন্যায় বিদ্যারসে মত্ত হইলেন—অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন শিক্ষাদানের সহ কীর্ত্তন প্রচার চলিত—নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইত, এখানে তাহার কিছুই ছিল না, সে সব যেন কিছুই জানেন না! শচী নববধু ও নিমাইকে লইয়া পুনর্ব্বার সুখী হইলেন।

এই ভাবে কিছু কাল গত হইলে নিমাই পিতৃকৃত্য ব্যপদেশে গয়াতে গমন করেন। বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিতে গিয়া তাঁহার যে আশ্চর্য্য ভাবোদয় হয়, তদ্দর্শনে সঙ্গী সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু পদ দর্শনে নবদ্বীপের উদ্ধত পণ্ডিত ঈশ্বরানুরাগে উন্মত্ত হইলেন; তাঁহার নেত্র হইতে অবিরলধারে অশ্রুপাত হইতে থাকে। এই সময় ঈশ্বরপুরী নামক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণানুরাগ

নিমাইর কৃষ্ণানুরাগ ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দেখিয়া গয়াবাসী চমৎকৃত হইল; সঙ্গীগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন ভাবতো মানুষে কেহ কখন দেখে নাই, মানুষের চক্ষে যে এত জল থাকিতে পারে, তাহাও কেহ কল্পনা করে নাই। নিমাই জ্ঞানশূন্য হইয়া কৃষ্ণদর্শন মানসে "কৃষ্ণ প্রাণধন কোথায়" বলিয়া বৃন্দাবনের মুখে ছুটিলেন। সঙ্গীগণ বহু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে কিছু স্থির করিলেন ও কোনরূপে গৃহে লইয়া আসিলেন।

নবদ্বীপে যে কয়েকজন হরিভক্ত তখন ছিলেন, নিমাই পণ্ডিতের ভাব পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা প্রাপ্তে তাঁহাদের চিত্তে পরম হর্ষ উপজাত হইল; সুখস্পন্দিত চিত্তে তাঁহারা দেখিলেন যে নিমাই এক অদ্ভুত বস্তু। বিনয়ের আধার, নিজকে নিতান্তহীনজ্ঞান, দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই, আপনাকে গোপনে রাখিতেই ব্যস্ত। স্নেহের আধার,—এত যে বাহ্যজ্ঞানহারক কৃষ্ণপ্রেম, তবু মাকে দেখিলে সব ভুলে যান, মাতাই তাঁহার কাছে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপিনী। ভগবৎভক্ত যেন প্রাণের সদৃশ। দয়ার আধার, + দীনহীন দেখিলে নিমাই গলিয়া যান—চক্ষের জল থামে না। ভক্তির আধার,—কৃষ্ণভক্ত দেখিলে বশে থাকেন না, হরিনাম শুনিলে নিমাইয়ের চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসে। প্রেমের আধার—সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেমে ভাসিতেছেন, ভিতর হইতে যেন ভাবরাশি উছলিয়া উঠিতেছে। বহুচেষ্টাতেও নিমাই অন্তরের ভাব দর্শন করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ বয়সে নবীন হইলেও নিমাইয়ের আচরণ সকলের শিক্ষনীয় ও আদর্শস্থানীয় হইল; দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে ঈশ্বরানুরাগী ভক্তগণ আসিয়া নিমাইকে ঘেরিলেন।

নিমাইর ছেলে পড়ান বন্ধ হইল, শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তন কোলাহল উঠিল।[১৬] সেই মৃত সঞ্জীবনী বংশীধ্বনী-শ্রবণে বহুদিনের শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হইল—নির্জ্জীব বঙ্গদেশবাসী প্রাণ পাইল। সে সকল অমৃত বার্ত্তা বিস্তারিতরূপে বর্ণনের আমাদের স্থান নাই—শক্তিও না।[১৭]

১৬. পূর্ব্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখিত হইয়াছে।

১৭. নিমাই গয়া হইতে আসিয়া সশিষ্য পথে চলিতে চলিতে একদা শ্রীহট্টবাসী রত্নগর্ভ আচার্য্যের টোল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা শুনিয়া কৃষ্ণ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রত্নগর্ভের কথা "ইতিবৃত্তের" ৩য় ভাঃ ১ম খঃ ৩য় অধ্যায়ে বলা গিয়াছে। শ্রীহট্টের শ্রীবাস পণ্ডিতের তাঁহার কীর্ত্তন লীলা চলিত, শ্রীহট্টের রত্নগর্ভের ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রথম তদীয় প্রেম প্রকটন, শ্রীহট্টের আচার্য্য রত্ন গৃহে বাঙ্গালার প্রথম নাটকাভিনয় এবং শ্রীহট্টের মুরারি গুপ্ত কর্ত্তৃক সর্ব্বাদ্যে এসব লিখিত হয়; তাহা ভাবিতে ভক্ত শ্রীহট্টবাসীর আনন্দ হয় নাকি?

এই কীর্ত্তনতরঙ্গে নবদ্বীপের জমিদার নন্দন ও শান্তিরক্ষক জগন্নাথ ও মাধব (জগাই মাধাই) বাধা দিতে গিয়া তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারই চরণলগ্ন হইয়া অকূলে কুল পাইয়াছিল; নবদ্বীপের যবন কাজি এই কীর্ত্তন-প্রবাহের রোধ করিতে অগ্রসর হন, কিন্তু প্রেমমহাবন্যার এক বিন্দু বারিস্পর্শে তাঁহার অন্তরের সব ময়লা বিধৌত হইয়া গিয়া কাজিকে অমৃতের অধিকারী করিয়া তুলে। ফলতঃ যত ক্ষুদ্র বৃহৎ খালা নালা ডোবা সে মহাবন্যার জলে আপ্লাবিত হইয়া একাকার হইয়া যায়। বঙ্গের প্রত্যেক অংশ হইতে যত খালা নালা, নদী, সকল আসিয়া এই মহাসাগরে মিলিত হয়। তাহাতে তরঙ্গে তরঙ্গে বারিধিবারি নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছিল, তাহাতে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়া নদে ভেসে যায়।"

এই সেদিন মাত্র—প্রখর ঐতিহাসিক আলোকের মধ্যে সোণার বাঙ্গালার সোণার দেবতা যে স্বর্ণযুগে পত্তন করিলেন, কোন কালে কেহ কখন তাহা দেখে নাই, শুনে নাই,—তাহার আস্বাদন করে নাই। তাঁহার কৃপার সে "অনর্পিত" সুধা যুগে যুগে ধরাবাসী পান করিয়া তৃপ্ত হইবে—অমর হইবে। বাঙ্গালী জাতি ধন্য, তাঁহাদেরই শ্রীগৌরাঙ্গ সে অনর্পিত, অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম রস জগতে বিলাইয়া দিয়াছেন; শ্রীহট্টবাসী আরোও ধন্য যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদেরই।

শ্রীগৌরাঙ্গ কত বৃহৎ বস্তু, তাহা যাঁহারা তখন বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা তাহা সম্যক অনুভব করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহই নির্ব্বোধ নিরক্ষর ছিলেন না। অদ্বৈত, শ্রীবাস; মুরারি, গঙ্গাদাস; পুণ্ডরীক, মুকুন্দ, গদাধর, জগীনন্দ, ইহারা সকলেই নিমাইর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরাবতার, একথা তাঁহারা সহজে বলেন নাই। বালুকণাকে পর্ব্বতচিন্তা চলিতে পারে, জলকণিকাকে মহাসাগর মনে করা যাইতে পারে কিন্তু ক্ষুদ্র মনুষ্য কীটকে অনন্ত বিশ্বের অধিপতি ঈশ্বর মনে করা যাইতে পারে না; মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞান হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মহাপাপ জনক। এসকল ঋষিকল্প মহাপুরুষগণ কঠোর পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তবে তাঁহাকে ঈশ্বর মনে করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যদি কেহ পরীক্ষা করিতেন, তবে তাহা হইতে অধিক পারিতেন না। পরীক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর মনে করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভগবান ভাবে তাঁহাকে ধ্যান-ধারণা করিতেন—পূজা করিতেন। কিন্তু সে সবই মনে মনে, শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে কেহই তাঁহাকে ঈশ্বরভাবে কিছু বলিতে কি করিতে পারিতেন না; দৈবাৎ অজানিতভাবে কোন নূতন লোক তাহা বলিলে তিনি "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিয়া কানে হাত দিতেন ও অতি বিষাদিত হইতেন।

ঈশ্বরাবেশ

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তভাবে ভক্তবৎ চলিলেও, সময় সময় তাঁহার ঈশ্বরভাব প্রকটিত হইত; সেই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি নিঃসৃত হইত, তাঁহার ক্রিয়া মুদ্রা ভিন্নাকার ধারণ করিত। যিনি আপনাকে তৃণাদপি হীন জ্ঞান করিতেন, দেব দ্বিজে যাঁহার ভক্তির তুলনা মিলিত না, তিনিই তখন বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুচক্রপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার আসনে বসিতেন এবং তিনি যে জগৎপতি, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতেন। তখনই তিনি নানাবিধ সফল বর প্রদান করিতেন বা ভবিষ্যৎবাণী বলিতেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার একটি ব্যবহারের কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়; এই সময় তিনি পূজনীয় ব্যক্তিবর্গ হইতেও সহাস্যে পূজা গ্রহণ করিতেন, তৎকালে মা শচী প্রণাম করিলে বা অদ্বৈত আসিয়া সচন্দন তুলসীদল চরণে লিপ্ত করিলেও কিছুই বলিতেন না। নিমাইর ন্যায় জ্ঞানী, শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দু সন্তান, নিমাইর ন্যায় সরল, বিনীত ও গুরুজনভক্ত গৃহস্থসন্তান স্ববশে থাকিয়া ইহা করিতে পারেন না। এই অবস্থায় নিমাইর দেহে ঈশ্বরাবেশ

ঘটিত বলিয়া ভক্তবর্গ ইহাকে আবেশাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ ভক্তবর্গ নিমাই পণ্ডিতে ক্রমশঃ নানা ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইতেন; বিবিধ অলৌকিক ভাব অবলোকন করিতেন,—আর তাঁহারা সকলেই সুখের সমুদ্রে ভাসিতেন। যদি সৌভাগ্য রূপে, কাহারও এমন বিশ্বাস হয় যে ভগবান রক্ষক থাকিতে নিজের চেষ্টা উদ্যমের আবশ্যক নাই, তবে তাঁহার কর্ম্ম করিবার মোটেই ইচ্ছা থাকে না; নবদ্বীপের ভক্তবর্গের কতকটা তদবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিষয়েরই যে দুইটা দিক আছে, একটার সঙ্গে অন্যটার ঘনিষ্ট সম্পর্ক, একথাটা তাঁহারা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এ অবস্থাটা সংসার রক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে, তাই অতি সত্বরই ইহার প্রতিক্রিয়াও নিমাই কর্ত্তৃক আরম্ভ হইয়াছিল।'

কৃষ্ণসুখে বিচ্ছেদ

মানব অভাবের দাস, অভাবের তাড়নায় বিতাড়িত হইয়া ভ্রামিত হয়। যদি অভাব বোধ না থাকে, তবে সাংসারিক দুঃখের অনেকটা লাঘব ঘটে। যদি এমত দৃঢ় বিশ্বাস জাত হইতে পারে যে তাঁহাদের অভাব উপস্থিত হইলেই ভগবান তাহা পূরণ করিবেন, তবে তজ্জন্য আর চিন্তা থাকে না। বৃন্দাবনের গোপ গোপীদের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল, তাঁহাদের অভাববোধ ছিল না—দুঃখের লেশও ছিল না; কৃষ্ণ-সঙ্গ ব্যতীত তাঁহাদের বাঞ্ছান্তরও ছিল না। সে বাঞ্ছাও আবার তাঁহাদের আত্মতৃপ্তির জন্য নহে—কৃষ্ণের সুখের উদ্দেশ্যেই মনে হইত। কিন্তু সকলেরই সীমা আছে—ইহা তাঁহারই বিধান, সঙ্গসুখেও বিচ্ছেদ আছে। যদিও বিচ্ছেদে রসের পরিপুষ্টিই সাধিত হইয়া থাকে, তথাপি তাহার স্বভাবসিদ্ধ আশুযন্ত্রণা যে নাই—এমন নহে; ইহা "তপ্তইক্ষুচর্ব্বণবৎ।" শ্রীকৃষ্ণকে অক্রুর মথুরায় লইয়া গেলেন, বৃন্দাবনে বিচ্ছেদানল জ্বলিয়া উঠিল।

প্রবলবেগে জাহ্নবী-ধারা বহিতেছিল, অগস্তঋষি গণ্ডুষে তাহা পান করিয়া সে খর-ধারা রোধ করিলেন। নবদ্বীপে যে প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, যে কীর্ত্তন কোলাহল সদা শ্রুত হইতেছিল, কেশবভারতী কর্ত্তৃক তাহা কোথায় উড়িয়া গেল? অক্রুর কৃষ্ণকে লইয়া গিয়াছিলেন, কেশব ভারতী নিমাইকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পথের কাঙ্গাল সাজাইয়া দিলেন।

অক্রুরকে ব্রজবাসিগণ দোষ দিয়াছিলেন, কেশব ভারতীকে দোষ দেওয়া কঠিন। ভারতী ভুবনমোহন নিমাইকে সন্ন্যাসী সাজাইতে চাহেন নাই। বার বার নানা কথা বলিয়া গৃহে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে বিশাল স্রোত পরিমিত স্থানে নির্বদ্ধ থাকিবার নহে, যাহা সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া দিকদিগন্তে প্রধাবিত হইবে, তাহার গতিরোধ করিবে কে? ভারতী কতক্ষণ প্রতিবন্ধকতা করিবেন? দেশের ধর্ম্ম-দুর্গতি দূর করিতে নিমাই চলিয়াছেন, তাঁহার অজস্র নয়নবারি ভারতীয় দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প ভাসাইয়া লইয়া গেল, তদীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতী বুঝিতে অসমর্থ হইলেন, সুতরাং ভারতীকে দুষিতে পারা যায় না। যে শক্তি মাতা ও পত্নী হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল কেশব ভারতী তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার দোষ কি?

সন্ন্যাসী

তরুণ নিমাই অরুণ বসন পরিধান করিয়া নবীন উদাসীন সাজিলেন, নাম হইল হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মনে এই ঘটনাটি পাষাণের রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, সংসারের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছিল, আত্মদৃষ্টি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন দ্রষ্টা এরূপ বিহ্বল হইয়াছিল যে তাহাদের জ্ঞান লোপ হইয়াছিল; কেহ

কেহ মুর্চ্ছিত হইয়াছিল এবং কেহ কেহ উন্মত্ত হইয়াছিল। ইহা কল্পনার কথা নহে—বাস্তব ঘটনা; গঙ্গাধর নামক একব্যক্তি কেশব ভারতীর মুখে "চৈতন্য" এই নামার্দ্ধ শুনিয়া মুচ্ছিত হন ও তৎপরে পাগল হইয়া শুধু "চৈতন্য" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে সপ্তদিবা গঙ্গার তীরে তীরে ভ্রমণ করেন; এই ব্যক্তি তদবধি "চৈতন্যদাস" নামে খ্যাত হন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। উন্মত্তবৎ তিনি "মুকুন্দ" "মুকুন্দ" বলিয়া বৃন্দাবনের মুখে ধাবিত হইলেন। নিত্যানন্দাদি পাঁচজন ভক্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা দৌড়িয়া অনুষঙ্গে যাইতে পারিতেছেন না। নবীন উদাসীনের জ্ঞান নাই। বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া মনে করিয়া তিনদিন রাঢ়দেশে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিলেন। তিন দিনের পর তিনি পূর্ব্বমুখ হইলেন, তখন নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আনয়ন করিলেন। গঙ্গাদর্শনে সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমি মনে করিয়াছিলাম, যমুনার তীরে আসিয়াছি এ যে গঙ্গা! আমি কোথায়? আমি কি শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়াছি?" তখন অদ্বৈত অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন! অদ্বৈতগৃহে কীর্ত্তন উঠিল—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর,
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যতদুখ দেল,
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেলা॥" (বিদ্যাপতি)

শান্তিপুরে বাস্তবিকই "আনন্দের ওর" বা সীমা ছিল না।

মাতৃ সম্মিলন

নবদ্বীপের প্রত্যেকভক্ত আসিয়াছেন, কাটোয়া প্রভৃতি হইতেও বহুলোকের আগমন ঘটিয়াছে, শচীদেবীও আসিয়াছেন; শান্তিপুরে বাস্তবিকই আনন্দের সীমা নাই। বড় দুঃখের পর মা পুত্রকে পাইয়াছেন; মুখে বাক্য নাই, নয়নে জলধারা। পুত্র মাকে বলিলেন—"জননি! কৃষ্ণপ্রেমে পাগল করিয়া আমাকে ঘরের বাহির করিয়াছে, আমাকে—তোমার অবোধ ছেলেকে—মা! ক্ষমা করো।" মা বলিলেন—"বাপ, যাহা করিয়াছ ভালই, তবে আমাদের চিত্তের তত বল নাই, তাই অভিভূত হই। বাপ, কৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করুণ!"

"কৃষ্ণ মঙ্গল করুণ" বলিতে শচীর মনে আর একটি কথা স্মরণ হইল, ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি ঢাকা দক্ষিণ গমন করিয়াছিলেন, তখন শাশুড়ী শোভাদেবী তদীয় গর্ভকথা জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন এবং বধূকে নবদ্বীপ প্রেরণকালীন, সেই গর্ভজাত সন্তানটিকে একবার ঢাকাদক্ষিণে পাঠাইতে বলিলে, তিনি প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছিলেন,[১৮] মনে হইল— সে প্রতিশ্রুতি তাঁহার দ্বারা রক্ষা করা হয় নাই। এই কথাটি তাঁহার মনে হইলে, তিনি ভাবিলেন—"কই, নিমাইকে তো আমি একথা বলি নাই? তাহাকে নয়নের অন্তরালে পাঠাইতে ইচ্ছা হইত না বলিয়া, বলি নাই। নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে—তথা শ্রীহট্টে গেলেও আমার প্রতিশ্রুতি সাক্ষাৎভাবে রক্ষিত হইতে পারে নাই—সে তো ঢাকাদক্ষিণে যায় নাই, বরগঙ্গা হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। আমারও গুরুজনের আদেশ রক্ষা করা হয় নাই। আমার এই পাপের ফলেই কি বিধাতা নিমাইকে ঘরের বাহির করিলেন। যাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে ভয় হইত, তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিলাম না। যাহা হ'বার হইয়াছে, এক্ষণে আমার দোষে আর যেন আমার

---

১৮. শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থ দেখ। এই বিষয়টি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উত্তরাংশের ৩য় ভাগ ১ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে পুনরুল্লেখ করা গেল না।

সোণারচাঁদের কোন অনিষ্ট না ঘটে।" এই ভাবিয়া পুত্র-স্নেহ-কাতরা জননী গোপনে আপন পুত্রের কাছে সেই বৃত্তান্তটি বলিলেন— যেরূপ তাঁহাকে ঢাকাদক্ষিণে পাঠাইতে পূর্ব্বে শাশুড়ী—সদনে প্রতিশ্রুত হন,[১৯] এবং তা তৎকালে পর্য্যন্ত বলেন নাই, ইহা জানাইলেন, ও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। তখন নিমাই মাতৃ ইচ্ছায়, তথা হইতে পুনর্ব্বার শ্রীহট্টে গমন করেন।[২০]

ঢাকাদক্ষিণ গমন

তিনি প্রথমতঃ বুরুঙ্গায় গিয়া, পরদিন ঢাকাদক্ষিণে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়া, পিতামহীর মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলেন, পিতামহীর সহিত সম্মিলিত হইয়া ছিলেন। আমরা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের এই অংশে ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়ে বুরুঙ্গার কথা এবং ৩য় অধ্যায়ে ঢাকাদক্ষিণের কথা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি।[২১] কৃপাপরায়ণ পাঠক এই উপলক্ষে তাহা পুনর্ব্বার দেখিয়া লইলে ভাল হয়।

শ্রীমহাপ্রভু ঢাকাদক্ষিণে আগমন করিলে, তৎসহ এদেশের রামদাস, মাধব ও জ্ঞানবর, কল্যানবর প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিয়া সম্মিলিত হন, ইহাদিগকে তিনি স্থানে স্থানে প্রচারকার্য্যে

১৯. "তব পিতামহী আছে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে,
তোমাকে পাঠাতে তার ঠাঁই।
তথা যেয়ে একবাব, বাঞ্ছাপূর্ণ কর তাব
তব কাছে এই ভিক্ষা চাই॥" —শ্রীচৈতন্য বিলাস।

২০. ঢাকাদক্ষিণে আগমন সময়ে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যেব সহিত তদীয় মাতুল বিষ্ণুদাস আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস দৃষ্টে ইঁহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য আহারান্তে হরীতকী চর্ব্বণ করিতেন, বিষ্ণুদাস তাহা যুগাইতেন। পূর্ব্ববঙ্গে---মুখডোবায় উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব হরীতকী প্রাপ্ত হইবাব কাবণ জিজ্ঞাসিলে বিষ্ণুদাস বলেন যে পূর্ব্বদিনে উহা পাইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তখন বলেন যে "আপনি এইখানেই থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম করুণ, আপনার সঞ্চয়তৃষ্ণা তিরোহিত হয় নাই।" শ্রীচৈতন্যের আদেশে বিষ্ণুদাস ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও সেই স্থানে থাকিয়া বিবাহ করিলেন। সেই হইতে বিষ্ণুদাসের বংশতরু পূর্ব্ববঙ্গে মুখডোবায় রোপিত হয় ও এ পর্য্যন্ত উহা তথায়ই পল্লবিত হইতেছে। এই আখ্যায়িকা তাঁহারাই প্রচার করেন।

২১. শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় পিতামহী শোভাদেবীর সহিত ঢাকাদক্ষিণে সম্মিলিত হয়। শ্রীমহাপ্রভুব পিতামহীর নাম কোথায়ও শোভাদেবী, কোন গ্রন্থে কলাবতী, কোন গ্রন্থে বা কমলাবতী বলিয়া লিখিত। আমরা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ১ম অধ্যায়ের একটি টীকায় দেখাইয়াছি যে উপেন্দ্র মিশ্র ও তৎপিতা মধুকর মিশ্র বিভিন্নগ্রন্থে বিভিন্ন নামে উল্লেখিত হইযাছেন, তদবস্থায় উপেন্দ্র-পত্নীব নাম সম্বন্ধে তদ্রূপ না থাকিলেই আশ্চর্য্যের কথা হইত, বস্তুতঃ উপেন্দ্রপত্নীর একাধিক নাম থাকাই সম্ভব।
শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণোপলক্ষে পিতামহ ও পিতামহীর সহিত মিলন প্রসঙ্গ ও উভয়ের নিত্যধামে গমনের সংবাদ প্রেমবিলাসে লিখিত হইয়াছে; পতি-পত্নী এক সময়েই নিত্যধামে গমন করেন নাই; করিলে ঢাকাদক্ষিণে শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহী সম্মিলন ঘটিবে কিরূপে? প্রাচীন গ্রন্থ পত্রের রচনা অনেক স্থানে জটিল, প্রেম বিলাসে সেই জটিলতা অত্যধিক। [অনুরাগবল্লী নামক প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমাদের "প্রেমবিলাস গ্রন্থ" প্রবন্ধ এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থ দেখ।] প্রেমবিলাসে সংক্ষিপ্ত ভাবে এক স্থানে (শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মিলন ও তদনন্তর পতিপত্নীর পরলোক গমন) দুই বিভিন্ন কালেব ঘটনা একত্রে বর্ণিত হওয়ায় জটিলতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ফলতঃ পৌত্রের সম্মুখে এক সঙ্গে পিতামহ ও পিতামহী পরলোক গমন করেন নাই। তখন কেবল উপেন্দ্র মিশ্রই পরলোক গত হন। তিনি সন্ন্যাসেব পূর্ব্বে এবং তৎপত্নী সন্ন্যাসের পরে ঢাকাদক্ষিণে পরলোক গমন করেন। প্রেমবিলাসে একস্থানে উভয় ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেদয়াবলী গ্রন্থে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী আগমন বর্ণনই উদ্দেশ্য বলিয়া তদীয় প্রথমবারের শ্রীহট্টাগমন কীর্ত্তিত হয় নাই।

প্রেরণ করিয়াছিলেন; সেই প্রচারের নিদর্শন দ্বার পর্য্যন্ত হয় নাই। উত্তরে হাজঙ্গ জাতি এই সময়েই বৈষ্ণবধর্ম্মে বঞ্চিত হয়, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশে ৩য় ভাগ ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায়ে তাহ বিবৃত করা হইয়াছে, পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা পুনর্ব্বার দেখিয়া লইবেন।

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুর হইতে ঢাকাদক্ষিণে গিয়া যেমন পিতামহীর মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সময় তেমনি যশোড়া গ্রামে গিয়া জগদীশ পণ্ডিতেরও মনোবাঞ্ছনা পূ করেন; এই জগদীশের নিমাই বাল্যে বিষ্ণুব নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগদীশগৃহে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হইলে যশোড়া পাঠ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।[২২]

শ্রীচৈতন্য আসামে

শ্রীমহাপ্রভু ঢাকাদক্ষিণ হইতে আসামে গমন করিয়াছিলেন। আসামে (হাজোতে) মাধবের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ তিনি এই মন্দিরে আসিয়া, বরাহ কুণ্ডের উপরে একটি গোফাতে অবস্থিতি করিয়া মাধবদর্শন করেন। এই স্থানে রত্নেশ্বর বিপ্র তাঁহার ভক্তরূপে গণ্য হন, ইঁহাকে তিনি ভাগবত শিক্ষা দিয়া "রত্নপাঠক" উপাধি প্রদানান্তর মাধবের মন্দিরে পাঠক নিযুক্ত করেন তদবধি তথায় ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পর মহাপ্রভু পরশুরামকুণ্ডে গমন করেন ও তথা হইতে ব্রহ্মকুণ্ডে গমন ও স্থানান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি পুনর্ব্বার হাজোতে আসিয়া সেই গোফাতেই অবস্থিতি করেন, সেই পবিত্র স্থান তদবধি "শ্রীচৈতন্যের গোফা" নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। এই স্থানে তিনি মাগুরীয় তর্কভূষণ ও কবিশেখরকে ভাগবত শিক্ষা দেন। কথিত আছে এই সময়ে তিনি নারদের ন্যায় বীণাবাদনপূর্ব্বক হরিনাম গান করিয়াছিলেন।

দামোদর আসামে দামোদরীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তিনি মাধবদর্শনে আসিয়া সাক্ষাৎ মাধব শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।[২৩] তাহার পর প্রসিদ্ধ শঙ্করদেব শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসেন, কিন্তু তৎকালে তিনি তথা হইতে যাত্রা করিয়া নীলাচলে গমন করায় আর তিনি তদ্বীয় দর্শন প্রাপ্ত হন নাই।[২৪] শ্রী মহা প্রভু আসাম হইতে নীলাচলে[২৫] পৌঁছিলে প্রথমেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম সহ তাঁহার মিলন হয়। সার্ব্বভৌমের নামোল্লেখ পূর্বে

---

২২. ইঁহার নামোল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। নিমাইর সন্ন্যাস গ্রহণ করার সংবাদ শ্রবণে বৃদ্ধ জগদীশ গৌরশূন্য নদীয়া, বাসের অযোগ্য বোধে তাহা হইতে সস্ত্রীক যশোড়াতে গিয়া গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করেন "শ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয়" নামক প্রাচীন গ্রন্থে তাহা বর্ণিত আছে।

২৩. দামোদরের শিষ্য প্রসিদ্ধ ভট্টদেব কবিরতন খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে আসামীভাষায় "সৎসম্প্রদায় কথা" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে ইহা লিখিত আছে, যথাঃ "শ্রীচৈতন্য কেশব ভারতীয় শিষ্য হই সৌমার (uppor Assam) পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা। প্রত্যেক পূর্ব্বদেশের আচার্য্য চৈতন্য প্রখ্যাত ভৈল। + + পাছে চৈতন্য ভাবতি প্রভু মাধব দর্শনে মনিকুটে (হাজোতে মাধব মন্দির যে পর্ব্বতে) আসিলা বরাহ কুণ্ডর উপরে গোফাত থাকি মাধব দর্শন হৈল, পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পড়াই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পড়িবে দিলা আরু যাত্রামহোৎসব সংকীর্ত্তন কর্ম্মকো মারধর দ্বারত প্রবর্ত্তাইলা। পরে মহাপ্রভু পর্শুকুটারে (পরশু রাম কুণ্ডে) যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই গোফাতে রহিলা। পাচে মাগুরীয় কণ্ঠভুষণক আর কবিশেখর বা কণ্ঠহার কন্দলিক শরণ লগাই ভাগবত পড়াইলা। পাচে বীণা হাতে ধরি কৃষ্ণ নাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠা (চেষ্টা) দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মনিকুটে যাই তাঙ্ক দেখি দুর্ল্লভ লাভ ভৈলা + + + তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দিয়া উড়েষাক (উড়িষ্যায়) গেলা।" সৎসম্প্রদায় কথা ৭ম অঃ।

২৪. পরে তিনি শ্রীচৈতন্য দর্শনে নীলাচল গমন করিয়াছিলেন।

২৫. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি প্রসিদ্ধ ও পরিজ্ঞাত গ্রন্থে শান্তিপুর হইতেই নীলাচল গমন কথা লিখিত। আবার সুবল মঙ্গলাদিতে অম্বিকা হইতে যাওয়ার কথা আছে। হইতে পারে এসব হইতে পুনঃ শান্তিপুরে গিয়াই নীলাচলে গিয়াছিলেন।

করা গিয়াছে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্ব্বভৌমের বিদ্যাযশ মহিমা শ্রবণে মোহিত হইয়া বৃত্তিদানে তাঁহাকে নীলাচলে নিয়া স্থাপন করেন। শ্রীক্ষেত্রে সার্ব্বভৌমের কাছে শত শত শিষ্য বেদান্ত অধ্যয়ন করিত, রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন।

নীলাচলে

সার্ব্বভৌম একদা জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন, তিনি দেখিলেন যে স্বর্ণকান্তি একটি যুবক জগন্নাথ দর্শনে আসিলেন। তাঁহার একাগ্রতা অতুলনীয়, তাঁহার ঐকান্তিকতা অনন্য সাধারণ। যুবকের নেত্রে জলধারা বহিতেছে, যে অশ্রুবারি অপরিমেয় অদ্ভুত; গণ্ড বাহিয়া, দেহ ভিজিয়া, ভূমি আর্দ্র করিয়া সেই জলধারা জলযন্ত্রের উচ্ছাসের ন্যায় ছুটিয়া' চলিল—"চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল।" সার্ব্বভৌমের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল; এদিকে যুবক মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। সার্ব্বভৌম দেখিতে পাইলেন যে যুবকের দেহ ছিন্নকণ্ঠ কপোতের মত কম্পিত হইতেছে; দেখিলেন—লোমাবলী যেন সজারু কন্টকের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল, দেহ বিবর্ণ হইয়া গেল ও পরক্ষণে লোমাবলী মূলে চণাকাকৃতি স্থূল ব্রণরাজি উত্থিত হইল। এসব ভক্তি-লক্ষণ মানবে কদাচিৎ লক্ষিত হয়, সার্ব্বভৌম ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও যুবকের প্রতি অনুরুক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে লোকদ্বারা বহন করাইয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন।

সার্ব্বভৌমের গৃহে গিয়া সন্ন্যাসীর জ্ঞান সঞ্চার হইল, তাঁহার সঙ্গীগণও আসিয়া মিলিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাদের কাছে সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব পরিচয় পাইয়া পরম তুষ্ট হইলেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁহাকে বেদান্ত শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সাতদিন কোনরূপ বাক্যব্যয়ব্যতীত বেদান্ত শুনিলেন। সাতদিনেরও পর সার্ব্বভৌম বলিলেন—"চৈতন্য! তুমি সাতদিন বেদান্ত শুনিলে, ভাল কিছুই বলিলে না, তোমাকে ধীশক্তি সম্পন্ন দেখায়, কিন্তু বুঝিতেছ কি না, তাহার লক্ষণ দেখিতেছি না!"

সার্ব্বভৌমের প্রশ্নে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিলেন "ব্যাসসূত্রের অর্থ অতি স্পষ্ট কিন্তু শঙ্করের ভাষ্যরূপ জলদ-জালে তাহা আচ্ছাদিত হওয়াতে আপনার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাটি তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না।" পণ্ডিত কেশরী সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন। সন্ন্যাসী পাগল নাকি? তখন সার্ব্বভৌম এক ধমকানি দিয়া তাঁহার ব্যাখ্যার দোষ দেখাইয়া দিতে শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন। তখন যুবক অতুল বাগ্বিন্যাস প্রকাশ করিয়া, অচিন্তিত-পূর্ব্ব গভীরার্থ-বচন-পরম্পরায় শান্ত সাগর মথিত করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে সার্ব্বভৌমের মস্তক ঘূর্ণিত হইল, বিস্মিত হইয়া তিনি মনে করিলেন—"এ শক্তি মানুষে সম্ভবে না। সার্ব্বভৌম বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, তাহা এই—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকী ভক্তি মিথ্যদ্ভুত গুণোহরি॥"

বাত্যাবিতাড়িত বিক্ষুব্ধ জলধি বক্ষে ভাসমান ব্যক্তি যেমন সাদরে সাময়িক অবলম্বনকে ধরে, সার্ব্বভৌম শ্লোকটি পাইয়া তেমনি সন্তুষ্ট হইলেন ও নিজ প্রণয়ে গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কল্পে অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে শ্লোকটির নয় প্রকার অর্থ করিলেন। অর্থ করিয়া একটু গর্ব্বসহকারে সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের অভিমত জানিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন "আপনি বৃহস্পতিতুল্য—ব্যাখ্যাও অপূর্ব্ব ও অন্যান্য সাধারণ, তবে শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে।" সার্ব্বভৌমের মুখ পুনঃ মলিন হইল, তৎপর শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায়মত শ্লোকাথ শুনিতে ব্যগ্র হইলেন। শ্রীচৈতন্য তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালীতে শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন।



"ষড়ভুজ মহাপ্রভু"

এইবার আর সার্ব্বভৌমের শ্রীচৈতন্যকে মনুষ্য বোধ রহিল না। তিনি আপনার বিদ্যাপরিমান জানেন, স্বীয় ছাত্র নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথের জ্ঞানাস্পর্দ্ধাও জ্ঞাত আছেন,[২৬] কিন্তু একি, আজ যে বিদ্যাবিভবের, অনন্ত জ্ঞান গরিমার সৌষ্ঠবসম্পন্ন চিত্র দেখিলেন, তাহা অসীম অপরিমেয়; তাহা কদাপি মানুষে সম্ভাবিত হইতে পারেনা। সার্ব্বভৌমের মনে একথা থাকিয়া থাকিয়া উত্থিত হইতে লাগিল, তখন তিনি দ্বীন-নেত্রে ভক্তিভরে সম্মুখবর্ত্তী শ্রীচৈতন্যের প্রতি চাহিতেই তাঁহার মাথা ঘুরিয়ে গেল দেখিলেন সম্মুখে এক বিদ্যুতপ্রভ ষড়্‌ভুজ মুর্ত্তি! ইহা কি সার্ব্বভৌমের চিত্ত বিভ্রম? তিনি দেখিলেন যে, সে মূর্ত্তির উর্দ্ধোত্থিত শ্যামাভ ভুজদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ ধৃত, মধ্যের নীলদ্যুতি করদ্বয়ে মধুর মুরলী রহিয়াছে; এবং নিম্নের পীতকান্তি হস্তদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু সুশোভিত। রাম, কৃষ্ণ, গৌর তিনে এক—অভেদ।

সার্ব্বভৌম যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন সেই গর্ব্বিত বৃদ্ধ, যুবকের চরণে, লক্ষণাৎ নিম্নের শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ পতিত হইলেন—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যং
প্রাবিষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ংলীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

নীলাচলের রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের মুখে এ সংবাদ শুনিলেন, আর তাঁহার বর্ণনানুরূপ একটি প্রতিমুর্ত্তি শ্রীমন্দিরের পাষাণগাত্রে খুঁদাইয়া রাখিলেন, তাহা হইতেই ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তির নানারূপ ছবি প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভু ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসেন, পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসেই তিনি দক্ষিণ দেশের তীর্থ সমূহ দর্শন করিতে গমন করেন, এ অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনের একান্ত স্থানাভাব। দক্ষিণের বহু তীর্থ দর্শন ও বহু সহস্র লোককে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দুই বৎসর পরে পুনঃ নীলাচলে আগমন করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের পরমভক্ত গদাধর পণ্ডিতের নাম একবার মাত্র বলিয়াছি। গদাধর পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে গিয়াছিলেন, তিনি তদবধি, আর কোথায়ও যান নাই; নীলাচলেই ছিলেন ও সময় সময় সুস্বরে তীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। একদিন স্বচ্ছতোয়া বিস্তৃতবক্ষা নরেন্দ্র-সরসী-তীরে ভক্তগণ সমবেত, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ আজ উপস্থিত, গদাধর সীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন; গৌর নিতাই এক আসনে দুই ভাই উপবিষ্ট হইয়া শুনিতেছেন, সম্মুখে সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতি। এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র একটি চিত্রকর সহ তথায় উপস্থিত হইলেন ও এক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া নেওয়াইলেন। ইহাই গৌরনিতাইর অবিকল চিত্র।[২৭] গদাধর যে শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি পাঠ করিতেন, তাহার অক্ষর

২৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ ২য় খঃ ৭ম অধ্যায়ে ইঁহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২৭. যে ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস দর্শনে পাগল হইয়া "শ্রীচৈতন্য" নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করতঃ চৈতন্য দাস নামে খ্যাত হন, তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস শ্রীচৈতন্য দর্শন জন্য নীলাচলে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার চৈতন্য দর্শন ঘটে নাই। তিনি পথে থাকিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধান ঘটে। শ্রীনিবাসের আশা পূর্ণ না হওয়ায় নীলাচলে পৌছিয়া তিনি ব্যাকুলিত চিত্তে ধরাবলুণ্ঠিত হইতে থাকেন, অনুচর মুখে শ্রীচৈতন্য-বিরহ-কাতর রাজা এই সংবাদ শুনিয়া, তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভুর প্রতিকৃতি দেখাইয়া প্রকৃতিস্থ করেন; চিত্রখানা শ্রীনিবাস আপন বুকে ধারণ করেন। ইঁহার ভক্তি ও ভাব দর্শনে রাজা আর উহা ফিরাইয়া লন নাই, এবং শ্রীনিবাস তাহা লইয়া দেশে আসেন। ইহা তাঁহার গৃহেই ছিল এবং তাঁহার বংশধরগণ অধিকারী হন। মহারাজ নন্দকুমার শ্রীনিবাস বংশের শিষ্য ছিলেন, তিনি গুরু রাধামোহন ঠাকুর হইতে উহা প্রাপ্ত হন। কুঞ্জঘাটার সেই তৈলচিত্র হইতেই এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের আসল প্রতিকৃতি প্রচারিত হইতেছে। আমাদের শ্রীনিতাইলীলা লহরী গ্রন্থে এই চিত্র সন্নিবেশিত আছে।

নেত্রজলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল[২৮] এইজন্য তিনি একখানা নূতন পুথি লিখিয়া লইয়াছিলেন, উহার পার্শ্বে ক্ষুদ্রাক্ষরে স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু কোন কোন শব্দের অর্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ নিজ শিষ্য বৃন্দাবন দাসের[২৯] জন্য উক্ত গ্রন্থ গদাধর হইতে গ্রহণ করেন, সে গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের পাট দেনুড়ে এখনও রহিয়াছে। তাহাতে শ্রীগৌর গদাধরের যুগল হস্তাক্ষর দেখার সুযোগ ঘটে।[৩০]

শেষ কথা

শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে রহিলেন, গৌড় দেশীয় ভক্তবর্গ প্রতিবৎসর রথোৎসবের সময় নীলাচলে গিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতেন ও ২/৩ মাস তথায় অতিবাহিত করিতেন। মধ্যে একবার মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন উপলক্ষে রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; সেবার আর তাঁহারা নীলাচলে যান নাই। রামকেলিতে রূপ ও সনাতন তাঁহার সহিত গিয়া দেখা করেন, ইহারা হুসেন শাহের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনাবধি ইহাদের সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া তৎসহ মিলিত হন। ইহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের মতানুযায়ী শাস্ত্র প্রণয়ন করেন ও বৃন্দাবনে বিলুপ্ত তীর্থস্থল উদ্ধার ক্রমে গোবিন্দাদি বিগ্রহ প্রকাশ করেন।

এবার শ্রীমহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমনে ব্যাঘাত ঘটিলেও, নীলাচল আসিয়া কিছুকাল মধ্যেই তিনি বনপথে তথায় গমন করেন, গমনকালে বন্যপশু সমুহ তাঁহার কাছে আসিত, এবং হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। শ্রীমহাপ্রভুর ভাব-সংক্রমিত হইয়া পশুপক্ষীরাও নৃত্য করিয়া উঠিত।

বৃন্দাবন হইতে আসিতে তিনি কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক এক প্রধান মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে স্বমতে আনয়ন করেন। ইনি তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যাগর্ব্বিত সন্ন্যাসী ছিলেন, সার্ব্বভৌমের ন্যায় তিনিও শেষে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত হন। ইঁহার প্রণীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব রত্ন, তদ্ব্যতীত "শ্রীবৃন্দাবনশতক" প্রভৃতি ইঁহার আরো গ্রন্থ আছে।

শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল বাসের শেষ দ্বাদশ বৎসর তিনি কৃষ্ণপ্রেমে এরূপ বিহ্বল থাকিতেন যে অতি অল্পকালই তিনি ভক্তবর্গের সহিত মিলিতে পারিতেন। ভাগবত পুরাণে গোপীদের যে ভাবের কথা লিখিত হইয়াছে, বঙ্গীয় প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস রাধিকার যেরূপ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। রাধা, যে কবিকল্পিত নহেন শ্রীচৈতন্যের ভাব দেখিয়া লোকে তাহা বুঝিতে পারেন। তখন আর তাঁহার ভাবের সহিত মিলিবার ইচ্ছা বা শক্তি থাকিল না। তবে যে মিলিতেন—সে অভ্যাস বশে। তখন স্বরূপ আর রামানন্দ—যিনি সংস্কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক রচনা করিয়াছেন—সর্ব্বদা তাঁহারা কাছে থাকিতেন, তাহাকে রক্ষা করিতেন। স্বরূপ তাহার ভাবের অনুরূপ গান গাইতেন, রামানন্দ কৃষ্ণকথা বলিয়া ধৈর্য্য ধরাইতেন। তিনি যে শ্রীচৈতন্য, ইঁহারা যে স্বরূপ ও রামরায়, তাঁহার ইত্যাকার জ্ঞান থাকিত না। ভাবিতেন—তিনি রাধা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে ললিতাও বিমাকা সখী রহিয়াছেন।

এই যে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরানুরাগ, ইহাতে প্রার্থনা নাই,—মুক্তির কথা নাই; ইহা ভক্তির চরম দশা ও চরম আদর্শ। ইহার উপরে শিখিবার কিছু না বলিবার কিছু নাই। এক শ্রীচৈতন্যই

২৮. অনুরাগবল্লী নামক প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে এই গ্রন্থ বৃন্দাবনে নীত হয়।

২৯. এই ৪র্থ ভাগে "শ্রীবাস পণ্ডিত" প্রসঙ্গে ইঁহার নামও লিখিত হইয়াছে।

৩০. হস্তাক্ষর চিত্রের চারিটি ছত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা বিজয়া পত্রিকায় আমরা সচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ইহার উদাহরণ—দ্বিতীয় পৃথিবীতে নাই।

এইরূপে প্রভুর যখন অবস্থা, তাঁহার সাড়া শব্দ না পাইয়া একরাত্রিতে ভক্তগণ কপাট খুলিয়া দেখেন যে তিনি গৃহে নাই। অমনি তাঁহারা মশাল জ্বালিয়া সন্ধানে বাহির হইলেন ও খুঁজিয়া সিংহদ্বারের পার্শ্বে চেতনাবিহীনাবস্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণের শুশ্রূষার বহুক্ষণে প্রভুর জ্ঞান সঞ্চার হইল।

শ্রীচৈতন্য আর একদিন চটকপর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন ভ্রমে বাহ্যবিরহিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন, কিছুদূরে গিয়া গতিস্তম্ভ হইল এবং লোমকূপ হইতে শোণিত প্রবাহ ছুটিল। ভক্তগণের শুশ্রূষায় পরে তিনি চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অবিরতই ঘটিতে লাগিল।

একরাত্রে প্রভু সমুদ্রদর্শনপূর্ব্বক যমুনাভ্রম হওয়াতে "হা কৃষ্ণ" বলিয়া তাহাতে ঝাঁপ দেন. খুঁজিতে খুঁজিতে ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে উন্মত্তপ্রায় এক জালিককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মৎস্যজীবী বলিল যে সে প্রভুর কথা বলিতে পারিবে না; সে একটা ভূত স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার মুখে গোঁ গোঁ ধ্বনি, হস্তপদ অসম্ভব দীর্ঘ। ভক্তগণ বুঝিলেন—ভাবের বিকারে শ্রীচৈতন্যের অস্থি সন্ধি আলগিয়া গিয়া হস্তপদ যেরূপ বিস্তারিত হইয়া থাকে, জালিক তাহাই বলিতেছে; ইনি তাঁহাদেরই প্রাণের আরাধ্য দেবতা। তখন তাঁহারা জালিককে প্রকৃতিস্থ ও ভয়বিহীন করিয়া সেই স্থানে লইয়া গেলেন ও প্রভুকে প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণ তাঁহার আর্দ্র বস্ত্র দূর করিয়া কর্ণে কৃষ্ণ ধ্বনি ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; তৎশ্রবণে তাঁহার চেতনা হইল ও তিনি ভক্তবর্গসহ বাসায় আসিলেন।

এই দিন হইতে ভক্তগণ তাঁহার শয়নের এক ব্যবস্থা করিলেন; তিনি যেন ভাবের আবেশে গৃহের বাহির হইতে না পারেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন; শঙ্কর প্রভুর পায়ের নীচে শয়ন করিতেন, ইহাতে "প্রভু পদোপাধান" বলিয়া শঙ্করের উপনাম হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার পর আর শ্রীমহাপ্রভু বাহিরে চলিয়া যাইতে পারেন নাই।

এইরূপ নির্জ্জনে শ্রীচৈতন্যদেব ৪৮ বৎসর বয়সে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একদিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেই যে গেলেন, আর তিনি ফিরিয়া আসিয়া ভক্তগণকে আনন্দ দান করিলেন না, আর তিনি "হা কৃষ্ণ!" বলিয়া ক্রন্দন কি প্রলাপ করিলেন না। জগতে নিমাইয়ের জন্ম দিন, সেই একদিন, আর এই একদিন—১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি।

তাহার পর আর কিছু বলিব না। প্রভু যান নাই, আজিও আছেন, যে তাঁহার বিচিত্র কাহিনী, ইহা ভাবিয়া এস ভাই, সকলে জীবন পবিত্র করি; ইহাতে এসব কথা প্রত্যক্ষবৎ নয়নসমক্ষে প্রতীয়মান হইবে; তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া যাইবে।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশে চতুর্থভাগ
সমাপ্ত

ইতি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ সম্পূর্ণ।
সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।
সর্ব্বমিদং শ্রী গৌরাঙ্গ সমর্পিতমস্তু।
৩০শে চৈত্র—১৩২০ বাংলা।

চতুর্থ ভাগ

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিশিষ্ট
জীবন বৃত্তান্ত

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে শ্রীহট্টবাসী যে যে গ্রন্থকারের এবং গ্রন্থকারবর্গের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, এস্থলে তাহাদের তালিকা সন্নিবেশিত হইল। তদতিরিক্ত কয়েকজন পরিজ্ঞাত শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের নামও লিখিত হইল। (নিম্ন ব্যবহৃত সং সংস্কৃত শব্দের সংক্ষেপ, বাং=বাংলা, পা=পারস্য ইত্যাদি।

গ্রন্থকারের নাম	তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের যে যে স্থানে উল্লেখ আছে।
অদ্বৈতাচার্য্য	যোগবাশিষ্ট ভাষ্য (সং)	
(লাউড়)	গীতাভাষ্য (সং)	৪র্থ ভাগ
আনন্দ রাম লালা (সদর)	দোহাবলী (বাং) ঝুলন সঙ্গীত (বাং)	
আনন্দ রাম চক্রবর্ত্তী(ছাতক)	পদ্মাপুরাণ (বাং)	
ইস্রাইল (তরফ)	মদালুল ফরায়েদ (পা)	২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম অঃ
ঈশান নাগর	অদ্বৈত প্রকাশ [বাং]	২। ৩। ১ অঃ ও ৪র্থ ভাঃ
[লাউড়]	[অদ্বৈত]	
কমলনারায়ণ বিশ্বাস	বৃষকেতু কাব্য [বাং]	
[বাণিয়াচঙ্গ]	সখী সংবাদ [বাং]	৩। ৪। ২য় অঃ
	মালসী সঙ্গীত [বাং]	
	পদ্মাপুরাণের লাচাড়ী (বাং)	৪র্থ ভাগ [নারায়ণ দেব]
কবিরাজ [জয়ন্তীয়া]	রাঘব পাণ্ডবীয় [সং]	২। ৪। ১ম অঃ
কালিকা প্রসাদ আদিত্য	কালী কীর্ত্তন [বাং]	৩। ২। ৩য় অঃ
[ছোট লিখা]		
কালী চরণ তর্কবাগীশ	দায়াদর্শ [সং]	
[ঢাকাদক্ষিণ]	ভক্তিবাদ [সং]	৩। ১। ৪র্থ অঃ
কাশীনাথ সেন	পদ্মাপুরাণ [বাং]	
[মহাসহস্র ইটা]	লঙ্কাকাণ্ড [বাং]	৩। ৩। ৮ম অঃ
কেশব লাল গোস্বামী	কৃষ্ণ সঙ্গীত [বাং]	৩। ৪। ৩য় অঃ
[জন্তবি]		
কৃষ্ণ গোবিন্দ ঘোষ	জিজ্ঞাসা তত্ত্ব [বাং]	
[বর্ম্মণ]	গোপাল ভোগ মালা [বাং]	৩। ৩। ৮ম অঃ
কৃষ্ণদাস [লাউড়]	বাল্যলীলা সূত্র [সং]	২। ৩। ১ম অঃ ও ৪র্থ ভাঃ
	বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী (বাং)	(অদ্বৈত)
কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য	নিয়ত মঙ্গল চণ্ডীর	
(মান্দারকান্দি)	পাঁচালী [বাং]	৪র্থ ভাঃ

গোবিন্দ গোসাঞি (মাছুলিয়া)	নির্ব্বাণ সঙ্গীত [বাং]	৩। ৪। ৬ষ্ঠ অঃ ও ৪র্থ ভাঃ
গোপাল চন্দ্র ন্যায়ভূষণ	স্মৃতি সংগ্রহ [সং]	৩।৫ । ১ম অঃ
(জয় কৈলাস)	সংসার যাত্রা [সং]	৩।৫ । ১ম অঃ
গোপীনাথ দত্ত	দ্রোণপর্ব্ব [বাং], নারীপর্ব্ব [বাং]	
[সাত গাও]	দত্তবংশাবলী [বাং]	৩।৩ । ৪র্থ অঃ
গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত	বর্ষ ভাস্কর [সং]	৩।৪ । ১ম অঃ
গোলোক চাঁদ ঘোষ [ইটা]	সঙ্গীত [বাং]	৩।৩ । ৭ম অঃ
গৌরীকান্ত	জাতক প্রকাশ (সং)	
	জ্ঞানদীপ [সং]	৩।৪ । ১ম অঃ
গৌরীশঙ্কর ভট্ট	সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকা [বাং]	
পাঁচগাও-[ইটা]	রসরাজ পত্রিকা [বাং]	
	নীতিকথা ১। ২। ৩য় ভাগ [বাং]	
	জ্ঞান প্রদীপ ১। ২য় ভাঃ [বাং]	১ম অঃ ৮ম অঃ ৪র্থ ভাগঃ
	ভূগোল [বাং] চণ্ডীটীকা [সং]	
চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্ন	পদাবলী [বাং]	২। ২। ৪র্থ অঃ, ৩। অঃ
জগজ্জীবন মিশ্র [ঢাকাদক্ষিণ]	মনঃসন্তোষণী [বাং]	৩।১ । ৩য় অঃ
জগদ্বন্ধু গুপ্ত [দুলালী]	রূপ চিন্তামণির পদ্যানুবাদ,	
	এবং পদাবলী [বাং]	৩। ১। ৫ম অঃ
জগৎ গোসাঞি [দিনারপুর]	বহু সঙ্গীত [বাং]	৩। ৪। ৩য় অঃ
জগন্নাথ বৈদ্য [শ্রীহট্ট]	শ্রীচৈতন্যের পাঁচালী [বাং]	৪র্থ ভাঃ
জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ [ইটা]	সামান্য লক্ষণা টীকা [সং]	
	কাত্যায়ণ কুলদীপিকা [সং]	৩। ৩। ৩য় অঃ
জয় গোপাল দাস	[আখালিয়া] বিদ্যোদয় [বাং]	৩। ১। ৬ষ্ঠ অঃ
তারানাথ ভট্টাচার্য্য	[সাচায়ানি] গোবিন্দ কীর্ত্তন [বাং]	৩। ৫। ১ম অঃ
ত্রিপুরানাথ তর্কোপাধ্যায়	রূপরহস্যম্ (সং)	
(ঢাকাদক্ষিণ)	মহিম্নস্তব ব্যাখ্যা (সং)	৩। ১। ৪র্থ অঃ
দেবীপ্রসাদ মোনশী (সদর)	Poly glot Grammer.	৩। ১। ৬ষ্ঠ অঃ
দৈখুরা মোনশী	সঙ্গীত (বাং)	৪র্থ ভাঃ
নসির উদ্দীন হায়দর (সদর)	তোয়ারিখি জলালি (বাং)	২। ২। ২ অঃ
নারায়ণ দেব (নগর)	পদ্মাপুরাণ (বাং)	৪র্থ ভাঃ
নূর আলী খাঁ (সৈয়দপুর)	মারিপতি গীত (বাং)	৪র্থ ভাঃ
পাগল শঙ্কর (বরাকপার)	সঙ্গীত (বাং)	৪র্থ ভাঃ (বাণীচরিত দেখ)
পীর বাদশাহ (তরফ)	গঞ্জে তরাজ (পা)	২। ২। ৫ম অঃ
প্যারী চরণ দাস (লাতু)	শ্রীহট্ট প্রকাশ পত্রিকা (বাং)	
	পদ্য পুস্তক ১ম, ৩য় ভাঃ (বাং)	৩। ২। ৮ম অঃ
	ভারতেশ্বরী (বাং),	

	মিত্র বিলাপ (বাং)	
	রণরঙ্গিণী (বাং), বর্ণশিক্ষা (বাং) ৪র্থ ভাঃ	
প্রজাপতি দাস	চণ্ডীটীকা (সং)	২। ২। ৮ম অঃ
(পাঁচ গাও ইটা)	৩। ৩। ৮ম অঃ	
প্রদ্যুম্ন মিশ্র (ঢাকাদক্ষিণ)	শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যো দয়াবলী (সং)	৩। ১। ৩য় অঃ
	শূদ্রাহ্নিকাচার (সং)	৪র্থ ভাঃ
বঞ্চিত ঘোষ (মহলাল ইটা)	ভঙ্গি সঙ্গীত (বাং)	৩। ৩। ৭ম অঃ, ৪র্থ ভাঃ
বলরাম দাস (দ্বিজ)	পদাবলী (বাং)	৪র্থ ভাঃ (সত্যভানু দেখ)
বলভদ্র ভট্ট (পঞ্চখণ্ড)	শ্যামল বর্ম্মা চরিতম্ (সং)	৩। ২। ১ম অঃ
বাণীনাথ বিদ্যাসাগর (ঢাকাদক্ষিণ)	কাতন্ত্রে বিদ্যাসাগরী টীকা (সং)	৩। ১। ৪র্থ অঃ
বিদ্যাবিনোদ হৃষীকেশ (গয়ঘর)	মন্ত্রকোষ ও তন্ত্র চূড়ামণি (সং)	৩। ১। ৪র্থ অঃ
বিনোদ রাম দাস (পাঁচগাও)	পদ্মপুরাণ (বাং)	৩। ৩। ৮ম অঃ
বিপিন বেহারী দাস এম, এ, বি এল্ র (মরজাত কান্দি)	র উপক্রমনিকা (বাং)	৪র্থ ভাঃ
বিরজা নাথ ন্যায় বাগীশ (গুটাটিকার)	সর্ব্বানন্দ প্রকাশ (সং)	ঐ
	মোহচপটানুবাদ (বাং)	ঐ
বিশ্বম্ভর চন্দ্র দাস (লাতু)	দলিলাবলী (বাং) পত্রমালা (বাং)	৩। ২। ৩য় অঃ
বীরেশ্বর দণ্ডী (জলসুখী)	আখ্যাতের বীরেশ্বরী টীকা (সং)	৩। ৪। ১ম অঃ
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (ইটা)	কৃত্য চিন্তামণেঃ টীকা (সং)	
	গায়ত্রী বর্ণোচ্চারণ বিধি "	
	শুদ্ধি চিন্তামণেঃ টীকা "	৩। ২। ৪র্থ অঃ
	কালীকার্চ্চণ সময় নির্ণয় "	
	কাত্যায়নী বিসর্জ্জনান্ত চণ্ডিকা"	
	পিকাষ্টক "	
ব্রজমোহন দত্ত (ঢাকাদক্ষিণ)	গৌরাঙ্গগীতি (বাং)	৬। ১ ৬ষ্ঠ অঃ
ব্রহ্মানন্দপুরী (বাণিয়াচঙ্গ)	মোহচপটম (সং)	৪র্থ ভাঃ
ভবদেব পঞ্চানন (ঢাকাদক্ষিণ)	ন্যায় দর্শনের টীকা (সং)	৩। ১। ৪র্থ অঃ
	আখ্যাতি বাদ (সং)	৩। ১। ৪র্থ অঃ
ভবানী প্রসাদ দত্ত (লাখাই)	দত্তবংশ লিপি (বাং)	৩। ৪। ৫ম অঃ
মকরন্দ ভট্ট (বাণিয়াচঙ্গ)	দোহা ও কবিতা (বাং)	২। ৩। ৩য় অঃ
মজঃফর খাঁ (ইটা)	কবিতা (বাং)	২। ২। ৭-৮ টীকাধ্যায়
মজিদ বখত মজুমদার (শ্রীহট্ট)	Majumadar Family	৩। ১। ৬ষ্ঠ অঃ
মথুরানাথ তর্কবাগীশ (লাউতা)	আখ্যাতের টীকা (সং)	৩। ২। ২য় অঃ
মনোহর সেন (দুলালী)	কৃষ্ণবিজয় (বাং), কৃষ্ণসঙ্গীত (বাং)	৩। ১। ৬ষ্ঠ অঃ

	হাস্যনাথের পাঁচালী	
মহাদেব পঞ্চানন (বাণিয়াচঙ্গ)	সাঙ্খ্য ভাষ্যম্ (সং)	৩। ৪। ২য় অঃ, ৪র্থ ভাঃ
মহেন্দ্রনাথ দে (জগৎশা)	মৈত্রী প্রভৃতি (বাং)	৪র্থ ভাগ
মহেশ্বর ঘোষ (মহলাল)	বঞ্চিত চরিত্রম্ (সং)	৩। ৩। ৭ম অঃ
মহেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন	অষ্টাবিংশতি প্রদীপ	২। ২। ৪র্থ অঃ
(পঞ্চখণ্ড)	(১৮ খানা গ্রন্থ)	৩। ২। ১ম অঃ, ২। ২। ৭ম
টীকা		
মালী ধৰ্ম্মদাস	পদ্মাপুরাণ (বাং)	
	হুসেনপৰ্ব্ব (বাং)	৪র্থ ভাঃ (বঞ্চিত চরিত)
মুকুন্দ বিশারদ (দেবীপুর)	জাত দীপ (সং)	৩। ২। ৪র্থ অঃ
মুরারি গুপ্ত (দুলালী)	চৈতন্য চরিত কাব্য (সং)	
	পদাবলী (বাং)	২। ২। ৪র্থ অঃ, ৪র্থ ভাগঃ
মোহন চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	শুদ্ধি কারিকালি (সং)	৩। ৪। ১ম অঃ
মৌলবী মোহাম্মদ আসরফ (বাণিয়াচঙ্গ)	জরুরউল-মকন্নাফ্ (পা)	২। ২। ৪র্থ অঃ
যদুনাথ কবিচন্দ্র (ঢাকাদক্ষিণ)	পদাবলী (বাং)	২। ২। ৪র্থ অঃ, ৩। ১। ৩য় অঃ
রঘুনন্দন (মান্দারকান্দি?)	অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (সং)	৪র্থ ভাগঃ
রঘুদেব ভট্টাচাৰ্য্য (ইটা)	গদাবেগ (সং)	৩। ৩। ৩য় অঃ
রঘুনাথ কবি (শ্রীহট্ট)	বাবাম্বর পাঁচালী (বাং)	২। ১। ৪র্থ অঃ, ৩। ১। ৩য় অঃ
রঘুনাথ শিরোমণি (পঞ্চখণ্ড)	চিন্তামণি দীধিত (সং)	
(পরে নবদ্বীপ)	প্রামান্যবাদ	”
	নানার্থবাদ	”
	ক্ষণভঙ্গুরবাদ	”
	আখ্যাতবাদ	”
	পদার্থ খণ্ডন	”
	লালাবতী টীকা	”
	গুণকিরণাবলী টীকা	”
রত্নগোবিন্দ চৌধুরী [মৈনা]	পদাবলী (বাং), সঙ্গীত (বাং),	
	স্তোত্রাবলী [সং]	৩। ২। ৪র্থ অঃ
রতিকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ [রেঙ্গা]	সিদ্ধান্তরত্ন [সং]	[কলাপটীকা] ৩। ১। ৪র্থ অঃ
রাজাগোবিন্দ সাৰ্ব্বভৌম [ইটা]	ব্রহ্মপদার্থ নিরূপণ, [সং]	৩। ৩। ৩য় অঃ
	বেদবাদ নিবারিকা [সং]	ঐ
	ভট্টি টীকা (সং)	ঐ
	[প্রভৃতি ২০ খানা গ্রন্থ]	ঐ
	[সং বাং মিশ্রিত ৩ খানা গ্রন্থ]	ঐ
রাজীব লোচন দাস [মৈনা]	পদ্যপ্রসূন [বাং] দৃষ্টান্তশ তাকানুবাদ	
	বিবিধ প্রবন্ধ ও কবিতা	৩। ২। ৪র্থ অঃ
	[বিষ্ণুপ্রিয়া এবং আনন্দবাজার পত্রিকায়]	

রাজেন্দ্র সিংহ [জয়ন্তীয়ারাজ]	ঝুলন সঙ্গীত	২। ৪। ৪র্থ অঃ
রাধানাথ চৌধুরী [আগিয়ারাম]	পরিদর্শক পত্রিকা [বাং]	৩। ২। ৪র্থ অঃ
রাধানাথ চৌধুরী [টিকর]	পদ্মাপুরাণ [বাং]	৩। ২। ৪র্থ অঃ
	রামচন্দ্রের অশ্বমেধ "	
	মহি রাবণের পালা "	
	বিবিধ সঙ্গীত	
রাধামাধব দত্ত [কেশবপুর]	ভারত সাবিত্রী [সং]	২। ৩। ২য় অঃ
	ভ্রমরগীতা "	৩। ৫। ২য় অঃ
	গীতগোবিন্দ টীকা "	
	সূর্য্য ব্রত পাঁচালী "	
	কৃষ্ণলীলা গীতাবলী "	
রামকুমার নন্দী [বেজুড়া]	বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য [বাং]	
	উষোদ্বাহ কাব্য	
	গীতাবলী ১। ২। ৩ ভাঃ	২। ৩। ২য় অঃ
	যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি	৪র্থ ভাঃ।
	২১ খানা গ্রন্থ।	
রামকৃষ্ণ গোসাঞি [বিথঙ্গল]	নির্ব্বাণ সঙ্গীত [বাং]	৩। ৪। ৬ষ্ঠ অঃ ৪র্থ ভাঃ
রামদেব বিদ্যানিবাস [জয়পুর]	শ্রাদ্ধদীপিকা [সং]	৩। ৪। ১ম অঃ।
রামগোপাল ন্যায় পঞ্চানন (লক্ষ্মীপুর)	কাল নির্ণয় (সং)	৩। ১। ৫ম অঃ।
	অশৌচ নির্ণয় (সং)	ঐ
	প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় "	ঐ
	প্রেতাধিকারী নির্ণয় (সং)	ঐ
	সম্বন্ধ নির্ণয় "	ঐ
রামভদ্র তর্কালঙ্কার (বুরুঙ্গা)	শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী (বাং)	৩। ১। ২য় অঃ।
রাম রাম ভট্টাচার্য্য (বোয়ালজোর)	তন্ত্ররত্নমালা [সং]	৩। ১। ৫ম অঃ।
রাম রমণ ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গা)	জ্যোতিষ সারসংগ্রহ (সং)	৩। ১। ৪র্থ অঃ।
রামশরণ বিদ্যালঙ্কার (জলসুখা)	শব্দরত্ন (সং)	৩। ৪। ৩য় অঃ।
রামেশ্বর নদী (নন্দীবংশের পূর্ব্বপুরুষ)		
পদ্মাপুরাণ, ক্রিয়াযোগ		৩। ৪। ৬ষ্ঠ অঃ।
	সার (বাং)। ভাত	
রামানন্দমিশ্র (পঞ্চখণ্ড)	রসতত্ত্ববিলাস (বাং)	৩। ২। ১ম অঃ।
রাসবেহারী দত্ত (সদর)	বহুপদাবলী [বাং]	৩। ২। ২য় অঃ।
	সঙ্গীতের পালা [বাং]	৩। ২। ২য় অঃ
রেয়াজুদ্দিন [তরফ]	স্বপ্ন ফল বিষয়ক গ্রন্থ [পা]	২। ২। ৫ম অঃ
লবনীদাস [বৈষ্ণব] [জগন্মোহন]	জগন্মোহন ভাগবত [বাং]	৪র্থ ভাঃ
শঙ্কর ঘোষ [বাসু ঘোষ বংশীয়]	পদাবলী [বাং]	৩। ৩। ৬ষ্ঠ অঃ
শম্ভুনাথ দেশমুখ্য [কাছাড়]	নক্সা ও নোট [শ্রীহট্ট হইতে	

	কাশী পর্য্যন্ত,] আত্ম বারমাসী,	৩। ২। ২য় অঃ
শ্যাম কিশোর ঘোষ [বম্মার্ণ]	সহজউজ্জ্বলচিন্তামণি [বাং]	৩। ৩। ৮ম অঃ
	প্রেমরত্নমালা, জয়দেবচরিত্র, [বাং]	ঐ
	হরিভক্তিতরঙ্গিণী "	ঐ
	উপদেশনিধি বিধিমালা "	ঐ
শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য (ইটা)	বৈদিক সংবাদিনী (সং)	২। ৩। ৪র্থ অঃ ১ টীকা
	৩। ১। ৫ম অঃ	
শিশু অজ্ঞান (ইটা)	সঙ্গীত [বাং]	৩। ৩। ৭ম অঃ।
শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর (শ্রীহট্ট)	রাজমালা [বাং]	২। ১। ৪র্থ অঃ
	ঐ টীকা অধ্যায়	
শ্রীচন্দ্রদাস (লাতু)	তত্ত্ব পরিচয় [বাং]	৩। ২। ৪র্থ অঃ
ষষ্টিবর দত্ত (ইটা)	পদ্মা পুরাণ [বাং]	২। ২। ৪র্থ অঃ, ৩। ৩। ৩য় অঃ
সত্যরাম (পঞ্চখণ্ড)	ঘাটুসঙ্গীত [বাং]	৩। ২। ৪র্থ অঃ
সাদেক আলী (লংলা)	নূর নসিয়ত [বাং]	৪র্থ ভাঃ
	রদ্দেকফুর [বাং]	ঐ
সারদা মোহন দাস (দিঘলী)	কপটনা বিষয়ক প্রবন্ধ [বাং]	৩। ১। ৬ষ্ঠ অঃ
হরগোবিন্দ আদিত্য (ছোটলেখা)	মালসী গান [বাং]	৩। ২। ৩য় অঃ
হরিকান্ত ন্যায় বাগীশ (ইটা)	সিদ্ধান্তরত্ন [সং কলাপটীকা]	৩। ৬। ৪র্থ অঃ
হরিহর ভট্টাচার্য্য (দক্ষিণ শ্রীহট্ট)	জ্যোতিঃ প্রদীপ [সং]	২। ২। ৫ম অঃ
হামিদবখত মজুমদার [সদর]	আইন-ই- হিন্দ [উর্দ্দু]	৩। ১। ৬ষ্ঠ অঃ
হৃদয়ানন্দ দত্ত (ইটা)	পদ্মাপুরাণ (বাং)	৩। ৩। ৬ষ্ঠ অঃ

গ্রন্থকারের নাম	তাহাদের কৃত গ্রন্থ
অনন্তরাম	রামায়ণ (বাং)
অনন্তরাম দত্ত (রঘুনাথ দত্ত সুত)	াাগসার।
অনন্তদাস	(বাং)
কবিরদাস বৈষ্ণব (বিথঙ্গল)	রামকৃষ্ণচরিত (বাং)
কালারায়	পদ্মা পুরাণ (বাং)
কালীকুমার ভট্টাচার্য্য	দশমহাবিদ্যা পটল সংগ্রহ (সং-তন্ত্র)
কালীচরণ সিদ্ধান্ত	দোলযাত্রা বিবেক (সং)
কাশীনাথ দ্বিজ	ষট্চক্র টীকা"
	পদ্মাপুরাণ (বাং)
কিশোর রায় ("একলা মোনসী")	গোবিন্দ ভোগের গান (বাং)
	পাঁচালী "
কুঞ্জকিশোর পাল (কৃষ্ণদাস) [বয়ারা]	বৃন্দাবন বর্ণন গ্রন্থ [বাং]
কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	জ্যোতিষ সূত্র [সং]
কৃষ্ণধন তর্কবাগীশ	মুক্তিপরিভাষা [সং-বৈদান্তিক গ্রন্থ]
কৃষ্ণদাস	দণ্ডাত্মিকা লীলাবর্ণন (বাং)

গঙ্গারাম	গোপাল চরিত্র (বাং)
গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (ইটা)	দীপিকাপ্রভা (শুদ্ধি দীপিকার টীকা-সং)
গোপীকান্ত দ্বিজ ("ধলাইর জলপায়ী")	পদ্মাপুরাণ (বাং)
গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য	কারক রহস্য (সং)
জগন্নাথ বৈদ্য	পদ্মাপুরাণ [বাং]
জয়কৃষ্ণ দত্ত	হাস্যনাথের পাঁচালী (বাং)
জগন্নাথ দাস	কলঙ্কোদ্ধার গ্রন্থ [বাং]
ত্রিলোচন দ্বিজ	পদ্মাপুরাণ (বাং)
দ্বীন ভবানন্দ	পদ্মার্পুরাণ (বাং)
	হরিবংশ "
	সঙ্গীত "
	লক্ষণ দিগ্বিজয় [বাং]
ধর্ম্মদাস বৈষ্ণব (পাথারিয়া)	বহুসঙ্গীত "
	পদরত্নমালা (৫১৫ পদ বাং)
	অষ্টকাল স্মরণ পদ্ধতি [৩৩ শ্ব পদ বাং]
ধ্রুবরাজ	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রন্থ [বাং]
নরসিংহ সরকার নট (রাঢ়িশাল)	কৃষ্ণলীলা গীতি [বাং]
নরোত্তম বাউল (খাগাউরা)	ঐ
পরশুরাম	সুদাম চরিত [বাং]
পুরন্দর	চৈতন্যচরিত "
বর্দ্ধমান দত্ত (ইটা)	পদ্মাপুরাণ "
বিপ্র জানকীনাথ	ঐ "
বিপ্রনাথ সেন	সত্যনারায়ণের পাঁচালী [বাং]
	হাস্যনাথের পাঁচালী "
বিশ্বাস মহাশয় (রায়নগর)	মালসী গান "
ব্রজকিশোর গুপ্ত (মুন্সেফ লংলা)	গোবিন্দভোগের গান "
ভবানীদাস (জয়চন্দ্র [জয়সিং , লাউড়)	লক্ষণ দিগ্বিজয় "
	শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয় "
	রামের স্বর্গারোহণ "
	ব্রহ্মপুরাণ "
ভবানী প্রসাদ কর মোনশী (শুকচর-তরফ)	কৃষ্ণলীলাত্মক হরি গান
	" ঝুলন সঙ্গীত "
	" ঘাটু গান "
ভবাণী রায় দ্বিজ	লক্ষণ দিগ্বিজয় "
ভানুদাস শুক্লবৈদ্য	পদ্মাপুরাণ "
মদনচাঁদ, মদনানন্দ (একব্যক্তি না কি?)	কলঙ্ক ভঞ্জন "
মাধব বৈরাগী (কাশীপুর—তরফ)	কলঙ্কভজন "

মুরারি মিশ্র	কৃষ্ণলীলা ”
পদ্মাপুরাণ	(বাং)
যুগল কিশোর বণিক্ (লস্করপুর-তরফ) কৃষ্ণ বিজয় ”	
রঘুনাথ দত্ত	বাবাহরের পাঁচালী ”
রামদাস	কৃষ্ণচরিত (বাং, ২৫০ বর্ষের প্রাচীন)
রামদাস	স্বর্গারোহণ (বাং)
	জ্যোতিষবল্লভ (সং)
রামশরণ দে (লংলা)	চৈতন্য বিলাস (বাং)
রাধাচরণ মোনশী (বালিয়ারি, তরফ)-	গৌর ও কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী (বাং)
রাধারাম রায়	সনৎকুমার গ্রন্থ (বাং)
শিবানন্দ (সানন্দরাম সুত)	গোবিন্দ বিজয় (বাং)
শিবানন্দ দত্ত (এক ব্যক্তি না কি?)	গোবিন্দ বিজয় (বাং)
সীতানাথ কর (ষাটিয়াজুরী)	তামাকুপুরাণ (বাং ১২১২ বাং হস্তলিপি)
সোণারাম দেব	যমগীতা (বাং) ১২০৮ হস্তলিপি
হরগোবিন্দ দাস (উচাইল)	ঘাটু সঙ্গীত (বাং)
	ঝুলন গান; হরিসঙ্গীত (বাং)
হরিহর দত্ত	পদ্মাপুরাণ (বাং)

এই অপূর্ণ তালিকায় ২২ জন কবিই পদ্মাপুরাণ রচয়িতা। আত সম্প্রতি আমরা কয়েকখানা পুঁথি পাইয়াছি, তাহাতে প্রায় ৫ খানা চৈতন্যচরিত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ঐ সকলও শ্রীহট্টবাসী প্রণীত। অনুসন্ধানে আরও বহু গ্রন্থ বাহির হইবে সংশয় নাই, এবং তাহাতে ইহার সংখ্যা নিঃসন্দেহে দ্বিগুণিত হইতে পারিবে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের খবর তো জানাই যায় না। জীবিত গ্রন্থকারদের উল্লেখ এখানে হয় নাই। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করুন।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

জীবন বৃত্তান্ত

শ্রীহট্টের মহাফেজখানা হইতে যে সকল সনন্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হয়, তাহার কয়েকটি মাত্র ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও বংশ বৃত্তান্ত খণ্ডে ব্যবহৃত হইয়াছে; অধিকাংশ সনন্দপ্রাপকের পরিচয় অপরিজ্ঞাত থাকায় উহার যথাযোগ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে নাই। কোন কোন সনন্দপ্রাপকের বংশবিলোপ ঘটা অসম্ভব নহে এবং তাহাতে বর্ত্তমানে তাঁহাদের পরিচয়প্রাপ্তির সম্যক অসুবিধা ঘটিয়া থাকিবেক। সনন্দের উল্লিখিত ভূমিও রূপান্তরিক ও হস্তান্তরিত হইয়া অনেকস্থলেই পরিচয়ের পন্থা কুটিল করিয়া তুলিয়াছে। এবং তাহাতে যে যে সনন্দ প্রাপকের বংশধরবর্গ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও হঠাৎ পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির পরিচয় করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা, এমন হওয়া বিচিত্র নহে; এই জন্য সংগৃহীত অবশিষ্ট সনন্দগুলি একবারে পরিত্যাগ না করিয়া তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল; তদ্দৃষ্টে সনন্দ প্রাপকবর্গের বংশধরবর্গ আপন আপন পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তির নিদর্শন পাইয়া সুখী ও গৌরবান্বিত হইবেন। মোসলমান আমলে দেশীয় সুধী ও সাধু সমাজ সতত রাজা হইতে প্রভূত সহায়তা প্রাপ্ত হইতেন, এই সকল সনন্দ তাহার উদাহরণ। শ্রীহট্টের আমিল (ফৌজদার) বর্গ প্রায় প্রার্থিবর্গকে বঞ্চিত করিতেন না। ইংরেজ আমলের ঊষাকালে পূর্ব্ব রীতিই অনুসৃত হইয়াছিল, ইহারও উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

উত্তর শ্রীহট্ট।

প্রাপক	উত্তরাধিকারী	দাতা	দানপ্রাপ্ত ভূমি
(সদর।)			
আবদুল্লা খাঁ	ভ্রাতা হামি খাঁ	নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ	পং কৌড়িয়া ১৩।.২৮ব্রহ্মত্র
আরিফ মাং (খিত্তা)	ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াসিন	নবাব আলাওর খাঁ	পং খিত্তা ৬।১৮৩। চেরাগী
আলম তরিব	—	শাহজাহা সুলতান সুজা	পং খিত্তা ৫০/০ চেরাগী (১০৬৭ হিঃ)
গণেশ শিরোমণি	পুত্র নরসিংহ তর্কালঙ্কার	নবাব মাং আলী খা	পং ফুরকাবাদ ৬/৬৷৩৮ হিঃ
গোলাম নবী (খিত্তা)	—	দেওয়ান কাজিমবেগ	পং খিত্তা ২৸০।১৬ চেরাগী
গোলাম হজবত	পুত্র শাহা আশা উল্লা	মোঃ আজি খাঁ	পং কৌড়িয়া ১৩৭/০ মদতমাস
কমলাকান্ত তর্কালঙ্কার (")	পুত্র উমাকান্ত শর্ম্মা,	কৃষ্ণজীবন দত্ত	পং কৌড়িয়া ১৭। ০২। ব্রহ্মত্র

চৈতন্যচাঁদ পূজারী (সদর) মিঃ সিগুসে সাহেব পং বালাউট
গং হইতে ৯৯৷২৸৫ মহাপ্রভুর দেবত্র

জগন্মোহন গোসাঞি ভ্রাতুষ্পুত্র কালীচরণ নবাব শুকুরুল্লা খাঁ
দুলু বিবি (খিত্তা) কন্যা আমিতু বিবি " মোং আলী খাঁ পং খিত্তা ৭৸০৲১ ⅄মদতমাস
মোং আবদুল্লা ভ্রাতা মোং হামি নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ
মোং মসউদ ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল সিব্বর খাঁ " " পং জলালপুর
গং ২৭।০।৪।০ মদতমাস

মোং হুসেন — "কোং এঙ্গরেজ" পং উত্তরকাছ
৫৪৷২৷৩৸ মদতমাস

মোং হায়াত খাঁ — নবাব বসারত খাঁ পং কুসিয়ারকুল
১৫৴৹ মদতমাস

মোং সবদর পুত্র আসির খাঁ নবার এক্রাম উল্লা পং কৌড়িয়া
১৪৴১৷৪৷০ মদতমাস

সৈদ সাদক (পীরমহল্লা) — নবাব শমশের খাঁ পং কৌড়িয়া
গঃ ১১৴।৬৸৹মদতমাস

সৈদ নজাত খাঁ পুত্র আসান উল্লা নবাব ফরহাদ খাঁ পং আতুয়াজান
২৭৴।২৭৸৹মদতমাস

সৈদ হায়াত খাঁ (দরগা মহল্লা), পুত্র মোং জরিফ, নবাব শমমের খাঁ, পং বারহাল
১৪৸২৲৫ মদতমাস

সৈয়দ কিয়ামুদ্দীন পুত্র মীর রিজুমল্লা মজম খান খানান
মজঃফরজঙ্গ তরফান। পং বাজুসনভাগ
৮৩৸২৫ মদতমাস

রামভদ্র ভট্টাচার্য্য (দুলালী।) — নবাব বিকু খাঁ উত্তরকাছ গং ৪৫৴৲

কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী পুত্র বিষ্ণুরাম শর্ম্মা নবাব হরকিষুণ দাস পং দুলালী
৸০৲৬ ব্রহ্মত্র

ভরত বৈষ্ণব ,, ভবানন্দ বৈষ্ণব আহমদ মজিদ পং ঢাকাদক্ষিণ
৪৷২৷৪ দেবত্র

রমাকান্ত সিদ্ধান্ত পুত্র রামকান্ত তর্কালঙ্কার নবাব নজীব আলি খাঁ পং পঞ্চখণ্ড ১৸০৪
হরিরাম ভট্টাচার্য্য (ঢাকাদক্ষিণ।) ,, রামকেশব ভট্ট নবাব জান মোহাম্মদ খাঁ —

কাশীরাম জনাবদার ,, চান্দরাম শর্ম্মা নবাব হর কিষুণ দাস পং ঢাকাদক্ষিণ
৸১৷২৷ ব্রহ্মত্র

গঙ্গারাম ও রামকান্ত ভ্রাতা হরবল্লভ নবাব আবদুরহেম খাঁ পং ঢাকাদক্ষিণ
৩৸২৸১৷ মদতমাস

জয়গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পুত্র হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নবাব হাজি হুসেন খাঁ পং ইটা
গং ১৴।৪।০ ব্রহ্মত্র

জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ,, শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নবাব নজীব আলী খাঁ পং শমশের-
নগর ।২৷৷১৮ ব্রহ্মত্র
দুর্ল্লভ রাম জনাবদার ,, আনন্দরাম শর্ম্মা নবাব হায়দর আলী খাঁ মৌং
দত্তরালি ১০।৫। ব্রহ্মত্র
দেবীচরণ জনাবদার ,, চাঁন্দরাম শর্ম্মা নবাব হায়দর আলী খাঁ মৌং দত্তরালি
বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তী ,, জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য ,, আবুহুসেন খাঁ পং ঢাকাদক্ষিণ
৫৴২৷৷১৷৷ ব্রহ্মত্র
রাঘবরাম চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ ওরফে রামচন্দ্র শর্ম্মা হরকিষুণ দাস পং ঢাকাদক্ষিণ
।১৷৷৪৸০ ব্রহ্মত্র
রাজারাম ভট্টাচার্য্য পুত্র রামবল্লভ ভট্টাচার্য্য নবাব হাজি হুসেন খাঁ পং ঢাকাদক্ষিণ
৫৴০০৷৷ ব্রহ্মত্র
রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য পিতা রতিরাম বিশারদ মীর নজম উদ্দান খাঁ
পং ঢাকাদক্ষিণ গং ৩২৴১১৮,,
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুত্র রামবল্লভ ভট্টাচার্য্য নবাব হাজি হুসেন খাঁ —
(দক্ষিণকাছ।)
করম উল্লা খাদিম পুত্র আয়েন উল্লা নবাব তানিব ইয়ার খাঁ পং
ঢাকাদক্ষিণ ১১।২৸৬। মদতমাস
কৃষ্ণরাম ও বাঞ্ছারাম ভ্রাতা হরিপদ নবাব হরকিষুণ দাস পং
ঢাকাদক্ষিণ ১৷৷১৷৷২ ব্রহ্মত্র
ভবানী সিদ্ধান্ত পুত্র শম্ভুনাথ শর্ম্মা নবাব হাজি হুসেন খাঁ
শেখ লুৎফুল্লা (খাদিম দক্ষিণকাছ দরগা) ,, আলী কুলিবেগ
পং ঢাকাদক্ষিণ ২২৷৷০৷৷৬। মদতমাস
শেখ ইনাম উল্লা নবাব সৈদউল্লা খাঁ নবাব নজীব আলী খাঁ
(কৌড়িয়া।)
জগন্নাথ দাস বৈষ্ণব — ইষ্টইণ্ডিয়া কোং পং ঢাকাদক্ষিণ
২৴২৻৬ দেবত্র
রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য পুত্র রঘুনন্দন শর্ম্মা নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ পং
ঢাকাদক্ষিণ ১০৴১৻৫ ব্রহ্মত্র
রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, পুত্র দর্পনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নবাব নজীব আলী খাঁ পং
ঢাকাদক্ষিণ ২৸২৸১ ব্রহ্মত্র
রামরাম পূজারী — নবাব নজীআলী খাঁ পং ঢাকাদক্ষিণ ১০৸৻৪ দেবত্র
লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য — নবাব আবুহুসেন পং ঢাকাদক্ষিণ
গং ৬।৩৷৷৩। ব্রহ্মত্র
শেখ গুয়া নসির মোং নবাব শমরেশ খাঁ শমশেরনগর
৫৷৷৭১৸২। মদতমাস
হিমত মোং পুত্র রহিম মোং নবাব মীর মোং হাদী পং উত্তরকাছ
গং ১৪৯২৷৷০ চেরাগী

(রেঙ্গা)

কবিবল্লভ চক্রবর্ত্তী	পুত্র রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী	নবাব হরকিষণ দাস	পং রেঙ্গা ॥২৫৬ ব্রহ্মত্র
শিবরাম চক্রবর্ত্তী	পুত্র জিত রাম চক্রবর্ত্তী	নবাব এক্রাম উল্লাহ খাঁ	পং রেঙ্গা ০৮৬৮ ব্রহ্মত্র

(বরায়া।)

গোবিন্দদাস বৈরাগী	—	নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ পং বরায়া	২৴।২৮৩।০ বিষ্ণুউত্তর

(বনভাগ।)

নরোত্তম পণ্ডিত	—	নবাব হরকিষুণ দাস	পং বনভাগ ২/০৮।ব্রহ্মত্র
রামগোবিন্দ বিশারদ	পুত্র রুদ্রচন্দ্র শর্ম্মা	নবাব মোং আলী খাঁ	পং বনভাগ ৪।২৩॥ ব্রহ্মত্র
রামবল্লভ জনাবদার	ভ্রাতা কৃষ্ণাম শর্ম্মা	নবাব বিকু খাঁ	পং বনভাগ ২৮২। ব্রহ্মত্র
রূপরাম ভট্টাচার্য্য	পুত্র রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	নায়েব আচল সিং	পং চৌয়াল্লিশ ২।১৮২ ব্রহ্মত্র
সোণারাম শর্ম্মা	পুত্র কৃষ্ণরাম শর্ম্মা	নবাব নজীব আলী খাঁ	পং বাজুবনভাগ ৬/০ ব্রহ্মত্র

(গহরপুর।)

শেখ বদরুদ্দীন	পুত্র মোং হাদী	নবাব নোয়াজিস মোং খাঁ পং পাথারিয়া	১৩৪৴০ মদতমাস
শেখ গিয়াসুদ্দীন		নবাব এক্রামউল্লা খাঁ	মৌঃ বেতরিকুল ২৩।৫॥২ মদতমাস
শেষ মোং তানিব	পুত্র কলিম উল্লাহ	নবাব শমশের খাঁ	পং গহরপুর ৫/০ মদতমাস
শেখ রাজিউদ্দীন	খোন্দকার মোং হাদী	নবাব নোয়াজিস মোং	পং পাথারিয়া ১৩৪॥১॥৪ মদতমাস
শেখ হেলিম উল্লা	—	নবাব নজীব আলী খাঁ	পং পাথারিয়া ১৭/০ মদতমাস

(কুরুয়া।)

বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তী	পুত্র হরিনারায়ণ	নবাব হরকিষুণ দাস	পং কুরুয়া ১৮০ ব্রহ্মত্র
বৈদ্যনাথ পঙ্গ		জগন্নাথ গুপ্ত (চৌয়ালিশ) পং কুরুয়া	৮১৮৫। ব্রহ্মত্র
রামজীবন মোহন্ত	পুত্র রামশঙ্কর মোহন্ত	নবাব সমসের খা	পং কুরুয়া ১৩॥২৫॥ ব্রহ্মত্র

সৈদ জয়েন উল্লা ভ্রাতা সৈদ সাদউফি নবাব এক্রাম উল্লা পং কুরুয়া
গং ৬২/॥৫। মদতমাস

(জলালপুর।)
সেক জকির উদ্দীন কন্যা নবাব শুকুর উল্লা খাঁ পং জলালপুর ২।০ ব্রহ্মত্র

(অরঙ্গপুর।)
গোপীনাথ দাস পূজারী রঘুনন্দন দাস নবাব হরকিষুণ দাস পং অরঙ্গপুর
১৮॥১৸৩॥ মদতমাস

সৈয়দ আলীরজা — নবাব হার্জি হুসেন খাঁ পং হাং সতর-শতী
১৭।১॥১ মদতমাস

(গোধরালী)
কাশীরাম বিদ্যালঙ্কার পুত্র কমলাকান্ত নবাব হর কিষুণ দাস পং চৌয়ালিশ
৯॥০॥৫ ব্রহ্মত্র

(ইছাকলস)
জয়দেব চক্রবর্ত্তী ,, সোণারাম নবাব সাদেকুল হরমাণিক পং ইছাকলস
৫/০ ব্রহ্মত্র

(মোক্তারপুর)
রাধারাম মোহান্ত — নবাব মীর মোং হাদী পং মোক্তারপুর
৬॥১॥৸ ব্রহ্মত্র

(কজাকাবাদ)
মোং আসিম — নবাব নোয়াজিস মোং —

(পঞ্চখণ্ড)
আনন্দ রাম জনাবদার পুত্র শ্রীহরি শর্ম্মা নবাব হর কিষুণ দাস পং পঞ্চখণ্ড
১।২॥ ব্রহ্মত্র

কামদেব চক্রবর্ত্তী ,, আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী ,, মুরিদ খাঁ পং পঞ্চখণ্ড
১৴০ ব্রহ্মত্র

কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী ,, রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী ,, মোং আলী খাঁ শ্রীহট্টের ইতিঃ
২।২।৪ অঃ দেখ।

কেশবরাম চক্রবর্ত্তী ,, কেবলরাম ঐ ,, তানিব ইয়ার খাঁ পং পঞ্চখণ্ড
২।২৻৬॥ ব্রহ্মত্র

ঐ ঐ ,, শুকদেব ঐ ,, হরকিষুণ দাস —

গোবিন্দ রাম ঐ ,, দুর্গাচরণ ঐ ,, তানিব ইয়ার খাঁ পং পঞ্চখণ্ড
১৮৮ ব্রহ্মত্র

নরোত্তম ঐ — ,, মীরআলীওর খাঁ
পং পঞ্চখণ্ড ৫॥২৸১ ব্রহ্মত্র

ভবানীচাঁদ ঐ ,, আনন্দরাম শর্ম্মা ,, হরকিষুণ দাস —

মহেশ্বররাম ভট্টাচার্য্য ,, হরিনাথ চক্রবর্ত্তী ,, মীর নজীব আলী খাঁ পং পঞ্চখণ্ড ৮/০ মদতমাস

রত্নগর্ভ চক্রবর্ত্তী ,, কৃষ্ণরাম ঐ ,, আলিকুলীবেগ পং পঞ্চখণ্ড
৯/৴২৲ মদতমাস

রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য গং	,, রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য	,, সদাকত আলী খাঁ পং শাহ-বাজপুর	১৴৷১' মদতমাস
রমাকান্ত তর্কালঙ্কার	,, কালী চরণ দাস	,, হরকিষুণ দাস	—
রামভদ্র বিদ্যালঙ্কার	,, কালিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	,, এক্রাম উল্লা খাঁ	—
রামবল্লভা চক্রবর্ত্তী	,, রামকান্ত চক্রব	,, হরকিষুণ দাস পং পঞ্চখণ্ড	৴৲২৷৫ ব্রহ্মত্র
রামেশ্বর ঐ	—	,, মোং আলী খাঁ	পং পঞ্চখণ্ড ১২৷৩। ব্রহ্মত্র
ঐ ভট	পুত্র রামকৃষ্ণ ভট	,, হরকিষুণ দাস	—
রাসুদেব জনাবদার	,, রবিরাম শর্ম্মা	,, মীর মোং হাদী পং পঞ্চখণ্ড	২৮ ব্রহ্মত্র
বিদ্যারত্ন দৈবজ্ঞ	পুত্র কৃষ্ণরাম ৷২ ।০ ব্রহ্মত্র	নবাব হাজী হুসেন	পং পঞ্চখণ্ড
শিবরাম চক্রবর্ত্তী	,, রূপরাম চক্রবর্ত্তী	,, নজীবআলী খাঁ	পং পঞ্চখণ্ড ৷০২৸ ব্রহ্মত্র
শুকদেব পং পঞ্চখণ্ড	ঐ গং	,, আনন্দরাম ঐ	,, ঐ ৪৷৴১৷ ব্রহ্মত্র
শুভঙ্কর বিশারদ	,, সদাশিব ভট্টাচার্য্য	,, তানিব ইয়ার খাঁ	পং পঞ্চখণ্ড ১৸২৷৩ ব্রহ্মত্র
সুরানন্দ ভট	,, সোনারাম	"হরকিষুণ দাস	পং পঞ্চখণ্ড ৴৲১৷৩১৲ ব্রহ্মত্র
(বাহাদুরপুর।)			
কামদেব পণ্ডিত	পুত্র কেশব পণ্ডিত	নবাব আলিকুলিবেগ পং পঞ্চখণ্ড	৬৸২৲৬৮ ব্রহ্মত্র
কৃষ্ণচরণ ভট্টাচার্য্য	,, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	,, আবু হুসেন পং বাহাদুরপুর	।২৴১৮৷ ব্রহ্মত্র
গোবিন্দরাম পণ্ডিত	—	দেওয়ান গোলাবরাম	পং বাহাদুরপুর ৫৴৷৪৷ ব্রহ্মত্র
রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তী	,, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী গং	নবাব আবু হুসেন পং বাহাদুরপুর	২৷১ ।২ ।০ ব্রহ্মত্র
লক্ষ্মীনাথ জনাবদার	,, কৃষ্ণচরণ শর্ম্মা	,, সৈয়দ ইব্রাহিম খা পং বাহাদুরপুর	১ ।০৻১। মদতমাস
সানন্দরাম চক্রবর্ত্তী	,, আনন্দ চক্রবর্ত্তী	,, মোহাম্মদ হাদী পং বাহাদুরপুর	৷০ ।২৷ ব্রহ্মত্র
(চাপঘাট।)			
গোলাম জাফর আলী	,, গোলাম জিনারি	,, হরকিষুণ দাস (শ্রীহট্টের ইতিঃ	২ ।২ ।৪র্থ অঃ দেখ
দুর্ল্লভনারায়ণ	,, সম্পদরাম	,, বিকু খাঁ	পং চাপঘাট ১৩৴২৷৩ দেবত্র
পরমানন্দদাস বৈরাগী	,, স্বরূপদাস বৈরাগী	,, নজীব আলী খাঁ পং চাপঘাট	৩৴২৷৩ দেবত্র
মোং মকবুল খাঁ	—	নবাব এক্রামউল্লা খাঁ	মৌং মহাকল ৪০০৴মদতমাস ইলাসপুর ১০০৴

রত্নেশ্বর পণ্ডিত পুত্র সম্পদ রাম . ঐ
(শাহবাজপুর।)
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ,, কালীচরণ ভট্টাচার্য্য ,, হরকিষুন দাস—
সৈয়দ জলিল কন্যা আজিনা বিবি ,, ফরমান বাদশাহী পং আতুয়াজান
১০৭০ হিঃ) ১৬/।২ মদতমাস
(দেওরালি)
বাজুরাম চক্রবর্ত্তী নবাব । দাস পং দেওরালি
১৩৸১॥৪৸ ব্রহ্মত্র
বাণীরাম সেন ও নসিরাম দাস (পাথারিয়া) } পুত্র রামগোপাল সেন ,, মোং আলী খাঁ
উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী দরাম দেব (দৈব গোষ্ঠী সম্ভূত?) পং বড়লিখা
১ ।৪ ব্রহ্মত্র
জগদীশ পণ্ডিত ,, কালীচরণ ভট নবাব মোং আলী খাঁ ঐ গং ৷২৷১৷ ,,
জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ,, গোবিন্দরাম ভট ,, এক্রামউল্লা খাঁ পং বরায়া
২॥ ২ ।৬। ব্রহ্মত্র
জান মোহাম্মদ দেওয়ান গোলাবরাম পং পাথরিয়া
।২॥৫ চেরাগী
জামিল ঐ নবাব আলীওর খাঁ পং পাথরিয়া
২০/০ মদতমাস
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,, রূপেশ্বর চক্রবর্ত্তী ,, মোহাম্মদ আলী খাঁ পং পাথরিয়া
১/২॥০ ব্রহ্মত্র
হীরানন্দ চক্রবর্ত্তী ,, রামনারায়ণ ঐ ,, হাজি হুসেন পং পাথরিয়া
৩॥০ ব্রহ্মত্র (১১৬১ পঃ)

দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

(ইটা)
কমলাকান্ত জট পুত্র কৃষ্ণচরণ ভট নবাব আলিকুলিবেগ পং শমশের নগর
৪০৸১ ৮ ব্রহ্মত্র
— ,, কারগুজার খাঁ পং কৌড়িয়া
পং ১১১৬ বাং ১৩১৩ ১৭৸২॥১ ব্রহ্মত্র
গণেশ্বর সার্ব্বভৌম ,, শ্রীকৃষ্ণ ভট ,, হরকিষুণ দাস পং চাপধাট
১৮৸২॥২ ।০ ব্রহ্মত্র
গণেশ্বর ভট গং ঐ ,, জাফর আলী খাঁ পং ঢাকাদক্ষিণ
৩০৩৸০ ব্রহ্মত্র
গণেশ্বর শর্ম্মা ভ্রাতা নন্দরাম শর্ম্মা ঐ পং ইটা
২৭ ।২৲৪ ব্রহ্মত্র
নবিবক্স গং পুত্র সুরাজ বক্স ,, শমশের খাঁ পং শমশের নগর

			৪৮১ ৲ মদতমাস
মহেশ ভট	,, রমাপতি ভট	,, ইব্রাহিম খাঁ (১০৭৫ হিঃ)	পং দক্ষিণ কাছ ৬২৷১০৪৷ ব্রহ্মত্র
	(শ্রীহট্টের ইতিঃ		২।২।৪ অঃ দেখ)
বিবি নবি	—	উজির উলমুলক মজঃফর জঙ্গমীর জুমলা খান খানান	পং ইটা গং [২০৷০৷১ মদতমাস
রতিকান্ত ভট	পুত্র কমলাকান্ত (মোহরে রমজান অঙ্কিত)		(১০৬৯ হিঃ ইনি কি নবাব?)
রমাপতি চক্রবর্ত্তী	,, শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	নবাব ফরহাদ খাঁ	পং আলীনগর ১৴।৫৷ ব্রহ্মত্র
হরিনাথ ভট	—	,, আলি কুলিবেগ	পং কৌড়িয়া ২৭৸৬। ব্রহ্মত্র
হরিকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	—	,, নজীবআলী খাঁ	পং কাণিহাটী ২৴১, ব্রহ্মত্র

(চৌয়ালিশ।)

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য	পুত্র কবিবল্লভ চক্রবর্ত্তী	নবাব নজীব আলী খা	পং চৌয়ালিশ ২৴।৩ ব্রহ্মত্র
জগৎবল্লভ শর্ম্মা গং	,, বিশ্ব নাথ শর্ম্মা	,, এক্রাম উল্লা খাঁ	পং চৌয়ালিশ ২৷৩ ব্রহ্মত্র
জগন্নাথ বৈরাগী	—	,, আনন্দরাম কর গং পং চৌয়ালিশ	১৴।০৷ দেবত্র
জমাবক্স ফকির	—	,, মোং আলী খাঁ	পং চৌয়ালিশ ২৷২৷৪ চেরাগী
জয়রাম শর্ম্মা	পুত্র আনন্দরাম শর্ম্মা	গদাধর গুপ্ত (চৌয়ালিশ)	—
নন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী	—	নবাব মীর আলী খাঁ	পং চৌয়ালিশ গং ৪৷০ ব্রহ্মত্র
প্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী গং	পুত্র কিশাই শর্ম্মা	,, এক্রাম উল্লা খাঁ পং চৈতন্যনগর	গং ৩।০৷৫ ব্রহ্মত্র
ভবদেব চক্রবর্ত্তী	,, শ্যামানন্দ চক্রবর্ত্তী	,, মীর মাং হাদী	পং চৌয়ালিশ ০৷০ ব্রহ্মত্র
মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী	—	নায়েব আচল সিং	পং চৌয়ালিশ ৫।০৩১ ব্রহ্মত্র
মোং শমশের খাঁ	,, আমীর খাঁ	নবাব এক্রাম উল্লাখাঁ	পং চৌয়ালিশ ৩৴১।২ মদতমাস
রঘুদেব চক্রবর্ত্তী	,, কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী	,, নজীব আলী খাঁ	পং চৌয়ালিশ ৩৴০৷১ ব্রহ্মত্র
রাজারাম পঙ্গ্	,, জয়রাম শর্ম্মা	মুক্তারাম লতাবৈদ্য	(চৌয়ালিশ) পং ইটা ১৷১৷ ব্রহ্মত্র
রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য	,, দামোদর ভট্টাচার্য্য	নবাব নূর উল্লা খাঁ	(শ্রীহট্টের ইতিঃ ২।২।৪ অঃ দেখ

রামভদ্র চক্রবর্ত্তী	,, রামরাম ভট	,, হরকিষুন দাস	পং চৌয়ালিশ ৭৴৷১৷৲ ব্রহ্মত্র
রামভদ্র ভট্টাচার্য্য	,, গদাধর ভট	ঐ	পং চৌয়ালিশ ২৷১৫৷০ ব্রহ্মত্র
(ছোট লিখা)			
ধর্ম্মদাস বৈষ্ণব	—	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং	পং ছোট লিখা ২১৷৷২ দেবত্র
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	,, কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী	নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ	পং বড়লিখা ৫৷৷১ দেবত্র ১৷১৷৬ ব্রহ্মত্র
(ইছামতী)			
কমলেশ্বর ভট্টাচার্য্য	,, মথুরেশ ভট্টাচার্য্য	,, জয়েনউল্লা আবিদি	পং ইছামতী ১৷৲২৷৷০ মদতমাস
মস্তফি হাজি	,, খাদিম মোং	,, ইনায়েৎ উল্লা	পং ইছামতী ৩৷৲১৷৷৬৷৷ মদতমাস
রাজারামদেব	,, পরমদেব	,, আলিকুলিবেগ পং	২০৴০ মদতমাস ৩১৴০ পীরত্র
রামকান্ত পণ্ডিত	,, গণেশ্বর শর্ম্মা	,, এক্রাম উল্লা খাঁ	মৌং মহাদেবপুর ১১৲৷০৷৷ ব্রহ্মত্র
(আগিয়ারাম)			
গদাধর ভট	,, রামচন্দ্র ভট	,, আলিত্তর খাঁ	পং আগিয়ারাম ২৴০ ব্রহ্মত্র
(রফিনগর)			
এবাদত উল্লা	—	,, শমশের খাঁ পং বারপাড়া পং কুশিয়ার কুল	২৭৷৷১৷৲৬ চেরাগী ১৭৷৲১৲৬ ,,
(ঢাকা উত্তর)			
শেখ ইনুস	—	,, আমীরউল উমারা	—
রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	—	,, নজীব আলি খাঁ	পং চৌয়ালিশ ৩৴৷৷০ ব্রহ্মত্র
লক্ষ্মীরায় জনাবদার	,, শিবচরণ	,, হরকিষুন দাস	পং চৌয়ালিশ ৷৲১৲৪৷৷০ ব্রহ্মত্র
বৃন্দাবনদাস বৈরাগী	শিষ্য নন্দলাল বৈরাগী	ঐ	পং চৌয়ালিশ ৭৴০ দেবত্র
সৈয়দ নিয়ামত উল্লা	পুত্র মোং আলি	নবাব নজীব আলী খাঁ	পং লংলা ১৬৴৷৷৬৲ মদতমাস
সুন্দরানন্দ চক্রবর্ত্তী	—	গোপালদাস সেন (চৌয়ালিশ)	পং চৌয়ালিশ ৷২৲৪৲ ব্রহ্মত্র
হরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	নবাব হরকিষুণ দাস	পং চৌয়ালিশ ২৴০৷২৷ ব্রহ্মত্র

হরিহর চক্রবর্ত্তী পুত্র সুরানন্দ চক্রবর্ত্তী ঐ পং চৌয়ালিশ গং ৩॥০৳৷৩॥ ব্রহ্মত্র

(বরমচাল)

রাজবল্লভ অধিকারী ভ্রাতা রাধাবল্লভ অধিকারী নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ পং ভাটেরা গং ৫৷৲২॥৩। ব্রহ্মত্র

রামজীবন ভট্টাচার্য্য পুত্র শঙ্কর ভট্টাচার্য্য দেওয়ান গোলাবরাম পং পাথারিয়া ॥০৲ ব্রহ্মত্র

রামভদ্র ভট ,, গোপীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ পং বরমচাল ১॥০ ব্রহ্মত্র

রামনাথ চক্রবর্ত্তী ,, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,, তানিব ইয়ার খাঁ পং বরমচাল ২৴২ ৫ ব্রহ্মত্র

শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ,, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ,, হরকিষুণ দাস পং বরমচাল ৩৴২৲

(লংলা)

অনন্তরাম চক্রবর্ত্তী ,, রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী ,, এক্রাম উল্লা খাঁ পং লংলা ১০।১।১। ব্রহ্মত্র

কাশ্মীশ্বর চক্রবর্ত্তী ,, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,, মোহাম্মদ সাদেক পং লংলা ৩॥২॥০ ব্রহ্মত্র

গোলাম রাম মজুমদার পুত্র রামচন্দ্র মজুমদার নবাব আলি কুলিবেগ পং লংলা ।১॥২ দেবত্র

চাঁদরায় জনাবদার ,, কালিকা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ,, হাজীহুসেন পং লংলা ৯॥০॥৪। ব্রহ্মত্র

জগৎ রাম শর্ম্মা ,, অনুপরাম শর্ম্মা ,, মীর মোং হাদী —

জয়দেব ভট ,, মুকুন্দরাম ভট ,, বিকু খাঁ পং লংলা ৳১।৬॥০ ব্রহ্মত্র

মোং মুনফত আলী — ,, নজীব আলী খাঁ পং লংলা ১০০১৴ ব্রহ্মত্র

রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,, রাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ,, নজবউদ্দীন খাঁ পং লংলা ৷১॥ ব্রহ্মত্র

রামরাম ভট্টাচার্য্য ,, জীবনরাম চক্রবর্ত্তী ,, হরকিষুণ দাস পং লংলা ১২॥১৷৲১ ব্রহ্মত্র

বাণী নাথ চক্রবর্ত্তী গং — ঐ পং লংলা ১৩।২৲৫॥ ব্রহ্মত্র

ব্রজবল্লভ গোঁসাই ,, গৌরীবল্লভ গোঁসাই শাহমতজঙ্গ পং লংলা ১৯।২৳২॥ ব্রহ্মত্র

শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী গং ,, জয়রাম চক্রবর্ত্তী নবাব শমশের খাঁ —

হরিহর চক্রবর্ত্তী ,, কামদেব চক্রবর্ত্তী ,, বশারত খাঁ পং লংলা ৬॥৹৩

(কাণিহাটী।)

অনুপরাম কানুনগো ,, রাম গোপাল কানুনগো ,, নজীব আলী খাঁ পং কাণিহাটী গং ১৬৴০ মদতমাস

খেদাওত আলী ,, নিয়ত আলী ,, মোঃ আলী খাঁ পং কাণিহাটী ৪৴২৲ চেরাগী

রাজবল্লভ ভট	,, হর বল্লভ ভট	,, নজীব আলী খাঁ পং কাণিহাটী	৩/।০ ব্রহ্মত্র
বিবি ফাতিমা	—	বাদশাহ্ আবুল মুজঃফর	পং লংলা ৯৷।১৮১। মদতমাস
(শমশের নগর)			
জয়কৃষ্ণ ভট	,, গণেশ্বর ভট	নবাব নজীব আলী খাঁ	পং শমশের নগর ১২।০ ব্রহ্মত্র
নওয়াজ মুল্লা	—	মোং রবি	(লংলার জমিদার?)
লক্ষ্মীনারায়ণ ভট	গণেশ্বর ভট	নবাব এক্রাম উল্লা	পং ইটা ১৩/।০ ব্রহ্মত্র
সম্পদরাম পণ্ডিত	,, বিজয়রাম পণ্ডিত	বগ	পং আলীনগর /২৻৩।০ ব্রহ্মত্র
(আলীনগর)			
রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য	,, কৃষ্ণরাম ভট্টাচ	,, এক্রাম উল্লা খাঁ	—
রাধাকান্ত ভট	—	ঐ	পং আলীনগর ১০/২৷৷ ব্রহ্মত্র
(ইন্দেশ্বর)			
জগন্নাথ শর্ম্মা	ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাচরণ শর্ম্মা	নবাব হরকিষুণ দাস	পং ইন্দেশ্বর /২৲ ব্রহ্মত্র
জয়রাম শর্ম্মা	পুত্র ঐ	,, মোং আলী খাঁ	পং ইন্দেশ্বর ।০৻৬', দেবত্র
বালকরাম বৈষ্ণব	শিষ্য রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব	,, মীর মোং হাদী	পং ইন্দেশ্বর ৬৮২৻৩৮দেবত্র
বিজয়রাম চক্রবর্ত্তী	,, পুত্র বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী	,, হরকিষুণ দাস	—
রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য	,, নন্দরাম বিদ্যালঙ্কার	,, আলি কুলিবেগ পং ইন্দেশ্বর	১৲২৷৷২। ব্রহ্মত্র
শেখ আনয়ান	,, শেখ রসিদ পং ইন্দেশ্বর	ফরমান আরঙ্গজেব বাদশাহ্	৬/১৻৩৷৷ মদতমাস
সেখ আনয়ান	—	ঐ	—
(মহরাপুর।)			
আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী	পুত্র গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী	নবাব মীর মোং হাদী	—
আনন্দদাস বৈরাগী	—	,, হরকিষুণ দাস	—
বিজয়রাম চক্রবর্ত্তী	,, বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী	ঐ পং হাউলি	সতরশতী ৪।০৻৬।
সম্পদরাম চক্রবর্ত্তী	,, উদয় রাম চক্রবর্ত্তী	ঐ	—
[ভাটেরা]			
কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	,, কুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ (প্রাপকের সাং মাইজগ্রাম)	
কেশব রাম ভট	,, কমলকান্ত ভট	নবাব শমশের খাঁ	—
রামজীবন চক্রবর্ত্তী	,, রামনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ (শাণ্ডিল্য গোত্রীয়?)	

[সতরশতী]
কৃষ্ণগোবিন্দ অধিকারী — নবাব হরকিষুণ দাস পং হাং
সতরশতী ১৬৮২ '৲দেবত্র
জয়কৃষ্ণ বৈষ্ণব ঐ পং সতরশতী ১।।০ দেবত্র
রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী পুত্র জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী নবাব শমশের খাঁ পং হাং সাতগাও
১৴২।। দেবত্র
হরিহর ভট্টাচার্য্য ,, হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ,, এক্রাম, উল্লা খাঁ পং হাং সতর-শতী
১১৷৲১৷২।। ব্রহ্মত্র

[সাতগাও]
গোপীনাথ ভট — ,, শমশের খাঁ পং সাতগাও
।।০৲১ দেবত্র
বাণীশ্বর ভট্ট জামাতা দামোদর ভট্টাচার্য্য ,, ঐ
পং সাতগাও ৩৲২।।১ ব্রহ্মত্র

[চৌতলী]
রামদাস বৈষ্ণব শিষ্য জয়কৃষ্ণ বৈষ্ণব নবাব আবু হুসেন খাঁ

[সায়েস্তা নগর]
অনুপরাম গুপ্ত — ,, এক্রাম উল্লা খাঁ পং নগর
১৲২।০ দেবত্র
জয়গোবিন্দ পাল বৈষ্ণব পুত্র মাধবদাস বৈষ্ণব, শ্যামরাম দেওয়ান পং সায়েস্তা-
নগর ।।৲১ দেবত্র
ভবদেব ভট্টাচার্য্য গং ,, নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, নবাব মীর মোহাম্মদ পং চৌয়ালিশ
।।১৲২ '৲ব্রহ্মত্র
মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী ভ্রাতুষ্পুত্র যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, নবাব মোং আলী খাঁ পং সায়েস্তা
নগর ।।১৲০। ব্রহ্মত্র
রামনাথ চক্রবর্ত্তী পুত্র রাজবল্লভ শর্ম্মা, শ্যামরাম গুপ্ত (শ্রীহট্ট) পং সায়েস্তা নগর ।।৫।। ব্রহ্মত্র
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,, মহাদেব ভট নবাবজান মোং খাঁ পং চৌয়ালিশ
।।২।।২ ব্রহ্মত্র
বাণীনাথ চক্রবর্ত্তী ,, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ,, নবাব হরকিষুণ দাস —
শেখ রূষণ ফকির — আরিফ মোং চৌধুরী—

হবিগঞ্জ

(বাণিয়াচঙ্গ)
উদয়রাম জনাবদার পুত্র হৃদয়রাম শর্ম্মা ইষ্টইণ্ডিয়া কোং জোয়ার বাণিয়া চঙ্গ ১০।।০।।৫ শিবত্র
গঙ্গাধর শর্ম্মা ভ্রাতা হলধর শর্ম্মা নবাব মোং আলী খাঁ (শ্রীহট্টের ইতিঃ
২।২।৪র্থ অঃ দেখ)
তিলকরাম বাচস্পতি — দেওয়ান উমেদরজা পং বাণিয়াচঙ্গ
৮৴০ দেবত্র
বাগীশ্বর ভট্টাচার্য্য — নবাব নসরত জঙ্গ পং বাণিয়াচঙ্গ

			৬/ ব্রহ্মত্র
রশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	—	আজমরজা জমিদার	পং বাণিয়াচঙ্গ ৩/. ব্রহ্মত্র
[কাশিমনগর]			
বাসুদেব চক্রবর্ত্তী	—	নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ	পং কাশিমনগর ৪/০ ব্রহ্মত্র
বিষ্ণুপ্রসাদ পং কাশিমনগর	জনাবদার	পুত্র বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী	,, হরকিষুন দাস ৩৷,১। ব্রহ্মত্র
শেখ কুতব ফকির	—	,, মোং আলী খাঁ পং কাশিমনগর	৷২৲১।০ চেরাগী
গোবিন্দ রাম পাণ্ডা	,, গোবর্দ্ধন পাণ্ডা	পং বেজোড়া	৪।১৲১। দেবত্র
মথুরেশ চক্রবর্ত্তী	ভ্রাতা রাম গোবিন্দ	নবাব আবু তুষার খাঁ	পং বেজোড়া ১৩।১৲১ দেবত্র
মোং আকবর	—	,, মোং আলী খাঁ	পং বেজোড়া ২৪/০ মদতমাস
রামকান্ত চক্রবর্ত্তী	,, বলরাম বিশারদ	,, ফরহাদ খাঁ	পং বেজোড়া ৫' ০৲৬ ব্রহ্মত্র
[জলসুখা]			
গৌর বল্লভ শর্ম্মা	নিঃসন্তান	,, সাদেকুলহরমানিক	মৌং খিদুর ।১।১ ব্রহ্মত্র
[গিয়াসনগর]			
আকুত রাম শর্ম্মা	—	সৈয়দ আলী জমিদার	পং গিয়াসনগর ২৲৫ ব্রহ্মত্র
[জন্তরি]			
ব্রহ্মানন্দ দৈবজ্ঞ	পুত্র রামানন্দ গং	নবাব মোং আলী খাঁ	পং জনতরী ~'২ ব্রহ্মত্র
[উচাইল]			
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	,, হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী পং উচাইল	নবাব সৈয়দ মোং আলী খাঁ	১।১৲ব্রহ্মত্র
রমাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী	,, বিষ্ণুদাস শর্ম্মা	,, সৈয়দ মোং আলী খাঁ	পং উচাইল '০ ব্রহ্মত্র
[দিনারপুর ।]			
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	,, কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য	,, হরকিষুণ দাস পং দিনারপুর	৬৲০৷৪। ব্রহ্মত্র
কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার	,, কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশ	,, শমশের খাঁ	পং দিনারপুর ২২/২।১। ব্রহ্মত্র
গঙ্গানন্দ চক্রবর্ত্তী	,, ভুবদেব চক্রবর্ত্তী	,, আবুতানিব খাঁ	পং দিনারপুর ৲১৷৩৲ ব্রহ্মত্র

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	,, রামকান্ত ভট্টাচার্য্য	,, নজীব আলী খাঁ	
রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী	,, হরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী	,, মোং আলী খাঁ	পং দিনারপুর ৫।২৸২।০ ব্রহ্মত্র
শ্যামচাঁদ অধিকারী	—	,, এক্রাম উল্লা খাঁ	পং দিনারপুর ১২৴১।৩।০ ব্রহ্মত্র
(দাউদপুর)			
রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য	,, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	মিঃ লেঙ্গুসি সাহেব পং বেজোড়া	১৯৸ব্রহ্মত্র
(আগনা)			
মুক্তারাম চক্রবর্ত্তী	—	নবাব নজীব আলী খাঁ পং আগনা	৭৴॥০ দেবত্র
[লাখাই]			
কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী	—	কৃষ্ণরাম দত্ত (লাখাই)	পং লাখাই ৴।০ ব্রহ্মত্র
জয়গোবিন্দ শর্ম্মা	—	ঐ	পং লাখাই ৴২ ব্রহ্মত্র
বাণেশ্বর শর্ম্মা	পুত্র সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং	পং লাখাই ১॥২।১॥ ব্রহ্মত্র

সুনামগঞ্জ।

(আতুয়াজান)			
কর মোহাম্মদ	—	নবাব নজীব আলী খাঁ পং আতুয়াজান	৭৴০ চেরাগী
রামকান্ত ভট্টাচার্য্য	পুত্র শ্যামানন্দ শর্ম্মা	,, হরকিষুণ দাস পং হাং সোনাইতা	৩॥০।০ ব্রহ্মত্র
রানবল্লভ ভট্টাচার্য্য	ভ্রাতা কাশীনাথ ভট	—	পং আতুয়াজান ৮॥২৲ ব্রহ্মত্র
বৈশাখা বৈষ্ণবী	—	নবাব রফি উল্লা খাঁ	
(সিক সোণাইতা)			
রঙ্গরাম বৈষ্ণব	ভ্রাতা শ্যামরাম বৈষ্ণব	নবাব হরকিষুণ দাসপং সিকসোনাইতা	৩৸১৸০ ব্রহ্মত্র
রাঘব রাম পণ্ডিত	পুত্র ভানুরাম শর্ম্মা	ঐ পং সিকসোণাইতা	৴২৩৸ ব্রহ্মত্র
রামকৃষ্ণ অধিকারী	,, হরকৃষ্ণ শর্ম্মা	,, সৈয়দ মোং আলী খাঁ পং সিকসোণাইতা	।১॥১ দেবত্র।
শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী	—	,, আবুহুসেন খাঁ পং সিকসোনাইতা	৮৬৴০ দেবত্র
সোণারাম বৈষ্ণব	,, দর্পনারায়ণ বৈষ্ণব	,, সৈয়দ রফি উল্লা খাঁ	পং সিকসোণাইতা ২৲০ মদতমাস

(হাউলিসোণাইতা)
গোবিন্দরাম বিদ্যালঙ্কার পুত্র রমাকান্ত শর্ম্মা নবাব মীর মোং হাদী পং হাং
হাউলিসোণাইতা ২৮১৻৩ ব্রহ্মত্র
বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী ,, বলরাম চক্রবর্ত্তী ,, আলিকুলিবেগ পং
হাউলিসোণাইতা ১।২।১ দেবত্র

বিভিন্ন স্থান।

(মুর্শিদাবাদ—ঈলাল দিনারপুর)
দুলালচন্দ্র গোসাই — নবাব মীর অলিওর খাঁ পং ইন্দানগর
৩/১৮৬ ব্রহ্মত্র

[ঢাকা সাং উথনি]
গোলোকচাঁদ গোসাই পুত্র নিতাইচাঁদ গোসাই ,, নবাব এক্রামউল্লা খাঁ পং
ইছামতি ১০০৻ দেবত্র

[জাহাঙ্গীরনগর]
যুগল কিশোর অধিকারী — ,, হরকিষুণ দাস পং পলডর
১০০৻ দেবত্র

(জোয়ানসাহী)
মৌ দুবাগ ২৫/০ দেবত্র
রামজীবন ভট্টাচার্য্য পুত্র দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নবাব শমশের খাঁ পং দুলালী
১৩৻২৻/০ ব্রহ্মত্র

(সরাইল)
সেখ ইমাম বক্‌স — ,, মোং আলী খাঁ পং বেজোড়া
৪২৷৷২ মদতমাস।

বংশ ও জীবন বৃত্তান্ত'

অতিরিক্ত খণ্ড-কাছাড়ের কথা

[উপক্রমণিকা]

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে কাছাড়ের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত দেওয়া গিয়াছে, উত্তরাংশেও তাই কাছাড়ের বংশ ও জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। কিন্তু তদর্থে তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিকবার বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন দিয়া এবং নানা স্থানে চিঠিপত্র লিখিয়াও বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই—মাত্র তিনটী বংশ কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। ১.—উদায়বন্দের দেশমুখ্য বংশ কথা ও ২.—হাইলা কান্দির ব্রাহ্মণবংশ কথা ও ৩.—হাইলাকান্দির কায়স্থ চৌধুরী বংশ কথা।

তাহাই প্রকাশিত হইল।

উদারবন্দের দেশমুখ্য বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ ২য় খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে (১৫৯ পৃঃ) চাপঘাটের দেশমুখ্য বংশবৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হয়—"এই দেশমুখ্যবংশে শম্ভুনাথের জন্ম।"

দেশমুখ্য বংশীয় শম্ভুনাথের জন্মস্থান কিন্তু চাপঘাট নহে, কাছাড় জেলার অন্তর্গত উদারবন্দের দুর্গানগর গ্রামে শম্ভুনাথ জাত হন। শম্ভুনাথের চরিত্র প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু অগ্রে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ সংক্ষেপে বলিতেছি।

মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ-বর্গের এক সম্প্রদায়ের পদবি "দেশমুখ্য"। আমরা যে বংশের বিবরণ বলিতেছি, ইঁহাদেরও পূর্ব্বপুরুষ যে এক সময় তদ্দেশবাসী ছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কখন কি কারণে তাঁহারা এ অঞ্চলে আগমন করেন, তাহা জানা যায় না। প্রথমে এই বংশীয়গণ শ্রীহট্টের ইটাবাসী ছিলেন, ইটা হইতে ঐ বংশীয় বসুদেব কাছাড়রাজ হরিশ্চন্দ্ররায়ণের সময়ে তৎকর্ত্তৃক শ্যামা ও কাঁচাখান্তি দেবীর পূজক নিযুক্ত হইয়া কাছাড় গমন করেন। তাঁহার পুত্র জয়কৃষ্ণ দেশমুখ্য উদারবন্দের সামাজিক বিচার নিষ্পত্তি করিবার ভার প্রাপ্ত হন। জয়কৃষ্ণের পুত্র সোণারাম ১২৩১ সালে পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। সে সনন্দে সোণারাম ঐ পদ প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের বিচার্য্য কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ আছে; যথাঃ—

"দফে জায় মোকদ্দমা—১
অপালন গোবধ আদি—১
অজ্ঞাত সংসর্গ পশ্চাদজ্ঞাত—১
শ্রাদ্ধ, পুর্ন্নবিবাহ ও চতুর্থ বিবাহ পতিত হওয়া—১
পুত্রে মাতা পিতা জেঠা খুড়া ও ভ্রাতা শ্বশুর আদিকে মন্দ-বাক্য বলিলে—১
ক্রোধেতে মোহেতে স্বামী স্ত্রীকে মাতা ভগ্নি বলিলে এবং
স্ত্রী স্বামীকে পিতা বলিলে—' " ইত্যাদি
সোণারামের দুই পুত্র রসরাজ ও শম্ভুনাথ।

শম্ভুনাথের কথা

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথের জন্ম হয়। শম্ভুনাথ শৈশবে ঘটনাবশে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পঙ্গু হইয়া পড়েন; অপরের সহায়তা ব্যতীত চলা ফেরা করিতে, কি গৃহ হইতে বহির্গত হইতে

পারিতেন না। এই জন্য তিনি বিবাহ করেন নাই। হবিষ্যান্ন ভোজন, পূজা অর্চ্চনা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তিনি চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার আর একটি প্রিয়কার্য্য ছিল গ্রন্থানুলিপি। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলী কার্য্যক্ষম ছিল না, তথাপি তিনি বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী মাত্র সাহায্যে ৩০ খানা গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এতদ্দারা তাঁহার বিদ্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তৎকর্ত্তৃক ৫৪ খানা গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি যে সকল গ্রন্থের প্রতিলিপি করেন, তাহার কোন কোনটির সমাপ্তিতে স্বরচিত এক একটি শ্লোক লিখিয়া সংস্কৃত জ্ঞানের সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার কৃত আত্মবারমাসী কবিতায় তিনি নিজের দুঃখের কথা যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের প্রতি সমবেদনা না হইয়া পারে না। উহা ১২৬২ বাংলায় রচিত হয়। উহার প্রথমেই লিখিত হইয়াছে ঃ—

"বৈশাখ মাসের দুঃখ শুন দুর্গা মাই।
এ ভবে বাঁচিয়া মোর কিছু লভ্য নাই॥
হস্ত গেল পদ গেল বদন মলিন।
সকলে ছাড়িয়া গেলা 'মোরে' জানি দীনহীন॥"

ধর্ম্মানুরাগী শম্ভুনাথ একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতেন এবং বৎসরের প্রথমেই একাদশীর একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। তিনি গুরুর পাদোদক বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতেন এবং বৎসর ভরা প্রত্যহ একটু একটু পান করিতেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিবেশীদিগকে নব বস্ত্র দিতেন এবং আম কাঠালের সময় ফলাহার করাইয়া আনন্দানুভব করিতেন। দুর্গোৎসব কালে দেবীর জন্য পুষ্পচয়ন করিতে অসমর্থ ছিলেন এবং দশমীর বিসর্জ্জনাদি দর্শনে যাইতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"পদ সুখে না করিলাম পুষ্প আয়োজন।
হস্ত সুখে না করিলাম দেবা পূজন॥
* * * *
এই দুঙ্ক প্রাণে মোর কত বা সহিমু।
মাগো আমি যম ঘরে কত দিনে যাইমু॥"

পুনশ্চ— "দশরাতে আইলে দুর্গা ন পারি প্রণতি।
দেখিয়া দুর্গার উৎসব চক্ষের গোচরে।
হাটিতাম না পারি আজি পুড়য়ে অন্তরে॥"

এইরূপে উক্ত কবিতার প্রতি পংক্তিতেই তাঁহার হৃদয়ের অপূর্ণ আকাঙ্খার অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়।

পিতৃবিয়োগের পর পিণ্ডদানোদ্দেশে উভয় ভ্রাতা গয়াধামে গমন করেন। তখন হাঁটিয়া বা নৌকাতে যাইতে হইত। ইঁহারা আত্মীয় স্বজন সমভিব্যবহারে ৫১ জন ব্যক্তি নৌকাযোগে যাত্রা করেন। সুদীর্ঘ পথ, সাহিত্যামোদী শম্ভুনাথ দিন কাটাইবার এক উপায় করিলেন। প্রভাত হইতেই তিনি কালি কলম কাগজ লইয়া নৌকার অগ্রভাগে গিয়া বসিতেন এবং পথের কোথায় কি আছে, তাহার খবর লইয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপে কাছাড় হইতে কাশী পর্য্যন্ত জলপথে গমনের এক চিত্র ও বিবরণী প্রস্তুত হয়। ৫৭ হাত দীর্ঘায়তন উক্ত মানচিত্রে নদীর উভয় পার্শ্বের গ্রাম পরগণা, দেবালয়, হাট, খাল বিল জঙ্গল ইত্যাদি প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয় চিত্রিত ও বর্ণিত হইয়াছে। কাশী যাওয়ার জল পথের এই ভৌগোলিক চিত্র প্রণয়নের জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কাশী যাতায়াতে নয় মাস লাগিয়াছিল, নয় মাস পরে বাড়ীতে আসিলে এক মণিপুরী দস্যুর চক্রান্তে তাঁহার গৃহ দাহ হয়। ইহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার রক্ত বমন হইত; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন ঃ-

"রুধির শ্রবিয়া অঙ্গে কৈল হীনবল।
দারুণ কার্ত্তিক মাসে হইলাম অচল॥
এই হইতে নৈরাশ আমি হৈলাম নিরানন্দ॥" ইত্যাদি

এই দারুণ রক্তবমনই বিষাদময় কবির দুঃখময় জীবন অবসান করে, ইহাতেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক দেশমুখ্য মহাশয় হইতে এই বংশ কথা প্রাপ্ত হইয়াছি।[১]

হাইলাকান্দির ব্রাহ্মণ বংশ

বংশ কথা।

কাছাড়ের ব্রাহ্মণ বিবরণ বলিতে গেলেই কৌণ্ডিল্য গোত্রীয়গণের কথা সর্ব্বাগ্রেই স্মরণ হয়। পাশ্চাত্য বৈদিক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বংশে কৌণ্ডিল্য গোত্রে কাছাড়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বনামধন্য হরিচরণ রায় বাহাদুরের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশবাসী ছিলেন না। রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ১৬ পুরুষ পূর্ব্বে তাঁহাদের বংশের আদি পুরুষ রাঘবরাম ফরিদপুরের কৌটালীপাড়ে ছিলেন। রাঘবের চারি পুত্র ছিল; কোন অজ্ঞাত কারণে ইঁহাদের পরবর্ত্তিগণ মধ্যে কেহ তথা হইতে বিক্রমপুরের কাচাদিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। "শুনা যায় যে, বিক্রমপুরের ইছাপুরায়" তাঁহাদের জ্ঞাতি বংশীয়গণ অদ্যাপি আছেন। রাঘবের ১১শ পুরুষে উমাকান্ত তর্কবাগীশ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার বাঞ্ছারামের রামেশ্বর, রামজীবন ও রামচন্দ্র নামে তিন পুত্র ছিলেন। কাচাদিয়া ইঁহাদের সময়ে পদ্মাগর্ভস্থ হইয়া পড়িলে, ইঁহারা তথা হইতে শ্রীহট্টের বাণিয়াচঙ্গে আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন বাণিয়াচঙ্গে বাস করার পর রামজীবন কৌড়িয়া পরগণায় গমন করেন; অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন বাণিয়াচঙ্গেই স্থায়ীরূপে থাকেন এবং অন্যতর তরফে চলিয়া যান। আমাদের বিবরণ প্রদাতা শুনিয়াছেন যে তরফে এখনও এই বংশীয় কেহ কেহ আছেন।

বাণিয়াচঙ্গের জাতুকর্ণ গোত্রীয়গণ উক্ত কৌণ্ডিল্য গোত্রীয়গণ গুরু বংশীয় বটেন। বাণিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌণ্ডিল্য গোত্রীয়গণ বেশ সম্মানিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় যে বাণিয়াচঙ্গের বংশশাখা প্রায় নির্ম্মুল, একটি ঘর মাত্র আছে।

রামজীবনের পুত্রের নাম কামদেব; ইঁহার পুত্র জগন্নাথ তর্কবাচস্পতি। কৌড়িয়াতে রামজীবন ভদ্রাসন স্থাপন করিলেও, তাঁহার বংশ তথায় স্থায়ী হয় নাই। ইঁহারা শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া কাছাড়বাসী হন। কিন্তু কাছাড়েও তখন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল না; কাছাড়ে প্রথম জগন্নাথের পুত্র "সর্ব্বানন্দ শর্ম্মার দেড়হাল পরিমিত ভূমির শস্যমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের সম্বল ছিল।"[২] সর্ব্বানন্দের ছয়পুত্র, যথা—সম্পদরায়, রামশরণ. রামচরণ, কৃষ্ণচরণ, নীলমণি ও হরিচরণ।

---

১. ১৩২১ বাং পৌষ মাসের প্রতিভা পত্রে কবির জীবন কাহিনী সহ তৎকৃত বারমাসী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা রামতারক বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে কবির কৃত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পের একটি সুন্দর কবিতা আছে, কিন্তু কীটদষ্ট হওয়াতে উহা অপাঠ্য হইয়াছে।

২. উদ্ধৃত অংশ সুরমা ১৩১৯ বাং ১০ই আষাঢ় হইতে গৃহীত।

হরিচরণ শর্ম্মা রায় বাহাদুর

১৭৪৯ শকাব্দে হাইলাকান্দির গাঙ্গপার ধুমকর গ্রামে হরিচরণ জন্মগ্রহণ করেন। "১৬ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। অবস্থা শোচনীয় ছিল বলিয়া ২১ বৎসর বয়সে তাঁহাকে ৮৲ বেতনে খেদা মোহরের কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়।" অল্পকাল মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ২০৲ টাকা মাসিক বেতনে উত্তর কাছাড়ের গঞ্জম ষ্টেশনে মোহরের কার্য্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তথাকার জলবায়ু তাঁহার অসহ্য হওয়ায় তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। "১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ কাছাড়ে চা বাগান স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মুঙ্গুরপার বাগানে "বাবু মনোনীত হন" "গুটী সংগ্রহের জন্য বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মণিপুরে প্রেরণ করেন। এই সুযোগে তিনি মণিপুরী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের সহায়তায় বিস্তর গুটী সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন; ফলে তিনি ৫০৲ টাকা বেতনে উন্নীত হন।" "অবশেষে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া তিন ১৫০৲ বেতনে বেরিস্মিথ কোং্র বাগিচাগুলির ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন।"

"১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে লুসাই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। "গবর্ণমেন্ট লোসাইদিগকে দমন করিবার নিমিত্তে সৈন্য প্রেরণ করিলেন।" "এই অভিযানে এড্গার সাহেবের অধীনে কুলি ও রসদসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়া হরিচরণ শর্ম্মা গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ফলে তিনি ১০০৲ বেতনে তহশীলদারের কার্য্য ও বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের ধন্যবাদ লাভ করেন।"

"এড্গার সাহেব দুইদল সৈন্য ও হরিচরণ শর্ম্মা সমভিব্যাহারে লুসাই যাত্রা করেন। লুসাই ভাষা ইতঃপূর্ব্বে আয়ত্ত থাকায় এই অভিযানে হরিচরণ শর্ম্মা গবর্ণমেন্টের বিশেষ সাহায্য করিতে সক্ষম হন।" "কাছাড়ে প্রত্যাগমন করিলে পর তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের ধন্যবাদ ও ৪৭০ একর পরিমিত নিষ্কর ভূমি এবং একটি হস্তী উপহার প্রাপ্ত হন।"

"গবর্ণমেন্ট তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি, স্পেসেল একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনারের পদ ও অপরাপর সম্মানে ভূষিত করেন। রায় বাহাদুর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রালোচনা ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাল অত্যাহিত করেন। ১৩১৪ সালের ১৮ই ভাদ্র বুধবারে বারাণসী ক্ষেত্রে তিনি দেহত্যাগ করেন।"

হাইলাকান্দির কায়স্থ চৌধুরী বংশ

"কাছাড় জেলার আদিম অধিবাসী কাছাড়ি জাতি এবং পার্ব্বত্য অন্যান্য জাতি। বর্ত্তমানে সমতল ভূমিতে বাঙ্গালীরাও বাস করিতেছে। ইহাদের ছোট বড় সকলেই শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া কাছাড়বাসী হইয়াছে।" আমাদের বিবরণ প্রদাতা এইরূপে আরম্ভ করিয়া লিখিয়াছেন যে দে চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ যদুনাথ শ্রীহট্টের বনভাগ পরগণার কালীজুরি গ্রাম হইতে দরিদ্রতা বশতঃ স্বীয় মোসলমান বন্ধু নওয়া মিয়া সহ প্রথমতঃ এগারশতী পরগণায় গিয়া বাস করেন, তত্রত্য "যদুরটিলা" ও "নওয়াটিলা" তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাসের পরিচয় দিতে বর্ত্তমান আছে।

যদুনাথের পুত্র শম্ভুনাথ এগারশতী পরিত্যাগ করেন এবং বর্ত্তমান বদরপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বৃন্দাশিল নামক স্থানে বসতি করেন। তজ্জন্য তদবধি এই বংশকে কেহ কেহ বৃন্দাশিলী বংশ বলেন।

শম্ভুনাথের পুত্র জগন্নাথ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া কাছাড়ের বিক্রমপুরবাসী হন। ইনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও কৌশলী পুরুষ ছিলেন, কাছাড়রাজ ইঁহার উপরে কোন কারণে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মজুমদার উপাধি দেন। ইনি রাজআজ্ঞায় বর্ত্তমান বড় হাইলাকান্দি মৌজায় আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। তিনি তথায় বাঙ্গালী প্রজার বসতি স্থাপন করেন এবং পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণ

হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া সে অঞ্চল সুশাসিত করেন।

ঐ সময় শ্রীহট্ট ও কাছাড় সীমাস্থ সরসপুরের পাহাড়বাসী রামভদ্র নামক পার্ব্বত্যজাতির এক নেতা মধ্যে মধ্যে ধলেশ্বর নদতীরবর্ত্তী বসতিতে আপতিত হইয়া ভীষণ অত্যাচার করিত কাছাড়রাজ ইহাকে দমনের জন্য আদেশ দেন এবং কেওয়ালিপার মৌজায় তাঁহার বাসের জন্য, একদিনের মধ্যে এক বাটি প্রস্তুত করিয়া দেন, ঐ বাটী এখন "পুরাতন বাটী" নামে পরিচিত। জগন্নাথ এখানে আসিলেও রামভদ্র অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। কিন্তু অচিরেই জগন্নাথ, পাহাড়ের মধ্যে রামভদ্রকে নিহত করেন। ঐ স্থান অদ্যাপি "রামভদ্রের কাটা" বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হাইলাকান্দি পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকৃত ছিল। এক ত্রিপুর-রাজ কন্যাকে কাছাড়-পতি বিবাহ করিয়া উক্ত অঞ্চল যৌতুক প্রাপ্ত হন। জগন্নাথ এই ভূখণ্ড নিয়া ত্রিপুরাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করায় তাঁহার শিরচ্ছেদ হয়।

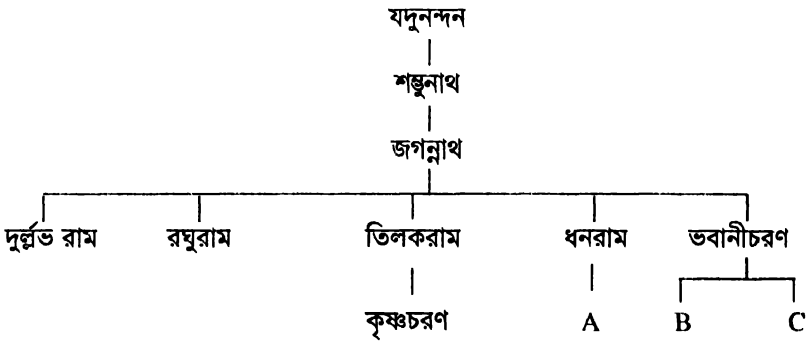
জগন্নাথের পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে ৩য় তিলকরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণ খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। কাছাড়-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল বলিয়া কথিত আছে। ইহাদের বংশ নাই।

ধনরাম ও ভবানীচরণ নামক তিলক রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশই বিস্তৃত। ধনরামের পাঁচপুত্র এবং ভবানীচরণের দুইপুত্র হয়। ইঁহারা কাছাড়-রাজ হইতে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। ভবানীচরণের কনিষ্ঠপুত্র জয়রাম প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কাছাড়-রাজের মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং রাঙ্গাউটির মোসলমান চৌধুরীর সাহায্যে হাইলাকান্দি শাসন করিতেন।

একদা কাছাড়-রাজ কোন বড়ভূইয়াকে চৌধুরী উপাধি দিতে ইচ্ছা করেন। তখন জয়রাম চৌধুরী ও মোসলমান জাতীয় কেবাই মিয়া চৌধুরী তাঁহাদের নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে চৌধুরী উপাধি দেওয়া অসঙ্গত বলিয়া ঘোরতর আপত্তি করেন। তখন রাজা সর্ব্বদিক রক্ষার জন্য জয়রামকে "বড়চৌধুরী" এবং কেবাই মিয়াকে "সাতপাইয়া চৌধুরী" বলিয়া খ্যাত করেন। ভূইয়া ইঁহাদের নিম্নপদস্থ "চৌধুরী" গণ্য হন।

ধনরামের কনিষ্ঠ পুত্র হৃদয়রাম সমাজ-প্রতিষ্ঠ-ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৫১ খৃঃ ২নং দাবীর মোকদ্দমার কাগজ পত্র আলোচনায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহারাণী ইন্দুপ্রভা স্বীয় আশ্রিত প্রজাদের সমাজে গ্রহণ জন্য গুমড়ার ভূইয়া, ভবানন্দ শর্ম্মা ও ইঁহাকে ৯৮৲ টাকা দিয়াছিলেন। তখন এই তিন ব্যক্তির তত্রত্য সমাজে বিশেষ আধিপত্য ছিল, ইহাই প্রমাণিত হয়। হৃদয়রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোণারাম, ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুলুকচন্দ্র। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র দে মহাশয় হইতে আমরা এই বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।[৩]

৩. সংক্ষিপ্ত চৌধুরীর তালিকা এই ঃ—



অন্যান্য কথা

এই সকল বংশ ব্যতীত কাছাড়ে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু অধিবাসী আছেন, এবং অনেক সম্মানিত মোসলমান বংশীয়ও আছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের কোনও বিবরণী দিতে পারিলাম না।

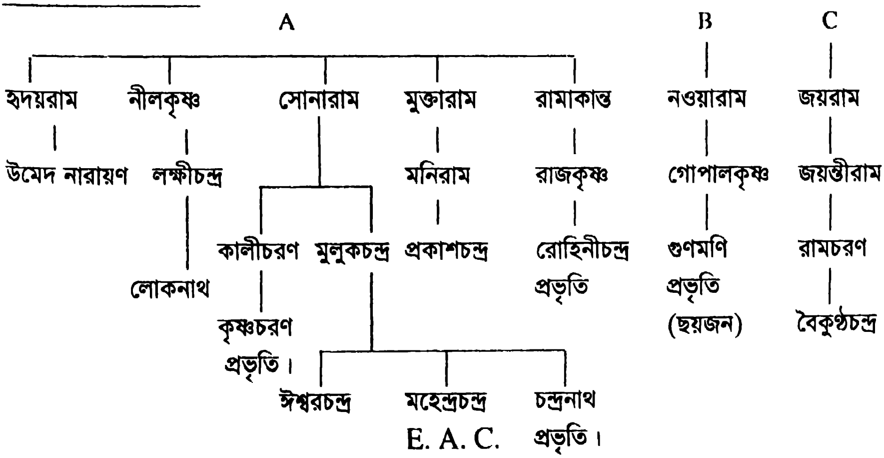
আরও দুইটি বংশের যৎকিঞ্চিৎ কথা আমরা ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছি; ১ম বিক্রমপুরের বড় মজুমদার বংশ; ২য় বড়খলার লস্কর বংশ।

যখন হেড়ম্বরাজ তাম্রধ্বজ মাইবং ছাড়িয়া কাছাড়ের সমতল ভূমিতে আগমন করেন, ঐ রাজ্যে তখন সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর উপনিবেশ হয়। বিক্রম রায় নামক এক ব্যক্তি কাছাড়ে উপনিবিষ্ট হইয়া আপন নামে বিক্রমপুর পরগণার সৃষ্টি করেন। কাছাড়ে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম পথ প্রদর্শক। ইঁহারই বংশধরগণ বিক্রমপুরের বড় মজুমদার উপাধিতে খ্যাত হইয়া কাছাড়ের অধিবাসী ভদ্রলোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই বংশ নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিচিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে।

লস্কর-বংশের প্রবর্ত্তক চাঁদ লস্করের কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশের উপসংহারে তৎপুত্র মণিরাম কর্ত্তৃক লব্ধ, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র প্রদত্ত সনন্দে আছে।

চাঁদ লস্করের বংশধরগণ এখনও বড়খলায় প্রতিপত্তি সহকারে বাস করিতেছেন। তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ রায় সাহেব শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয় রায় হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুরের পর কাছাড়ের অধিবাসীবর্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম গবর্ণমেন্ট হইতে খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার বিদ্যোৎসাহিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি নাম দিয়া তিনি কাছাড়ের শেষ ভূপতি গোবিন্দ চন্দ্রের আইন (যাহা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ—উপসংহারের টিকায় মুদ্রিত হইয়াছে) পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহোদয় কর্ত্তৃক হড়ম্বের রাজবংশের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান সচিত্র ভূমিকা লিখাইয়াছেন, তাহাতে কাছাড়ের ইতিহাসের উপর প্রোজ্জ্বল রশ্মিপাত হইয়াছে।

বংশ বৃত্তান্তে অনুল্লিখিত দু একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম অদ্যাবধি শ্রুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শিবরাম জ্যোতিষী, গুলুমিয়া এবং কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতির নাম এস্থলে উল্লেখ যোগ্য।



E. A. C.

শিবরাম কায়স্থ ছিলেন, তিনি ফলিত জ্যোতিষে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনা যায়; তন্মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র মহারাজের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু বিষয়ক তদীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে।

গুলুমিয়া কাছাড় রাজ্যে উপনিবিষ্ট মোসলমানগণের মধ্যে এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন,—"নবাব" এই উপাধিতে তাঁহার প্রতিপত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া অবশেষে ইহাকে কারারুদ্ধ হইয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি মহারাজ সুরদর্পের মাতা মহারাণী চন্দ্রপ্রভাব আদেশে "নারদী রসামৃত," নামক গ্রন্থ লিখিয়া চিরস্মরণী হইয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের রচনা ১৬৫২ শকে (১৭৩০ খৃঃ) শেষ হয়।

"হরিধ্বনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন।
ষোলশত বায়ান্ন শাকেতে হৈল লিখন॥
তাম্রধ্বজ মহারাজ ছিলা মহাভাগ।
সর্ব্বলোকে সদ যারে করে অনুরাগ॥
তান পুত্র রাজা শূরদর্প মহাশয়।
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয়॥
কবি বাচস্পতি তান বাক্য অনুসারে।
শ্রীনারদী রসামৃত রচিলা পয়ারে॥

উপসংহার

আমরা উত্তরাংশে কাছাড়ের কথা অতি সংক্ষেপেই সমাপ্ত করিলাম; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই অংশই শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়;—কেননা, কাছাড়ে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ভদ্র হিন্দু মোসলমান প্রায় সমস্তই শ্রীহট্ট হইতে গিয়াছেন। ফলতঃ "বৃহত্তর" শ্রীহট্টের এই পূর্ব্বাঞ্চলের কাহিনী শ্রীহট্টের গৌরবসূচক। তথাপি বরং কাছাড়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু বৃহত্তর শ্রীহট্টের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ—বর্ত্তমান ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ ও ত্রিপুরার উত্তরাংশ—আমরা স্পর্শ করিতেও পারি নাই। ইতিহাস কখনও কেহ চূড়ান্ত করিয়া লিখিয়া যাইতে পারেনা—ভবিষ্যত ইতিহাসের গবেষণার অবকাশ যথেষ্ট থাকিয়া যায়; বিশেষত বৃহত্তর শ্রীহট্টের ইতিহাস সংকলন আমাদের অসাধ্য। মহত্তর ব্যক্তির কাজ তাই ভবিষ্য ঐতিহাসিকের উপর সে ভার অর্পণ পূর্ব্বক আমরা ক্ষুদ্র লেখনী এই স্থলেই উপসংহার করিলাম।

অনুমোদন

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের টেকস্‌ট্‌ বুক্‌ কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞাপনী প্রচারের পূর্ব্বে "আসাম" বিযুক্ত হইয়া যাওয়ার বঙ্গের ডাইরেক্টার সাহেব মহোদয় ইতিবৃত্ত কেবর তদধীন "পূর্ব্ববঙ্গ" বিভাগের নিমিত্ত লিষ্টভুক্ত করিয়াছেন। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

NOTIFICATION.

The 12th August,1913

No. 5K.-In continuation of Natification No 59K, dated the 23rd September 1912, the following supplementary list of Library and Prize Books recommended for use in schools in Dacca, Chittagong And Rajshahi Division, is published for general information :-

APPENDIX I

Books recommended as Library and prize books for the first four classes of High schools (some of these books may be also found useful in College Libraries.)

Class.	Name of book.	Name of author.	Publisher.	price.
	LIBRARY BOOKS-BENGALI.			
(iii) History	Srihatter Itibritta, Pts. I and II. +	Achyuta Charan Choudhury.	Upendra Nath Pal Choudhury	400

+ Also for Colleges.

APPENDIX II

Books recommended as Library and prize books for the second four classes of High schools or the First four classes of Middle English Schools.

LIBRARY BOOKS-BENGALI.

(iii) History	Srihatter Itibritta, Pts. I and II. +	Achyuta Charan Choudhury.	Upendra Nath Pal Choudhury	400

APPENDIX III

Books recommended as Library and prize books for Vernacular Schools.

LIBRARY BOOKS-BENGALI.

(iii) History	Srihatter Itibritta, Pts. I and II.	Achyuta Charan Choudhury.	Upendra Nath Pal Choudhury	400

W. W. Hornell.
Director of Public Instruction, Bengal.

সমালোচনা
প্রবন্ধাবলীর অংশ বিশেষ।

১—ইংরেজী পত্র (দৈনিক)

The Empine, dated the 1st July 1911.

"There are Histories and Histories in Bengali but very few Bengalis know how to write the history of a country properly. It is with very great satisfaction, therefore, that we announece the publication of a "History of Sylhet" by Mr. Achyuta Choran Choudhuri Tattvanidhi written in a way in which a history should be written. The author has received considerable and valuable help from Rr. Padmanath Battacharja Vidabinod M. A. of the Cutton College Gouhati, the well-known Bengali Liteateur, From an advance copy of part I of the book, which we have just examined we can say without hesitation that it will make the work of future Historians of Bengal easier in many ways. We hope the Educational authorities of E. B. & Assam will see their way off patronize the work."

*　　　*　　　*　　　*

Another issue of the same, dated 20th Nov. 1911, writes:

*　　　*　　　*　　　*

"The work shows careful reading and research, Mr. Choudhuri had shown how a history should be written. If Bengali writers will follow in his steps they will be able to produce many excellent historical works in due course." &c. &c.

The amrit Bazar Patrika-16th September, 1911.

"The Geographical and Historical works of Sylhet."

We are glad to notice that Sriijut Achyuta Charan Choudhuri Tattwanidhi of Sylhet, who some years ago, under took to write a History of the District the lives in, has at last brought out a big volume containing the Georaphical and Historical accounts of District of Sylhet. This, of course, is the first volume, with a promise to complete the work in another volume similar to this size. This work, when complete, will undoubtely and to the store of our vernacular Literature which is going to be enriched almost every day with valuable productions and will prove useful to the reading public.

The author of this work is already well-known for his steady persuits to collate and collect information-historical, biographical and geographical. In these pages his merit has been displayed quite in keeping with the reputation he has already acquired in the field of researches. He is collected and compiled the best possible information

from various reliable sources reading the Geogaphical and Historical accounts of the District. It is pleasing to find that the author has taken great pains in gathering information about religious sects and sentiments which are calculated to be factors of cardinal importance to mould the character of the people and to form a basis of the History of a nation. The author is to be congratulated for the fair performance of the arduous task he has undertaken. The work has been decorated with several pictures, mass of neglected papers both private and offical. The author richly deserves encouragement at the hands of the public for the production of this valuable work which we doubt not throws a flood of light on the materials which served to constitute the basis of History of the District of Sylhet and which were hitherto unknown even to those who had curiosity to peep into the past regarding the importants of other Districts, would, we are sure, positively tend to give us much more important informations regarding the history of the nation than what we are now obtaining from the official Gazetteers. The price of the book is Rs 4.

The Indian Messenger-30th May 1912.

"Srihatter Itibritta or History of Sylhet Vol I by Achyuta Charan Choudhuri, cloth bound, price Rs 4.

Babu Achyuta Charan Choudhuri is alrealy known to the Bengali reading public as a writer of some importance. His articles in the Bengali periodicals to which he often contributes place within the reach of the public his invastigations into the Vaishnave Iliterature of Bengal. But his crowning effort in the field of resarch has been this volume of history before us. It treats of geographical and historical accounts of the authoras own district. The amount of industry and research he has brougt to bear upon this work of leve does Mr. Choudhuri no small credit. It is by attempts like the one the author has made that sufficient mateials for a true history of Bengal can be forth coming.

The book appears with an introduction by Prof. Padmanath Bhattacharya Vidyavionde M. A. Cotton College Gouhati, who we are glad to observe, has co-operated with the author in collecting materials for it, consists of no les than 800 pages, containing almost on every page much valuable information, In the opinion of the author, Sylhet, in the remote past, formed a part of the Aryan Kingdom of Pragivotishpur and the country of 'shi-li-tsa-to-lo' that Huen Tsiang decribed as situated to the north-east of the Kingdom of Samatata was no other than Sylhet, so sylhet appears to have possessed the blessings of Aryan civilization at an early date. If it were not so, the long line of eminent men that it produced would be unaccountable. To mention only a few, Srichaltanya though born in Navadwip belonged to Sylhet by his fathers and mother's side. Sylhet claims as its own advai-

ta, the great Raghunath Siromoni Subtlest logican that Bengal ever produced, Mohes Nayalanker, who like Baghunandan wrote 28 books on old Smriti, called Pradipas, Baninath Vidyasagar whose commentary is one of the best over written on sanskrit, Shah Rehanuddin who for the oxoellence of his, composition was given the title of "the Bulbule Bangla" by the emperor of Delhi of whose sons he was a tutor, The book is written in chaste Bengali. Copious references and useful appendices have enhanced the value of book. We recommend it to the public and eongratalase the author on the success he has attained."

২—বাংলা মাসিকপত্র

ঐতিহাসিক চিত্র—আশ্বিনকার্ত্তিক সংখ্যা ১৩১৮ সাল

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শতাধিক ফর্ম্মায় সমাপ্ত ও ২২ খানি সুদৃশ্য চিত্রে সুশোভিত এবং বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত বিরাট গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৪ টাকা। ছাপা, কাগজ, বাঁধন, সবই সুন্দর।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, ইহা নিতান্ত পুরাতন কথা হইলেও, বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা। সে কলঙ্ক দূর করিবার জন্য, যাঁহারা এ যুগে ব্রতী থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, তাহারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল হইবে।

ইংরাজ লিখিত একদেশদর্শী ঐতিহাসিক, মতামতের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ মাত্র বাঙ্গালার ইতিহাস নহে, একথা বহু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীন তত্ত্বপূর্ণ সুসঙ্কলিত ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় কমই পাঠ করিতে পাওয়া যায়। যে কয়েক খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আজ বহু দিন পরে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হাতে পাইয়া সে ক্ষোভ দূর হইল। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় সাহিত্য সম্রাট স্বদেশের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেখিতেছি ভারতীয় কবির সে অনুরোধ পালিত হইবার পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া পড়িতেছে। গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয় ১৩০৯ সালে এই ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের জন্য যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের দীর্ঘ পরিশ্রমে পরিবর্দ্ধিত সেই ক্ষুদ্র বীজ আজ বিশাল দেহে বঙ্গসাহিত্যে স্থান লাভ করিল। বাঙ্গালীর তথ্যানুসন্ধিৎসার ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় রহিয়া গেল।

বাঙ্গালা কেবল বাঙ্গালীর জন্মভূমি নয়, ইহা অতি প্রাচীন দেশ। এই প্রাচীন দেশের প্রাচীনতম অংশ বিশেষের ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে কালে সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার পথ সরল হইবে। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত পথাবলম্বন করিয়া ইতিহাস রচনায় ব্রতী হইলে বাঙ্গালী ইতিহাস রচনায় শীঘ্রই যশস্বী হইতে পারিবে।

শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন দেশ। এই পুস্তকের ২য় ভাগ ৩য় অধ্যায়ে বৈদেশিক উল্লেখ প্রসঙ্গে দেখিলাম যে, চৈন পরিব্রাজক সুয়েংসাং প্রভৃতি বিদেশীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায়—"প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ পূর্ব্বদেশে যখন আর্য্য প্রতিভা জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়াছিল,

তৎসঙ্গে শ্রীহট্টও সেই প্রজ্বলৎ প্রভায় প্রকাশিত হইয়াছিল"। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীহট্ট ভূমি বৈষ্ণব প্রসূতি। ইহা চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃ ও মাতৃভূমি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে "ভারতগৌরব রঘুনাথ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন।" সুতরাং এতদিন পরে এই প্রসিদ্ধ স্থানের ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় একটী অভাব দূরীভূত হইল।

শ্রীহট্টের ইতিহাস দুইখণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আলোচ্য গ্রন্থ পূর্ব্বাংশ। এই গ্রন্থ সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আজ নয় বৎসরের ফলে, ইহা মুদ্রাযন্ত্রের লৌহ কারাগার ভেদ করিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইল। ইহার প্রথমেই শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ শর্ম্মণঃ লিখিত ভূমিকা, পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে"। ইত্যাদি।

প্রবাসী—আশ্বিন সংখ্যা ১৩১৮ সাল

(সমালোচক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ)

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ (ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক) শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত ৬০৬ পৃঃ মানচিত্র ও ২৩ খানি চিত্রযুক্ত। প্রকাশক শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, মূল্য ৪্ চারি টাকা।

স্বদেশকে ভালবাসিতে হইলে তাহাকে ভাল করিয়া জানা চাই। তবেই স্বদেশ-প্রেমিকতা বৃথা ভাবোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়া যায় না। প্রাকৃতিক অবস্থা, ইতিহাস, জীবনী, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আমরা নিজ জেলা ও প্রদেশ অপেক্ষা বিদেশের খবরই বেশী রাখি, কারণ আমাদের সকল জ্ঞানই পুঁথিগত, এবং এই সব বিভাগে বিদেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট গ্রন্থ আছে; স্বদেশ অন্ততঃ স্বজেলা সম্বন্ধে নাই। আবার, ক্রমে কালের স্রোতে পুরাতনের অনেক চিহ্ন, অনেক জনশ্রুতি লোপ পাইতেছে।

সুতরাং জেলার ইতিহাস লেখার যে একটা চেষ্টা দেশময় জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি। এই কার্য্যে "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" লেখক যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহার উপকরণ সংগ্রহ সমবেত চেষ্টার ফল। যে সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক, তাহার তালিকা ছাপাইয়া তিনবার দেশময় বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে কতক তথ্য হস্তগত হয়। তারপর গ্রামের শিক্ষকদের নিকট হইতে অনেক স্থানীয় বিবরণ লিখিয়া আনা হয়। (যদি লেখকগণ এই শ্রেণীর সংবাদ-দাতাদিগকে হেয় জ্ঞান না করিতেন তবে অনেক মূল্যবান তথ্য ইহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইত।) সর্বশেষ সরকারী মহাফেজ খানার কাগজ পত্র পরীক্ষা করা হয়। ফলতঃ ইউরোপে ইতিহাস লিখিতে আজ কাল যেরূপ সুশৃঙ্খল প্রণালী ও সমবেত চেষ্টা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" বঙ্গদেশে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত।

যে পরিমাণে জেলার ইতিহাসের সঙ্গে দেশের ইতিহাসের অথবা মানবজাতির ভাবের ইতিহাসের সংযোগ স্থাপন করা যায়, সেই পরিমাণে তাহার প্রাদেশিকত্ব ঘুচিয়া যায়, ত্রিহট্ট, আগ্রা, আর্কট প্রভৃতি জেলাকে ভারত-ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। শ্রীহট্ট সেরূপ স্থান নহে।

জেলার ইতিহাস লেখকেরা প্রায়ই দুইটি দোষ এড়াইতে পারে না, প্রথম জোর করিয়া মহাপুরুষদিগের সঙ্গে জেলার সম্বন্ধ স্থাপন করা। আগে আমরা ভ্রমণকারী পাণ্ডবভ্রাতাদের নিজ নিজ জেলায় টানিয়া আনিয়া কোন ভিটে বা জঙ্গলের সঙ্গে তাঁহাদের গল্প যুড়িয়া দিতাম। এখন "বৈদ্ধ প্রভাব"টা ফেশান্ হইয়াছে। পরিত্যক্ত ইটের পাঁজা মাত্রেই প্রাচীন "-" বিহার। অভ্রান্ত

চীন পর্য্যটক ইউয়ান্ চেয়াঙ্গের অন্যায় করিয়া একটু দিকভ্রম কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনী হইতে অতি সহজেই পাঁজাটি "—" বিহার বলিয়া প্রমাণ করি। আদিশূর বল্লালসেন প্রভৃতির স্থানীয় রাজধানীও এইরূপ কাল্পনিক। সাধুদের বিষয়ে উন্মাদ অর্দ্ধবিস্মৃত জনশ্রুতিও এইরূপে বিচার বিবেচনা না করিয়া জেলার ইতিহাসের অন্তর্গত করা হয়। কিন্তু সাহিত্যের জুরীগণ নিশ্চয়ই এগুলিকে "সাধু শোনাক্ত honest identification" নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, এবং কিছুদিন পরে জেলার ইতিহাসের সেই অংশও আরব্য উপন্যাসের শ্রেণীতে যোগ দিবে।

দ্বিতীয় মারাত্মক দোষটি একটা ব্যবসাদারী চালের ফল। লিখিবার মত উপকরণ একেবারেই নাই, অথচ বই বড় করিতে হইবে। কাজেই বৃথা বাগাড়ম্বর এবং অল্প কথা ফেনাইয়া তুলিবার প্রলোভন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচনা এখনও এত নিম্নস্তরে আছে যে ভাবের দৈন্য অলঙ্কারের আড়ম্বরে এবং ভাষার ঝঙ্কারে লুকাইয়া ফেলিলে লেখক বাহবা পান। সুখের বিষয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"—লেখক এ লোভ কাটাইতে পারিয়াছেন।

* * * *

ইহার বিশুদ্ধ সংবাদ ঠিক তারিখ ও সংখ্যা, চিত্র, দলিলের প্রতিলিপি, বংশাবলী প্রভৃতির জন্য, জেলার ইতিহাস হইলেও ইহা বঙ্গের ঐতিহাসিকের, ভারতের ঐতিহাসিকের, নিকট প্রথম শ্রেণীর উপকরণ বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম তথ্যের ভিত্তি না পাইলে কোন ইতিহাস স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের ইতিহাস লিখিবার পক্ষেও গ্রন্থখানি এক অত্যাবশ্যক খনি।

আমরা ভরসা করি যে "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" বঙ্গভাষীদের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান পাইবে, এবং ্যতবাবু এইরূপ প্রণালী ও উৎকর্ষের সহিত দ্বিতীয় বালুম লিখিয়া তাঁহার কীর্ত্তি সম্পূর্ণ করিবেন।"

সাহিত্য সংবাদ—চৈত্র ১৩১৮ বাং (১ম বর্ষ ৩১৫ পৃঃ)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" প্রণয়ন করিয়াছেন। একটি প্রদেশের বা একটি জেলার ইতিহাস হইলেও এই গ্রন্থ প্রণয়নে অমানুষিক পরিশ্রমের, বিপুল অর্থব্যয়ের এবং গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়; আর একমাত্র শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়নেই সাহিত্য সংসারে চৌধুরী মহাশয়ের কীর্ত্তি ও যশঃপ্রভা চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে বলিয়া মনে করিতে পারি। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়নে চৌধুরী মহাশয়ের নামের সঙ্গে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয়ের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়নের কল্পনা ইহাদের দুই জনের মনে যুগপৎ উদয় হইয়াছিল। ১৩০৯ সালের আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রোক্ত ইতিহাস সঙ্কলনের উপযোগী উপাদান সমূহ সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন পত্র প্রচার করেন। সেই সময়, চৌধুরী মহাশয় "শ্রীহট্টাদীপিকা" নামক শ্রীহট্টের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণ জন্য মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিজ্ঞাপন পত্র পাইয়া চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে আপনার গ্রন্থের বিষয় লিখিয়া পাঠান। ইহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার সংগৃহীত সমস্ত উপাদান চৌধুরী মহাশয়কে প্রদান করেন। তখন চৌধুরী মহাশয় শ্রীহট্টের এই বিস্তৃত ইতিবৃত্ত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের আর এক মহত্ত্ব—তিনি এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় বহন করিয়াছেন। তিনি রাজা নহেন, জমিদার নহেন, ধনবান নহেন; অথচ তিনি আপন জেলার ইতিবৃত্ত প্রকাশের এই ব্যয়

নিঃস্বার্থ ভাবে প্রদান করিয়াছেন! এ বিষয় চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি নিঃস্বার্থভাবে এই গ্রন্থের মুদ্রণাদির ব্যয় (প্রায় আড়াই হাজার টাকা) বহন না করিতেন তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইত না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এ আদর্শ—বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী সামর্থ্যবান ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণীয়।

গ্রন্থখানি সুরঞ্জিত মানচিত্রে এবং আবশ্যকানুরূপ বিবিধ চিত্রাদিতে সুশোভিত। এই গ্রন্থে এত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে যে এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে।

যাঁহারা সাহিত্যের সমাদর করেন, সৎসাহিত্যের উৎসাহ দানে পরাঙ্মুখ নহেন, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তাঁহাদের সকলেরই নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

যে অধ্যবসায়, যে পরিশ্রম এবং যে অনুসন্ধিৎসার সহিত এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।"

শান্তিকণা—৩য় বর্ষ—১১৷৷ ১২শ সংখ্যা

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।—শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত। পূর্ব্বাংশ, ১ম ও ২য় ভাগ; ডিমাই ৮ পেজী, প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲ টাকা।

ইহা একখানি শ্রীহট্ট জেলার ইতিহাস, ভূগোল সমাজ, তীর্থকাহিনী, শিল্প বাণিজ্য, দেশের অবস্থা, জীবজন্তু প্রভৃতি নানাবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ। এরূপ গবেষণা ও প্রকৃত তথ্যপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ জেলার, এমন কি দেশের পক্ষে অতিশয় গৌরবের সামগ্রী। যদি প্রত্যেক জেলার এই রূপ বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মতথ্য সম্বলিত বিস্তৃত ইতিহাস রচিত হয়, তবে দেশের ও ভাষার প্রকৃতই কল্যাণ সাধিত হয়। অচ্যুতবাবুর নিকট বঙ্গভাষা ও বঙ্গবাসী—বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসী চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলেন। এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলনে যথেষ্ট গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আমরা গ্রন্থকর্ত্তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি। শুভক্ষণে তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। লেখকের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। যদি দেশের প্রকৃত ইতিহাস ভূগোল, সমাজ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাপর বিস্তৃত তথ্য জানিতে হয়, তবে ইহা একমাত্র পাঠ্য, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর হাফটোন চিত্র ও শ্রীহট্টের একখানি সুরঞ্জিত মানচিত্র আছে, ছাপা কাগজ ও বাইণ্ডিং সুন্দর।"

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—১১শ সংখ্যা ফাল্গুণ ১৩১৮ সন

(লেখক প্রবীণ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ।)

"জাতীয় গৌরব স্তম্ভ জাতীয় ইতিহাস। জাতীয় ইতিহাসের অভাব জাতীয় দুর্ভাগ্য। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা করিবার জন্য জাতীয় ইতিহাস লেখকের অভাব নিতান্তই জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

* * * *

বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস রচনার সময় অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু প্রাদেশিক ইতিহাস সংগৃহীত না হইলে বাঙ্গলার ইতিহাস সঙ্কলন অতি দুরূহ বলিয়া বোধ হয়। ইতঃপূর্ব্বে ময়মনসিংহ ও শেরপুরের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। অদ্য আর এক খানা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রাদেশিক ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা—"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।" এই গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় সাহিত্যিক সমাজে অপরিচিত নহেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অচ্যুতচরণ

বাবুর বিশেষ সাহায্যকারী। ইঁহাদের উভয়ের যত্নে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বইটি লোকলোচনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে। ইহারা উভয়েই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকে আদর্শ বলিয়া বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার ইতিহাস রচনা করা এক্ষণ আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে।

৩—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

বসুমতী—৩রা কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল।
(লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।)

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।—পূর্ব্বাংশ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত, মূল্য চারি টাকা।

আজ কাল আমাদের দেশে ইতিহাসের যথেষ্ট অনুসন্ধান ও আলোচনা হইতেছে, ইহা যে অত্যন্ত সুখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, যাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা দেশ অত্যন্ত আধুনিক,—বাঙ্গালার আলোচনাযোগ্য ইতিহাস নাই, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রম প্রবর্ত্ত, বর্ত্তমান যুগের অনুসন্ধান তাহা দিন দিন দৃঢ়তার সহিত সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালা দেশ যতই আধুনিক হউক না কেন,—আমরা এখন যে সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকি, সেই সকল দেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ প্রাচীনতর। আর্য্যগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বঙ্গে আসিয়াছেন। বঙ্গের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে শ্রীহট্ট অঞ্চল। শ্রীহট্ট বঙ্গেরই অঙ্গীভূত। বৃটিশ রাজ শাসন সৌকার্য্যার্থে শ্রীহট্টকে যে ভাগেই স্থাপিত করুন না কেন, আমরা চিরকালই শ্রীহট্টকে আপনার বলিয়া আসিতেছি, আপনার বলিয়াই মনে করিব। জ্ঞাতি স্থানান্তরিত হইলেই হিন্দুর কখনই তাহার সহিত জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করে না। দুরস্থ জ্ঞাতির অশৌচপালনে হিন্দু কখনও পরাঙ্মুখ নহে। সুতরাং শ্রীহট্ট আসামভূক্তই হউন, আর তিব্বতভুক্তই হউন—শ্রীহট্ট আমাদের, শ্রীহট্ট বাঙ্গালারই। এই শ্রীহট্টের অতীত ইতিহাস বাঙ্গালারই গৌরবের পরিচায়ক। যখন বাঙ্গালার অনেক আধুনিক সমৃদ্ধ অঞ্চল, বিস্তীর্ণ সলিল রাশিতে নিমজ্জিত ছিল,—তখনও শ্রীহট্ট বক্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া আমাদেরই সে পূর্ব্বগত আর্য্যগণকে আশ্রয় দিয়াছে। আমাদেরই কত ধর্ম্ম প্রাণ পূর্ব্বপুরুষ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে শ্রীহট্টে যাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

প্রায় চারি সহস্র বর্ষ ধরিয়া, এই অঞ্চলে আর্য্যকীর্ত্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়াছিল। সে কীর্ত্তিকথা অধ্যয়ন করিবার জন্য যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল না হয়,—তিনি হিন্দু নাম গ্রহণের যোগ্য নহেন। এতদিন শ্রীহট্টের ইতিহাস সহজপ্রাপ্য ছিল না, এখন উহা সহজ প্রাপ্য হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এত বিস্ময়কর ব্যাপার এরূপ সুন্দর ভাবে নিপুণতা সহকারে প্রদত্ত হইয়াছে যে ইহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রন্থকার মহাশয় এই গ্রন্থে এত সুন্দর ও প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যে, ইহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গ্রন্থকার মহাভারতের সময় হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসরের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা এত সুললিত, যুক্তি এত সুবিন্যস্ত যে, উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। প্রতি ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। সংবাদ পত্রের সংক্ষিপ্ত স্থানে এইরূপ ইতিহাসের তথ্য পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য আমরা পাঠকবর্গকে এই সুন্দর গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। গ্রন্থখানি বৃহৎ। ছাপা, কাগজ, ও বাঁধাই অতি সুন্দর। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। গ্রন্থখানির আদর অবশ্যম্ভাবী।"ঃ

বঙ্গবাসী,—১৬ই ভাদ্র ১৩১৮ সাল

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"

"বাঙ্গালার খাঁটি ইতিহাস লিখিবার সুযোগ ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। অধুনা ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেরই একটা এমন ধাঁচা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা ছোট কাজ আরম্ভ করিতে চাহেন না। যে বৃহৎ কল্পনা তাঁহাদের চক্ষু ঝলসিয়া না দেয় তাহাতে তাঁহাদের বড় আস্থা থাকে না। তাঁহারা বড় কল্পনা লইয়া বড় কাজ করিতে চাহেন। অথচ বড় কাজের আরম্ভেই হয়ত তাঁহাদের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়, তথাপি তাঁহারা ছোট কাজে হাত দিতে চাহেন না। ছোট কাজ আরম্ভ হইলে, ক্রমে ব্যষ্টিতে সমষ্টির কাজ হওয়াই অসম্ভব। বাঙ্গালার ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের কোন খবর রাখেন না, অথচ সমগ্র ভারতের উদ্ধার করিতে চাহেন, এমন দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষের অভাব আমাদের দেশে নাই বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ইতোনষ্টোতভোভ্রষ্টঃ। পল্লীগ্রামেরও দুঃখ ঘুচেনা, ভারতেরও উদ্ধার হয় না।

সকল কাজের সম্বন্ধেই ত এই কথা। ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত লিখিবার কথাটাই ধর না। আমরা একটী পল্লীগ্রামের কোন খবর রাখি না, জেলার কথা ত দূরের কথা, আমরা সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে বসি। এমন কি, অনেকে দুর্ব্বুদ্ধির বশে সমগ্র ভারতের ইতিহাস লিখিয়া থাকেন এবং লিখিতে চাহেন। যাঁহারা এরূপ লিখেন, তাঁহারা আবার গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া যান। তাঁহারা দেশের নূতন পুরাতন কোন তথ্য সংগ্রহে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশের ব্যয় করেন না; কিন্তু পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকেরা যা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহারই পুনরুদ্ধার করেন মাত্র। তাঁহাদের ইতিহাস লিখিবার অধ্যবসায় বা মেধা নাই, অথচ ইতিহাস লেখকের গর্ব্ব-পরিচয়প্রার্থী।

সৌভাগ্যের বিষয়, এখন এভাবের কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেরূপ ব্যষ্টিভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিলে, সমষ্টিতে দেশের পূর্ণাঙ্গ পুষ্টিময় ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে, এখন অনেকেরই সেই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন অনেকেই ইতিহাস লেখার প্রকৃত পথানুসরণ করিতেছেন। এখন কেহ কেহ সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস না করিয়া বাঙ্গালার খণ্ডাংশ জেলার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেরূপ ভাবে তথ্যানুসন্ধান করিলে, যেরূপ ভাবে শ্রমসাধনায় মনোনিবিষ্ট হইলে, যেরূপ ভাবে অর্থব্যয়ে দৃষ্টি রাখিলে, একটী জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়, এখন কেহ কেহ সেই ভাবে ইতিহাস লিখিতেছেন।

* * * *

আজ কাল ইউরোপীয় ইতিহাসে নূতন ভাবের বিকাশ দেখা যায়। প্রাচীন ইতিহাস লেখকেরা কেবল তথ্য লইয়া থাকিতেন; পরন্তু কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য সাধনে দৃষ্টি রাখিতেন। এখনকার ইতিহাস লেখকেরা তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিশ্লেষণে মনোযোগী হইয়া থাকেন। আমাদের এদেশে এখন কেহ কেহ আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাস রচনার প্রণালী মতে চলিতেছেন। অন্ততঃ যাঁহারা বাঙ্গালার খণ্ডাংশের ইতিহাস লিখিতেছেন, তাঁহাদের রচনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজী লেখকেরা বলেন যে কেবল লিখিত পঠিত বিষয় লইয়া ইতিহাস লিখিলে চলিবে না, চির প্রচলিত কিম্বদন্তী, প্রবাদ প্রভৃতির সন্ধান লইতে হইবে, তবে কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য আর কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহার বিচার করা চাই। সে ক্ষমতা আমাদের ঋষি ইতিহাস লেখকদের ছিল। ফলে ইংরেজ লেখকের কথাটা অমান্য নহে।

আজকাল বাঙ্গালার যে সব খণ্ডাংশের ইতিহাস লেখা হইতেছে, তাহাতে ইংরেজ লেখকের কথা অবমানিত হয় না। প্রমাণ স্বরূপে আমরা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত নামক নূতন গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত। ইহা শ্রীহট্ট ইতিবৃত্তের পূর্ব্বাংশ। ইহা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক। চৌধুরী মহাশয় সুলেখক। বহুদিন যাবৎ বহু পরিশ্রম করিয়া ইনি বহু সন্ধান লইয়াছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। শ্রীহট্টের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক কৌতূহলোদ্দীপন করিয়া থাকে। যাহার পর যে বিষয়টীর সমাবেশ প্রয়োজনীয়, বেশ সুসম্বন্ধভাবে তাহার পর সেই বিষয়টীর উল্লেখ হইয়াছে। দেববিগ্রহের আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে হিন্দুর বিশ্বাসমতে আলোচনা হিন্দুলেখকের যোগ্য হইয়াছে। স্বভাববর্ণনা ভাষার মাধুর্য্যে হৃদয়োন্মাদক। আলোচ্য গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ নহে। ইহা পূর্ব্বাংশ মাত্র। প্রকাণ্ড গ্রন্থ, ৬/৭ শত পৃষ্ঠার ত কম নহে। সুন্দর কাগজ, ছাপাই ও বাঁধাই। এ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে গ্রন্থকারের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে ভাগ ও খণ্ড আছে। এ সকল খণ্ডে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণ ও বিশ্লেষণ হইয়াছে। এরূপ ধরণের ইতিহাস বাঙ্গালায় বিরল। প্রাচীন তথ্য পড়িতে পড়িতে, বহু স্থানে বাঙ্গালী বীরের বীরত্ব কাহিনীর আলোচনা করিতে করিতে মন মাতোয়ারা হইয়া পড়ে। দেশের পূর্ব্বাবস্থা ও অধুনাতন অবস্থার তুলনা সমালোচনায় পুলকে প্রাণ ভরিয়া যায় এবং অনেক স্থলে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। শ্রীহট্টের অনেক সুচারু শিল্প লোপ পাইয়াছে। তাহার বিষয় এ গ্রন্থে পড়িলে বুকের হাড় খসিয়া পড়ে। ফলে আলোচ্য গ্রন্থখানি খাঁটি ইতিহাস। এইরূপ ভাবে যদি সকল জেলার ইতিহাস লিখিত হয়, তাহা হইলে একদিন বাঙ্গালার খাঁটি ইতিহাস দেখিবার আশা করিতে পারি। প্রত্যেক বাঙ্গালীর শ্রীহট্টের ইতিহাস পাঠ করা উচিত। ইহাতে কয়েক খানি চিত্র আছে, মূল্য ৪ টাকা। গ্রন্থের আকৃতি এবং প্রকৃতি হিসাবে ইহা নিশ্চিতই সুলভ মূল্য।"

আনন্দবাজার পত্রিকা—৩২ শে শ্রাবণ ১৩১৮ সাল
"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"

"আমরা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থের পূর্ব্বাংশ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার মহাশয় যে অসাধারণ ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ইতিহাসপাঠার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় ভাগে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপসংহারে কাছাড়ের বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। এক খানি মানচিত্র, অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ স্থানের প্রতিচ্ছবি এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় দলিলের প্রতিলিপি দ্বারায় গ্রন্থখানি সমালঙ্কৃত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় এই বিরাট আয়তনের অতি সুন্দর পুস্তক খানিকে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণের পাঠের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই অশেষ শ্রম বিপুল গবেষণা এবং রচনা প্রণালীর প্রাঞ্জলতা দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ, সরল ও চিত্তাকর্ষী ভাষায় সেই সকল উপাদান উপযুক্তরূপে বিন্যস্ত করা এবং বিশ্বাসযোগ্য দলিল প্রমাণ প্রভৃতির দ্বারায় ঐতিহাসিক ঘটনার সমর্থন করা ঐতিহাসিক নিবন্ধলেখকগণের প্রধানতম গৌরবের বিষয়।

সরকারী অনেক দলিল আদি হইতে এবং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদি হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

মহাশয় শ্রীহট্ট সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যে সকল বিষয় ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ কখনও সাহিত্য সমাজে প্রকাশ করেন নাই। যদি গ্রন্থকার মহোদয়ের গবেষণার সেই সকল বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত না হইত, তাহা হইলে কালে সেই সকল ঘটনা লোকের জ্ঞানের সীমা হইতে হইত না। আমরা এই গ্রন্থখানিকে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত বলিব কিম্বা শ্রীহট্ট সীমা হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আমরা এই গ্রন্থখানিকে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত বলিব কিম্বা শ্রীহট্ট সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া বলিব, তাহাই এক বিচার্য্য বিষয় বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে।

* * * *

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ভাষা সর্ব্বত্রই সরল প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষী। আমরা এই ইতিহাসেও তাহার সুস্পষ্ট বহুল উদাহরণ দেখিতে পাইয়া বিমুগ্ধ হইলাম। দয়াময় শ্রীভগবান গ্রন্থকারকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহার দ্বারায় এই মহৎ কার্য্য যথাসম্ভব সত্বরে পরিসমাপ্ত করাইবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা॥

পল্লীবাসী—১৯ শে আষাঢ় ১৩১৯ সাল।
"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।"

"সৎগ্রন্থের প্রকাশে সৎসাহিত্যের প্রচার;—সৎসাহিত্যের প্রচারে সাহিত্যিকের আনন্দ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পাঠে আমরা এমনই আনন্দ পাইয়াছি।

প্রণেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত—"পল্লীবাসীর" আশৈশব সুহৃদ্—আমাদের পরম প্রেমাস্পদ। তাই সাহিত্যিক অচ্যুতচরণকে আজ ঐতিহাসিক হিসাবে অভিনন্দন করিতে গিয়া আমরা একটু গৌরবও অনুভব করিতেছি। তত্ত্বনিধির ভাষালেখায় খাসা হাত। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে তাহার পরিচয় পাই।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত এক বিরাট ব্যাপার। শ্রীহট্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এমন কোনও ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক তথ্য নাই, যাহা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের সমালোচ্য পূর্ব্বাংশে সন্নিবেশিত হয় নাই।

* * * *

* * * *

ইতিবৃত্তটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে গ্রন্থকারের যত্নের কোনটি ত্রুটি নাই। গ্রন্থশেষে যে দুইটি পরিশিষ্ট সংযোগ করা হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান। এই বিরাট গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, পুরাতত্ত্বাভিজ্ঞতা ও লিপিকুশলতার প্রয়োজন, তত্ত্বনিধি মহাশয় তাহার যথেষ্টই পরিচয় দিয়াছেন। কিরূপে আজ আট বৎসরের চেষ্টা ও যত্নে এবং অচ্যুতবাবুর একান্ত অধ্যবসায়ে এই বিরাট গ্রন্থ লোক সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ভূমিকায় তাহা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ পড়িয়া অনেক লিখিলাম; অবশিষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর মঙ্গল-বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি।

আমাদের জাতীয় ইতিহাস নাই বলিয়া এতদিন যে একটা কলঙ্ক, এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত অধিক প্রচার হইবে, ততই তাহার ক্ষালন হইবে। এই মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করিয়া তত্ত্বনিধি মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে বিজয়কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি,—গ্রন্থকার তাঁহার ইতিবৃত্ত খানি সম্পূর্ণ করিয়া ধন্য হউক।

পরিদর্শক—২৭শে আগষ্ট ১৯১১ ইং

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—পূর্ব্বাংশ।"

"যাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্যের সন্ধান রাখেন, যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত গৌরপদ তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিশিষ্ট মত প্রকাশ করিতে যাঁহারা সক্ষম, শ্রীহট্টের পণ্ডিত অচ্যুতচরণ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বপ্রথম। শ্রীহট্ট জানে না, যে এমন রত্ন তাহার গর্ভে আছে। কিন্তু বাংলাদেশ তাহা বিশেষ ভাবেই অবগত আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বাংলাভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকায় কৃতি লেখক তত্ত্বনিধি মহাশয়ের কিরূপ গুণগান করিয়াছেন, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদরজঃ শোভিত দেশে অচ্যুতচরণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, দশবৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই দেশের ইতিবৃত্ত লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যে আজ তিনি স্বার্থকনামা হইয়াছেন।

তারপর যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আপনার নাম এক সময়ে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, যিনি সাহিত্য সাধনার ব্রত গ্রহণ করিয়া উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সম্মিলনীতে কর্ণধারের কার্য্য করিয়াছিলেন, আজ যিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনীর "পরিচালনা সমিতি"র সভ্য, সেই অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও ধন্য! তিনি দুই সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন, দশবৎসর ব্যাপিয়া গুরু পরিশ্রমে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যোগ্যব্যক্তির সন্ধান করিয়া স্বয়ং গ্রন্থকার যশোপ্রার্থী না হইয়া আপন জন্মভূমিখণ্ডের, শ্রীহট্ট প্রদেশের পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় এইরূপ বিরাট সাহিত্যানুষ্ঠান বঙ্গদেশে বড়ই বিরল; বিশেষতঃ আমরা জানি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই গুরুকার্য্য সম্পাদনের জন্য কাহারো দ্বারস্থ হন নাই, অথচ ভগবানও তাঁহাকে অজস্র ধনরত্নের অধিকারী করেন নাই।

পুস্তকের সঙ্কলন প্রণালী অভিনব ও আধুনিক। বিজ্ঞাপন দিয়া দশ বৎসর ব্যাপিয়া সমস্ত জিলার সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যান্ ব্যক্তিদিগের আনুকুল্যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। স্তুপাকার তথ্য, সংবাদ, গুজব, কাহিনী, সত্য ও মিথ্যার পর্ব্বত প্রমাণ কাগজের রাশি আলোড়িত করিয়া আজ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত যুগান্তের তিমির দূর করিয়া লোকলোচনের সমক্ষে বাহির হইয়াছে। বাংলাদেশে এই প্রণালীতে আজ পর্য্যন্ত এত বৃহৎ একখানি ইতিবৃত্তও বাহির হয় নাই। অন্যান্য ইতিবৃত্তের সহিত তুলনায় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের কিছু বিশেষত্ব আছে; শ্রীহট্ট প্রাচীন কালে এক রাজার রাজ্যধীন ছিল না। বহুতর নৃপতিপুঞ্জে ও স্বাধীনরাজ্যে এই প্রদেশ গঠিত ছিল। এক রাজ্যের কাহিনী, অন্যরাজ্যের উপকথার সহিত জড়িত হওয়ায় ঐতিহাসিক গবেষণার পথ কত যে কন্টকাকীর্ণ, তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রের অবিদিত নহে। তারপর শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন দেশ, বাংলাদেশ যখন অসভ্যসেবিত, নদনদী প্লাবিত, শ্রীহট্ট তখনও আর্য্য-কিরণ-গরিমায় উদ্ভাসিত। অচ্যুতচরণের সুললিত ভাষায় সেই শ্রীহট্টের প্রাচীন কাহিনী পাঠ করিলে সেই দূর অতীতের শোভন চিত্র, সেই রাজযজ্ঞের পবিত্র হোমশিখা, সেই যজ্ঞকুণ্ড, সেই গিরিপ্রাকারবেষ্টিত, "সাগর" রাজি-পরিশোভিত রণতরী ও বাণিজ্যপোত সমাকীর্ণ বরবক্র ও তপোবন-সমাচ্ছন্নতটা মনুনদের জলরাশি সেবিত, মহাপীঠের পূণ্যনিকেতন শ্রীহট্টের পরম রমণীর চিত্র যেন স্বতঃই নয়নপথে ভাসিয়া উঠে।

শ্রীহট্টবাসী এই পুণ্যগাথা পরিপূর্ণ ইতিবৃত্ত পাঠ করুন, হৃদয়ঙ্গম হইবে, আপনারা কোথায় জন্মিয়াছেন। আধুনিক যুগে শ্রীহট্ট যতই পতিত হৌক্ না কেন, আপনারা বুঝিবেন যে বাঙ্গালী

যদি ভারতের গৌরব মুকুট হয়, তবে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই মুকুটের গৌরবোজ্জ্বল মণি ছিলেন। আপনাদের পিতৃভূমি, প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি, আপনাদের দেশ বাংলার স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা রাজাগণের কূটরাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী নরসিংহের দেশ, আপনাদের এই জলবায়ুতে এমন পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার গৌরবগাঁথা কীর্ত্তন করিতে কবি গাহিয়াছেনঃ—

পক্ষধরের পক্ষ পাতন করি।
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে
যশের মুকুট পরি॥"

জানিবেন, যিনি মেঘনানদীর পূর্ব্বাঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপাত করিয়াছিলেন, সেই বীরের পদভরে এই শহর একদিন কম্পিত হইত, আজ তাঁহারই পুত্রপৌত্রগণ দুর্গতির জীবন যাপন করিতেছেন। জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, কাব্য, ন্যায় ও ললিত কলার পরিচর্য্যায়, ধর্ম্মক্ষেত্রে ও সমরক্ষেত্রে এক দিক এই অধুনাপতিত শ্রীহট্টের কৃতিসন্তান পূর্ব্বভারতের আর্য্যজাতির বিজয় গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসি! আপনারা বিস্মৃতির জলে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবকীর্ত্তি ভাসাইয়া দিয়া নিজেদের অকর্ম্মন্য বলিয়া জগতের সমক্ষে ঘৃণিতের জীবনযাপন করিতেছিলেন, আজ এই ইতিহাস পাঠ করুন, জানিতে পারিবেন, ভারতবর্ষে আর্য্যগৌরব প্রতিষ্ঠাকল্পে যে মস্তিষ্ক ও শোণিতপাত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ কণিকা এখনও ঐ তুচ্ছ দেহের ভিতরে বিষাদের গান গাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আর বিশেষ বলিতে চাহিনা, যদি অতীতের উপসনায় কখনও আপনি গৌরব অনুভব করেন, তবে একখণ্ড ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া তাহার স্বার্থকতা অনুভব করুন।

পুস্তকে প্রকাশিত সকল কথাই যে সম্পূর্ণ সত্য হইবে, এমন কথা আমরা বলি না; তবে পুস্তকে যদি স্থানে স্থানে সামান্য ভুল হয় তবে এই ক্রুটী গ্রন্থকারের নহে, কারণ গ্রন্থকার সকলের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন, এ স্থলে দেশের লোকদের কর্ত্তব্য যে তাহা প্রদর্শন করিয়া দিয়া ইতিবৃত্তখানি নির্ভুল করেন। তবে গ্রন্থকার জ্ঞাতসারে যে ভুল ভ্রান্তির প্রশ্রয় দেন নাই, ইহাই তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতার পরিচয়। পুস্তকপাঠে দেখিবেন যে তিনি স্থানে স্থানে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মত সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ঐতিহাসিকের সত্যানুসন্ধান স্পৃহার জয় হইয়াছে। অচ্যুতবাবুর ইতিহাস শ্রীহট্টের প্রথম প্রথম ইতিহাস, যাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রথম ইতিহাস দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিবেন যে এটা একটা দেশের প্রাণ ইতিহাস এই গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল বা সৌষ্টবসম্পন্ন হইতে পারে না। এমন নির্ভুল ইতিহাস লিখিলে লেখককে দেবতা বলিতে হইত, তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকার কখন নিজকে দেবতা মনে করেন না, তিনি সত্যানুসন্ধান-স্পৃহাসম্পন্ন সাধারণ মানুষ,—মানুষ যাহা এই ক্ষেত্রে করিতে পারে, তাহা তিনি করিয়াছেন, পুস্তক সম্বন্ধে এতাধিক প্রশংসা করিবার শক্তি নাই।"

* * * *

এতদ্ব্যতীত "হিতবাদী" (৪ঠা ফাল্গুণ ১৩১৮), বিশ্ববার্ত্তা (১৯১১ ইং) প্রভৃতি সংবাদ পত্রে ইতিবৃত্তের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; বাহুল্য বিধায় তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এস্থলে উদ্ধৃত অংশে সমালোচনা প্রবন্ধগুলি হইতে কোন কোন স্থান পরিত্যাগ করিয়া সংক্ষেপ করতঃ প্রকাশ করা গেল। প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় যে, ব্যবসাদারী চালে, সমালোচনা হইতে প্রতিকূল অংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রশংসাবাদ মাত্রই উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি হইতে যাহা বাদ দেওয়া গেল, তাহা তদ্রূপ অংশ নহে। ইতিবৃত্তের বিষয়-পরিচয় সম্বন্ধে যাহা প্রবন্ধে ছিল, সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে তাহাই মাত্র বাদ দেওয়া অংশে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অনেক বিজ্ঞ মহানুভব ব্যক্তি "ইতিবৃত্ত" পাঠে পত্রদ্বারা স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে মাত্র তিন জনের পত্র হইতে ২/৪ ছত্র উদ্ধৃত করা গেল।

(১)

"আপনার + + শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমরা এতদিন যে শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলাম, আপনি তাহাই পূরণ করিলেন। এই অল্পকাল মধ্যে যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি ও ইতিবৃত্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী ক্রমে সুন্দর লিখিত হইয়াছে। কার্য্য যে এতশীঘ্র শেষ হইবে আমি ততদূর আশা করি নাই। আপনি বোধ হয় অবগত আছেন রঙ্গপুর ও বগুড়ার ইতিবৃত্তও রচিত হইতেছে। রঙ্গপুর হইতে + + + বাবু অনুগ্রহ করিয়া এ সম্বন্ধে আমার সাহিত্যিক সহানুভূতি চাহিয়াছেন, ইতি মধ্যেই আপনার প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহারাও কার্য্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছি।" + + +

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়
("নবাবী আমল" প্রভৃতি প্রণেতা।)

(২)

\+ + + +

আপনারা যে উদ্যমে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তখানি সংকলিত করিয়াছেন, মুদ্রণের উদ্যম তাহার তুলনায় বিলক্ষণ উল্লেখযোগ্য। + + +

শ্রীহট্টের সকল কথাই আমাদের ভাবিবার এবং ভাবিয়া শিখিবার কথা। আশা করি গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত করিতে পারিলে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। +

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
("সিরাজ উদ্দৌলা" প্রভৃতির লেখক।)

(৩)

"শ্রীহট্টের ইতিহাস আমাদের নিকট একটা বিশেষ গৌরবের জিনিস অনেক দিন হইতেই এ গৌরব কাহিনী পাঠ করিতে আকাঙ্ক্ষা হইত, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার কোন উপায় ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উদ্যোগ করিয়াছিলেন, আর আপনার মত অক্লান্তকর্ম্মা লিপিকুশল লেখকের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাই আজ আমাদের দীর্ঘকালের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হইল। আপনি এত পরিশ্রম করিয়া যে পথ খুলিলেন, তাহার অনুসরণে ভবিষ্যতে আরও কত লোক এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপে প্রসিদ্ধলাভ করিবেন, কিন্তু প্রথম পথ প্রদর্শকের আদর, সম্মান এবং যশ চিরদিন অবিসংবাদিতরূপে আপনারই রহিবে। এই গ্রন্থ লিখিতে যে ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে. গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়ই তাহার পরিচয় দিতেছে। গ্রন্থপাঠের সময় কত যে অজ্ঞাত নূতন বিষয় জানিতে পারিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। মাতৃভূমির এই গৌরবাত্মক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। +

\+ + +